চতুর্থ ভাগ।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

চতুর্থ বৎসরের লেখকগণের নাম।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ উমেশচন্দ্র গুপ্ত
„ কানাইলাল মিত্র
„ কামিনীকুমার দাস
„ কালীপ্রসন্ন দত্ত
„ কুলচন্দ্র দে
„ গঙ্গাচরণ সরকার
„ গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী
„ গিরিশচন্দ্র বসু
„ গোপালচন্দ্র চৌধুরী
„ গোবিন্দচন্দ্র দাস
„ চন্দ্রনাথ বসু
„ চন্দ্রমোহন সেন
„ চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ
„ জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
„ জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়
„ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়
„ দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি
„ নবীনচন্দ্র সেন
„ নিমাইচাঁদ শীল
„ পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়
„ পাঁচকড়ি ঘোষ
„ প্রকাশচন্দ্র বসু
„ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বেনোয়ারিলাল গোস্বামী
„ ব্রজেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ স্মৃতিতীর্থ
„ মনোমোহন চক্রবর্ত্তী
„ মহেন্দ্রনাথ মিত্র
„ মুক্তকেশী দেবী
„ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ রঘুনাথ দে
„ রজনীকান্ত গুপ্ত
„ রামদাস হাজরা
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
„ শরচ্চন্দ্র গোষ্ঠীপতি
„ শরচ্চন্দ্র মজুমদার
„ শশীভূষণ দে
„ শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সতীশচন্দ্র রায়
„ সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ
„ সিদ্ধেশ্বর রায়
„ হরচন্দ্র চৌধুরী
„ হরিচরণ রায়
„ হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
„ হারাণচন্দ্র রক্ষিত
„ হারাধন মুখোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ হৃষীকেশ শাস্ত্রী

ও সম্পাদক।

কলিকাতা,
৫৩ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, অপূর্ব্ব কার্য্যালয় হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
শকাব্দা ১২৯৫।
মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

সূচিপত্র।

গদ্য।

পদ্য।

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ | শ্রাবণ ১২৯৪। | ১ম সংখ্যা।

প্রাণের প্রার্থনা।

(১)

দুরন্ত দিনে প্রকট দিগম্বর,
ভূতনাথ ভকতির ভগবান,
আশ্চর্য্য সুন্দর সত্য স্বরূপে
সবনে মহেশ মুরতিমান।

(২)

সর্ব্বেন্দ্র শিব সংসার শুভঙ্কর,
জ্যোতির্ম্ময় জগন্নাথ জগত্রাণ,
যোগীন্দ্র জীবন্ত অনন্ত সত্যের
সুশান্ত প্রশান্ত নিতান্ত নিদান।

(৩)

আনন্দময় আজন্ম আত্মারাম,
চিরঞ্জীব চিদানন্দ চিরন্তন,
চিন্ময় স্বরূপ সগুণে সাক্ষাৎ
ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ নিত্য নিরঞ্জন।

(৪)

ওঙ্কার প্রাণ বিজ্ঞান বিলোকিত
নিরবধি নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিকার,
অনন্ত অপার ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপৃত,
চিরন্তন চৈতন্য চমৎকার।

(৫)

স্বতন্ত্র প্রভু নিষ্কাম নিষ্কলঙ্ক,
নিরন্তর নিত্য সুখে নিমগন,
সম্পূর্ণ শাশ্বত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর,
প্রকৃতি বিভূতি বিচিত্র ভূষণ।

(৬)

প্রকট হৈলা প্রকৃতি প্রয়োজনে,
প্রেমিকের প্রাণ-ভর প্রার্থনায়,
প্রকট হইলা লাবণ্য সমুদ্র
শ্রীপতি শঙ্কর শকতি সহায়।

(৭)

বীরেন্দ্র বলী বৈষম্য বিবর্জ্জিত,
পরাক্রান্ত পরমেশ পরন্তপ,
পরম পুরুষ পরব্রহ্ম অবতার
এস বৈষ্ণবের বিজন বান্ধব।

(৮)

দাসস্য দাস দুরন্ত দুরাচার,
দেহি দেহি দীন জনে দয়াময়,
মন্মথ মোহন শ্রীপদ পল্লবি
যুগল উজ্জ্বল রাস রসাশ্রয়।

পানিপতের যুদ্ধ।

(পণ্ডিত কাশীরাজের গ্রন্থ হইতে)

৩।

গণেশ পণ্ডিত নামে একজন সদাশিবের সংবাদ-লেখক নবাব সুজার শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিল। সামান্য ব্যক্তি বলিয়া সে নবাবের দরবারে যাইতে পাইত না, যে কোন কার্য্য থাকিত, আমার (পণ্ডিত কাশীরাজ) দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। এই ব্যক্তির দ্বারায় ভাও স্বহস্তে আমাকে সর্ব্বদাই পত্র লিখিতেন এবং নবাবসুজা ও প্রধান উজিরের মধ্যস্থতায় সন্ধি স্থাপন করিয়া দিতে নিতান্ত অনুরোধ করিতেন। এক্ষণে তিনি লিখিলেন, যে আপনাকে ও সৈন্যগণকে বাঁচাইতে পারিলে যে কোন সর্ত্তে সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন এবং মধ্যস্থগণের উপর বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবেন। তিনি স্বজাতির প্রথা অনুসারে শর্ত্ত-সূচক এক মুষ্টি জাফ্‌রান এবং একখণ্ড লিখিত সন্ধি পত্র পাঠাইলেন, এবং নবাবসুজার সহিত বন্ধুতা-সূচক বিনিময় জন্য একটি স্বর্ণ খচিত উষ্ণীষও পাঠাইলেন। নবাব সুজাও উপঢৌকন প্রত্যর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে সন্ধি বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

নবাব সুজা এই সন্ধি কার্য্য লইয়া অনেকবার আমাকে প্রধান উজিরের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। উজিরও ভাওয়ের প্রস্তাবে অমত ছিলেন না এবং দুরানী শাহের নিকট কথা উত্থাপন করিলেন। শাহ বলিলেন, "দেখ আমার এ বিষয়ে কিছুই বক্তব্য নাই। আমি কেবল আমার স্বদেশী রোহিলা ও অন্যান্য মুসলমানগণের অনুরোধে তাঁহাদিগকে মহারাষ্ট্রীয় শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছি। যুদ্ধের সমস্ত নায়কতা আমার থাকিবে বটে, কিন্তু সন্ধি করা না করা সম্বন্ধে, হিন্দুস্থানী সর্দ্দারের যে রূপ অভিরুচি হয়, করিতে পারেন, আমার আপত্তি নাই।"

হাফিজ রহমত, দুন্দী খাঁ বঙ্গশ প্রভৃতি সকলেই সন্ধি স্থাপনের অভিলাস প্রকাশ করিলেন, কিন্তু নজীবুদ্দৌলার অমতে কেহই সন্ধি স্থাপনে অনুমোদন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। নবাব সুজা নজীবকে বুঝাইবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিলেন। আমি গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, এবং সন্ধি স্থাপনে অন্যান্য সর্দ্দারগণের সহিত

এক মত হইবার জন্য নানা তর্ক বিতর্ক করিলাম। নজীব প্রত্যুত্তর করিলেন, "নবাব সুজার পিতাকে আমি সুকবি বলিয়া জানিতাম, তাঁহাকেও ঐ প্রকার মনে করি, কিন্তু তিনি এখনও অপরিণত বয়স্ক, সংসারানভিজ্ঞ, তিনি উপস্থিত বিষয় তলিয়া বুঝিতেছেন না। এ কেবল প্রতারণা মাত্র। যখন বিপক্ষ ক্ষীণ-বল ও পরাজয়োন্মুখ হয়, এমন বিষয়ই নাই যে সে পরিত্যাগ করিতে ইতস্তত করে, এমন শর্তই নাই যাহা করিতে ভয় করে। কিন্তু শর্ত কেবল বাক্য মাত্র, শৃঙ্খল নয়, যে চিরকাল বদ্ধ করিতে পারিবে। শত্রুকে এতদূর বিপদে পাতিত করিয়া যদি এখন পলাইতে অবসর দেও, সে কি প্রথম বল সঞ্চয়ের সুবিধা পাইবা মাত্র, নষ্ট সম্মান ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে যত্নবান হইবে না? এখন সমস্ত দক্ষিণাত্য আমাদের করতলস্থ বলিলেও হয়, এমন সুবিধা সমাগম আর কবে হইবে। একবার চেষ্টা করিয়া এই মহারাষ্ট্ররূপী কণ্টক উচ্ছেদ করা যাউক। নবাব সুজাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলুন, আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করিতেছি।" আমি প্রত্যাগমন করিয়া প্রভুকে সকল কথা জানাইলাম, এবং বলিলাম আপনি নিশ্চয় জানুন নজীব সন্ধি স্থাপনে কখনই সম্মত হইবেন না।

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। নজীব তৎক্ষণাৎ দুরানী শাহের নিকট উপস্থিত হইয়া আমার সহিত কথোপকথন আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বোধ হইতেছে সমস্ত সর্দ্দারগণই মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত সন্ধি-স্থাপনে তৎপর হইয়াছে, কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহা নিতান্ত অযুক্তি। মহারাষ্ট্রীয়েরা উত্তর ভারতের কণ্টক স্বরূপ। যদি তাহারা প্রতিরোধ না করে তো, এই সাম্রাজ্য মহাশয়েরই হস্তগত, যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন। আপনার বিবেচনায় যাহা সিদ্ধ হয় করুন। আমি সৈনিক বৈ নয়, যে পক্ষ জয়ী হউক, তাহারই সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক মিলিত হইতে পারি।" দুরানী শাহ প্রত্যুত্তর করিলেন "তুমি যথার্থই বলিতেছ, আমি তোমার পরামর্শ যুক্তি-সঙ্গত বুঝিতেছি এবং তদ্বিপরীত কোন কথা শুনিব না। নবাব সুজা বালক ও অনভিজ্ঞ। মহারাষ্ট্রীয়েরা চতুর, তাহাদের মিথ্যা অনুতাপের উপর কিছুতেই নির্ভর করা যায় না। প্রথম হইতে আমি এ বিষয়ের ভার তোমার উপর রাখিয়াছি।

তোমার যেমন সদ্বিবেচনা হয় কর। আমার যে রূপ পদ, তাহাতে আমাকে সকলকার কথাই শুনিতে হইবে, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শের বিপরীতে কোন কার্য্য করিব না।"

পরদিন নজীব নবাব সুজার শিবিরে আসিলে, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পরামর্শ হইল, কিন্তু কিছু স্থির হইল না। এ দিকে সদাশিবের শিবিরে এরূপ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল, যে সৈনিকেরা শস্যের জন্য পানিপত নগর লুণ্ঠন করিল, কিন্তু যাহা প্রাপ্ত হইল, তাহাতে এতাদৃশ বহু সংখ্যক লোকের কি হইবে? অবশেষে মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারেরা ও সৈনিকেরা মিলিত হইয়া সদাশিবের শিবির বেষ্টন করিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আমাদিগকে আর কষ্টে ধ্বংশ হইতে দিবেন না, একবার সাধ্য মত বিপক্ষ-গণকে আক্রমণ করিতে অনুমতি দিউন, পরে ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবে।" ভাও প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভাল তাহাই হউক, তোমরা যেরূপ করিতে সংকল্প কর, আমি তাহাতেই সম্মত আছি।" অবশেষে স্থিরীকৃত হইল, যে প্রত্যূষে পরিখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাত্রা করিয়া সম্মুখে তোপ সংরক্ষণ পূর্ব্বক বিপক্ষকে আক্রমণ করা যাইবে। সকলেই প্রাণ পণে যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল, এবং প্রতিজ্ঞা দৃঢ়ীকৃত করিবার মানসে স্বদেশাচারানুযায়িক পরস্পরে তাম্বুল বিনিময় করিল।

ঐ ঘোর বিপদ কালে ভাও স্বহস্তে এক খানি পত্র লিখিয়া একজন নিতান্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যের দ্বারা আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই "পাত্র পূর্ণ হইয়াছে, আর এক বিন্দুরও স্থান নাই। যদি কিছু করিতে পারেন তো, এই বেলা করুন, না হয় স্পষ্ট জবাব দিউন। ইহার পর আর লিখিবার বা জানিবার অবসর থাকিবে না।" রাত্রি ৩ টার সময় পত্র পৌঁছিল। আমি নবাব সুজার নিকট উপস্থিত ছিলাম, পত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইলাম। পত্র বাহককে জিজ্ঞাসা করায় সে মহারাষ্ট্র শিবিরে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, বিস্তারিত নিবেদন করিল। এমন সময়ে নবাবের হরকরা আসিয়া সংবাদ দিল যে মহারাষ্ট্রীয়েরা তোপ সম্মুখে রাখিয়া শিবির ত্যাগ করিয়া ধাবমান হইতেছে। শুনিবা মাত্র নবাব ভুবানী শাহের শিবিরে উপস্থিত হইয়া প্রহরী খোজাগণকে বলিলেন, শীঘ্র শাহকে জাগরিত কর, নিতান্ত আবশ্যকীয় কার্য্য আছে। শাহ তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া

সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন। নবাব উত্তর করিলেন, "মহাশয় এখন বিস্তারিত নিবে-
। করিবার সময় নাই, শীঘ্র অশ্বারোহণ করিয়া সৈন্য গণকে সশস্ত্র সজ্জী-
ত হইতে আদেশ করুন।" শিবির দ্বারে অনুক্ষণ অনেক গুলি অশ্ব সজ্জীভূত
কর্ত। শাহ একটার উপর আরোহণ করিয়া সৈন্যগণকে সশস্ত্র সজ্জীভূত
তে আদেশ করিতে করিতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ অগ্রসর হইলেন। শাহ
বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সংবাদ কোথায় পাইলে; নবাব আমার নাম
য় শাহ তৎক্ষণাৎ একটা উট পাঠাইয়া আমাকে লইয়া গেলেন। আমি
াম করিলে শাহ বিস্তারিত বিবরণ নিবেদন করিতে অনুমতি করিলেন।
বলিলাম মহারাষ্ট্রীয়েরা শিবির পরিত্যাগ করিয়া ধাবমান হইয়াছে,
লোক হইবা মাত্র আক্রমণ করিবে। ঠিক সেই সময়ে কয়েকজন
রানী অশ্বারোহী সৈনিক সেই খান দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তাহাদের অশ্বে-
ন দ্রব্য ছিল, জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে মহারাষ্ট্রীয়েরা পলায়ন
রিতেছে, তাহাদের শিবির লুণ্ঠন করিয়া ঐ দ্রব্য সকল তাহারা হস্তগত
রিয়াছে। শাহ আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন এ কি? আমি বলিলাম
শয় অল্পক্ষণ পরেই আমরা কথার সত্যাসত্য প্রমাণীকৃত হইবে। আমার
শেষ না হইতেই, মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রায় দেড় ক্রোশ অগ্রসর হইয়া
াসিয়া তোপ গুলিকে এক সারি করিয়া একেবারে গোলা চালাইতে আরম্ভ
রিল। দুরানী শাহ অশ্বোপরি বসিয়াই পারস্য ফুলিয়া হুকায় তামাকু
াইতেছিলেন, তোপের শব্দ শুনিয়া নবাবকে বলিলেন "হাঁ দেখিতেছি তোমার
সত্যই বলিয়াছে।" তিনি তৎক্ষণাৎ উজির এবং সর্দারগণকে ডাকাইয়া
নম্নোক্ত প্রকার সেনা সন্নিবেশ করিতে আদেশ করিলেন যথা—শাহ পছন্দ
। স্বসৈন্যে নজীবুদ্দৌলার বাম পার্শ্বে অবস্থিত হইল, উজীর স্বসৈন্যে সর্ব্ব
ধ্য অবস্থিত হইলেন, বর খোরদার খাঁ অন্যান্য সর্দার গণ সহিত স্বসৈন্যে
ফিজ রহমত খাঁর দক্ষিণ ভাগে রহিলেন; আহমদ খাঁ বঙ্গশ সকলের
ক্ষিণে রহিলেন। সেনা সন্নিবেশ হইলে রণবাদ্য বাদিত হইতে আদিষ্ট হইল।

ক্রমে বস্তু-নির্দ্দেশ-সম্ভব আলোক হইলে দেখা গেল মহারাষ্ট্রীয়েরা পতাকা
কল তোপ সম্মুখে রাখিয়া ধীরে ধীরে নিয়মিত রূপে অগ্রসর হইতেছে।
রাণী শাহ সৈন্য শ্রেণীর সম্মুখ দিয়া গমন করিয়া সমস্ত সেনা নিবেশ স্বচক্ষে
র্য্যবেক্ষণ করিলেন তৎপরে পূর্ব্ব কথিত ক্ষুদ্র শিবিরের সম্মুখে আপন অবস্থান

নির্দ্ধারণ করিলেন। এক্ষণে ঐ ক্ষুদ্র শিবির মুসলমান সৈন্যে শ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। এই স্থানে থাকিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিতে আদেশ করিলেন।

মহারাষ্ট্রী সেনা পূর্ব্ব মুখে ধাবিত। তাহাদের শ্রেণী নিম্নোক্তপ্রকারে সন্নিবেশিত ছিল। যথা সকলের বামভাগে ইব্রাহিম খাঁ গার্দি—তাহার পর ক্রমান্বয়ে আম্বাজী গইকুয়াড়, সুদেব পাটেল, সদাশিব স্বয়ং বিশ্বাস রাওয়ের সহিত, যশবন্তরাও পুয়ার, শমশের বাহাদুর, মলহর রাও, জওজী সিন্ধিয়া ইত্যাদি। সমস্ত তোপ সুতর নল প্রভৃতি সেনা শ্রেণীর সম্মুখে অবস্থিত ছিল।

মুসলমান সৈন্য পশ্চিম মুখে অবস্থিত। বাম দিক হইতে গণনা করিয়া দেখিলে নিম্নোক্ত প্রকারে সন্নিবেশিত, যথা—ক্রমান্বয়ে শাহ পছন্দ খাঁ, নজীবুদ্দৌলা, সুজাউদ্দৌলা, উজীর সাবুদ্দী খাঁ, আহম্মদ খাঁ বঙ্গশ, হাফিজ রহমত খাঁ, দুন্দী খাঁ, আমীর বেগ খাঁ, পারস্য ও মোগল সর্দ্দার গণ, বরখোদার খাঁ। ইঁহাদেরও সম্মুখে সমস্ত তোপ এবং রকেট। উষ্ট্রারোহী জম্বুরকধারীগণ এবং পারস্য দেশীয়বন্দুক ধারীগণ তোপের পশ্চাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

উভয় পক্ষীয় সৈন্য শ্রেণী বক্র ভাবে অবস্থিত হওয়ায় বর খোরদার খাঁ, আমীর বেগ এবং দুন্দী খাঁ, এই তিন জন অপর পক্ষীয় ইব্রাহিম খাঁ গার্দীর সন্নিকট হইয়াছিল। নিম্ন লিখিত চিত্রে উভয় পক্ষীয় সেনা সন্নিবেশ স্পষ্ট বিদিত হইবে।

৯ শাহপছন্দ খাঁ
৮ নজীব
৭ নবাব সুজা
উজীর ৬
বঙ্গশ ৫
রহমত ৪
৩ দুন্দী খাঁ
২ আমীর বেগ
১ বরখোরদার খাঁ

৮ জওজী সিন্ধিয়া
৭ মলহর রাও
৬ শমশের বাহাদুর
৫ যশবন্ত রাও
৪ সদাশিব ও বিশ্বাস রাও
৩ সুদেব পাটেল
২ আম্বাজী গৈকুয়াড
১ ইব্রাহিম খাঁ গাদী

১৭৬১ শালের ৭ ই জানুয়ারি সূর্য্যোদয় কাল হইতে বন্দুক, তোপ, বোম প্রভৃতি অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল, কিন্তু মুসলমান সৈন্যের অধিক ক্ষতি হইল না। কারণ উভয় পক্ষই পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে ছিল, এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের বৃহৎ তোপ সকলের সহজে মুখ পরিবর্ত্তন করিতে না পারায়, তৎবর্ষিত গোলা মুসলমান সৈন্যের উপর দিয়া চলিয়া প্রায় এক ক্রোশ পশ্চাতে পড়িতে লাগিল। এদিকে উজীরের রেজিমেণ্ট ভিন্ন অন্য মুসলমান সেনা বিভাগ হইতে তোপ অত্যল্প মাত্র চলিতে ছিল।

উভয় পক্ষীর সেনা ক্রমে অধিক নিকট বর্ত্তী হইতেছে, ইতি মধ্যে ইব্রাহিম খাঁ গাদী অশ্ব পৃষ্ঠে ভাওয়ের নিকস্থ হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক বলিতে লাগিল 'মহাশয় রীতিমত বেতন প্রদানের জন্য অনুরোধ করায় আপনি আমার প্রতি অনেক দিন হইতে অসন্তুষ্ট আছেন। এমাসে আপনার ধন লুণ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া আমরা এক পয়সাও বেতন পাই নাই। সে কথা এখন যাউক। অদ্য আমি আপনাকে দেখাইব যে আমরা অনুপযুক্ত হইয়া এত-দিন বেতন গ্রহণ করি নাই।' এই বলিয়া তিনি অশ্ব সঞ্চালনে আপন সেনাংশে উপস্থিত হইয়া পতাকা অগ্রসর করিতে আদেশ করিলেন। এবং বরখোরদার খাঁ ও আমীর খাঁ তাঁহার পার্শ্বাক্রমণ করিতে না পারে, এজন্য দুই ব্যাটেলিয়ান সৈন্য রাখিয়া স্বহস্তে একটা নিশান লইয়া অবশিষ্ট ৭ ব্যাটেলিয়ান সমভিব্যাহারে বন্দুকের উপর ব্যায়োনেট চড়াইয় হাফিজ রহমত ও দুঁদি খাঁর সেনা বিভাগ ঘোরতর রূপে আক্রমণ করিলেন। রোহিলারা প্রভূত সাহস সহকারে ঐ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিল, উভয় পক্ষের হাতা হাতী কাটা কাটী হইতে লাগিল। প্রায় ৮ হাজার রোহিলা এই আক্রমণে হত ও আহত হইল এবং তাহাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিল যে প্রথম আক্রমণের পর উহাদের সেনাপতি গণের নিকট ৬ শত বা এক সহস্রাধিক সেনা তিষ্ঠিতে পারিল না। হাফিজ রহমত খাঁ পীড়িত হইয়া পালকিতে ছিলেন, বেগতিক দেখিয়া বাহকগণকে পালকি দুঁদি খাঁর নিকট লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন, যে তৎসমীপে প্রাণত্যাগ করিবেন। এদিকে দুঁদি খাঁও হাফিজ রহমত খাঁর অনুসন্ধান করিতেছিল। বস্তুত এত বিশৃঙ্খল গোলমাল হইয়া ছিল, যে কে কোথায় কিছুই ঠিক ছিল না। তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া ঐ যুদ্ধ হয়। ইব্রাহিম খাঁর ৬ টা ব্যাটেলিয়ান উচ্ছন্ন প্রায়

হইল আর সে স্বয়ং শরীরের নানা স্থানে বরষার শূলে আহত ও একস্থানে বন্দুকের গুলিতে বিদ্ধ হইয়া ছিল। তাঁহার অবশিষ্ট দুই ব্যাটেলিয়ান, যাহারা পার্শ্ব রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল, তুমুল যুদ্ধ করিয়া ভবানী সেনার বারংবার গতি রোধ করিয়া ছিল। আম্বাজী ইংকোয়াড ইব্রাহিমের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ছিলেন। তাহারও সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া ছিল।

মধ্য ভাগে, সদাশিব এবং বিশ্বাস রাও নিজ পায়গা সৈন্য লইয়া প্রধান উজিরের সেনা বিভাগ আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা ১০ হাজার মুসলমান অশ্বারোহী, ৭ হাজার পারস্য বন্দুকী এবং ১ হাজার জম্বুর্ক বাহী উষ্ট্র ভেদ করিয়া চলিয়া গেল এবং তিন হাজারেরও অধিক শত্রু হত ও আহত করিল। উজীরের ভাতুষ্পুত্র আতাই খাঁ, যে গোবিন্দ পণ্ডিতকে জয় করিয়া অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়াছিল, এই আক্রমণে প্রাণ হারাইল। উজীরের সেনা পলায়নোন্মুখ হইল, কিন্তু উজির স্বয়ং ৩ বা ৪ হাজার অশ্বারোহী এবং ৬৫টি জম্বুক লইয়া—স্থির পদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্ব শরীরে কবচাচ্ছাদন করিয়া পদাতী বেশে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ইহার পরেই নবাব সুজার সেনা বিভাগ। ধূলি রাশিতে চারিদিগ অন্ধকার হওয়ায় কোথায় কি হইতেছে তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না। হঠাৎ ঐ দিকে মনুষ্য কোলাহল ও অশ্বের হ্রেষা হইল শুনিয়া, কারণ অবধারণ জন্য আমাকে পাঠাইলেন। আমি দেখিলাম, উজিরের সৈনিকগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইতেছে, দেখিয়া রাগ ও দুঃখে অধীর হইয়া তিনি গালাগালি দিতেছেন আর বলিতেছেন, "ভাইগণ আমাদের দেশ অনেক দূরে অবস্থিত, কোথায় পলাইতেছ?" কিন্তু তাঁহার আদেশ কেহই কর্ণপাত করিতেছে না। আমাকে দেখিয়া বলিলেন 'শীঘ্র পুত্র সুজা উদ্দৌলার নিকট গিয়া বল যে এই মুহূর্ত্তে তিনি আমার সহায়তা না করিলে আমার রক্ষা নাই।' আমি নবাবকে এই সংবাদ জানাইলে, তিনি বলিলেন, যে শত্রু অতি নিকট, আমার সৈন্য আক্রমণ করা বিশেষ সম্ভব, আমি এ সময়ে কোন দিকে সৈন্য চালনা করিলে, শত্রুরা আমাদের ব্যূহ ভেদ করিবে, তাহা হইলে সমস্ত সৈন্যের বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবে।

নবাব সুজার সেনা বিভাগে কেবল মাত্র ২ হাজার অশ্বারোহী ১ হাজার

বন্দুকী, ২০টা তোপ এবং কতকগুলি ছোট কামান ছিল। কিন্তু তাহারা সম্মিলিত হইয়া এমন সাহস-চিহ্ন দেখাইতে লাগিল, যে শত্রুরা উহাদিগকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল না। কএকবার তাহারা নিকটে আসিয়া আক্রমণ করিবার ভাব প্রকাশ করিল, কিন্তু আক্রমণ করিল না।

নবাবের বামভাগে নজীবুদ্দৌলা ৮ হাজার রোহিলা পদাতি এবং ৬ হাজার অশ্বারোহী লইয়া অবস্থান করিতে ছিল। ইহাদের সঙ্গে কতকগুলি বিলদার সৈন্য ছিল। ইহারা বালুকা খনন করিয়া রক্ষা-প্রাচীর নির্ম্মাণ করিত। এইরূপ একটা প্রাচীর প্রস্তুত হইলে সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া তাহার আশ্রয় লইল। ইতিমধ্যে বিলদারেরা বন্দুকের গুলি পৌঁছিবার অর্দ্ধপথ অগ্রসর হইয়া আর একটী প্রাচীর প্রস্তুত করিতে লাগিল। এই প্রকারে এই সেনা-বিভাগ বালুকা-প্রাচীরের আশ্রয়ে ক্রমাগত অল্পে অল্পে প্রায় ক্রোশেক অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল। বিপক্ষ-সেনার গুলি এখানে কদাচিৎ পৌঁছিতে পারিত। নজীব এখন আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "আমাকে এখন প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে হইবে। আজিকার যুদ্ধের ফলাফলে আমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্বার্থযুক্ত, আর সকলে কেবল দর্শক বৈত নয়।" বস্তুতঃ নজীব অসাধারণ কর্ম্মিষ্ঠ ও ক্ষমতাশালী পুরুষ। জঙ্কুজী সিন্ধিয়ার সহিত তাঁহার তুমুল সংগ্রাম বাধিল। উভয়ের মধ্যে বহুকাল হইতে ভয়ানক শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। রোহিলাদের সহিত অনেক রোম হাউই ছিল, তাহারা এককালে দ্বি-সহস্র হাউই ছাড়িতে আরম্ভ করিল। উহাদের ভয়ঙ্কর ধ্বনিতে বিপক্ষের অশ্ব সকল ভীত হইতে লাগিল এবং এতাধিক প্রাণ হানি হইতে লাগিল, যে তাহারা রোহিলাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল না। বিশেষতঃ নজীবের দক্ষিণ পার্শ্বে সাহ পছন্দ খাঁ অবস্থান করিতে ছিল, এবং ঐ সাহসী ও অভিজ্ঞ দুরানী সর্দ্দার এমন কৌশলে অগ্রসর হইতে লাগিল, যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা ইহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিল না।

এই প্রকারে দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত সংগ্রাম চলিতে লাগিল। মুসলমানদের হত ও আহতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছিল বটে, কিন্তু মোটের উপর মহারাষ্ট্রীয়দিগের জয়লাভ বোধ হইতে লাগিল।

প্রায় দ্বি-প্রহরের সময় দুরানী সাহ সংবাদ পাইলেন, যে রোহিলারা এবং উজীরের সেনাবিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ

তিনি নিমকটি * নামক সেনা-পুঞ্জ হইতে দুই হাজার বীরপুরুষকে আহ্বান করিয়া তন্মধ্যে পঞ্চশত বীরকে আদেশ করিলেন, তাহাদের যে সকল পলায়িত সৈন্য শিবিরে আশ্রয় লইয়াছে। সকলকে বলপূর্ব্বক যুদ্ধে পুনঃ প্রেরণ করে, এবং অবশিষ্ট ১৫ শত বীরকে আদেশ করিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া তাহারা পলায়িতগণকে রণে পুনঃ প্রেরণ করে, আর কেহ অস্বীকার করিলে তাহার প্রাণ বধ করে। এই প্রকারে অনেক সেনা সংগ্রহ করিয়া দুরানী সাহ ৪০০০ হাজার লোক দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষার্থ এবং আর দশ হাজার লোক উজীরের সহায়তার জন্য পাঠাইলেন, এবং উজীরকে আদেশ করিলেন যে নিষ্কাসিত তরবারি হস্তে পাশাপাশি করিয়া পূর্ণবেগে বিপক্ষকে আক্রমণ করা হউক। আর সাহ পছন্দ খাঁ ও নজীবুদ্দৌলাকে অনুমতি করিলেন যে, উজীর যতবার আক্রমণ করিবেন, উহারা ততবার বিপক্ষ সেনার পার্শ্ব আক্রমণ করে। বেলা ১টার সময় ঐ সকল সেনা উজীরের নিকট পৌঁছিলে তিনি অশ্বারোহণে সাহের অনুমতি মত যেখানে সদাশিব স্বয়ং সেনাপতিত্ব করিতেছিলেন, সেই সেনাবিভাগ আক্রমণ করিলেন। সাহ পছন্দ খাঁ এবং নজীবুদ্দৌলাও একবারে পার্শ্ব আক্রমণ করিলে ব্যাপার বিষম হইয়া উঠিল। প্রায় ১ ঘণ্টা কাল হাতাহাতী ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল, পরস্পর পরস্পরের প্রতি তরবারি, শূল, টাঙ্গি এবং ছোরা প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে লাগিল। বেলা ২টা এবং ৩টার মধ্যে বিশ্বাস রাও আহত হইয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইলেন, তৎসংবাদ শ্রবণে ভাও তাঁহাকে আপন হস্তীর উপর উঠাইয়া লইতে অনুমতি করিলেন। আরও এক ঘণ্টা কাল সদাশিব অশ্বারোহণে ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু তৎপরে হঠাৎ ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার ন্যায় সমস্ত মহারাষ্ট্র সেনা একবারে পশ্চাৎদিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। যুদ্ধক্ষেত্র তাহাদের মৃত দেহে আবৃত হইয়া গেল। বিজয়ী পক্ষ ভয়ঙ্কররূপে তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল, আত্ম সমর্পণ করিয়াও কেহ নিস্তার পাইল না। চারিদিকে ১০।১২ ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত দুরানীরা পরাজিতগণকে তাড়াইয়া চলিল, কত

* ইহারা এক দল অশ্বারোহী, দুরানী সাহের নিজ আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য নিযুক্ত থাকিত। ইহাদের পরিচ্ছদ ও অস্ত্র বিশেষ প্রকার থাকায় ঐ নামে অভিহিত হইয়াছিল।

লোক প্রাণে মরিল ইয়ত্তা করা দুষ্কর। কথিত আছে, বালক বনিতা সমেত মহারাষ্ট্র শিবিরে যে ৫ লক্ষ লোক ছিল তাহার অধিকাংশই হত বা বন্দি হইয়াছিল। যাহারা পলায়ন দ্বারা মুসলমান হস্তে নিস্তার পাইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ গ্রাম্য কৃষকদিগের হস্তে প্রাণ হারাইল। মহারাষ্ট্র সর্দ্দার অন্তজীমানকেশর অনুচর সহিত পলায়ন করিতেছিলেন, ফরোখ নগরের কৃষকেরা তাহাদের প্রাণ বধ করিল।

মহারাষ্ট্র-শিবির লুণ্ঠন করিয়া যে কত দ্রব্য মিলিল তাহার ইয়ত্তা নাই। এক একজন মুসলমান অশ্বারোহী ৮।১০টা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে মহামূল্য লুণ্ঠিত দ্রব্য বাহির করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। অশ্বগুলাকে মেষপালের ন্যায় তাড়াইয়া লইয়া যাইতে দেখা গেল। বহুসংখ্যক হস্তীও লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রায় ৪০ হাজার লোক বন্দি হইল, ইহাদের মধ্যে ৬।৭ হাজার লোক নবাব সুজার শিবিরে আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। তিনি দুরানীদিগের নিষ্ঠুরাচরণ হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আপন লোক নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। যে সকল দুর্ভাগারা দুরানীদের হস্তে পড়িল তাহাদের প্রায় সকলেই প্রাণ হারাইল। দুরানীরা উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল যে গৃহ হইতে যাত্রা কালে তাহাদের মাতা, পত্নী, ভগ্নীগণ অনুরোধ করিয়াছে যে, শত্রু পরাজয়পূর্ব্বক তাহাদের প্রত্যেকের নামে জনকত পাষণ্ডকে হত্যা করিয়া ঈশ্বর সমীপে তাহাদের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইবে। এই প্রকারে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যু প্রাপ্ত হইল। কেবল দুরানী এবং তাঁহার প্রধান সর্দ্দারদিগের শিবির ভিন্ন আর সকল দুরানী শিবিরের সম্মুখে নরমুণ্ডের স্তূপ দৃষ্ট হইতে হইল।

যুদ্ধ অবসান হইলে, প্রধান সর্দ্দারেরা দুরানী সাহকে মাঙ্গল্য নজর প্রদান করিল। সাহ যুদ্ধক্ষেত্র অল্প মাত্র পরিদর্শন করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রধান প্রধান সর্দ্দারেরাও আপন আপন শিবিরে গেল। অধঃশ্রেণীস্থ সর্দ্দারেরা ও সৈনিক পুরুষেরা স্বেচ্ছামত বিপক্ষের পশ্চাদনুসরণ বা লুণ্ঠন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল।

নিশা শেষে বরখোরদার খাঁর একজন দুরানী সৈনিক মাতঙ্গোপরি বিশ্বাস রাওর মৃত দেহ দেখিতে পাইয়া, হস্তী ও অলঙ্কার অপহরণপূর্ব্বক দেহ মাত্র নবাব সুজা উদ্দৌলার নিকট উপস্থিত করিল। নবাব উহাদের ২ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন এবং মৃত দেহ যত্নের সহিত রাখিতে আজ্ঞা

করিলেন। সুজাফুলি নামে নবাবের একজন অনুচর ইব্রাহীম খাঁ গার্দীকে জীবিত বন্দি করিয়াছিল। ইব্রাহীমের সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত। নবাব শুনিয়া তাহাকে সযত্নে ও গোপনে রাখিতে এবং তাহার ক্ষত স্থানে ঔষধি লেপন করিতে অনুমতি করিলেন।

পর দিন দুরানী সাহেব অনুমতিক্রমে বিশ্বাস রাওয়ের দেহ তৎ শিবিরে নীত হইল। সেখানকার বড় ছোট সকলেই দেখিবার জন্য উপস্থিত। মৃত পুরুষের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল। মৃত্যুতে উঁহার মুখশ্রীর কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, যেন সুপ্তাবস্থা বোধ হইতে লাগিল। উঁহার ঘাড়ে এক তরবারির আঘাত এবং বাম চক্ষের উপর এক অত্যল্প মাত্র তীরের আঘাত ছিল এবং অবশিষ্ট অঙ্গ-বস্ত্রের উপর শোণিতের দাগ মাত্রও ছিল না। ঐ দেহ দেখিয়া দুরানীরা একত্র হইয়া এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল, যে "ঐটা পাষণ্ডাধিপতির দেহ, আমরা উহাকে শুষ্ক করিয়া তৃণ ভরিয়া কাবুলে লইয়া যাইব।" এ কারণ এই দেহ বরখোরদার খাঁর শিবিরে মতিলাল নামক তাঁহার ক্ষত্রিয়জাতীয় দেওয়ানের তাঁবুর নিকট রক্ষিত হইল।

নবাব সুজাউদ্দৌলা এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উজিরকে সঙ্গে করিয়া শাহের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "মহাশয়, বিপক্ষের জীবনাবধি তাহার সহিত শত্রুতা। হিন্দুস্থানের ব্যবহার এই, যে জয়লাভের পর সর্দ্দারগণের মৃত দেহ—তাহাদের জাতী ও ধর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, আপন আপন ধর্ম্মবিধি অনুসারে সৎকৃত হইবার জন্য স্বানুচরের হস্তে অর্পিত হইয়া থাকে। এরূপ আচরণে জয়ীদিগের যশ লাভ হয়, বিপরীত আচরণে মহতী নিন্দা। আপনি এদেশে অল্প দিন মাত্র আছেন, কিন্তু আমি এবং অন্যান্য হিন্দুস্থানী সর্দ্দারেরা এদেশের স্থায়ী অধিবাসী, ভবিষ্যতেও আমাদের মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, এখন অন্যায় আচরণ করিলে সে কথা চিরকাল মনে জাগরূক থাকিবে। অতএব আমাদিগের অনুরোধ, যে, মৃত দেহ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রত্যার্পণ করা যাউক, তাহারা দেশানুযায়ী সৎকার করুক।" নজীবুদ্দৌলা প্রভৃতি সমস্ত হিন্দুস্থানী সর্দ্দারেরাও ঐ প্রকার অনুরোধ করিতে লাগিল। প্রায় দুই দিন এই কথার আন্দোলন চলিতে লাগিল। এই কার্য্যোপলক্ষে নজীরের উকিল মেঘরাজের সহিত আমাকে বরখোরদার খাঁর এবং মতিলালের তাঁবুতে যাইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় বার

আমি একাকী গেলাম। মতিলাল আমাকে জিজ্ঞাসা করিল 'আপনি কি কেবল ঐ মৃত দেহ লইতে আসিয়াছেন না আরও কিছু কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন।" আমি বলিলাম "যাহাকিছু করিতে হয় বলুন, আমি প্রস্তুত।" মতিলাল আমাকে দুইটি গুপ্ত তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। একটার মধ্যে ভাউয়ের উকিল রাজা বাবু পণ্ডিতকে আহত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। তাহার সহিত অল্পক্ষণ কথা বার্ত্তার পর দ্বিতীয় গুপ্ত তাঁবুর মধ্যে গিয়া দেখি, জঙ্কুজী সিন্ধিয়া বসিয়া আছে। তাহার বয়ক্রম ২০ বৎসর মাত্র, বাহুতে বন্দুক ও শূলের আঘাত লাগাতে উহা ফিলা বদ্ধ রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া মস্তক হেট করিয়া রহিল। আমি তদ্দৃষ্টে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, 'মহাশয় আপনি লজ্জিত হইতেছেন কেন, মনুষ্যের চেষ্টা ও সাহসে যতদূর সম্ভব, আপনি সমস্তই করিয়াছেন, এবং আপনার এই দিনের বীরত্ব মনুষ্য মাত্রের স্মৃতি পথে বিদ্যমান থাকিবে।" তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন। "সত্য বটে, ভাগ্যের সহিত বিবাদ করিতে কেহই সমর্থ নহে। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার মৃত্যু শ্রেয়ঃ ছিল, কিন্তু অদৃষ্ট বশত এখানে আনীত হইয়াছি। এই লোকেরা আমার নিকট মুক্তি মুল্য চাহিতেছে উহাদের প্রার্থিত অর্থ প্রদান করাও আমার পক্ষে দুষ্কর নহে: কিন্তু এই স্থানে এই সময়ে উহা সংগ্রহ নিতান্ত অসম্ভব। আপনি আমার পিতার বন্ধু ছিলেন, এবং নবাব সুজার পরিবারবর্গের সহিত আমার পরিবারেরও চিরকাল বন্ধুতা ছিল, আমার পিতা তাহাদের অনেক উপকারও করিয়াছিলেন। যদি নবাব বাহাদুর আমার মুক্তির জন্য আপাততঃ অর্থ প্রদান করেন তাহা হইলে ঐ উপকার আমি কখন ভুলিব না।" আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম যে নবাব কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না এবং কত টাকা দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলাম। মতিলাল বলিল যে ৭ লক্ষ টাকার দাবি হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় কিছু কমে মিটিতে পারে। আমি প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম নজীবুদ্দৌলা নবাবের সহিত উপবিষ্ট আছে। যে কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলাম তাহার সমুদয় নবাবকে নিবেদন করিলাম। কিন্তু জানিতাম যে নজীবের সহিত জঙ্কুজীর ও তৎপরিবারের চিরশত্রুতা আছে, পাছে নজীব জানিতে পারে যে জঙ্কুজী জীবিত ধৃত হইয়াছে, একারণ সে কথার কোন উল্লেখ না করিয়া শিবিরান্তরে প্রস্থান করিলাম। আমার মুখ দেখিয়া নজীবের সন্দেহ হইল।

সে নবাবকে বলিল, মহাশয় কাশিবাজের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে তাহার আরও কিছু বলিবার আছে, আমার সম্মুখে বলিতে পারিতেছে না। নবাব সুজা বলিলেন, যে তদুভয়ের মধ্যে গোপন কিছুই নাই এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে ডাকাইয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিতে আদেশ করিলেন এবং গঙ্গার নামে শপথ করাইলেন, যে নজীব উপস্থিত আছে বলিয়া কোন কথা গোপন করিব না। কাজেই আমাকে সমস্ত কথা বলিতে হইল। নজীব আত্মগোপনে বিশেষ সমর্থ ছিল, বলিল যে শত্রুকে এরূপ অবস্থায় উদ্ধার করা মহাপুরুষের নিতান্ত কর্ত্তব্য ও উপযোগী বটে, আরও বলিল, মহাশয় জঙ্গু-জীর মুক্তি মূল্য নির্দ্ধারণ করুন আমি তাহার অর্দ্ধেক নিজ হইতে দিব। বাহিরে এইরূপ ব্যক্ত করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নজীব প্রধান উজীরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় কথা বলিল।

যেমন নজীব সিন্ধিয়ার বংশ উন্মূলনে কৃতসংকল্প, তেমনি ওদিকে উজীর বল্লি খাঁরও বরখোরদার খাঁর সহিত মহতী শত্রুতা ছিল। উজীর এই গোপনীয় কার্য্যে লিপ্ত থাকার ব্যপদেশে বরখোরদার খাঁর অনিষ্ট সাধনের সুবিধা পাইলেন। উভয়ে মিলিয়া তৎক্ষণাৎ দুরানী সাহের নিকট গিয়া সব কথা জানাইলেন। সাহ, বরখোরদার খাঁকে ডাকাইয়া জঙ্গুজীকে গোপন রাখার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বরখোরদার "কিছুই জানি না" বলিয়া একবারে অস্বীকার করিল, উজীর বল্লি খাঁ কথা প্রমাণ করাইবার জন্য আমাকে ডাকাইলেন, কিন্তু বরখোরদার খাঁ তখনও অস্বীকার করিতে লাগিল। অতএব দুরানী সাহ নিমকটী সেনাকে উক্ত সরদারের শিবিরে খানাতল্লাসী করিতে আদেশ করিলেন। অন্য উপায় না দেখিয়া বরখোরদার খাঁ তৎক্ষণাৎ স্বানুচর-গণকে গোপনে সাহের সেনা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্র বন্দিদ্বয়কে বধ করিয়া দেহ প্রোথিত করিবার অনুমতি পাঠাইল। দুর্ভাগ্যদ্বয়ের প্রাণ এইরূপে বিনষ্ট হইল।

ইব্রাহীম খাঁ গাদী নবাবসুজার শিবিরে বন্দি ছিল, নবাব তাহাকে গোপনে লক্ষণে প্রেরণ করিবার মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু দুরানী সাহের অনুচরেরা অবগত হইয়া সংবাদ করিলে, সাহ নবাবকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি প্রথমতঃ অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে সাহের অনুরোধ ও খোসামুদী এড়াইতে না পারিয়া স্বীকার করিলেন। বোধ হয় পূর্ব্বেই ষড়যন্ত্র

ছিল, কথা স্বীকার করিবা মাত্র বহুসংখ্যক দুরানী সেনা নবাবের শিবির বেষ্টন পূর্ব্বক এই বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল "ইব্রাহীম খাঁ আমাদের পরম শত্রু, আমাদের জাতীয় বহুলোক হত্যা করিয়াছে, উহাকে আমাদের হস্তে অর্পণ করা হউক, নতুবা কে উহার অভয় দাতা দেখাইয়া দেও, আমরা তাহাকে আক্রমণ করিব।" নবাব সুজাউদ্দৌলা পার্শ্বস্থিত তরবারিতে হস্ত ক্ষেপণ করিয়া বলিলেন "এই আমি, এখানে উপস্থিত আছি।" ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া উজীর বল্লি খাঁ নবাবকে জনান্তিকে এই বলিয়া বুঝাইলেন, যে ইব্রাহীমকে ১ সপ্তাহের জন্য তাহার উজীরের নিকট রাখা হউক, তৎপরে তাহাকে নিরাপদে প্রত্যর্পণ করিবার অঙ্গীকার করিলেন। নবাব প্রতারণা সন্দেহ করিয়া প্রথমতঃ এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই, কিন্তু বল্লি খাঁ কোরাণের শপথ পূর্ব্বক বলিল, যে ইব্রাহীমের কোন বিপদ হইবে না। সুতরাং নবাব ইব্রাহীমকে আনাইয়া উজীরের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

আহম্মদ সাহ ইব্রাহীমকে আনাইয়া অপমান-সূচক বাক্যে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার মত সাহসী বীরের একি দশা ঘটিয়াছে?" ইব্রাহীম প্রত্যুত্তর করিল, 'মহাশয়, অদৃষ্টের উপর কাহারও হাত নাই, আমার প্রভু হত হইয়াছেন, 'এবং আমিও আহত ও বন্দি, যদি বাঁচিয়া উঠি, আর আপনার সরকারে ভৃত্য নিযুক্ত করেন তো সদাশিবের জন্য যে প্রকার উৎসাহ দেখাইয়াছি, আপনার জন্যও সেইরূপ দেখাইব।" সাহ উহাকে বল্লি খাঁর তত্ত্বাবধারণে থাকিতে অনুমতি করিলেন।

ইব্রাহিমের উপর ভয়ানক নিষ্ঠুর ব্যবহার হইতে লাগিল। অবশেষে দুরানীরা তাহার আহত স্থানে বিষ প্রয়োগ করায় সপ্তম দিনে তাহার মৃত্যু হইল।

যুদ্ধের পরদিন, আহম্মদ সাহ মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক অশ্বারোহণে রণভূমি পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। ক্রমে মৃতদেহের ৩২টা স্তূপ দেখিলেন; হতভাগারা পরস্পরের নিকট থাকিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন মহারাষ্ট্র পরিখা এবং পানিপতের চতুষ্পার্শ্বস্থ জঙ্গলাবৃত ভূমি মৃতদেহে পরিপূর্ণ। সাহ পানিপত নগরে প্রবেশ করিলেন এবং বু-আলি কলন্দরের (ফকীর) দরগাছ দেখিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

নবাব সুজাউদ্দৌলা শতাধিক পাণিবাহক ভিস্তি সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে

মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিগণের বিশেষতঃ সদাশিব রাও ভাওয়েব মৃতদেহ অন্বেষণ করিবার জন্য অনেকানেক দেহ ধৌত করাইলেন। তাঁহাকে এই কার্য্যে সহায়তা করিবার মানসে তিনি সেনাধর পণ্ডিত ও গণেশ পণ্ডিত নামক মহারাষ্ট্রীয় উকিলদ্বয় এবং আর কএক জন মহারাষ্ট্রীয় বন্দিকে (ইহারা প্রায় সকল মহারাষ্ট্রীয় প্রধান পুরুষদিগকে চিনিত) সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহারা যশবন্তরাও পোবার, পাল যদুব পুত্র, এবং অন্যান্য ব্যক্তির মৃত দেহ পাইল।

পরদিন ভাওয়েব দেহ পুঙ্খানুরূপে অন্বেষণের জন্য অনুমতি হইলে, সংবাদ আসিল, যে ১৫ ক্রোশ দূরে একটা কবন্ধ পাওয়া গিয়াছে, উহাকে ভাওয়েব দেহেব ন্যায় বোধ হইতেছে। নবাব সুজা তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়া শব ধৌত করাইলেন। ঐ শবেব নিকট তিন চারি শত টাকা মূল্যের কএকটা উৎকৃষ্ট মুক্তা পতিত থাকায় উহা যে কোন প্রধান পুরুষেব দেহ তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। সেনাধর পণ্ডিত এবং মহারাষ্ট্রীয় বন্দিগণ ঐ মুক্তা দেখিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে বলিল, ঐ দেহসদাশিবেরই বটে। অধিকন্তু তাহারা জানিত সদাশিবের শরীরে কয়েকটী চিহ্ন ছিল; ঐ শবদেহেও সেইচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা (১) তাহার উরু দেশে মুদ্রার পরিমাণ একটা ক্ষত চিহ্ন (২) পৃষ্টে এক কুঠারাঘাত চিহ্ন—ইহা সদাশিব মজাফর খাঁর হস্ত হইতে পাইয়া ছিলেন, (৩) পদমূলে সৌভাগ্য ব্যঞ্জক পদ্ম মুখ চিহ্ন। সকলে জ্ঞাত ছিল না যে সদাশিব প্রত্যহ সূর্য্য সমীপে ১২০০ বারশত বার প্রণাম করিতেন, তজ্জনিত চিহ্নও ঐ শব দেহের হস্তে ও জানুদেশে লক্ষিত হইতে ছিল। হত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৩৫।৩৬ বৎসর। একজন দুরানী কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া হাস্য করিতে ছিল, আমি দেখিয়া নবাবকে নিবেদন করিলাম যে বোধ হয় ঐ ব্যক্তি এই মৃত দেহ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাত থাকিতে পারে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে এইরূপ বলিল " আমি যুদ্ধকালে অনেকবার এই ব্যক্তিকে দেখিয়াছি ; ইনি অত্যুত্তম অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে দুইটা অশ্ব তাহার নিম্নে হত হইয়াছে, অবশেষে অনেকগুলি আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় ইনি তৃতীয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ সময়েই মহারাষ্ট্র সেনা চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল, কিন্তু তখনও এইব্যক্তির মনঃচ্যুতি ঘটে নাই। ইহার পরিচ্ছদ উত্তম ছিল। তাহাতে হীরক জড়িত ছিল।

ইনি একটা ছোট শূল হস্তে ক্রমে পাছু হটিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও মুখে সাহসের লক্ষণ বিদ্যমান। আমরা কএকজন অলঙ্কারলোভে ইহাকে অনুসরণ করিলাম, পরে বেষ্টন করিয়া জিজ্ঞাসিলাম "তুমি কে? কোন প্রধান সর্দ্দার বা স্বয়ং ভাউ? আরও বলিলাম, তোমার ভয় নাই, তোমাকে মারিব না, যেখানে বল, সেইখানে লইয়া যাইব। এ ব্যক্তি কোন প্রত্যুত্তর না করায় আমার এক জন সঙ্গী ক্রোধান্ধ হইয়া ইহাকে শূলে বিদ্ধ করিল, এ ব্যক্তিও তাহার প্রতি শূল নিক্ষেপ করিল, সুতরাং আমরা ইহার মস্তক ছেদন করিলাম। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে এ আমাদের দুই তিন জনকে আহত করিয়াছে। ইহার মণ্ড আর এক জনের নিকট আছে।" এই শেষ কথা সত্য নহে, কারণ ইহারই নিকট হইতে পরে মুণ্ড বাহির হইয়াছিল।

বাল্য-বিবাহ।

বিজয় ও বসন্তের কথোপকথন।

বিজয়।—দেখ বসন্ত, বাল্য-বিবাহ-প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত থাকাতে যে আমাদের কত দূর পর্য্যন্ত অনিষ্ট সাধন হইতেছে তাহা বলা যায় না। এই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছি। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ হইলে, বালকদের মন নারী-প্রেমের দিকে প্রধাবিত হয়। তাহারা নানা প্রকার সুখের আস্বাদন পায়, বিলাসিতা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে, কত প্রকার শকের লহরী তাহাদের মনোমধ্যে খেলিতে থাকে। এই সমুদায় পূর্ণ করিবার জন্যই তাহারা ব্যতিব্যস্ত হয়, লেখা পড়ার দিকে আর তাহাদের মন থাকে না। বিশেষতঃ অল্প বয়সে স্ত্রী-সম্ভোগ করিলে শরীর দুর্ব্বল ও মস্তিক তেজোহীন হইয়া পড়ে। কেহ কেহ বলেন, কি স্ত্রী কি পুরুষ যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলেই তাহাদিগকে বৈবাহিক সূত্রে বন্ধন করা উচিত। স্বভাবই বিবাহের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। খোদার উপর আবার খোদকারী কেন? কিন্তু এই যুক্তিটী সমীচীন নহে। প্রকৃতির নিকট হইতে আমরা সকল বিষয়ে উপদেশ লইতে পারি না। পশু, পক্ষী যেরূপ কার্য্য করে, জ্ঞান-সম্পন্ন মনুষ্য কি তাহার অনুকরণ করিতে পারে? পৃথিবীর অসভ্য লোকদিগের মধ্যে কোন কোন পাশব বৃত্তি দেখা গিয়া থাকে এবং প্রাচীন ইতিহাস পাঠেও

আমরা অবগত হই যে, আদিম মনুষ্যগণ প্রথমে পশুদের মত ব্যবহার করিত। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, মনুষ্য যত সভ্য ও উন্নত হইতে থাকে তত পাশব আচরণ সকল একে একে পরিত্যাগ করে। এইরূপে স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলনে অনেক উন্নত ভাব লক্ষিত হইতেছে। সে দিন নব্য-ভারতে একটী উপযোগী দৃষ্টান্ত দেখিলাম। দৃষ্টান্তটি এই ঃ—কঠিন সামগ্রী চিবাইবার জন্য আমরা দন্ত পাইয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া দন্ত উঠিতে উঠিতে শিশুকে কঠিন জিনিষ খাইতে দেওয়া কি উচিত? বরং ইহাই কি বিহিত নহে যে, যতদিন শিশুর দন্ত কোমল থাকে ততদিন যাহাতে সে কোন কঠিন দ্রব্য ব্যবহার করিতে না পারে তৎপক্ষে যত্নবান হইতে হইবে? সেইরূপ, কি স্ত্রী কি পুরুষ, যৌবনের প্রারম্ভেই তাহাদিগকে বৈবাহিক সূত্রে বন্ধন করা উচিত নহে। এ মিলন হইতে মন্দ ফলই ফলিয়া থাকে—যুবক ও যুবতী তেজোহীন হইয়া পড়ে এবং তাহাদের যে সন্তান জন্মে তাহা অপরিণত ও বীর্য্যহীন হয়।

বসন্ত।—ভাই বিজয়। তুমি যাহা বলিলে তাহা যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় বটে। তোমার কথায় অনেক সার আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল দিক না দেখিয়া কোন বিষয় স্থির করা উচিত নহে। তুমি বলিলে যে আমাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকাতে আমরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু এ নালিশ আজ কালই শুনা যাইতেছে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে ত ইহা শুনা যায় নাই। সে সময়ের স্ত্রী-পুরুষগণ বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ছিল। কিন্তু তখনও বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল। আমার বিবেচনায় বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীই সমধিক অনিষ্টের কারণ। বালকগণ অসময়ে আহার করিয়া বিদ্যালয়ে গমন করে, পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করে, এই জন্যই আমাদের বালকগণ তেজোহীন হইয়া পড়ে। ইহার উপর বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের জলবায়ু ভাল নহে। তুমিও দেখিয়াছ চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ কেমন মনের আনন্দে থাকিত। তাহাদের শরীরে দৌর্ব্বল্য দেখা যাইত না। আমাদের মধ্যে কৃষক ও মজুরদারদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও প্রতীয়মান হইবে যে, তাহাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত সত্ত্বেও তাহারা কেমন বলিষ্ঠ। পরীক্ষা-রূপ বিভীষিকা তাহাদের ভয় দেখায় না, মানসিক পরিশ্রম তাহাদের নাই, অথচ শারীরিক পরিশ্রম আছে; এই জন্যই তাহারা স্বাস্থ্য-সুখ অনুভব করে। আমাদের বালকদের মধ্যে যৎপরোনাস্তি মানসিক পরিশ্রম আছে, অথচ

কোনরূপ শরীরের চালনা নাই। এই নিমিত্তই তাহারা ক্ষীণকায় হইতেছে। তুমি বলিলে যে, পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ হইলে বালকের মন নারীপ্রেমের দিকে প্রধাবিত হয়। এ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কারণ বালকগণ পরীক্ষা দিবার জন্য এত ব্যস্ত হয় যে, কোন বাধাই তাহাদিগকে সে উৎসাহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। আমার বিবেচনায় এ কঠোর পরিশ্রম হইতে বালকদের মন যদি কিয়ৎপরিমাণে রমণীর বিশুদ্ধ প্রেমালাপে ব্যয়িত হয়, তাহা তাহাদের পক্ষে কল্যাণপ্রদ। ইহাতে তাহাদের জীবন মধুময় হয় এবং কঠোর পরিশ্রম তাহাদের পক্ষে ভারবহ বলিয়া বোধ হয় না। তুমি যে শিশুর কোমল দন্তের তুলনাটীর উল্লেখ করিলে তাহা শুনিতে যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু বল দেখি, দাঁত উঠিলে শিশু কি ক্রমে ক্রমে ভাত খাইতে অভ্যাস করে না? অন্নপ্রাশন সংস্কারটী কেন হইয়া থাকে? শিশুকে ভাত খাইতে দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। অন্নপ্রাশন হইতেই শিশু অল্প অল্প করিয়া ভাত খাইয়া থাকে। ইহাতে ত তাহার কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না। বরং ভদ্র লোকের বাটীর শিশুকে অনেক দিন পর্য্যন্ত দুগ্ধ পান করিতে দেখা যায়। দুঃখীদের মধ্যে তাহাও ঘটে না—তাহাদের শিশুরা শীঘ্রই ভাত খাইতে আরম্ভ করে, অথচ তাহাদের দন্ত কেমন কঠিন তাহারা কেমন বলিষ্ঠ। অবশ্য দাঁত উঠিয়াছে বলিয়া যে শিশু দন্তের দ্বারা সুপারি ভাঙ্গিবে, আমি একথা বলিতেছি না, তবে তাহার পক্ষে যাহা উপযোগী তাহাই তাহাকে দেওয়া উচিত। সেইরূপ যৌবনের প্রারম্ভে, নব-নারীর সম্মিলন অনিষ্টজনক হইতে পারে না। তবে, অতিরিক্ত স্ত্রী-সম্ভোগ হইতে যে মন্দ ফল ফলিয়া থাকে তাহা কে না স্বীকার করিবে?

বিজয়।—ভাই বসন্ত! তোমার কথায় আমি সায় দিতে পারি না। আমি একথা স্বীকার করি যে অসময়ে আহার ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুণ আমাদের বালকগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহা যাহাতে সংশোধিত হইতে পারে, তৎপক্ষে অভিভাবকদের যত্নবান হওয়া উচিত। যাহাতে তাহারা ব্যায়াম-চর্চ্চা করে তৎপক্ষে উৎসাহ প্রদান করা উচিত। আমি দেখিয়াছি, বালকগণ খেলা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের অভিভাবকগণ তৎপক্ষে বাধা দিয়া থাকেন। ইহা অতীব অন্যায়। বালকেরা যে দৌড়াদৌড়ী করিয়া, "হাডু ডুডু" "নুন কোট" প্রভৃতি খেলা করিয়া থাকে, ইহা একপ্রকার

ব্যায়ামের কার্য্য। ইহাতে বাধা দেওয়া উচিত নহে। তবে, অতিরিক্ত কিছুই ভাল নহে। তুমি ৩০।৪০ বৎসরের পূর্ব্বকার কথার উল্লেখ করিলে, কিন্তু অন্যান্য কারণ বশতঃ তখনকার লোক বলিষ্ঠ থাকিত। কিন্তু, তাই বলিয়া অল্প বয়সে স্ত্রী-সম্ভোগে যে অনিষ্ট হয় না তাহা কে স্বীকার করিবে? এ ব্যবহারটী না থাকিলে তখনকার লোক আরো অধিক বলিষ্ঠ হইত। স্ত্রী-সম্ভোগে যে শরীর দুর্ব্বল ও মস্তিষ্ক তেজোহীন হইয়া পড়ে তাহা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার? একবার প্রাচীন কালের কথা আলোচনা কর। প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে কিরূপ পদ্ধতি ছিল বিবেচনা কর দেখি। সে সময়ে দ্বিজগণ অন্যূন দ্বাদশ বৎসর গুরু-গৃহে থাকিয়া শাস্ত্র আলোচনা করিত। সুতরাং ২৫।৩০ বৎসর বয়সে তাহারা বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইত। স্ত্রী-লোকদেরও যে অধিক বয়সে বিবাহ হইত তাহারও অনেক প্রমাণ দেওয়া যায়। কারণ এরূপ একটি বিধিবদ্ধ ছিল যে, যত দিন কন্যা পতি-মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিবে, তত দিন তাহাকে বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। পুরাকা-কালের স্বয়ম্বর-প্রথা হইতে সহজেই সিদ্ধান্ত হয় যে, তখন রমণীগণ অধিক বয়সে পরিণীতা হইত।

বাল্য-বিবাহ হইতে আর একটী বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। আমাদের যুবকগণের উপর অল্প বয়সে সংসারের ভার নিপতিত হওয়াতে তাহারা লেখা পড়ার উন্নতি করিতে পারে না। তাহাদিগকে শীঘ্র বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কোন একটি সামান্য চাকরি স্বীকার করিতে হয়। ইংরাজদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। তাহারা উপার্জ্জনক্ষম না হইলে, বিবাহ করে না। সুতরাং অল্প বয়সে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। তাহারা জ্ঞান লাভ করিতে বিলক্ষণ সময় পায়। আর ইহা কি অস্বীকার যাইতে পারে যে ইংরাজদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই বলিয়া, তাহারা কি বল-বীর্য্যে, কি বিদ্যায়, সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে?

বসন্ত।—ভাই বিজয়! স্ত্রী-সম্ভোগে যে শরীর দুর্ব্বল হয় তাহাও আমি অস্বীকার করি না। আমিও পূর্ব্বে বলিয়াছি যে অতিরিক্ত কিছুই ভাল নহে। জীব-প্রবাহের মধ্যে ভগবানের কৌশল দেখা উচিত। পিতা-মাতার বলবীর্য্য ক্ষয় না হইলে সন্তান উৎপত্তি হয় না। পুরুষ ঊর্দ্ধরেতা হইয়া থাকুক এবং স্ত্রী কুমারী হইয়া কাল যাপন করুক, দেখিবে তাহারা কেমন

বলিষ্ঠ হইবে। পুরুষের চল্লিশ বৎসরে এবং রমণী র ৩০ বৎসরে বিবাহ হউক, দেখিবে, তাহাদের মিলনে যে সকল সন্তান উৎপত্তি হইবে তাহারা বিলক্ষণ বলশালী হইয়া মনের আনন্দে বিরাজ করিবে। তাই বলিয়া কি, এত অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত? ইংরাজদের মধ্যে এ প্রকার বিবাহ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু, তাহা হইতে কি উত্তম ফল ফলিতেছে? আমি স্বীকার করি যে, ইংরাজেরা অল্পবয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় না। কিন্তু, অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না হওয়াতে, কি পুরুষ কি স্ত্রী তাহাদের মধ্যে যে ঘোর অত্যাচার হইতেছে, তাহা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার? সে দিন অধ্যাপক মোক্ষমুলার সাহেব মেং মালাবারিকে লিখিয়াছিলেন "বাল্য-বিবাহ রহিত করিবার চেষ্টা কর তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু, সাবধান, ইউরোপের প্রথা যেন অনুকরণ করা না হয়—অর্থাৎ অধিক বয়স পর্য্যন্ত কি পুরুষ কি স্ত্রী অবিবাহিত থাকাতে, ইউরোপে যে অনিষ্ট হইতেছে, তাহা যেন ভারতবর্ষে দেখিতে না হয়।" ফল কথা এই যে, কেবল শারীরিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না। চরিত্রকে পবিত্র রাখা কর্ত্তব্য। যদি আমাদের বালকগণ ব্যভিচার দোষেই লিপ্ত হইল তাহা হইলে আর তাহাদিগকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিবার ফল কি? এই জন্যই বিবেচক ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সন্তানদিগকে যৌবনের প্রারম্ভেই বিবাহ দিয়া থাকেন।

তুমি যে বলিলে, অল্প বয়সে সংসারের ভার বহন করিতে হয় বলিয়া বালকদের উন্নতির পক্ষে ব্যাঘাত হয়—এ কথাটি অতি অল্প বালকের পক্ষেই ঘটে। যাঁহারা সম্পন্ন নহেন, তাঁহারা তাঁহাদের বালকদিগকে উচ্চ শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েন না। ইহা গৃহস্থের অবস্থার উপর নির্ভর করে—বিবাহ হওয়া না হওয়ার উপর নহে। আমাদের কেবল স্ত্রী লইয়াই সংসার নহে। পিতা-মাতা ও ভাই-ভগ্নীর ভরণ-পোষণের জন্য অনেক বালককে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে হয়। আবার, অল্প বয়সে বিবাহ হওয়াতে কোন কোন বালকের সুবিধাও হইয়া যায়। কন্যার পিতা সম্পন্ন হইলে তিনি তাঁহার জামাতাকে উত্তমরূপে লেখাপড়া শিখাইয়া থাকেন। আর, কোন কোন বালক যদি বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? যাহারা অধিক পড়িল, তাঁহারা না হয় উকিল ও হাকিম হইল। আর যাহারা অল্প পড়িল,

তাহারা না হয় কেরাণীগিরি স্বীকার করিল। কেবল অর্থাগমের তারতম্য মাত্র, শিক্ষা সম্বন্ধে ত এ উভয় দলের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখি না। যাঁহারা অধিক কাল বিদ্যালয়ে থাকেন, তাঁহারা পরীক্ষা দিবার অনুরোধে অধিক মুখস্থ করেন এবং তাহার ফল স্বরূপ উত্তম চাকরী প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত শিক্ষা হয় কই? বরং ইহা দেখা যায় যে যাঁহারা একরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া সমধিক অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অত্যাচারী হইয়া পড়েন। আবার যাঁহারা অল্প পড়িয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেককে নিজ চেষ্টায় উন্নতি লাভ করিতে দেখা গিয়াছে, এবং বলিতে কি, কেহ কেহ, কি বিদ্যায় কি চরিত্রে, সমাজের শীর্ষস্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছেন।

বিজয়।—ভাই বসন্ত! তুমি বলিলে যে বালক ও বালিকাদের চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য বাল্য-বিবাহ বাঞ্ছনীয়। একথাটী শুনিতে বড় ভাল। কিন্তু পবিত্রতা কাহাকে বলে তাহা একবার বিবেচনা করা উচিত। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ আমার বিবেচনায় অপবিত্র। চিত্তকে সংযত রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কেহই পবিত্র ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। বাল্য-বিবাহ, পবিত্র ভাব পোষণের পক্ষে বিষম অন্তরায়। কোথায় বালক বালিকার মন নানা প্রকার সদ্ভাবে পরিপূর্ণ থাকিবে, না, তাহাদের মনকে দাম্পত্য-প্রণয়ের দিকে লইয়া যাওয়া হয়। আর ইহাও নিশ্চয় জানিবে যে, বালক ও বালিকার মন একটি নূতন সুখের আস্বাদন পাইয়া, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের দিকে অধিক পরিমাণে রত হয়। ইহা কি অনিষ্টজনক নহে? ইহাকে কি ব্যভিচার বলা যায় না? আমাদের সমাজে সতীত্ব ধর্ম্মের বড় গৌরব। হিন্দু-রমণী সতী বলিয়া সর্ব্বত্র গৌরবান্বিতা। কিন্তু, আমরা যাহাকে সতীত্ব বলি, ইহা কি প্রকৃত সতীত্ব? আপনার মানসিক বলে যে আত্ম-সংযম করিতে না পারিল তাহাকে কি সতী বলা যায়? রমনীকে কঠোর শাসনে রাখিলাম, গৃহের মধ্যে তাহাকে রুদ্ধ করিলাম, যদ্যপি কাহারো কখন পদ স্খলিত হইল, তাহাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিলাম, একরূপে সতীত্ব রাখা গৌরবের বিষয় নহে। রমণীকে পবিত্র রাখিবার জন্য আমরা এইরূপে ব্যস্ত, কিন্তু পুরুষদের সম্বন্ধে আমরা কি করিয়া থাকি? হিন্দু-সমাজে, পুরুষ স্পর্শমণি স্বরূপ সে কিছুতেই কলুষিত হয় না। সে নানা রূপ ব্যভিচার করুক

হিন্দু-সমাজ তাহাকে অপরাধী বলিয়া দণ্ড করিবে না। বরং হিন্দু-সমাজের ইহাই নীতি যে, স্বামী হাজার মন্দ হউক, স্ত্রীর তাহারই প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে হইবে ; যে না করিবে, সে প্রকৃত সতী নহে। এরূপ নীতি হইতে কি প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেম আশা করা যাইতে পারে ? রমণী কঠোর শাসনের অধীন হইল, আর পুরুষ নির্ভয়ে সমাজের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

বসন্ত।—ভাই বিজয় ? তোমার কথাগুলি বড় উঁচুদরের সন্দেহ নাই। যে রমণী আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারে, সেই যে প্রকৃত রূপে রক্ষিতা একথা কে না স্বীকার করিবে ? কি পুরুষ কি স্ত্রী, আত্ম-সংযম যে উভয়ের পক্ষেই গৌরবের বিষয় তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু লোকের কি সহজে আত্ম-সংযম শিক্ষা হইয়া থাকে ? বালক ও বালিকাকে উত্তম রূপে নীতি-শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তাহাদিগকে শাসনে রাখিতে হইবে, তবেত তাহারা ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান হইতে পারিবে ? কেবল বালক বালিকা কেন ? মনুষ্য মাত্রেই দুর্ব্বল। সামান্য প্রলোভন তাহাকে বিপদগামী করিতে পারে ; অতএব প্রলোভন হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য। প্রলোভনকে অতিক্রম করা ধর্ম্মবীরের কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু, এরূপ পরাক্রম ক'জন দেখাইতে পারে ? বাল্য-বিবাহ যে বালক-বালিকার চরিত্র পবিত্র রাখে তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি বল যে বাল্য-বিবাহ বালক বালিকার কাম-প্রবৃত্তি উত্তেজিত করে। কিন্তু তুমি কি ইহা অবগত নহ যে, কত বালক গণিকালয়ে গমন করত অত্যাচারের একশেষ করিয়া থাকে এবং ইহাও অপ্রকাশ নহে যে, কত বালক পরস্পর অস্বাভাবিক ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে। এই সকল অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বাল্য-বিবাহের প্রয়োজন। তুমি কি জাননা যে বালকগণ যৌবনের প্রারম্ভেই প্রণয়-বিষয়ক নাটক ও উপন্যাস পাঠ করিয়া নূতন রসে রসিক হইয়া উঠে। তাহাদের উত্তেজিত মনকে শান্ত করা আবশ্যক। বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয়ই তৎপক্ষে উপযোগী। বালক ও বালিকা সংযত থাকে ইহা প্রার্থনীয়। কিন্তু যে ব্যভিচারের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা অপেক্ষা স্বামী ও স্ত্রীর সম্মিলন কি বাঞ্ছনীয় নহে ?

বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহাদের প্রাচীন অধ্যাপক রামচন্দ্র দেখা দিলেন। বাল্য-বিবাহ লইয়া যে তর্ক চলিতেছিল তাহার মীমাংসার ভার অধ্যাপক মহাশয়ের

উপর অর্পিত হইল। অধ্যাপক রামচন্দ্র তাঁহার অভিপ্রায় এই রূপে ব্যক্ত করিলেন।

আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করা উচিত। আমাদের বাল্য-বিবাহ-পদ্ধতি সহিত ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রচলিত প্রণালীর তুলনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, হিন্দু সমাজ অনেক অংশে পবিত্র ভাব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে। মেং মালাবারির আন্দোলন সম্বন্ধে, পঞ্জাবের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার মেং ইবেটসন সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, পঞ্জাবের যে ২ অঞ্চলে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত সেই সেই অঞ্চলে রমণী ঘটিত ব্যভিচার অল্প; কিন্তু যে যে অঞ্চলে অধিক বয়সে বিবাহের প্রথা প্রচলিত সেই ২ অঞ্চলে ব্যভিচার প্রবল। অধ্যাপক মোক্ষমুলার এসম্বন্ধে মেং মালবারিকে যে রূপ সতর্ক করিয়া দিয়াছেন তাহা তোমরা অবগত আছ। বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকাতে যে বঙ্গবাসীগণ বীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছে একথা বলা যায় না। উত্তর-পশ্চিম দেশে মাদ্রাজে ও দক্ষিণাত্যে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে কিন্তু সে সকল প্রদেশের লোক বিলক্ষণ বলশালী। এ সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। জারমানি যাহা পরাক্রমে ইউরোপের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে, সে দেশে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত। অবশ্য শিশুদিগকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করা উচিত নহে। যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে বালক-বালিকাদিগকে বিবাহ দেওয়া উচিত। কেহ কেহ বলেন যে,যৌবনের প্রারম্ভে বিবাহ দিলে ক্ষতি হয় না, যদ্যপি এরূপ নিয়মই করা যায় যাহাতে ঋতুকালের পূর্ব্বে বর কন্যা একত্রিত হইতে না পাবে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এরূপ নিয়ম আছে যে দ্বিতীয়-বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে স্বামি-গৃহে পাঠান হয় না। এ নিয়মটি উত্তম বটে। কিন্তু ইহার দ্বারা বাল্য-বিবাহ ঘটিত দোষ নিবারণ হইলেও আর একটী অন্তরায় আছে। আমাদের সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকাতে শিশু-বিবাহ হইতে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াথাকে। বিশেষতঃ বালিকাদের বৈধব্য দশা অতিশয় শোচনীয়। যৌবনের সূত্রপাত হইলেই যে পুত্র-কন্যাকে বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই বটে। কিন্তু আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা আমাদের বালক-বালিকার চরিত্র পবিত্র

লিখিতে পারি কই ? যৌবন-প্রাপ্ত বালকগণ একত্রিত হইয়া যে কত কবে তাহাব নির্ণয় কে করে ? তাহাদের মধ্যে কত অস্বাভাবিক ব্যভিচার সংঘটিত হয এবং বলিতে কি, তাহারা বালিকাগণকেও প্রলোভন কার্য্যে কলুষিত করিয়া থাকে। অনেকে, বেশ্যালয়েও গমন করিয়া থাকে। অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া যে, আমবা বালক-বালিকাদেব মনকে প্রেমের দিকে আকর্ষণ করি, তাহা সত্য নহে। পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের মন সে দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে। বিশেষত কিছু অধিক বয়স্ক ব্যক্তির সহবাসে বালকদেব মনের ভাব বিচলিত হইয়া পড়ে। বলিতে কি, যাঁহারা বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রণীত প্রণয়-ঘটিত নাটক ও উপন্যাস পাঠে বালক-বালিকাদেব মন বিশেষ রূপে কলুষিত হইয়া থাকে। অসময়ে কিম্বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় ভোগের দ্বারা যাহাতে শরীর ভগ্ন না হয়, তৎপক্ষে সতর্ক থাকা অতীব বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু পুত্র-কন্যাদেব অধিক বযস পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিলে, সে ফল পাওয়া যায় কই ? স্ত্রী সহবাস জনিত যে মন্দ ফল ফলিয়া থাকে, অস্বাভাবিক ব্যভিচার ও বেশ্যাবৃত্তি যে তাহা অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট সংসাধিত করিয়া থাকে। বলিতে কি, কোন কোন যুবকের অত্যাচারে পাড়ার বালিকাগণকে ভাল রাখা যে কঠিন হইয়া উঠে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে, প্রতীয়মান হইবে যে, যৌবনের প্রারম্ভেই পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত।

প্রাচীন কালে অধিক বয়সে বিবাহ দিবার নিয়ম ছিল বটে। কিন্তু সে সময়ের সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করা উচিত। যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার পর দ্বিজকে অন্যূন ১২ বৎসর গুরু গৃহে বাস করত বিদ্যাভ্যাস ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইত। এই কএক বৎসর বালককে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইত। বালকের মনে কোন মন্দ ভাব আসিতে পারিত না। কেবল ধর্ম্মের দিকেই তাহার মন প্রধাবিত হইত। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর ছাত্র তাঁহার ইচ্ছানুসারে সংসার আশ্রয় প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন, অথবা অন্যান্য আশ্রম অবলম্বন পক্ষেও তাঁহার কোন বাধা ছিল না। এ দিকে কন্যাও তাহার পিতা কর্ত্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং মাতা কর্ত্তৃক গৃহ কার্য্যে শিক্ষালাভ করিতেন। কন্যারও যে অধিক বয়সে বিবাহ হইত, তাহার প্রমাণ আছে। প্রাচীন ব্যবস্থাশাস্ত্রে ইহা লিখিত আছে যে, যে পর্য্যন্ত কন্যা পতি সেবা

করিতে সক্ষম না হইবে, ও পতি-মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত পিতার উচিত নহে, যে তাহাকে বিবাহ-সূত্রে বদ্ধ করেন। এ প্রকার সুশিক্ষা-প্রাপ্ত বালক ও বালিকাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না দিলে, কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা বর্জ্জিত বিদ্যাভ্যাস উল্লিখিত পদ্ধতির উপযোগী হইতে পারে না।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি আছে। তাহা ব্যায়াম চর্চ্চা। এক একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে যেখানে বালক ও যুবকগণ ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া থাকে। ইহার প্রতি তাহাদের এরূপ আকর্ষণ, যে তাহারা আমোদ প্রমোদ ত্যাগ করিয়া এই ব্যাপারেই রত থাকে। সুতরাং কুভাব তাহাদের মনকে অধিকার করিতে পারে না। এই পদ্ধতিটি বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত।

বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন কালের পদ্ধতি অনুসারে বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু যতদূর সম্ভব তাহাদের মনকে ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত প্রত্যেক পল্লীতে এক একটি ধর্ম্ম-শিক্ষালয় সংস্থাপিত হওয়া উচিত। এই শিক্ষালয়ে সুপণ্ডিতজনগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইবে এবং বালকগণ নিয়মমত ধর্ম্ম উপদেশ শ্রবণ করিবে। লোকের মনে ধর্ম্ম ভাব উদ্দীপন করিবার আর একটি উপায় আছে। ইহা কথকতা। এতদ্দ্বারা কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি বালক কি বৃদ্ধ, সকলেরই উপকার হইবার সম্ভাবনা। প্রত্যেক পল্লীতে ধর্ম্ম শিক্ষালয় সংস্থাপিত না হইতে পারে। কিন্তু কথকতা যাহাতে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া সকলেরই উচিত। এতদর্থে পল্লীস্থ সকলের নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলে কথক মহাশয়ের ব্যয় সংকুলন হইতে পারিবে। কথক মহাশয় পর্য্যায়ক্রমে গৃহস্থের বাটীতে শাস্ত্র হইতে উত্তম উত্তম বিষয় ব্যাখ্যা করিবেন। গৃহস্থের নিজ বাটীর লোক এবং প্রতিবাসীগণ একত্রিত হইয়া ধর্ম্ম কথা সকল শ্রবণ করিবেন। লোকের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করিবার পক্ষে কথকতা একটি প্রকৃষ্ট উপায় এবং তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া সকলের বিশেষ কর্ত্তব্য। ব্যায়াম চর্চ্চা এবং উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রদত্ত হইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইবে যদি অভিভাবকগণ বালক বালিকগণকে উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাইতে না পারেন। যে ব্যক্তি নিজে ব্যভিচারী সে কি প্রকারে তাহার সন্তানকে সচ্চরিত্র দেখিবার আশা করিতে

পারে? পল্লীর মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানী ও কৃতবিদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করা উচিত। কারণ, লোক তাঁহাদেরই অনুকরণ করিয়া থাকে। ফল কথা এই, সন্তান গণকে সুশিক্ষা প্রদান করিলে ও তাহাদের সমক্ষে উত্তম দৃষ্টান্ত ধারণ করিলে, যে সুচারু ফল ফলিবার সম্ভাবনা তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায় যাহা সমুচিত তাহা তোমাদের সমক্ষে বিবৃত করিলাম। তোমরা যে উত্তম বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া থাক, ইহা দেখিয়া সুখী হইলাম।

সাহেব চোর।

বাঙ্গালীর ন্যায় সাহেবদিগের মধ্যেও চোরের অভাব নাই। কিন্তু বাঙ্গালীতে এবং সাহেবে যেমন বলবীর্য্যে এবং বুদ্ধি-কৌশলে প্রভূত প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তেমন বাঙ্গালী এবং সাহেব চোরেও বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। বাঙ্গালীর মধ্যে প্রায়ই অতি হীন জাতীয় লোকে দস্যু বৃত্তি করে, কিন্তু সাহেবদিগের মধ্যে তাহা নহে। বাঙ্গালী চোর কদাচিৎ লেখা পড়া জানে। আমি দীর্ঘকাল পুলিস আমলা ছিলাম এবং বহু চোর ডাকাইত আমি দেখিয়াছি, কিন্তু এই শ্রেণীর লোক আমার এমন একজনও স্মরণ হয় না, যাহাকে নাম দস্তখত করিতে পারিতে কিম্বা অন্যরূপ লেখা পড়া জানিতে দেখিয়াছি। কিন্তু সাহেব চোর সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। আমি অবশ্যই বিলাত যাই নাই এবং সাহেবদিগের সহিত আমার এমন গতিবিধি কিম্বা সংসর্গ করা হয় নাই যদ্দ্বারা সাহেবদিগের সকল বিষয়ে তাহাদের সাধারণ স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমি অভিমত প্রকাশ করিতে পারি, কিম্বা আমার অভিমত বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। কেবল আমি বলিয়া নহে আমার ন্যায় অনেক বঙ্গবাসীরই সাহেবদিগের ভিতরের কথা জানিবার এক মাত্র উপায় তাহাদিগের নিজের লিখিত পুস্তক সকল। যে এক মুষ্টিভরা বাঙ্গালী ইংলণ্ডে যাইয়া সেই স্থানে বাস করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের কথা অবশ্যই প্রামাণ্য। বটে—কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে বিলাত ফেরত বাবুরা অতি যুবা বয়সে কেবল বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। স্বীয় কার্য

সাধনের নিমিত্ত দিবারাত্র ব্যস্ত ছিলেন। ইংলণ্ডের সমস্ত দৃশ্য দেখিতে কিম্বা অধিবাসিদিগের সহিত সংসর্গ করিতে অতি অল্প সময় ব্যয় করিতে পারিয়াছিলেন। পরীক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত বিলাত গিয়াছেন, যাহাতে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন তাহাতেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অহর্নিশি লিপ্ত ছিলেন এবং পরীক্ষা দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিশেষত তাঁহাদের ইংলণ্ডে বাসাবস্থায় তাঁহারা কেবল বিদ্যার্থী এবং পণ্ডিত মণ্ডলী দ্বারা বেষ্টিত থাকিতেন। সজ্জন এবং সচ্চরিত্রান্বিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য রকমের ইংলণ্ডের অধিবাসিগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার আবশ্যক কিম্বা সাবকাশ হইত না। অতএব ইহাঁদের মনে ইংলণ্ডের কেবল ভাল ভিন্ন মন্দ চিত্র অঙ্কিত হয় নাই এবং তাঁহাদের বিশ্বাস যে তাঁহাদের অধ্যাপক এবং শিক্ষকদিগের ন্যায় এবং সেই সকল অধ্যাপক এবং শিক্ষকের স্ত্রী কন্যা ভগিনী প্রভৃতির ন্যায় ইংলণ্ডের সকল নরনারীই ধার্ম্মিক, নির্দ্দোষ এবং পবিত্র। সুতরাং আমাদের বিলাত যাত্রীদিগের মুখে শুনিতে হইলে, কেবল ইংলণ্ড নহে সমুদায় ইউরোপ-খণ্ডই পৃথিবীর স্বর্গীয় ভাগ বোধ হইবে! ফল কথা তাহা নহে, দর্পণের যেমন এক দিক উজ্জ্বল এবং আর এক দিক মলিন থাকে, ইউরোপীয় সমাজেরও সেইরূপ দুই দিক আছে, কিন্তু সেই বিভিন্নতা আমাদের স্বদেশের অবস্থা দৃষ্টে পরিমাণ করিতে পারা যায় না। আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ বলিয়া একটা কথা আছে বটে কিন্তু সেই প্রভেদ অনুযায়ী সাহেবদিগের ভাল মন্দের বিবেচনা করা অসাধ্য। ইউরোপ খণ্ডের ভাল মানুষেরা খুবই ভাল এবং মন্দ লোক এমনই মন্দ, যে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আকৃতি প্রকৃতি, ধন, বিদ্যা বুদ্ধি—প্রভৃতি সকল বিষয়ে এই বিভিন্নতার সীমা নাই। শুনিলে আমাদের স্তম্ভিত হইতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাহেবদিগের কথা জানিবার জন্য, তাঁহাদের পুস্তকই আমাদের প্রধান উপায়। তদ্ভিন্ন কলিকাতা নগরের রাস্তা ঘাটে যে অল্প বিস্তর ইউরোপবাসীদিগকে আমরা দেখিতে পাই, তাহাতেই আমরা বুঝিতে পারি, যে ইতর সাহেব এক ভয়ানক জীব। তথাপি ইহারা ইউরোপের ইতর লোকের যথার্থ আদর্শ নহে। ইহাদের অপেক্ষা যে আরও কত পরিমাণে অপকৃষ্ট মনুষ্য আছে, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই, কেবল অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া মনকে প্রবোধ দিতে হয়। তাই বলিতেছি যে বাঙ্গালী

চোরের সহিত সাহেব চোরের তুলনা হইতে পারে না। আদৌ শারীরিক বলবীর্য্য সম্বন্ধে সকল শ্রেণীরই বিশেষত নিম্ন শ্রেণীর সাহেবেরা যে আমাদিগের অপেক্ষা শত শত পরিমাণে উৎকৃষ্ট, তাহা আর এক্ষণে বাঙ্গালীদিগকে চক্ষে আঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে না। সকলে যাহা জানে তাহার পুনরুল্লেখ করা কেবল সময় নষ্ট করা ভিন্ন নহে; তথাপি পাঠক বৃন্দের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আমি এই স্থানে একটি দৃষ্টান্ত বিবৃত করিব।

সাহেবদিগের প্রথম আমলে যখন তাঁহাদের লৌহ কিম্বা কলের জাহাজ সৃষ্টি হয় নাই, কেবল কাষ্ঠে জাহাজ নির্ম্মিত এবং বাতাসের দ্বারা চালিত হইত, তখন এক খানা মানোয়ার অর্থাৎ যুদ্ধের জাহাজ বঙ্গ সাগর হইতে কলিকাতায় আসিতে জোয়ারের প্রতীক্ষা করিয়া সাগর দ্বীপের ধারে নোঙ্গর করিয়াছিল। জাহাজ খানা বহু দিন ধরিয়া জলে জলে ভ্রমণ করিবার পরে ভূমির নিকট উপস্থিত হওয়াতে মানোয়ারের কয়েক জন নাবিক সুন্দর বনের মনোহর দৃশ্য দেখিয়া তাহার মধ্যে যাইয়া ভ্রমণ করার নিমিত্ত কর্ত্তা সাহেবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিল, তিনি তাহাদিগকে দুই ঘণ্টার বিদায় দিলেন। তদনুযায়ী ৭।৮ জন নাবিক এক খানা ডিঙ্গি করিয়া দ্বীপের কূলে আসিল এবং সেই স্থানে এক বৃক্ষের সহিত নৌকা খানা বন্ধন করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। এখন অপেক্ষা তখন জঙ্গল অত্যন্ত গভীর ছিল। আবাদের জন্য মনুষ্যে হস্ত ক্ষেপণ করে নাই সুতরাং ব্যাঘ্র প্রভৃতি বন্য জন্তু যে তাহাতে অধিক সংখ্যায় ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। লোকেরা ইতস্তত ভ্রমণ করার পরে হঠাৎ এক ব্যাঘ্র তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। জন্মে তাহারা ব্যাঘ্র কিম্বা ব্যাঘ্রের চিত্র দেখে নাই, অতএব ইহা যে ব্যাঘ্র তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। জন্তুটা অতি সুন্দর দেখিয়া তাহা ধরিয়া জাহাজে লইয়া যাইতে ব্যস্ত হইল। ইতিমধ্যে ব্যাঘ্র নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করিল। লোকেরা নগ্ন-হস্তে জাহাজ হইতে আসিয়াছিল কোনও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আইসে নাই। জন্তুটা তাহাদিগকে আক্রমণ করিল দেখিয়া তাহারা হাঁসিতে হাঁসিতে কেবল মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা ব্যাঘ্রকে মারিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। ব্যাঘ্র তাহাদের সকলকে তাহার দন্ত ও নখ দ্বারা কত ক্ষত বিক্ষত করিল, কিন্তু বীর পুরুষেরা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। কি প্রকারে জন্তুটা হস্তগত করিবে কেবল তাহার

দিকেই তাহাদের লক্ষ্য। এইরূপে বহুক্ষণ ঘোরতর সংগ্রামের পরে নাবিকেরা কেবল শরীরের বলে এবং সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সেই সুন্দরবনের হুমা বাঘটাকে মুষ্ট্যাঘাতে দ্বারা বধ করিয়া, কজনে তাহা কষ্টে তুলিয়া উল্লাসের সহিত হু-র-রা হু-র-রা দিতে দিতে জলের ধারে লইয়া উপস্থিত হইল। কর্ত্তা কাপ্তান সাহেব উঁহাদিগের সেই জয়ধ্বনি শুনিয়া দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলেন, যে নাবিকেরা এক ব্যাঘ্র শীকার করিয়া আনিতেছে। তাহারা জাহাজে আরোহণ করিলে পর দেখিলেন যে সকলের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। কাপ্তেনকে সেলাম করিয়া তাহারা তাঁহাকে এই জন্তুটা উপঢৌকন দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে জন্তু তাহারা মারিয়া আনিয়াছে, তাহার নাম তাহারা জানে কি না? নাবিকেরা "না" বলিয়া উত্তর করাতে তিনি বলিলেন যে ইহাই ভারতবর্ষের ব্যাঘ্র। এই নাম উচ্চারিত হইবা মাত্র তাহাদের সাহস অন্তর্হিত হইয়া ভয়ে শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। পরে কাপ্তান সাহেব ইহাদিগকে দুই তিন মাসের চিকিৎসায় আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বলুন দেখি, ইহা কি মনুষ্যের না অসুরের কার্য্য! মনুষ্যের হইলে বাঙ্গালী মনুষ্যের দ্বারা এই কার্য্য কখনও সম্ভব হয় না। যে বীর জাতি প্রথমে পলাসী, তৎপরে আসাই, তাহার পরে মহারাজপুর পণিয়ার, তৎপরে মুদকী, সোব্রা-য়ান ও গুজরাট যুদ্ধ জয় করিয়া এবং অবশেষে বহু সংখ্যক বিদ্রোহী সিপাহী সৈন্য দমন করিয়া এই বৃহৎ সাম্রাজ্য অপেক্ষাকৃত অতি অল্প সময়ের মধ্যে করতলস্থ করিয়াছে, ইহা তাহাদেরই কার্য্য, অন্যের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। এক একটা কীর্ত্তি শুনিলে মনুষ্য-জীবন ধন্য বলিয়া মনে উল্লাসের উদ্ভব হয়।

ভাল কথার কি আকর্ষণ দেখুন, কোন কথার প্রসঙ্গে আমি কি কথা বলিতে এত সময় ক্ষয় করিলাম। চোরের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া সাহেবদিগের বলবীর্য্যের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক এই ক্ষণে সাহেব চোর যে কত নির্দ্দয় এবং প্রাণ নষ্ট করিবার যে স্থলে কোনও আবশ্যক নাই, সে স্থলে তাহারা যে ঐরূপ কুকার্য্য করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না, তাহার এক দৃষ্টান্ত দেখাইব। রুসিয়া দেশের এক গ্রামে এক গৃহে একটি পুরুষ ও তাহার স্ত্রী ও তাহাদের একটি যুবতী কন্যা বাস

করিত। এক রুসিয়ার দৃষ্টান্তে ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপ খণ্ডের প্রায় সকল দেশের নিম্ন শ্রেণীর চরিত্র বুঝা যাইতে পারে, কারণ ইহাদের সকলের স্বভাবই এক ছাঁচে গঠিত বলিলে বলা যাইতে পারে। ঐ গৃহস্থ নিতান্ত দরিদ্র ছিল না, পরিশ্রম করিয়া যে কিছু উপার্জ্জন করিত তদ্দ্বারা তাহাদের সকলের সচ্ছন্দে দিন পাত হইত। গ্রামের কিঞ্চিৎ দূরে সপ্তাহের মধ্যে এক দিন এক স্থানে এক হাট হইত এবং সপ্তাহের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার নিমিত্ত সেই গ্রামের অধিবাসীরা সেই হাটে যাইত। ইহারই এক হাটের দিন ঐ গৃহস্থের স্ত্রীপুরুষ দুই জনে তাহাদের কন্যাকে গৃহে রাখিয়া হাট করিতে গিয়াছিল। পিতা মাতা গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইবার পরে কন্যা গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া গৃহস্থালী এক কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। এই স্থানে বিবৃত করা আবশ্যক, যে গ্রামের অধিবাসীদিগের গৃহ সকল সহর কিম্বা নগরের গৃহের ন্যায় এক স্থানে সংলগ্ন ছিল না। গৃহ সমস্ত পরস্পর ব্যবধানে ছিল। কিন্তু এই গৃহস্থের গৃহখানা অন্যান্য গৃহ হইতে অধিক দূরে সংস্থাপিত ছিল। সুতরাং ইহাতে কি হইতেছে, না হইতেছে, তাহা প্রতিবেশী সহজে দেখিতে কিম্বা জানিতে পারিত না। দ্বার বন্ধ করিবার কিছু কাল পরে কন্যা শুনিতে পাইল, যেন কে তাহাকে ডাকিয়া দ্বার খুলিতে বলিতেছে। দ্বার মোচন করিবা মাত্র এক জন অপরিচিত কদাকার এবং মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র ধারী মনুষ্য কন্যাকে ঠেলিয়া বল পূর্ব্বক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কন্যার হস্ত হইতে দ্বারের চাবি কাড়িয়া লইয়া পুনবার দ্বারের তালা বন্ধ করিয়া চাবিটা আপনার পকেটের মধ্যে রাখিল এবং পোষাকের ভিতর হইতে এক খানা লম্বা চক্‌চকে ছুরি বাহির করিয়া কন্যাকে দেখাইয়া বলিল, যে কন্যা তাহার কথার অবাধ্য হইয়া কার্য্য করিলে কিম্বা চীৎকার করিলে, সে তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গে ছুরি বসাইয়া তাহাকে বধ করিয়া ফেলিবে। এই ব্যাপার দেখিয়া কন্যা যে ভয়ে স্তম্ভিত হইল, তাহা আর বলিতে হইবে না। সে নির্ব্বাক হইয়া এক স্থানে খাড়া হইয়া কাঁপিতে লাগিল এবং চোর ব্যাটা যাহা কিছু তাহাকে করিতে বলে, তাহাই সে কলের পুত্তলিকার ন্যায় করিতে লাগিল। প্রথমে গৃহের মধ্যে যে সকল আহার্য্য বস্তু ছিল তাহা ঐ ব্যক্তি উদরস্থ করিল, পরে বাক্স সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা কড়ি এবং অন্যান্য মূল্যবান

দ্রব্য যাহা পাইল, তাহা হস্তগত করিলে কন্যা বিবেচনা করিল, যে এখন সে চলিয়া যাইবে এবং তাহার নিস্তার হইবে, কিন্তু কন্যার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। দ্রব্য সকল হস্তগত করিয়া চোর কন্যার নিকট আসিয়া কহিল, যে কন্যাকে গৃহমধ্যে ছাড়িয়া দিয়া কিম্বা জীবিত রাখিয়া গেলে, গৃহস্বামী প্রত্যাগমন করিলে, সে তাহাকে সকল কথা বলিয়া দিবে এবং তাহা হইলে পুলিশের অনুসন্ধান দ্বারা তাহাকে ধৃত করিয়া দণ্ডনীয় করিবে। এই স্থানে বলা আবশ্যক, যে রুসিয়ার পুলিস বড় পরাক্রান্ত এবং চোর ধরিতে বড় মজবুত। তাহার উপরে চোরের শাস্তি অতি ভয়ানক। ফাটক এবং নির্ব্বাসন ত আছেই, তদতিরিক্ত নাউট নামক এক ভয়ঙ্কর শাস্তি আছে। আমাদের বেত্রাঘাতের স্থলে রুসিয়ার নাউট। উহা নাকি চর্ম্মের এবং শোণ পাটের বন্ধ দ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং উহার আঘাত এমনই বেদনা-দায়ক যে করের ন্যায় বলবান মনুষ্যও ইহার কয়েক আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। দস্যু বলিল যে “ তোমাকে জীবিত রাখিয়া গেলে আমায় নিশ্চয়ই নাউট খাইতে হইবে, অতএব তোমাকে মারিয়া যাইব, তবে তুমি অতি নম্রভাবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছ, সেই জন্য তোমার প্রতি আমার দয়া হইয়াছে, তোমাকে অধিক কষ্ট দিব না। তুমি বল যে তুমি কোন্ প্রকারে মরিতে ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে সেই প্রকারে মারিব। তুমি শীঘ্র বল, বিলম্ব হইতেছে।” যুবতী ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, কিন্তু সে পাপাত্মার কিছুতেই দয়া হইল না। অবশেষে সে বলিল যে ‘ বুঝিয়াছি যে তুমি ছুরির আঘাত সহ্য করিতে পারিবে না, তোমাকে ফাঁসি দিয়া মারিব, তাহা হইলেই তোমার কম যন্ত্রণা হইবে”। এই বলিয়া সে এক গাছা শোণের দড়ি সংগ্রহ করিয়া তাহার এক আগায় একটা ফাঁস করিয়া অপর আগা সেই ছুরীর মধ্য স্থানে শক্ত করিয়া বান্ধিল। পরন্তু বসিবার একটা কাষ্ঠের টুল ঘরের মধ্য স্থলে আনিয়া মুদ্গারের ন্যায় আর একটা কাষ্ঠ লইয়া সেই টুলের উপরে দণ্ডায়মান হইল এবং সেই অবস্থায় মাথার উপরে দুই হস্ত প্রসারণ করত মুদ্গারের দ্বারা আঘাত করিয়া ছাদের একটা কড়িকাষ্ঠের মধ্যে খুব জোরে সেই ছুরি খানা বসাইয়া দিল। ছুরির অর্দ্ধ ভাগের অধিক কড়ি কাষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিল পরে তাহা শক্ত হইয়া বসিয়াছে কি না এবং তাহাতে এ কন্যার শরীরের ভার অনায়াসে

খুলিতে পারিবে কি না, তাহার পরীক্ষা করার নিমিত্ত সে দড়ির ফাঁসটা তাহার দক্ষিণ হস্তের মধ্যে গলাইয়া দিয়া সজোরে তাহা টানিয়া দেখিতে লাগিল। মনে করিয়াছিল, যে দড়িটা পরীক্ষায় টিকিলে সে ঐ মেয়েটাকে টুলের উপরে উঠাইয়া তাহার গলায় ফাঁসী দিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় বিপরীত ফল ঘটিয়া উঠিল। পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার পদতলের টুলটা সরিয়া কিঞ্চিৎ দূরে ভূমিতে কাত হইয়া পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীরও অবলম্বন অভাবে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে ভূমিতে পড়িয়া যাইত কিন্তু তাহার দক্ষিণ হস্তটা দড়ির ফাঁসের মধ্যে থাকাতে, হস্তখানায় ফাঁসী লাগিয়া, তাহার শরীর ঝুলিতে এবং নূতন দড়ির শক্ত পাক নিবন্ধন বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার হওয়ার নিমিত্ত দড়ি ছিঁড়িয়া ভূমিতে পড়িতে অথবা পায়ের দ্বারা টুলটা টানিয়া পুনরায় পদতলে আনিতে সে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার হিতে বিপরীত হইল। কারণ, সে যত অধিক বল প্রয়োগ করিতে লাগিল, ততই দৃঢ় রূপে তাহার হস্তের ফাঁস চর্ম্মের মধ্যে বসিতে লাগিল এবং কতক্ষণ পরে তাহার পঞ্চ অঙ্গুলির মাথাতে রক্ত জমাতে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে সে তাহার আপন চেষ্টা নিষ্ফল দেখিয়া যুবতীকে প্রথমে রূঢ় বাক্যে টুল খানা টানিয়া দিতে কহিল, ক্রমে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিল এবং অন্তে কাকুতি মিনতীও করিল কিন্তু কিছুই হইল না। কারণ মেয়েটি তখনও স্পন্দহীন। তাহাকে বধ করিবে শুনিয়া তাহার প্রথম হইতেই জ্ঞান লোপ হইয়াছিল এবং এমনই তাহার হতবুদ্ধি হইয়াছিল যে যদিও এই দুরাত্মার সমস্ত কার্য্য তাহার চক্ষের উপরে নির্ব্বাহিত হইতেছিল, তথাপি সে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। ভয়ে তাহার বাকবোধ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। চোর ব্যাটার কাকুতি মিনতি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশিয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহার কার্য্য করিবার কিম্বা কথা কহিবার শক্তি, কিছুমাত্র ছিল না। বোধ হয়, ইহা সেই যুবতীর প্রাণ রক্ষার একটি মহদুপায় স্বরূপ হইয়াছিল কারণ যুবতীর কার্য্য করার শক্তি থাকিলে সে নির্ব্বোধতা বশত কিম্বা ভয়ে, দুরাত্মার কথা মতে তাহার পায়ের নিকট টুল আনিয়া দিত, আর চোর মুক্ত হইয়া তাহাকে বধ করিতে ছাড়িত না। সে যাহা হউক এইরূপে কিঞ্চিৎকাল অতিবাহিত হইলে পরে

গৃহস্থেরা প্রত্যাগমন করিল এবং কন্যার কোন উত্তর না পাইয়া কবাট ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দুই জনের সে অবস্থা দেখিয়া অবাক হইল। পুলিষ কর্ম্মচারীরা দুর্ব্বৃত্তকে একজন পুরাতন বদমাএস বলিয়া জানিতে পারিয়া দণ্ডের নিমিত্ত রাজদ্বারে অর্পণ করিল।

ইহা ত হইল ইউরোপের ঘটনা কিন্তু অদ্য ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের কলিকাতা নগরে যে এক ঘটনা হইয়াছিল তাহাও কম লোমহর্ষণ কাণ্ড নহে। ইহা সকলেই জানেন, যে কলে কৃত্রিম বরফ প্রস্তুত করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সাহেবদিগের বিলাস ভোগের নিমিত্ত আমেরিকা খণ্ডের ক্যানেডা প্রদেশ হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া কলিকাতায় স্বাভাবিক বরফ আসিত এবং বার মাস সেই বরফ রক্ষা করিয়া রাখিবার জন্য এইক্ষণে যে স্থানে ছোট আদালতের নিমিত্ত নূতন প্রসাদ হইয়াছে তাহার ঠিক পশ্চিম ধারে বরফ গুদাম নামে এক গৃহ নির্ম্মিত হয় এবং তাহাতে বরফ গুদামের দুই এক জন কর্ত্তা সাহেবও মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় একবার বরফ গুদামে অনেক টাকা জমা হইয়াছিল। কি কারণে বলিতে পারি না, সেই টাকা ব্যাঙ্কে চালান করিতে কয়েক দিবস শৈথিল্য করা হয়। কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, কেবল একজন সাহেবের অসুস্থতা। সেই সাহেবটি বরফ গুদামে বাস করিতেন, সেই স্থানে তাঁহার পীড়া হয় এবং পীড়িতাবস্থায় সেই খানেই ছিলেন। পীড়া শীঘ্র আরাম না হওয়াতে এক দিবস টাকাগুলি হঠাৎ ব্যাঙ্কে চালান করা হইল, তাহার পর দিবস প্রাতে সেই পীড়িত সাহেবের খানসামা সাহেবের কামরায় যাইয়া দেখে যে সাহেবকে কে খুন করিয়া গিয়াছে, দেহটা পালঙ্গ হইতে নামাইয়া ঘরের কোণে চিত করিয়া রাখিয়াছে; পালঙ্গের বিছানায় এবং ঘরের স্থানে স্থানে রক্তে আচ্ছাদিত। এই সংবাদ প্রচার হওয়া মাত্র, সাহেব মহলে খুব একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল এবং দোষী ব্যক্তিদিগকে আবিষ্কার করার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হইল। তখন ম সাহেব কলিকাতায় পুলিষের সুপরিনটেণ্ডেণ্ট। প্রথম দিবস মৃত সাহেবের খানসামা খিদমদগার প্রভৃতি দেশীয় লোকের উপরে সন্দেহ হয় কিন্তু সকল অবস্থা অনুধাবন করিয়া দেখার পরে, এই কার্য্য যে কোন দেশীয় লোক দ্বারা হয় নাই, সাহেবের দ্বারা হইয়াছে, তাহাই স্থির হইল। কারণ মৃত শরীরের এবং

বৃক্ষের অভ্যন্তরিক অবস্থা দৃষ্টে সকলেরই প্রতীয়মান হইল যে বিনা যুদ্ধে হত্যাকারী ব্যক্তি হতার প্রাণ নষ্ট করিতে পারে নাই এবং বিলক্ষণ প্রমাণ দৃষ্ট হইল যে, মৃত সাহেবটি আপনার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই রূপ সংগ্রাম সাহেবের সহিত বাঙ্গালীর সম্ভব পায় না অতএব পুলিশ কর্ম্মচারীরা দেশী ভৃত্যদিগের উপরে শোভা সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়া, কোন্ সাহেব কর্ত্তৃক এই খুন হইল তাহার অনুধাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেবকে কি কারণে বধ করা হইল, তাহার ও কোন দ্রষ্টব্য কারণ বুঝিতে পারিল না; কারণ খুনের সঙ্গে বরফ গুদামে কোন দ্রব্য অপহৃত হয় নাই এবং সাহেবটিও বিলাত হইতে নবাগত, এবং তাঁহার সহিত কাহারও কোন বিবাদ বিসম্বাদ ছিল বলিয়া কেহ জানে না, অতএব বিনা কারণে হঠাৎ একরূপ খুন হইতে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। কলিকাতা সাহেব মণ্ডলীর মধ্যে এই ব্যাপারে অত্যন্ত আশঙ্কা উপস্থিত হইল। প্রত্যেক সাহেবের মনে ভয় হইল যে এই নরঘাতক ধৃত না হইলে প্রশ্রয় পাইয়া পুনরায় আর এক জনের প্রতিও ঐ রূপ ব্যবহার করিবে। তখন বড় লাট সাহেবেরা বৎসরের অধিক ভাগই কলিকাতায় কাটাইতেন, সিমলা মরাটু কিম্বা দারজিলিঙ্গের নাম কেহ জানিত না, জানিলেও ঐ সকলে যাওয়ার অবশ্যকতা বিলাসভোগী সাহেবদিগের মনে উদ্ভূত হয় নাই। আমার ঠিক স্মরণ নাই কিন্তু বোধ হয় মহা পরাক্রান্ত লর্ড ডেলহৌসীই সেই সময়ে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল ও বঙ্গদেশের গবর্ণর ছিলেন। বাঙ্গালায় লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের পদ সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বড় লাট বাঙ্গালারও ছোট লাট হইতেন এবং যদিও তাঁহার অধীনে বাঙ্গালার জন্য ডেপুটী গবর্ণর খ্যাতিতে এক জন উচ্চ কর্ম্মচারী ছিল তথাপি প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালা বেহার এবং উড়িষ্যার মূল শাসন ভার বড় লাটের উপরেই ন্যস্ত ছিল—। গবর্ণর জেনেরেল এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ অবগত হইয়া মৃত সাহেবের প্রতি ঐকান্তিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কঠিন হুকুম প্রচার করিলেন যে কলিকাতার পুলিশ কর্ম্মচারীরা হত্যাকারী ব্যক্তিকে আবিষ্কার করিয়া দণ্ডনীয় করিতে অসমর্থ হইলে, তাহাদের সকলকে তিনি কর্ম্মচ্যুত করিবেন। কলিকাতার সাহেবমণ্ডলীর মধ্যেও এই বিষয় সম্বন্ধে যার পর নাই সহানুভূতি উদ্ভূত হইল এবং সাহেবেরা সকলে পুলিসের সাহায্য করিতে কৃত সংকল্প হইলেন।

পুর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে এই সময় ল সাহেব কলিকাতার পুলিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি ইত্যগ্রে শান্তিপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখনও বোধ হয় কলিকাতায় নূতন পুলিসের সৃষ্টি হয় নাই পুরাতন চৌকীদারী পুলিস ছিল এবং নূতন পুলিস হইয়া থাকিলেও তাহা অতি অল্প দিনের সৃষ্টি এবং বর্ত্তমানের ন্যায় তখন পৃথক পৃথক কার্য্যের জন্য পৃথক পৃথক রকমের সুশিক্ষিত অধিক সংখ্যার কর্ম্মচারী ছিল না সুতরাং এই হত্যাকাণ্ডের দণ্ডের গুরুতর ভার এক মাত্র ল সাহেবের স্কন্ধেই পতিত হইযাছিল। ল সাহেব বিবেচনা করিলেন যে বরফ গুদামের সাহেবকে বধ করার কার্য্যে কোন ভদ্র সাহেবের যোগ থাকিলেও তাহার সহিত অবশ্যই দুই এক জন ইতর গোরা লিপ্ত ছিল এবং বধের কার্য্যটা সেই ইতর গোরা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইযাছে, অতএব তাহাকে ধরিতে পারিলেই সমুদায় কথা প্রচারিত হইবে। তজ্জন্য তিনি লাল-বাজার, কসাইটোলা, চান্দনী প্রভৃতি যে সকল স্থানে জাহাজী এবং ইতর গোরাদিগের থাকিবার নিমিত্ত হোটেল এবং বাসা-বড়ী সকল সংস্থাপিত আছে, তাহার মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে গবর্ণমেণ্ট এবং বরফ গুদামের কর্ত্তৃপক্ষরা যে ব্যক্তি এই বিষয়ের যথার্থ সংবাদ দিতে পারিবে তাহাকে অনেকটাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া স্থানে স্থানে ঘোষণা পত্র লটকাইয়া দিলেন। এইরূপ কয়েক দিন চেষ্টার পরে ল সাহেব একজন হোটেলওয়ালার নিকট কথায় কথায় শুনিতে পাইলেন যে হত্যাকাণ্ডের দুই এক দিবস পূর্ব্বে সে দুই জন গোরাকে তাহার হোটেলের এক নির্জ্জন কোণে বসিয়া অনেক গোপনে পরামর্শ করিতে দেখিয়াছিল। কিন্তু কি বিষয়ে তাহারা পরামর্শ করিতেছিল, তাহা সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে নাই এবং জানেও না। উহার দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি তাহার হোটেলে বাস করিত, দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্য স্থানের অধিবাসী। তাহার হোটেলে যে ব্যক্তি বাস করিত, সে সেই দিবস ধরিয়া আমেরিকা যাত্রী এক জাহাজে নাবিকের কর্ম্ম লইয়া সেই জাহাজে চলিয়া গিযাছে কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির সংবাদ অর্থাৎ সে কোন হোটেলে থাকে কিম্বা কি কার্য্য করে তাহা সে অবগত নহে। লো সাহেব এই সংবাদ পাইয়া অনেক অনুসন্ধানের পরে এক ব্যক্তিকে সন্দেহ করিয়া ধৃত করেন এবং হোটেলওযালাও তাহাকে চিনিল। প্রথমে সে ইহার কিছুই জানে না বলিয়া প্রকাশ করে কিন্তু সাহেব বোধ হয় অগ্রে

তাহাকে কিঞ্চিৎ যন্ত্রণা দিয়া পরে অনেক প্রলোভন দেখানতে সে স্বীকার করিল যে ঘটনার দুই তিন দিবস পূর্ব্বে বরফ ক্রয় করিতে যাইয়া বরফগুদামের ঘরে ঘরে বেড়াইয়া তাহাতে কয়েকটা লোহার সিন্দুক দেখিয়া তাহার মধ্যে তাহার অনেক টাকা থাকার বিষয় সন্দেহ হইয়াছিল। ইহা বলিবার আবশ্যক নাই, যে কলিকাতার সকল স্থানেই কি ইতর কি ভদ্র সকল প্রকার সাহেবের অবারিত দ্বার। প্রহরীরা অপরিচিত সাহেব দেখিলে কিছু বলে না সুতরাং তাহারা যেখানে ইচ্ছাপদার্পণ করিতে পারে। এই সাহেব তাহার পর দিবস পুনরায় বরফগুদামে যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া কত টাকা মৌজুদ আছে এবং কে কোন স্থানে শয়ন করে ইত্যাদি তাহার আবশ্যকীয় সমুদায় তথ্য অবগত হইল এবং টাকা অপহরণ করার মানসে যড়যন্ত্র করিয়া এক জন সঙ্গীর চেষ্টায় বাহির হইল। অবশেষ এস বেরী নামক এক আমেরিকান যুবক নাবিকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে বেরী তাহার সহকারী হইতে সম্মত হইল। ইহাদের এক পরামর্শের সময় লো সাহেবের সংবাদদাতা হোটেলওয়ালা তাহাদিগকে দেখিয়াছিল। পর দিবস প্রাতে পুনরায় সেই চোর বরফগুদামে যাইয়া টাকা পূর্ব্ববৎ সেই স্থানে থাকিতে দেখিয়া আইসে। সন্ধ্যার সময় বেরীর সহিত একত্র হইয়া দুই জনে অধিকরাত্রে জানালা দিয়া বরফগুদামের ভিতর প্রবেশ করে। প্রধান ব্যক্তির নিকট তালা কুলুপ খুলিবার ইস্পাতের শলাকা ও দ্বার ও জানালা ভাঙ্গিবায় করাত ও বেতী ও দুইজনের কোমরে নাবিকের ছুরী ভিন্ন আর কোন অস্ত্র শস্ত্র ছিল না। কিন্তু গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহারা যাহা দেখিল তাহাতে তাহারা অত্যন্ত নৈরাশ হইল। কারণ দেখিল যে প্রাতে যে যে স্থানে সিন্ধুক ছিল সেখানে তাহা নাই বারান্দায় খোলা পড়িয়া রহিয়াছে, ইহাতে তাহারা অনুভব করিল, যে মুদ্রা সকল দিনের মধ্যেই স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এইরূপ নিরাশ্বাস হইয়া প্রধান চোর বেরীর হাত ধরিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল কিন্তু বেরী তাহা না শুনিয়া যে ঘরে পীড়িত সাহেবটি শয়ন করিয়াছিল তাহাতে প্রবেশ করিল দেখিয়া সে বাহিরে দাঁড়াইয়া বেরীর প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। বেরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে পরে ঐ ব্যক্তি বাহির হইতে শুনিতে পাইল যেমন ঘরের ভিতরে কেহ হাতাহাতি করিতেছে কিন্তু কি হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিল না এবং ঘরে প্রবেশ করিতেও সাহস করিল না।

কিয়ৎকাল পরে বেরী ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে অতি ব্যস্ত ভাবে বাহিরে আসিয়া তাহার সঙ্গীকে "চল' বলিয়া সম্বোধন করিল। সঙ্গী দেখিল যে বেরী উন্মাদের প্রায় হইয়াছে, সে বেরীর হস্ত ধরিতে তাহা সিক্ত বোধ হওয়াতে মনে করিল যে শরীরের ঘর্ম্ম দ্বারা তাহার বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বরফ গুদাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পরে পথের প্রদীপের আলোতে দেখিল যে বেরীর পোষাক ও শরীর রক্তে রক্ত ময়। বেরীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কহিল যে সে ঐ ব্যাটাকে খুন করিয়া আসিয়াছে এবং শীঘ্র নদীতে যাইয়া রক্ত ধুইয়া ফেলিতে চাহিল। যদিও সে স্থান হইতে নদী অনতি দূর ছিল তথাপি নদী ধারের রাস্তার বহু দেশী এবং সাহেব প্রহরী থাকে বিশেষ গোরা নাবিকেরা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেই রাস্তা দিয়া গতিবিধি করে অধিকন্তু ঘাটে ঘাটে সহস্রাধিক দেশী নৌকা ও জাহাজ লাগান আছে জানিয়া সেই অবস্থায় তাহাকে লইয়া নদীধারে রাস্তায় যাওয়া বিঘ্ন বোধ করিলাম। অতএব তাহাকে লালদিঘির মধ্য দিয়া পরে মেঙ্গোলেন প্রভৃতি ছোট ছোট গলি অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মতলার পশ্চিম দিকে এক জলের প্রণালীর নিকট উপস্থিত হইলাম এবং প্রণালীর মধ্যে বেরীর শরীর ও বস্ত্র ধৌত করিয়া তাহার রুমাল যাহাতে অত্যন্ত রক্ত লাগিয়াছিল তদ্দারা তাহার ছুরীখানা বেষ্টন করিয়া প্রণালীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। তদন্তর বেরী সেই আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া সঙ্গীর সহিত বিদায় হইয়া জাহাজে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পরে বেরীর সহিত তাহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই, শুনিয়াছে যে বেরীর জাহাজ তাহার পর দিবসেই পরমিট মুক্ত হইয়া কলিকাতা বন্দর হইতে রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। ল সাহেব ঐ ব্যক্তির কথা পরীক্ষা করায় নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তাহাকে লইয়া সেই প্রণালী অন্বেষণ করিলেন এবং তাহার মধ্যে বেরীর ছুরী ও রুমাল প্রাপ্ত হইলেন। অতএব তাহার কথায় প্রতি আর কোন সন্দেহ না থাকাতে তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে তাহার দুই দিবস পূর্ব্বে একখানা জাহাজ খুলিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহা এখনও ডায়মণ্ড-হারবার পার হইয়া সমুদ্রে যায় নাই।

বর্ত্তমান সময়ের বিদ্যুৎদ্বারা চালিত বিশ্বব্যাপী ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের পূর্ব্বে যে-প্রকার টেলিগ্রাফ ছিল, তাহা কি আমার যুবা পাঠকগণ অবগত আছেন? তাহা সাহেবেরা সিমাফোর টেলিগ্রাফ বলিয়া অভিহিত করি-

তেন। স্থানে স্থানে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবধানে একটা উচ্চ স্তম্ভের উপরে একটা দীর্ঘকাষ্ঠের মাস্তুলের গাত্রে ছিদ্র করিয়া কয়েকখানা তক্তা এমন ভাবে লাগান থাকিত যে তাহা স্তম্ভের মধ্য হইতে দড়ি দ্বারা টানিলে মাস্তুলের উভয় ধারে ঐ সকল তক্তা উঠিত ও নামিত এবং সেই তক্তা গুলীর উঠা নামার পরিমাণেই কথার এবং অক্ষরের ইঙ্গিত হইত। ইহার একটি কলিকাতায় এক্সচেঞ্জে ঘরের ছাদের উপরে, দ্বিতীয়টি কেল্লার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যে স্তম্ভের উপর হইতে গোলা পড়িলে এইক্ষণে দুই প্রহর এক ঘণ্টার তোপ-ধ্বনি হয় সেই স্তম্ভের উপরে এবং ঐ রূপ ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকে- ডায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত কতকগুলি স্তম্ভ ছিল এবং উহাদের দ্বারাই তখন জাহাজের সংবাদ আসিত এবং যাইত। এই টেলিগ্রাফে দিবস ভিন্ন রাত্রে কোন কার্য্য হইত না এবং এখন যেমন ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের দ্বারা চক্ষের পলক মধ্যে সহস্র ক্রোশ হইতে সংবাদ আইসে তখন তাহা হইত না। কলা-গাছিয়া হইতে কলিকাতায় পুরাতন টেলিগ্রাফের দ্বারা সংবাদ আসিতে অন্তত তিন চারি ঘণ্টার কমে হইত না। কিন্তু এত বিলম্ব হইলেও সেই ধীর গতি টেলিগ্রাফের দ্বারা অনেক উপকার হইত। বেরীর জাহাজ কলা-গাছিয়া পার হইয়া যায় নাই শুনিয়া ল সাহেব সেই স্থানে তিনি না পৌঁছিলে জাহাজ সমুদ্রে যাইতে না পারে এবং জাহাজ হইতে কোন নাবিক তীরে আসিতে না পারে তদ্বিষয়ে ডায়মণ্ড হারবারের জল পুলিসের কর্ত্তা সাহেবের নিকট টেলিগ্রাফের সংবাদ পাঠাইয়া নিজে তাঁহার সংবাদ দাতা চোর ও কয়েক জন সাহেব পুলিশ কর্ম্মচারীর সমভিব্যাহারে এক দ্রুতগামী নৌকায় বেরীকে ধরিবার নিমিত্ত ডায়মণ্ড হারবার মুখে যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে তাঁহার নৌকা জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলে, জাহাজের সমুদায় নাবিক কি জন্য পুলিশের নৌকা জাহাজে আসিতেছে তাহার কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত জাহাজের ধারে আসিয়া খাড়া হইল কিন্তু বেরীই বুঝিতে পারিল যে তাহার অদৃষ্টে আগুণ লাগিয়াছে, অতএব সে অন্যান্য নাবিকের ন্যায় জাহাজের ধারে না আসিয়া গুপ্ত ভাবে জাহাজের পিছাড়ায় কাছি অবলম্বন করিয়া হাইলের পার্শ্বে নামিয়া সেই স্থানে সমস্ত শরীর ডুবাইয়া কেবল মাথাটা জাগাইয়া রহিল; ভাবিল যে কেহ আর সেই খানে তাহাকে অন্বেষণ করিবে না। কিন্তু পুলিষের কর্ম্মচারীরা জাহাজের কাপ্তেন সাহেবের সাহায্যে তাহাকে তাহার

গুপ্ত স্থানে আবিষ্কার করিয়া জল হইতে টানিয়া তুলিল এবং তাহার সঙ্গী লোক তাহাকে তৎক্ষণাৎ বেরী বলিয়া সনাক্ত করাতে ল সাহেব তাহাকে হাতকড়ি দিতে উদ্যত হইলে সে তাচ্ছল্য ভাবে বলিয়া উঠিল যে "অনর্থক কেন কষ্ট পাও, আমি খুন করিয়াছি, ইচ্ছা করিলে আমার * * * ফাঁসী দিয়া আমাকে ঝুলাইতে পার, "Now hang me by my * * *।" তদনন্তর কলিকাতায় আনিত হইলে সে প্রধান মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে যে একবার করিয়াছিল তাহার স্থূল মর্ম্ম আমার এই রূপ স্মরণ হইতেছে। "আমি আমেরিকার দেশের এক ভদ্র লোকের সন্তান, আমার বয়স ২০ বৎসরের অধিক নহে কিন্তু স্বদেশে নরহত্যা ও চুরি প্রভৃতি কুকার্য্য করায় আমার পিতামাতার ও পুলিসের দৌরাত্মে আমি এক জাহাজের নাবিক হইয়া ভারতবর্ষে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলাম। পরন্তু এখানে আমার চিত্ত স্থির না হওয়াতে অন্য স্থানে যাইয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করার নিমিত্ত পুনরায় এক জাহাজের নাবিক হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ইতমধ্যে জাহাজ খুলিবার অল্পকাল পূর্ব্বে এই ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বরফ গুদামে চুরি করিলে অনেক টাকা পাইবার প্রলোভন দেখাইয়া আমাকে সেই কার্য্য করিতে সম্মত করে। বহু ধনের কথা শুনিয়া আমার আশা হইয়াছিল যে তাহা হস্তগত করিতে পারিলে, আমি পুনরায় স্বদেশে যাইয়া আমার পিতামাতার স্বাধীন হইয়া সচ্ছন্দে থাকিতে পারিব এবং যেহেও জাহাজেও শীঘ্র কলিকাতা হইতে খুলিয়া যাইবে অতএব চুরির পরে কলিকাতার পুলিসও আমাকে ধরিতে পারিবে না। এই সকল কথা ভাবিয়া আমার মনে অত্যন্ত সুখের আশা হইয়াছিল অতএব যখন বরফ গুদামের সকল ঘর অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম যে কিছুই পাইলাম না, তখন নৈরাশে আমার অনন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল। একবার ভাবিলাম যে আমার সঙ্গীকে হত্যা করি কিন্তু পরক্ষণে একটা ঘরের সম্মুখে আসিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলাম এবং খাটের উপরে একজন পুরুষ শয়ন করিয়া আছে দেখিয়া তাহার মশারি উঠাইয়া তাহার বক্ষস্থলে এক চপেটাঘাত করিলাম। কি কারণে আমি ঐ রূপ কার্য্য করিলাম তাহা আমি এখনও আপনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু মানুষ দেখিয়া তাহাকে আমার মারিতে ইচ্ছা হইল এবং আমি সেই বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার শরীরে

হস্তক্ষেপ করিলাম। কিন্তু সেই পুরুষটি পীড়িত হইলেও তাহার স্নায়ুতে এঙ্গ্লো স্যাকসন জাতীয় শোণিত বহিতেছিল, অতএব আমার আঘাত প্রাপ্ত হইবামাত্র সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া আমাকে ধরিতে চেষ্টা করাতে আমি আমার ছুরীর দ্বারা তাহাকে সাজ্ঘাতিক কয়েকটা আঘাত করিলে সে শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমি বোধ করি যে পীড়ার গতিক তাহার কায়িক দুর্ব্বলতা না থাকিলে আমি তাহাকে পরাজয় করিতে পারিতাম না। সে যাহা হউক খাটের উপর অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িল দেখিয়া আমি তাহাকে নামাইয়া ঘরের এক কোণে রাখিলাম এবং যাহাতে পুনরায় জীবন প্রাপ্ত না হয় তজ্জন্য আরও দুই এক ছুরীব আঘাতে তাহার প্রাণ সংহার কবিলাম। তদনন্তর যে যে কার্য্য কবিয়াছিলাম তাহা আমার সহকারীর বর্ণনাতেই ব্যক্ত হইয়াছে এবং তদ্বিষয়ে আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই। মোট কথা এই যে আমার সঙ্গী এই হত্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।'

ল সাহেবের খুব প্রশংসা ও পদ বৃদ্ধি এবং বেরীর ফাঁসীর হুকুম হইল। কিন্তু মনুষ্যের হৃদয়ের এমনই গতি যে বেরীর অল্প বয়স দেখিয়া এবং বোধ হয় বাঙ্গালীর সম্মুখে একজন সাহেবের ফাঁসীর হুকুম প্রচারিত হওয়ার ভয়ে কলিকাতায় বহুতর পাদ্রী ও সাহেবেরা একত্র হইয়া তাহাকে ক্ষমা করিতে কিম্বা ফাঁসীর পবিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ রাখিতে লাট সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই দুরাচার নরঘাতকের প্রতি অন্যায় সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া সুপ্রিম কোর্টের দণ্ডাজ্ঞার প্রতি হস্তক্ষেপণ করিলেন না। বেরীর কলিকাতায় ফাঁসী হইল।

স্বভাব ও অভ্যাস।

(হিন্দুজাতির পক্ষে)

এক্ষণে স্বভাব ও অভ্যাস লইয়া আমাদের মধ্যে বড় একটা গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে। আমরা সহজ বুদ্ধিতে দুইএর এইরূপ অর্থ করি। যেটী যাহার শৈশব সংস্কার, সেইটাই তাহার স্বভাব। যেটী পুনঃ পুনঃ কার্য্য ও ধৈর্য্য-

বৃত্তি লব্ধ হয়, তাহাই অভ্যাস। মনুষ্যের স্বভাব হাস্য প্রবণতা কিন্তু অভ্যাসদ্বারা হাস্যকে সম্বরণ ও দমন করা যায়। তবেই কোন একটী কার্য্যফলকে প্রকৃত স্বভাব বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি না। একটী বালকের স্বভাব অমনোযোগিতা ও আলস্য। কিন্তু শিক্ষা, যত্ন ও অভ্যাস দ্বারা তাহাকে মনোযোগী ও পরিশ্রমী করা যাইতে পারে। এটী একটী বড় সত্য কথা যে শিশু ও বালকের স্বভাব অনেকটা কুল ও পিতৃ মাতৃ পরম্পর আগত ও লব্ধ। তাহা না হইলেই বা একটী বালক সাক্ষাৎ স্বভাব সম্বন্ধে অন্য একটীর অনুরূপ হয় না কেন? কতকগুলি বৃত্তি অভ্যাস দ্বারা শাসিত ও চালিত হয়, আর কতকগুলি হয় না। একটী অলস বালককে অনায়াসেই পরিশ্রমী করিতে পারা যায়, কিন্তু একটী নির্ব্বোধ বালককে বুদ্ধিমান্ করে কাহার সাধ্য? ইহাতে আর ও বোধ হইতেছে যে কতকগুলি বৃত্তি আন্তরিক ও অভ্যাস সাপেক্ষ নয়, অন্য কতকগুলি বাহ্যিক ও অভ্যাস দ্বারা বশীকৃত ও পোষিত হয়। একটী বালক স্বভাব কবি—বাল্যকালেই গৃহের কোণে বসিয়া কবিতা রচনায় মগ্ন, আর একটীর হৃদয়ে হয়ত বিন্দু মাত্র রস ও কবিত্ব নাই—কেবল নীরস ও কঠোরতাময়।

স্বাভাবিক যাহা তাহাসমস্তই সুন্দর—স্বভাবের সুষমা বর্ণনাতীত, স্ত্রীজাতির লজ্জাশীলতা, ধীরতা, নম্রতা ও কোমলতা স্বভাব। যে রমণীতে এইগুলির অভাব আছে তাহাতে স্বাভাবিকতার অভাব আছে—অতএব তিনি প্রকৃত রমণী পদ হইতে কিঞ্চিৎ স্খলিত হইলেন। যাঁহাতে এতগুলি পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান আছে তিনি আদর্শ-রমণী, তিনিই রমণী রত্ন, তিনি স্বভাবের শোভা। যে রমণীতে এগুলির একটীও নাই তাঁহাতে রমণীর রমণীয় বিন্দু মাত্র নাই। পুরুষের স্বভাব, সাহস, ধৈর্য্য, বীর্য্য ও প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব। এগুলি যে পুরুষে নাই, তাহাকে পুরুষ বলা বিড়ম্বনা, কারণ তিনি পুরুষের স্বাভাবিক গুণের আধার নন। শিশুর হাসিতে স্বাভাবিকতা আছে বলিয়াই তাহাতে এত মধুরিমা ও সরলতা আছে—সেই জন্য সে হাসি এত প্রীতিকর ও সুখপ্রদ। যে সেই হাসি হাসিতে পারে, জানিব তাহার মন বাস্তবিক নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক ও বিমল আনন্দে পরিপ্লুত। শিশুর নয়নে মাধুরী, জ্যোতি ও আকর্ষণশক্তি আছে বলিয়াই যিনি নিজের নয়নে শিশুর নয়নের ছায়া দর্শাইতে পারেন, তিনিই আনন্দ সাগরে ভাসমান বলিয়া বোধ হয়।

যে লোক শৈশবকালের বাহ্যিক ও আন্তরিক সৌন্দর্য্য ও কোমলতা বরাবর রক্ষা করিতে পারেন তাহার দেহ সচ্ছন্দ, মন প্রফুল্ল ও হৃদয় প্রশস্ত হয়। সকল লোকেরই হৃদয়ের অভ্যন্তরে একটী স্বভাবজাত বৃত্তি আছে, যাহা দ্বারা লোক পাপ করিলে অনুতাপ করে, দুঃখের পরে অনুশোচনা করে। কেহ কেহ বলেন এটী সংস্কার জনিত, কেহ কেহ বলেন এটী একটী অভ্যাসলব্ধ ধন; কিন্তু আমরা ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করি। আমাদের জীবনের সৎকার্য্যই প্রকৃতি; অসৎ কার্য্য বিকৃত মাত্র। কেন না পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে পাপের প্রতি আন্তরিক বিরাগ ও বিতৃষ্ণা জন্মে—কিন্তু পুণ্যকর্ম্মের পক্ষে তাহা হয় না। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বত্র ও আজীবন সম্ভব ও রুচিকর—ইহার প্রতি বিরাগ নাই বিতৃষ্ণা নাই। ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে আমরা স্বতঃই মুগ্ধ হই, শিশুর কোমলতায় ও সরলতায় যে স্বাভাবিকতা আছে তাহাতে পাপের স্পর্শ, কুরুচির কলঙ্ক নাই। এই রূপে আবার বিপরীত যুক্তি অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হয় যে, যে কার্য্যের পৌনপুনিক অনুষ্ঠান কখন না কখন ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা জন্মে তাহাই পাপ। আর যে কার্য্যের অনুষ্ঠান, যে কার্য্যের স্মৃতি চিরকালই সমভাবে আদরণীয় ও প্রীতিদায়ক তাহাই পুণ্য ও সৎ। এক্ষণে দেখা যাউক স্বভাব সময়ে সময়ে অভ্যাসের দ্বারা অনুশাসিত হইয়াও কিরূপে নিজের সৌন্দর্য্য-ছটা ও রূপের শোভা বিস্তার করিতেছে। অভ্যাসের বল স্বভাবের রূপের হ্রাস করিতে পারে না ও প্রচ্ছন্ন রাখিতে ও পারেন না। "ঢাকাই মলমলে খেসারির ডালের ন্যায়" সে রূপের আভা বাহির হইয়া পড়িবে—কোন মতে তাহার হ্রাস হয় না।

স্যর উইলিয়ম জোন্সের বাল্য শিক্ষক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে ঐ বালকটীকে যদ্যপি নির্জ্জন প্রান্তরে একাকী রাখিয়া আসা যায়, তাহা হইলেও সে এক মহৎ লোক হইবে। বাস্তবিক স্বাভাবিক গুণাবলী কদাচ প্রচ্ছন্ন থাকে না। সে গুণের জ্যোতিঃ অন্যের উত্তেজনা ও সাহায্য ব্যতিরেকে দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ হয়। প্রতিভা-সম্পন্ন বালকের শিক্ষার আবশ্যক করে না—তাহার প্রতিভার কিরণ লোকের চক্ষুর উপর পড়িবেই; কিন্তু এই মাত্র প্রভেদ উপস্থিত হয় যে, স্বভাবত যে কিরণটীর গতি একদিকে অভ্যাস ও শিক্ষা দ্বারা তাহার গতি অন্য দিকে ফিরান যাইতে পারে। সেই

রূপ স্বভাবত যে নির্ব্বোধ ও প্রতিভাশালী নয়, তাহাকে সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও বুদ্ধিমান্ করা যায় না.। আর যদিও চেষ্টায় ও অভ্যাসে কিঞ্চিৎ সিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু ইহাতে তাহার অন্যান্য গুণের ব্যত্যয় ও বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে। স্বভাব অভ্যাস শাসিত হইলে ইহার তেজ অন্তর হইতে প্রকাশ পায়— কিছুতেই ইহার সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য মলিন করা যায় না।

এইরূপ তর্কে অনেকটা অদৃষ্টবাদের আভাস আসিয়া পড়িতেছে কিন্তু বাস্তবিক এরূপ হয় কেন ? জোন্সের গুরু যে কথাটী বলিয়াছিলেন তাহাতে কিঞ্চিৎ অত্যুক্তির ছটা আছে। তাহা এইরূপ; মানুষের যে কোন কার্য্যই তিনটী তত্ত্বদ্বারা শাসিত হয়—অদৃষ্ট, কাল ও পুরুষকার। অর্থাৎ শুদ্ধ অদৃষ্টের সাহায্যে, কিম্বা শুদ্ধ কালের গতিতে কিম্বা শুদ্ধ পুরুষকারের সাহায্যে কার্য্য হয় না। কোথাও দুইটীর কোথাও বা তিনটীর সমাবেশ আবশ্যক। জোন্সের শিক্ষক বলিতে পারিতেন না যে তিনি দ্বাদশ বর্ষ বয়সে আদালতে বিচারপতি হইবেন—কিম্বা তিনি যদ্যপি গুণের পরিচয় না দিয়া মরিয়া যান তাহা হইলে তাঁহার যশোরাশি বিক্ষিপ্ত হইবে ও প্রতিভার বিকাশ হইবে। ভবিষ্যদ্বাণী বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে—তাই বলিতে-ছিলাম কাল ও পুরুষকার এই দুইটী অদৃষ্টের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করে—ইহাতে শিক্ষার আবশ্যক করে না বা অভ্যাসের প্রয়োজন করে না। পুরুষকার ও অদৃষ্ট ও কালের সাহায্যেই লোকে বড় লোক হইয়াগিয়াছে— মহত্ত্ব শিক্ষা সাপেক্ষ নয়, তাহা হইলে আর পার্ব্বত্য Arago ফ্রেঞ্চদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইত না। এই সমস্ত কারণবশতঃ আমরা কাল ও পুরুষ-কারকে তাদৃশ প্রয়োজনীয় মনে করি না বলিয়া অদৃষ্টকেই প্রাধান্য দিয়া থাকি। বাস্তবিক অদৃষ্টবশেই শিশু ও বালকের যে যে কার্য্যাবলীর প্রকাশ তাহাই তাহার স্বভাব। কালক্রমে অদৃষ্ট কাল ও পুরুষকারের সহিত যুক্ত হইয়া যে যে কার্য্যাবলী সংঘটিত হয় তাহাই মনুষ্যের পরিণত অবস্থার পরিচায়ক। তবেই অদৃষ্টই প্রধান, পুরুষ একটী কারণ মাত্র—কালটা একটা গোণতত্ত্ব কিন্তু অদৃষ্টের সহিত সংপৃষ্ট ও সংশ্লিষ্ট। এই সম্বন্ধে ভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন—

নচমাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীন বদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

অপিচ,

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব।
জিত্বাশত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ রাজ্য সমৃদ্ধং॥
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব।
নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥

স্বভাবটা কতকটা অভ্যাসের দ্বারা সংগঠিত হয় বটে কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে নয়। অভ্যাস একটি বাহ্যিক শক্তি যাহা স্বভাবকে অনেকাংশে ভাবান্তরিত ও রূপান্তরিত করে। কিন্তু তাহার আতিশয্যের ব্যত্যয় হয় না। এইরূপে এক মতে অভ্যাসটাও কতকটা স্বভাবের দাস। মনুষ্য বাল্যকালে অশিক্ষা-গ্রস্ত হইলে তাহার স্বভাবানুযায়ী কার্য্য করে—ইহার অবশ্য কতকগুলি সৎ ও উদ্দেশ্য যুক্ত ও কতকগুলি অসৎ ও উদ্দেশ্য-বিহীন। এইরূপ স্বভাবানু-যায়ী কার্য্য করিতে করিতে কালক্রমে তাহার ক্রমশ এই কার্য্য কলাপ অনে-কাংশে অভ্যস্ত হইয়া যায়—তখন সে স্বভাবের সৌন্দর্য্য কোমলতা কমনীয়তা অনুভব করিতে পারে। কিন্তু যে স্থলে অভ্যাস স্বভাবের দাস হইয়া মানব চরিত্রের বিচিত্রতা উৎফুল্লতা ও স্বাধীনতা সম্পাদন করে তাহার ন্যায় সুন্দর ও আশ্চর্য্য প্রণালী আর নাই। যে স্থানে স্বাভাবিক রমণীয়তার ও বৈচি-ত্রের হ্রাস সেই স্থানেই মানসিক সুখ ও স্বচ্ছন্দতার অভাব। বাহ্যিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হইয়া স্বভাবের অনুকরণ করিয়া অর্থে বিতৃষ্ণ হইয়া বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত না হইয়া যে শুদ্ধ স্বাভাবিক নিয়মে, স্বভাবের উদ্দমতার উপর নির্ভর করিয়া, স্বভাব সুন্দরপ্রদেশ অবস্থিতি করিয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য স্পর্শে চলিয়া স্বভাবের গতিতে চালিত হইয়া অবস্থিতি করে, তাহারই সুখ ও স্বচ্ছন্দ অধিক। যে দেশে স্বাভাবিকতা অধিক সেই দেশ সর্ব্বকালে সুখ-দায়ী ও সর্ব্বদা স্বাস্থ্যকর। যে দেহ স্বাভাবিক নিয়মে চালিত হয়, সে দেহে রোগ শোক কম। যে সংসারে স্বাভাবিক প্রথার প্রচলন তাহাতে শান্তির লক্ষণ অধিক। যে গৃহে লোকে স্বাভাবিক নিয়মে চলে তাহা সভ্যতা বিগ-র্হিত কার্য্যের আবাস স্থান হইলেও স্বর্গ। যে স্বভাবজাত ফলমূলাদি আহার করে তাহার অভাব বড় কম—অভাব কম হইলেই সুখ বেশী। যিনি আবার

সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বভাব সৌন্দর্য্যের গুণ গ্রহণ পূর্ব্বক কাল্যাতিপাত করেন ন পরম পুরুষ।

উপন্যাস।

উপন্যাস-বিচারে দুইটি বিষয় প্রতিই সমান দৃষ্টি রাখিতে হয়—উপন্যাসের উদ্দেশ্য ও উপন্যাসের শিল্প-নৈপুণ্য (art)। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে উপন্যাসের উদ্দেশ্য বা বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে চাহি।

উপন্যাসের উদ্দেশ্য যদি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয়, তবে আর তাহা পৃথক করিয়া ভাবিতে হইবে কেন? সব উপন্যাসের যখন উদ্দেশ্য একই হইল, তখন উপন্যাস-বিচারে সে উদ্দেশ্য নূতন করিয়া ভাবিবার আবশ্যকতা কি? বিচার ত তুলনা দ্বারা? তবে যাহা সকল গ্রন্থেই এক, বিচারকালে সেটি ত ভাবিবারই দরকার নাই—এইরূপ প্রশ্ন সহসা মনে উঠিতে পারে। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি যে উপন্যাসের উদ্দেশ্য, এ কথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই বলি যে, 'সৌন্দর্য্য' এইখানে ইহার বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কথার অর্থ লইয়া কলহ করিতে গেলে, অনেক কথা বলিতে হয়, আমরা এখানে সেরূপ করিতে প্রস্তুত নহি। স্বীকার করিয়া লইলাম যে, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই সকল প্রকার চরিত্রের, সকল প্রকার উপন্যাসের উদ্দেশ্য। এই সৌন্দর্য্য যখন একটা গুণ তখন ইহার বিভাগ অসম্ভব; সুতরাং স্বীকার করি সকল প্রকার উপন্যাসেরই উদ্দেশ্য একই প্রকার। কিন্তু এই গুণটি অবশ্য কোনও কিছুগত এবং এই কোনও কিছুর সহিত যোগেই ইহাকে সৃষ্টি করিতে হইবে, তবে সেই সৃষ্ট পদার্থটির প্রকার ভেদ থাকা সম্বন্ধে তর্ক না থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাস বা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য বা বিষয় আছে, এ কথাও নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে। ফলত ইহাই প্রকৃত কথা। উপরের কথা ভুল না হইলেও হয় অতি স্থূল, নহিলে অতি সূক্ষ্ম। শুদ্ধ সে কথা বলিলে এক প্রকার কিছুই বলা হয় না।

বিবিধ প্রকার ভাবাদিগত সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনই উপন্যাস-চরিত্র-স্রষ্টার সাক্ষাৎ লক্ষ্য। কিন্তু গৌণভাবে আরও একটি লক্ষ্য আছে।

সেটি পাঠকবর্গের চিত্ত শুদ্ধি বিধান। পাঠকের 'চিত্তকে সৌন্দর্য্য অনুভব করাইয়া ইহার চিত্তশুদ্ধি বিধানই কাব্যের ধর্ম্ম'—আমরা 'কাব্য' কথার অর্থ-গোলে না পড়িয়া বলিব—উপন্যাসের ধর্ম্ম। কাব্যের অন্যাংশ আমাদিগের আলোচ্য নহে। উপন্যাস এই দুইটি লইয়া—সৌন্দর্য্য ও চিত্তশুদ্ধি। কিন্তু এই পিণ্ডীকৃত অর্থ সমষ্টিকে কেহ কেহ সামান্য অর্থবোধক মনে করিয়া সময়ে সময়ে বড় প্রমাদে পতিত হইয়া থাকেন। কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে এই সৌন্দর্য্য প্রেমমূলক—শুদ্ধ তাহাও নহে, রমণী-প্রেমমূলক। কেহ কেহ এরূপ মনে করেন, নীতি বা ধর্ম্মতত্ত্ব হইলে, তথায় সৌন্দর্য্যের অবস্থান অসম্ভব ব্যাপার। প্রচলিত অর্থ হইতে বিভিন্ন অর্থযুক্ত অথবা বিস্তৃত বা অনির্দ্দিষ্ট অর্থযুক্ত কথার ব্যবহারে প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ একটা ফল দাঁড়ায়। আমরা বুঝি যে, চরিত্র লইয়া উপন্যাস, সেই চরিত্রে যাহা কিছু আছে, ধর্ম্ম হউক অধর্ম্ম হউক, পাপ হউক পুণ্য হউক, তদ্দারাই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা সম্ভব। যাঁহারা পাপ চরিত্র-দ্বারা আবার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি কি, বুঝেন না, তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই উপন্যাসের উদ্দেশ্য এ কথা বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু পাপচরিত্রে যে পুণ্যচরিত্রেরই সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়, উপন্যাস পাঠককে এ কথা বলিতে হইবে না। পাপ চরিত্র পুণ্য চরিত্রেরই ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। কেবলমাত্র ইহা লইয়াও উপন্যাস হইতে কোন বাধা দেখি না। ইহাও পুণ্যের সৌন্দর্য্য অনুভব করাইয়া চিত্তশুদ্ধি বিধানে সমর্থ। হৃদয়ের স্থায়ী ভাবমাত্রই লোকের নীতি হইতে পারে। চরিত্র ত এই স্থায়ী ভাব লইয়া? তবে উপন্যাস নীতিমূলক বলিতেই বা কি আপত্তি হইতে পারে? নীতির উল্লেখ অবশ্য উপন্যাসের কার্য্য নহে—নীতির ব্যাখ্যা বা তাহার কার্য্যাকার্য্য প্রদর্শনই উপন্যাসের কার্য্য। বঙ্কিম বাবু একস্থলে লিখিয়াছেন কাব্যগ্রন্থ মনুষ্য-জীবনের কঠিন সমস্যার ব্যাখ্যামাত্র। কাব্য অর্থ যেরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সংস্কারও কিছু অর্থ-বিস্তৃতি আবশ্যক, কিন্তু আমাদিগের আলোচ্য উপন্যাস সম্বন্ধে কথাটি বড়ই সুন্দর ও যুক্তিযুক্ত। উপন্যাস গ্রন্থ মনুষ্য-জীবনের সমস্যার ব্যাখ্যা মাত্র। কঠিন বা সহজ, উপন্যাসের বিচারকালেই দ্রষ্টব্য—উপন্যাস এই সমস্যা লইয়া। যাহাকে আমরা সচরাচর নীতি বলি, সেই নীতি এই ব্যাখ্যা হইতে সংগৃহীত। এই নীতিতে যুক্ত হইয়াই উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্ট হয়—

উপন্যাস সৃষ্ট হয়। নীতিকে প্রচ্ছন্ন রাখে, তাই স্থূলদৃষ্টিতে তাহা পরিদৃষ্ট হয় না। উপন্যাসের নীতি-ব্যাখ্যা অনাবশ্যকীয় কার্য্য নহে। কারণ ইহা বুঝিলে art ভাল বুঝা যায়। চিত্র ও চরিত্র এ সম্বন্ধে একরূপ নহে। চিত্রে ফুটাইতেই art নিয়োজিত হয়, চরিত্রে প্রচ্ছন্ন রাখিতেই art ব্যবহৃত হয়। কারণও বড় সুন্দর, কিন্তু তাহা বলিবার এ স্থান নহে।

উপন্যাসের এই যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হইল, উপন্যাসের প্রকৃত বিচারে তাহা নিতান্তই দ্রষ্টব্য বিষয়। এই উদ্দেশ্য বল, সমস্যা বল, নীতি বল, তত্ত্বল, ইহা না বুঝিলে, লিপি-নৈপুণ্য বুঝা যায় না। এই subject না বুঝিলে তৎপ্রতি নিয়োজিত art বুঝা যায় না। এই artএর মাত্রা না বুঝিতে পারিলে, উপন্যাসের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইল না এবং তাহা না হইলে উপন্যাসের বিচারই অসম্ভব।

দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

দুইটি চিত্রকর দুইটি চিত্র অঙ্কিত করিল। একটি সরল রেখার—অপরটি মনুষ্যমূর্ত্তির। প্রথমটি নিষ্কলঙ্ক হইল, দ্বিতীয়টির স্থানে স্থানে কিছু কলঙ্ক দেখা গেল। ইহা দেখিয়া কি কোনও বিচারক বলিতে পারেন যে, এই সরল রেখার চিত্রকর মনুষ্যমূর্ত্তির চিত্রকর অপেক্ষা ভাল চিত্রকর? কখনই নহে। কারণ একটির বিষয় অতি সহজ, অন্যটির বিষয় অপেক্ষাকৃত অনেক কঠিন। আবার মনে কর, একটি অতি সুন্দর ভাবযুক্ত ছবি ও আর একটি বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণরাজী বিভাসিত অনর্থযুক্ত ছবি তুমি একটি বালকের সম্মুখে ধরিলে। বালক ইহার কোনটি লইবে। অবশ্যই শেষেরটি। কেন? না, প্রথমটি অপেক্ষা সে শেষেরটিতে অধিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। কেন পায়? না, সে প্রথমটির art বুঝিতে পারে না, সুতরাং সৌন্দর্য্যই বুঝিতে পারে না।

কেহ যদি এরূপ বলিতে চাহেন "অত কথায় কাজ কি? যাহা আমার নিকটে সহজে ভাল লাগিবে, তাহাই ভাল বলিব, যাহা ভাল লাগিবে না, তাহাই মন্দ বলিব," আমরা তাঁহাকে বলিব যে এ তাঁহার বিচার হইল না। সৌন্দর্য্য দ্বারা বিচার করিতে হইবে বলিয়াই যে বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই এরূপ নহে। উপন্যাস বিচারকালে তাঁহাকে ধীরভাবে উপন্যাসের বিষয় ও তদুপরি প্রযুক্ত art ভাল করিয়াই দেখিতে হইবে, নহিলে সুবিচার অসম্ভব।

বৈদেশিক সভ্যতা।

সৌভাগ্য বশতই হউক আর দুর্ভাগ্য বশতই হউক আমি বাল্যকালাবধি ইংরাজি মতে শিক্ষিত। আমাদের সমাজের রক্ষণার্থ সম্প্রদায় বা সংস্কার-প্রয়াসী দল আমার সহিত একমত হইবেন কিনা জানি না। আমি নিজের শিক্ষানুসারে ইংরাজি মতে, বৈদিশিক সভ্যতা আমাদের গ্রহণীয় কি না এতৎ সম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিব।

আমার মতে ইংরাজি সভ্যতা কোন কোন অংশে আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু আমি এখানে ইহাকে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়াই ধরিয়া লই-লাম। এই উৎকৃষ্ট সভ্যতা আমাদিগের গ্রহণীয় কি না তাহাই আমার আলোচ্য।

বলা উচিত আমি জাগতিক সাধারণ বিবর্ত্তবাদে বিশ্বাস করি এবং জৈব বিবর্ত্তনে, ডারউইনের মতে, শ্রদ্ধা করি। বিবর্ত্তবাদের সাহায্যে আমি নিজমত সমর্থনে প্রয়াস পাইব। যাঁহারা বিবর্ত্তবাদে অশ্রদ্ধা করেন, অথবা ডারুইনের নামে নাসিকা সঙ্কোচ করেন তাঁহাদিগকে আমার এ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কষ্ট পাইতে বলি না।

ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান অধুনা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে মনুষ্য সমাজ একরূপ শরীরি পদার্থ। প্রাণী-শরীরের ক্রিয়া যে যে সাধারণ নিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে, সমাজ-শরীর ও সেই সেই নিয়মের অনুযায়ী। সমাজকে কি কারণে শরীরী বলা যায়, যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয়ের লিখিত প্রথম বৎসরের "নব জীবনে" প্রকা-শিত সমাজ-শরীর প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সমুদয় মনুষ্য জাতির সমষ্টি লইয়া একটি শরীর নহে; ইংরাজ সমাজ, হিন্দু সমাজ, মুসলমান সমাজ ইত্যাদি বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন দেহধারী। তন্মধ্যে কোনটিই এত উন্নত নয় যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মনুষ্য দেহের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। প্রাণী-জগতে যেমন অবয়ব রহিত কীটাণু কৃমি হইতে আরম্ভ করিয়া বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবয়বাদি সম্পন্ন স্তন্যপায়ী পর্য্যন্ত নানা পর্য্যায়ভুক্ত জীব আছে, সমাজ জগতে ও সেইরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি রহিত বর্ব্বর জাতি হইতে

আরম্ভ করিয়া নানা অবয়ব সম্পন্ন সুসভ্য জাতি পর্য্যন্ত বিবিধ পর্য্যায় দৃষ্ট হয়। [কোন্ জীবের সহিত কোন্ সমাজের তুলনা করা যাইতে পারে যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা Spencer প্রণীত Principles of Sociology পাঠ করিবেন।]

বিবর্ত্তবাদের একটী সাধারণ নিয়ম এই জীবমাত্রের গঠন বহিস্থ প্রকৃতির অনুযায়ী হয়। যে জীব বহিস্থ প্রকৃতির উপযোগী ইন্দ্রিয়াদি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না, তাহার বেশি দিন বাঁচিবার আশা নাই। এই বহিস্থ প্রকৃতির ইংরাজি নাম Environment এবং এই উপযোগিতার নাম Adaptation। যে জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাহ্য প্রকৃতির উপযোগী, সেই জীব সংগ্রামে জয়লাভ করে, অন্যান্য অনুপযুক্ত প্রাণী লোপ পায়। এইরূপে উপযুক্তের স্থিতি ও অনুপযুক্তের বিনাশে কালক্রমে সকল জীবই বাহ্য জগতের উপযোগী প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া উঠে। এই নিমিত্তই মৎস্যাদির নিঃশ্বাস যন্ত্র একরূপ, আবার স্থলচর জীবের শ্বাস যন্ত্র অন্যবিধ। এই নিমিত্তই শীত প্রধান দেশের জীবের লোম দীর্ঘ ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জীবের লোম খাট। এই নিমিত্তই মাংসাশী জন্তুরা তীক্ষ্ণ-নখদন্ত-শালী ও হিংস্র প্রকৃতিক হয় এবং উদ্ভিজ্জাদি মৃদু প্রকৃতিক হয় ও তীক্ষ্ণায়ুধ রহিত হইয়া থাকে। ইত্যাদি—

Adaptation to Environment বাহ্যপ্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য বিবর্ত্তবাদের একটী মূল মন্ত্র। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী জীব বা উদ্ভিদ শীত প্রধান দেশে বিশেষ যত্ন না করিলে বাঁচে না; কিম্বা শীতল দেশের তরু লতা গরম দেশে বৃদ্ধি পায় না। জলজন্তু স্থলে আসিয়া জীবিত থাকে না অথবা স্থলের জন্তু জলে ফেলিয়া দিলে মরিয়া যায়। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

তন্মধ্যে একটী কথা আছে। জীব মাত্রেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে এরূপ শক্তি আছে, যদ্দ্বারা বহি প্রকৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিলে নিজ অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও তদুপযুক্ত রূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। এই শক্তি টুকু না থাকিলে জীবের অবস্থানই অসম্ভব হইত। এমন কি পৃথিবীতে জীবের উদ্ভবই ঘটিত না। কেননা বহি প্রকৃতি সদা পরিবর্ত্তনশীল; পলে পলে, যুগে যুগে, বর্ষে বর্ষে শতাব্দে শতাব্দে ভূপৃষ্ঠে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। জলে স্থলে বায়ুমণ্ডলে সর্ব্বত্র অবিশ্রাম গতিতে পরিবর্ত্তনই জগতের নিয়ম। দিবসের মধ্যে আলোআঁধার, সৌরতাপের পরিবর্ত্তন, বর্ষের মধ্যে ঋতু পরিব-

স্তন, জলের গতি, বায়ুর গতি, ভোজ্য বস্তুর পরিমাণ, নৈসর্গিক বিপৎ পাত,—এ সকলের পরিবর্ত্তন আছেই ত। তদ্ভিন্ন যুগ ব্যাপী পরিবর্ত্তনে পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া দেশ প্রস্তুত হয় এবং সাগর গর্ভ পর্ব্বতাধিত্যকায় পরিণত হয়।

ভূপঞ্জর পরীক্ষা করিয়া ও নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহে পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে কোটি বর্ষ পূর্ব্বে পৃথিবীর যে অবস্থা ছিল এখন তাহার সমধিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই মহা মহা পরিবর্ত্তনের কথা ভূপঞ্জরের স্তরাবলিতে স্ফুটাক্ষরে লেখা আছে।* এই বহি প্রকৃতিব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে জীব জগতে ও মহান পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। কত শত নূতন জীব পৃথিবীতে উদ্ভূত হইয়াছে। এবং কিছু কাল লীলা খেলা করিয়া চিরকালের মত লয় পাইয়াছে। যে কালে যে জাতি প্রকৃতিব উপযোগী ছিল সে কালে তাহারাই আধিপত্য করিয়াছে এবং তৎপরকালে বহির্জ্জগতে রূপান্তর ঘটিলে অধিকতর উপযুক্ত জাতি আসিয়া তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা প্রকৃতিব সঙ্গে নিজ অবস্থা সমন্বয় করিয়া রাখিতে পারিয়াছে, যাহাবা প্রকৃতিব পবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শক্তির বলে নিজ অবস্থাব উন্নতি কবিয়া সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়াছে তাহারাই কেবল রূপান্তরিত অবস্থায় বাঁচিয়া আছে, অন্যান্যজাতি যাহাবা তাহা পারে নাই, তাহারা ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইয়া ভূতত্ত্ববিদের জন্য ভূপঞ্জরে কঙ্কালাবশেষ রাখিয়া গিযাছে। ইহারই নাম জীব জগতে বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ। এই রূপেই বিভিন্ন রূপ-ধারী, বিভিন্ন স্থান-বাসী, বিভিন্ন দেশ কালোপযোগী সুতরাং বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট জীব সমূহেব উদ্ভব হইয়াছে।

আমরা যাহা দেখিলাম তাহার ফল এই দাঁড়ায়। (১) জীব মাত্রেই সাধাবণত বহি প্রকৃতিব অনুযায়ী শবীর ও প্রকৃতি বিশিষ্ট। (২) বহি প্রকৃতি ক্রমশ পরিবর্ত্তন শীল এবং তাহাব সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিবাব জন্য জীব শরীবও পরিবর্ত্তন শক্তি বিশিষ্ট। (৩) বাহিরের পরিবর্ত্তন অল্প পরিমাণ হইলে জীব শরীর ও তদনুরূপ পরিবর্ত্তিত হয়; ইহারই নাম ক্রমবিকাশ। (৪) বাহিরের পরিবর্ত্তন আকস্মিক বা অমিত প্রমাণ হইলে জীব শবীর তদপযুক্ত না হইতে পারিয়া মারা পড়ে।

এই কয়টি কথা যে কেবল বড় বড় বিষয়েই খাটে এমন নহে প্রাত্যহিক ঘটনা হইতে সহস্র সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন ক্রমশ

ঋতু পরিবর্ত্তনে কাহারও কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিলেই নানা রূপ ব্যাধি, এমন কি মহামারী পর্য্যন্ত ঘটিয়া যায়। রেলওয়ে বিস্তারে ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষের সহচারী মড়ক—এ সকলই আমাদের নিত্য ঘটনা।

সকল জীবে যাহা, মনুষ্যপক্ষেও তাহা। মনুষ্য কিয়ৎ পরিমাণে ক্রমশ পরিবর্ত্তন অক্লেশে সহ্য করে, মনুষ্যের শরীর ও মানসিক প্রকৃতি পর্য্যন্ত কিয়ৎ পরিমাণে বাহ্য শক্তির অনুযায়ী। নতুবা ব্যায়াম শিক্ষা বা বিদ্যালোচনা বা নীতি শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? বাহিরের শক্তি প্রয়োগে শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিকে আস্তে আস্তে গড়িয়া তুলিতে ও দৃঢ় করিতে পারা যায় বলিয়াই উহাদের উপকারিতা। কিন্তু যখনই এই বাহ্যশক্তি প্রবলবেগে আকস্মিক ভাবে আক্রমণ করিবে, তখন আর মনুষ্যদেহ গঠিত হইবে না, বরং ভাঙিয়া যাইবে। নতুবা হঠাৎ শীত পড়িলে বা গরম পড়িলে পীড়া হয় কেন? অনিয়মে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় কি কারণে? গুরুতর পরিশ্রমে জীবন হানির কারণ কি? গুরুতর মানসিক ব্যায়ামে মনের গঠন না হইয়া প্রত্যুত মানসিক শক্তি নিপীড়িত ও ক্ষয়িত-তেজ হইয়া যায় কেন?

সুতরাং কি জীব জগতে, কি মনুষ্য জগতে, কি অতীত ইতিহাসে, কি বর্ত্তমান কালে দেখিতে পাই; (৫) বাহ্য জগত পরিবর্ত্তনশীল; সুতরাং জীব দেহেরও আত্মবিকাশ ক্ষমতা আবশ্যক। এবং সাধারণত জীব মাত্রেই এই ক্ষমতা অল্প বা অধিক পরিমাণে ধারণ করে; (৬) বাহ্যজগতে আকস্মিক বা অমিত প্রমাণ পরিবর্ত্তন ঘটিলে জীবদেহের মৃত্যুই অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তাদৃশ পরিবর্ত্তন সর্ব্বথা অবাঞ্ছনীয়। (৭) জীবদেহ সর্ব্বতোভাবে তরল হইলে চলিবে না, যিনি একেবারে কাঠিন্য রহিত, তিনি সামান্য ফুৎকার মাত্রে বিচলিত বিপর্য্যস্ত বা বহুধা ভগ্ন ও বিনষ্ট হইবেন। আবার সর্ব্বতোভাবে কঠিন হইলেও চলিবে না, একেবারে কঠিন হইলে অবশ্য কিছুকাল বাহ্য প্রকৃতির চাপল্য ঘটিত নির্যাতন সহ্য করিতে পারিবে বটে; কিন্তু একেবারে নোওাইতে না চাহিলে, বাহ্য শক্তি অতি প্রবল হইলে ভাঙিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

বস্তুত জীব দেহ মাত্রেই নাতি তরল নাতি কঠিন হইয়া থাকে।

এখন আমরা জীব দেহের সাত নিয়ম ব্যক্ত করিলাম। সমাজ দেহের উপরেও উক্ত নিয়মগুলি অক্ষরে অক্ষরে খাটিবে। কতিপয় উদাহরণ দ্বারা বিশদ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম নিয়ম। সমাজ শরীর যে বাহ্য প্রকৃতির অনুযায়ী, সে কথা কহাকেও বলিতে হইবে না। Buckle সাহেব এই কথা বুঝাইতে গিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্তের পুণ্যভূমি প্রাচীন ঋষিচরিত্র এবং গ্রীস দেশের সাগর পরিবেষ্টিত পার্ব্বত্য প্রদেশ প্রাচীন গ্রীক চরিত্র গঠন করিয়াছিল। সাগরগর্ভে ভাসমান, প্রকৃতির শস্য সম্পত্তি বঞ্চিত, কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন-নভ-প্রদেশ ইংলণ্ড দেশে ইংরাজ জাতি, আর সাহারার বিকট মরুতে আতপ-দগ্ধ কাফ্রি। এইরূপ যে জাতি দেখিবে সকলেই যে বহি প্রকৃতির দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত তাহাদের জাতীয় প্রকৃতিই তাহার পরিচয় দিতেছে।

দ্বিতীয় নিয়ম। বহি প্রকৃতি বা Environment বলিলে কেবল মাত্র নদী পর্ব্বত ও জলবায়ু মাত্র বুঝায় না, চেতন বা অচেতন বাহ্য জগতের শক্তি নিচয়ের সমষ্টিকে বুঝায়। বঙ্গের উর্ব্বরা ভূমি, ভাগীরথীর জলপ্রবাহ, ষড়ঋতুর বিকাশ বা হিমালয় পর্ব্বত—আমার শরীর ও মানস প্রকৃতির যেরূপ নিয়ামক, আমার বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশী দেশবাসী, জীবজন্তু বৃক্ষ লতা পর্য্যন্ত সেইরূপ আমার প্রকৃতির উপর আধিপত্য রাখে। এ সকলের পরিবর্ত্তনে আমার পরিবর্ত্তন হয়। সেইরূপ সমাজেও। কেবল ভূমধ্য সাগরের বাণিজ্য বর্ত্তন, Gulfstream এর উত্তপ্ত প্রবাহ, বা সাহারার জ্বলন্ত নিঃশ্বাস ইয়ুরোপ ভূমির সভ্যতা বজায় রাখিয়াছে এরূপ নহে; ভারতের আবাধ বাণিজ্য, কালিফর্ণিয়ার স্বর্ণখনি, আফ্রিকার দাসজাতি ও চীনবাসীর অহিফেণ প্রিয়তাও সেই রূপ ইউরোপ সমাজকে নিয়মিত করিয়াছে ও করিতেছে। কে বলিবে বহি প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে সমাজ শরীরে পরিবর্ত্তন হয় না। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপ মূর্খ ছিল। কেন? ইউরোপের উপর বহিশক্তির বিশেষ পরিচালনা হয় নাই বলিয়া। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সমাজ তড়িদ্গতিতে উন্নতি মার্গে আরোহণ করিল। কেন? তাহার Environment পরিবর্ত্তিত হইল বলিয়া। আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল বলিয়া ও ভারতে বাণিজ্য প্রচার হইল বলিয়া। প্রাচীন বৃটন রোমানদের সংসর্গে আসিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং বিজেতৃ ব্যবহার অনুকরণ করে। প্রাচীন সাক্সন নর্ম্মাণদের সংসর্গে পড়িয়া পশুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া Castle নির্ম্মাণ অভ্যাস করে এবং Arthur ও Charlemagne এর বীরত্ব কাহিনী গাহিতে শিখে। বাহ্য

প্রকৃতি যে জাতির প্রকৃতি গঠন ও নিয়মন করে ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না।

(৩) বাহ্য শক্তির পরিবর্ত্তন যেখানে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ঘটে সমাজও সেই খানে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া উন্নতি ও বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়। ইউরোপের বাহিরের জ্ঞান ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে; ইউরোপীয় সমাজ ও ক্রমে ক্রমে উন্নতির দিকে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি বিকাশ পাইয়াছে, তাই বলিয়া ইংরাজ সমাজ এত দৃঢ়মূল, তাই বলিয়া ইংরাজ সমাজ Constitutional Government এর এত গর্ব্ব করে। ফরাসী সমাজ জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সমভাবে বিকাশ পায় নাই, তাই যখন বাহ্য শক্তির প্রচণ্ড বাত্যা ঘোর বেগে বহিয়া উঠিল, সমাজের মূল পর্য্যন্ত থরহরি কাঁপিয়া গেল, নব শোণিতে ফরাসী ভূমি আর্দ্র হইল। আজি পর্য্যন্ত ফরাসী সমাজ টলটলায়মান।

(৪) চতুর্থ নিয়ম। কিন্তু বাহিরের পরিবর্ত্তন যখন আকস্মিক ও অপরিমিত হয়, তখন জীব শরীরই হউক, আর সমাজ শরীরই হউক, কাহার সাধ্য নাই, যে বাঁচিয়া উঠে। পরিবর্ত্তন যেখানে অল্প, জাতীয়-প্রকৃতির ও সেই খানে বিকাশ, বাহিরের পরিবর্ত্তন যেখানে বেশী জাতিরও তথায় বিনাশ।

নিকৃষ্ট সমাজই হউক আর উৎকৃষ্ট সমাজই হউক বিজাতীয় সমাজ যখন প্রবলবেগে আক্রমণ করে, তখন আক্রান্ত সমাজের সাধ্য নাই যে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। বিনাশ সেখানে অবশ্যম্ভাবী। হুন্‌দিগের আক্রমণে ইয়ুরোপের প্রাচীন সমাজ ভাঙিয়া গিয়াছিল। অসভ্য স্পানিয়ার্ডের প্রবল আক্রমণে সভ্যতর মেক্সিকো ও পেরুর প্রাচীন সমাজ সহিতে পারে নাই। ইস্‌লামের প্রবল ঝটিকায় প্রাচীন পারস্যের জাতীয় জীবন বিধ্বস্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম্ম বিপ্লবের প্রচণ্ডবেগে স্পেনের কাথলিক সমাজ জীবন্‌মৃত হইয়াছে। এইত গেল অসভ্যতার আক্রমণে সভ্যতার বিনাশ। এইবার সভ্যতার আক্রমণে অসভ্যতার দুর্দ্দশা দেখা যাউক। প্রাচীন রোমের সংসর্গে পড়িয়া অসভ্য বৃটন পশুবৃত্তি পরিহার করিয়া উৎকৃষ্টতর জীবন বৃত্তি অবলম্বন করে। বিজেতার অনুকরণে বিজেতার ভাষা, বিজেতার আচার, বিজেতার পরিচ্ছদ, বিজেতার ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইহার নাম উন্নতি সন্দেহ নাই। প্রাচীন বৃটন উন্নতি মার্গে আরোহণ করিল, অসভ্যতা পরিহার করিয়া সভ্য পদবী প্রাপ্ত

হইল। কিন্তু ইহার নাম বিকাশ নহে। বাহ্য শক্তির সহিত প্রাচীন বৃটন জাতীয় জীবনের সামঞ্জস্য রাখিতে পারে নাই। রোম যখন আত্মরক্ষার জন্য বৃটনকে পরিত্যাগ করিল, তখন বৃটনের সেই উন্নতি, বৃটনের সেই সভ্যতা কোথায় রহিল, ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই সেই দারুণ বার্ত্তা অবগত আছেন।

আর একটী আধুনিক উদাহরণ দিব। অষ্ট্রেলিয়া ও ফিজি দ্বীপের আদিম নিবাসী মনের আনন্দে পশুর সঙ্গে পশুর মত চরিয়া বেড়াইত। তিন হাজার বর্ষ পূর্ব্বে ইউরোপ যে পদবীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহারাও তত্তুল্য অথবা আরও নীচ অবস্থায় ছিল। ভাষাহীন, জ্ঞানহীন, ধর্ম্মহীন ফিজি বাসী পশুর ন্যায় বিচরণ করিত এবং রুধির পিপাসু দেবতার নিকট বৃদ্ধ পিতাকে বলিদান দিয়া পরম স্নেহে পিতৃদেবের আম মাংস উদরসাৎ করিত। তাহাদের অবস্থা শোচনীয় ও ঘৃণেয় ছিল সন্দেহ নাই—অকস্মাৎ ইয়ুরোপ তাঁহার উৎকৃষ্টতর সভ্যতা ও উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম লইয়া তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। পাপীর পবিত্রাণার্থ খৃষ্টান পাদরি ধর্ম্ম পুস্তক হস্তে করিয়া তাহাদের উদ্ধারার্থ বদ্ধ পরিকর হইলেন। ফল হইল কি? সকলেই জানেন অষ্ট্রেলিয়া বাসীর উদ্ধারে আর বিলম্ব রহিল না, সামাজিক ক্রম বিকাশের পথে অগ্রসর হইবার অবসর রহিল না। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম বাসী ধরা পৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবার উদ্যোগ দেখিতেছে।

সুতরাং (পঞ্চম নিয়ম) সমাজ মাত্রই অল্প মাত্রায় পরিবর্ত্তন সহিতে পারে এবং ক্রমে বিকাশ লাভ করিয়া উন্নত হইতে পারে সত্য; কিন্তু, (ষষ্ঠ নিয়ম,) উন্নতির পক্ষেই হউক আর অবনতির দিকেই হউক, পরিবর্ত্তন আকস্মিক হইলে বিনাশের সম্ভাবনাই বেশী। সমাজের বিকাশ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বিপ্লব ভয়াবহ।

ভারতের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, জানি না বৈদেশিক শক্তির তরঙ্গ আসিয়া এই প্রাচীন সমাজের ভিত্তির উপর আঘাত করিতেছে। হইতে পারে ইংরাজি সভ্যতা উৎকৃষ্ট, হইতে পারে ইংরাজী সভ্যতা নিকৃষ্ট, সে বিষয়ে বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। উৎকৃষ্টই হউক, আর নিকৃষ্টই হউক, প্রবল পরাক্রমে বাহ্য শক্তি আসিয়া এই সমাজের উপর আপতিত হইয়াছে। কাহারও সাধ্য নাই যে এই শক্তি রোধ করে বা প্রতিহত করে। এই প্রাচীন তরুর উপর আরও ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, আরও

প্রবল বাত্যা এই তরুর মূলোৎপাঠনে সমর্থ হয় নাই। কে বলিবে এই নূতন আক্রমণের ফল কি? এ ঝটিকার বেগ সহ্য করিতে পারিবে কি না পারিবে কেহই তাহা বলিতে পারে না। হিন্দুর জাতীয় জীবনের Environment বিদ্যুদ্বেগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন ধীর গতিতে হইলে কোন আশঙ্কার কারণ ছিল না। হিন্দুর জাতীয় জীবনের আভ্যন্তরীণ বিকাশ ক্ষমতা আজও লোপ পায় নাই। কিন্তু পরিবর্ত্তন যেরূপ আকস্মিক তাহাতে সমধিক শঙ্কার বিষয়। আমাদের জাতীয় জীবনের পরিণাম কি কাহার ও সাধ্য নাই যে গণিতে পারে। পরিবর্ত্তনের উর্ম্মিমালা আঘাত করিতেছে, এই আঘাত নিবারণের উপায় নাই, তবে সেই আঘাতের আনুকূল্য করা কর্ত্তব্য কি না ধীর ব্যক্তির আলোচ্য বিষয়।

আমার আর অধিক বক্তব্য নাই। ইউরোপীয় জীববিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের মূলসূত্র কয়টি বলাই আমার উদ্দেশ্য। আমাদের কোন্ পন্থা অবলম্বনীয় সুবোধ লোকে বিবেচনা করিবেন। সমাজ বিজ্ঞান কেবল এত দিনে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে মাত্র। সমাজ বিজ্ঞান আর কিছু দেখাক্ আর না দেখাক্ এই কথা প্রতিপন্ন করিতে চায় যে জাগতিক সকল কার্য্যই নৈসর্গিক নিয়মের অধীন, মনুষ্য সমাজ সেই রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম নিচয়ে আবদ্ধ। সেই সকল নিয়ম অপরিবর্ত্তনশীল, মনুষ্যের ইচ্ছার বশীভূত নহে। মানুষ যেমন ইচ্ছা করিলে মাধ্যাকর্ষণের ব্যতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ সমাজ শরীরে বিবর্ত্তনের উপরে ও হাতদিতে পারে না। সমাজ আপনা হইতে উদ্ভূত হয়, আপনা হইতে বিকাশ পায়, মানুষ তাহার অন্যথা করিতে পারে না। সমাজের গঠন যেরূপ সম্ভবপর নয়, ইচ্ছাকৃত সমাজের উন্নতিও সেরূপ সম্ভবপর নয়। শারীর বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া চিকিৎসক জীব-শরীরের ব্যাধি আরোগ্য করেন সত্য বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি কিছু নৈসর্গিক নিয়মের বিরুদ্ধে আচরণ করে না। জীব-শরীর যেদিকে ইচ্ছা লইয়া যাওয়ার তাঁহার ক্ষমতা নাই। বিজ্ঞান বলে প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যেই তিনি প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়মিত করেন। যেখানে চিকিৎসক বিজ্ঞানের সাহায্য পান না, সেই খানেই পীড়া আরোগ্য করিতে গিয়া মৃত্যু ডাকিয়া আনেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে জীবদেহের চিকিৎসা প্রণালী আজিও বৈজ্ঞানিক মতে পূর্ণতা লাভ করে নাই। জীবের শারীর-বিজ্ঞান অনেক উৎকর্ষ

লাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু চিকিৎসকা প্রণালী তদনুরূপ উন্নতি লাভ করে নাই। সমাজের শরীর বিজ্ঞান সবে মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। সমাজের ব্যাধিষয় বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা প্রণালী প্রতিষ্ঠা হওয়ার অনেক দেরি। যে সকল সংস্কারক নিজ অজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া সমাজের ব্যাধি আরোগ্য করিতে প্রয়াস পান তাঁহারা হাতুড়ে চিকিৎসক। তাঁহাদের দ্বারা কোন সুফলের প্রত্যাশা নাই, প্রত্যুত অপকারের সম্ভাবনা।

হইতে পারে আমাদের সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত, কিন্তু তাই বলিয়া ভ্রান্ত সংস্কারক ইহার ব্যাধি আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিও না। আমাদের বৃদ্ধ সমাজ-তরু অনেক বাত্যা সহ্য করিয়াছে। ইহার মূলোৎপাটন হয় নাই বটে, কিন্তু কে বলিবে ইহা অক্ষত শরীরে রহিয়াছে, কে বলিবে ইহার দুই একটী প্রকাণ্ড শাখা ভগ্ন হয় নাই। কে বলিবে ইহার প্রফুল্লতা সজীবতা নবীনতা পূর্ব্বের মত বর্ত্তমান আছে। পুনরায় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল বাত্যা বহিতেছে। দুই একটি শাখা প্রশাখা জীর্ণমূলও ভগ্ন হইয়াছে। উপরের পাতাগুলি ঝরিয়া যাইতেছে। এই বাত্যা প্রতিরোধের উপায় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া আর ইচ্ছা পূর্ব্বক সমাজ তরুর অঙ্গচ্ছেদ করিও না। আপনা হইতে যাহা ভাঙ্গিতেছে ভাঙ্গুক। ইচ্ছা পূর্ব্বক ক্ষত সংখ্যা বাড়াইও না।

স্বীকার করি কোন জীবেরই পক্ষে কাঠিন্য শুভকর নহে; সপ্তম নিয়মানুসারে কাঠিন্য ও তারল্যের সমবায়েই জীবশরীর গঠিত হওয়া আবশ্যক, স্বীকার করি পরিবর্ত্তন আবশ্যক; পরিবর্ত্তনের একান্ত অভাব বিকাশের অন্তরায়; কিন্তু পরিবর্ত্তন যেখানে মৃদু গতিতে আইসে, সেই খানেই বিবর্ত্তন ও বিকাশ। পরিবর্ত্তনের বেগ যেখানে প্রবল সেইখানেই ভবিষ্যৎ আশঙ্কা জনক।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন মধুর কথা; প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন আশাজনক ও সমগ্র মানব জাতির মঙ্গলাবহ। কিন্তু সম্মিলন সম্ভব কি না আলোচ্য বিষয়। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে অনেক প্রভেদ; প্রত্যেকে আপন আপন Environmentএর উপযোগী। সম্মিলন বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু একের বিনাশ ও অপরের উত্থান প্রার্থনীয় নহে। প্রাচ্য ভূমেজাত বৃদ্ধ তরুর শাখা কর্ত্তন করিয়া তদুপরি প্রতীচ্য তরুর কলম বাঁধিলে সুফলের আশা করা যায় কি না সমাজ বিজ্ঞানের আলোচ্য, অজ্ঞ উদ্ধত প্রকৃতিক সংস্কারকের অধিগম্য নহে।

ইউরোপীয় সমাজ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা মহামনস্বী হর্বার্ট স্পেনসরের গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

"The unfolding of an organism after its special type, has its approximately uniform course taking its tolerably definite time; no treatment that may be devised will fundamentally change or greatly accelerate these. But it is quite easy to adopt at reatment which shall dwarf or deform otherwise injure: the process of growth and development may be hindered or deranged though theycan not be artificially bettered Similarly with the social organism. Though, by maintaining favorable conditions, there can not be more good done than that of letting social progress go on nnhindered, yet an immensity of mischief may be done in the way of distarbing and distorting and repressing by policies carried out in pursuance of erroneous conceptions."

Study of Socialogy. p.—401.

পুনশ্চ (প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলনাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি)

Between organisms widely unlike in kind no progeny can can arise; the phisiological units contributed by thom respecievely to form a fertilized germ, can not work togetter, so as to produce a new organism.

Evidently as while multiplying, the two classes of units tend to build themselves into two different stuctures, their conflict prevents the formation of any structure. In cases where the conquering and the conquered widely unlike intermary extensively, a kindred effect is produced. The half caste inheriting from one line of ancestry proclivities adapted to ont set of institutsons and form the other line of ancestry is not fitted fr either. He is a unit whose nature has not been moulded by any social type and therefore can not evolve any social type. Spain with its diverse peoples Basque, Celtic, Gothic, Moorish Jewish, partially localized shew us this result,

Principles of sociology, Vol. I. p. 592—594.

ক্রোটনের কথা।

১।

আমি ক্রোটন ভাল বাসি না ;—বাবু ভায়াদের বড় বড় বৈটকখানার উঠিবার সিঁড়ির দুই ধারে, বাগানের যেখানে, সেখানে—এখানে ওখানে যে পাঁচরঙ্গা পাতার বিলাতী রঙ্গিন গাছগুলা দেখা যায়—সেই গুলাই ক্রোটন ;—আমি ক্রোটন ভাল বাসি না ; দেখিতে পারি না—আমার একান্ত ইচ্ছা যে তোমারাও ও গুলাকে না ভালবাস, না পছন্দ কর, দেখিতে না পার। তোমরা—কিনা—গড়-গড় গাড়ী তেতালা বাড়ী বড় মানুষেরা, তোমরা কিনা—বাগান বায়ু গ্রস্ত মধ্যবিধ বাবুরা, তোমরা কিনা—গোলাপী সৌখীন গৃহস্থ লোকেরা ; তোমরা কিনা—স্কুল কাছারিব আপিসের অধ্যক্ষেরা, তোমরা কিনা আধকাঠা উঠান পাইয়া সহবের সৌভাগ্যশালী বাসাড়িয়ারা ; তোমরা কি না—একহাত রোয়াকে বসিয়া গুড়ুক-সেবী দোকান-দারেরা, আমার একান্ত ইচ্ছা, তোমরা সকলেই ক্রোটন গুলা না-পছন্দ কর, আমার মত দেখিতে না পার।

আমি যাহা ভালবাসিনা, তাহা যে তোমাদিগকেও না-পছন্দ করিতে বলিতেছি,—ইহাতে তোমরা আমাকে ঘোরতর অহঙ্কারী মনে করিতে পার, বড় অনুদাব সঙ্কীর্ণমনা মনে করিতে পার ; তোমাদের মনের দুয়ার দিয়া অনুমানের গতি আমি আমার ভাঙ্গা আগড় দিয়া আটক বাধিতে পারিব না ; কিন্তু তোমবা আমাকে বড় অহঙ্কারী বা নিতান্ত অনুদার মনে করিলে, আমাব কাজ হাসিল হইবে না—আমাব কথা তোমরা রাখিবে না—বলিয়া একটা কথা আমাকে বলিতে হইতেছে। কথাটা এই, যে এমনও ত হইতে পারে, যে আমি তোমাদিগকে ভালবাসি বলিয়াই, আমার চক্ষে জগতের ভাল মন্দ দেখিতে, আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি ; তোমরা সকলেই এই রূপ কর ; যাহাকে ভালবাস, তাহাকে বল না কি, 'ছি ও সকল সামগ্রী তুমি ব্যবহার কর কেন ?" হয়ত সেইরূপ তোমাদের ভালবাসি বলিয়াই বলিতেছি, "ছি ছি ক্রোটন গুলাকে তোমরা অত আদর কর কেন ?"

ক্রোটনের পাঁচরঙ্গা পাতা ; এই না তার গুণ ? ভাল, ওটা গুণ না দোষ ? তা বেশ করিয়া একবার ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখ দেখি।

এক একটি বর্ণে এক একটি ভাবের সুন্দর স্ফূর্ত্তি হয়; সে বর্ণটি মিশ্র হউক, আর অমিশ্র হউক, এক এক প্রকারের বর্ণে এক এক রূপ ভাবের পুষ্টি ও স্ফূর্ত্তি হয়। ঐ আকাশের আশমান বর্ণে,দেখ কেমন উদারভাব, উদাসভাব, ধীর স্থির গম্ভীর ভাব, সর্ব্ব সামঞ্জস্য ভাব—পরিস্ফুট রহিয়াছে। প্রান্তরের শ্যামল শোভা—উহাতেও তেমনই উদার ভাব আছে—কিন্তু সে উদাস ভাব নাই; উহার সঙ্গে সঙ্গে আশা যেন চল চল করিতেছে; সেই গম্ভীরতা আছে তবু যেন সে ধীর স্থির ভাব নাই; বাতাসে দোলে; শিশিরে কাঁদে। জবাকুসুম সঙ্কাশ কাশ্যপেয়ের মহাদ্যুতিতে প্রতাপ যেন গর গর করে, আবার এই শরতের ফুট ফুটে জোৎস্নায় জগৎ যেন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সুস্বপ্নে হাসিতে থাকে।

শুদ্ধ হউক, মিশ্র হউক, এক এক বর্ণের ভাবে, এক একটি রাগিণী বাঁধা আছে। ঐ ক্ষুদ্র উদ্যানেই দেখ না কেন। ঐ ঘোরাল রক্তবর্ণ পঞ্চমুখী জবা—যে সমগ্র তন্ত্র শাস্ত্র উদ্ভিদবতারে ফুটিয়া রহিয়াছে। মহাশক্তির সেই প্রসন্ন বদনের করাল জিহ্বা, নর্ত্তনশীল শ্রীচরণের কোকনদ আভা, সেই বরাভয়-দাত্রীর রক্ত রঙ্গিণী মুর্ত্তি, রাগরঞ্জিত লোচনের ভীমা ভ্রুকুটি—যেন সকলগুলি মিলিয়া মিশিয়া বর্ণগত হইয়া করুণরৌদ্রের পুষ্পাবতার হইয়াছে, মধুর বটে, কোমল বটে, শীতল বটে,—মৃদু মৃদু দুলিতেছে, মুচকি মুচকি হাসিতেছে—কিন্তু কি রক্ত-রাগ—কি ভীষণ ভ্রুকুটি! যেন সহস্র সিংহচক্ষু কেন্দ্রীভূত হইয়া তোমার দিকে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে তোমার অন্তর পরীক্ষা করিতেছে। তুমি পাষণ্ড হইলে, সেই অন্তর পরীক্ষায় তোমার হৎপিণ্ড কম্পিত হইবে; তুমি ভক্তিমান হইলে, আপনা আপনি বলিবে—

"রাঙ্গা জবা কি শোভা পায়—পায়;"

কোন পায়? সেই মহাশক্তির পায়—

"যে ভ্রুকুটি ভঙ্গে, সঙ্গিনী সঙ্গে, বামা কত রঙ্গে নেচে যায়॥"

বাস্তবিক ঐ পঞ্চমুখী জবা—ভ্রুকুটি ভঙ্গময়ী, রঙ্গময়ী মহাশক্তির মহাপদ্মারবিন্দে শোভা পায়—তাহাতেইত বলিয়াছিলাম—একটি ফুলত ফুটিয়া নাই—যেন একখান তন্ত্র শাস্ত্র ফুটিয়া রহিয়াছে!

দেখ ঐ চাঁপা; দেখ, ঐ টগর; দেখ ঐ অপরাজিতা। বিভিন্ন কুসুমের বিভিন্ন বর্ণের বৈচিত্র—চারিদিকেই মোহকর। চাঁপা সত্য সত্যই আলো

করিয়া আছে; সোণার বরণ বলিলে চাঁপার অপমান করা হয়, সোণা ঝক্ মক্ করে, চাঁপা তা করে না; চাঁপার চাকচিক্য নাই; শোভা আছে, তাহে প্রভা নাই; আলো আছে, তাহে আভা নাই; যে প্রথমে বলিয়াছিল—"সেই মহাশয়, চাঁপা ফুলময়, হেন মনে হয়, খোঁপায় রাখি।" বোধ করি, সে চাঁপা ফুলের গৌরব কিছু বুঝিয়া থাকিবে। সোনার অলঙ্কার—চক চক করে, তাহা অঙ্গে ধারণ করিতে হয়—চাঁপা ফুল স্বভাবের সোণার গড়ন—তাহা মাথার মণি করিয়া খোঁপায় রাখিতে হয়।

টগরের ত কোন রঙ্গ নাই বলিলেও চলে; যাহাকে তোমরা রঙ্গ রস বল, তাহার কিছুই টগরে নাই; অথচ দেখ দেখি কেমন সুন্দর! যে বলিয়াছিল, "শাদা মুলুক জাদা" সে অর্দ্ধ কবি। যে বুঝাইয়াছিল, যে শ্বেতবর্ণই পবিত্রতা—সে মহাদার্শনিক—মহাকবি। টগরের ন্যায় অমল ধবল পুষ্প—মূর্ত্তিমতী পবিত্রতাই বটে। বঙ্গের বাল্য-বৈধব্য-ব্রত যেন নীরবে, বিরলে বসিয়া রহিয়াছে, তাহাতে হাব, ভাব, বিলাস, বিভ্রম কিছুই নাই; কেবল পবিত্রতার অমলচ্ছদে স্বতই সুন্দর। ঐ দেখিলে বালবিধবা ব্রহ্মচারিণীর বন-বাসিনী মূর্ত্তি। আবার যখন দেখিবে, টগর প্রতিমা সম্মুখে পুষ্পপাত্রে রাশিকৃত রহিয়াছে, একটু একটু চন্দনের ছিটা লাগিয়াছে—তখন বুঝিবে সেই ব্রহ্মচারিণীর দেবমন্দিরবাসিনী মূর্ত্তি! কুসুমের এ সকল মূর্ত্তি কি তোমাদের ভাল লাগে না? যদি লাগে—তবে কুসুম-কান্তি শূন্য, শ্বেত্রীকুষ্ঠময় ও পাঁচ রঙ্গা পাতাগুলার অত আদর কেন? ওগুলা ফুল ও নয়, পাতা ও নয়, ওগুলা দুয়ের বাহির।

জীবন সমস্যা।

১

কেন এ জীবন?	কেন বা মরণ?	ধরায় কি কায করি?
নয়নের পথে	তৃণ হাসি কয়	"আমিও জীবন ধরি!"
সংসারের সেবা?	পারি না বুঝিতে	আছে কিবা ফল তার!

অদূরে জাহ্নবী ডাকিয়া কহিছে "দেখ মোরে একবার,
"রেণু হ'তে প্রাণী আর্য্যাবর্ত্ত যুড়ে সেবি আমি অবিরল,
"অকূল অতল সাগরে পড়িয়া করি প্রাণ সুশীতল।"
কোথা সে সাগর— জীবন প্রবাহ যেথানে মিশায়ে যায়?
প্রকৃতি কহিছে "ডুব আসি বুকে দেখিতে পাইবে তায়।"
নয়ন তুলিয়া হেরি চারি ধার— শান্তির সাগর কই?
জাহ্নবী কহিছে "অনন্তের বুকে অনন্ত জীবন ওই।"

২

আপনার সুখ পারি না ভুলিতে অনন্তে মিশিব, হায়!
একের হৃদয়ে পারি না ডুবিতে অনন্তে ডোবা কি যায়!
আপনার জায়া আপনার সুত আপনার পরিজন,
তাহাদেরি সনে মেলে না মানস অনন্তে মিলিবে মন!
আপনা ভুলিব? ভুলিয়াছি কবে! কভু কি দিয়াছি প্রাণ!
সে যে বিনিময়! তবু তুষ্ট নয় তবু যে করেছি মান।
বিদ্যা ধন যশ লভিতে বাসনা সুধুই নিজের তরে
আপনা ভুলিয়া কিছু কি তাহার দিয়াছি কখন পরে!
আপনাতে ডুবে থাকি চির দিন কূপ গর্ত্তে ভেক প্রায়,
এ জীবন কভু মিশে কি অনন্তে কেন এ জীবন, হায়!

৩

জাহ্নবীর তীরে কালীতলা ঘাটে চিতায় অনল জ্বলে,
যুবকের দেহ ধরিয়া কোলেতে হাসিতে হাসিতে বলে
"আপনা ভুলিতে পারনা মানব হের এই মৃতকায়
"আপনাতে ভরা, ছিল বুক তার সে আপনা কোথা, হায়!
"আপনার সুখে জগতের দুখে ছিল না ইহার জ্ঞান,
"জগত হইতে মহত ভাবিত ইহার আপন প্রাণ,
"এত আপনায় ভরা যে জীবন হের নর দশা তার,
"তথাপি অনন্ত হৃদয় পাতিয়া ধরিতেছে চারি ধার,
"এই ক্ষুদ্র দেহে ও অনন্ত যদি আপনি মিশিতে চায়,
"তুমি কোন্ বিন্দু? তুমি কি মানব মিশিতে নারিবে তায়!"

৪

চাহিয়া দেখিনু চিতার অনলে পুড়িছে মানব দেহ,
চারি পাশে তার বসি প্রিয় জন নিকটে না যায় কেহ,
ভুলিলাম তৃণ ভুলিনু জাহ্নবী চিতায় ভরিল প্রাণ,
ওই মৃত সনে ওই প্রিয় জনে শুধু কি স্নেহের ভাণ?
এত অভিলাষ—.. এত অভিমান আজীবন মোহ যার,
অমনি করিয়া চিতার অনলে ওই পরিণাম তার!
মায়া মোহ প্রেম বালির সৈকত! মানব জীবন তায়
বালকের মত আপন ছায়ায় নাচিয়া ধরিতে যায়!
সিহরিল প্রাণ— মুদিনু নয়ন মানব জীবন স্মরি
ওই কি জীবন জড় অজড়ের হায়রে ভুবন'পরি!

৫

গবাক্ষের পাশে কুসুম কোরক হাসিয়া কহিছে ধীরে
"তবে কি মানব ফুটিবনা আমি এখনি যাইব ফিরে?
"আমার বিকাশে এ কানন হাসে মুগ্ধ তাহে কতজন!
"ছার সুখ দুখ তুলনায় তার সুখ দুঃখ কতক্ষণ!
"নেহার জগৎ আকুলি ব্যাকুলি ফোটে প্রাণী কত তায়
"এত দুখ যদি তবু কেন প্রাণী জীবন ধরিতে চায়!
"এ জীবন বারি জগৎ হইতে লহ তুলি একবার
"এ মহত্ব তার রহিবে কোথায় জগৎ রহিবে আর?
"ওই মহত্বের বিন্দু বিন্দু কণা তুমি আমি অন্যজন
"আইস মানব ওই সিন্ধুনীরে ঝাঁপ দিব দুই জন।"

৬

তটিনীর পারে বৃক্ষ বাটিকায় দীপ শিখা দেখা যায়
গত জীবনের কক্ষে কক্ষে আলো ফুটিয়া উঠিছে তায়
ছিল কত সজ্জা প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে কত শোভা ছিল তার
ভূমণ্ডল পতি বুঝিবা মোহিত প্রবেশিলে একবার
সুরভিত দীপে পুলকিত ঘর কুসুম ছড়ান তায়
মুক্ত বাতায়নে ঝুর ঝুর করি বহিত মলয় বায়
গবাক্ষে গবাক্ষে আকুল হৃদয়ে পাপিয়া ঢালিত গান

আশার শয়নে আবেশে গলিয়া ঢলিয়া পড়িত প্রাণ
তেমতি করিয়া আবার সাজায় যদি কেহ এ জীবন
দেখি পারি কিনা অনন্তের বুকে এবার ঢালিতে মন।

৭

কুটীরের দীপ হাসিয়া কহিছে "সে আলো জ্বালিলে পুন
"অনন্তের দিকে চাহিবে না ফিরে তোমাতে ডুবিবে মন
"হেরি প্রতিদিন যে জ্বালে আমারে সে নাহি অনন্তে হেরে
"খায় দায় পরে শেষে শয্যা পাতি আলস্যে ঘুমায় পরে
"আমারেও ফিরে দেখেনা চাহিয়া নিবি আমি ধীরে ধীরে
"চারি পাশে তার ভীষণ আঁধার আসিয়া দাঁড়ায় ঘিরে,
"জ্বালিতে আমারে আসিলে সুন্দরী সুধাইয়া ছিনু তায় "
"চাঁদের কিরণে বিভোব অনন্ত সে কেন ফিরে না চায়,
"রাখি তৈলাধার অঙ্গুলি নির্দ্দেশি পুলকে বিভোর হই
"স্বামীরে দেখায়ে কহিল সুন্দবী 'আমাব অনন্ত ওই'।"

৮

নিবিল প্রদীপ নয়নের পথে সংসার ভাসিয়া উঠে,
কত প্রিয় মুখ কত প্রিয়-দুঃখ মানস ভরিয়া ফোটে,
অঙ্গুলি তুলিয়া আমারে নির্দ্দেশি পুলকে পুর্ণিত হই
কত জন তার কহিছে ডাকিয়া আমার অনন্ত ওই,
দেখিনু চাহিয়া তাহাদের পানে বদনে করুণ আঁকা
দুনয়ন ভরা মমতার সিন্ধু বাহুতে যতন মাখা ;
একে একে একে হইল স্মরণ সুখ দুখ যত যার,
দেখিনু চাহিয়া আমাতে বাসনা ঢালিয়াছে কতবার,
বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল হৃদয় অনন্ত কোথায় আর,
হাসি কহে শশী "ফুটিয়াছে আঁখি ঢাল প্রাণ এইবার।"

ঈশান।—

হুগলী
স্নিগ্ধ ঘাট।

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। | ভাদ্র ১২৯৪। | ২য় সংখ্যা।

পানিপতের যুদ্ধ।

(পণ্ডিত কাশীরাজের গ্রন্থ হইতে)

৩।

পরদিন উজীর সেই দুরাণী সেনাকে ডাকাইয়া মুণ্ড কোথায় আছে ঠিক বলিয়া দিলে লুণ্ঠনদ্রব্য প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না—এইরূপ আশ্বাস দিলেন। তাহাতে দুরাণী সৈনিক বস্ত্রাবৃত একটা মুণ্ড আনিয়া উজীরের সম্মুখে ফেলিয়া দিল; মুণ্ড চিনিবার জন্য রাজাবাবু পণ্ডিতকে ডাকান হইল, সে দেখিয়া বলিল, "এ মুণ্ড ভাওয়েরই বটে, তিনি আমার প্রভু ছিলেন, অতএব এ মুণ্ডের সংকার করা আমার পবিত্র ধর্ম্ম, মুণ্ডটি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দিন, আমি স্বধর্ম্মাচার অনুসারে দাহ করিব।" উজীর ঈষৎ হাস্য করিয়া মস্তকটি তাহাকে দিলেন এবং কেহ প্রতিবন্ধক না হয় এজন্য কয়েকজন চিহ্নিত সেনা প্রেরণ করিলেন। রাজা বাবু পণ্ডিত শিবিরের বহির্ভাগে মুণ্ডের সংকার করিল। তৎপরে ভাওয়ের মৃত্যু বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। পানিপতের যুদ্ধ এবং ভাওয়ের মৃত্যু বিষয়ে আমি যাহা চক্ষে দেখিয়াছি ও স্বহস্তে করিয়াছি, এই খানে তাহার শেষ হইল।

পরে শুনা গেল, মলহর রাও, আমাজী গৈকোয়ার, সুদেব বেতাল প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সর্দারগণ যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। ভাওয়ের এক পত্নী অশ্বারোহণে দীগ নগরে পলায়ন করিতে সক্ষমা হইয়া-

ছিলেন। রাজা সূর্য্যমল তাঁহাকে সাতিশয় সম্মান সহকারে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, এবং অর্থ, বস্ত্র ও পাল্কী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রক্ষক সমভি-ব্যাহারে ঝান্সী নগর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়াছিলেন, তথা হইতে ভাও-পত্নী দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সমশের বাহাদুর আহত হইয়া দীগে পৌঁছিলেন; সূর্যমল তাঁহার যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু কিয়ৎদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল, তাঁহার সমাধি-মন্দির অদ্যাপি দীগে বিদ্যমান রহিয়াছে।

যুদ্ধের পাঁচ দিন পরে আহম্মদ শাহ দুরানী,দিল্লি যাত্রা করিলেন। চারিদিন কুচ করিয়া তথায় পৌঁছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ভারত-রাজ-শ্রী সম্ভোগ করেন, কিন্তু দৈব তাঁহাকে প্রতিকূল সাধিলেন। নবাব সুজাউদ্দৌলাও তৎসঙ্গে দিল্লি পৌঁছিলেন। মহারাষ্ট্র শিবিরের যত লোক তাঁহার আশ্রয় লইয়াছিল, সকলকে তিনি এইখান হইতে বিদায় দিলেন। তাঁহার সেনা উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া জাট রাজ্যের সীমান্তে নিরাপদে পৌঁছিয়া দিল।

পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ইহার অষ্টাহ পরে দুরাণী সৈনিকেরা একত্র হইয়া বিদ্রোহ করিল এবং গত দুই বৎসরের বাকী বেতন প্রাপ্তি ও কাবুলে প্রত্যা-গমন করিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। কয়েক দিন পর্য্যন্ত এই গোল-মাল মিটিল না। ইতিমধ্যে দুরানীরা নবাব সুজার অনুচরবর্গের সহিত কলহ করিতে লাগিল এবং তাঁহার শিবির আক্রমণ করিবার ভয় দেখাইতে লাগিল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া উজীরের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমার নিকট পূর্ব্বে যেরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এই সকল, কি তাহার উচিত ব্যবহার হইতেছে?" উজীর বলিলেন "মহাশয় আমার এবং শাহের উভয়েরই আপনার সম্মান ও যত্নের প্রতি লক্ষ্য আছে, কিন্তু কি করিব, দুরাণী সেনা অদম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" নবাব বলিলেন, "বুঝিলাম, আপনাদের প্রতিশ্রুতির মূল্য কত?" এই বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, উজীর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আবার যেন সাক্ষাৎ হয়।" নবাব কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া নবাব বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিলেন, সকলেই বলিল যে দুরানী শাহের সহিত থাকা আর নিরাপদ নহে। সেই দিন অপরাহ্নেই শিবির ভঙ্গ করিয়া রাত্রিযোগে ১৫ ক্রোশ পথ অতি-ক্রম করিয়া আসিলাম, এবং ৫ দিন অবিশ্রান্ত কুচের পর গঙ্গাতীরবর্ত্তী মিন্দি-

ঘাট নামক স্থানে পৌঁছিলাম। নবাবের সন্দেহ হইয়াছিল, যে হঠাৎ পলায়ন করায় দুরাণী শাহ তাঁহাকে অনুসরণ জন্য সেনা প্রেরণ করিবেন, কিন্তু কেহই আসিল না। নবাব গঙ্গা পার হইয়া স্বরাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

পরে সংবাদ লেখকদিগের পত্রে জানা গেল, যে দুরাণী শাহ কোন প্রকারে সৈনিকগণকে দমন করিতে না পারিয়া, পরিশেষে ভারত রাজ্য ভোগের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাবুলে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে নজীবুদ্দৌলার নিকট হইতে নিজ সহায্য দানের মূল্য স্বরূপ ৪০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

উক্ত ইতিহাসে সদাশিবের মৃত্যু স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইলেও ঐ মৃত্যু লইয়া কয়েক বৎসর পরে বড়ই গোলযোগ হইয়াছিল। ১৭৭৯ শালে এক-ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া আপনাকে সদাশিব বলিয়া পরিচয় দিল। ইটাবা নগরে বালগোবিন্দ নামক একজন ধনী মহাজনের সহিত সদাশিবের বন্ধুতা ছিল, তাহারই বাটীতে ঐ ব্যক্তি প্রথম উপস্থিত হয়। আকার বয়সাদিতে ঐ ব্যক্তি ঠিক, প্রকৃতি সদাশিবের ন্যায় ছিল, এবং বালগোবিন্দ তাহাকে সদাশিব বোধে যত্ন ও সম্মান করিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি আপন ইতিহাস এই প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছিল, "পানিপতের যুদ্ধে আহত হইয়া আমি প্রাণে প্রাণে কুমায়ুন পর্ব্বতে পলায়ন করিলাম, সেখানে ৫ বৎসর কাল এক সম্প্রদায় ফকিরের সহিত থাকিয়া তাহাদের ব্যবহার ও আত্মসংযমাদি আচরণ করিয়া কাটাইলাম। তৎপরে বৈরাগীবেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিলাম, এক্ষণে আত্ম পরিচয় জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি।" ঐ ব্যক্তি পরে ছত্র-কোট হইতে বারাণসীতে রামচন্দ্র গোটকর, গণেশ ভট প্রভৃতি ভাওয়ের পুরাতন পরিচিত মহারাষ্ট্র অনুচরগণকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র লিখিল। তাহারা ছত্রকোটে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া কয়েক দিন পরামর্শ করিল, কিন্তু যখন ঐ ব্যক্তি বলিল, যে আমি যুদ্ধের পূর্ব্বে রামচন্দ্রের নিকট কয়েক লক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছি, তদবধি উহারা সকলেই উহাকে পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী প্রত্যাগমন করিল এবং প্রচার করিয়া দিল যে এ ব্যক্তি জাল সদা-শিব মাত্র। জালভাও বারাণসী আসিল; অনেক মহারাষ্ট্রীয় তাহাকে সত্য সদাশিব জ্ঞানে অর্থানুকূল্য করিতে লাগিল। ক্রমে ঐ ব্যক্তি প্রায় ৪০০

শত অনুচর সংগ্রহ করিয়া রামচন্দ্র গৌটকব প্রভৃতির নিকট দাবী ঋণ অর্দা-র্ঘের জন্য বলপ্রয়োগের উদ্যোগ করিল। ঐ সময়ে গ্রেহাম সাহেব কোম্পা-নির পক্ষে বানারসের রেসিডেণ্ট। তৎকালিক কাশী নরপতি মহারাজ চৈৎসিংহের ইংরাজের সহিত সদ্ভাব ছিল না, মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত তখন ইংরাজের যুদ্ধ চলিতেছিল। গ্রেহাম সাহেব সংবাদ পাইলেন যে চৈৎসিং জাল সদাশিবকে গোপনে আনুকূল্য করিতেছেন। তাঁহার মনে আরও উদয় হইল, (কেন হইল কে বলিবে ?) যে জাল সদাশিবের দ্বারা অধিবাসী গণ মধ্যে একটা গোলযোগ উত্থাপন করিয়া, সেই সুবিধায় সাহেবের প্রাণবধ করা চৈৎসিংহের ইচ্ছা। গ্রেহাম সাহেব চৈৎসিংহের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। চৈৎসিংহ সকল কথা অস্বীকার করিলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য উহাকে তৎসমীপে পাঠাইতে লিখিলেন। কিন্তু জাল সদা-শিব গ্রেহামের আদেশ গ্রাহ্য করিল না। গ্রেহাম সাহেব চৈৎসিংহের অনুজ্ঞা লইয়া বারাণসীর কোতোয়াল এবং কতকগুলি সিপাহী সমভিব্যাহারে জাল সদাশিবের আবাস গৃহ বেষ্টন করিয়া তাহাকে বন্দী করিলেন। উহার জবানবন্দী লইয়া সাহেবের চৈৎসিংহের গুপ্ত শত্রুতার প্রতি সন্দেহ বদ্ধমূল হইল, হইবারই কথা।

বারাণসীর আমিন কাছারি জেলে কিয়দ্দিবস আবদ্ধ রাখিয়া কলি-কাতার বোর্ডের আদেশ মত জাল সদাশিব চুনার দুর্গে প্রেরিত হইল। গ্রেহাম সাহেব অনেকবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার পরিচয়ের সত্যতা বিষয়ে তদন্ত করিয়াছিলেন, ক্রমে ঐ ব্যক্তিকে প্রকৃত সদাশিব বলিয়া গ্রেহামের বিশ্বাস হইল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে গ্রেহাম সাহেব মান্দ্রাজে বদলী হওয়ায় ঐ কথার আর উচ্চ বাচ্য রহিল না, জাল সদাশিব জেলে পচিতে লাগিল। ১৭৮১ সালের আগষ্ট মাসে গবর্ণর জেনরল হেষ্টিংস সাহেব, চৈৎসিংহের সহিত বিবাদের সময় চুনার দুর্গে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন ; তিনি জাল সদাশিবকে ডাকাইয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করার পর তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। দুর্ভাগা বারাণসীতে প্রত্যাগমন করিল, কিন্তু অধিক দিন জীবিত ছিল না। প্রবন্ধ লেখক কাশিরাজা পণ্ডিতও বারাণসীতে জাল সদাশিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ; তিনি বলিয়াছেন যে প্রবন্ধোক্ত শারীরিক চিহ্ন সকল এ ব্যক্তির শরীরে সমস্তই বিদ্যমান ছিল, তবে প্রকৃত সদাশিবের ন্যায় স্বভাব ও আচরণ ছিল না। যাহা

চটুক ঐ ব্যক্তি প্রকৃত সদাশিব কি না, এই সন্দেহ চিরকাল রহিয়া গিয়াছে।

আধ্যাত্মিক-অর্থ।

আজ কাল ধর্ম্মান্দোলন সংক্রামক রোগে পরিণত হইয়াছে। হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে—সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের কথা। জ্ঞানবয়োবৃদ্ধ ঋষিগণ সমৃদ্ধ সভা করিয়া যে সকল তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন, আজ অজাত-শ্মশ্রু অপরিণত-বুদ্ধি বালক সেই কূটতর্কে সময় অতিবাহিত করিতেছে! কি বিড়ম্বনা! কি দুর্দ্দৈব!! অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কালিদাসের প্রশংসার সহিত সেক্ষপীরের কুৎসা করা যেমন উপহাসের বিষয়, সেইরূপ জ্ঞান-বালকের ধর্ম্ম মীমাংসা উপহাসের বিষয়। হাসিবার যো নাই; সকলেই ধর্ম্মান্দোলী—ঠক্ বাছিতে গাঁ ওজোড়। শুক পক্ষীর "রাধাকৃষ্ণ" বুলির ন্যায় অনবরত ধর্ম্মবুলি বহির্গত হইতেছে। বালিতপ্ত স্থালী হইতে যেন ধন্য খৈ ফুটিতেছে। কেহ কেহ এই আন্দোলনরূপ অরুণের উদয় দেখিয়া ভবিষ্যতে সুখসূর্য্যের উদয় আশা করিতেছেন। কেহ বা পশ্চাদুদিত প্রবল মেঘ দেখিয়া আতঙ্কে অশ্রু-বারি বিসর্জ্জন করিতেছেন।

লোকের স্বভাব—হুজুগের স্রোতে গা ঢালিয়া দেয়। ভবিষ্যতে সে স্রোত সুখের সাগরে মিশ্রিত হইবে, কি দুঃখের সাগরে পরিণত হইবে, তাহা অনুধাবন করে না। অনেক সময়ে অনুধাবনেও কর্ত্তব্য স্থির করা কঠিন হয়।

আমার বিবেচনায় আন্দোলনেও উপকার হইতে পারে। সৎকর্ম্মের নকলও ভাল। নকল করিতে করিতে নকল আসলে উপস্থিত হইতে পারে। কদাচিৎ কচিৎ আন্দোলনের ফল ফলিবেই ফলিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে যে আকারে আন্দোলন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, ইহাতে তাদৃশ ফললাভ ঘটিবে বোধ হয় না।

প্রচলিত আন্দোলন ক্রিয়াগত নয়, কেবল অধ্যাত্ম কথায় পূর্ণ। আজ কাল বশিষ্ঠকে বশিষ্ঠ ঋষি এবং বিশ্বামিত্রকে বিশ্বামিত্র ঋষি ইত্যাদি ভাবিতে যেন লজ্জা হয়, কেননা ইহাঁদিগকে ঋষি বলিয়া, তাঁহাদের কৃত অলোকসাধারণ কার্য্য পরম্পরা,—স্বীকার করিলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপহাসাস্পদ হইতে

হয় ; অথচ হিন্দুধর্ম্ম পূর্ব্বপুরুষের আদরের ধন,অস্থিমাত্রাবশিষ্ট, দয়ার পাত্র ; সুতরাং ধর্ম্মটি কে মাজিয়া ঘসিয়া সুরুচির জলে পরিষ্কার করিয়া লইতে ইচ্ছা করেন, তাই "বশিষ্ঠ" বলিতে ইন্দ্রিয়বশীকরণশক্তি এবং "বিশ্বামিত্র" বলিতে বিশ্বের মিত্র ধর্ম্মজ্ঞান ইত্যাদি প্রকার (১) স্বকপোলকল্পিত অর্থে নিজে বুঝিবার চেষ্টা করেন এবং অন্যের চক্ষুতে এইরূপ ধূলিক্ষেপ করিতে প্রয়াস পান। এই বিশ্ব বিড়ম্বনায় হিন্দুধর্ম্ম আরও বিড়ম্বিত হইয়া সাধারণের ঘৃণার জিনিষ হইয়া পড়িতেছে, কেন না সকল কথারই এইরূপ একটি না একটি আধ্যাত্মিক অর্থ কল্পনা করা যাইতে পারে। অথচ কল্পিত, এত আয়াসের, অর্থ—নিরর্থক মাত্র। মনে করুন কেহ বলিল, "কালিদাস কুমারসম্ভব করিয়াছেন" আধ্যাত্মিক অর্থদর্শী ভাবিতে পারেন—কলয়তীতি কালী—প্রকৃতি। তাঁহার দাস অর্থাৎ তদধীন চৈতন্য। 'কু'শব্দে পৃথিবী, তাহাতে মরে যে অর্থাৎ মনুষ্য। ইহার তাৎপর্য্য প্রকৃত্যাশ্রিত চৈতন্য ক্ষিত্যাদির সৃষ্টান্তে, কুমার (মনুষ্য) সৃষ্টি করিয়াছেন। এরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অতি সহজ এবং অতি অকিঞ্চিৎকর। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে সেক্ষপীরের পুস্তকের আধ্যাত্মিক অর্থ প্রদর্শিত হইল না। পাঠক! ইচ্ছা করিলে কল্পনা করিয়া লইতে পারেন। এইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দুশাস্ত্রে বীতস্পৃহ হইতেছেন।

ফল কথা, আমি আধ্যাত্মিক অর্থের বিরোধী নই। যে আধ্যাত্মিক অর্থ ঋষিগণের বা বক্তার (?) অভিপ্রেত,তাহা নত শিরে স্বীকার করি। যে আধ্যাত্মিক অর্থ বটতলার উপজীবিকা বা সংবাদপত্রের পত্রপূরক, তাহার পক্ষপাতী নই, বরং বিরোধী।

লোকে আধ্যাত্ম্য অর্থের এত পক্ষপাতী হইয়াছে যে, বাহ্যার্থে এক প্রকার অন্ধ হইয়াছে। একদা একটি বিষয়ী লোক বলিল "রাবণ সীতাকে হরণ করেন।" এই কথা শুনিয়া জনৈক অধ্যাত্মদর্শী বলিলেন "বল দেখি রাবণ কে?" আমার বন্ধু বলিলেন "লঙ্কার রাজা।" তিনি বলিলেন "ওতো বাহ্যার্থ। দশানন—দশ ইন্দ্রিয়। সীতা প্রকৃতি। রাবণ অর্থাৎ" বন্ধু তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমার আর আধ্যাত্মিক অর্থ করিতে হইবে না। 'রাবণ সীতাকে হরণ করেন' এই বাহ্যার্থেই সমস্ত অর্থ পরিস্ফুট। সেই সঙ্গে তোমারও বিদ্যা বুদ্ধি পরিস্ফুট।"

(১) যথা অধিক, বশিষ্ঠ, ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতির নাম।

গায়ত্রী সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতির আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। তাহার বাহিরের অর্থ বহির্জগতের আরাধনা, আর আন্তরিক অর্থে অন্তর্জগতের আরাধনা। এই দ্বিধা বিভক্ত উপাসনাপ্রণালী উপাসকভেদে সৃষ্ট হইয়াছে। যাহাদের চিত্ত বহির্জগতের কার্য্যপ্রপঞ্চে আকৃষ্ট, তাহারা বাহ্যার্থে মুগ্ধ হইয়া উপাসনা করিবে। এইরূপ উপাসনা করিতে করিতে চিত্তের নির্ম্মলতা সাধিত হইবে; সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জগতে প্রবেশের অধিকার হইবে। যাহারা অন্তর্জগতে সর্ব্বদা বিচরণ করে, তাহারা অন্তরের অর্থের অনুসন্ধান করে। বাহ্যবিষয়ে চিত্ত আকৃষ্ট থাকিলে আধ্যাত্মিক অর্থ ধারণা করিতে পারে না। যে অন্তর্জগতের পদার্থনিচয় চেনে না, সে কেমন করিয়া সেই পদার্থ-ঘটিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবে? কয়জন ব্যক্তি গায়ত্রীর অর্থ বুঝিতে পারে—কয়জন বা গায়ত্রীর "ধী" ধারণা করিতে পারে? এই হেতু বলিয়াছেন,—

"ইদং গুহ্যতমং লোকে ন দেয়ং যস্যকস্যচিৎ।
জ্যেষ্ঠপুত্রায় শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় বা পুনঃ॥ ইত্যাদি"

অনেকে বলিতে পারেন, এইরূপ ভিতর বাহিরের দুইটি অর্থ কখন ঋষিগণের অভিপ্রেত হইতে পারে না। শ্লেষবাদী ভিন্ন কোন বক্তা দ্ব্যর্থ শব্দ ব্যবহার করেন না। প্রত্যুত ভ্রম প্রমাদ, প্রবঞ্চনা রহিত বেদ এইরূপ দ্বিভাবে গঠিত হইয়া লোককে বঞ্চনা করিতেছে, ইহা কখন যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। —এই তর্ক-বায়ুতে ঘূর্ণিত হইয়া অনেকে ভ্রমসাগরে পতিত হন। বাস্তবিক বেদের দ্ব্যর্থ বোধকতা উদ্দেশ্য নয়। কেবল আধ্যাত্মিক অর্থবোধক শব্দ নাই, হইতেও পারে না। বাহ্যার্থ প্রকাশক শব্দ সাহায্যে আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহ হয় মাত্র। এই হেতু শ্রুতিতে আছে—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেঽপ্রাপ্যমনসা সহ।"

বাক্যে আধ্যাত্মিক অর্থ বলিয়া উঠিতে পারে না কেবল সহায়তা মাত্র করে। অথচ বাক্যমাত্রেরই একটি না একটি অর্থ আছে; সে অর্থ আবার লৌকিকভাবে পূর্ণ। কাজেই বেদাদি দ্ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে। সেই দ্ব্যর্থ ভাবে পরিণত বেদও আমাদের পরম উপকারী। যেমন মৃত্তিকারূপে পরিণত ঈশ্বর আমাদের পরমার্থের অনুকূল। তাহার (মৃত্তিকার) বাহিরে মৃত্তিকা বা জড়ভাব, অন্তরে ঈশ্বর বা চৈতন্যভাব। দ্বিভাবই সত্য; অথচ উপাসনার সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্যই আধ্যাত্মিক ঈশ্বরভাব। মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা অবলম্বন ব্যতীত ঈশ্বরোপ সনার প্রতিষ্ঠা হয় না, তাই সাধক মৃত্তি-

কান্ত চৈতন্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাহাতে মিশাইতেছে। সেইরূপ বাহ্যার্থ অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক অর্থ বিরাজ করে। বাহ্যার্থ ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক অর্থের প্রতিষ্ঠা হয় না, অথচ প্রতিমার ন্যায় বাহ্যার্থ নিরর্থক মাত্র।

সাধারণ জনগণ আধ্যাত্মিক অর্থোপদেশের পাত্র নয়। অসম্পূর্ণোপাসনাবস্থায় আধ্যাত্মিক ভাব হৃদয়ে ধারণা হয় না। অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিলে ফল হইতে পারে। চৈতন্যদেবের সম্পূর্ণ ধর্ম্মের উপদেশ অসম্পূর্ণাবস্থার ব্যক্তিও গ্রহণ করিতেছে, তাই তাহার ফল বিপরীত ঘটিয়াছে। বাবাজীরা নামমাত্র কৌপীনধারী হইয়া দ্বারে দ্বারে "হরি বোল" ব'লে মুষ্টি ভিক্ষা করিতেছে, আর অধর্ম্মের অবতার হইয়া ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সমস্ত অকার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছে, কিন্তু আমাদের শাস্ত্র উপদেশ দানে সবিশেষ সতর্ক, তাই আজিও হিন্দুধর্ম্ম অস্থিমাত্র সার হইয়াও সজীব রহিয়াছে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ধর্ম্মের দ্বেষাদ্বেষী।)

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কেষ্টা বন্দা, রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন এবং রেবরেণ্ড কে এম ব্যানার্জ্জী। এই চতুর্ব্বিধ নামধারী ব্যক্তি বঙ্গদেশের যে এক জন অতি চিহ্নিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা আর আমার এক্ষণে বলিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না। খ্যাত্যাপন্ন পাঁচালী রচয়িতা এক চক্ষু অন্ধ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস; তাঁহার অন্যতর নাম লখে কাণা ছিল। তিনি বলিতেন যে "যিনি আমাকে লক্ষ্মীকান্ত বলেন, তিনিই আমাকে বিশ্বাস বলেন, কিন্তু যে ব্যাটা আমাকে লকে বলে সে ব্যাটাই আমাকে কাণা বলে।" সেইরূপ চারি প্রকার লোকে কৃষ্ণমোহনকে চারি প্রকার নামে অভিহিত করিত। তাঁহার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খ্রীষ্টান হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার সেই নামই ছিল, কিন্তু যখন তিনি খৃষ্টান হইয়া হিন্দুদিগকে বিরক্ত করিয়া তুলিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে কেষ্টা বন্দা বলিয়া ডাকিত। পক্ষান্তরে সাহেব এবং দেশী খ্রীষ্টান মহলে তিনি রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কনবোকেশন এবং

সভাসমিতিতে তিনি রেবারেণ্ড কে, এম, বানর্জ্জী বলিয়া সম্মানিত হইতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেমন বিদ্যাবুদ্ধির জোর তেমনই আবার বৈষয়িক বুদ্ধিও চমৎকার ছিল। আমি অনেক বিচক্ষণ লোককে বলিতে শুনিয়াছি যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টান হইয়া যেমন দেশী খ্রীষ্টানের মধ্যে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, খৃষ্টান না হইলেও তিনি যে ব্যবসায় প্রবেশ করিতেন তাহাতেই তিনি যশস্বী এবং প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। এই সময়ে বঙ্গদেশে কয়েকজন বড় বড় লোকের জন্ম হইয়াছিল এবং যদিও তাঁহারা সকলে কৃষ্ণমোহনের সমবয়স্ক ছিলেন না, তথাপি তিনি তাঁহাদের সমসাময়িক ছিলেন। প্রথমতঃ রামমোহন রায়, তখন কৃষ্ণমোহন অবশ্যই বালক ছিলেন। তদনন্তর দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, মতিলাল শীল, রসময় দত্ত; তদনন্তর কাশীপ্রসাদ ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত; তদনন্তর হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র জীবিত আছেন, আর সকলেই কৃষ্ণমোহনের অগ্রে লোকান্তরিত হইয়া গিয়াছেন।

কলিকাতাই ছিল কৃষ্ণমোহনের জন্মস্থান। বাহির সিমলা গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলিতে তাঁহার বাড়ী ছিল এবং সেইখানে বোধ করি এখনও তাঁহার একজন জ্ঞাতির বাস আছে। কুলীন বামনের ছেলে কৃষ্ণমোহন অবশ্যই শ্রীমান ছিলেন। বর্ণ আগে ছিল উজ্জ্বল শ্যাম, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া মদ্য-মাংস-সেবন, গাত্রে সাবানানুলেপন ও সাহেবী ধরণে কালযাপন করাতে বর্ণটা শেষে গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল। খৃষ্টান হওয়ার পরে কৃষ্ণমোহন যদিও ধুতি চাদর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কখনও সাহেবী হ্যাট কোট অবলম্বন করেন নাই; কেবল ইদানীন্তন দুই গালে দুইটা শ্বেত চুলের গালপাট্টা রাখিয়া এমন সুন্দর মুখখানি বিকৃত করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক হইতে হইলে যে সকল ভাষায় অভিজ্ঞ হইতে হয়, তৎসমস্তই কৃষ্ণমোহন বিসপস্ কালেজে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তদতিরিক্ত তিনি সংস্কৃতও শিখিয়াছিলেন; কিন্তু গোলডষ্টুকর, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি ইউরো-

পীয় পণ্ডিতগণ যে উদ্দেশ্যে সংস্কৃত চর্চ্চায় উন্মত্ত হইয়াছেন, কৃষ্ণ-মোহনের ঠিক তাহার বিপরীত উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা হইয়াছিল। তিনি কেবল হিন্দুধর্ম্মের এবং হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের ছিদ্র অনুসন্ধান করিবার এবং দোষ দেখাইবার নিমিত্ত এই অদ্বিতীয় ভাষাটী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কার্য্যই সেই উদ্দেশ্যমুখী বলিয়া বোধ হয়।

ইদানীন্তনই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বজাতিবৎসল হইয়াছিলেন। তাহাতেই সভাসমিতিতে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া সভাপতি স্বরূপে বরণ করা হইত এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন সংস্থাপনের জন্যও অনেকে ব্যস্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। পূর্ব্বে বরং কৃষ্ণমোহন হিন্দু-সমাজের একজন পরম শত্রু বলিয়াই পরিগণিত ছিলেন। কলিকাতায় অধিক লোকে তাঁহাকে 'ঘর মজানে কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিত। বালকদিগকে এক বারের অধিক তাঁহার সংসর্গে দেখিলে তাহাদের বন্ধুবান্ধবেরা সশঙ্কিত হইত। ফলেও কৃষ্ণমোহন অনেক অপরিণত-বয়স্ক এবং সুকুমারমতি হিন্দু বালকের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি যে কত হিন্দু পিতামাতাকে শোক-সাগরে ডুবাইয়া তাহাদের অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও জ্ঞানেন্দ্র-মোহন ঠাকুর। যদি হিন্দুবালকদিগকে কেবল ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে কিছু বলিবার থাকিত না। কারণ, তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক এবং সেই নিমিত্ত বেতনভোগী। সেই ধর্ম্ম প্রচার করাই তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল এবং তাহাতে তিনি উৎসাহ দেখাইলে নিন্দার পাত্র না হইয়া বরং তিনি প্রশংসনীয়ই হইতে পারেন। কিন্তু শুদ্ধ তাহা নহে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির চক্রান্তটাও বহুল পরিমাণে ছিল। বালকের মন একবার খৃষ্টান ধর্ম্মের দিকে ধাবমান করিতে পারিলে তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা পরে আর তাহার মতি ফিরাইতে না পারে তৎপ্রতি কৃষ্ণমোহনের বিলক্ষণ যত্ন ও দৃষ্টি ছিল এবং সেই জন্য কোন বালক একবার তাহার পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলে তাহাকে আর তাহার পিতামাতার সহিত সর্ব্বদা দেখা কিম্বা কথোপকথন করিতে দিতে আশঙ্কা করিতেন। কৃষ্ণমোহন জানিতেন যে বাঙ্গালী বালকেরা তাহাদের পিতামাতার অত্যন্ত বশীভূত, অতএব যদি বালক তাহার মাতার ক্রন্দন দেখিয়া কিম্বা পিতার বিনয়বাক্য

শুনিয়া ভুলিয়া যায়,তাহা হইলে তাঁহার শীকার হাতছাড়া হইয়া যাইবে, সেই জন্য বালককে তাহার বন্ধুবান্ধবের অন্তর করিয়া রাখিয়া যত শীঘ্র সাধ্য তাহাকে ব্যাপ্‌টাইজ করা হইত। তবে কেবল লোক দেখান যে দুই একবার তাহাকে দেখা করিতে দেওয়া হইত সে কেবল নাম মাত্র। বালক একবার হস্তগত হইলে ব্যাপ্‌টাইজ না হওয়া পর্য্যন্ত সে কদাচিৎ বাহিরে যাইতে পারিত না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত খৃষ্টান হওয়ার অভিপ্রায়ে পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া (শুনিয়াছি) প্রথমে কৃষ্ণমোহনের আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণমোহন দেখিলেন যে মধুর পিতা রাজনারায়ণ বাবু একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। তাঁহার জমিদারীতে অনেক লাঠিয়াল শড়কীওয়ালা আছে,বিশেষ কলিকাতায় সমস্ত ধনাঢ্য হিন্দুদিগের সহানুভূতি রাজনারায়ণ বাবুর পক্ষে, অধিকন্তু কলিকাতায় পুলিষও তখন পরাক্রান্ত ছিল না, অতএব রাজনারায়ণ বাবু ইচ্ছা করিলে অনায়াসে মধুকে তাঁহার গৃহ হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে সমর্থ হইবেন, এই আশঙ্কায় যে পর্য্যন্ত ব্যাপ্‌টাইজ করা না হয় সে পর্য্যন্ত মধুকে কেল্লার মধ্যে কোন স্থানে গোপন করিয়া রাখিবার মন্ত্রণা করিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শ মতে লাট-পাদ্রী কেল্লার কর্ত্তা ব্রিগেডিয়ার পৌণী সাহেবকে অনুরোধ করিয়া কেল্লার মধ্যে ঐ সাহেবের কুঠিতে মধুর থাকিবার এরূপ এক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন যে তথায় যাইয়া রাজনারায়ণ বাবু কিম্বা অন্য কোন বাঙ্গালী মধুর প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে কোন মতেই সমর্থ হইবেন না। এই স্থানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কৃষ্ণমোহন যে খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন,মধু সেই সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইয়াছিল বলিয়াই লাট-পাদ্রী এবং ব্রিগেডিয়ার পৌণী সাহেব মধুকে ঐরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন,নচেৎ অন্য কোন সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইলে তাঁহারা সেইরূপ সাহায্য করিতেন কি না সন্দেহের বিষয়।

জ্ঞানেন্দ্র ঠাকুরের খৃষ্টান হওয়া এবং কুচবিহারের রাজার ব্রাহ্ম হওয়া সমান কথা। উভয় ঘটনাতেই ধর্ম্মযাজকের আত্ম-স্বার্থ-বিশিষ্ট গাঢ় অভিসন্ধি নিহিত ছিল। এই দুই কার্য্যের জন্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম্মের নিকট অব্যাহতি পাইবেন কি না তাহা যিনি ধর্ম্ম তিনিই জানেন, কিন্তু উভয়েরই লোকসমাজে বুঝাইবার অনেক কথা ছিল। জ্ঞানেন্দ্র বাবু অধিক বয়সে এবং যখন তাঁহার বুদ্ধি খুব প্রস্ফুটিত এবং পরিপক্ক হইয়াছিল, তখন খৃষ্টান হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া-

ছিলেন। তন্নিমিত্ত কৃষ্ণমোহনকে কেহ নিন্দা করিতে পারে না আমি বরং তাঁহাকে প্রশংসাই করি। কৃষ্ণমোহন উত্তম কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বংশকে উচিত প্রতিফল দিয়াছিলেন। পীরালী মহাশয়েরা কন্যাভারগ্রস্ত হইলে টাকার প্রলোভন দেখাইয়া কুলীনের ছেলেদের জাতিনাশ করেন, কৃষ্ণমোহন না হয় ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া তাঁহার অবিবাহিতা কন্যার নিমিত্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে হস্তগত করিয়াছিলেন; ইহাতে কৃষ্ণমোহনের কিছুমাত্র দোষ নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া বৃদ্ধ এবং ব্যথিত প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে বালক এবং ইতর ব্যক্তির ন্যায় ঠাট্টা বিদ্রূপ এবং অবমানিত করা কৃষ্ণমোহনের উচিত কার্য্য হয় নাই। জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে খৃষ্টান করিয়া এবং তাঁহাকে কন্যা বিবাহ দিয়া কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে পরিমাণে উল্লাস এবং উৎসাহ হইয়াছিল, তাহার অধিক পরিমাণে প্রসন্নকুমারের দুঃখ ও মনঃক্ষোভ হইয়াছিল। অনেকের বিশ্বাস যে জ্ঞানেন্দ্র বাবুর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করায় তাঁহার পিতার যত আপত্তি ছিল, তাহার শতগুণ অধিক আপত্তি কৃষ্ণমোহনের কন্যাকে বিবাহ করাতে হইয়াছিল। কিন্তু যে কোন কারণে হউক, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, প্রসন্নকুমার বাবু তাঁহার শেষ বয়সে পুত্রের কার্য্যগতিকে মনে বড় শক্ত ব্যথা পাইয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার বাবুর হৃদয় বিলক্ষণ সংযত এবং কঠিন ছিল এবং সেই জন্য তাঁহার কথাবার্ত্তায় কিম্বা কার্য্য-কর্ম্মে সহসা কেহ তাঁহার শোক দেখিতে পাইত না; কিন্তু রাবণের চুল্লির ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণের ভিতর পুত্রের বিরহাগ্নি যে সদাসর্ব্বক্ষণ প্রজ্জ্বলিত ছিল, তাহা তাঁহার সহচরেরা সকলেই সহজে অনুভব করিতে পারিত এবং কৃষ্ণমোহনও তাহা না জানিতেন এমন নহে; বরং তিনি অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা প্রসন্নকুমার বাবুর অনেক গোপনীয় এবং আন্তরিক সংবাদ অবগত ছিলেন।

আমি জানি, এক দিবস প্রসন্নকুমার বাবু বায়ু-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে তাঁহার বিখ্যাত মুঙ্গেরের পীরপাহাড়ীর বাড়ীতে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়া হাওড়ার রেলওয়ে ষ্টেষণের প্ল্যাটফরমে উপস্থিত হইয়া ধীর গতিতে প্রথম শ্রেণীর এক গাড়ীতে যাইয়া উঠিতেছিলেন। সেই দিন কৃষ্ণমোহন ও তাঁহার স্ত্রী অন্য কোন স্থানে যাইবার জন্য তাহার পূর্ব্বক্ষণে অন্য এক গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সেই গাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া কৃষ্ণমোহন তাঁহার স্ত্রীকে উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন

"ঐ দেখ আমাদের বিয়াই যাইতেছেন।" প্রসন্নকুমার বাবু এই কথা শুনিবামাত্র ঘাড় হেঁট করিয়া দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণমোহন নাছোড়বন্দা ; কৃষ্ণমোহন তৎক্ষণাৎ তাঁহার গাড়ী হইতে নামিয়া যথাসাধ্য উচ্চ কণ্ঠে "ও বেয়াই ও বেয়াই" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন "বিয়াই আসুন না কেন আমরা দুই বেয়াই এবং বেয়ানে একত্র হইয়া এক গাড়ীতে যাই।" কৃষ্ণমোহনের এই ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া এবং পথি মধ্যে কৃষ্ণমোহন কর্ত্তৃক আরও অবমানিত হওয়ার আশঙ্কায় প্রসন্নকুমার বাবু সেই যাত্রায় মুঙ্গের যাওয়া রহিত করিয়া অধোমুখে এবং ভগ্নহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইরূপ কৃষ্ণমোহন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর ঘটিত অনেক উপখ্যান আছে, কিন্তু তাহা লিখিয়া আমি আর পাঠকবৃন্দের সময় নষ্ট করিব না। এসকল কথা তাহাদের ভাল লাগিবে না।

যাহাতে হিন্দুর উৎসাহ, তাহাতেই কৃষ্ণমোহনের নিরুৎসাহ এবং যাহাতে তাহাদের উদ্যোগ ও আনন্দ, তাহাতেই তাঁহার নিরানন্দ ছিল। হিন্দুদিগের সভাসমিতিতে তিনি যোগ দিতেন না এবং হিন্দুদিগের যাহাতে কোন উপকার হয় তাহার দশ হাত অন্তর দিয়া চলিয়া যাইতেন। এই দেখুন না কেন, যে হেয়ার সাহেব হিন্দুসমাজের নিকট দেবতার ন্যায় পূজিত ছিলেন এবং যাঁহার কৃপায় এবং যাঁহার স্কুলে বিনা বেতনে কৃষ্ণমোহন ইংরাজী বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বাঙ্গালীর মধ্যে কেবল কৃষ্ণমোহনই সেই হেয়ার সাহেবের বৈরঙ্গ ছিলেন। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পরে কলিকাতায় সকল হিন্দু বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাদা ভাঙ্গিয়া তাঁহার শবের সঙ্গে সঙ্গে সমাধি-স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছিল, কেবল কৃষ্ণমোহন সেই যাত্রায় যোগ দেন নাই। কৃষ্ণমোহন যদি সেই সমাধি স্থানে উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে শুনিতে পাইতেন যে স্কচ্ চর্চ্চের পুরোহিত রেবারেণ্ড ডাক্তার চার্লস্ সাহেব বাইবেলের এক শাস্তিপূর্ণ বচন ভিত্তি করিয়া হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় উপস্থিত শ্রোতাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। বাইবেলের সেই বচন এই—'Ye fight not with the dead' অর্থাৎ তোমরা মৃতব্যক্তির সহিত বিবাদ করিওনা। অনেকের মনে হইয়াছিল কথা গুলা যেন কৃষ্ণমোহনকে উপলক্ষ করিয়াই বলা হইতেছে। হেয়ার সাহেবের স্মরণ-চিহ্ন সংস্থাপনের জন্য মেডিকেল কালেজ গৃহে হিন্দুদিগের এক

মহতী সভা হইয়াছিল তাহাতেও কৃষ্ণমোহন উপস্থিত হয়েন নাই। হেয়ার সাহেবের প্রতি কৃষ্ণমোহনের মনোমালিন্যের কারণ আর কিছুই নয়, কেবল খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রতি হেয়ার সাহেবের অধিক শ্রদ্ধা ছিল না এবং হিন্দুর ছেলেরা যে খ্রীষ্টান হয়, তাহা তিনি ভাল বাসিতেন না।

হিন্দুকালেজের উপরেও কৃষ্ণমোহন বাবুর বিরাগ ছিল, কারণ তাহাতে হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয় বালক বিদ্যাভ্যাস কবিতে পাইত না এবং বাইবেল কিম্বা খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন পুস্তক পঠিত হওাব অনুমতি ছিল না। কৃষ্ণমোহনের বিশ্বাস ছিল যে হিন্দু কালেজের কোন রূপ বিঘ্ন করিতে পারিলে অনেক হিন্দু বালককে তিনি খৃষ্টান করিতে পারিতেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি এক বার একটী সুন্দর কৌশল খেলিয়াছিলেন ; কিন্তু হিন্দু-কালেজের সৌভাগ্যে এবং হেয়াব সাহেবের উদ্যোগে সেই কৌশল সফল হইতে পারিল না। বলিয়া কষ্ট পাইতে হইবে না যে কৃষ্ণমোহনই প্রথমে দেশী খৃষ্টানের কুল পবিত্র কবিয়াছিলেন। পূর্ব্বে হিন্দু ভদ্রবংশীয় কিম্বা কৃতবিদ্য লোকে খৃষ্টান হইত না। পাদ্রী সাহেবেরা নীচ জাতীয় লোককে ব্যাপ্‌টাইজ করিতে পাবিলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। দুর্ভিক্ষের সময় সুন্দর বনের এবং অনেক জেলাব দুর্গম্য স্থানের দরিদ্র কৃষী প্রজাদিগকে ধান চাউল এবং টাকা দিয়া কিম্বা জমিদাব তালুকদারের অত্যাচাব হইতে বক্ষা করাব প্রলোভন দেখাইয়া খৃষ্টান কবা হইত। কলিকাতায় মৃজাপুরে সাণ্ডিল সাহেবের গির্জ্জাতে যে সকল বাঙ্গালী খৃষ্টান বাস করিত তাহাদের অধিকাংশ সাহেবদিগের খানসামা, খিদমতগার, চাপরাশী বা পেয়াদা ছিল। স্ত্রীলোকেরা মেম সাহেবদিগের আয়াগিরী কার্য্য করিত। অধিক সম্মানের চাকরী হইলে কাটিকিষ্ট নামক নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধর্ম্ম প্রচারকের চাকরী পাইত ; কিন্তু খ্রীষ্টান হইয়া বিসপ্‌স্‌ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া রেবারেণ্ড উপাধি পাইবার পবে তাঁহার চেষ্টায় দেশী খ্রীষ্টান সমাজের উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। পাদ্রী সাহেবেরা দেখিলেন যে কালা খ্রীষ্টানদলের পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণমোহনেব পদ বৃদ্ধি কয়া আবশ্যক এবং তাঁহারা ভাবিলেন যে কৃষ্ণমোহনের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে অনেক ভদ্র বাঙ্গালী যুবা ঐ প্রলোভনে পড়িয়া খৃষ্টান হওয়ার জন্য প্রার্থিত হইবে। কিন্তু তাঁহারা ইহাও দেখিলেন যে সাহেবদিগের গির্জ্জার মধ্যে কালা পাদ্রীর স্থান হইবে না। চৌরঙ্গির ব্রজীতলার বড় গির্জ্জা ঘর নির্ম্মিত হইলে পরে, কৃষ্ণমোহনকে

তাহার মধ্যে এক কার্য্যের ভার দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু সাহে- বেরা কালা আদমির পৌরহিত্য স্বীকার করিতে অসম্মত হইলেন কাজেই কয়েক দিন ধরিয়া কৃষ্ণমোহনকে লইয়া পাদ্রীর কর্ত্তৃপক্ষগণের বিভ্রাট উপ- স্থিত হইল। সে যাহা হউক অবশেষে পাদ্রীরা এক মন্ত্রণা করিয়া সেই দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। মন্ত্রণায় স্থিরীকৃত হইল যে কৃষ্ণমোহনকে সাহেবী কোন গির্জ্জায় নিযুক্ত না করিয়া বাঙ্গালী খৃষ্টানদিগের জন্য কলিকাতায় বাঙ্গালী টোলার মধ্যে এক নূতন গির্জ্জা বানাইয়া তাহার প্রধান পাদ্রী পদে কৃষ্ণমোহনকে নিযুক্ত করিলেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কার্য্য হইবে, কারণ তদ্দ্বারা কৃষ্ণমোহনেরও উচিত পুরস্কার হইবে এবং হিন্দুরাও দেখিতে পাইবে যে উপযুক্ত ব্যক্তি খৃষ্টান হইলে পাদ্রীরা তাহাকে উপযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত করিতে ত্রুটি করিবেন না।

এই গির্জ্জার স্থান নির্ণয়ের সময়ে কৃষ্ণমোহন তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা দেখাইলেন এবং এক বাণে দুই পক্ষী শীকার করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি মিসনরী সাহেবদিগকে পরামর্শ দিলেন যে হিন্দু কলেজের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এই গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে পারিলে কালেজের ছাত্রেরা অন্তত তামাসা দেখিবার জন্য গির্জ্জাতে না আসিয়া ও প্রচারের বাক্য না শুনিয়া থাকিতে পারিবে না; হেয়ার সাহেব কিম্বা কালেজের অধ্যক্ষগণ কতদিন তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া রাখিবেন? নিষেধক হুকুম অবশ্যই ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িবে, কাজে কাজেই অবশেষে কৃষ্ণমোহন তাঁহার বহুকালের মনস্কামনা সিদ্ধি করিতে পারিবেন। এই মন্ত্রণা করিয়া কৃষ্ণমোহন অতি গোপনে হিন্দু- কালেজের পশ্চিমের বারাণ্ডার পশ্চিম ধারে, যেখানে এক্ষণে হেয়ার স্কুল এবং প্রেসিডেন্সি কালেজ হইয়াছে, সেই স্থানটী ক্রয় করিয়া তাহাতে গির্জ্জা নির্ম্মাণের কল্পনা করিলেন। এই স্থানে পূর্ব্বে একটা বৃহৎ বস্তী ছিল, খোলার ঘর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, আমরা কলেজে আসিয়া এই স্থানের লোহার কর্ম্মকারদিগের দ্বারা লাটিমের আল বসাইয়া লইতাম। এ দিকে ভিতরে ভিতরে কৃষ্ণমোহন মহা সমারোহের সহিত প্রস্তাবিত গির্জ্জার ভিত্তি সংস্থাপনের আয়োজন করিলেন, কিন্তু হেয়ার সাহেব এবং হিন্দু কালেজের কোন অধ্যক্ষই ইহার কোন সংবাদ জানিতেন না। অবশেষে ভিত্তি সংস্থা- পনের অতি অল্প সময় পূর্ব্বে, এক কি দুই দিবস পূর্ব্বে, কি ঠিক সেই দিবস প্রাতে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। ভিত্তি গাড়ার

কার্য্যটা বৈকালেই সাধারণত হইয়া থাকে। আমরা কালেজে আসিবার সময় দেখিলাম যে সেই বস্তীর মধ্যে একটী স্থান পরিষ্কৃত হইতেছে, কয়েক গাড়ী বাঁশ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আসিয়াছে এবং অনেক কুলী মজুর সেইখানে সমবেত হইয়াছে। আমার উত্তম স্মরণ আছে যে, কালেজ বসিবার পরে কালেজের অধ্যক্ষদিগের নিকট হইতে হুকুম আসিল যে সেই দিবস নিয়মিত ৫টার সময় ছুটি হইবে না, সন্ধ্যার পরে ছুটি হইবে এবং কোনও বালক সন্ধ্যার পূর্ব্বে কালেজ গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। এমন কি প্রহরীরা সেই দিবস কোন ছাত্রকে কালেজের হাতার পশ্চিম দিকের রেলের নিকট যাইতে দেয় নাই। আমরা বালক আমরা রাজনীতি কি বুঝি? স্কুলে আসিবার সময় বস্তীতে আয়োজন দেখিয়া বড়ই আশা করিয়াছিলাম যে ছুটি হইলে পরে আমরা যাইয়া পেট ভরিয়া তামাসা দেখিব, কিন্তু কালেজের মধ্যে আসিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছুটি হইবেনা শুনিয়া নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ হইলাম, তথাপি আমরা অনেকে মনে করিলে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু শিক্ষকেরা স্বীয় স্বীয় ক্লাসের ছাত্রেরা ক্লাস ছাড়িয়া যাইতে না পারে তৎপ্রতি অত্যন্ত সাবধান হওয়াতে আমরা পলাইতে পারিলাম না, বিশেষ হেয়ার সাহেবের প্রহারের ভয়েও আমরা নিরস্ত হইয়া রহিলাম। কিন্তু কৃষ্ণমোহনের এত আয়োজন এবং দর্শকদিগের এত আশা সকলই নিষ্ফল হইল। সে দিবস ভিত্তি গাড়া হইল না। শুনিলাম যে হেয়ার সাহেব, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, মতিলাল শীল প্রভৃতি হিন্দুসমাজের প্রধান কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া সুপ্রিমকোর্টের প্রধান জজ স্যার এডওয়ার্ড রায়েলের সহকারে বড় লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার দ্বারা লাট পাদ্রীকে সেই দিবস প্রস্তাবিত গির্জ্জার ভিত্তি গাড়ার কার্য্য স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন এবং লাট পাদ্রীও সেই অনুরোধ মতে ভিত্তি সংস্থাপন করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। হিন্দিতে বলে যে "এক দম হাজার উমেদ" এই গির্জ্জা সম্বন্ধে ঠিক তাহাই ঘটিল। নির্দ্ধারিত দিবসে ভিত্তি সংস্থাপিত না হওয়াতে হেয়ার সাহেব ও হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া পাদ্রীদিগের সেই কার্য্য রহিত করিতে কৃতকার্য্য হইলেন এবং অবশেষে অধ্যক্ষগণ পাদ্রী সাহেবদিগের নিকট সেই ভূমিখণ্ড উচিত মূল্যে ক্রয় করিয়া তাহার উপরে এক বাঙ্গালা পাঠশালা

সংস্থাপন করিলেন। পাদ্রী সাহেবেরা হেদুয়া পুষ্করিণীর নৈর্ঋত কোণে ভূমি সংগ্রহ করিলেন এবং তাহার উপরে ক্রাইষ্টচার্চ্চ নামে সুন্দর এক গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া কৃষ্ণমোহনকে সেই গির্জ্জার প্রধান পাদ্রী পদে বরণ করিলেন। এই রূপে উভয় কুল বজায় রহিল।

হিন্দুকালেজের প্রতি বিরাগ কেবল এক কৃষ্ণমোহনের ছিল এমন নহে, খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক-মণ্ডলীর মধ্যে এই ব্যাধিটী যেন সংক্রামক ছিল। হিন্দু-কালেজের শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি কোন দোষারোপ কিম্বা সেখানকার ছাত্র-দিগকে অপদস্থ কিম্বা অবমানিত করিতে পারিলে পাদ্রীসাহেবেরা চেষ্টার ত্রুটি করিতেন না, এই বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত আমি এই স্থানে বিবৃত করিব। আমাদের সময়ে হিন্দুকলেজে যেমন সাহিত্যের অধ্যাপক বিখ্যাত রিচার্ডসন্ সাহেব ছিলেন, গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক তেমনি বিখ্যাত রীজ সাহেব ছিলেন। ইদানীন্তনও রীজ সাহেব নামে আর একজন অঙ্কশাস্ত্রে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু তিনি আমাদের রীজ সাহেব নহেন। আমাদের রীজ সাহেব যদিও রিচার্ডসন্ সাহেব প্রভৃতির ন্যায় খ্যাতাপন্ন ছিলেন না তথাপি তিনি গণিত বিদ্যায় একজন ধূর্দ্ধর ব্যক্তি ছিলেন। রীজ সাহেব ইংরাজ ছিলেন না, তিনি সুইজরল্যাণ্ড দেশের অধিবাসী এবং কেহ কেহ বলেন যে তিনি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সৈন্যের মধ্যে একজন সেনা ছিলেন। সে যাহা হউক ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অতি অল্প অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি প্রথমে প্রথমে Stop the motion of a ballবলিতে যাইয়া Stop the go of a ball বলিতেন। পক্ষাঘাত রোগে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল, বাম হস্তে লিখিতেন। তিনি ছাত্রদিগের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন এবং যে প্রকারে তাহাদের উন্নতি করিতে পারিতেন তদ্বিষয়ে চেষ্টার ও যত্নের ত্রুটি করিতেন না। রীজ সাহেব এক বার (বোধ হয় ১৮৪৭ কিম্বা ১৮৪৮ সালে হইবে) প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে গণিত-জ্যোতিষে সূর্য্যগ্রহণ গণনায় উপদেশ দিয়া কয়েক জন ছাত্রকে আশু-সম্ভবনীয় এক সূর্য্যগ্রহণ গণনা করিতে আদেশ করেন, তাহাতে ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের গণনাই উৎকৃষ্ট এবং বিশুদ্ধ হয়। এই ঈশ্বর বাবু পরে বহুকাল ধরিয়া ডেপুটী-মাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং এই ক্ষণে পেনসন্ পাইতেছেন। ঈশ্বরের গণনায় রীজ সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এবং অন্যান্য ছাত্রের উৎসাহের নিমিত্ত সেই গণনা

বেঙ্গাল হরকরা কাগজে ছাপাইয়া দিয়াছিলেন। এখন যেমন ইংলিসম্যান কাগজ, তখন তেমনি দৈনিক কাগজের মধ্যে বেঙ্গল হরকরা এবং সাপ্তাহিক কাগজের মধ্যে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্বাদ পত্রই প্রধান ছিল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে ইংরাজী গণিত বিদ্যার মধ্যে সূর্য্যগ্রহণ গণনা অতি কঠিন কার্য্য এবং অঙ্ক শাস্ত্রে প্রচুর বিদ্যা না হইলে কেহ তাহা গণনা করিতে সক্ষম হয় না। অতএব ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের সূর্য্যগ্রহণ গণনা হরকরা কাগজে প্রচারিত হওয়াতে প্রমাণীকৃত হইল যে হিন্দু কালেজেব ছাত্রদিগের অঙ্ক-শাস্ত্রে চরম উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের গৌরব পাদ্রী সাহেবদিগের কিরূপে সহ্য হইবে? ঈশ্বরের গণনার ভুল না দেখা-ইতে পারিলে তাঁহাদের মনে শান্তি হইতে পারিল না, অতএব ঈশ্বরের পত্র হরকরা কাগজে প্রচারিত হওয়ায় ৭।৮ দিবসের মধ্যে জেনেরেল এসেম্বলী স্কুলের রেবরেণ্ড স্মিথ নামক এক জন অধ্যাপক এই গণনার প্রতিবাদ করিয়া নিজে এক গণনা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, ঈশ্বর যে সময়ে গ্রহণ হইবে এবং ছাড়িবে বলিয়া গণনা করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক; তাঁহার নিজের গণনাই বিশুদ্ধ, ঈশ্বরেব গণনা কোন কার্য্যকারক নহে; কেবল লোক দেখান গণনা মাত্র। ইহার উত্তরে রীজ সাহেব তাঁহার নিজ নামে এক পত্র লিখেন যে তাঁহার ছাত্রেব গণনাই ঠিক এবং তিনি তাহার জন্য এক হাজার টাকা বাজী রাখিতে প্রস্তুত আছেন। যদি রেব-রেণ্ড স্মিথ সাহেব সম্মত হয়েন তবে উভয়ে এক জন মধ্যস্থ নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যেকে এক সহস্র টাকা গচ্ছিত বাখিতে পারেন, এবং যেহেতু গ্রহণের দিন অতি নিকট আসিয়াছে অতএব সেই দিবস উভয়ে মধ্যস্থকে লইয়া সর্ব্বেয়ার জেনরেল আফিসের অবজারবেটরি ঘরে যাইয়া সেই স্থানের দূরবীক্ষণ প্রভৃতি উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা প্রতক্ষ্য করিতে পারি-বেন, যে কাহার গণনা বিশুদ্ধ এবং যাহার গণনা বিশুদ্ধ বলিয়া স্থির হইবে তিনি তাঁহার বিপক্ষের গচ্ছিত টাকা পাইবেন। সাহেবদিগের সকল বিষয়েই ধনোপার্জ্জনের প্রতি দৃষ্টি থাকে। রেবরেণ্ড স্মিথ সাহেব প্রথমে বোধ হয় বিবেচনা করিতে পারেন নাই যে ব্যাপার এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে একে তিনি সাহেব, তাহাতে আবার এক জন ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত রেবরেণ্ড পাদ্রী, অধিকন্তু জেনে-রেল এসেম্বলী স্কুলের ন্যায় বড় স্কুলের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক অতএব

তাঁহার নাম দেখিলে সকলেই বাঙ্গালী বালক ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের গণনা উপেক্ষা করিয়া তাঁহার গণনাই বিশ্বাস করিবে। যাহা হউক রীজ সাহে-বের পত্র প্রকাশিত হওয়ায় পরে তিনি লোক-লজ্জার খাতিরে কিম্বা অন্য যে কোন কারণে হউক, রীজ সাহেবের বাজী গ্রহণ ও এক জন মধ্যস্থ নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার নিকট এক সহস্র টাকা গচ্ছিত করিতে বাধ্য হইলেন। সত্য মিথ্যা জানিনা, কিন্তু তৎকালে শুনিয়াছিলাম যে কয়েক জন পাদ্রী একত্রে চাঁদা করিয়া এক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া মধ্যস্থের নিকট গচ্ছিত করিয়াছিলেন, নচেৎ স্মিথ সাহেবের ন্যায় গরিব পাদ্রীর একলা এক সহস্র টাকা দেওয়ার সঙ্গতি ছিল না। পরে গ্রহণের দিবসে উভয় পক্ষে অবজরবেটরি ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং যথা সময়ে সূর্য্যদেবই আকাশে বসিয়া সাক্ষ্য দিলেন যে ঈশ্বর মিত্রের গণনা বিশুদ্ধ। রীজ সাহেব জয়ী হইলেন, হিন্দু কলেজের মান বজায় রহিল এবং শত্রুর মুখে কালি পড়িল। রীজ সাহেব সেই সহস্র টাকা লইয়া তাহার তিন শত টাকা দিয়া ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রকে এক সোনার ঘড়ি উপহার দিলেন এবং অবশিষ্ট টাকায় পূজার অবকাশে পালকীর ডাকে কাশীর মাণ-মন্দির দেখিয়া আসিলেন।

কৃষ্ণমোহনের খ্রীষ্টান হওয়ার পূর্ব্বে তিনি গোহাড় প্রভৃতি হিন্দুর অস্পর্শীয় দ্রব্য সকল তাঁহার প্রতিবেশীদিগের বাড়ীতে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বিরক্ত করিতেন, পরে যখন তিনি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন তখন ত একে মনসা তাহাতে আবার ধুনার গন্ধ। তাঁহার লেখার চোটে হিন্দু সমাজকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন। সংবাদ পত্রে লিখিয়া, পুস্তক ছাপাইয়া, তিনি হিন্দুদিগের শাস্ত্রের ও আচার ব্যবহারের নিন্দা করিতে কসুর করেন নাই। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের যেরূপ স্বভাব চিত্র করিয়াছেন তাহা কৃষ্ণমোহন সম্বন্ধেও খাটে। ঈশ্বরগুপ্ত লিখিয়াছেন যে গৌরিশঙ্করের :—

"লেখনীর গর্ব্বে গালাগালী পর্ব্বে পুরবাসী সর্ব্বে সিকস্তে।"

কয়েক বৎসর ধরিয়া কৃষ্ণমোহনের বিদ্যার ফলও ঠিক সেইরূপ হইয়া-ছিল। এমন যে ঋষি তুল্য নিরীহ রাজা রাধাকান্ত দেব যাঁহাকে কি সাহেব কি হিন্দু কি মুসলমান সর্ব্বজনে সমান সম্মান করিত, তাঁহাকেও কৃষ্ণ-মোহন বিদ্রূপ এবং অপমান করিতে ছাড়েন নাই। কৃষ্ণমোহনের হিন্দু-

সমাজকে ঠাট্টা করিয়া ইংরাজীতে এক নাটক লিখিয়া ছাপাইয়া ছিলেন তন্মধ্যে তিনি রাজা রাধাকান্ত দেবকে রাজা গাধাকান্ত নাম দিয়া তাঁহাকে অভিনয়ের রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য হিন্দুকেও তিনি সেই পুস্তকে সেইরূপ বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। এই পুস্তক বাহির হইলে অহিন্দু-মহলে আনন্দ উঠিল,—আনন্দ হইবারই কথা।

কলিকাতায় তখন হিন্দুসমাজের পক্ষে ভাল কথা কহে, এমন অধিক লোক ছিল না; বিশেষ কৃষ্ণমোহনের ন্যায় বিদ্বান ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সকলে সাহস করিত না, তথাপি বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের হিন্দু ইনটেলিজেন্সার ছাপাখানা হইতে একব্যক্তি কৃষ্ণমোহনের উত্তরে 'সঞ্জয় রিভিবাইবস' নামে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক বাহির করিয়া তাহাতে কৃষ্ণমোহনকে 'খিনিক্রুষ্ণ তিনি তা' ও খৃষ্টান বিপ্রদাসকে Beef-fed-ass ও কৃষ্ণমোহনের ভ্রাতা কালী-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'হাড় কালী' ও একজন খৃষ্টান মহিলাকে 'ইল্যাইজা ভুতোর মা' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিল। যদিও এই পুস্তকের ইংরাজী রচনা কৃষ্ণমোহনের পুস্তকের ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে, তথাপি ইহা যে কৃষ্ণমো-হনের নাটকের মুখের মতন গরম গরম তীব্র উত্তর হইয়াছিল, তাহা হরকরা ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কাগজের সম্পাদকেরাও স্বীকার করিয়াছিলেন। কেবল কৃষ্ণমোহনই যে এরূপ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন এমন নহে, পাদ্রী মণ্ডলীর মধ্যে যে যখন অবকাশ পাইতেন, বাণ নিক্ষেপ করিতে ছাড়িতেন না। এত বড় যে ডফ সাহেব তিনিও একবার (বোধ হয় ১৮৪৯ সালের অগষ্ট কিম্বা সেপ্টেম্বর মাসে হইবে) বেঙ্গল হরকরা পত্রে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি হিন্দুবালকদিগকে খ্রীষ্টান করেন বলিয়া বাঙ্গালীরা তাহাকে খুন করিতে মন্ত্রণা করিয়াছে। এই গুরুতর কিন্তু অমূলক অভি-যোগের উত্তরে একজন হিন্দুকালেজের ছাত্র 'Mac Bamboo' নাম স্বাক্ষরে এমন এক তেজস্বী পত্র সেই কাগজে প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাহার পরে ডফসাহেব কিম্বা অন্য কোন পাদ্রী বাঙ্গালীদের প্রতি ঐরূপ দোষা-রোপ করিতে আর সাহস পাইলেন না।

কৃষ্ণমোহনের উন্নত সময়ে তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বান বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল এবং অনেকের বিশ্বাস ছিল যে অনেক সাহেবেরাও তাঁহার তুল্য ইংরাজী রচনা করিতে পারেন না। কৃষ্ণমোহন 'Lardner's Encyclopedia'র অনুকরণে 'Encyclopedia Bengalensis'

নামে খণ্ডে খণ্ডে দ্বৈভাষিক অর্থাৎ ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষার বৃহৎ এক পুস্তক রচনা করিতে সংকল্প করিলেন, তাহার দ্বাদশ খণ্ড বাহির হইয়াছিল।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন চরিত লেখা বা তাঁহার চরিত্রের দোষ গুণ বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ৪০। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টান সম্প্রদায় কিরূপ ভাবে হিন্দুসমাজের উপর আক্রমণ করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রদর্শন করিতে গিয়া আমরা হয় ত অনেকের মনোকষ্টের কারণ হইয়াছি—কিন্তু জীবন্ত ইতিহাস লেখকের কোন দিকেই নিস্তার নাই। যাহা হউক, সহৃদয় পাঠক এই প্রবন্ধ ইতিহাসের উপকরণ জ্ঞান করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, ইহাই আমাদের ভরসা।

রুক্মা বাইএর চিঠি।

কেমনে পুরিবে সাধ হে ;

অহে——কহ গুণমণি কেমনে তা শুনি
বামনে ধরিবে চাঁদ হে।

শুনে হাসি পায় বলো ঘরে আয়——
কই পতি ঘর কই ?
দিব্য অট্টালিকা ফুলের বাগান
মার্ব্বেল ফোয়ারা কই ?
সস্তার 'বাউয়র', হাওয়াখানা ঘর
সারি গাঁথা ঝাউগাছ,
'টেনিসে'র ঘর কই হে আমার,
হৃদ কই খেলি মাচ্ ?
আর কি এখন্ আছি হে তেমন্
ঘোমটা ঝুকনী বউ,
পেয়েছি এখন্ সুখের আস্বাদ—
চিনেছি পাশ্চাত্য মউ!

সে ঘোর ভেঙেছে   দু চোখ্ ফুটেছে,
উঠেছে প্রাণের ডানা,
আর কি কোটরে   পারিহে থাকিতে
শাবক যেমন কাণা?

এখন——সুখের সাহিত্য   পড়ি সেক্ষপীর
কাব্য শত শত খান্;
'গীবন্' 'গ্রোটে'   পড়ে ইতিহাস
হয়েছে--পেয়েছি জ্ঞান;
পড়েছি দর্শন   'লক্' 'হ্যামিল্টন,'
'মিল্' 'হিউম্' 'বেন্থাম'
বিবর্ত্তনবাদী—   'ডারউইন' 'স্পেন্সার'
জগৎ বিখ্যাত নাম;
'মিলের' 'লজিক'   'লিবার্টি' পড়েছি,
'বেনেতে' 'কল্চর' বেশ,
'ফ্যারাডে' 'হার্শেলে'   'হকস্লে' 'টিণ্ডেলে'
বিজ্ঞান করেছি শেষ।
নবেল পড়েছি   'থ্যাকারে' 'স্কট'
'ডিকেনস' করেছি সায়,
'ডিউমা' 'লিটন'   'এন্টনি ট্রোলোপ'
'রিচার্ডসন্' সমুদায়,
'ফীল্ডিং' 'রেনল্ডস্'   কণ্ঠস্থ আমার
'স্যাণ্ডে' নবেলে প্রাণ;
এখন্—স্বনাম প্রসিদ্ধ   বিদুষী হয়েছি,
লিখেছি 'ড্যান্সিং' গান।
এখন্—দেখিব দেখাব   শিখিব শিখাব
কেবা নিবারয়ে তায়,
ফুলে ফুলে উড়ে   বেড়াব এখন—
সুখী প্রজাপতি প্রায়;

যা'ব নাট্যশালা নাচ রঙ্গভূমে
তোড়া নেব হাতে করি,
চেয়ারে 'শোফাতে' সভায় সাক্ষাতে
বসিব যেমন পরী।

স্যাঙ্গাৎ, পতি হ'তে চাও তুমি হে।

অহে—মম অঙ্গে 'সোপ্' সুগন্ধ পার্ফিউম্—
সৌরভ ছুটেছে দূরে,
তব অঙ্গধূলি উড়ায় পবন
দুর্গন্ধে নাসিকা পূরে;
মম অঙ্গে কিবা 'গউনের' শোভা,
সর্ব্বলজ্জা আচ্ছাদন,
তব অঙ্গে ধুতি লেঙ্গুটী প্রমাণ
নাম মাত্র আবরণ;
মম শিরে 'ক্যাপ্' হেলনে দোলনে
ময়ূরের পুচ্ছ শোভা,
তব শিরে পাগ্ বিঁড়েটী যেমন—
মজুরের বেশ কিবা;
মম কটিতটে সুকোমর বন্ধ—
কটির কষণ তায়,
তোমার কোমরে কড়সি বন্ধন—
ভুঁড়িটী অলাবু প্রায়;
আমার সুগণ্ডে 'রুজ' 'পাউডরে'
প্রস্ফুট গোলাপ দেখা,
তোমার কপালে গেরি মাটি গোলা,
বিষম ত্রিপুণ্ড্র রেখা;
সুচিকণ 'বুট' আমার চরণে
বিলাতি পালিসে ঝকে;

নিগড় বন্ধন, নাগোরা তোমার
চরণ দুখানি ঢাকে;
আমার সুজঙ্ঘা রঞ্জিত রেশমী
মোজা করে আবরণ,
সর্ব্বাঙ্গ তোমার অসভ্যের প্রায়
খোলা থাকে সর্ব্বক্ষণ;
আমাব জিহ্বাতে বিলাতি ধরণে
কথাগুলি ধীরে সরে,
বর্ব্বরের প্রায় রসনা তোমার—
কথা অতি উচ্চৈঃস্বরে;
বাবুর্চ্চির হাতে রন্ধন আমার—
সুগন্ধে আমোদ করে,
চাপাটি তণ্ডুল আহার তোমার—
দেখিলে অরুচি ধরে;
আমি বলি 'গড' তুমি বল হরি
যাগ যজ্ঞ মানো বেদ হে;
তোমায় আমায় অনেক তফাৎ
জমিন আস্মান্ ভেদ হে,—
কেমনে পূরিবে সাধ হে॥

সুতা।

সুতা অনেক রকম ;—গুলি সুতা, তাসা সুতা, রিল সুতা, কাটিম সুতা, ও কাপড় বুনিবার সুতা। গুলি,তাসা,রিল ও কাটিমের সুতায় প্রায়ই সেলাই-এর কায হয় ও ঘুড়ি উড়ান হয়। অন্যান্য উদ্দেশ্যও সাধিত হইয়া থাকে, কিন্তু সে সকল লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে কাপড় বুনিবার সুতার কথা আলোচিত হইবে। সকল সুতার মধ্যে এই সুতারই কারবার অধিক। কিন্তু কারবার অধিক বলিয়া লোকে জিনিসটার অনেক তত্ত্ব রাখিয়া থাকে, এমন বোধ হয় না। ব্যবসায়ীরা দুই একটা মোটামুটি খবর জানেন আর অন্য সকলে এই পর্য্যন্ত জানেন, যে এই সকল আমদানিতেই দেশটা উৎসন্ন হইতেছে, এ ব্যবসায় যত কমে, এদেশের পক্ষে ততই ভাল।

সুতা একটা পদার্থ। জ্যামিতির রেখার ন্যায় অপদার্থ নহে, সুতরাং ইহার দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থও আছে। তাহা ছাড়া আবার গুরুত্বও আছে।

১। দৈর্ঘ্য কিরূপ, দেখা যাউক।

১।০ গজ = ১ সুতা।

১২০ ,, = ৮০ ,, = ১লি

৮৪০ ,, = ৫৬০ ,, = ৭ = ১ গুছি।

১৬৮০০ ,, = ১১২০০,, = ১৪০ =২০ ,, = মোড়া।

"লি" কথার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নাই। গুছি ও মোড়ার ইংরাজি নাম হ্যাঙ্ক (Hank) ও পূর্ব্বোল্লিখিত হিসাবটি সকল সুতায় খাটে, কেবল উইলকিন্সনের (Doffing) কলের সুতায় সবটা খাটে না। উইলকিন্সনের গুলিতে এক গুছি, ৭ লিতে নহে। কিন্তু তাহাই বলিয়া অন্যান্য কলের এক মোড়ায় যত সুতা, ইহাতে তদপেক্ষা কম নাই।

২। সুতার প্রস্থের কথা বুঝা একটু কঠিন। প্রস্থের মাপ নম্বরওয়ারি; যেমন ১০ নম্বরের সুতা, ২০ নম্বরের সুতা, ৪০ নম্বরের সুতা ইত্যাদি। কিন্তু সুতা দেখিয়া নম্বর ঠিক করিয়া লন, এমন লোক বাঙ্গালায় অতি কমই আছেন। সকলেই মোটামুটি একটা আন্দাজ করিয়া লন। নম্বরের বেশী তফাৎ হইলে বুঝা যায়, নতুবা বুঝিতে পারা যায় না। তাঁতীরা অনেকটা বুঝিতে পারে; কিন্তু ব্যাপারীরা এবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিলে

অত্যুক্তি হয় না। সাহেব মহাজনেরা ব্যাপারিদিগের বিদ্যা জানেন বলিয়া, এই কারবারে যত ভেল চলে, অন্য কোন ব্যবসায়ে তত চলে কিনা, আমি বলিতে পারিনা। নম্বরের মার পেঁচ কি, হিসাব কি, কি করিয়া ঠিক ধরা যাইবে, একটু পরেই বলিব।

৩। সুতার গুরুত্বের কথা। গুরুত্বটি গুরু কথা, ছাড়িয়া দিয়া ওজন বলা যাউক।

(ট্রয়) ইংরাজি।

২৪ গ্রেণ	=	১ পেনিওয়েট।				
৪৮০ ,,	=	২০ ,,	=	১ আউন্স।		
৫৭৬০ ,,	=	২৪০ ,,	=	১২ ,,	=	১ পাউণ্ড।

ইংরাজি এক গ্রেণ আমাদিগের একতোলার ১৮০ ভাগের এক ভাগ; অর্থাৎ

১৮০ গ্রেণ = ১ তোলা বা ভরি।
১ আউন্স = ২$\frac{২}{৩}$,, ,, ,,।
১ পাউণ্ড = ৩২ ,, ,, ,,।

এখন আবার নম্বরের কথা বলা যাউক। কলিকাতার বাজারে সুতার নম্বর একেবারে দশ দশ করিয়া উঠে। যেমন ১০ এর পর ২০। ২০র পর ৩০, ইত্যাদি। ১, ২, ৩, ১১, ১৪, ৪৫, ৫৬ প্রভৃতি নম্বর এখানে নাই। নম্বরের ঊর্দ্ধ সংখ্যা ২২০। বিলাতি কাপড়ের কলওয়ালারা এই সকল মধ্যবর্ত্তী নম্বর লইয়া কাজ করে। নম্বর যত কম, সুতা তত মোটা। ৪০ নং অপেক্ষা ৩০ নং মোটা, আবার ৩০ নং অপেক্ষা ২০ নং মোটা; এই রূপ। ২০ নং অপেক্ষা নিচু নম্বরের সুতা কলিকাতায় আইসে না।

কোরা সুতার যত নং; প্রতি পাউণ্ড সুতায় তত গুছি থাকে। যেমন ২০ নং সুতায় ২০ গুছি, ৩০ নং সুতায় ৩০ গুছি ইত্যাদি। পূর্ব্বে বলিয়াছি ২০ গুছি এক মোড়া, তাহাতেই

২০ নম্বরের সুতার	১ পাউণ্ডে	১ মোড়া
৩০ ,,	১ ,,	১॥ ,,
৪০ ,,	১ ,,	২ ,,
৫০ ,,	১ ,,	২॥ ,,
৬০ ,,	১ ,,	৩ ইত্যাদি।

এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সুতা নম্বরে যত কম, মোটায় তত বেশী কেন, অর্থাৎ ২০ নম্বর ৩০ নম্বরের চেয়ে মোটা কেন, ৩০ নং ৪০ নং এর চেয়ে মোটা কেন?

১ পাউণ্ড ওজনের তুলা হইতে

২০ নম্বরের সুতা ১৬৮০০

৩০ ,, .. ২৫২৯০

৪০ ,, ৩৩৩০০

৫০ ,, ৪২০০০ গজ প্রস্তুত হয়।

তাহার পর দেখা যাউক, নম্বর ঠাওরাইবার উপায় কি? অল্প সুতা হইলে, আন্দাজ ব্যতীত গতি নাই। কিন্তু বেশী সুতা পাইলে অকাট্য ধরা যায়।

নিয়ম। ১ লি কে ১০০০ দিয়া গুণ করিয়া সেই লি ওজনে যত গ্রেণ, সেই গ্রেণের সংখ্যা দিয়া ভাগ দিলে নম্বর ঠিক হইবে যথা—

যদি ১ লির ওজন ২০ গ্রেণ হয়, তাহা হইলে সুতার নং কত?

$$\frac{১ \times ১০০০}{২০} = ৫০$$

উত্তর।—সুতার নম্বর ৫০।

৯০ নং সুতার ১লির ওজন কত?

$$\frac{১ \times ১০০০}{৯০} = ১১\frac{১}{৯} \text{ গ্রেণ।}$$

সুতা কি ভাল কি মন্দ দেখিবার তিনটি কথা আছে। সুতাটি বরাবর এক রকম মোটা কিনা, সুতাটির রং খুব ধব্‌ধবে কিনা, আর সুতা কতটা টান সহ্য করিতে পারে।

কলিকাতার ব্যাপারীরা সুতার নাম, টিকিট, ও বাঁধাই দেখিয়া মাল ভাল মন্দ বিচার করেন। সুতার নাম অর্থে বুঝিতে হইবে, কোন্ কলের সুতা। সকল সুতার বাণ্ডিলে কলওয়ালার নাম থাকে না। আমদানিকারক মহাজনেরা কলওয়ালার নাম দিতে দারুণ নারাজ; তাহারা নিজের নামের টিকিট চালাইবার চেষ্টা করে। সুতার বাঁধাই কি পদার্থ, অব্যবসায়ীরা তাহা জানেন না। সাতটি করিয়া লি. কোন একটা রঙ্গিন সুতায় বাঁধিয়া একটা

করিয়া গুছি করা হয়। সেই রং ধরিয়া ব্যাপারীরা সুতাকে কাল বাঁধাই জর্দা বাঁধাই ইত্যাদি নাম দেন। কিন্তু বাঁধাই দেখিয়া সুতা বিচার করা বড় ভুল ও ঠকিয়া যাইবার একটা বিশেষ হেতু।

কোরা সুতা। মোড়া ও পাউণ্ড হিসাবে বিক্রীত হয়। সাহেব মহাজনেরা পাউণ্ড ধরেন, ও দেশীয় ব্যাপারীরা মোড়া ধরেন। অর্থাৎ একটা ৫০ নম্বরের সুতার দাম ইংরাজ মহাজনেরা দশ আনা বলিলে, বুঝিতে হইবে, মোড়া হিসাবে সুতাটিব মূল্য চারি আনা মাত্র।

সরু সুতার অপেক্ষা মোটা সুতার দাম কম। অর্থনীতিজ্ঞ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—এইরূপ হইবার কারণ কি? এক পাউণ্ড তুলায় এক পাউণ্ড ২০ নম্বর সুতা হয়, এবং সেই ১ পাউণ্ড তুলায় এ পর্যন্ত ৫০ নং সুতা হয়। তবে ২০ নম্বর অপেক্ষা ৫০ নম্বরের দাম বেশী কেন? ইহার প্রথম কারণ সরু সুতা তৈয়ার করিতে মেহেনতয়ানা বেশী। তুলাকে অনেক পাট করিতে হয়, এবং তুলাকে বেশী পিঁজিতে হয়। তাহার পর আর এক কারণ—যে, সকল তুলায় বেশী নম্ববেব সুতা প্রস্তুত হয় না। ভারতবর্ষের তুলায় ১ হইতে ৪০ নম্বব পর্য্যন্ত সুতা হয়; আমেরিকার তুলায় ৪১ হইতে ১০০ সুতা, ও মিসরের তুলায় তাহার অধিক নম্বরের সুতা হয়। ভারতবর্ষের তুলা অপেক্ষা, আমেরিকার তুলা মহার্ঘ, আবার আমেরিকার তুলা অপেক্ষা মিসরের তুলা মহার্ঘ। ভারতবর্ষের তুলায় ৪০ নম্বরের অধিক নম্বরের সুতা তৈয়ার করিলে তত মজবুত হয় না। অব্যাবসায়ী পাঠকের কাছে এই কথাটা সমস্যার মত বোধ হইবে। যে তুলার সুতায় ঢাকার মলমল হয়, সে তুলায় সরু সুতা হয় না—এ কি কথা? উত্তরে এই বলা যাইতে পারে, সরু সুতা হইবে না কেন, হয়; কিন্তু কলে নয়, হাতে।

তাহার পর দেখা যাউক, গত বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় কত কোরা সুতাব আমদানি হইয়াছেন;—

	২০নং	৩০নং	৪০নং	৫০নং	৬০নং	৭০নং	৮০নং	৯০নং	১০০নং	উর্দ্ধসংখ্যা
১৮৭৪	২১৫৪	২১৫৪	১৩০৯১	১৫৯৮	৯৮১	৩৪৩	৩২৩	১৮১	১৫৩	২৭৩
১৮৭৫	৯৩৬	২৭৭	১৪৬৫৫	১৬৮৮	১০৬৭	৪৬৫	৩৭২	২৫৭	২২০	১৭১
১৮৭৬	৮৬৪৬	৫০৫	১১৪৯২	১৪১৬	১০৮২	৩৮৮	২৮৬	২২২	১৮৫	৩১৬
১৮৭৭	১৭৯৭০	৭৫৬	১৫৪১৫	১৯৮৩	১৪৪৫	৫৪৬	৪৪৮	৩৪০	২১১	১৩৬
১৮৭৮	১৩২৯৩	১২২৮	১৪২০১	১৭২০	১২৩৪	৪৪৯	৩৫৫	২৩৬	১৮৮.	৬৭

১৮৭৯	৮৯৭০	৩৯৯	৯০৪৪	১০৯৪	৯০০	৪৯৬	৪৫৩	২০৩	১৯১	১৬৭
১৮৮০	১৩১৬২	৭৬৮	১০৯৯৯	১৮৪৮	১৬২৩	৫৬৫	৪৩১	৩০৬	১৭১	১১০
১৮৮১	১২৮৩৭	৬০০	১১১২৫	১৩৬২	৮৫৬	৫৭১	৩৬১	২৬৮	২০০	১০৩
১৮৮২	১৫৮৩৭	৯২৬	১০৮১৮	১১৬৯	১০৬৩	৩৮৬	২৩২	৯৮	৮২	১২৮
১৮৮৩	১৭৫৪৮	৫১৬	৯৬৭৩	১৫৫৫	১২৬৪	৮১৮	৩৪২	৩৪৮	৩১৪	২৫৮
১৮৮৪	১৯২০০	৪৩৮	১০১৯৯	৯৮৫	৮৬৭	৭৮১	৫৬৪	৩০৪	৩০১	২৭২
১৮৮৫	১৭৪৫০	২৪৩	১৫০০	১০৭৭	১০৩২	৬১৯	৫৯০	২৯৪	২৬৪	—
১৮৮৬	১৯৬৭৯	১৭৩	৯৫১১	১৩২৬	১১২৯	৬৪৭	৪৯৬	২৬৯	২৭০	—

উপরের সংখ্যা গুলি গাঁট বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক গাঁটে ৪০ শত পাউণ্ড সুতা থাকাই রীতি, তবে কোন কোন আমদানিকারক মহাজন ৫০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত সুতার গাঁট বাঁধাইয়া থাকেন; বড় গাঁটে মহাজনের সুবিধা অনেক;—খরচ কম পড়ে। গাঁট তৈয়ারি করা, জাহাজ ভাড়া, জাহাজ বোঝাই, ও জাহাজ হইতে নামান, কলিকাতায় গুদাম ভাড়া ইত্যাদি অনেক খরচ গাঁট হিসাবে ধরা হয় বলিয়া, বড় গাঁট সুবিধা জনক। আবার খরচের সুবিধা হইলেই সকল দিকেই লাভ;—অন্যান্য প্রতিযোগ অপেক্ষা একই মাল অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রয় করিতে পারিলে, জিনিসের কাট্‌তি বেশী হয়।

তালিকাটি যে নির্ভুল, তাহা বলিতে পারিনা। তবে যত ঠিক্‌ করা সম্ভব, তাহার যত্নের ত্রুটি হয় নাই। কলিকাতার কষ্টম হাউসের দৈনিক রিপোর্ট হইতে তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে; সুতরাং ইহাতে কেবল জাহাজের মাল আছে, রেলের মাল নাই। রেলে করিয়া অল্পই সুতা কলিকাতায় আসিয়া থাকে, কখন কখন বোম্বাই ও করাচি হইতে দুই এক গাঁট প্রেরিত হয়। সে গুলা হিসাবে না ধরিলেও ক্ষতি নাই। বিলাত হইতে বোম্বাই এ মাল আনিতে যত জাহাজ ভাড়া লাগে, কলিকাতায় আসিতে তাহা হইতে অতি সামান্যই অধিক লাগে। কিন্তু বোম্বাই হইতে রেলে করিয়া মাল আসিতে যে খরচ লাগে, বিলাত হইতে জাহাজ করিয়া আনয়ন করা তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যয় সাধ্য।

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে সকল সুতার মধ্যে ২০ নং ও ৪০ নং সুতারই আমদানি অধিক। সরু সুতার আমদানি বড় কম। ২০ নম্বরের প্রায় সমস্ত মাল বোম্বাই হইতে আইসে। পূর্ব্বে বিলাতি

সুতা আমদানি হইত, কিন্তু অধ্যবসায়ী বোম্বাইবাসিরা আপনাদিগের দেশে কল আনাইয়া ভারতবর্ষ হইতে ২০ নম্বরের বিলাতি সুতাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। কেবল ভারতবর্ষ হইতে নহে; পূর্ব্ব উপদ্বীপ, চীন ও জাপানে এখন ২০ নম্বরের বিলাতি সুতার পরিবর্ত্তে বোম্বাই এর সুতা যায়। এখন কলিকাতায় ২০ নংএর বিলাতি সুতা বৎসরে দশ গাঁট ও আইসে না। কলিকাতায় ও বেঙ্গল মিল বা উড়িয়া প্রভৃতি দুই চারিটি সুতার কল আছে। এই সকল কলে ১০ ও ১৫ নম্বরের সুতা প্রস্তুত হয়।

কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী কোন গ্রামে যদি ৪০ নং সুতার কতকগুলি কল আনান যায়, তাহা হইলে, আমার বোধ হয়, সে গুলিতে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা। ৪০ নং এর সুতার উপযোগী তুলা, ভারতবর্ষেই পাওয়া যাইবে; ইহার জন্য আমেরিকায় বা মিসরে যাইতে হইবে না। বিলাতি সুতা হইতে এসুতার দাম অনেক সস্তা হইবে, কারণ খরচ অনেক কম হইবে। এখন তুলা এখান হইতে বিলাতে যায়, ও সুতা হইয়া বিলাত হইতে এখানে আইসে। এই দুই বারের জাহাজ ভাড়া একেবারে বাঁচিয়া গেল, তাহার পর দালালি, বিমা, গাঁট বাঁধাই প্রভৃতি অন্যান্য অনেক ব্যয় একেবারে থাকিবে না। কিন্তু হইলে কি হয়, বাঙ্গালি যৌত কারবার বুঝেন না। চক্ষের সম্মুখে দৃষ্টান্ত থাকিলেও তিনি তাহাতে বিশ্বাস করেন না। পূর্ব্বে এখান হইতে পাট বিলাতে গিয়া ডণ্ডী নগরের কলে, চট বুনাই হইত ও সেই চট এখানে আসিয়া বিক্রয় হইত। এখন আর এরূপ হয় না। কতকগুলি সাহেব চটের কল আনাইয়া, একেবারে ডণ্ডীর মাথা খাইয়া দিয়াছেন।

কলিকাতার বাজারে নিম্নলিখিত কলগুলির নাম বিখ্যাত;—

৪০ নং। জন মেয়াল, জর্জ্জ মেয়াল, কিংষ্টন, ব্যানারমিল, কভেন্ট্রী, ও উইলকিন্সন। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জন মেয়াল নিকৃষ্ট, ও উইলকিন্সন উৎকৃষ্ট। জন মেয়ালের মত অনেকগুলি সুতা কলিকাতায় আসিয়া থাকে, কিন্তু সে সকল কলের নাম, বাজারে প্রকাশিত নাই; লোকে টিকিট অনুসারে, সেই সুতা কলের নাম করে যথা কুলি পুলি ইত্যাদি।

ব্যানারমিল সুতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ হয়। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এই সুতার যত আদর, উইলকিন্সনের তত নহে। শেষোক্ত সুতা বাঙ্গালা দেশে চলে; এত দামী জিনিস, পশ্চিমের তাঁতিরা কিনিতে চাহে না। সম্প্রতি

গ্রেহেম কোম্পানি জর্দ্দা ঘোড়া বা জর্দ্দারাজা টিকিটের এক প্রকার ৪০ নম্বরের কোরা সুতা আনাইতেছেন। তাহা, উইলকিন্‌সন অপেক্ষা ভাল বলিয়া বোধ হয়। নূতন আমদানি বলিয়া,লোকে এখনও ইহা ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। রয়টার টেলিগ্রাম কোম্পানি নিত্য নিত্য বিলাতি বাজারের দর পাঠাইয়া থাকেন, তাহাতে কেবল ব্যানার মিলের দর থাকে।

রুসিয়া নামক সুতাও খুব প্রচলিত। রুসিয়া সুতা ৫০ হইতে ১০০ শত নম্বর পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে কোন একটা নম্বরের সুতা আলাহিদা বিক্রয় হয় না। সকল নম্বর একেবারে একটি অনুপাত অনুসারে বদ্ধ। এই অনুপাতকে ব্যাপারিরা "ভোল" বলে। রুসিয়ার ভোল এইরূপ ; ত্রিশ গাঁট সুতা কিনিলে ৮ গাঁট ৫০ নং, ৮ গাঁট ৬০ নং, ৪ গাঁট ৭০ নং, ৪ গাঁট ৮০ নং, ৩ গাঁট ৯০ নং ও ৩ গাঁট ১০০ নং।

"লাইট মলার" সুতার ও নাম আছে। এই সুতা ৭০ হইতে ১০০ নং পর্য্যন্ত। রুশিয়ার ন্যায়, ইহার ভোল আছে। দশ গাঁট লাইট মলারে ৪ গাঁট ৭০ নং, ৩ গাঁট ৮০ নং, ২ গাঁট ৯০ নং ও ১ গাঁট ১০০ নম্বর।

উর্দ্ধ সংখ্যার সুতার মধ্যে "ঢাকা" কলের সুতা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। এই সুতা মিশরের তুলায় প্রস্তুত হয়। ইহার আমদানি অতি কম। পূর্ব্বের তালিকায় দৃষ্ট হইবে ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ সালে কিছুই সুতা আইসে নাই।

কোরা সুতার কোন মরসুম নাই; অর্থাৎ বৎসরের যে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইহার ক্রয় বিক্রয় অধিক হয়, এমত নহে। তবে পৌষ মাসে, সকল বাজার মন্দা, সুতার বাজার ও মন্দা। কোরা সুতার বিষয় আর অধিক কিছু বলিবার নাই। এবার রঙ্গিণ সুতার কথা বলিয়া প্রবন্ধ সাঙ্গ করিব। রঙ্গিণ সুতা দুই ভাগে বিভক্ত ; টর্কিরেড সুতা, ও অন্যান্য রঙ্গের সুতা। টর্কিরেড সুতা অন্য রঙ্গের সহিত কোন বিষয়ে সমান নহে, ইহা ভিন্ন শ্রেণীস্থ। অন্যান্য রং ছোপাইয়া প্রস্তুত হয়; টর্কিরেড সেরূপ নহে; ইহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রঞ্জিত। এ প্রক্রিয়ার বর্ণনা এস্থলে অনাবশ্যক, পাঠক বোধ হয় দেখিয়াছেন, যে বিলাতী সকল রঙ্গের অপেক্ষা লাল রং টা পাকা ; সেই পাকা রং, এই টর্কি রেড। টর্কি রেড ভিন্ন অন্য লাল রং অনেক আছে ; কিন্তু সে গুলি পাকা নহে।

গত তের বৎসরে কত রঙ্গিন সুতা কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহার তালিকা এই ;——

	টর্কিরেড সুতা	অন্যান্য রঙ্গের সুতা।
	গাঁট	গাঁট
১৮৭৪	৪১৭১	২৫৬০
১৮৭৫	৫৯৯০	৩৪৭৮
১৮৭৬	৫৬২৯	২৯৭৩
১৮৭৭	৬২৫৩	৪০৮১
১৮৭৮	৭১৬০	৪২৮৮
১৮৭৯	৮৬০৮	৩১৮০
১৮৮০	১২১৫৫	৩৯৩৭
১৮৮১	১২২৭৮	৪১২৮
১৮৮২	১৩৫১৭	২৮৪২
১৮৮৩	১১২০৬	২৫৪০
১৮৮৪	১৭৭৫৬	৩৫৮৬
১৮৮৫	১১৩৯০	২৮৯৫
১৮৮৬	১৬৭৪৫	৩৪২৮

এই তালিকাটি বিশেষ কার্য্যকারী নহে। কোন্ রঙ্গের কত সুতা আসিয়াছে, জানিবার উপায় নাই। ভারি ওজনের কত সুতা, ও হাল্কা ওজনের কত সুতা তাহাও জানা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝা যায়, রঙ্গের সুতার কারবার এক রকম স্থিতিশীল, আর টর্কিরেডের কারবার বৎসর বৎসর বাড়িয়া যাইতেছে।

আবার এদিকে টর্কিরেডের কারবার যেমন বাড়িতেছে, দাম তেমনই কমিতেছে। তের বৎসর পূর্ব্বে, যে দাম ছিল, এখন তাহার অর্দ্ধেক দামে টর্কিরেডের সুতা পাওয়া যায়। তবে মালও অনেক খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। সস্তায় বেচিবার উদ্ভাবন করিতেছেন, আর মালও পূর্ব্বমত হইতেছে না। পূর্ব্বে, এদেশে কেবল জর্ম্মানির প্রস্তুত টর্কি রেড আসিত, এখন বিলাতি লালই অধিক আইসে; জর্ম্মানির লাল একেবারে উঠিয়া গিয়াছে. বলিলেও বলা যাইতে পারে। জর্ম্মানিতে জিনিস ভাল হয় বটে কিন্তু লোকে ভাল জিনিস চায় না, সস্তা জিনিস চায়, কাজেই বাণিজ্যে

ইংরাজ জয়ী। যাহাকে বিলাতি টর্কি বলি, তাহা বাস্তবিক টর্কি রেড নহে, তাহার নাম আলিজিরিন রেড। বিলাতি টর্কিরেড রংওয়ালা দিগের মধ্যে, জন অব ইতরিং, এমর ইউবিং, ষ্টাইনাব, ষ্টালিং মণ্টিথ টিপি মিলার ও বিড প্রসিদ্ধ।

বাঙ্গালা দেশে, টর্কিরেড ও অন্যান্য সুতাব কাপড়েব পাড় প্রস্তুত হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে টর্কিবেড সুতার কাপড় বুনাইও হইয়া থাকে। বৎসবেব সকল সময়েই এই রঙ্গিন সুতা বিক্রয় হয়, কেবল পৌষ, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে অপেক্ষাকৃত কম।

বঙ্গিন সুতার কথা বলিতে গিয়া, হাল্‌কী ওজন ও ভারি ওজন সুতাব নাম কবা হইয়াছে। এই দুই সুতাব পার্থক্য বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। প্রথম প্রভেদ এই যে, ভারি ওজনের সুতা ঠিক্ মাল, ও হাল্‌কা সুতা বিঠিক্। ৪০ নম্বরের সুতা রঙ্গ করিয়া যদি বিক্রয় করা যায় তাহা হইলে ভারি ওজন ৪০ নম্বেব সুতা হইল। আর যদি চল্লিশের উর্দ্ধ নম্ববেব সুতা ছোপাইয়া চল্লিশ বলিয়া বিক্রয় কবা যায়, তাহা হইলে হাল্‌কা হইল। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি ;—

এক পাউণ্ড ৪০ নং কোবা সুতাব ২ মোড়া অর্থাৎ ৩৩, ৬০০ গজ। এই এক পাউণ্ড সুতা রং করিলে অবশ্য সুতা মোটা হইবে ও ভাবি হইবে। এইরূপ সুতা ভারি ওজনের সুতা।

আর এক পাউণ্ড ৫০ নং কোরা সুতার ২৷৷০ মোড়া অর্থাৎ ৪২,০০০ গজ। এই সুতাকে যদি বং দিয়া ৪০ নম্বরেব মোটা করিয়া আধ মোড়া বাদ দি, তাহা হইলে, এই সুতা ৪০ নম্বরের সহিত লম্বার সমান হইল। এই হইল ৪০ নম্বরের হাল্‌কা ওজন সুতা। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মোটা সুতা অপেক্ষা সরু সুতার দাম বেশী। কিন্তু ৪০ নম্বর অপেক্ষা ৫০ নম্বরেব দাম যত অধিক, আধ মোড়া সুতার তাহার ক্ষতি পূর্ণ হইয়া, অনেক লাভ থাকে।

রঙ্গিন সুতা মোড়া হিসাবে বিক্রয় হয় না। পাউণ্ড হিসাবে বিক্রয় হয়। রঙ্গিন সুতার ৪০ নম্বরের কারবার বেশী। ২০ নং ৩০ নং, ৫০ ও ৬০ নং সুতার ও আমদানি আছে; কিন্তু অল্প।

শ্রীরঘুনাথ দে।

শারদীয়া শক্তি পূজা।

(১)

হরি হতে অবতরি হরষে দিনেশ,
ধীরে ধীরে কন্যালয়ে করেন প্রবেশ।
উগ্রভাব নাহি আর, প্রচণ্ড প্রতাপে যার,
দহিত অখিল বিশ্ব জ্বলিত জীবন,
এখন ঢালেন রবি মৃদুল কিরণ।

(২)

ভানুর প্রশান্তভাবে সুশীল শরত,
বিমল সৌন্দর্য্যে করে ভূষিত জগত।
কিবা মনোহর কাল, ছিঁড়িল জলদ জাল,
তিরোহিল তমোরাশি ঘন ঘন সনে,
প্রকৃতি হাসেন পুন প্রফুল্ল বদনে।

(৩)

ত্রিযামায় কিবা শোভে গগন মণ্ডল,
উজ্জ্বল তারকাবলী অঙ্গে ঝলমল।
রজত তটিনী প্রায়, নীহারিকা দীপ্তি পায়,
রজত কিরণ ঢালি শশী হাসি হাসি,
বিমল আকাশ পথে যায় ভাসি ভাসি।

(৪)

পথ, ঘাট, শুকাইল ঘুচিল কর্দ্দম,
বিধৌত ধরণী ধরে মূর্ত্তি মনোরম।
নানাবিধ তরুরাজি, শোভে ঘন পত্রে সাজি,
অনিলে আমোন ক্ষেত্র কিবা আন্দোলিত,
সুনীল সাগর যেন মৃদু তরঙ্গিত।

(৫)

স্থলপদ্ম, শেফালিকা, কোমল কামিনী,

নদ,নদী, নিরমল, ধীর গামী ঢল ঢল,
জলাশয়ে ফুটে কত জলজ সুন্দর,
কুমুদ, কহ্লার আর কমল নিকর।

(৬)

এইরূপ রমণীয় সুখদ শরতে,
আদ্যাশক্তি সনাতনী এলেন ভারতে।
এলেন আনন্দময়ী, ধরি রূপ বিশ্বজয়ী,
তেজঃপুঞ্জ প্রভাপুঞ্জে তিমির তাড়িত,
উজ্জ্বল আলোকে দেশ কিবা আলোকিত।

(৭)

কালরাত্রি পোহাইল হলো সুপ্রভাত,
ভারতের হলো যেন দুঃখের নিপাত।
চতুর্দ্দিকে জয় জয়, হর্ষের লহরী বয়,
স্বর্গ হতে দেবগণ হেরেন নয়নে,
জগত জাগিল যেন নবীন জীবনে।

(৮)

জাগরে ভারতবাসী জাগরে সকলে,
নিদ্রা হতে উঠ সবে দুর্গা দুর্গা বলে।
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল, বাজায়ে আনন্দ বোল,
তোল সবে একতানে ভেদিয়া গগন,
বিষাদে বিস্মৃতি হ্রদে দিয়ে বিসর্জ্জন।

(৯)

মহাদিনে মহাপূজা কর মহোৎসবে,
বিতরিতে শিব শিবা এসেছেন ভবে।
আনরে কমলদল, বিল্বপত্র গঙ্গা জল,
অঞ্জলি পুরিয়ে দেহ চরণ কমলে,
মঙ্গলার কৃপা হলে থাকিবে মঙ্গলে।

(১০)

পূজ পূজ মহাশক্তি শক্তি প্রদায়িনী,
নিশুম্ভ নাশিনী দেবী শুম্ভ নিপাতিনী।

পাবে সবে হৃদে বল, দলিবে দানবদল,
করিবে শত্রুব কুল সংহার সাহসে,
স্বদেশে বিদেশে গুণ গাবে সবে যশে।

(১১)

পূজ পূজ মহেশ্বরী মহেশ ললনা,
ভাবনা যাইবে দূবে পূবিবে কামনা।
যাঁব পদ পূজা কবি, ত্রেতায় রাক্ষস অবি,
বাঘবেন্দু বামচন্দ্র বধিয়া বাবণ,
জানকীব সমুদ্ধাব্ কবেন সাধন।

(১২)

পূজ ভক্তি ভবে দুর্গা দুর্গতি দলনী,
শুভঙ্কবা দুঃখ হরা দীনেব জননী।
শোক, তাপ, দূরে যাবে, কতই না সুখ পাবে,
ঐশ্বর্য্য সৌভাগ্যশালী হবে সবে ভবে,
দৈন্য দাবানলে আব দহিতে না হবে।

(১৩)

ভারত জননী পূর্ব্বে শক্তিব কৃপায়,
মহিমায় অদ্বিতীয়া ছিলেন ধবায়।
মহা তেজে তেজস্বিনী, জ্ঞানে মানে যশস্বিনী,
ধনযুতা ধর্ম্ম পূতা বীরের আবাস,
শত্রুকুল হেবে সদা পাইত সন্ত্রাস।

(১৪)

ভাবতের সেইভাব যেন দেখাইতে,
অবতীর্ণা মহেশ্ববী অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে।
অসুরের জটে ধবি, সমারূঢ়া সিংহোপরি,
সঙ্গে শোভা পায় কিবা লক্ষ্মী সবস্বতী,
গণ অধীশ্বব আর সুর সেনাপতি।

(১৫)

পূজ পূজ হেন মূর্ত্তি করিয়া ভকতি,
উথলিবে অনুবাগ মাতৃভূমি প্রতি।

পাবে ধন, মান, জ্ঞান, হবেসবে শক্তিমান,
একতায় বিদলিবে দানবের দলে,
দেবগণ সহ স্বর্গে বসিবে সকলে।

আগমনী।

এতদিনপরে কিমা পড়িয়াছে মনে ?
তাইএসেছিস এই ভারত ভবনে,—
দরিদ্র সন্তান দলে, আদরে লইতে কোলে,
তুষিতে তাদের মন আশ্বস্ত বচনে।
অই গো দেখ না চেয়ে, মা তোরে দেখিতে পেয়ে,
'মা' বলে ছুটিছে সবে প্রফুল্ল বদনে।

কতই কেঁদেছি মাগো দৈত্য অত্যাচারে,
'মা' 'মা' ব'লে কতই মা ডেকেছি তোমারে,
কতই চখের জল, ফেলেছি মা অবিরল,
গিয়াছে কতই দিন কতই প্রকারে;
কত দিন উপবাসে, কত দিন উর্দ্ধশ্বাসে,
দৌড়েছি আকুল হয়ে তোরে দেখিবারে।

আসিব বলিয়া তুই গেলি মা চলিয়া,
এতদিন ছিলি বল কেমন করিয়া ?
কতই যাতনা, হায় ! পেয়েছি না বলা যায়,
শরীর হয়েছে শীর্ণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
দীর্ঘ বৎসরের পরে, পেয়েছি জননী তোরে,
প্রতিজ্ঞা কর মা যাবি না ছাড়িয়া।

তুই না থাকিলে কাছে, কি বলিব, হায়!
অস্থরের অত্যাচারে প্রাণ যেন যায়!
আমরা মা অতি দীন, চীর বাস চির দিন,
পাতার কুটীরে থাকি, বেড়াই ভিক্ষায়;
যা কিছু মা অন্ন যুটে, অস্থরে তা লয় লুটে,
বিষম যাতনা পাই, মরি মা ক্ষুধায়।

বারেক দেখ মা চেয়ে ছেলেদের প্রতি,
তোরে ছাড়া হয়ে কত পেয়েছি দুর্গতি!
তুই মা দুর্গতি হরা, দুর্গতি হর মা তারা,
দে মা, দে অভয়, ভয়ে মরি দিবা রাতি;
প্রাণ যে মা ওষ্ঠাগত, দেহ অস্থি চর্ম্ম গত,
হস্ত পদ নাড়িবারে নাই মা শকতি।

করুণ কটাক্ষে চেয়ে দেখ একবার,
তুই ভিন্ন আমাদের কে আছে মা আর?
অপার দুঃখের নদী পার না করিস্ যদি,
নিশ্চয় তুফানে প্রাণ যাবে মা এবার!
তাই গো মা জগদম্বে, রক্ষা কর অবিলম্বে,
বিলম্ব সহেনা আর কর গো মা পার।

আমরা যে চিরদিন মা তোর আশ্রিত,
আমাদের দুখ দেখা তোর কি উচিত?
যে দুখ পেতেছি, হায়! হৃদয় বিদরে যায়,
ত্বরায় এ দুখ ভার কর মা দূরিত।
পাষাণ-তনয়া ব'লে পাষাণ-হৃদয়া হ'লে,
পষাণে কলঙ্ক তোর হইবে খোদিত।

কি দিয়া পূজিব তোরে, কি আছে মা বল্?
আমরা দরিদ্র অতি, নাই মা সম্বল;

উদর পূরণ তরে, যা কিছু মা ছিল ঘরে,
সকলি নিয়েছে হরে দানবের দল,
কিছুই সম্বল নাই, কোথায় বা কিবা পাই,
আমাদের আছে মাত্র নয়নের জল।

তাই তোরে দিযে মাগো পূজিব এবার,
আয় মা মঙ্গলময়ী, দয়ার আধার!
ও চরণে অবিরল, ঢালিয়া চখের জল,
পূরাব মনের সাধ, ভাসাব সংসার,
আয় মা আয় মা ঘরে, অনেক দিনের পরে,
পেয়েছি জননী তোরে, ছাড়িবনা আর।

আয়রে ভারতবাসী আয়রে সকলে,
কেন আর শোকাকুল পড়িয়া ভূতলে?
দেখ্ চেয়ে দেখ অই, এসেছে মা দয়াময়ী,
উঠি গিয়ে আয় সবে জননীর কোলে;
পেয়েছি পেয়েছি মায়, আয়রে সকলে আয়,
যুড়াই তাপিত প্রাণ ডাকিয়া 'মা' বলে।

আমরি 'মা' কথা আহা কিবা মধুময়!
ডাকিতে ডাকিতে নেচে উঠিছে হৃদয়!
'মা' ব'লে ডাকিছি যত, ডাকিতে বাসনা তত,
কিছুতেই সে বাসনা নিবৃত্তি না হয়,
আয় সবে আয় আয়, মা বলিয়া উভরায়,
ডাকি আয় মায় সবে খুলিয়া হৃদয়।

ধন, বিদ্যা, রূপ, গুণ, আমাদের নাই,
আমাদের মত দুখী কেবা আছে ভাই?
মা অভয়া দয়া ক'রে, দুখ নিবারণ তরে,
ও সকল সঙ্গে ক'রে এনেছেন তাঁই;

মার মত দয়া কার, এসংসারে আছে আর?
আয় আয় ভাই সব মার কোলে যাই।

যে শরীরে কিছু মাত্র ছিল নাই বল,
কেন আজি সে শরীর এতই সবল?
যে চখে ছিলনা দৃষ্টি, অন্ধকারময় দৃষ্টি,
আজি কেন সেই চখে জগত উজ্জ্বল?
যে শ্রবণ চিরদিন, শ্রবণের শক্তিহীন,
কেন সে শ্রবণে আজি বর্ষে পরিমল?

যে মন বিষাদে পূর্ণ সকল সময়,
কেন বা সে মন আজিহেন সুখময়?
কাঁদিত রে যেই প্রাণ, হাসিছে রে সেই প্রাণ,
কেন আজি সেইরূপ দেখি বিপর্যায়?
সেই রাত্তি, সেই দিবা, ইহার কারণ কিবা?
জেনেছি,——মা হয়েছেন ভারতে উদয়।

দুর্গোৎসবে আশা।

চোখের জলে ভিজিয়া তিতিয়াএকটী বরষ গেল,
তেমনি হইয়া ভাসিতে আবার নূতন বরস এল!
সুখের আভাস নাহিক যথায় আশার আলোক আর,
ভবিষ্যৎ যা'র ঘোর অমানিশা আঁধারের পারাবার।
তা'র তরে কেন এত পরিবর্ত্ত আবার নূতন আসে,
অমানিশা মাঝে অকূল সাগরে কি লাগি জোছনা হাসে?

দু-চোকের জল দু'দিনের তরে কেন শুকাইয়া যায়?
মুমূর্ষুর কেন মুখে মৃদু হাস নিমেষের তরে হায়।
দু-দিনের তরে কেন বৃথা আশা কেন বৃথা (এ) উৎসব?
জীবিতের মত আহ্লাদ আমোদে কিহেতু নিরত শব?
তাই বলি, কেন বৃথা বিড়ম্বনা কর বিধি দুখী জনে,
আঁধারের জীব আঁধারে লুকায়ে থাকুক আপন মনে।
ডাকিও না তারে জাগা'ওনা আর ডেকেছত কতবার—
ডাকিলে শুনে না, জাগিলা জাগে না, বাহিরে যায় না আর।
দেখে না চাহিয়া অনন্ত আকাশ—অনন্তের পারাবার,
চন্দ্র, সূর্য্য, তারা দেখেও দেখে না, বুঝেও বুঝে না আর।
গিরি, সিন্ধু, নদী, বন, উপবন কেজানে দেখিতে আর?
প্রকৃতি ইঙ্গিত কে বুঝে এখন? কৃত্রিম হয়েছে সার!
প্রকৃতি প্রকৃতি না বুঝি' কেমনে প্রকৃতি সাধনা করি?
না জানি, চিন্ময়ী কতই কুপিতা!—অকূলে পাই না তরী।
যুনাণী মণ্ডলী প্রকৃতি সাধনে হয়েছে সুসিদ্ধ বাম,
হৃদয়ে তা'দের শকতি বিরাজে, পেয়েছে সাধক নাম।
আছে কি মোদের ওদের মতন সাহস, যতন, পণ?
আছে কি তেমন অজস্র সাধন, অচল অটল মন?
"করিবার যাহা করিব এখনি' একদিন পাব ফল,
"না হয় জীবন যাইবে আমার ক্ষতি কিবা তায় বল?
"পুত্র পৌত্রগণ ভুঞ্জিবে সে ফল জন্মিবে যাহারা পরে।"
মরি কিবা হায়, সুখের ধারণা অটল যতন ধরে!
নাহিক মোদের সাধনার বল মুখটি হ'য়েছে সার,
বল মা অম্বিকে, পা'ব নাকি কূল—পূজিতে সাধিতে আর?
না থাকে যদি মা, এদুখের কূল, কি লাভ ভারতে এসে?
প্রিয় পুত্র যথা আছে মা তোমার যাও সে যুনানী দেশে।
আজি হতে মোরা ভুলিব তোমায় তুমিও তুমিত ভুলেছ কবে!
মা বলিয়া আর ক'বনা তোমায় হৃদয় বেদন সবে।
কিন্তু যেন মনে থাকে গো তোমার এমনি যাবে না দিন,
রজনী পোহালে কিবা দুখী সুখী সকলি' পায় যে দিন।

মহা কালে যবে এ দুখের কাল মিশাবেনিয়মে তাঁর,
উদিবে তরুণ সুখের অরুণ ভারত পাইবে পার।
দেখিব তখন, এস কি না এস, কালের আদেশ বলে,
ভারত-তনয়ে হবে গো ডাকিতে ভাসিয়া নয়ন জলে।
এমন সাধক পাবেনা গো আর, (এখনি' সে নাই কেহ)
তোমার চরণে আত্ম বিসর্জ্জন—নহেক নশ্বর দেহ—
আত্ম-বিসর্জ্জন ভারত সন্তান ক'রেছে চরণে তব।
য়ুনাণী তেমন জানে না সাধন, দেহই তা'দের সব।
'দেবী' বলি মোরা পূজিগো তোমায়—জগত জননী বলি,
জড় যন্ত্র বলি' সবার সাধন—স্বভাবের গ্রন্থাবলী।
সজীব তাহারা--নির্জ্জীব উদ্যান তুমি গো তাদের তরে,
বাছি' বাছি' ফুল তুলিয়া যতনে সবায় গলায় পরে।
এখনই এই, আছে এর শেষ, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ত্য'জে
পদার্থ বিজ্ঞান সাধনে কি ফল—নাস্তিক্যে সবাই মজে!
তখন ভারতে' পড়িবে গো, মনে, য়ুরোপে না পেয়ে ঠাই,
বুঝিবে তখন, মৃগেন্দ্র-নন্দন ভারত বিনা রে নাই!
"সম্বর বিলাপ ভারত সন্ততি, এখনি যাবেনা দিন,
"ঐ দেখ চেয়ে পূবর আকাশে ঊষার উজল চিন!
"উত্থান পতন জগত নিয়ম, বুঝত তোমরা সবে,
"চির দুখে কায়, যায় হে জীবন,—চিরসুখী কেবা কবে?
"নব দিবা এবে পেয়েছ সকলে, নূতন যতন ধর,
"অতুল উদ্যমে কর্ত্তব্য সাধনে প্রাণপণ সবে কর।
"সাধিলেই সিদ্ধি" জান পূর্ব্বাপর—ভুল না ক্ষণেক তরে,
"ভাই বোন মিলি' মাতৃ সেবা কর অতুল প্রমোদ ভরে।
সম্বৎসর পরে যে শকতি বলে জাগহ দু"দিন তরে,
"ভুলিও না তা'য়; শকতি সমষ্টি অসাধ্য সাধন করে।"
এ কি রে সুখের আশার আলোক উদিল মানস পটে?
দেবী কি কহিলা এ আশ্বাস বাণী রহিয়া বোধন ঘটে?
এস মাগো তবে, এস হৃদি মাঝে, দিতেছি পরাণ দান
একে একে একে সবারি সাধনে হৃদি দিব বলিদান।

এস দশভুজে, রমা বীণা-পাণি, গুহ গজানন আর,
ত্যজ ও কেশরী, গতাসু অসুর, রতন মানিক হার।
লৌহ বর্ম্ম এবে পরা'ব সবায় আমরা কেশরী হ'ব,
সম্মুখ সমরে দুর্জ্জয় অসুরে বীরতা দেখা'ব সব।
রমার ভাণ্ডারে কত রত্ন আছে, বাণীর মোহন গাঁথা,
দেখিব কেমন কার্ত্তিকেয় বীর্য্য, গণপতি সিদ্ধিদাতা?
কত শক্তি ধরে সে শক্তি রূপিণী দেখিব বুঝিব এবে,
বাহন কেমন দেখিব তোমরা—বিলম্ব কিহেতু তবে?

পৌত্তলিকতা।

ইদানীং ইংরাজী ভাষাবিৎ কৃতবিদ্যগণ মূর্ত্তিপূজার নাম শুনিলে একেবারে জ্বলিয়া উঠেন, তাঁহাদের চিরসঞ্চিত ক্রোধ উদ্বেল হইয়া পড়ে। পৌত্তলিকতা অতীব হেয়, ঘৃণ্য ও জ্ঞাতপ্রজ্ঞ লোকের পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য, ইহাই তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস। ঈশ্বরের রূপ কল্পনা অত্যন্ত অবৈধ ও ভ্রমসঙ্কুল, বৈদেশিক শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাদের এই জ্ঞান জন্মিয়াছে। মূর্ত্তিপূজা সভ্যতর জাতির পরিবর্জ্জনীয়, এ প্রতীতিও তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল। উহার উচ্ছেদ সাধন করা তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও জীবনব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক সাকার ঈশ্বরের উপাসনা কি সকল অনর্থের মূল? মেষযূথের ন্যায়, যাঁহারা বৈদেশিক শাস্ত্রাস্বাদে বিকৃতচিত্ত স্বশাস্ত্রানভিজ্ঞ অগ্রণীর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক। তবে প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সমদর্শী ও সহৃদয় লোকে স্থিরচিত্তে এই প্রস্তাবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন, এই আশয়ে ইহা উত্থাপন করিতেছি।

ভূমণ্ডলের সর্ব্বাংশেই কোন না কোন কালে জড়োপাসনা প্রচলিত ছিল। এখনও অনেক প্রদেশে উহার প্রচলন লক্ষিত হয়। সকল সুসভ্য জাতির

আদ্যন্ত ইতিবৃত্ত পরিজ্ঞাত হইলে, মানবসমাজে যে ক্রমান্বয়ে জড়, জীব, পঞ্চভূত গ্রহ, উপগ্রহ, ঈশ্বরজ্ঞানে পূজিত হইয়া আসিয়াছে, ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্রমে আদর্শ নর সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া সম্পূজিত হইয়াছেন, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। পরে যে জাতিতে ঈশ্বরোপলব্ধি আরও বিকশিত হইয়াছে, সেই সেই জাতীয় লোকে, ঈশ্বর বিশ্বসংসার হইতে অভিন্ন, ঈশ্বরই বিশ্বরূপ, অনন্তরূপ এই জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অদ্বৈতবাদী প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের ঈশ্বর জ্ঞান এইরূপই ছিল। স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রভেদ তাঁহারা স্বীকার করিতেন না, তাঁহারা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ভাবিতেন। ইউরোপ খণ্ডে বহুকাল ব্যাপিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত। খৃষ্টধর্ম্মে স্রষ্টা ও সৃষ্টির পার্থক্য বিশিষ্টরূপে নির্ণীত হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর নিকটে জগৎ নশ্বর অনিত্য, ঈশ্বর অবিনশ্বর ও শাশ্বত। খ্রীষ্টধর্ম্মে আদর্শ মনুষ্য যে জগদীশ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাও সহজে অনুভব করিতে পারা যায়। ইউরোপে অধিকাংশ লোকে এখনও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। সেই জন্য এখনও তাঁহারা দ্বৈতবাদের উত্তাল তরঙ্গে বিঘূর্ণিত ও ইতস্তত সন্তাড়িত হইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ক্বচিৎ কখন অদ্বৈতবাদের বেলাভূমিতে উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছেন মাত্র। সাধারণ লোকে অদ্যাবধি পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে বিভিন্ন,আদর্শ নরগুণোপেত ঈশ্বরের উপাসক। ঈশ্বর নিরাকার, তাঁহার মূর্ত্তিকল্পনা মনুষ্যের অসাধ্য; তিনি একক ও অদ্বিতীয়, বিশ্বরাজ্যে তাঁহার সমকক্ষ দেবোপদেব কেহ নাই, এ শিক্ষাও খ্রীষ্টধর্ম্মে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবম্বিধ ধর্ম্মভাব যে সব লোকের চিত্তাধিকার করিবে তাঁহারা যে পৌত্তলিকতার উপর খড়্গহস্ত হইবেন, তাহা আদৌ বিস্ময়কর নহে।

এক্ষণে পৌত্তলিকতার গুণাগুণ বিচার করিবার পূর্ব্বে, পৌত্তলিকতা কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। পৌত্তলিকতা "পুত্তলি" পদ হইতে উৎপন্ন। পুত্তলি শব্দে সাধারণত মৃণ্ময়ী কি ধাতবী জীবমূর্ত্তিই সূচিত হয়। এই জন্য প্রথমত ঈশ্বরজ্ঞানে জীবরূপিণী মূর্ত্তির পূজা লক্ষ্য করিয়া যে পৌত্তলিকতা পদের উদ্ভব হয়, ইহা সহজে অনুমান করিতে পারা যায়। এই জীবমূর্ত্তি সকল সময়ে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সময়ে প্রাণিপুঞ্জের অবিকল অনুরূপ, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে যে কল্পনাবলে ঈশমূর্ত্তি সংগঠিত হইয়াছে, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু অদৃষ্ট পূর্ব্ব অতীন্দ্রিয় কোন জীব বা পদার্থের কল্পনা মনুষ্য

পক্ষে অসম্ভব। তজ্জন্য জীব জগতের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংযোজন করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব অভিনব ঐশ মূর্ত্তির সৃষ্টি প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ফলত সর্ব্বপ্রথমে যে পৌত্তলিকতার অর্থ, ঈশ্বরের জীবরূপকল্পনা ছিল, ইহাই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কালক্রমে এই শব্দের অর্থ আরও পূর্ণাবয়বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে জীবরূপসঙ্কল্প পৌত্তলিকতার অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে; স্বভাব বা কৃত্রিম পদার্থ বিশেষকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিলেই, পৌত্তলিক অভিহিত হয়। ইদানীং শালগ্রাম শিলার পূজাও পৌত্তলিকতা। কিন্তু সকল পদার্থেরই, সুন্দর হউক, অসুন্দর হউক, রূপ আছে; রূপ পদার্থের একটি ধর্ম্ম মাত্র, রূপহীন পদার্থ অনুমান করা অতীব দুঃসাধ্য। এ কারণে অদ্যাপি পৌত্তলিকতার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের রূপ কল্পনা সূচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত পৌত্তলিক বলিলে বহুদেবতায় বিশ্বাস এবং বহু দেবতার পূজা অভিব্যঞ্জিত হয়। পৌত্তলিকতার এ অভিব্যক্তি কিরূপে হইল, ইহা স্থির করা নিতান্ত সুকর নহে। যে সমুদয় জাতির মধ্যে মূর্ত্তি পূজার প্রাবল্য পরিদৃষ্ট হইয়াছে, সেই সব জাতির মধ্যেই বহুদেবতার অর্চ্চনা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এই জন্য মূর্ত্তি পূজা ও বহু দেবোপাসনা সর্ব্বত্র যুগপৎ প্রাদুর্ভূত হওয়ায়, মূর্ত্তিপূজক হইলে বহুদেবোপাসক হইবে, সাধারণ লোকের মনে এই প্রতীতি জন্মিয়াছে বোধ হয়। যে কারণেই হউক, এখন একেশ্বরবাদী ও পৌত্তলিক দুইটি বিরোধী পদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইউরোপ খণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে মূর্ত্তিপূজার বিশেষ আদর ও প্রচলন হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিপূজার উপর বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা লক্ষিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর, ঈশ্বরের সমকক্ষ আর কোন দেবতা নাই। ইউরোপে সর্ব্ব প্রথমে এ কথা খৃষ্টধর্ম্মই সাধারণ লোকের কর্ণগোচর করে। "মুশা" এ শিক্ষা ইহুদিদিগকে বহুকাল পূর্ব্বে দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। ইহুদিগণ অচিরে পূর্ব্ববৎ দেবোপদেবতার অর্চ্চনে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজায় তাঁহাদের চিত্ততৃপ্তি জন্মায় নাই। খৃষ্টধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে, একেশ্বরবাদিত্ব প্রকৃত প্রস্তাবে লোকের মনে বদ্ধমূল হয়। কিন্তু ইদানীং পৌত্তলিকার উপর যে ভীষণ ক্রোধ ও ঘোর বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার উৎপত্তি মহম্মদীয় ধর্ম্মে। মহম্মদের চিত্ত যে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রসাদে বিস্ফারিত

হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ইহজীবনের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারা যায়। অপরাপর বিধর্মীর ন্যায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ মুসলমানদিগের নিকটে ঘৃণা ও অমর্য্যাদার পাত্র নহেন। তাঁহারা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া মহম্মদের সমীপে যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মেরও বীজমন্ত্র এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস। "কোরাইস" সম্প্রদায়ে সাকার ঈশ্বরের উপাসনা হইত এবং একাধিক উপাস্য দেবতার পূজা হইত। মহম্মদ নিজে "কোরাইস" সম্প্রদায়ভুক্ত এবং স্বসমাজ হইতে বহু দেবারাধনা নিবারকরণ করিবার জন্য তাঁহার মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারে প্রথমে প্রবৃত্তি জন্মে। এবম্বিধ ধর্ম্ম যে পৌত্তলিকতার বিষম বিদ্বেষ্টা হইবে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ইতিহাস পাঠে মুসলমানগণ যে পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, তাহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ পাওয়া যায়। সমুদায় মূর্ত্তিপূজক জাতির দেবমূর্ত্তিসমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভগ্ন করা, মুসলমানদের মধ্যে অতি প্রশস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইলে মুসলমানদিগের দৃষ্টান্তানুসারে মূর্ত্তিপূজার প্রতি বিদ্বেষ চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইতে থাকে; একেশ্বরবাদী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীও পৌত্তলিকতার ভীষণ শত্রু হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রোধাগ্নি ধূমজাল অতিক্রম করিয়া দীপ্তশিখা মণ্ডিত হইল।

ভারতবর্ষে পৌত্তলিকতার প্রতি কাহারও কোন কালে অভক্তি ছিল কি না সন্দেহ। ভারতবাসীগণ চিরকালই মনের সুখে নানা দেবদেবী পূজা করিয়া আসিয়াছেন। বিধর্ম্মী মুসলমান ভারতে রাজ্যেশ্বর হইলেও, মূর্ত্তি পূজার অণুমাত্র হ্রাস হয় নাই। অত্যাচারের অসদ্ভাব ছিল না; কিন্তু বাহুবলে কস্মিন্ কালে কোন জাতির ধর্ম্মজ্ঞান পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায় না। যাঁহার স্বধর্ম্মে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাভক্তি নাই, তিনিই কেবল অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। নতুবা বলপ্রয়োগ করিলে কেহ কখনও আশৈশবশ্রুত পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। স্বদেশাধিপ বলপূর্ব্বক ধর্ম্মলোপ করিবার চেষ্টা পাইলে, লোকে জন্মভূমিও পরিত্যাগ করে, কিন্তু স্বধর্ম্মচ্যুত হয় না। মুসলমান নৃপতিকুল ভীষণ অত্যাচার করিয়াও আমাদের ধর্ম্মের আদৌ হানি করিতে পারেন নাই। আমরা তখন স্বশাস্ত্রে আস্থাবান্ ছিলাম; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে তখন শাস্ত্রবিশারদ ছিলেন, কেহই তখন বৈদেশিক ভাষা অধ্যয়ন করিতে গিয়া স্বধর্ম্ম বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং মুসলমান

ভূপতিগণের বলপ্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া যায়। পূর্ব্ববৎ আমরা দেবদেবী পূজা করিতে থাকি। কিন্তু ইংরাজ সমাগমে আমাদের মতিগতি অন্যরূপ হইয়া যাইতেছে। বলপ্রকাশ করিয়া আমাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা, এক প্রকার অসম্ভব এ জ্ঞান ইংরাজের বিলক্ষণ জন্মিয়াছে। তাঁহারা প্রকাশ্যে আমাদের স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে কখনও বলেন নাই। কিন্তু ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা, এখন আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য করিয়া তুলিয়াছেন। আ-জীবন অনন্যকর্ম্মা হইয়া ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন না করিলে এখন যে কেহ আত্ম পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প। সুতরাং ইদানীং সকলে আজীবন ইংরাজী শিক্ষা করেন; স্বশাস্ত্র মূলে পাঠ করেন না। এইরূপ শিক্ষার যাহা অসম্ভাবী ফল, তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই এখন ইংরাজদের চর্ব্বিতচর্ব্বণ গলাধঃ-করণে শশব্যস্ত।

অতি অল্প লোকের এখন স্বশাস্ত্রে ভক্তি, শ্রদ্ধা বা অভিজ্ঞতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজি শিক্ষার সমভিব্যাহারে আমাদের দেশে বৈদেশিক মত সমূহের সমাদর যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে। পৌত্তলিকতার প্রতিকূলে এখন যে এই মহা কল্লোল উত্থিত হইয়াছে তাহা কেবল এই জীবন ব্যাপিনী ইংরাজি শিক্ষার গুণে। ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা শব্দের ব্যবহার ছিল না। বঙ্গে যে একদল প্রচ্ছন্ন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোক জন্মিয়াছেন, তাঁহারাই প্রথমে এই পদ প্রচলিত করেন বলিয়া, বোধ হয়।

এপর্য্যন্ত কেবল পৌত্তলিকতার অর্থ কি, কি প্রকৃতির লোকে উহার বিরোধী, কেমন করিয়াই বা আমাদের কৃতবিদ্যগণ মূর্ত্তি পূজার উপর জাত-ক্রোধ হইলেন, এই সব বিষয় সামান্যত সমালোচিত হইয়াছে। এক্ষণে কি কি আপত্তি উত্থাপন করিয়া, নিরাকারবাদী মহোদয়গণ মূর্ত্তি পূজা পদদলিত করিতে ইচ্ছুক, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

প্রথম আপত্তি এই যে ঈশ্বর নিরাকার; তাঁহার রূপ কল্পনা অতীব গর্হিত কর্ম্ম। কেন গর্হিত কর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে, নানা প্রকার উত্তর পাওয়া যায়। কেহ বলেন নিরাকার ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলে জগ-দীশের অবমাননা করা হয়; আবার কেহ বলেন অনন্ত ঈশ্বরকে সান্ত বলিয়া পূজা করিলে প্রকৃত ঈশোপলব্ধি হয় না। কৃত্রিম শিল্পজ পদার্থকে ঈশ্বর

জ্ঞানে পূজা করিলে মহা পাপ জন্মে, এ কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কারণ জগৎ স্রষ্টাকে মানুষ কখনই শিল্প কৌশলে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে সক্ষম নহে। এইরূপ অনেক বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া ঈশ্বরের রূপ কল্পনা অতীব যুগুপ্‌সিত নিরাকার বাদীরা ইহার প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরের আকার কল্পনা করিলে, কি কারণে জগদীশের অপমান হইবে, ইহা স্থির করা নিতান্ত দুরূহ। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রের আকার আছে কিন্তু স্রষ্টার আকার নাই, নিরকার হইতে সাকার উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ চিন্তা করাই মানুষের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু নিরাকার হইতে সাকার জগতের উৎপত্তি স্বীকার করিলেও, স্বাকার ঈশ্বরের আরাধনা দোষাবহ বলিয়া বোধ হয় না। আমি সাকার জীব, নিরাকার সত্তা আমার চিন্তনীয় নহে! আমি পৃথিবীতে যে সমুদয় পদার্থ অবলোকন করি সকলই আকৃতিবিশিষ্ট। সকল সামগ্রীরই দৈর্ঘ্য প্রস্থ আছে; ব্যাপ্তিহীন সামগ্রী মানুষের অচিন্ত্য। এ স্থলে নিজ শক্তির অসদ্ভাববশত আমি পরমেশ্বরের যদি রূপ কল্পনা করি, তাহা হইলে কেন আমি দোষী হইব? আমার যদি নিরাকার ঈশ্বর চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকিত এবং আমি যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বর নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতাম, তবে আমি নিন্দাভাজন হইলেও হইতে পারিতাম। কিন্তু যখন নিরাকার সত্তা চিন্তা করিবার আদৌ শক্তি নাই, তখন সাকার ঈশ্বরের উপাসনা করিলে আমি কেন দোষী হইব? কেনই বা আমার পূজায় ঈশ্বরের অবমাননা হইবে? যাঁহারা চক্ষু মুদিত করিয়া নিরাকার ঈশ্বর পূজনে মনঃসংযোগ করেন, তাঁহারা বস্তুত নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করেন না। ঈশ্বর চিন্তায় সংলগ্নচিত্ত হইলেই মনোমধ্যে সাকার ঈশ্বর সমুদিত হন। দেবভক্ত উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গীত আরম্ভ করিয়া বলেন "দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে।" যতই কেন নিরাকারবাদী নিরাকার ঈশ্বরচিন্তনে সমাহিতচিত্ত হউন না, তিনি মনশ্চক্ষুতে সর্ব্বদা দিব্যমাল্যাম্বরধর বিশ্বেশ্বরকে দেখিতে পাইবেন। ভাষা ব্যতীত উপাসনা কি পূজন সম্ভবপর নহে। মৌনাবলম্বন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেও মানুষ চিন্তাবিচ্যুত হইতে পারেন না। চিন্তা করিতে হইলেই ভাষার প্রয়োজন; ভাষা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে রূপ চিন্তা এক প্রকার অপরিহার্য্য। প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, নিরাকার ঈশ্বরের পূজা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। নিরাকারবাদীরা চর্ম্মচক্ষুর দর্শনীয় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন না, কিন্তু মনশ্চক্ষুর

গ্রাহ্য ঐশরূপ ধ্যান করেন। পৌত্তলিকের সহিত তাঁহাদের মূলত বিশেষ ঐক্য আছে। পার্থক্য কেবল নামত।

এ স্থলে আর একটি যুক্তির উদ্ভাবন আবশ্যক বোধ হইতেছে। লোকের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া আমরা "অনাদর" "অপমান" প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করি। তুমি আমার প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছে, আমাকে অপদস্থ ও অপ্রতিভ করিতে পারিলে তোমার সুখ হইবে, এই জন্য তুমি আমাকে অপমান করিতেও প্রস্তুত। তুমি আমাকে অবমাননা করিয়াছ কি না, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, আমার প্রতি তোমার মনোভাব কিরূপ ছিল ইহা স্থির করা আবশ্যক। সাকার ঈশ্বর পূজা করিলে নিরাকার ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়, এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য সাকার উপাসকের ঈশ্বরের প্রতি মনোভাব কীদৃশ, তাহা নিরূপণ করা অত্যাবশ্যক। যদি মূর্ত্তিপূজকের চিত্ত ভক্তি-রসাপ্লুত হয়, যদি পৌত্তলিক দেবমূর্ত্তি সম্মুখে তন্ময় হইয়া দেবারাধনা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পূজাবিধি কদাপি প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ লোকের নিকট নিন্দনীয় হইতে পারে না। ফলত চিন্তাশীল ঈশভক্ত লোকে কখনই মূর্ত্তিপূজা পরমেশ্বরের অপমানজনক মনে করেন না। তবে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও তদ্গতচিত্ত হওয়া, পূজকের প্রকৃতির উপর অধিক মাত্রায় নির্ভর করে। কি মূর্ত্তিপূজা কি মানস পূজা, উভয়বিধ পূজায় অভক্ত ভণ্ড থাকিবার সম্ভাবনা সমান।

দ্বিতীয়ত অনন্ত ঈশ্বরকে সান্ত বলিয়া পূজা করিলে প্রকৃত ঐশজ্ঞান জন্মে না, এ কথাও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি অনন্ত ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে পারেন এবং "নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ" এ মধুর কথা বলিতে পারেন, সে মহাত্মা কখনও সায়তন সান্ত ঐশ মূর্ত্তিকে ঈশ্বর ভাবিবেন না। তিনি দৈব প্রতিমাকে ঈশ্বরের অংশ বা লক্ষণ জ্ঞান করিবেন। সকল সামগ্রীকে মানুষ লক্ষণ দ্বারা আত্মহৃদয়ে জাগরূক রাখিতে সতত চেষ্টা পায়। যে সব কৃতবিদ্যগণ অধুনা পৌত্তলিকতার পরম শত্রু বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, তাঁহারাই গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন কালে অবাধে, অক্লিষ্ট মনে অনন্তসূচক সঙ্কেত ব্যবহার করিয়াছেন। গণিতশাস্ত্রে সান্ত সঙ্কেত আনন্ত্যবাচক হইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু দেবপূজা কালে সান্তমূর্ত্তি অনন্ত দেবোদ্দেশে নির্ম্মিত হইলেই যত দোষ। এ যুক্তির পক্ষপাতী হওয়া প্রকৃতিস্থ লোকের পক্ষে দুষ্কর। ইংরাজ সুধী-

গণের এখন যথেষ্ট সমাদর দেখিতে পাই। এই জন্য কোবিদ "কারলাইল" মূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নে এক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। " I dol is *Eidolon* a thing seen, a symbol. It is not God but a symbol of a God." বাস্তবিক চিন্তা করিয়া দেখিলে কেবল সান্ত দ্বারা অনন্ত অনুভূত হইতে পারে। অনন্ত ঈশ্বরের লক্ষণ স্বরূপ দেবপ্রতিমা, ঈশোপলব্ধির প্রশস্ত উপায়। যাঁহারা মূর্ত্তি পূজায় অনন্তবোধোপলব্ধি মূলে সম্ভবপর নহে, এ কথা বলেন, তাঁহাদের উক্তি সর্ব্বথা অগ্রাহ্য।

তৃতীয়ত কৃত্রিম শিল্পজ পদার্থ ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিলে, কেন যে ঈশ্বরের অগৌরব হয়, কেন যে গুরু পাপগ্রস্ত হইতে হয়, ইহা নিরূপণ করা অতীব কঠিন। মানুষ রাজ্যেশ্বরের প্রীণনার্থ অত্যুৎকৃষ্ট উপায়ন আহরণ পূর্ব্বক রাজ পাদমূলে উপঢৌকন দেন। এ প্রথা দূষ্য নহে; কিন্তু বিশ্বরাজ্যের নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে মনোমুগ্ধকর কৃত্রিম পদার্থে অধিষ্ঠিত করিলেই মহাপাপ। এইরূপ চিন্তা মনে মনে স্থান দিলে, তর্ক ও যুক্তির বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। যাঁহাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান করেন, তাঁহার তুষ্টির জন্য মানুষ স্বত প্রবৃত্ত হইয়া নিজের প্রীতিকর সামগ্রীই তাঁহার পরিচর্য্যার্থ উপস্থিত করেন। সাকার ঈশ্বরের পূজা করিতে হইলে, মানুষ নিশ্চয়ই সুন্দর শিল্পজ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন। ঈশ্বরের চারু মূর্ত্তি সংগঠন মানুষের একটী স্বাভাবিকী ক্রিয়া। এস্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে পৌত্তলিকদিগের সকল দেব মূর্ত্তিই কি নয়ন-তর্পণ? সকল দেবতার মূর্ত্তি এক্ষণে সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যে সামগ্রী অদ্য কুৎসিৎ ও বিরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে, মান্ধাতার সময়ে যে সেই সমুদয় সামগ্রী নয়নানন্দকর ছিল না, ইহার কোন স্থিরতা নাই। কালক্রমে যে লোকের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যের জ্ঞান পরিবর্ত্ত হয় তাহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ পাওয়া যায়। যে দেবমূর্ত্তি অদ্য ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইতেছে, দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে সেই মূর্ত্তিই সর্ব্বজন মনোহর ছিল। এই জন্য যখন যে দেবমূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছে তখন যে সেই মূর্ত্তি সুন্দর ও প্রীতিপ্রদ ছিল, ইহাই ধারণা হয়।

ঐশ রূপ কল্পনার প্রতিকূলে দুই একটী প্রধান প্রধান আপত্তির উল্লেখ করিলাম মাত্র। যদি এই সব আপত্তি খণ্ডিত হইয়া থাকে, তবে পৌত্তলিকতার উপর কাহারও জাতক্রোধ হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু পৌত্তলিক

কেবল মূর্ত্তি পূজক নহেন, তিনি বহু দেবোপাসক বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকেন। এক্ষণে পৌত্তলিকের বহু দেবোপাসনা নিন্দনীয় কি না, ইহাই মীমাংসার বিষয়। পৌত্তলিকদিগের মধ্যে বহু দেব দেবীর অর্চ্চনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যেক দেবতার একটী বিশেষ কোন শক্তি থাকে; কোন দেবতাই সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া সম্পূজিত হন না। যখন আরাধ্য দেব দেবীর মধ্যে ঈদৃশ বিভাগ দৃষ্টি গোচর হয়, তখন এই সমুদয় দেবতাকে সহজেই খণ্ড দেব বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। খণ্ড দেবের সমষ্টিই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর। একটী একটী দেব দেবীকে পূর্ণাঙ্গ ঈশ্বর না ভাবিয়া ঈশ্বরের অংশ বিশেষ ভাবিলেই আর পৌলিকগণকে বহু দেবোপাসক বলিয়া, বোধ হইবে না। আংশিক ঈশ্বরের পূজাও দূষ্য নহে; কেন না, অংশের পূজা হইলে সমষ্টিরও পূজা হয়। যে মানুষের পাদ পূজিত হইল সেই মানুষেরই পূজা হইল, ইহাই অনুভাব্য।

এতক্ষণ কেবল পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সচরাচর যে সমুদয় আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারি খণ্ডনে নিযুক্ত ছিলাম। এক্ষণে পৌত্তলিকতার যে বিশেষ গুণ আছে, তাহারি উল্লেখ করিব। আমাদের শাস্ত্রকারেরা সকল মানুষের মেধা সমান ভাবিতেন না। যে কারণেই হউক, মানুষের চিন্তা শক্তির অনেক তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য তাঁহারা মানুষের মধ্যে অধিকার ভেদ স্বীকার করিতেন। ঈশ্বর-জ্ঞান কখনও সকল মানুষের একরূপ হইতে পারে না। কেহ শিলা খণ্ডে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবেন, কেহ উহাতে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত হন ইহাই ভাবেন, কেহ বা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" দেখেন। কাহারও ঈশোপলব্ধি দ্বৈতবাদ অতিক্রম করিতে পারিল না, কাহারও বা অদ্বৈতবাদের শান্তি সলিলে নিমজ্জিত। এতদবস্থায় পৌত্তলিকতার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পূজা বিধি আর কি হইতে পারে? যাঁহার শুদ্ধ স্থূল মূর্ত্তি চিন্তা করিবার শক্তি আছে, তিনি ঐশ মূর্ত্তি ঈশ্বর ভাবিয়া পূজা করিবেন। যে ব্যক্তি নিজ মেধা গুণে একেশ্বর বাদী হইয়াছেন, তিনি ঐশ মূর্ত্তিকে ঈশ্বরের লক্ষণ স্বরূপ জ্ঞান করিবেন। যে মহাত্মা ঈশ্বরের বিশ্বরূপে বিভোর, তিনি দেব মূর্ত্তিতে দেবাংশ দেখিবেন। এমন সর্ব্বজনোপযোগী পূজা প্রকরণ আর দ্বিতীয় নাই।

হিন্দু ধর্ম্মের সংস্কার।

নবীনে আর প্রবীণে প্রীতি এক প্রকার প্রকৃতি বিরুদ্ধ, তাই বোধ করি, নবীন হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত প্রবীণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মতের একতা হয় না। প্রাচীনেরা চির সঞ্চিত অথচ শিক্ষা মার্জ্জিত সংস্কারের দ্বারা চালিত, নব্যেরা স্বশিক্ষা সুলভ কর্ত্তব্য জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত। প্রবীণেরা প্রায় পরের মুখে ঝাল খান, কিন্তু নব্যেরা নিজে পরক না করিলে স্ব মত প্রকাশ করেন না। নব্যেরা অন্য ধর্ম্মের সহিত যোগ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের কলম বাঁধিতে চান; হিন্দু প্রাচীন দল তাহাতে বিরূপ—তাঁহারা স্বধর্ম্মবৃক্ষের কেবল পর গাছা কাটিতে চান। উভয় সম্প্রদায়ই সমাজ সংস্কার করিতে প্রস্তুত আছেন। সংস্কারের পথ পরস্পরের পৃথক্—কেহ পূর্ব্বাভিমুখে, কেহ পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত; সুতরাং পরস্পরের সম্মিলন দুর্লভ। উভয় দলই একস্থানে যাইবার মানসে যাত্রা করিয়াছেন। অপর যাহারা সেই সংস্কৃত পথে ধর্ম্মস্থানে যাইতে প্রস্তুত, তাহারা বিষম বিভ্রাটে পড়িয়াছে। এখন তাহারা কাহার ক্ষুন্ন মার্গে গমন করে? অনুযাত্রীগণের এই গোল মিটাইতে যদি পরস্পর প্রীতিপাশে বদ্ধ হইয়া একটী নির্দ্দিষ্ট সৎপথে উভয়ে প্রস্থান করেন,তাহা হইলে সকলেই সুখী হয় এবং উভয় সম্প্রদায়েরই একাকী যাইতে হয় না, সেতো পান। এরূপ সম্মিলন যে সুখকর এবং ইষ্ট সাধনতার অনুকূল, তাহা সহৃদয় পাঠক মাত্রেই বিবেচনা করিতে পারেন; কিন্তু হতভাগ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের বা মনুষ্য মাত্রের ভাগ্যে এরূপ সর্ব্বজনীন সম্মিলন বড়ই অসম্ভব। তথাপি সৎকার্য্যের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

হিন্দুগণের সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিবার জন্য অথবা অন্যান্য কারণে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাব হইল। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম শৈশব অতীত করিতে না করিতে গুরুজনের সহিত পৃথক্ হইলেন। তাই আজ উদার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম "আদি', "নববিধান' ও 'সাধারণ'—এই ত্রিধা বিভক্ত মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন; সুতরাং সাম্প্রদায়িক বিরোধ এক প্রকার প্রকৃতিগত, আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি। এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা স্থির করিয়াছি—প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্মিলন সম্প্রতি দুর্ঘট।

গত আষাঢ় মাসের নবজীবনে "হিন্দু ধর্ম্মের সংস্কার" নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন বাবু "নবজীবনের ভূমিকায় মুগ্ধ হইয়া ভাবিয়াছিলেন, "এই বার বুঝি নবীনে ও প্রবীণে প্রীতি হইবে—ইত্যাদি কত সুখ দেখিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ফলবতী না হওয়ায় মর্ম্মাহত হইয়াছেন, হইবারই কথা। একটু আকাশ পরিষ্কার হইবার যো হইয়াছিল। সম্মিলনের কিরণ অল্প মেঘাবৃত হইলেও ঈষৎ বিকীর্ণ হইতেছিল, অমনি কোথা হইতে রমেশ মেঘে আকাশ ছাপিয়া পড়িল, সেই সময়ে সকলের আশা সমূলে উৎপাটিত হইল। অন্ধকার সময় পাইয়া অধিকার বিস্তার করিল। পেচকেরা কৌতুক করিতে লাগিল।

ফলত রমেশ বাবুর দ্বারাও আমরা উপকৃত হইয়াছি; সে উপকার কখন ভুলিব না। যিনি ভুলিবেন, তিনি অকৃতজ্ঞ। তিনি যদি নির্ব্বাণ প্রায় ধর্ম্ম বহ্নিতে খোঁচা না মারিতেন, কখনই অকস্মাৎ এরূপ জ্বলিয়া উঠিত না। সর্পকে খোঁচা না মারিলে ফোঁস করে না। যে নবজীবনে বেদ কৃষকের ভাব-ভোর প্রাণ ভরা সরল সঙ্গীত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই নবজীবনে বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য নব্য শিক্ষিতের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে, ইহা সামান্য সৌভাগের বিষয় নয়। যদি রমেশ এরূপ খোঁচা না মারিতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ পত্রিকা নির্ব্বিশেষে বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য সমর্থিত হইত না। ভগবান বুদ্ধদেব একবার খোঁচা মারিয়াছিলেন। যখন সাধারণের কর্ম্ম-কাণ্ডে আসক্তি, জ্ঞানকাণ্ডে একটু মাত্র ও দৃষ্টি নাই।—কেবল যাগ—গোমেধ, অশ্বমেধ, ছাগমেধ।—যাগে, পূজায়, মধু-পর্কে—সর্ব্বত্রই জীবহিংসা। আর যখন ধর্ম্ম মুখে—আত্মাভিমানে পূর্ণ, বৈদিক কার্য্যে—জ্ঞান রহিত কেবল মন্ত্রগত,—অন্তঃকরণে বড় নাই; সেই সময় ভগবান্ বুদ্ধদেব এক খোঁচা মারিয়াছিলেন, আর আগুণ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাই বলি, যে খোঁচা মারে তার প্রতি আমরা বা আমি বড় সন্তুষ্ট হই। এই যুক্তি মূলে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টীয়ানেরা আমাদের সন্তোষের পাত্র। মধ্যে মধ্যে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের নির্ব্বাণ প্রবণ দশায় এইরূপ খোঁচা খাইয়া অপেক্ষাকৃত সতেজ হইতে হইবে—এই বড় আক্ষেপের বিষয়।

পাঠক! পূর্ব্বোক্ত কুজ্ঝটিকাই "বেদব্যাসের" উৎপত্তির অপর কারণ। সেই অবধি বা তাহার কিছু পূর্ব্বাবধি নব্যের প্রিয়, প্রাচীনের সম্পূর্ণ অপ্রিয় প্রবন্ধ নবজীবনে বেশী বেশী বাহির হইতে লাগিল; নব্যদল দলে দলে

দ্বিগুণ উৎসাহে নব্য হিন্দু ধর্ম্মে দিন দিন আকৃষ্ট হইতে লাগিল, নবজীবন ও প্রচার সৌভ্রাত্র প্রেমে চিরবদ্ধ ; সুতরাং, প্রচারও নবজীবনের অনুকরণ করিতে লাগিল ইহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক দাদা, ভাই নবজীবন ও প্রচারের ধর্ম্মকথায় নব্যের অনেক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে লাগিল ; কিন্তু তাহাতে প্রাচীন বা তন্মতাবলম্বীর মনস্তুষ্টি হইল না, তাঁহাদের উপযোগী একখানি সংবাদপত্রের প্রয়োজন হইল। এই সমাগমে "বেদব্যাসের" উৎপত্তি। নতুবা "শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের "ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা" শীর্ষক প্রবন্ধ কাটিয়া ছাটিয়া ছাপা" হওয়াতে বেদব্যাসের সৃষ্টি হয় নাই *।

রমেশ বাবুর ঋগ্বেদ শীর্ষক প্রস্তাব যে প্রাচীনের নিতান্ত অপ্রীতিকর, তাহা সাধারণে অবগত আছেন। এই সঙ্ঘর্ষণে নবীনের আর প্রবীণের বিদ্বেষানল সমধিক জ্বলিয়া উঠিল। চন্দ্রমোহন বাবু লিখিয়াছেন, "সকলেই বুঝিতে পারিলেন, চূড়ামণি মহাশয় এই অছিলায় নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের একটী প্রতিযোগী দল সৃষ্টির চেষ্টায় আছেন," এটী কিন্তু তাঁহার নিতান্ত ভুল। পাছে লোকে তাঁহাকে নব জীবনের ও প্রচারের পোষক বিবেচনা করে, এই গ্লানি ভয়ে, বঙ্গবাসীতে ঘোষণা দিলেন, যে, "নবজীবন ও প্রচারের ধর্ম্ম মতের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই"।

"বেদব্যাস" সম্পাদক মহাশয়! দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াই "বেদব্যাস ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখপাত্র" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। লেখক বেদব্যাস ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখপাত্র স্বীকার করিতে বড় নারাজ; কেননা তাহাতে চন্দ্রশেখর বাবুর ও রজনী বাবুর দুইটী মাত্র প্রস্তাব আছে। তিনি জানেন না "ভূয়সা ব্যবদিশ্যতে"—ভূয়ঃ অংশানুসারে বস্তুর নাম কীর্ত্তিত হয়। পাঠক দেখিতে পাবেন, বেদব্যাসের অধিক লেখা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকল্প পাশ্চাত্য-শিক্ষিতের, তাই মুখপত্র বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। বিশেষত চন্দ্রশেখর বাবুর 'দেবযান' প্রস্তাব ছাপান কালে এ ঘোষণা দেওয়া হয় নাই। তবে ঘোষণার পরে রজনী বাবুর প্রস্তাব

---

* শ্রদ্ধাস্পদ নবজীবন সম্পাদক মহাশয় তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধ যে কাটিয়া ছাটিয়া ছাপান নাই, তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। অবশিষ্টাংশ তৎকালে প্রকাশ না করিয়া বরং সাধারণের উপকার করিয়াছেন। ও রূপ মর্ম্মভেদি নিষ্ঠুর বাক্য প্রকাশ না করাই উপযুক্ত সম্পাদকের কার্য্য। আমি লেখকের ঠিক লেখা তুলিলাম।

অঙ্কিত হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু নাই, ইহাতে কিছুমাত্র গোঁড়ামি নাই। এই মাত্র বলিতে পারি, বেদব্যাস সম্পাদকের ইচ্ছা, এই পত্রখানি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা পরিচালিত হয় ; সে ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া কঠিন। সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ মদধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহোদয় অনুরুদ্ধ হইয়াও লিখিতে অনিচ্ছুক ; অন্যান্য অধ্যাপকেরও এই ইচ্ছা। তাঁহারা হাটে, ঘাটে ধর্ম্ম যন্ত্রাইতে ইচ্ছা করেন না। অনেকের বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ অথচ পণ্ডিত ব্যতীত ধর্ম্মের মৌলিকতা রক্ষিত হওয়া কঠিন। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে কেবল ধর্ম্মান্দোলন করিয়া আসিতেছে, ধর্ম্ম তাঁহাদের হাড়ে মাসে জড়িত, এ কথা কে অবিশ্বাস করে? তাহারা ধর্ম্মতত্ত্ব লিখিতে বা বলিতে জানুক বা না জানুক, অনুভব করিতে জানে। এ কথাও বলি, গোবরেও পদ্ম হয়, ঘৃতও ভেল হয়।

নিরপেক্ষক লেখক যথাসময়ে উপস্থিত বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া আমাদের অতি মহান্ অপকারের মূল উৎপাটন করিবার সূত্রপাত করিয়াছেন। যদি তাঁহার প্রস্তাবে উভয় পক্ষ দলাদলি দ্বেষাদ্বেষি, বকাবকি পরিহার করিয়া আপনাদের গুরুতর কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে সকলই সুখের ভূমিতে অবতীর্ণ হয় ; নতুবা কেবল শক্র হাসান মাত্র সার হইবে।

প্রতি পরমাণু মিশিয়া স্থূল পদার্থ হয়। পরমাণু যে যে জাতীয় ও যে যে গুণসম্পন্ন, স্থূল পদার্থও অবিকল সেইরূপ হয়। সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি মিলিয়া একটী একটী সম্প্রদায় হয়। তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত যে যে গুণ থাকে, সেই সেই গুণ সম্প্রদায়ে সংক্রান্ত হয়। অতএব সম্প্রদায়ের দোষ গুণের জন্য প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়ী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রাচীন আর নব্য এই দুইটী মাত্র হিন্দুসম্প্রদায় ধরিলে লেখকও এই দুইএর একটীর অন্তর্বর্ত্তী হইবেন। নব্যসম্প্রদায়ের দিকে একটু আন্তরিক টানের আবছায়া পরিলক্ষিত হওয়ায়, তাঁহাকে নব্যহিন্দুসম্প্রদায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করি। অথবা তিনি না—নবীন—না—প্রবীণ তৃতীয় হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত হউন, তাহাতে ক্ষতি নাই ; তবে এই মাত্র বলি, যে চন্দ্রমোহন বাবু আজ পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ করিতে নিষেধ করিতেছেন, এবং উভয়ের ঘুসোঘুসি নিবারণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তিনিও বাগ্ পাইয়া ছাড়েন নাই—ঘুসি ঠেকাইতে গিয়া পাশ কাটিবার সময় এক ঘুসি মারিয়া

আসিয়াছেন। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন, "প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীর দেখাদেখি রামা, শ্যামা প্রভৃতি তীর্থযাত্রীরাও যে নব্য হিন্দুসম্প্রদায়কে সর্ব্বদা নানাবিশেষণে বিশেষিত করিতেছেন, তন্নিবারণের চেষ্টা করাও তাঁহাদের উচিত।"

পাঠক! আমি একজন "রামা, শ্যামা" তীর্থযাত্রী; সুতরাং আমার আঁতে ঘা লাগিয়াছে; তাই আজ নিরপেক্ষ লেখককে ২। ১ টী কথা বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি। "দোষাবাচ্যা গুরোরপি"—তীর্থযাত্রীরা কোন ছার। তাহাদের দোষ সংশোধনের দুই উপায়—এক তীব্র বিদ্রূপ বাণ, অপর গুরু গম্ভীর উপদেশ বর্ষণ। উভয়বিধই যথাসময়ে উপযোগী। শেষোক্ত উপায়ই উন্নতমনার আশ্রয়ণীয়। লেখকও এই শেষোক্ত প্রিয়, তাহা আভাসে জানাইয়াছেন; কিন্তু নিজের মহত্ত্ব নিজে রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি কীলোকীলি থামাইতে গিয়া এক কীল মারিয়া আসিলেন। বাছিয়া বাছিয়া গরিবকে মারিলেন, তাই কীল কিছু বেশী জোরে বোধ হইয়াছে।

উপসংহারকালে আর একটী কথা বলিয়া বেদব্যাসের বিশ্রাম করি। লেখকের মনের ভাব, তীর্থযাত্রীদিগকে প্রথমেই জব্দ করা উচিত; ভবিষ্যতে তাহারা আর বাড়িতে না পারে। এই তীর্থযাত্রীদের আস্পর্দ্ধা নিবারণ করিবার ক্ষমতা কোন সম্প্রদায়ের নাই। লেখক যেমন তাহাদিগকে অধম ভাবেন, বাস্তবিক ততদূর তাহারা নয়। বিশেষত তাহারা হিন্দুসমাজের প্রধান অঙ্গের মধ্যে গণ্য। কালে তাহাদের দ্বারাই এই কঙ্কালাবশিষ্ট হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিত ও চালিত হইবে। লেখক জানেন কি—"কালে বাণুও পণ্ডিত হয়।" আজ লোকে যে হিন্দুধর্ম্মের বড়াই করিয়া থাকে, তাহাও এই জাতির লোকের দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল, নতুবা এত দিন কেহ হিন্দুধর্ম্মের নাম মাত্রও শুনিতে পাইত না।

আমি প্রতিবাদ করিতে এই প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। চন্দ্রমোহন বাবুর মন উন্নত, উদ্দেশ্য অতি মহান্, জ্ঞানও প্রবীণবৎ পরিপূর্ণ। তাঁহার সময়-সুলভ স্মরণ প্রদর্শন করিবার জন্যই আজ লেখনী ধারণ করিলাম।

কে আছে আমার ?

কে আছে আমার ?

এই যে বিশাল ধরা, কত রাজ্য দেশ ভরা
কত জনপদ গ্রাম সংখ্যা নাহি তার,
কে আছে এ পৃথিবীতে
এ দগ্ধ জ্বলন্ত চিতে
একটু শান্তনা দিতে কে আছে আমার ?
এত দুঃখে মনস্তাপে
এত কাঁদি শোকে তাপে
এত যে ভাঙ্গিয়া গলা করি হাহাকার,
ভ্রুক্ষেপে চাহে না ফিরে
কেহই শোনে না কিরে ?
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আহা কে আছে আমার ?

(১)

কে আছে আমার ? আমি একা—অসহায়,
দেখেছি আমার দুখে
দয়া নাই কারো বুকে
এক বিন্দু অশ্রুজল নাহি এ ধরায় !
দেখেছি খুজিয়া ধরা
শুধু নিষ্ঠুরতা ভরা
একটু মমতা স্নেহ নাহি পাওয়া যায় !
খুজিয়াছি পৃথিবীরে
অস্থি মজ্জা শিরে শিরে
প্রতি অণু পরমাণু রেণু কণিকায়,
একটু মমতা স্নেহ নাহি পাওয়া যায় !

(২)

কে আছে আমাব ? আমি একা--অসহায়,
যেখানে সেখানে আছি,
মবি মবি—বাচি বাচি
সংসাব, তোমাব তা'তে কি বা আসে যায় ।
আমি যাই অধঃপাতে
ক্ষতি কি তোমাব তা'তে
কাঁদে না তোমাব প্রাণ পাষাণের প্রায় ।
ভিখাবী ভিক্ষুক বেশে
ফিবিতেছি দেশে দেশে
পাইনা একটু দযা কাঁদিযা কোথায় ।
একটী স্নেহের ভাষা
একটুকু ভালবাসা
একটী নিশ্বাস দীর্ঘ,—হায হায় হায,
পাইনা একটু দয়া কাঁদিয়া কোথায ।

(৩)

একাকী সংসাবে আমি, কে আছে আমার ?
ভাই হাবা বন্ধু হাবা
দেশ ছাডা লক্ষ্মী ছাড়া
এমন কপাল পোডা আছে নাকি আব ?
আছে কি আমাব মত
জগতে দুর্ভাগা এত
'আমাব' বলিতে যাব নাহি অধিকাব ?
এমন 'আমার' হাবা
কোথা আছে আমি ছাডা
বিবাট বিশাল বিশ্ব খুজে মেলা ভার,
সামান্য পথের ধূলি
হৃদয়ে লইতে তুলি

সংকুচিত হয় চিত্ত নাহি পারি আর!
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আহা কে আছে আমার?

(৪)

আমি যেন সংসারের কেহ কিছু নই,
জগতে কিছুতে মম নাহি অধিকার,
রবি শশী সমুদয়
এই যে উদয় হয়
ঘুচাইয়া সকলের আঁখি অন্ধকার,
ইহারা আমার তরে
আলো দান নাহি করে
কে আছে এ সংসারের?—আমি কোন্ ছার!
এই যে সমীর বহে
আমার লাগিয়া নহে
তরু তৃণ ফল শস্য ধরে না আমার।
তবু বেহায়ার মত
ঘৃণায় লজ্জায় এত
নিষ্ঠুর জগতে আছি—ধিক্ শতবার।
এত হেয় অবজ্ঞেয় জীবন আমার।

(৫)

কেন এ সংসারে আছি—কার মমতায়?
শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন
বান্ধব নাহিক অন্য
শকুনী গৃধিনী মম শেষের সহায়!
কাকের কর্কশ রবে
সান্ত্বনা পাইতে হবে
এই মম পরিণাম, হায় হায় হায়,
কেন এ সংসারে আছি, কার মমতায়?

(৬)

কোন্ কালে ছিঁড়িয়াছে ভবের বন্ধন,
মিছে সে আশায় আছি
মিছে সে আশায় বাঁচি
মিছে শুধু দেশে দেশে করি অন্বেষণ !
এই যে বিশাল ধরা
এতে নর নারী ভরা
একটী মিলিল কই মমতা তেমন
এ দেশে আছে কি তারা
পাপিষ্ঠ মানুষ ছাড়া ?
দেবতা দৈত্যর দেশে তিষ্ঠে না কখন !
মিছে শুধু দেশে দেশে করি অন্বেষণ।

(৭)

মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই,
যবে দেখি তারে যেয়ে
শুধুই সুধাই গিয়ে
তুমি কিরে জগবন্ধু জীবনের ভাই ?
তুমি কি ভগিনী মম
প্রাণ হতে প্রিয়তম
পূজনীয়া দেবী সম আমি যাঁরে চাই ?
দেখিলে বালিকা মেয়ে
মিছে কোলে করি যেয়ে
প্রাণের প্রমদা ব'লে মিছে চুমা খাই।
কেহই বলেনা কথা
কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা
অনাদরে প্রাণ মন পুড়ে হল ছাই !
একটুকু ভালবাসা
একটী স্নেহের ভাষা
এক ফোটা আখি জল কোথাও না পাই !

সত্যই এ বসুন্ধরা
কেবলি রাক্ষসে ভরা
দয়ার সে দেবতারা এ জগতে নাই!
মিছে শুধু দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই।

(৮)

মিছামিছি দিবা নিশি করি অন্বেষণ,
দেখিয়াছি অনিমিষে
অনন্ত আকাশ দেশে
ওঠে কত রবি শশি গ্রহ তারা গণ,
খুজিয়াছি পাতি পাতি
সে নব লাবণ্য ভাতি
একটি সারদা নাহি মিলে কদাচন!
একটী ভগিনী ভাই
অনন্ত আকাশে নাই
একটী প্রমদা নাহি তোষে প্রাণ মণ!
ওঠে কত শশী তারা তরুণ তপন!

(৯)

মিছামিছি দিশি দিশি করি অন্বেষণ,
উপবনে শত শত
দেখেছি কুসুম কত
কামিনী গোলাপ কুন্দ করবী কাঞ্চন,
দেখিয়াছি ফুলে ফুলে
কি মঞ্জরী কি মুকুলে
সারদার স্নেহ সুধা মিলে না তেমন!
ভগিনী ভাইয়ের মত
ভালবাসা নাই তত
সামান্য সৌরভে নাহি জুড়ায় জীবন!
দেখিয়াছি সরোবরে
কমল কুমুদ থরে

একটী প্রমদা নাহি ফোটে কদাচন !
মালতী মাধবী জাতি
সূর্য্যমুখী বেলী যূথী
বকুল বান্ধুলী বক সেউতী বঙ্গন,
দেখেছি কুসুম কত
উপবনে শত শত
একটী সাবদা ফুল ফোটেনা কখন !
দেখেছি বসন্ত কালে ভরা উপবন।

(১০)

শুনেছি বসন্ত কালে কোকিল কূজন,
শুনিয়াছি শাখে শাখে
পাপিয়া দয়েল ডাকে
শ্যামার সঙ্গীতে বটে ভুলায় ভুবন,
দেখিয়াছি যথা তথা
মৃত তরু মৃত লতা
মঞ্জরী মুকুলে ফুলে জাগে উপবন !
কিন্তু এ পাখীর গানে
সে সুধা পশে না প্রাণে
সাবদা প্রমদা সুধা ঢালিত যেমন।
ভগিনী ভাইয়েব ভাষা
মিটাইত যত আশা
কলকণ্ঠে সে পিপাসা হয় না বারণ,
শুনেছি বসন্ত কালে কোকিল কূজন !

(১১)

মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমি অকারণ,
দেখেছি খুঁজিয়া হায়
শত যত্নে অমরায়
দেবতা ছত্রিশ কোটি সুরবালা গণ,
অমর ঐশ্বর্য চয়
দেখিয়াছি সমুদয়

দেখিয়াছি কুসুমিত দেব উপবন!
সাবদা ভগিনী ভাই
প্রমদা সেখানে নাই
অমব জানেনা আহা মমতা তেমন!
দেখিয়াছি পরখিয়া
দেবতাব সুধা দিয়া
প্রাণেব জলন্ত জ্বালা নহে নিবাবণ,
দেবতা জানেনা আহা মমতা কেমন।

(১২)

মিছামিছি দিশি দিশি কবি অন্বেষণ,
দেখেছি খুজিয়া স্বর্গ, মিলে বটে চতুবর্গ
মিলে সুখ মিলে শান্তি অনন্ত জীবন'
দেখিয়াছি অন্বেশিলে
সালোক্য সযুজ্য মিলে
মিলে সে নির্ব্বাণ মুক্তি কবিলে সাধন,
কিন্তু সে ত্রিদিব ধামে
জনক জননী নামে
দেবেব দেবতা নাহি মিলে কদাচন,
কোথা সে পবিত্র ঠাঁই
কল্পনায় নাহি পাই
কোথা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কবিছে পূজন,
দেবের দেবতা তাবা কোথায় এখন?

(১৩)

মিছামিছি দেশে দেশে কবি অন্বেষণ,
ত্রিদিবেও নাহি যাঁবা,—
বৃথা খুজি বসুন্ধবা
কে আছে এমন মূর্খ আমাব মতন?
শুধু এ দৈত্যেব দেশে
মানব মানবী বেশে

দানব দানবী আছে ভরিয়া ভুবন !
করুণা মমতা শূন্য
নাহি জানে পাপ পুণ্য
পিশাচ রাক্ষসগুলা কাহার সৃজন ?
মিছামিছি দেশে দেশে করি অন্বেষণ !

(১৪)

কেন এ সংসারে আছি ?—কার মমতায় ?
শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন
বান্ধব নাহিক অন্য
শকুনী গৃধিনী মম শেষের সহায় ।
কাকের কর্কশ রবে
সান্ত্বনা পাইতে হবে
এই মম পরিণাম হায় হায় হায়,
কেন এ সংসারে আছি, কার মমতায় ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস ।

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। } আশ্বিন ১২৯৪। { ৩য় সংখ্যা।

বিজয়া দশমী।

ফুরাইল সব ;—হাসি, হর্ষ, মহোল্লাস,—
জীবন্ত উৎসাহ, যত্ন, আমোদ, উচ্ছ্বাস,
শিথিল অঙ্গের গ্রন্থি,
নীরব হৃদয় তন্ত্রী,
অচল ধমনীচয়, অবসন্ন প্রাণ,—
উদ্বেল হৃদয়ে রক্ত বহে না উজান।

২

সমাপিত সাড়ম্বর শক্তি মহোৎসব,—
জগতী বিষাদময়ী,—শূন্যময় সব।
ক্ষণিক স্বপন প্রায়,—
সকলি ফুরাল হায়,—
বিদ্যুতের বহ্নিক্রীড়া,—বজ্র নির্ঘোষণ,—
প্রাণের প্রমত্তভাব, হৃদয়োদ্দীপন।

৩

বঙ্গের অদৃষ্টাকাশে তিনটি বাসর—
সমুদিত ছিল যেই সুখ সুধাকর,—
বরষি আলোক রাশি,
দুখের তামস নাশি,—
অসুখ—জলদ জালে মিশিল আবার,
বিষাদ নিলয় বঙ্গ পুনঃ অন্ধকার।

৪

বিসর্জ্জিয়ে শক্তি মূর্ত্তি বিষাদিত মনে,
ফিরিয়ে ভবনে, হায় নিরখি নয়নে,—
নাহি সে সুখের হাসি,
সর্ব্বত্র বিষাদ রাশি,—
ভাসে না হর্ষের জ্যোতিঃ নয়নে নয়নে—
ভ্রমে না সুখ ষট্‌পদ প্রাণ-পুষ্পবনে।

৫

যে মন্দিরে মহাশক্তি ছিল অধিষ্ঠিত,
যে মন্দির দীপালোকে ছিল আলোকিত,
আজি সে মন্দির শূন্য,—
অন্ধকারে ম্লান, ক্ষুণ্ণ;
নিরখি সে ম্লান কক্ষ কেঁদে উঠে প্রাণ,
মন্দির সুষমা শক্তি করেছে প্রস্থান।

৬

যে প্রাঙ্গনে অহর্নিশি হাসি হর্ষ বোল—
বাজিত সুকণ্ঠে; যথা শঙ্খ ঢাক ঢোল—
প্রমোদ প্রবাহে মরি,—
হৃদয় আকুল করি,—
গভীর দাপটে ঘন উঠিত বাজিয়া,
হৃদয়ের রক্ত স্রোতে বিদ্যুৎ ঢালিয়া,—

৭

ঋত্বিকের প্রাণস্পর্শী মন্ত্র উচ্চারণ
করিত যেখানে সদা, চিত্ত-বিনোদন—
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পায়ে,
'পুত্রান্ দেহী মহামায়ে
সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহী মে' করি নিবেদন,
হৃদয়ের সুপ্ত আশা হ'ত সচেতন,—

৮

আজি সে উৎসবময় পূজার ভবন,—
নীরব গাম্ভীর্য্যে আছে হয়ে নিমগন।
নাহি সে হর্ষের রোল,
নাহি বাজে ঢাক ঢোল,
বিষণ্ণ হৃদয় মাঝে থাকিয়া থাকিয়া,—
অতীত সুখের স্মৃতি উঠিছে জাগিয়া।

৯

কেন কাঁদ প্রাণ, কেন এত অবসাদ,
কি হেতু আক্ষেপ এত, কেন এ বিষাদ?
সময়ের সিন্ধু পার
দেখ গিয়ে একবার,
আর্য্য মহাশক্তি মগ্ন হয়েছে কোথায়,
আর্য্য বীর্য্য বহ্নি কোথা নির্ব্বাপিত হায়।

১০

কুরুক্ষেত্র সমরের বহুকাল পরে,
ভারতের শান্তিশূন্য অনৈক্য আঁধারে,
রণ মদে দম্ভভরে
শাণিত কৃপাণ করে,
প্রবেশিল জয়োন্মত্ত যবন দুর্ব্বার,
অত্যাচারে স্বর্ণভূমি হ'ল ছার খার।

১১

নাশিতে যবন গর্ব্ব কত আর্য্যবীর,—
সমর অনলে, দিলা আহুতি শরীর,—
শোণিত প্রবাহে হায়,
ভাসিল ভারত কায়;
আর্য্যরক্তে ম্লেচ্ছরক্তে হল মেশামিশি,
গ্রাসিল ভারত রাজ্য—দুর্ভাগ্যের নিশি।

১২

সময় সিন্ধুর সেই রক্তময় স্রোতে,
আর্য্য মহাশক্তি মগ্ন বহু দিন হ'তে
একতা অধ্যবসায়,
সকলি বিলুপ্ত হায়,—
শোণিত প্রবাহে ধৌত সুখ স্বাধীনতা,—
অতুল বীরত্ব ভাতি, তীব্র তেজস্বিতা।

১৩

তবে কেন প্রাণ আজি অধীর এমন?—
মৃন্ময়ী প্রতিমা জলে করি বিসর্জ্জন।
যেই শক্তি প্রাণরূপা
অনন্ত সুখ-স্বরূপা
ভীরুর সাহস বীর্য্য, দুর্ব্বলের বল,
পতিতের ত্রাণকর্ত্রী,—জাতীয় সম্বল,

১৪

সেই শক্তি বিসর্জ্জিয়ে কাল সিন্ধু জলে,
সমর্পিয়ে প্রাণ মন শত্রু পদতলে—
ঘৃণিত জীবন লয়ে,
দাসত্বের বোঝা বয়ে,
সপ্ত শত বর্ষাবধি বহিয়াছ হায়,
হারায়ে জাত্যভিমান,—জীবন্মৃত প্রায়।

১৫

পুনঃ কি সে মহাশক্তি হইবে উদ্ধার?—
পুনঃ কি এ দেহে হবে জীবন সঞ্চার?—
আর্য্যসুত মহাভক্ত
দিয়ে হৃদয়ের রক্ত
সে জীবন্ত মহাশক্তি পূজিবে আবার?
হাসিবে ভারত ভূমি, ঘুচিবে আঁধার?—

শ্রীশরচ্চন্দ্র গোষ্ঠীপতি।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

অথ যোগানুশাসনম্। ১।

পদচ্ছেদঃ। অথ, যোগ-অনুশাসনম্।

পদার্থঃ। অথ ইত্যধিকারার্থঃ, যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, অনুশাসনম্ শাস্ত্রম্।

বাক্যার্থঃ। যোগশাস্ত্রমধিকৃতমিত্যর্থঃ। ইতঃ পরং যদ্বক্ষ্যে তদ্যোগবিষয়কমিতি জ্ঞেয়ম্।

অনুবাদ। এই সূত্র যোগশাস্ত্রের আরম্ভক। ইহার পর যে সকল সূত্র কথিত হইবে, সকলই যোগের বিষয় জানিবে।

সমালোচনা 'যোগ' শব্দের অর্থ 'সমাধি' অর্থাৎ অধ্যাত্মচিন্তায় দীর্ঘকাল চিত্তের স্থির ভাব। সামান্যত চিত্তের পাঁচ প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। ইহাদিগের মধ্যে রজোগুণের প্রাবল্য বশত সর্ব্বদা বিষয় লালসায় চঞ্চল চিত্তকে 'ক্ষিপ্ত' বলা যায়। যে চিত্ত তমোগুণের প্রভাবে সর্ব্বদাই নিদ্রিত, অর্থাৎ মোহ বা অজ্ঞানে পরিপূর্ণ, তাহাকে 'মূঢ়' বলা যায়। 'বিক্ষিপ্ত' চিত্ত 'ক্ষিপ্ত' হইতে কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট। ক্ষিপ্ত চিত্ত যেমন রজোগুণে চালিত হইয়া সর্ব্বদা বিষয় বাসনায় পাগলের মত ছট্ফট্ করে, বিক্ষিপ্ত চিত্ত সেরূপ নহে। ইহাতে সত্ত্বগুণের অল্পমাত্র অধিকার থাকায় মধ্যে মধ্যে স্থির হয়। 'একাগ্র' চিত্ত এক বিষয়ে নিরত। যেমন বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা স্থির ভাবে থাকে, সেইরূপ সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হেতুক একাগ্রচিত্ত একই বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া স্থির-ভাবে অবস্থান করে। যখন চিত্তের সমুদয় বৃত্তিগুলি নিরুদ্ধ হয়, কেবল সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম 'নিরুদ্ধ।' এই পাঁচ প্রকার অবস্থার মধ্যে ক্ষিপ্ত বা মূঢ়াবস্থায় যোগ হইতেই পারে না। কারণ, ক্ষিপ্তাবস্থায় চিত্তের স্থিরতা নাই। মূঢ়াবস্থায় অজ্ঞান-বাহুল্য; তাহাতে সদ্বিষয়ের জ্ঞান হয় না,

সুতরাং দীর্ঘকাল ধরিয়া আধ্যাত্মিক চিন্তা অসম্ভব। বিক্ষিপ্ত চিত্তের কিঞ্চিৎ স্থিরতা আছে বটে, কিন্তু ঐ স্থিরতা ব্যাপককাল স্থায়ী নহে, স্থিরতা হইতে না হইতেই রজোগুণের প্রাবল্য হেতুক অস্থিরতা আসিয়া পড়ে। কেবল একাগ্র এবং নিরুদ্ধ এই দুই অবস্থাই যোগের উপযুক্ত। ইহাদের মধ্যে একাগ্র অবস্থায় যে 'সমাধি' হয়, তাহার নাম 'সম্প্রজ্ঞাত।' এই সমাধিতে পরমার্থ স্বরূপ ধ্যেয় বস্তুকে প্রকাশিত করে, ক্লেশ সকলের ক্ষয় করে, কর্ম্মবন্ধনদিগকে শিথিল করে, এবং ক্রমে ক্রমে চিত্তকে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধাবস্থায় নীত করে। 'সম্প্রজ্ঞাত' শব্দের অর্থ, যাহাতে ধ্যেয় বস্তু সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। এই সম্প্রজ্ঞাত চারি প্রকার। 'বিতর্কানুগত', 'বিচারানুগত', 'আনন্দানুগত', এবং 'অস্মিতানুগত'। ইহাদিগের প্রত্যেকের লক্ষণ পরে বলা হইবে।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সময়ে সকল বৃত্তির নিরোধ হয় না। কারণ, সে সময়ে ধ্যেয় বস্তুর সাক্ষাৎকারিণী বৃত্তি থাকে; সে বৃত্তিটিও যে অবস্থায় লুপ্ত হয়, উহাকে নিরুদ্ধাবস্থা বলে, এই অবস্থায় যে সমাধি হয়, তাহার নাম 'অসংপ্রজ্ঞাত' সমাধি। অসংপ্রজ্ঞাত বলিবার তাৎপর্য্য, এই অবস্থায় কিছুই বিদিত হয় না; ধ্যেয় ও ধ্যাতার প্রভেদ জ্ঞান থাকে না, চিত্ত ধ্যেয় বস্তুতে লীন হইয়া কেবল অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভোর হইয়া থাকে, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হয়। কিন্তু এ অবস্থাতেও পূর্ব্ব সংস্কারগুলির একেবারে লোপ হয় না। উহারা কোনরূপে অলক্ষিতভাবে চিত্তমধ্যে অবস্থান করে। কারণ, সমাধিভঙ্গের পর পদার্থ নিচয়ের পূর্ব্ববৎ জ্ঞান হইয়া থাকে।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।২।

পদচ্ছেদঃ। যোগঃ চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধঃ।

সংক্ষেপার্থঃ। চিত্তস্য মনোবুদ্ধ্যহংকাররূপস্যান্তঃকরণ সামান্যস্য যা বৃত্তয়ঃ (সুখদুঃখেচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সংস্কাররূপা যে পরিণামাঃ) তাসাং নিরোধঃ উপশমঃ বহির্মুখপরিণতি বিচ্ছেদাদন্তর্মুখতয়া প্রতিলোম পরিণামেন স্ব স্ব কারণে লয়ঃ ইত্যর্থঃ। 'যোগ' আখ্যায়ত ইতিশেষঃ।

অনুবাদ। চিত্ত শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ, তাহার বৃত্তি সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা. দ্বেষ চেষ্টা এবং সংস্কার প্রভৃতি পরিণাম; এই সকল পরিণামের যে নিরোধ, নিবৃত্তি, অর্থাৎ বাহ্য বস্তু সম্বন্ধ রহিত হওয়ায় অন্তর্বীণ ক্রিয়া দ্বারা উহারা যে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার বিপরীত ক্রমে স্ব স্ব কারণে লীন হওন, তাহার নাম যোগ।

সমালোচনা। চিত্তের নাম অন্তঃকরণ। উহা তিন প্রকার; মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। এবং উহাতেই বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব হওয়াতে আমাদের জ্ঞানের উদয় হয়। উহার স্বরূপ কি, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই।

ব্যাসদেব বলেন, আমরা চিত্ত বা অন্তঃকরণের প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং স্থিতি অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়াবস্থা—এই তিন প্রকার স্বভাব লক্ষ্য করি। ইহাতে অনুমান হইতেছে যে, চিত্ত বা অন্তঃকরণ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক। যখন উহার প্রকাশ স্বভাব দৃষ্ট হয়, তখন উহা শুদ্ধ সত্ত্বগুণময়। ঐ সত্ত্বময় চিত্ত রজঃ এবং তমঃ এই উভয় গুণের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হইলে, ঐশ্বর্য্য (অলৌকিক শক্তি বিশেষ) এবং বিষয় (সাধারণ ভোগ্য বস্তু) এই উভয়কে ভাল বাসে। আর কেবল তমোগুণ সংযুক্ত হইলে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য এই সকল প্রিয় বলিয়া বোধ করে। চিত্তের মোহরূপ আবরণ ক্ষীণ হইলে, কেবল অল্পমাত্র রজোগুণের এক বিন্দু সম্পর্ক থাকিলে, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য এই সকলে চিত্ত উপগত হয়; আর ঐ রজোগুণের সম্পর্কটুকু অপগত হইলে, চিত্ত আবার স্বরূপে অবস্থিতি করে; তখন বুদ্ধি ও আত্মার স্বরূপ জ্ঞান মাত্র ইহার বৃত্তি হয়।

উপরে চিত্তের স্বরূপ যাহা উক্ত হইল তাহাতে জানা গেল যে চিত্ত ত্রিগুণময়, এবং যখন যে গুণের আধিক্য হয়, তখন উহা তদনুগামী হয়, কাজেই সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। রজোগুণের আধিক্য হইলে সুখ দুঃখাদি বিষয় লাভে প্রবৃত্ত হয়। তমোগুণের উদ্রেক হইলে হিতাহিত জ্ঞানের লোপ হওয়ায় সর্ব্বদা অহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং সত্ত্বের আধিক্য হইলে কেবল সুখের সাধনে প্রবৃত্ত হয়। এই পরিবর্ত্তনশীল চিত্তে বাহ্য বস্তু নিচয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া উহার নানাবিধ পরিণাম, সুখ, দুঃখ, ইত্যাদি উৎপন্ন করে। ঐ সকল পরিণামের নাম বৃত্তি। বৃত্তি

সকল নানা প্রকার। কোন বৃত্তি কেবল ক্লেশজনক, কোন বৃত্তি আনন্দ জনকও হয়, কিন্তু কোনরূপ বৃত্তি স্থির সুখের কারণ নহে।

ক্রমশ অভ্যাস দ্বারা ঐ বৃত্তি গুলির নিবৃত্তি করার নাম নিরোধ। বৃত্তির নিরোধ করিতে হইলে অগ্রে ইন্দ্রিয়দিগকে বাহ্য বস্তু হইতে নিবৃত্ত করিতে হয়। তাহার পর ইন্দ্রিয় এবং মনের সম্বন্ধ পৃথক করিতে হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৃত্তি সকল লীন হয়।

সূত্রে 'বৃত্তি নিরোধ' মাত্র বলিয়াছেন, 'সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ' বলেন নাই। এই নিমিত্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও যোগশব্দের বাচ্য হইল। যদি সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ বলিতেন, তাহা হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি যোগশব্দের বাচ্য হইত না। কারণ সংপ্রজ্ঞাত সমাধির সময় বুদ্ধি ও আত্মার স্বরূপ জ্ঞানবৃত্তি চিত্তে অবস্থান করে। যদি বল সম্প্রজ্ঞাতই যোগের চরমসীমা হউক, সকল বৃত্তি নিরোধরূপ যোগের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তর এই যে বৃত্তি-মাত্রই ত্রিগুণাত্মক এবং পরিণামিনী, সুতরাং উহা স্থির আনন্দের হেতু হইতে পারে না, এই নিমিত্ত তাবৎ বৃত্তিরই নিরোধ আবশ্যক।

চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণময়; কারণ ইহাতে সত্ত্ব গুণের ধর্ম্ম 'প্রকাশ' অর্থাৎ দর্পণ তুল্য নির্ম্মলতা, রজোগুণের ধর্ম্ম, 'প্রবৃত্তি,' এবং তমোগুণের ধর্ম্ম 'অন্ধকার' এই তিনই লক্ষিত হয়। চিত্তের পরি-ণাম অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম বৃত্তি। এই অবস্থান্তর প্রাপ্তি যে কেবল বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পতনে হয়, তাহা নয়, চিত্তের উপাদান স্বরূপ উপরি কথিত গুণত্রয়ের ন্যূনাধিক্য বশতও ঐরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। যে চিত্তে সত্ত্বগুণের আধিক্য তাহার বৃত্তি সকল সুখময়, ধর্ম্মপ্রিয়, বৈরাগ্য-প্রধান; যাহাতে রজোগুণের প্রাবল্য তাহার বৃত্তি সকল ইচ্ছা-প্রধান, চেষ্টা-বহুল, এবং ঐশ্বর্য্যাসক্ত; এইরূপ তমোগুণের আধিক্য হইলে চিত্তের বৃত্তি সকল পাপময়, দুঃখপূর্ণ, শোকাকুল হয়। ফলত চিত্তের ভাল অবস্থাও বৃত্তি এবং মন্দ অবস্থাও বৃত্তি। এই বৃত্তি সকলের উপশম হইয়া চিত্ত যখন নির্ব্বিকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যখন সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা চেষ্টা কিছুই না থাকে, তাহার নাম যোগ। সম্পূর্ণ যোগ হইলে চিত্তে কেবল শুদ্ধচৈতন্য রূপ আত্মার প্রতিবিম্ব নিপতিত হওয়ায় চিত্তও আত্মার সহিত ঐক্য রূপ ধারণ করে; আত্মাও

যেমন সুখ দুঃখ রহিত, কেবল চৈতন্যস্বরূপ, চিত্তও তাদৃশ হয়। তখন আত্মা ও চিত্তের বিবেক অর্থাৎ প্রভেদ জ্ঞান থাকে না। ইহাই যোগের চরম অবস্থা। ইহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। কেহ কেহ ইহাকেই ব্রহ্মানন্দ বলেন। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার যোগ আছে, তাহাতে চিত্তের অপর বৃত্তি সকলের উপশম হয় বটে, কিন্তু একটিমাত্র আত্মা ও বুদ্ধির বিবেক রূপ বৃত্তি থাকে। পূর্ব্বে রজঃ ও তমোগুণের সংশ্রব থাকাতে অহঙ্কার উৎপন্ন হওয়ায় আত্মা নিজ প্রতিবিম্বযুক্ত চিত্তকে আমি বলিয়া জানিত। ক্রমে রজঃ ও তমোগুণের ক্ষীণতা এবং সত্ত্বের প্রাবল্য হওয়ায় সেই ভ্রমজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যে অবস্থায় বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান হয়, যে অবস্থায় বুদ্ধি জড় ও পরিণামী, এবং আত্মা চৈতন্য ও অপরিণামী, এইরূপ বিবেকমাত্র থাকে, আর কোন বৃত্তি থাকে না, উহাও যোগ। উহার নাম সম্প্রজ্ঞাত যোগ। এক্ষণে তৃতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা লিখিতেছি।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্ ॥ ৩ ॥

পদচ্ছেদঃ। তদা, দ্রষ্টুঃ, স্বরূপে, অবস্থানম্।

পদার্থঃ। তদা, তস্মিন সময়ে, অসম্প্রজ্ঞাত যোগকালে ইত্যর্থঃ। দ্রষ্টুর্দর্শকস্য, চিতিশক্তেঃ, পুরুষস্য, আত্মনঃ, স্বরূপে নিজপ্রকৃতৌ, নির্বিষয় চৈতন্যমাত্রে। অবস্থানং স্থিতির্ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। যদা অসম্প্রজ্ঞাতো যোগঃ সিধ্যতি তদা উৎপন্ন বিবেকখ্যাতেঃ পুরুষস্য আত্মনঃ কর্তৃত্বাভিমাননিবৃত্তৌ, প্রোন্মুক্তপরিণামায়াং বুদ্ধাবাত্মনঃ স্বরূপেণাবস্থানং স্থিতির্ভবতি।

অনুবাদ। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হইলে তখন চৈতন্য আত্মা বৃত্তিশূন্য চিত্তে শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপে অবস্থান করেন। তখন তাহাতে আর কোন রূপ কর্তৃত্বাদি অভিমান থাকে না।

সমালোচন। পূর্ব্বে আত্মা এবং বোধের স্বরূপ কথনের সময়ে ইহা বলা হইয়াছে যে, আত্মা শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, পরিবর্ত্তন-শূন্য, অর্থাৎ বরাবর এক রূপই থাকে। ইহাতে বাহ্য বস্তুর এবং নিজ প্রতিবিম্বযুক্ত চিত্তের প্রতিবিম্ব নিপতিত হইয়া জ্ঞান ও অভিমান উৎপন্ন করে। যেমন স্ফটিক মণি বা নির্ম্মল কাচের নিকট জবাপুষ্প বা কোনরূপ রঙ্গিল পদার্থ

আনীত হইলে ঐ স্ফটিক মণি বা কাচ সেই জবাপুষ্প বা রঙ্গিন পদার্থের রঙ্গে রঞ্জিত হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ আত্মার সম্মুখে বাহ্যবস্তু-প্রতিবিম্বযুক্ত বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া আত্মাকে স্বীয় রঙ্গে রঞ্জিত করে। বুদ্ধি-স্থিত বস্তু সকল আত্মার নিজের বলিয়া ভাসমান হয়। এই রূপে বুদ্ধির বৃত্তি সকল আত্মাতে প্রতিফলিত হওয়াতে আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান, সুখ, দুঃখ ও নানাবিধ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। আবার যেমন ঐ স্ফটিক বা কাচের সম্মুখ হইতে সেই জবাপুষ্প বা রঙ্গিল পদার্থ দূরে অপনীত করিলে উহারা স্বীয় নির্ম্মল স্বরূপে অবস্থান করে, সেইরূপ বুদ্ধি যখন বৃত্তি-শূন্য হইয়া নির্ম্মল ভাব ধারণ করে, তখন আত্মাও স্বীয় নির্ম্মল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। উহাতে কোন রূপ বৃত্তির প্রতিবিম্ব থাকে না। বুদ্ধি ও আত্মা এক ভাবই ধারণ করে।

বৃত্তি সারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥

পদচ্ছেদঃ। বৃত্তি-সারূপ্যম্, ইতরত্র।

অন্বয়ঃ। ইতরত্র (ব্যুত্থানে, অসমাধিদশায়ামিতি শেষঃ), বৃত্তি-সারূপ্যম্ (চিত্তের সহ আত্মনঃ বৃত্তৌ সারূপ্যম্, বৃত্তি বিষয়ে চিত্তৈক রূপ-তেত্যর্থঃ)। বৃত্তিভিঃ সারূপ্যমেকরূপতেতি কেচিৎ।

ভাবার্থঃ। যোগাদন্যস্মিন কালে চিত্তস্য যাদৃশ্যো বৃত্তয়ঃ সুখ দুঃখ মোহাত্মিকাঃ প্রাদুর্ভবন্তি, আত্মনোঽপি তাভিরবিলক্ষণাঃ সমানরূপা ইতি যাবৎ বৃত্তয়ো ভবন্তীতি ভাবঃ।

অনুবাদ। যোগভিন্ন অবস্থায় চিত্তের যাদৃশ বৃত্তি হয়, আত্মারও তাদৃশ বৃত্তি হইয়া থাকে। চিত্ত ও আত্মার একরূপতা উভয় অবস্থাতেই তুল্যভাবে হইয়া থাকে। অর্থাৎ, সমাধি সময়েও চিত্ত ও আত্মার যেমন একরূপতা হয়, সমাধির অতিরিক্ত সময়েও চিত্ত ও আত্মার তেমনই একরূপতা হয়। ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, সমাধি সময়ে চিত্ত আত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, এবং সমাধির অতিরিক্ত সময়ে আত্মা চিত্তের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

সমালোচন। যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে, তুমি বলিতেছ, চৈতন্য অপরিণামী, তাহার একই রূপ, কখন পরিণাম হয় না, আবার

বলিতেছ, অসম্প্রজ্ঞাতাবস্থায় (যে অবস্থায় সমুদয় বৃত্তির নিরোধ হয়) চৈতন্য আপনার স্বরূপে অবস্থান করে। ইহা দ্বারা এই সিদ্ধ হইল যে, তাদৃশ সমাধি ভিন্ন, অন্য সময়ে চৈতন্যের অন্যরূপ অবস্থা থাকে। তবে ত তাহার অবস্থান্তর আছে। যাহার অবস্থান্তর হয় সেই তো পরিণামী। ইহার উত্তরে বেদব্যাস বলিয়াছেন, চৈতন্যের, কি সমাধি অবস্থা কি অন্য অবস্থা, সকল সময়েই এক রূপ। উহার কোন সময়েই কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন বা বিকৃতি হয় না। তবে সমাধিভিন্নাবস্থায় চৈতন্য অন্যরূপ লক্ষিত হয় কেন, তাহা বুঝাইবার জন্য মহর্ষি পতঞ্জলি উপরি উক্ত চতুর্থ সূত্রের অবতারণ করিয়াছেন।

সমাধিভিন্নাবস্থায় চৈতন্য অন্যরূপে লক্ষিত হয় কেন? ইহার প্রতি ভাষ্যকার হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন 'দর্শিতবিষয়ত্বাৎ'। যোগাতিরিক্তা-বস্থায় বুদ্ধি আপনাতে উপস্থিত বিষয় সকল আত্মাতে প্রতিবিম্ব রূপে নিহিত করে, তাহাতেই আত্মার অন্যরূপতা লক্ষিত হয়। এই নিমিত্তই বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন 'গৃহীতানিন্দ্রিয়ৈরর্থানাত্মনে যঃ প্রযচ্ছতি। অন্তঃ-করণরূপায় তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ'। যে অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত পদার্থ নিচয়কে আত্মাতে অর্পিত করে, সেই বিশ্বব্যাপী অন্তঃকরণকে নম-স্কার। উপরি উক্ত বিষ্ণুপুরাণের বচন দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, আত্মা শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ এবং অবিকারী বটে, তথাপি বুদ্ধির যে সকল বৃত্তি আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহারাই আত্মার বৃত্তি। ঐ প্রতিবিম্ব ছায়ার মত আত্মার স্বরূপাচ্ছাদক মাত্র। উহাদ্বারা আত্মার বিশুদ্ধ চৈতন্য রূপের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে না, কেবল সেই সেই বিষয়ে একটু অভিমান উৎপন্ন হয়। ঐ বিম্বরূপ দুঃখনিবৃত্তিই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির ফল। যদি কেহ এমন বলেন যে, 'আমি সুখী' বা 'আমি দুঃখী' এইরূপ জ্ঞান যখন আমাদের হয়, তখন বৃত্তি সকল আত্মার নিজেরই পরিণাম বিশেষ বলিতে হইবে। তদুত্তরে বৃত্তিকার বলেন, একথা অতি তুচ্ছ, কারণ যদি আত্মার পরিণাম স্বীকার কর, তবে সকল সময়েই আত্মার ঐরূপ পরিণাম হয়, ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে। যে মোক্ষের জন্য এত উদ্যোগ, তাহা ত আর হইতেই পারে না।

যদি বল, সকল সময়ে আত্মার ঐরূপ পরিণাম হইতে পারে না, ঐরূপ পরিণামের প্রতি আত্ম মনঃ-সংযোগই কারণ, যখন আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে, তখনই ঐরূপ পরিণাম হইবে। ভাল, এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ, আত্মা, মনঃ, এবং এই উভয়ের সংযোগ এই তিনকে পরিণামের হেতু স্বীকার করা অপেক্ষা একমাত্র মনই তাদৃশ পরিণামের কারণ অর্থাৎ স্বীয় প্রতিবিম্বিত বস্তু সকল আত্মাতে প্রতিবিম্বরূপে অর্পণ করে, এইরূপ বলিলেই হয়।

তবে 'আমি কর্ত্তা' 'আমি সুখী' এইরূপ যে জ্ঞান হয়, সে সকল জ্ঞান 'আমি সুন্দর' 'আমি স্থূল' ইত্যাদি জ্ঞানের মত ভ্রমকাল্পত। যেমন সৌন্দর্য্য বা স্থূলতা দেহের ধর্ম্ম, উহা ভ্রান্তি বশতঃ আত্মাতে আরোপিত হয়, সেইরূপ সুখ দুঃখ ও কর্তৃত্বাদি চিত্তের পরিণাম অহঙ্কার বশতঃ আত্মাতে আরোপিত হয়। দেহ-ভিন্ন-আত্মবাদীরা যে যুক্তি প্রমাণদ্বারা 'আমি সুন্দর' এইরূপ জ্ঞানকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আমাদের পক্ষেও 'আমি কর্ত্তা' ইত্যাদি জ্ঞানকে ভ্রান্ত বলা সেই একই যুক্তি ও প্রমাণ জানিবা। স্মৃতিও বলিয়াছেন 'প্রকৃত্যৈবচ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি'। যে ব্যক্তি কার্য্য সকল প্রকৃতি কর্তৃক নিষ্পাদিত বলিয়া জানিতে পারে, আত্মা যে কর্ত্তা নয় ইহা সেই জানে।

যখন বাহ্য বস্তুর জ্ঞান কখন হয়, কখন হয় না, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, বাহ্য বস্তুর আকার প্রাপ্তিই জ্ঞানের প্রতি কারণ, বুদ্ধিই বাহ্য বস্তুর আকার প্রাপ্ত হয়, কারণ উহা পরিণামী। ঐ বাহ্য বস্তুর আকারে পরিণত বুদ্ধি নির্ম্মল দর্পণস্বরূপ আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হয়, যেমন তীরস্থ বৃক্ষ সকল সরোবরে প্রতিবিম্বিত হয়। যেরূপ আত্মাতে বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতেও চৈতন্যের প্রতিবিম্ব অবশ্য স্বীকার্য্য, নতুবা চৈতন্যের জ্ঞান হইতে পারে না। আপনি আপনার জ্ঞান করিতে পারে না। অতএব যেরূপ বাহ্য বস্তু সকল বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া আত্মার জ্ঞেয় হয়, সেইরূপ আত্মাও বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া আপনার জ্ঞেয় হয়।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

পরিচ্ছেদঃ।—বৃত্তয়ঃ, পঞ্চতয্যঃ, ক্লিষ্ট অক্লিষ্টাঃ।

পদার্থঃ।—বৃত্তয়ঃ, চিত্তস্য পরিণামবিশেষাঃ ; পঞ্চতয্যঃ, পঞ্চ প্রকারাঃ পঞ্চাবয়বা ইত্যর্থঃ ; ক্লিষ্টাঃ ক্লেশৈরাক্রান্তাঃ ; অক্লিষ্টাঃ, তদ্বিপরীতাঃ।

সূত্রার্থঃ।—পূর্ব্বোক্তা নিরোদ্ধব্যা বৃত্তয়ঃ বক্ষ্যমাণাঃ পঞ্চতয্যঃ পঞ্চ প্রকারা এব ক্লিষ্টা অক্লিষ্টা বা ভবন্তি। বৃত্তিরূপোঽবয়ব্যেকঃ, তস্য প্রমাণাদয়োঽবয়বাঃ পঞ্চ ইতি পঞ্চতয্যঃ।

ভাবার্থঃ।—বৃত্তয়স্তু বক্ষ্যমাণ প্রমাণাদি পঞ্চাবয়বাঃ। তঃ ক্লেশকারিকাঃ অক্লেশকারিকাশ্চ। কাশ্চিৎ ক্লেশং জনয়ন্তি কাশ্চিন্নেত্যর্থঃ। যাঃ ক্লেশং জনয়ন্তি, তাঃ রজস্তমোগুণাক্রান্তাঃ, তেন যাঃ ক্লিষ্টা বৃত্তিঃ সা রাজসী, তামসী বা. যা অক্লিষ্টা সা সাত্ত্বিকী। বহির্ম্মুখচিত্তস্য ক্লিষ্টা বৃত্তিঃ, অন্তর্ম্মুখস্য চাক্লিষ্টা। যা ক্লিষ্টা সা পাপায় সংসারায় চ। যা অক্লিষ্টা সা কল্যাণায় মোক্ষায় চ। ভবতি চৈত্রো মৈত্রোবা কশ্চিৎ সর্ব্বেষামেব তেষাং বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্য এব নাধিকা ন ন্যূনা বা। বাহ্য বিষয় দর্শনেনান্তর বিষয় দর্শনেন চ চিত্তমনেকধা সংস্ক্রিয়তে, তে সংস্কারা বৃত্তিরূপপরিণামানুৎপাদয়ন্তি, বৃত্তয়স্তু সংস্কারান্ জনয়ন্তি। এতচ্চক্রমনিশং চলতি।

অনুবাদ।—নিরোধের বিষয়ীভূত বৃত্তি সকল পাঁচ প্রকার, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্লেশের হেতু অর্থাৎ দুঃখের কারণ আর কেহ কেহ বা অক্লেশ অর্থাৎ সুখের কারণ।

সমালোচন।—বৃত্তি কিরূপ এবং কত প্রকার ইহা না জানিয়া কিরূপে তাহার নিরোধ করিবে। আর বৃত্তি সকল অসংখ্য হইলেও হইতে পারে, সহস্র বৎসর পরমায়ু হইলেও সেই সকল বৃত্তিদিগকে কেহ গণনা করিতে পারে কি না সন্দেহ, অতএব সেই অসংখ্য বৃত্তির নিরোধ কিরূপে সম্ভব। এইরূপ আশঙ্কাকারীদিগকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত বৃত্তিদিগের সাধারণ লক্ষণ এবং ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া পঞ্চম সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

বৃত্তি সকল সাধারণতঃ দুই প্রকার লক্ষিত হয়, যথা কতকগুলি ক্লিষ্ট এবং কতকগুলি অক্লিষ্ট। ক্লিষ্ট দ্বারা তমোগুণপ্রধান বৃত্তিনিচয়ের, এবং অক্লিষ্ট বলিতে সত্ত্বগুণপ্রধান বৃত্তিনিচয়ের, গ্রহণ হইয়াছে। এই উভয় মিশ্রিত রজোগুণপ্রধান ক্লিষ্টাক্লিষ্ট রূপ স্বতন্ত্র আর বৃত্তি নাই; কারণ যাহারা অক্লিষ্ট, তাহারা সর্ব্বদাই অক্লিষ্ট, ক্লিষ্টদিগের সহিত একত্র অবস্থান

করিয়াও তাহারা স্বীয় অক্লিষ্ট ভাব পরিত্যাগ করে না। এই রূপে ক্লিষ্ট বৃত্তি সকল অক্লিষ্ট বৃত্তিদিগের সহিত, একত্র অবস্থান করিয়াও আপনার ক্লিষ্ট ভাব পরিত্যাগ করে না, সর্ব্বদাই ক্লিষ্ট রূপই থাকে। ফল, যে সকল বৃত্তি দুঃখের কারণ, তাহারা সর্ব্বদাই দুঃখ দান করে। এইরূপ যাহারা সুখের কারণ, তাহাদের হইতে সর্ব্বদাই সুখ পাওয়া যায়। কখন সুখ এবং কখন দুঃখ দেয়, এরূপ কোন বৃত্তি নাই। কাজেই তমঃ বা সত্ত্বগুণের সহিত রজোগুণের মিশ্রণে আর কোন রূপ স্বতন্ত্র বৃত্তির উৎপত্তি হয় না। রজোগুণ যখন তমোগুণের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন ক্লিষ্ট বৃত্তি সকল উৎপন্ন হয়; এবং রজোগুণ যখন সত্ত্বগুণের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন অক্লিষ্ট বৃত্তি সমূহের উৎপত্তি হয়; এবং সত্ত্ব বা তমের সহিত প্রধান রূপে রজোগুণ মিশ্রিত হইলে ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট,এই দুই প্রকার বৃত্তিই আবির্ভূত হয়, এক বৃত্তির দুইরূপ ধর্ম্ম হয় না। বৃত্তি অনুসারে চিত্তে সংস্কার সকল উৎপন্ন হয়, ক্লিষ্ট বৃত্তি নিচয় ক্লিষ্ট জাতীয় সংস্কার উৎপন্ন করে, এবং অক্লিষ্ট বৃত্তিরা অক্লিষ্ট জাতীয় সংস্কার উৎপন্ন করে, এবং ঐসকল সংস্কারেরা আবার কখন কখন স্ব স্ব অনুরূপ বৃত্তি নিচয়কে উৎপাদিত করে। যে পর্য্যন্ত নিরোধ সমাধি না হয়. সেই পর্য্যন্ত এইরূপ বৃত্তি ও সংস্কারের চক্র রাত্রিন্দিব পরিভ্রমণ করিতে থাকে। এই জীবভ্রামক বৃত্তি ও সংস্কারচক্রের গতিরোধ বা একবারে নিরোধই যোগের একমাত্র উপায়। অক্লিষ্ট বৃত্তিদ্বারা ক্লিষ্ট বৃত্তি সকলের নিরোধ করিবে, এবং অক্লিষ্ট বৃত্তিদিগকে আবার শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যদ্বারা (যাহার বিষয় পরে বলা হইবে) নিরুদ্ধ করিবে। এই বৃত্তি-সংস্কারময় চিত্ত যখন সম্পূর্ণ নিরোধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহার অধিকার (Office) শেষ হয়, আর কিছুই কর্ত্তব্য থাকে না; তখন উহা আত্মার সহিত একরূপ হয়, এবং যে পর্য্যন্ত যোগভঙ্গ না হয়, দুঃখ শূন্য হইয়া অবস্থান করে, যোগভঙ্গ হইলে আবার সংস্কার অনুসারে বৃত্তি সকলের উদয় হয়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ নিরোধের অভ্যাস বশতঃ সংস্কার সকলের ক্ষয় হইলে চিত্ত একবারেই আত্মার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, আর যোগভঙ্গ হয় না। ঐরূপ মিশ্রিত হওয়ার নামই মুক্তি।

বাস্তব বলিতে হইলে চিত্তের একই বৃত্তি—বিষয়াকারে পরিণাম। ঐ

এক বৃত্তি যেমন বিষয়ভেদে ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্টরূপ ধারণ করে, তেমনি আশ্রয় বা কারণভেদে নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকারে গণনীয় হয়; সুতরাং বৃত্তি অসংখ্য হইলেও তাহাদের আকার দুই রকম, ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট; আর প্রকার পাঁচ রকম, প্রমাণ, বিপর্য্যয় বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি। এক্ষণে বৃত্তির আকার এবং প্রকার উভয়ই জ্ঞাত হওয়া গেল।

প্রমাণ বিপর্য্যয় বিকল্প নিদ্রাস্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

পদচ্ছেদঃ।—প্রমাণানিচ, বিপর্য্যয়শ্চ, বিকল্পশ্চ, নিদ্রাচ, স্মৃতিশ্চ, তাঃ।

ভাবার্থঃ।—প্রমাণবৃত্তিঃ, বিপর্য্যয়বৃত্তিঃ, নিদ্রাবৃত্তিঃ, স্মৃতিবৃত্তিশ্চ। এতাঃ পঞ্চবৃত্তয়ঃ। তাসাং লক্ষণান্যত্র বক্ষ্যন্তে।

অনুবাদ।—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি।

সমালোচন,। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি এই পাঁচ প্রকার বৃত্তির বিষয় যথাক্রমে বিশদরূপে পরে আলোচিত হইবে। এই নিমিত্ত এস্থলে আর বিশেষ রূপে আলোচিত হইল না। তবে এইমাত্র বলা যাইতেছে যে, যেসকল বৃত্তির উদয় হওয়াতে চিত্ত বস্তুস্বরূপ ঠিক ঠিক জানিতে পারে, ঐ সকল বৃত্তির নাম প্রমাণ। যে বৃত্তি বশত বস্তুকে বিপরীত ভাবে জ্ঞান করা হয়, তাহার নাম বিপর্য্যয়। শব্দ আছে অথচ তাহার অভিধেয় বস্তু নাই, যে বৃত্তি বশতঃ ঐরূপ শব্দের বোধ হয়, তাহার নাম বিকল্প। নিদ্রা কি তাহা বোধ হয় বাঙ্গালী পাঠকদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। কারণ বাঙ্গালীর আর কোন বৃত্তি থাকুক বা না থাকুক নিদ্রাটি বিলক্ষণরূপ আছে। পূর্ব্বানুভূত বস্তুর মানসিক প্রত্যক্ষের নাম স্মৃতি।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

পদচ্ছেদঃ।—প্রত্যক্ষ—অনুমান—আগমাঃ প্রমাণানি।

পদার্থঃ—ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবস্তূপরাগাৎ চিত্তস্য তদ্বিষয়া সামান্য বিশেষাত্মনোঽবধারণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষম্, পক্ষে গৃহীত সম্বন্ধ হেতু দর্শনেন সাধ্যস্য সাধনাত্মনা নির্দ্ধারণমনুমানম্। আগমশ্চাপ্তবচনম্। আপ্তশ্চ

যথার্থবক্তা। প্রমা অবিসংবাদি জ্ঞানং, অনধিগততত্ত্ববোধো বা। তৎ-করণং প্রমাণম্।

অন্বয়ঃ।—উদ্দেশ্য বিধেয় স্থলে লিঙ্গ বচনস্যাতন্ত্রতেতি ন্যায়াদত্রভিন্ন লিঙ্গতা নদোষমাবহতি। প্রত্যক্ষং অনুমানং, আগমঃ এতানি ত্রীণি প্রমাণানীতার্থঃ।

ভাবার্থঃ।—এতানি ত্রীণ্যেব প্রমাণানি, এতদতিরিক্তানাং পরোক্তানাং প্রমাণানামেতেষ্বেবান্তর্ভাবঃ, তথাহ্যুপমানার্থাপত্ত্যোরনুমানেঽন্তর্ভাবঃ, অভাবস্য প্রত্যক্ষে, সম্ভবস্য চাপ্তবচনে। ঐতিহ্যস্য প্রামাণ্যমেবনাস্তি।

অনুবাদ।—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম এই তিনটি মাত্র প্রমাণ যথার্থ জ্ঞানের হেতু অথবা অজ্ঞাত পদার্থের স্বরূপ বোধক।

প্রমাণ শব্দের বুৎপত্তিলব্ধ অর্থ প্রমার করণ, অর্থাৎ যাহাদ্বারা প্রমার উৎপত্তি হয়; কাযেই প্রমার অর্থ না জানিলে প্রমাণ শব্দের অর্থ ঠিক্ ঠিক জানিতে পারা যায় না। তবেই জিজ্ঞাসা হইল, প্রমা কি?

আমাদের সাধারণতঃ দুই প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, প্রমা এবং ভ্রম। প্রমা শব্দে যথার্থ জ্ঞান,যাহা যেরূপ ঠিক সেই সেই রূপে তাহার জ্ঞান; ভ্রম ঠিক ইহার বিপরীত, যাহা যেরূপ নয়, তাহাকে সেই রূপে জ্ঞান; গাছকে গাছ, কলসীকে কলসী বলিয়া, জানার নাম প্রমা; দড়ীকে সাপ, ঝিনুককে রূপা বলিয়া জানার নাম ভ্রম।

যে সকল বৃত্তিদ্বারা মনে এই প্রমা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, উহাদিগকে প্রমাণ বলে। মহর্ষি পতঞ্জলি ঐ বৃত্তি গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান এবং (৩) আগম।

প্রত্যক্ষ কি? এই প্রশ্নের মোটামুটি একটা উত্তর দিতে হইলে ইহা বলিলেই হয় যে, ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজন্য চিত্তের বাহ্য বস্তুরূপে পরিণাম। আর একটু বিশদ করিতে চেষ্টা করা যাউক। চিত্তের বহিঃসঞ্চরণের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গুলি যেন প্রণালী বা পুলের মত; যেরূপ গৃহাভ্যন্তরে প্রজ্বলিত প্রদীপের শিখা গবাক্ষ বা দ্বার দ্বারা বহির্গত হইয়া বহিঃস্থ পদার্থে পতিত হয়, তাহাকে উজ্জ্বল করে ও তাহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অন্তর্বর্ত্তী অন্তঃকরণও ইন্দ্রিয় রূপ প্রণালী দ্বারা বাহ্য বস্তুতে নিপতিত হইয়া তাহার

আকার প্রাপ্ত হয়, তাহার সহিত একাকার হয়। চিত্তের এইরূপ পরিণাম বা বৃত্তিকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। এই প্রত্যক্ষ বৃত্তি আমাদিগের প্রমাণ অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপবোধের প্রতি কারণ। এই নিমিত্ত উহা প্রমা। দেখ উক্তরূপে বাহ্যবস্তুর সহিত ঐক্য ভাব প্রাপ্ত অন্তঃকরণ আমার চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া চৈতন্যে বাহ্য বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের উৎপত্তি করে। 'আমি অমুক বস্তু জানিতেছি' চৈতন্যের এইরূপ বোধ হয়। আমি ইহার অর্থ আমার চৈতন্য অমুক বস্তুর অমুক বস্তু জানিতেছে, সহিত ঐক্য ভাব ধারণ করিয়াছে। এইরূপে বাহ্য বস্তুর সহিত ঐক্য ভাব ধারণ করিলেও চৈতন্যের অপরিণামি স্বভাবের যে কিছু ব্যত্যয় হয় না, ইহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সাংখ্য শাস্ত্রে বুদ্ধির বাহ্য বস্তু আকারে পরিণামকেও প্রমা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে দুইটি প্রমা, একটি বুদ্ধিবৃত্তিরূপ, অপরটি আত্মার বোধ রূপ। ইহাদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিরূপ প্রমার প্রতি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নিচয়, এবং আত্মবোধ রূপ প্রমার প্রতি স্বয়ং বুদ্ধিবৃত্তিই কারণ। আত্মবোধ রূপ প্রমাটি মুখ্য বা চরম ফল।

আমরা এতক্ষণ চিত্তের বাহ্য বস্তুর আকারে পরিণাম সম্বন্ধে বলিয়া আসিলাম, তাহা বলিয়া যেন কেহ এইরূপ বিবেচনা না করেন যে, প্রত্যক্ষের বিষয় কেবল বাহ্য বস্তু। প্রত্যক্ষ বৃত্তিটি ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আমরা 'বাহ্যবস্তু' এই শব্দটির বারম্বার ব্যবহার করিয়াছি। বস্তুত বস্তু মাত্রেই প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। আত্মারও প্রত্যক্ষ হয়, ঈশ্বরেরও প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু ঐ সকল প্রত্যক্ষের প্রতি একমাত্র অন্তঃকরণই কারণতা। আমরা এই প্রত্যক্ষ বৃত্তিকে ভাল রূপে বুঝাইবার জন্য নীচে কতকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত বচনের উদ্ধার করিলাম।

'প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেবচ।
প্রমার্থাকার বৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥
প্রতিবিম্বিত বৃত্তীনাং বিষয়োমেয় উচ্যতে।
বৃত্তয়ঃ সাক্ষিভাস্যাঃ স্যুঃ করণস্যানপেক্ষণাৎ॥
সাক্ষাদ্দর্শন রূপঞ্চ সাক্ষিত্বং সাংখ্য সূত্রিতম্।
অবিকারেণ দ্রষ্টৃত্বং সাক্ষিত্বঞ্চাপরে জগুঃ॥

শুদ্ধ (অবিকারী) চৈতন্য আত্মাই প্রমাতা (প্রমাজ্ঞান বিশিষ্ট)। চিত্তের বস্তু স্বরূপে পরিণামরূপ বৃত্তি নিচয়ের চৈতন্যে পতিত প্রতিবিম্বের নাম প্রমা। চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত বৃত্তির বিষয়, অর্থাৎ মূল বস্তুই প্রমেয়, আমাদের জ্ঞেয়। বৃত্তিসকল চৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। সাংখ্য মতে চৈতন্য স্বয়ং যখন দৃশ্যের সহিত ঐক্য ভাব ধারণ করে, তখন উহাকে সাক্ষী বলা হয়। অন্যমতে চৈতন্য যখন কোন রূপ বিকার প্রাপ্ত না হইয়া বস্তু সকল দর্শন করেন, তখন তিনি সাক্ষী।

অনুমান—আর একটি অন্তঃকরণের বৃত্তি, দ্বিতীয় প্রমাণ। ইহাও প্রমা বা বস্তুর স্বরূপ বোধের প্রতি কারণ। কিন্তু সে প্রমা পূর্ব্বোক্ত প্রমা হইতে অন্যরূপ। ইহাতে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের আবশ্যকতা আছে বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ কারণতা নাই। ইহাদ্বারা পূর্ব্বে পরস্পর নিত্যসম্বন্ধ রূপে বিদিত বস্তু দ্বয়ের মধ্যে একটিকে প্রত্যক্ষ করিয়া অপরটির সত্তা অবধারণ করা হয়। নিত্যসম্বদ্ধ শব্দের অর্থ নিত্যসম্বন্ধ যুক্ত। এখানে নিত্যশব্দে যাহার কখন নাশ নাই এরূপ বিবেচনা করিবেন না, কিন্তু যাবদ্দ্রব্য ভাবি, অর্থাৎ যতক্ষণ দ্রব্য থাকে ততক্ষণ যাহা স্থিতি করে। যেমন অগ্নি এবং ধূম ইহারা নিত্যসম্বদ্ধ, ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ উভয়ের স্থিতি কাল অবধি। অগ্নির সৃষ্টির প্রথম হইতে ধূমের সহিত উহার সম্বন্ধ হইয়াছে, এবং যতকাল অগ্নি থাকিবে ততকাল ধূম থাকিবে। যদি পূর্ব্বে আমরা ইহা জানিয়া থাকি যে, ধূম অগ্নির সহিত নিত্যসম্বদ্ধ, যেখানে অগ্নি সেই খানেই ধূম,—যেখানে অগ্নি নাই সেখানে ধূমও নাই, তবে কোন একস্থলে, রসুই ঘরে, গোয়াল ঘরে, জ্বালামুখী পর্ব্বতে, অথবা পাটের কলে, দূর হইতে ধোঁয়া উড়িতে দেখিবাই অন্তঃকরণে একটি বৃত্তি বা পরিণামের উদয় হয় যাহা দ্বারা 'ঐ স্থানে অবশ্য অগ্নি আছে' এইরূপ বোধ হয়, দূর হইতে ধূম দেখিয়া অগ্নির সত্তা নির্দ্ধারিত হয়। এস্থলে আমরা দুইটি জ্ঞান দেখিতে পাই, এক ধূমের জ্ঞান, উহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, কারণ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সন্নিকর্ষ জন্য, দ্বিতীয় অগ্নির জ্ঞান, উহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, যেহেতু অগ্নির সহিত কোন ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, অথচ অন্তঃকরণে উহার সত্তা প্রতিভাত হইতেছে, সুতরাং উহার বোধের নিমিত্ত প্রত্যক্ষ হইতে

একটি অতিরিক্ত বৃত্তি কল্পনা করিতে হইবে, সেই অতিরিক্ত বৃত্তির নামই অনুমান। অনুমান শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ, প্রত্যক্ষের পর, যে বৃত্তি দ্বারা বস্তু স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। জগতের যাবতীয় বস্তুই পরস্পর কোন না কোন রূপে সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্বন্ধও নানা প্রকার, কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ, আধার আধেয় সম্বন্ধ, বাচ্য বাচক সম্বন্ধ, ইত্যাদি অসংখ্য সম্বন্ধ সুতরাং বস্তু নিচয়ের পরস্পরের মধ্যে কোন না কোন একটি সম্বন্ধ অবশ্যই বিদ্যমান আছে। সেই সম্বন্ধ নির্ণয়ই অনুমানের মূল সূত্র। যাঁহার সম্বন্ধ জ্ঞান আছে, তিনিই অনুমানে নিপুণ, এবং তাঁহার অনুমান কখনই ব্যভিচারী হয় না। এই সম্বন্ধ জ্ঞানকে নৈয়ায়িকেরা ব্যাপ্তিজ্ঞান বলেন। যিনি ব্যাপ্তি স্থির করিতে অক্ষম, তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রে অধিকার নাই। যদি আমরা জানি, কার্য্য এবং কারণ পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ, কারণ ভিন্ন কার্য্য কখনই উৎপন্ন হয় না, এবং কারণ থাকিলেই কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, কার্য্য কারণের আমরা যখন কেবলমাত্র কার্য্য দেখি, তখন আমাদের অন্তঃকরণে অনুমান বৃত্তির উদয় হয়, যাহাদ্বারা আমরা কারণের সত্তাও নির্দ্ধারিত করি। যদি আমরা জানিতে পারি যে, মেঘ কারণ বৃষ্টি কার্য্য, তাহা হইলে আমরা বৃষ্টিজলের প্রবাহ দেখিয়া অনুমান দ্বারা মেঘের পূর্ব্বসত্তা স্থির করিতে পারি। এইরূপ। জগৎ রচনারূপ কার্য্য দেখিয়া অনুমান দ্বারা উহার কারণ পরমেশ্বরের সত্তা নির্দ্ধারিত হয়।

মিসর।

পুরাকালে মিসরের কিরূপ অবস্থা ছিল এবং তৎপরে কিরূপ ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া এখন মিসরের দারুণ দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

যৎকালে ইউরোপ ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, কেবলমাত্র অসভ্য ও বন্য জাতিদিগের এবং হিংস্র জীবজন্তুগণের আবাসস্থান ছিল, তৎকালে মিশর একটি সবল পরাক্রান্ত সমৃদ্ধিশালী সুসভ্য বহুবিস্তৃত রাজ্য। যীশুখ্রীষ্টের

জন্মের নয় শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেশে ফেরো নামে অভিহিত প্রাচীন রাজা-দিগের কীর্ত্তিস্তম্ভের চিহ্ন স্বরূপ বৃহৎ বৃহৎ পিরামিড্ নির্ম্মিত হয়। এই দেশে পূর্ব্বকালের লোকেরা ক্ষেত্রবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, শিল্পশাস্ত্র জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি নানা শাস্ত্র ও বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিল।

মিসর হইতে গ্রীক ও রোমিয়েরা এককালে বিস্তর জ্ঞান শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। কালক্রমে এই দেশ প্রথমে দিগ্বিজয়ী আলেগজাণ্ডার কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া গ্রীকদিগের অধীন হয় এবং টলেমি নামধেয় রাজাদিগের দ্বারা শাসিত হইতে থাকে। টলেমিদিগের শাসন কালে মিসর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলীর বাসস্থান এবং সভ্যতার কেন্দ্র স্থল বলিয়া জগতে পরিগণিত ছিল। তৎপরে ভুবন বিখ্যাত রাণী ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর পর এই রাজ্য রোম সাম্রাজ্যের অধীন হয়। অবশেষে রোম সাম্রাজ্যের পতন হইলে এই দেশ উত্তর আফ্রিকাস্থ অন্যান্য দেশ সকলের সহিত [illegible] স্থাপিত তুর্কীর সুলতান কালিফদিগের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হইল, মিসরে মহম্মদ আলী নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তুর্কী কর্ত্তৃক শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হন। এই ব্যক্তি অতি বিচক্ষণ দূরদর্শী, ও রাজনীতিজ্ঞ। ইনি তুর্কীর অধীনতা হইতে মিসরকে মুক্ত করিতে সবিশেষ যত্নবান হন। ইনি অতি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, তুর্কীর আধিপত্য মিসরের পক্ষে বহু অমঙ্গলের কারণ ও অপায়ের বীজ স্বরূপ। ইনি অবশেষে তরবারির দ্বারা মিশর ও তুর্কীর পরস্পর সম্বন্ধ ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন এবং স্বীয় পুত্র ইব্রাহিমকে সসৈন্যে তুর্কীর সহিত যুদ্ধ যাত্রায় প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধ বিশারদ ইব্রাহিম নানা দেশ জয় করিয়া স্তাম্বুলের ৫০ ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইলেন। কনষ্টাণ্টিনোপোলের সুলতান আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজার নিকট মিশরশাসনকর্ত্তার এইরূপ শত্রুতাচরণের কথা কহিলেন। ইউরোপীয় রাজন্য হস্তক্ষেপ করেন বলিয়াই মহম্মদ আলী যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন এবং তদীয় অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ই ফেব্রুয়ারি মহম্মদ আলী সুলতানের নিকট হইতে এক অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হন। তদ্দ্বারা তিনি মিশরের রাজপ্রতিনিধি হন

মিশরে তুর্কীর রাজপ্রতিনিধিবংশ সংস্থাপনের আদিপুরুষ এই মহম্মদ আলী। মহম্মদ আলী জীবদ্দশায় সুলতান কালিফকে বাৎসরিক কর ৩,২৫,০০০ পাউণ্ড প্রদান করিতেন।

মহম্মদ আলীর মৃত্যুর পর আব্বাস ও সায়েদের শাসনকালে তুর্কী মিসরে পূর্ব্ববৎ আধিপত্য স্থাপনের নিমিত্ত পুনরায় চেষ্টা করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আলীর পৌত্র ইস্মায়েল পাশা মিসরের রাজপ্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত হন। পিতামহের ন্যায় ইস্মায়েল প্রথম হইতেই তুর্কীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রয়াস পান। কিন্তু ইস্মায়েল নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করেন। এই সময়ে তুর্কী সাম্রাজ্যের কালিফদিগের নিকট যদি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কোন সম্মানসূচক পদ বা ক্ষমতা পাইতে অভিলাষ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সুলতানের কার্পেট চুম্বন করিতে হইত। খেয়ার উদ্দিন পাশা নামে টিউনিস নগরের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই পথ অবলম্বন করিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের উজীর বা প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। অতি ব্যয় সাধ্য ও অপমানজনক হইলেও ইস্মায়েল এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন স্বকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত ব্যয় করিতে ইস্মায়েল কখনই কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। সুলতান কালিফদিগকে অর্থ ও বহুবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া ইস্মায়েল তাঁহাদের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তিনি অনেক গুলি সনন্দলাভ করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৭ এ মে তারিখ হইতে মিসরের রাজকার্য্য স্বাধীন ভাবে সম্পাদন করিবার ক্ষমতা পান। তাঁহার বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুষানুক্রমে উত্তর কালে প্রতিনিধি পদাভিষিক্ত হইবে, এই মর্ম্মে তিনি একটি সনন্দ পান। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে যে সনন্দ পান তাহাতে তিনি খিদিব (১) উপাধি পান এবং বাণিজ্যের নিমিত্ত সন্ধি স্থাপন ও ভূম্যাদি সম্প্রদানের ক্ষমতা পান।

(১) বোধ হয় এস্থলে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, তুর্কীর সুলতান পোর্টি নামে অভিহিত হন। মিসরের প্রতিনিধি খিদিব নামে অভিহিত হন; মিশরের ও তুর্কী সাম্রাজ্যের কোন কোন স্থলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ পাশা নামে অভিহিত হন এবং মিসরের নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণকে ফেলা ও মিসরনিবাসী খৃষ্টানদিগকে কপ্‌টস্‌ বলা হয়।

ইস্মায়েল মিসরের বাৎসরিক কর ৭,৫০,০০০ তুরস্ক পাউণ্ডে পরিবর্দ্ধিত করেন, তিনি অপক্ষপাতী ও সুবিচারক ছিলেন। প্রজাগণকে সমভাবে পালন করিতেন ও সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। বিধর্ম্মী বলিয়া তিনি কখন কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতেন না। তিনি গুণবানকে উচিত মত পুরস্কার করিতেন। তচ্ছাসনকালে অনেক বিদেশীয় ব্যক্তি মিসরের বহুবিধ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়। ইহারাই ধনশালী ও ক্ষমতাশালী হইয়া পরে মিসরের কালস্বরূপ হইয়া উঠে।

ইস্মায়েলের শাসনকালে মিসর দেশে যেরূপ উন্নতি হয়,বোধ হয়,টলেমি-দিগের রাজত্বের পর আর কোন সময় সেরূপ হয় নাই। ইস্মায়েল আলেক-জাণ্ড্রিয়া ও অপর অপর নানা স্থানে নানা বন্দর নির্ম্মাণ করেন। তিনি বাষ্পীয় শকট গমনাগমনের নিমিত্ত মিসরের চতুর্দ্দিকে রেলপথ প্রস্তুত করেন, মিসরের প্রধান প্রধান নগরে তাড়িতবার্ত্তাবহ সংস্থাপন করেন ও স্থানে স্থানে বৃহৎসেতু নির্ম্মাণ ও দীর্ঘিকা খনন করেন। ইস্মায়েল সুয়েজ-প্রণালী উদ্‌ঘাটিত করিয়া পৃথিবীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি মিসরে নানা প্রকার নূতন ব্যবসা ও বাণি-জ্যের সৃষ্টি করেন এবং সর্ব্বদাই বিদ্যাশিক্ষা ও সভ্যতার সকল প্রকার উন্নতির চেষ্টা করিতেন। তিনি মিসরে জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির প্রথম সূত্রপাত করেন। মধ্য আফ্রিকার ক্রীতদাস ব্যবসার উন্মূলন করিবার নিমিত্ত ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা এপ্রেল তারিখে এক দল সৈন্য তথায় প্রেরণ করেন। ইংলণ্ড হইতে উত্তম ও বহুমূল্য জলযান ও তরি সকল এই নিমিত্ত আনয়ন করেন। তাঁহার সৈন্য নীলনদী দিয়া নিউবিয়া অতিক্রম করিয়া খার্ত্তুম পর্য্যন্ত যাত্রা করে। সার্ সামুয়েল হোয়াইট্ বেকার ইস্মায়েলের নিকট হইতে পাশা উপাধি গ্রহণ করেন ও এই যুদ্ধ-যাত্রার সৈন্যদলের অধ্যক্ষ হন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইস্মায়েল ব্যয়কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি ইউরোপীয় সভ্যতা অনুকরণ করিতে গিয়া ব্যয় করিবার নিমিত্ত ঋণ করিতে থাকেন, দুর্ভাগ্য বশত বিদেশীয় গণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণে তৎপর হইলেন এবং তাহাদিগকে অতিরিক্ত সুদ দিতেও সম্মত হইলেন।

এমন কি, সময়ে সময়ে বাৎসরিক সুদের মাত্রা বৎসর কাল মধ্যে আসলও অতিক্রম করিল। এই ঋণ গ্রহণে ইস্মায়েলের মূর্খতা ও অবিমৃষ্যকারিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছি, এই ঋণই তাঁহার সকল যত্ন বিফল ও শ্রম পণ্ড করিয়াছে। এই ঋণই তাঁহার রাজচ্যুতির কারণ এবং মিসরে মহা অনর্থ ও বিপ্লবের নিদান। বাস্তবিক ঐ ঋণ গ্রহণকালাবধি মিসর আর পূর্ব্বের ন্যায় সুশাসিত হয় নাই। উত্তমর্ণেরা সুদ না পাইলে ভুলিবার পাত্র নহে। তাহারা যেরূপ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, ইস্মায়েল কোন মতেই তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেন না, অগত্যা ইস্মায়েল দুর্ভাগা ফেলাগণকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের নিকট হইতে ভবিষ্যতের রাজস্ব অগ্রিম আদায় করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না।

ইস্মায়েল নানা ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে মিসরের ভূম্যধিকারীগণকে সমবেত করিয়া (১৮৭৬। ৭৭) ১২ বৎসরের নিমিত্ত মোকাবিলা নামে একটি বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ৫০ টাকা অধিক বৃদ্ধি করিলেন এবং দ্রব্যের মাসুল পূর্ব্বাপেক্ষা অর্দ্ধ পরিমাণে হ্রাস করিলেন। ঐ বার বৎসর অতীত হইলে একটি চিরস্থায়ী নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব স্থির করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। প্রজারাও এইরূপ মুগ্ধকরী আশায় প্রতারিত হইয়া অতিরিক্ত সুদে ঋণ গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করিতে না পারায় তাহাদের সকল কর্ম্মই বন্ধ হইলেও তাহাদের ঐরূপ শোচনীয় অবস্থার প্রতি কেহই কটাক্ষপাত করিল না।

ঋণ পরিশোধ না হওয়ায় চতুর উত্তমর্ণেরা ইউরোপীয় রাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করিল। লর্ড বীকন্সফিল্ড এই সময়ে ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী। তিনি অবিলম্বে ফ্রান্সের সহিত মিলিত হইয়া মিসরের রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ১৮৭৬ অব্দের আগষ্ট মাসে ইস্মায়েল এক পক্ষে এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনীতিজ্ঞ গোসেন ও জুবেয়ার অপর পক্ষে থাকিয়া একটি বন্দোবস্ত করিলেন। খিদিবের জ্যেষ্ঠ পুত্র টিউফিককেও ইহাতে লিপ্ত হইতে হয়। খিদিবের নিজ অধীনে কতকগুলি ডেরা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত মিশরের স্থাবরসম্পত্তি গুলির নাম) ছিল। গোসেন ও জুবেয়ার উক্ত ডেরা গুলি ইস্মায়েলের নিকট হইতে ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত এক বন্ধক নামা

করিয়া লন। এক্ষণে ঐ ডেরা গুলি ইউরোপীয় তত্ত্বাবধানে আছে। সেই গুলিতে অনেক কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে, ইক্ষুর চাস ও চিনি প্রস্তুত হইতেছে।

মিসরের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়াও উত্তমর্ণগণ ক্ষান্ত হইল না। তাহাদের পরামর্শে চৌদ্দটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধি মিলিত হইয়া মিসরে এক নূতন প্রণালীর বিচারালয় সৃষ্টি করিতে অনুমোদন করেন। ঐ বিচারালয়ে ভিন্ন জাতি সংক্রান্ত কেবল দেওয়ানী মকদ্দমার বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইল। বিচারকর্ত্তাগণও ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে নির্ব্বাচিত হইল, খিদিব হইতে অতি সামান্য মিসরবাসী এবং ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ, রুষ, ও ইতালীয় প্রভৃতি সকলেই উক্ত বিচারালয়ের অধীন হইল।

এইরূপে মিসরে বিদেশীয় গণের বিশেষ প্রতিপত্তি হইতে লাগিল বিদেশীয়গণ ফৌজদারীর নিমিত্ত কোন বিচারালয়ে অধীন নহে, তাহারা করদান হইতে মুক্ত। এদিকে মিসরবাসিগণ কর দিতে মহা কাতর। যে, নূতন দেওয়ানী বিচারালয় গুলি সংস্থাপিত হইল, সেগুলিও মিসরের প্রান্তভাগে ও মিসরবাসিগণের পক্ষে দূরবর্ত্তী। তথায় গমন করিবার পথ খরচ করাও তাহাদের পক্ষে সহজ নহে। মিসরের ভাষাও উক্ত বিচারালয়ে চলিত নহে।

অল্পকাল মধ্যে মিসরের রাজনীতির রূপান্তর হইল। যে খিদিব সকলের শাসনকর্ত্তা তিনি অন্যান্য জাতির নিকট এক প্রকার অধীন। তাঁহার অধিকাংশ কর্ম্মই বৈদেশিক গণের মতসাপেক্ষ। দেখিতে দেখিতে খিদিবের নামেও নানা অভিযোগ হইতে লাগিল। তাঁহার নামে ডিক্রী ও তাঁহার সম্পত্তি সকল ক্রোক হইতে লাগিল। তাঁহাকে আর ঋণ দিতে কেহই স্বীকৃত নহে। তথাচ তিনি ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা ও নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

কথায় বলে "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" খিদিবের কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, উত্তমর্ণগণ তাঁহাকে অধিকতর রূপে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিল। এত অত্যাচার খিদিব আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় মন্ত্রী নিউবর পাশা ও উইলসন প্রমুখ বিদেশীয় মন্ত্রীবর্গকে কর্ম্ম হইতে চ্যুত করিলেন, এবং উক্ত বিজাতীয় আদালত গুলির ডিক্রীজারী এককালীন বন্ধ করিয়া দিলেন।

এস্থলে নিউবর পাশা সম্বন্ধে সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অপ্রা সঙ্গিক হইবে না। এই ব্যক্তি একজন আর্মানী খৃষ্টান। ইনি চতুর, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্। সামান্য কেরাণীগিরি হইতে মিসরের উচ্চপদ ও বহু ধনসম্পত্তি লাভ করেন। ইনি রাজকর্ম্মে সুদক্ষ এবং ইউরোপীয়দিগের পরম বন্ধু।

ইস্মায়েল পাশার এইরূপ অচরণে ইউরোপীয় রাজগণের অপমান বোধ হইল। বিশেষত অপমান শূল ফরাসী ও ইংরাজ জাতির হৃদয় বিদ্ধ করিল। কোন প্রকারে প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত তাহারা খিদিবের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইল। অবশেষে তুর্কীর সুলতান আবদুল হামিদ ফ্রান্স ও ইংলণ্ড কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ইস্মায়েলকে পদচ্যুত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। সুলতান ইস্মায়েল দত্ত উপঢৌকনগুলি ও ইস্মায়েলের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইলেন।

১৮৭৯ অব্দের জুন মাসে কনষ্টান্টিনোপল হইতে তারযোগে সংবাদ আসিল যে, অতঃপর ইস্মায়েল পাশা খিদিব পদচ্যুত ও তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র টিউ- ফিক খিদিব পদাভিষিক্ত হইলেন। ইস্মায়েল ১৭ বৎসর মিশর শাসন করেন। তাঁহার ঋণই সকল অনর্থের মূল। তিনি যে জাতীয় সম্প্রদায়, পার্লিয়ামেণ্ট ও সেনাদল সৃষ্টি করেন, তাহাতে তাঁহার নাম মিশরে চিরস্থায়ী হইবে।

যৎকালে টিউফিক পাশা খিদিব পদে অভিষিক্ত হন, তখন তাঁহার বয়ঃ- ক্রম অধিক নহে। যুবক টিউফিকের বিষয় কর্ম্মে বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই। কোন বিশেষ ক্ষমতা বা গুণও ছিল না। তুর্কীর সুলতান এক্ষণে সুযোগ পাইয়া পূর্ব্বে ইস্মায়েলকে যে সকল ক্ষমতা দিয়াছিলেন, তাহা অনা- য়াসেই টিউফিকের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন। টিউফিক কলের পুত্তলি- কার ন্যায় ফ্রান্স ও ইংলণ্ড কর্ত্তৃক চালিত হইতে লাগিলেন। বিদেশীয় শাসন মিশর পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইল। উত্তমর্ণদিগের ঋণ প্রতিশোধের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল; কিন্তু রাজকোষ অর্থ শূন্য; এই নিমিত্ত অনেক রাজকর্ম্ম- চারীরও বেতন বাকি পড়িল, তদ্বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত হইল না।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মিসর শাসনে হস্তক্ষেপ করিবার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য দুইটি—প্রথম—সমগ্র মিসরে সুশাসন ও শান্তিস্থাপন; দ্বিতীয়—ঋণ পরি- শোধের সুবন্দোবস্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অদ্যাবধি দুইটির একটিও

সুসিদ্ধ হইল না। ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত নামক একটি আইন ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পরামর্শে টিউফিক মিসরে প্রচারিত করেন। তাহাতে ঋণের সুদ শতকরা ৪ টাকা ধার্য্য হইল এবং ইস্মায়েলের ঋণের নিমিত্ত উত্তমর্ণগণকে মিসরবাসিগণের ৬০০০০০০ পাউণ্ড দিতে হইবে ধার্য্য হইল। ইহাতে পাঁচটি প্রধান ইউরোপীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করেন। চারিবৎসর কাল অতীত হইলে হিসাব হয়। ১৮৮১ হইতে ১৮৮৪ পর্য্যন্ত এই আইনানুসারে যে কার্য্য হয়, তাহার মাসিক ও বাৎসরিক কোন হিসাব হয় নাই। এক্ষণে চারি বৎসর পরে প্রকাশ হয় যে, আদায়ের টাকা হইতে ৮০০১০০০ টাকা ঘাটিয়াছে। মিসর-বাসিগণের দুঃখের আর সীমা রহিল না। মিসরের এইরূপ শাসন কার্য্য প্রতিরোধের নিমিত্ত মিসরবাসিগণ সবিশেষ সচেষ্ট হইল।

এই সময় আর্‌বি পাশার আবির্ভাব হয়। স্বদেশানুরাগ তাঁহার অন্তঃ-করণ বিদ্ধ করিল। মিসরের দুঃখ দূরীকরণ ব্রতে তিনি ব্রতী হইলেন। দেশোন্নতি ও স্বদেশের মঙ্গল সাধনার্থে তিনি মিসরবাসিগণকে দেশভক্তি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। খিদিবের ব্যবহার ও বিদেশীয় দিগের অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব উল্লেখ করিয়া তিনি মিসরবাসি গণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং মিসরের কুশাসন নিবারণে বদ্ধ পরিকর হইলেন। আর্‌বি পাশা উদার প্রকৃতি, অকপট ও সত্যবাদী ছিলেন। তাঁহার গুণে ও ব্যবহারে মিসরবাসি সকলেই মুগ্ধ হইল। অল্পকাল মধ্যে আর্‌বিকে মিসরবাসিগণ জাতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান মন্ত্রী ও অধ্যক্ষ করিল। আর্‌বিও অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, তাঁহার পক্ষে সকলেই সমান। তিনি পরোপকারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার লোভ ছিল না। উপঢৌকন স্বরূপে তাঁহাকে কেহ অর্থদান করিতে সাহস করিত না। তাঁহার সাধুতা, ন্যায়পরতা, ও সুবিচারের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এক সময়ে আর্‌বী বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া কোন স্ত্রীলোকের নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করেন। স্ত্রীলোকটি আনন্দসাগরে মগ্ন ও বিস্মিত হইয়া আর্‌বিকে ১০ একর ভূমি দান করে। আর্‌বি ঐ দান লইতে অস্বীকার করিয়া তাহাকে এই

বলিয়া উত্তর দিলেন যে, তিনি তাহার ধন্যবাদকেই যথেষ্ট পুরস্কার মনে করেন।

মিসরের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সমবেত করিয়া আরাবি পরামর্শ করিলেন, যে মিশরের রাজস্বের যে অংশের সহিত উত্তমর্ণগণের কোন সংস্রব নাই, তাহাতে বিদেশীয়গণ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। ইহাতে বিদেশীয়গণ অসন্তুষ্ট হইয়া টিউফিক্‌কে আরাবির কথায় কর্ণপাত করিতে নিবারণ করে। মিসরবাসিগণ আরাবির কথায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইল এবং টিউফিকের উপর তাহাদের আর কোনও বিশ্বাস রহিল না। যেরূপে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ইস্মায়েলকে রাজ্যচ্যুত করে, তদ্রূপ তাহারাও টিউফিককে পদচ্যুত করিতে উদ্যত হইল। সুতরাং মিসরে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল। এই বিপ্লব নিবারণে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড স্বীকৃত হইল। কিন্তু ফ্রান্স শীঘ্রই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইল। তুরস্ক হইতেও সেনাপতি আলি নিজামি পাশা, উজির আলি ফোয়াদরে, বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও দূত কাদ্রীরে এবং সুলতানের প্রিয়পাত্র আমেদ রাতির পাশা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মিসরে আগমন করেন। তাঁহারা খিদিবকে তুরস্কের অধীনতা স্বীকার করিতে এবং মিসরবাসিগণকে সুলতানের ক্ষমতাধীনে আনয়ন করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন।

আরাবি পাশা ১৮৮২ সালের প্রারম্ভে জাতীয় সম্প্রদায়ের যুদ্ধসচিব পদে নিযুক্ত এবং অল্পকাল মধ্যে প্রভূত ক্ষমতাশালী হইলেন; মিসরে তুরস্ক প্রাধান্য তিনি কোন মতেই স্বীকার করিলেন না। তিনি বলেন, মিসরে তুরস্ক সেনা আসিলে, তিনি ইংরাজ অপেক্ষা তাহাদিগের সহিত অধিকতর জিদের সহিত যুদ্ধ করিবেন। সুলতান কখন আরাবিকে খিদিবের প্রতি এবং কখন খিদিবকে আরাবির প্রতি বিপক্ষাচরণ করিতে পরামর্শ দেন; কিন্তু আরাবির স্বদেশানুরাগ পূর্ব্ববৎ প্রগাঢ় রহিল; তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অচল, অটল রহিলেন।

সুদানে এই সময়ে মহা গোলযোগ। তথায় মেহেদি নামে একজন জাল পয়গম্বর বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন পূর্ব্বক রণে মিসর সৈন্য পরাস্ত করেন এবং সুদান অধিকার করিয়া খার্ত্তুম নগর অধিকার করিতে ভয় দেখান। মিসরে আরাবির শাসন চলিতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে

খিদিবের রাজ্য নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। ইংলণ্ড আলেকজাণ্ড্রিয়া বন্দরে যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করেন এবং ১৮৮২ সালের ১১ই জুলাই আলেকজাণ্ড্রিয়া সহরটী তোপে উড়াইয়া দেন তাহাতে দুর্গটিও বিনষ্ট হয় এবং প্রায় দুই সহস্র মিসরবাসীর প্রাণনষ্ট হয়। আরবি বিপদ দেখিয়া নগরে আগুন লাগাইয়া দিলেন, বন্দীগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং অনুচরবর্গ লইয়া স্বয়ং অন্যত্র গমন করিলেন। খিদিব ...ণভয়ে এক বৃটিশ জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বোম্বাই হইতে একদল ভারতীয় সেনা এই সময়ে মিসরে প্রেরিত হয় ১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাষোলের নিকট একটি তুমুল যুদ্ধ হয়, তাহাতে অনেকগুলি বৃটিশ সৈন্য হত ও আহত হয় এবং আরবিরও বহুসংখ্যক সৈন্য নষ্ট হয়। পরিশেষে তেল্লেল্‌কবীরে একটি ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে আরবি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন।

তুরস্কের পোর্ট ইংলণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া এই সময় আরবি ও তাঁহার অনুচরবর্গকে বিদ্রোহী (?) নির্দেশ করিয়া এক ঘোষণা পত্র প্রচার করেন, সার্ গার্নেট উল্‌সলিও মিসরে ইংরাজ দগের অবাস্থিতির উদ্দেশ্য কেবল খিদিবের ক্ষমতা দৃঢ় রূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত এইরূপ একটি ঘোষণা পত্র মিসরে প্রচার করেন।

আরবি ধৃত হইলেন। কোর্টমার্শালে তাঁহার বিচার হইয়া তৎপ্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। কিন্তু খিদিব তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে চিরকাল মিসরের বহির্দ্দেশে এবং ইংরাজরাজ্য মধ্যে বাস করিতে হইবে, বলিয়া নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিলেন। খ্রীষ্টীয় ১৮৮৩ সালের ১০ই জানুয়ারি তারিখে মেরিওটিস নামক জাহাজ কর্ত্তৃক আরবি সিংহল দ্বীপে আনীত হন, তদবধি কলম্ব নগরে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

ইউরোপীয় প্রধান প্রধান সংবাদ পত্র মধ্যে এই সময়ে মিসর সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ইংলণ্ডকে মিশর স্বরাজ্য ভুক্ত করিতে যুক্তি দেন, কেহ ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত করিতে পরামর্শ দেন ইত্যাদি। কিন্তু ইংলণ্ড মিশর স্বরাজ্যভুক্ত করিবেন, কি ত্যাগ করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না।

মিসর স্বরাজ্য ...ক্ত করিলে প্রথমতঃ ইংলণ্ডের বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়

এবং সুরাজনীতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয় বিশেষত রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইলে জগতে মহাঅপযশ ঘোষিত হয়। দ্বিতীয়ত ইহাতে ইংলণ্ডের বিশেষ অর্থলাভও হইবে না। কারণ মিসর ঋণগ্রস্ত ও ইউরোপীয় সৈন্যের ভরণ-পোষণের ব্যয় মিসর হইতে সংগ্রহ করাও সহজ ব্যাপার নয়, তৃতীয়ত এরূপ করিলে কয়গন আর্ম্মিনিয়া আক্রমণ করিবে।

পুনশ্চ মিসর ত্যাগ করাও এ সময় ইংলণ্ডের পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয় নহে। ইংলণ্ড মিসরের সহিত একটি বিশেষ বন্ধনে আবদ্ধ আছেন, মিসরে বিদ্রোহ নিবারণ ও তথায় শান্তি স্থাপন এবং সুশাসন আনয়ন করিবেন বলিয়া ইংলণ্ড পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ফ্রান্স কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে মিসরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও উন্নতিবিধান সকলেই ইংলণ্ডের উপর নির্ভর করিতেছে।

লর্ড ডফরিণ এই সময়ে মিসরে শান্তি স্থাপন ও শাসনবিধি সংস্করণের নিমিত্ত প্রেরিত হন। তাঁহার আগমনে মিসরবাসী অনেকেই অনেক আশা করিয়াছিল। এক্ষণে আর আরবি হইতে কোন আশঙ্কা নাই, লর্ড ডফরিণ কতকগুলি শিক্ষা ও নীতি বিভাগ সৃষ্টি করিলেন। তিনি মিসরবাসিগণকে স্বদেশ শাসনের ক্ষমতা গ্রহণের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি একটি বিচার সভার প্রস্তাব করেন। তাহাতে ১৪টি অধ্যক্ষ থাকিবে, তন্মধ্যে খিদিব অর্দ্ধ সংখ্যা নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন এবং তৎসঙ্গে তিনি দ্বিতীয় একটি সভা সাধারণের মতানুমত প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব করেন, তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই প্রকাশ করেন যে, মিসরের শাসন শক্তি আর নাই খিদিব পক্ষের সৈন্য সংখ্যা অতি অল্প; এই নিমিত্ত নূতন সৈন্য সৃষ্টি করা আবশ্যক, দেশীয় আদালতের সুবিচার সম্বন্ধে ষ্টাণ্ডার্ড নামক কোন বিলাতী সংবাদ পত্রে প্রকাশ হয় যে, মধ্যে মধ্যে অনেক নির্দ্দোষীরও প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। অনেক রাজকর্ম্মচারী নির্দ্দোষীগণের প্রাণ লইয়া ব্যবসায় করিয়াও তাহাদের আত্মীয় স্বজনকে শোকান্বিত ও ক্ষিপ্ত প্রায় করে এবং আপনারা অল্পকাল মধ্যে বিপুল ধনশালী হয়।

এই সকল ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়া লর্ড ডফরিণ মিসরবাসিদিগের

অবস্থা উন্নতির নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, ঋণ পরিশোধ বন্দোবস্তটি মিসরের উন্নতি পথের কণ্টক স্বরূপ; দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও করভারে প্রপীড়িত মিসরবাসি অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছে অথচ বিদেশীয়গণ ধনশালী হইতেছে, সুতরাং মিসরবাসী ইংলণ্ডের প্রতি অসন্তুষ্ট।

লর্ড ডফরিণ ইংরাজদিগকে কর দিতে বাধ্য করেন। ইহা তাঁহার প্রশংসার কথা বটে। মন্ত্রীবর গ্লাডষ্টোন বলিয়াছেন যে, মিসর একবারে ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে খেদিবের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করা আবশ্যক এবং তন্নিমিত্ত মিসরবাসিগণের মনে ইংলণ্ডের প্রতি সদ্ভাব ও ভক্তিভাব উদ্রেক করা আবশ্যক, কিন্তু ঋণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যৎকালে ইস্মায়েল পাশা পদচ্যুত হন, তৎকালে যে ঋণ ১৪০০০০০ পাউণ্ড ছিল, লর্ড ডফরিণের রিপোর্টে ঐ ঋণ ৯০০০০০ পাউণ্ডে বৰ্দ্ধিত হয়। অতএব মিসরের কষ্ট কোনক্রমেই দূরীভূত হইল না।

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, দুঃখ একবার আগমন করিলে শীঘ্র যাইতে চাহে না এবং এক দুঃখ শেষ না হইতে হইতেই দ্বিতীয় একটি উপস্থিত হয়। মিসরে বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হইলে ঋণশোধের ও সুশাসনের উপায় স্থিরীকরণ হইতে লাগিল, এমন সময় সুযোগ পাইয়া বিসূচিকা মহামারী অকস্মাৎ মিশরে প্রবেশ করিল। এই রোগটী অবিলম্বে এক স্থান হইতে মিসরের নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইল। সৈন্যদলও এই রোগাক্রান্ত হইল। এই রোগ হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। অনেক গুলি বৃটিশ সৈন্যও শমন সদনে প্রেরিত হইল। মৃত্যু সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল দেখিয়া মিসরগণ ভয়ে আকুল হইল। তাহাদিগের কর্ম্মে মহা ব্যাঘাত উপস্থিত। ইংরাজ এই সময়ে মিসর ত্যাগ করিলে তথায় অরাজকতা উপস্থিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। যাহা হউক, বেকর পাশা এই সময়ে বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীগণের সেবা শুশ্রূষা স্বয়ং করিয়া এক মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। পূর্ব্বে যে মেহেদির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনিও এই সুযোগে সুদানে মিসরস্থ সৈন্য গুলিকে রণে পরাস্ত করেন। ১৯শে নবেম্বর সুদানে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ হেক্স পাশার পরাজয়বার্ত্তা মিসরমধ্যে উপস্থিত হয়।

কি প্রকারে ইংলণ্ড হেক্‌শ পাশার পরাজয়রূপ অপমান হইতে শীঘ্র উদ্ধার পাইবে ও সম্মানের সহিত মিসর ত্যাগ করিবে, এতদ্বিষয়ে নানা উপায় স্থির হইতে লাগিল। পরে জেনারেল গর্ডন ১৮ই জানুয়ারি কাইরো যাত্রা করিলেন।

মিসর রাজমন্ত্রীগণ রাজ্য বিস্তারের নিমিত্তই সুদান যুদ্ধে নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহাদের আশা ফলবতী হইল না। সুদানে হস্তক্ষেপ করা বাস্তবিক তাঁহাদের ঘোর বাতুলতার কর্ম্ম। সুদান একটি বৃহৎদেশ। ইহার মধ্যে অধিকাংশ স্থল শুষ্ক ও প্রায়ই মরুভূমি; তথায় আহার দ্রব্যাদি দুষ্প্রাপ্য; বিষম রৌদ্রে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়; কুত্রাপি একটি কূপ বা জলাশয়ও ও দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন ভূভাগ এইরূপ জলহীন, খাদ্য দ্রব্য বিহীন, ছায়াহীন ও নহে। তাহার উপর মেহেদিও তাহার প্রতিনিধি ওসমান্‌ডিগ্‌না যুদ্ধে কাতর নহেন। ১৮৮৪ সালে অনেকগুলি যুদ্ধ হইল। বোধহয় সুদানের বিষয় ও জেনারেল গর্ডনের পরিণাম অধুনা কাহারও অবিদিত নাই।

এইরূপ আর্‌বিকে নির্ব্বাসিত করিয়া মিসরের দুর্দ্দশা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইল। ফেলাগণ ক্রীতদাসাবস্থাপন্ন হইল এবং তন্মধ্যে অনেকে মেহেদির ও দলভুক্ত হইল। জাতীয় সম্প্রদায় ক্ষমতাশালী থাকিলে এরূপ কখনই হইত না। আর্‌বিকে আশাউন হইতে দামিয়াত্তা পর্য্যন্ত এখনও সকলে ভক্তি করে ও ভাল বাসে। মুসলমানদিগের কথা দূরে থাকুক, কপ্টস ও মিসর বাসী ইহুদী পর্য্যন্ত সকলে আরবি ও জাতীয় সম্প্রদায় হইতে বহু আশা করিয়াছিল, কিন্তু কালের অনতিক্রমনীয় শক্তি প্রভাবে এক্ষণে সে আশা-লতা নির্ম্মূলা হইল। ইহারা বলে, আর্‌বি থাকিলে, সুদানে এত গোলমাল হইত না।

ইউরোপীয়গণের আগমনে মিসরের সৌভাগ্য সূর্য্য কি প্রকারে অস্তমিত হইল, এই প্রস্তাবে তাহা বর্ণিত হইল। জাতীয় সম্প্রদায় হীনবল ও লুপ্তপ্রায় হওয়াতে মিসরের পুনরায় মস্তক উন্নত করিবার আর এক্ষণে ক্ষমতা নাই। রাজকোষ শূন্য হওয়াতে মিসর দেউলিয়া হইয়াছে। সভ্য ইউরোপ কর্ত্তৃক যে জাতীয় ঋণের সৃষ্টি হয়, তাহা পরিশোধ হইবারও আর এক্ষণে আশা

নই। যদিও, ইংলণ্ড স্বকীয় দায়িত্বের গুরুভার লাঘব কামনায় ইস্মায়েল পাশার পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধের উপায় স্থিরীকরণার্থে, ফ্রান্স, জর্ম্মনি, অষ্ট্রীয়া, রুষিয়া ও ইতালী প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান প্রধান ইয়োরোপীয় রাজ্যের পরামর্শ ও যুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তথাপি কেহই কোনরূপে তাঁহার কর্ম্পিত অথবা মিসরের কুটিল রাজনীতি মধ্যে হস্তক্ষেপ করেন না; মন্ত্রিবর গ্লাডষ্টোন্ ও লর্ড গ্রানিভিল বলিয়াছেন যে ১৮৮৮ সাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ড মিসরের তত্ত্বাবধান করিবে, তৎপরে অন্যান্য রাজগণের মত লইয়া মিসর একেবারে ত্যাগ করিবে। মিশরের ইংরাজ সেনাবর্গ সংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস করা হইতেছে। তথাপি এখন পর্য্যন্ত যে ইংরাজ সেনাদিগের অবস্থিতি আছে তাহা কেবল সুয়েজ প্রণালী দিয়া নিরাপদে জাহাজ গমনাগমন নিমিত্ত।

এস্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, চতুরচূড়ামণি রাজনীতিতে মন্ত্রিবর প্রিন্স বিসমার্কই মিসরের ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্তটি বিফল করিবার প্রধান কর্ত্তা। তদীয় জটিল ও কুটিল চক্রের দ্বারা ইংলণ্ডের পদে পদে ঘোর অবমাননা ও পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই মহাবিঘ্ন ঘটিয়াছে। আফ্রিকা প্রদেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে অন্যান্য জাতি সকল এই সময়ে নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপন ও স্ব স্ব রাজ্য বিস্তার করে। রুষগণ মধ্য আসিয়ায় এই সময়ে স্বরাজ্য বিস্তার করিবার অবসর পায়।

উপসংহারের কালে বক্তব্য এই যে অধুনা মিসরের যেরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা অতীব শোচনীয়। ইউরোপীয়গণের আগমনকালে মিসরের যেরূপ কষ্টের উৎপত্তি হয় তাহা অপ্রতিহতরূপে অদ্যাবধি পূর্ব্ববৎ বিরাজ করিতেছে। মিসরের শাসন কার্য্যে অধুনা এরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত, যে অনেকে টিউফিককে পদচ্যুত করিয়া ইস্মায়েলকে পুনর্বার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন এবং অনেকে আরবিকে পুনরানয়ন করিলে পুনরায় মিসরের সুখসূর্য্যের উদয় হইবে বলিয়াও আশা করেন।

শ্রীশশিভূষণ দে।

কলিকাতা, বহুবাজার।

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার।

৩।

এক্ষণে খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, যে ধর্ম্মের প্রারম্ভ-কাল চিন্তা করিলে ইতিবৃত্ত লেখককে উৎকণ্ঠিত হইতে হয়, সেই সুদূর কালের তত্ত্বালোচনায় ভ্রম হইবে বিচিত্র নহে, এই হেতু শঙ্কিত হইতেছি পাছে নিজের ভ্রম অন্যকেও আকৃষ্ট করে, যদি কোন স্থলে আপনারা আমার ভ্রম বিলোকন করেন, উপেক্ষা করিবেন। সত্যের পথ পরিষ্কার হয় এই আমার ইচ্ছা, ইহা ভিন্ন অন্য অভিপ্রায় নাই।

পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে পুরাবৃত্তই চক্ষু স্বরূপ। খ্রীষ্টীয় তত্ত্বালোচনায় প্রাচীন গ্রন্থ ও অতীত ঘটনাবলি আলোক সদৃশ। বাইবল এতৎসম্বন্ধে দর্পণ স্বরূপ, একথা অনেকেই বলেন, কিন্তু বাস্তব তাহা কতদূর সত্য তাহা আমি বলিতে পারি না। (১)

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাচার্য্যেরা বলেন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সকল কথাই বাইবলে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু রোমীয় মণ্ডলী কাহাদ্বারা কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বহুকষ্টেও তাঁহারা তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই (২)। শুনিতে পাই জনৈক প্রেরিত কর্ত্তৃক রোমে প্রচারিত হইয়াছিল (৩)। সত্য মিথ্যা আমি জানি না, জানেন গ্রীস্ দেশীয় ধর্ম্ম যাজক ইরিনিয়ঃ ও ইউসিবিয়ঃ।

---

(১) "Little is known of the history of the church for some centuries after the time of the apostles"

Beeton's Dic P. 1488.

(২) "With respe t to the origin of this church we have no certain information in the scriptures They do not tell us when or by whom it was founded"

(৩) "The opinion that it was founded by St. Peter does not appear to rest on any satisfactory evidence, the chief authorities for it are Irineus and Eusivius, but if he had indeed preached gospel at Rome, such a circumstance would probably have been noticed in the Acts of the Apostles; nor is it likely that St Paul would have made no allusion in his epistle Perhaps the most reasonable opinion on the subject is that the Gospel was first preached at Rome by the strangers."

তাঁহারা বলেন সেণ্ট পিতর রোমে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কথাটি বাস্তবিক বিশ্বাস যোগ্য নহে। এত বড় কাথলিক ধর্ম্ম, এত আড়ম্বর, পোপের এত প্রতাপ, এবং কাথলিকদিগের এত বাগাড়ম্বর, কিন্তু রোমীয় মণ্ডলী কে স্থাপনা করিয়াছিল, কোন্ সূত্রে এবং কোন্ সময়েই বা উক্ত সমাজের প্রচার আরম্ভ হয়, বাইবল এবং খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী তাহা বলিতে অক্ষম। প্রেরিতদের সকল কথা 'ক্রিয়া" পুস্তকে উক্ত হইয়াছে, রোমে পিতর আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন, এমন কথা উক্ত গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। সেণ্ট পলও রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও উক্ত ঘটনার কথা বলেন নাই। কোন্ প্রমাণ বলে, পিতর কর্ত্তৃক রোমে ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল—এই কথাটি গ্রীস দেশীয় ধর্ম্ম যাজকেরা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। রোমীয় মণ্ডলীর পুরাবৃত্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন ও উক্ত খ্রীষ্টীয় যাজকদিগের বাক্য অসত্য।

রোমীয় মণ্ডলীর পুরাবৃত্তের সূত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এ অতীত ঘটনা মনুষ্যলোকে জানিতে পারিবে না, পৃথিবী চিরকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিবে, ভগবানের এরূপ অভিপ্রায় নহে, কোন সূত্র হইতে রোমীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, আজি তাহার কথা বলিব। আমি দীর্ঘকাল বলিয়া আসিতেছি যে পাশ্চাত্যেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহা প্লাবন উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেধর্ম্ম কি উড়িয়া গেল, অথবা তাহা কুতীর্থিক (Heretics) দিগের হস্তে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে? পাশ্চাত্য লোকেরা কি তাহার কোন পুরাবৃত্ত রক্ষা করেন নাই? যদি রক্ষা করিয়া থাকেন, পৃথিবীর ধর্ম্মান্ধদিগের বৈরানল হইতে কি তাহার উদ্ধার হইয়াছিল?

আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, যে, যৎকালে রোমীয় সম্রাট্ অদ্রিয় (Adrian) তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ দিগের আসুরিক বৃত্তি বর্জ্জন পূর্ব্বক রোমের মহাতক্ষে প্রশস্ত মূর্ত্তিতে শোভা বর্দ্ধন করিতে ছিলেন, যে সময়ে ইতালীর সমাজের শিরা দল যত্র তত্র অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ের সহিত সদ্ধর্ম্মালোক উদ্দীপন করত জনগণের মোহান্ধকার বিনাশ করিতেছিল, যৎকালে কাথলিক সম্প্রদায়ের নাম লোকে জানিত না, সেই মহা শুভাবহ একশত ত্রিংশ খ্রীষ্টীয় অব্দে বৌদ্ধাচার্য্যগণ রোমের প্রকাশ্য পথে অত্যুচ্চ প্রাসাদে দরিদ্রের দ্বারে সদ্ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। রোমের

তৎকালে প্রবল পিপাসা, কিন্তু ধর্ম্ম পিপাসার নিকট কোন পিপাসাই স্থায়ী হয় না, পরাক্রান্ত রোম ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইলে, ধর্ম্ম কথা রোমের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল; রোম পৃথিবী বিজয়বাসনা পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্মের অনুসরণ করিলেন, দানব আজি দুর্দ্দান্ত ব্যবহার পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গ্রহণ করিল। পুরাবৃত্তের এ গুহ্য কথাটি আজি জগতে প্রচার হইলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই। এ ঘটনা মিথ্যা নহে, কাহারও কল্পনা নহে, ইহা গ্নস্তিক ধর্ম্ম প্রচারের অক্ষয় প্রমাণ ও সত্যের উচ্চ চীৎকার (৪)।

রোমে গ্নস্তিক ধর্ম্ম প্রচার হইবার পর রোমীয় লোকেরা জ্ঞানী হইয়াছিল, তাহাদের মত তত্ত্ব জ্ঞানের প্রতি ধাবমান হয়, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মোন্নতি ও জ্ঞানোন্নতির সাময়িক পুরাবৃত্ত আমরা প্রাপ্ত হই নাই। গ্নস্তিকরোমের ধর্ম্মপুরাবৃত্ত এ পর্য্যন্ত গোপন রহিয়াছে। ইউরোপের পুরাবৃত্তের ক্রমিক উন্নতির শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু খ্রীষ্টের কিছু কাল পরে কতিপয় শতাব্দির ধর্ম্ম-পুরাবৃত্ত একেবারেই সুদুর্ল্লভ, ইহার কারণ কি?

খ্রীষ্টীয়ান লেখকেরাই বলেন যে, গ্নস্তিক ধর্ম্ম প্রাচ্য তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু এ প্রাচ্য তত্ত্ব কোন্ জাতির নয়, তাহা প্রাঞ্জলরূপে তাঁহারা বলেন না। প্রাচ্য দেশ বলিলে চীন দেশ পর্য্যন্ত বুঝায়, সেইরূপ প্রাচ্য তত্ত্ব শব্দে নানা তত্ত্ব বোধক, প্রাচ্যের কোন্ জাতির ধর্ম্ম তত্ত্ব হইতে গ্নস্তিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মোৎপন্ন হইয়াছে, ইউরোপীয় লেখকদিগের লেখার ভঙ্গিতে তাহা আশু বোধগম্য হওয়া দুঃসাধ্য বোধ হয় (৫) আমি অনুমান করি বৌদ্ধ ও গ্নস্তিক বিভিন্ন ধর্ম্ম নহে।

---

(৪) "Another sect which took its rise from the opinions of the Gnostics was that of Cerdo and the more celebrated Marceon, who began to propogate their tenets at Rome about A D. 130 The principal feature of this heresy was the adoption of the oriental belief in two supreme powers the one good and the other evil"

P C. See Heresy.

(৫) "The origin of the Gnostic system has been traced to various sources Some have derived their doctrine from the Alexandrian school of philosophy, others from the Jewish Cabbala, and a still greater

গ্নস্তিব দিগেব মুখ হইতে তাহাদিগেব ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইলে তাহাবা কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, তাহা জানিতে পারিতাম। গ্নস্তিকগণ প্রকৃতি ও প্রধান অর্থাৎ জড এবং চৈতন্য দুইটি পৃথক পদার্থ বিশ্বাস করিত। সাংখ্যতত্ত্ব ব্যতীত এ মত কোন জাতিব কোন ধর্ম্মেই ছিল না। এই জডই দুঃখ ভোগেব মূল, ভাবতস্থ বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ইহা স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু পবিতাপের কথা বলিব কি ইউরোপীয় আধুনিক লোকেরা প্রতিপন্ন করিতে চান যে, পারসিক ধর্মতত্ত্বই উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ দুইটি প্রধান গুণেব শিক্ষা দেন। পুরাতত্ত্বের গবেষণায় এ প্রকার কত শত অবোধেব উক্তি দেখিতে পাই। কিন্তু হাসিব বি, যাঁহাদেব হইতে শিক্ষা লাভ কবিযাছি, তাঁহারাই সেই অবোধ। তাহারাই বলেন গ্নস্তিকগণ আদি খ্রীষ্টীয়ান ও গ্নস্তিকদিগেবই সর্ব্বাগ্রে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেব উপর প্রবল আধিপত্য ছিল। (৮) আমাব অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে যে গ্নস্তিক ধর্ম্ম হইতেই রোমান কাথলিক ধর্ম্মের সৃষ্টিয়াছে, এবং রোমেব সেই গ্নস্তিক প্রচারকগণই রোমীয় মণ্ডলীব প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

কন্যাভার।

পাশ্চাত্য সভ্যতাব লক্ষণ অনুসারে আমাদিগেব সমাজে যে, বিস্তব পরিমাণে সভ্যতাব আলোক প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে আমাদিগেব অবনতিব অবধি ছিল না এবং যথা সময়ে ভারতে ইংরাজেব আবির্ভাব না হইলে আমাদিগকে যে, আবও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কেবল

---

number from the oriental belief in two great independent principles one as the author of good and the other evil"

P C See Gnostics

(৮) "There can be no doubt that the sect became very powerfull in the church soon after that time and their opinions exercised a great influence upon Christian theology

B eton's Dic, see Gnostics

পাশ্চাত্য সভ্যতার লক্ষণ অনুসারেই যে আমরা উন্নত হইয়াছি, এমন নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে, শতাধিক বৎসরে আমরা যে, বিস্তর উন্নতি লাভ ও অসভ্যতারী বর্জ্জন করিয়াছি, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অনিচ্ছায় সহমরণ, সন্তান বিক্রয়, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ, নরবলি, রাজপুত জাতির কন্যাবধ ইত্যাদি বিস্তর পাপক্রিয়া নিবারিত হইয়াছে এবং বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা প্রভৃতি সমাজবন্ধনও শিথিল হইয়াছে। আমরা এক্ষণে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া সাধারণের শিক্ষার সুবিধা করিতেছি, অল্প মূল্যে লোকের দ্বারে দ্বারে সংবাদ পত্র পাঠাইয়া প্রত্যেককে সকল বিষয়ে বিদিত করিতেছি, সভা সমিতি করিয়া জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিতেছি এবং আমাদিগের সামান্য কষ্ট নিবারণের জন্যও রাজদ্বারে গমন করিতে ক্রুটি করি না। ফলত ইংরাজ শাসনের নানা দোষ থাকিলেও আমরা যে, বিস্তর পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছি, তাহা আর উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই।

সমাজ শরীর একদিকে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতেছে সত্য, কিন্তু নানা প্রকার ক্ষয়কারী ব্যাধি ইহাকে অন্তঃসার শূন্য করিতেছে। রোগ মারাত্মক হইতে না হইতে যদি আমরা তাহার প্রতীকার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমাদিগের ধ্বংশ যে সুদূরবর্ত্তি নহে, তাহা সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদিগের কাহারও সে দিকে দৃষ্টি নাই। দুই একজন কখন কখন রোগের জ্বালায় "হায়! হায়!" করিয়া বেড়ায় সত্য, কিন্তু যে রোগ সমস্ত সমাজ শরীরে বা সমাজের উত্তমাঙ্গে, তাহা একের চেষ্টায় কি প্রকারে নিবারিত হইবে? অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা অদ্য কেবল কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার নিমিত্ত অযথা ব্যয়ের বিষয়টির উল্লেখ করিতেছি। কন্যাকে বিবাহিত করিতে আজ কাল যে প্রকার অযথা ব্যয় করিতে হয়, বোধ হয় কেহই তাহা অবিদিত নহেন। যাঁহার মস্তকে কন [illegible] ভুবে একেবারে নিষ্পেষিত হই [illegible] বহুকন্যা তাঁহার দুর্দ্দশা ও দারিদ্র্যের সীমা নাই এবং কন্যাগণও যে, অযথা পাত্রে অর্পিতা হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়া জীবন যাপন করে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

কন্যাকে বিবাহিত করিবার ব্যয় বাহুল্য কোথা হইতে আমাদিগের সমাজে প্রবেশ করিল, তাহা স্থির করা যায় না। ইংরাজ সমাজে যেমন বিধি আছে, তেমনই নিষেধও আছে, সুতরাং ইংরাজ সমাজকে আদর্শ বলা যাইতে পারে না। শাস্ত্রে আছে, সালঙ্কারা কন্যা দান করিতে হইবে; কিন্তু এমন কোন কথা নাই যে, সে অলঙ্কার বহুমূল্য না হইলে পাত্র তাহা গ্রহণ করিবেন না। ইহার উপর এক্ষণে পাত্রকে নানাবিধ বহুমূল্য আভরণ ও তৈজসাদি দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে, কন্যা-দায় সকল দায়ের শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একটি কন্যার বিবাহে, যেমন করিয়া হউক, একজন সামান্য মধ্যবিত্ত লোককে প্রায় একসহস্র টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। এক্ষণে আবার সময় গুণে ষষ্ঠী দেবীর অনুগ্রহে কন্যা সন্তানও কিছু অধিক সংখ্যায় জন্ম গ্রহণ করিতেছে। তবে এত অধিক নহে যে, সকল কন্যাগুলি বিবাহিতা হইতে পারে না। বিগত লোক সংখ্যার হিসাবে দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজে পুত্র সংখ্যা ১ হইলে কন্যা সংখ্যা প্রায় ১·১২ অর্থাৎ ১০০ পুত্র কন্যার মধ্যে প্রায় ৪৭টী পুত্র এবং ৫৩টী কন্যা। পক্ষান্তরে, এই অনুপাতে সকলের সন্তান জন্মে না। এমন দেখা গিয়াছে যে, কোন একটি পরিবার মধ্যে ২২টি সন্তানের মধ্যে একটিও পুত্র নাই। সুতরাং সেই পরিবারকে ২২ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া কন্যা গুলিকে বিবাহিত করিতে হইবে। এমন অবস্থায় কন্যাভার কি ভয়াবহ ব্যাপার, তাহা চিন্তা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে! কিন্তু প্রত্যেক হিন্দু পরিবারকেই আজ কাল এই জ্বালায় জ্বলিতে হইতেছে। না জানি এই মহাতাপে কত সংসার জ্বলিয়া ছাই হইয়া গেল।

আবার যে পরিবার মধ্যে পুত্র সন্তান অধিক, সে পরিবারও পুত্রগণকে বিবাহিত করিয়া বিশেষ লাভবান হয় না। তাহার কারণ এই যে, মধ্যবিত্ত লোকে বিবাহ লব্ধ সামগ্রী বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ না করিয়া তাহা অব্যবহারিক ধনেই পরিণত করিয়া রাখে। আবার পুত্র কন্যা সমান সংখ্যক হইলেও তাহাদিগের বিবাহে লাভালাভ সমান হয় না। কেননা পুত্রের বিবাহে যাহা লাভ করা যায়, তাহার যৎসামান্যই কন্যার বিবাহে কার্য্যোপযোগী হয়। সুতরাং প্রায় সকল অলঙ্কার ও তৈজসাদিই নূতন করিয়া ক্রয় করিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কন্যাকে বিবাহিতা করিতে

হইলেই গড়ে এক সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কন্যাকে, সঙ্গতিহীন লোকেও অবিবাহিতা রাখে না এবং রাখাও উচিত নহে। আমাদিগের দেশাচারও তাহার বিরোধী। স্ত্রীলোক অবিবাহিত থাকিলে চরিত্র কলঙ্কিত হইতে পারে এবং তাহাতে সমাজের বিলক্ষণ অমঙ্গল সম্ভাবনা। কিন্তু কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার ব্যয় বাহুল্য এতই সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে যে, সেই অবিরাম গতি রুদ্ধ না হইলে, লোকে সমাজ বন্ধন ছিন্ন করিয়া কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিয়া সমাজকে দূষিত ও কলঙ্কিত করিতে বাধ্য হইবে। তখন কি ভয়ানক ব্যাপারই সংঘটিত হইবে, তাহা চিন্তা করিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! অর্থাভাব হইলে লোকে বড় একটা কার্য্যের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করে না; সুতরাং সঙ্গতিহীন লোকে যে, কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিতে কুণ্ঠিত হইবে, তাহা কি প্রকারে অনুমান করা যাইতে পারে।

কাহাকেও অর্থাভাবে কন্যাকে অবিবাহিত রাখিতে এখনও বড় একটা শুনা যায় না। কিন্তু সেদিন আর সুদূরস্থিত নহে। এখনও সঙ্গতি হীন লোকে কোন মতে বাটী ঘর বিক্রয় করিয়া বা ঋণ গ্রস্ত হইয়া অথবা ভিক্ষা করিয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করিতেছে। কিন্তু বিবাহের ব্যয় ভার এতই বৃদ্ধি পাইতেছে যে, মধ্যবিত্ত লোকে আর সে ব্যয়ভার বহন করিতে পারে না। নানা প্রকারে আমাদিগের দেশ দিন দিন নির্ধন হইয়া পড়িতেছে। এমন কি, অনেকের দিন যাপন বিলক্ষণ কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়াছে। তাহারা উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হইলেও সাধারণ লোকের ন্যায় যে সে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া অর্থাগম করিতে পারে না। সুতরাং অতি সামান্য আয় হইলেও তাহারা ভদ্রোচিত কার্য্যেই নিযুক্ত হইয়া কোন প্রকারে কষ্ট সহ্য করিয়াও দিন যাপন করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে অধিক ব্যয় বাহুল্য করিয়া কন্যাগণকে বিবাহিত করিতে হইলে, তাহাদিগের যে সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

কন্যাকে বিবাহিত করিতে কন্যাকর্ত্তার ঋণ বা ভিক্ষাই যদি এই সামাজিক কুপ্রথার চরম হইত, তাহা হইলেও আমাদিগের অনেকটা সৌভাগ্য বলিতাম। কিন্তু অযথা মূল্যে পাত্রগণ বিক্রীত হওয়াতে সমগ্র সমাজের

আর একটি বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। এক্ষণে নির্ধন ভদ্রপরিবারস্থ কন্যাগণ প্রায়ই অপাত্রে সংযুক্ত হইতেছে এবং সম্ভ্রান্ত বংশের হানি হইতেছে। আজ কাল সুপাত্র হইলেই তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে আর ধনহীন ব্যক্তি তাহার সহিত কন্যাকে বিবাহিত করিতে পারিতেছে না। সুতরাং তাহাকে অল্প ব্যয়ে অযোগ্য পাত্রের গলায় কন্যাকে বাঁধিয়া দিতে হইতেছে। সম্ভ্রান্ত পুরাতন বংশের আজিও একটু বংশ মর্য্যাদা থাকাতে নিকৃষ্ট বংশোদ্ভূত আধুনিক লোক সেই বংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে কিঞ্চিৎ যত্নবান আছে। এই জন্য আধুনিক নিকৃষ্ট বংশীয় পাত্রগণের মূল্য কিঞ্চিৎ সুলভ আছে এবং সম্ভ্রান্ত বংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন জন্য বরকর্ত্তা বড় একটা অতিরিক্ত দাওয়া দাবী করেন না। নির্ধন সম্ভ্রান্ত বংশীয় কন্যাকর্ত্তা এ সুযোগ অবশ্যই অবহেলা করিতে পারেন না। কাজেই তিনি বংশ মর্য্যাদার হানি করিয়া নিকৃষ্ট বংশোদ্ভূত পাত্রের সহিত কন্যাকে বিবাহিত করিতেছেন। যাহাতে তাঁহাকে ভিক্ষা করিতে বা ঋণ গ্রস্ত হইতে না হয়, সেই উপায় অবলম্বন করাতে, হয় তাঁহাকে অযোগ্য না হয় নিকৃষ্ট বংশীয় পাত্রে কন্যা সমর্পণ করিতে হইতেছে। ইহাতে সমাজের যে দিন দিন অবনতি হইতেছে, তাহা দেখিয়াও সমাজ বিন্ধ্যাচলের ন্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া এই অযোগ্য সংমিশ্রণে উপেক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় সমাজবন্ধন দৃঢ় নাই এবং আহার ব্যবহারের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, সুতরাং এই অযোগ্য যোজনা বিনা বিঘ্ন ও বিনা আপত্তিতে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু ফলে যে, সমাজেরই অনিষ্ট হইতেছে, সমাজ তাহা দৃষ্টি করিতেছে না।

যে কারণেই হউক, বর্ত্তমান সময়ে লোকের অর্থ কষ্ট হইয়াছে তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা উপার্জ্জন বৃদ্ধি হইলেও অভাবের হ্রাস হয় নাই। সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত লোকের অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু তন্নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। সুতরাং লোকে কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে না। ইহার উপর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল দিন দিন দুর্মূল্য হইতেছে। এমন অবস্থায়, একজন মধ্যবিত্ত লোককে প্রত্যেক কন্যার বিবাহে এক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে হইলে, তাহার পক্ষে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, তাহা যাঁহারা ভুক্তভোগী নহেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারেন। ইহার উপর প্রত্যেক পরিবারের অভি-

ভাবককে তিন চারি বা ততোধিক কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, তাঁহার যে কি পর্য্যন্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তাহা কি আর তর্ক যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে হইবে? আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি প্রত্যেক মধ্যবিত্ত বৃহৎ পরিবারকে প্রতি ছয় বৎসরে গড়ে একটি করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে হয়। সুতরাং প্রতি কন্যার প্রতি সহস্রমুদ্রা ব্যয় পড়িলে, সেইরূপ প্রত্যেক পরিবারকে ৬ বৎসরে সহস্রমুদ্রা ঋণ করিতে হয় এবং সে ঋণ শোধ যাইতে না যাইতে আবার পূর্ব্ববৎ ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব এইরূপ প্রত্যেক পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগকে যে, চিরকাল যৎপরোনাস্তি কষ্টে দিনযাপন করিতে হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যাঁহারা সম্পত্তিপন্ন, কন্যার বিবাহ তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর না হইতে পারে; কিন্তু সমাজের পনের আনা লোকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সুতরাং অধিকাংশ লোককেই যে এই দারুণ কুরীতির দংশনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইতেছে, তাহাতে আর সংশয় নাই। কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তিকে অনেক সময়েই ভিক্ষা করিতে ও ঋণজালে জড়িত হইয়া ছারখার হইতে দেখা যায় এবং বিষে জর্জ্জরিত হইয়া কাহাকে কাহাকেও আত্মহত্যা করিয়া এই দায় হইতে মুক্ত হইতে শুনা গিয়াছে। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা সমাজে আর কি কুরীতি আছে?

সমাজের এ প্রকার নানাবিধ দুরবস্থা থাকিলেও আমরা গৌরব করিয়া থাকি যে, আমরা দিন দিন সভ্য ও উন্নত হইতেছি। এমন সভ্যতা ও উন্নতি অতল জলে নিমগ্ন হউক! হটেণ্টটের ঘোর অন্ধকারও আমাদিগের জ্ঞানালোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! আমাদিগের সভাসমিতি আছে, সংবাদপত্র আছে, স্কুল কালেজ আছে, বলডিনার আছে, বিলাতে দেশীয় বক্তা আছে, নামের শেষে বড় বড় খেতাব আছে—নাই কেবল সমাজ-বন্ধন। নবহেমলার একটা অসতী নারী থাকিলে, আমরা কোমর বাঁধিয়া বাল্যবিবাহ বন্ধ করিতে অগ্রসর হই; কিন্তু আমাদিগের নিজের শিথিল সমাজটার একটা আলগা গিরা দিতেও যত্নবান নই। ইহা কি সামান্য ঘৃণার কথা! হে দীর্ঘ বক্তৃতাকারী সংস্কারকপ্রবর! মিনতি করি, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া নিজের সমাজের প্রতি দৃষ্টি কর। অগ্রে আপন সমাজকে দৃঢ় কর, নতুবা তোমার দাঁড়াইবার স্থল থাকিবে না। তোমার শরীর মধ্যে যে দারুণ ব্যাধি তাহার প্রতীকারে সর্ব্বাগ্রে যত্নবান হও। যে সামাজিক কুরীতি দেশব্যাপী ও

রাজযক্ষ্মার ন্যায় ক্ষয়কারী, তাহাকে শরীর মধ্যে পোষণ করিয়া বেশ ভূষার চটক দেখাইয়া বেড়ান, বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

এই দেশহিতকর কার্য্যে সকলেরই অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। যিনি হিন্দু, হিন্দুসমাজে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং হিন্দুসমাজের সর্ব্বনাশে যিনি কণামাত্রও কাতর, তাঁহারই কর্ত্তব্য যে, অগ্রসর হইয়া এই ভয়ানক আসন্ন বিপদ হইতে সমাজকে রক্ষা করেন। যাঁহাদিগের কন্যা আছে, তাঁহারা যে বদ্ধপরিকর হইবেন, তাহা ত বলাই বাহুল্য! যাঁহাদিগের কন্যা জন্মে নাই, তাঁহাদিগেরও হিন্দুসমাজের রক্ষার জন্য কৃতসংকল্প হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। আজই তাঁহাদিগের স্বার্থ নাই; কিন্তু ভবিষ্যতে যে এই জ্বালায় তাঁহাদিগকে জ্বলিতে হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? আর এই মহৎ ব্যাপারে তাঁহারা যদি একটু স্বার্থই না ত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব কোথায়?

আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে আমাদিগের এমত বিশ্বাস হইয়াছে যে, সমাজের সহিত যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র সংশ্রব আছে, তিনিই এই কুপ্রথা নিবারণের জন্য ব্যগ্র আছেন। তবে তাঁহাদিগের ব্যগ্রতা কার্য্যে পরিণত না হইবার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহাদিগকে পরিচালিত করিবার কেহ নাই। সকলেরই মন প্রস্তুত হইয়া আছে, কেবল পরিচালকের অভাবে কোন প্রতীকার হইতেছে না। আজ কাল সমাজের নেতা নাই—সমাজ-শরীর মস্তকহীন, হইয়া একটা জড়পিণ্ডবং পড়িয়া আছে। সুতরাং এই বিষম কন্যাভার নিবারণের জন্য কাহারও উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। বিবাহ উপস্থিত হইলে পাত্রের অভিভাবককে অগ্রসর হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি যোগ্য বংশে যোগ্য পাত্রীর সহিত পাত্রকে বিনা ব্যয় বাহুল্যে বিবাহিত করিতে প্রস্তুত আছেন। তদ্ভিন্ন আমরা আর একটি সহজ উপায়ের নির্দ্দেশ করিব। তাহা এই—প্রতি সহরে বা গ্রামে অথবা কয়েকটি সহর বা গ্রাম একত্রিত হইয়া এক একটি করিয়া সমিতি সংস্থাপন করিবেন এবং সমিতির অন্তর্গত ব্যক্তিগণ এইরূপ স্বীকার করিবেন যে, তাঁহারা বিনা ব্যয় বাহুল্যে পরস্পর কন্যা পুত্রের আদান ও দান করিবেন। কোন সামাজিক কার্য্য ব্যতিরেকে সে সমিতির অধিবেশনের প্রয়োজন নাই এবং তথায় বক্তৃতারও কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই। এই প্রকার ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র কেন্দ্র হইতে আরম্ভ হইয়া এই মহৎ উদ্দেশ্য ক্রমে সমস্ত সমাজে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে পারিবে, আমাদিগের এমত বিশ্বাস আছে। অতএব ভরসা করি, স্বদেশানুরাগী মহোদয়গণ যত্ন করিয়া প্রথমে এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতির সূত্রপাত করিতে আর বিলম্ব করিবেন না। সংবাদ পত্রাদির যদি সমাজ সংস্কার করা একটি ব্রত হয়, তাহা হইলে সংবাদ পত্রাদিতে এ বিষয়ের পর্য্যাপ্ত আলোচনা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমরা প্রত্যেক সংবাদ ও সাময়িক পত্রকে এ বিষয়ের আন্দোলন করিতে ও কি উপায়ে এই বিষম কন্যাভার নিবারিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। এ নিদারুণ ব্যাধি প্রতীকার করিবার উপায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে কন্যাভারের ন্যায় যে দ্বিতীয় অনিষ্টকর কুপ্রথা বিদ্যমান নাই, তাহাতে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করিবেন না।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

হিন্দু-হিতৈষী হরিশ্চন্দ্র।(১)

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর সময়ে বঙ্গে যে সকল বালকের জন্ম হইয়াছে, তাঁহারা এখন প্রৌঢ় যুবা পুরুষ; অনেকেরই সন্তান সন্ততি হইয়াছে। যে সকল বালিকার জন্ম হইয়াছে, তাঁহারা এখন সকলেই প্রৌঢ়া গৃহিণী, কাহারও কাহারও দৌহিত্র দৌহিত্রী হইয়াছে। এই কাল পরে হরিশের জীবনী প্রকাশিত হইতেছে। ইহাও আশাপ্রদ।

(১) হিন্দু পেট্রিয়টের ভূত পূর্ব্ব সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী। শ্রীরামগোপাল সান্ন্যাল প্রণীত। রামগোপাল বাবুর বহু পরিশ্রম সাধ্য হরিশ্চন্দ্রের জীবনীর আমরা যে মুখবন্ধ লিখিয়াছি, তাহাই হরিশ্চন্দ্র চরিত্রের যৎসামান্য সমালোচনা ভাবে প্রকাশ করা গেল।

আমরা এখনও বালেন্টিন জামিরে ডুবাল লইয়া ব্যস্ত; হরিশ রামগোপাল, কেশব দ্বারকানাথ,—এসকলের কথায় আমরা থাকি না। আমরা ঘোরতর আত্ম-বিস্মৃত জাতি। সোণা বাহিরে রাখিয়া শুধু আঁচলে গিরা দিতে, আমাদের মত বোধ হয় আর কেহ নাই। তোমার যদি একটি আকবরি মোহর, আধুলি, বা সিকি থাকে, তাহাই লক্ষ্মীর হাঁড়ীতে যত্ন করিয়া রাখিও, পুষ্প চন্দনে পূজা করিও, কালে তাহাতেই তোমার লক্ষ্মী উজলা হইবেন। আর তাহাতে অযত্ন করিয়া, তাহা দূরে ফেলিয়া, লঙ্কায় রাশি রাশি সোণা আছে শুনিয়া, কেবল শুধু আঁচলে গিরা দিলে, কখন কিছু হবে না ভাই!

হিন্দুহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র সত্য সত্যই দেশ ভক্তির আকবরি মোহর। নিখাদ, খাটি সোণা। এই হরিশ্চন্দ্রে ভক্তি করিতে শিখিলে, সত্য সত্যই তোমার লক্ষ্মী উজলা হইবেন।

হরিশের স্বদেশভক্তি তাঁহার প্রাণের প্রাণ; সেই ভক্তি ভরেই তিনি জীবিত ছিলেন, সেই ভক্তি ভরেই তাঁহার লেখনী তেজস্বিনী, ভাষা ওজস্বিনী ও তিনি স্বয়ং মনস্বী হইয়াছিলেন। সেই ভক্তির বলেই তিনি একাকী, সহস্র দুদ্ধর্ষ প্রবল প্রতাপান্বিত নীলকরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন, সেই ভক্তি বলেই তিনি লর্ড ডালহৌসির সর্ব্বগ্রাসিনী রাক্ষসী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, আবার সেই ভক্তি বলেই হরিশ্চন্দ্র দারুণ সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে "ভারতের কোটি কোটি নিঃসহায় লোকের পক্ষ হইয়া একাকী রাজদ্বারে অযাচিত প্রতিভূ স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।" হরিশের মত দেশভক্ত দয়ার ভিখারী না পাইলে, লর্ড কানিঙ্গের সার্ব্বজনিক দাক্ষিণ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারিত কি না সন্দেহ। 'এক দিকে সহস্র সহস্র দানব ভারতের লক্ষ লক্ষ নর নারীর রক্ত পিপাসায় লালায়িত হইয়া, সহস্র সহস্র লেলিহান জিহ্বা নির্গত করিয়া অনবরত "প্রতিহিংসা "প্রতিহিংসা" ধ্বনিতে চীৎকার করিতেছে, অন্য দিকে এক সৌম্যমূর্ত্তি বঙ্গ ব্রাহ্মণ যুবা অসীম দেশ-ভক্তি ভরে, সেই অসহায় লক্ষ লক্ষ নর নারীর পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, 'রক্ষা কর' 'ক্ষমা কর', 'দয়াকর' বলিয়া কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিতেছে। বলিতেছে 'যদি ভারতে ইংরাজ রাজ্য স্থায়ী করিবে, যদি ইংরাজ আপনাকে রক্ষা করিবে, তবে ইংরাজ, ক্ষমা কর, দয়া কর;

অতীতের অত্যাচার ভুলিয়া যাও, ভবিষ্যতে ভারতে ইংরেজের প্রতাপচ্ছবি মনে কর; ভারতের সাম্রাজ্যেই ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য; সেই ভারতকে রক্ষা কর, ক্ষমা কর, দয়া কর।' ইংরাজের রাজলক্ষ্মী, ভারত-ভক্ত ব্রাহ্মণ যুবার এই কাতরোক্তি, মহা রাজনীতিকের এই স্বার্থ-পরার্থ মিশ্রিত অপূর্ব্ব রাজনৈতিক উক্তি, আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিলেন, তিনি লর্ড কানিঙ্গে ভর করিয়া ভারতের সমগ্র দেশে প্রদেশে, গ্রাম নগরে, দ্বারে দ্বারে ক্ষমা ঘোষণা করিলেন। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত, ভারত হইতে বিদ্রোহ গিরিগুহায় বিদূরিত হইল; শান্তির সুস্নিগ্ধ বায়ু ভারতে বহিতে লাগিল; ভারতের প্রাণ ও ইংরাজের মান যুগপৎ রক্ষা পাইল। যথার্থই বলা হইয়াছে, হরিশ্চন্দ্র "লক্ষ লক্ষ নর নারীকে অকাল মৃত্যু হইতে, শ্মশান হইতে, রক্ষা করিয়া ছিলেন, এইজন্য" হরিশ্চন্দ্রের ভারতহিতৈষী নামের সার্থকতা হয়।

হরিশ্চন্দ্রের ইংরেজিতে অপূর্ব্ব রচনা শক্তি, অগাধ পরিশ্রমে প্রবৃত্তি, নানা বিষয়িণী গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইতিহাসের আলোচনা, অত্যাচারের উপর তাঁহার ভীষণ ভ্রূকুটি, রাজপুরুষগণের নিত্য নৈমিত্তিক দুষ্ক্রিয়া কলাপে নিয়ত মর্ম্মান্তিক রূপে অথচ সরস ভাবে উপহাস ও বিদ্রূপ— এ সকলই হরিশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ; বড় সুন্দর, বড় সুললিত, বড় সৌম্য, অথচ সবল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বটে, কিন্তু হরিশের প্রাণ—তাঁহার জ্বলন্ত দেশভক্তি। সেই মহা প্রাণে অনুপ্রাণিত ছিল বলিয়াই, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল লাবণ্যে ঝলমল করিত, সামর্থ্যে দেব পরাক্রম ধারণ করিত।

হরিশ্চন্দ্র দেশভক্তির উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত অবতার ছিলেন; এখনকার দিনে সেই দেশ ভক্তি নানা মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে; আত্ম ভক্তি, যশোলিপ্সা, পদাকাঙ্ক্ষা, মানভিক্ষা এখন কত মূর্ত্তি কত দিক হইতে দেশভক্তির অঙ্গচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করিয়া, অভিনয়ে বঙ্গ ভূমিকে রঙ্গ ভূমিতে পরিণত করিতেছে; এই সময়ে প্রকৃত দেশভক্তের জীবনী প্রকাশ বিশেষ সময়োপযোগী ও আশাপ্রদ; সেই জন্য আশান্বিত হৃদয়ে আমরা সেই জীবনীর সমালোচনা স্বরূপে হরিশ্চন্দ্রের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলাম।

আর্য্য জাতির কর্ম্মকাণ্ড।

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ॥"

গীতা ৩ অ। ৫।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন,—পার্থ! কোন কালে কোন অবস্থাতে ক্ষণমাত্রও কোন জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকিয়া অবস্থিতি করিতে শক্ত হয়েন না। যে হেতুক স্বভাবই সমুদয় জনকে অবশ করিয়া কর্ম্ম করাইতেছে।

১। ভাষা-পরিচ্ছেদে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব এই সাত প্রকার পদার্থ নিরুপিত হইয়াছে। (১) উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, এবং গমন ভেদে কর্ম্ম পঞ্চ বিধ (২)।

২। উল্লিখিত পঞ্চ প্রকার কর্ম্মের মধ্যে গমন বা গতিরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু উৎক্ষেপণাদি অবশিষ্ট চতুর্ব্বিধ কর্ম্মও গতি সাপেক্ষ।

৩। মীমাংসক মতে কর্ম্ম ক্ষণ দ্বয় স্থায়ী। (৩) এই মতে প্রথম ক্ষণে কর্ম্মের উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে পূর্ব্ব সংযোগ নাশ ও উত্তর সংযোগের উৎপত্তি। (তৃতীয় ক্ষণে কর্ম্মের নাশ)। নৈয়ায়িক মতে কর্ম্ম ক্ষণ চতুষ্টয় স্থায়ী। প্রথম ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে বিভাগ, তৃতীয় ক্ষণে পূর্ব্ব সংযোগ নাশ, চতুর্থ ক্ষণে উত্তর সংযোগের উৎপত্তি। (পঞ্চম ক্ষণে কর্ম্মের নাশ)।

---

(১) দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং।
সমবায়স্তথা ভাবঃ পদার্থা সপ্তকীর্ত্তিতাঃ।

ভাষাপরিচ্ছেদ।

(২) উৎক্ষেপণং ততোহবক্ষেপণ মাকুঞ্চন স্তথা।
প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চচ॥

(ঐ)

(৩) ক্ষণ, কালের সূক্ষ্মতম বিভাগ—' বিভাগা প্রাগভাবাবচ্ছিন্ন কর্ম্ম।

সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী।

৪। সামান্যত কার্যের অগ্রে "কারণ" এবং শেষে 'ফল' অবস্থিতি করে। সুতরাং কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না এবং কার্য্য ভিন্ন ফলের উদয় হইতে পারে না। সমস্ত জগৎ অনবরত ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। নিশ্চেষ্টতা ও নিষ্পন্দতা কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। ক্রিয়াই জগতের নিয়ম। কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন বিষয়েরই নিষ্পত্তি হয় না।

চিত্ত মার্জ্জিত না হইলে, বিশুদ্ধ জ্ঞান না জন্মিলে, পরমার্থ তত্ত্বে অধিকারী হওয়া যায় না। সকলই যত্ন বা কর্ম্মানুষ্ঠান সাপেক্ষ। অতএব কর্ম্ম আবশ্যক।

৬। উপরে সামান্য কর্ম্ম মাত্রের যে লক্ষণাদি উল্লিখিত হইল, তদ্ভিন্ন শাস্ত্রবিহিত ও নিষিদ্ধ কতকগুলি কর্ম্ম আছে। কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থে যাগ ও হিংসাদিকে কর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (৪) এই সমস্তই কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদ্য (৫)।

৭। বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ দ্বারা অধর্ম্ম সঞ্চয় হইয়া থাকে।

বেদাদি বিহিত ক্রিয়া জন্য যে পুরুষের গুণ (অদৃষ্ট), তাহা ধর্ম্ম ও বেদাদি নিষিদ্ধ ক্রিয়া জন্য যে পুরুষের গুণ (অদৃষ্ট) তাহা অধর্ম্ম (৬)।

---

(৪) শব্দকল্পদ্রুম ৪৮০ পৃঃ।

(৫) বেদের যে যে অংশে নানা প্রকার কর্ম্মের বিধান ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি নির্ণীত আছে, তাহা কর্ম্মকাণ্ড এবং যে যে অংশে বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহা জ্ঞান কাণ্ড বলিয়া খ্যাত। বেদে যে সকল গৃহ্য (গৃহস্থ কর্ত্তব্য) কর্ম্মের উল্লেখ ও মন্ত্র আছে, সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি (সামবেদী) গোভিল (যজুর্ব্বেদী) পারস্কর এবং (ঋগ্বেদী) আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ নিবদ্ধ করেন। ঐ সকল পদ্ধতি সামান্যত গৃহ্যসূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভবদেব প্রভৃতি পরবর্ত্তী নিবন্ধকারেরা গোভিলাদি গৃহ্য সূত্রের অর্থাবলম্বন করিয়া সহজবোধগম্য পদ্ধতি সকল প্রস্তুত করেন। সংহিতা কারকেরা বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম কহিয়াছেন। ঐ সমস্তকে ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতি কহে। তদ্ভিন্ন পুরাণাদি ও সদাচারও ধর্ম্মের প্রমাণ।

(৬) বিহিত ক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুং সাং গুণোমতঃ।
প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়াসাধ্যঃ সগুণোঽধর্ম্ম উচ্যতে॥
স্মৃতি।

এতদ্ভিন্ন লোকে সহজত যে সকল কর্ম্ম করে, স্থূল ভেদে তাহারও পুণ্য-পাপ-জনকতা আছে।

৮। সুখ ধর্ম্মের ও দুঃখ অধর্ম্মের অবিচ্ছেদ্য অবশ্যম্ভাবি ফল। মহর্ষি জৈমিনি, তজ্জন্যই সুখ দুঃখ সাধকত্ব দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে ধর্ম্ম কি?—না, যাহা সুখের নিমিত্ত উৎপন্ন হয়; অধর্ম্ম কি?—না, যাহা দুঃখের নিমিত্ত উৎপন্ন হয় (৭)।

৯। বৈধ ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের নাশ হইলেও তাহার একটি অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট থাকে। সেই অদৃষ্ট ফল জন্মায়। অদৃষ্ট কর্ম্মায়ত্ত; সুতরাং কর্ম্মই ফলের মুখ্য কারণ।

১০। উক্ত অপূর্ব্ব, অদৃষ্ট বা কর্ম্মের অনুবন্ধন নিবন্ধন মনুষ্য পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ ও যোনি ভ্রমণ করে। মায়া (৮) মোহিত হইয়া বিবিধ

---

(৭) কো ধর্ম্মো যো ভ্যুদয়ায়
কোঽধর্ম্মো যো নভ্যুদয়ায়॥

জৈমিনি সূত্রভাষ্য।

সুখন্তু জগতামেব কাম্যং ধর্ম্মের জন্যতে।
অধর্ম্ম জন্যং দুঃখং স্যাৎ প্রতিকূল সংচেতসাং॥

(৮) বেদান্ত মধ্যে মায়া সৎ কি অসৎ ইহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। ইহা ত্রিগুণাত্মক (সত্ত্ব রজস্তমোগুণময়ী), জ্ঞান বিরোধী ভাবরূপ। মায়ার নাম অজ্ঞান। 'অহমজ্ঞো মামহং ন জানামি।' ইহা জীবের কারণ শরীর; মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুটি শক্তি আছে। আবরণ দ্বারা জীবাত্মার জ্ঞান শক্তি প্রভৃতি আবৃত হয়। বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা সমুদায় সৃষ্টি নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। মায়া (অজ্ঞান) দুই প্রকার—মায়া ও অবিদ্যা। বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধানকে মায়া এবং মলিন সত্ত্ব প্রধানকে অবিদ্যা কহে। উহা যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের উপাধি।

বেদান্ত ভিন্ন অন্য কোন মতে মায়া নামক কোন পদার্থ স্বীকৃত হয় নাই। অন্যান্য মতে প্রকৃত বাসনা বা অদৃষ্ট ইহার স্থানীয়।

বাসনার (৯) অনুসরণ করে। তাহার বাসনা জন্য অভিলাষ, অভিলাষ জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় এবং কর্ম্ম জন্য নানা প্রকার ফল ভোগ হইয়া থাকে।

১১। ঐ ভোগ লিঙ্গ শরীরেরই (১০) হয়, আত্মার (১১) হয় না।

ক্রিয়া কলাপের উৎপত্তির প্রতি জ্ঞানই প্রধান নিদান। ঐশ্বরিক জ্ঞান ঐ অজ্ঞান নাশে সমর্থ। কিন্তু অজ্ঞান জনিত কর্ম্ম অজ্ঞানকে নাশ করিতে পারে না (১২)।

---

(৯) যোগ-বাশিষ্ঠ মতে বাসনা দ্বিবিধ। শুদ্ধা ও মলিনা। শুদ্ধা বাসনা (কেবল ঈশ্বর প্রীতি উদ্দেশ্যে ক্রিয়মাণ উপাসনাদি) জন্ম বিনাশের হেতু স্বরূপা। মলিনা বাসনা (কাম সংকল্পাদি) শরীরোৎপত্তি কারণ রূপিণী।

বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা।
মলিনা জন্মনো হেতুঃ শুদ্ধা জন্ম বিনাশিনী।।

যোগ-বাশিষ্ঠ ১ অ। ৯।

(১০) পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান) মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ,—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্) যুক্ত অপঞ্চী-কৃত পঞ্চ মহাভূত (বিশুদ্ধ পঞ্চ মহাভূত) নির্ম্মিত শরীরকে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর কহে। জীবাত্মা এই লিঙ্গ শরীরাশ্রিত হইয়া দেহান্তর গমন করেন।

পঞ্চ প্রাণো মনোবুদ্ধি দশেন্দ্রিয় সমন্বিতং।
অপঞ্চীকৃত ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগ সাধনং ॥

পঞ্চদশী।

(১১) আত্মা সম্বন্ধে দ্বৈত ও অদ্বৈত দুই মত। প্রায় সমুদয় দার্শনিকেরাই দ্বৈতবাদী। কেবল বেদান্ত অদ্বৈত বাদী। বেদান্ত মতে একই আত্মা অবস্থা ভেদে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হন। মায়াতীত অবস্থাতে পরমাত্মা ও মায়াচ্ছন্ন অবস্থায় জীবাত্মা। মায়ার আবরণ শক্তি-ভেদে জীবগণের পরস্পর ভেদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মায়া পাশ ছিন্ন হইলেই মোক্ষ লাভ হয়।

(১২) অজ্ঞানমেবাস্য হি মূলকারণং তজ্জ্ঞান মেবাত্র বিধৌ বিধীয়তে।
বিদ্যৈব তন্নাশ বিধৌ পটীয়সী ন কর্ম্ম তজ্জং সবিরোধং মীরিতং।।

রামগীতা। ৯।

১২। কর্ম্ম জন্য পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ, যোনি ভ্রমণ ও নানাবিধ ফল ভোগ করিতে হয় বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডে অনাস্থা করা উচিত নহে। সচরাচর বিষয়োপভোগ দ্বারা বিষয় বাসনার ক্রমশ বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু পুনঃপুনঃ উপভোগ দ্বারা উত্তরোত্তর কামনা সংকুচিত হইয়াও আইসে। বাসনার স্বভাব এই যে তাহারা সর্ব্বদা নূতন বিষয়ে ধাবিত হয় এবং যে বিষয় যতই পুরাতন হইতে থাকে, ততই তাহার আকর্ষণ হইতে নির্ম্মুক্ত হয়। যোগীদিগের কথা বলিতেছি না,সাধারণ লোকের পক্ষে বিষয় অভুক্ত থাকিলেই স্পৃহা থাকিয়া যায়। অতএব পুনঃ পুনঃ উপভোগ দ্বারা পরিণামে তাহার মূল চ্ছেদন করা যত সহজ, তত আর কিছুই নহে। 'দিবাকর যেমন কিরণ জাল বিস্তার পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহা সংকুচিত করেন, তদ্রূপ মনুষ্য বিষয় ভোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিষয় বাসনা সংকুচিত করে এবং পরিশেষে নিরহঙ্কার হইয়া গুণাতীত পরম ব্রহ্মে লীন হয়। অতএব বায়ু যেমন অর্ণবস্থ তৃণাদিরে প্রবাহ দ্বারা পর পারে লইয়া যায় তদ্রূপ কর্ম্ম সংসারে লিপ্ত জীবকে পর ব্রহ্মে লীন করিয়া থাকে (১৩)।

১৩। জন্ম ভেদে ফলভোগ হেতু কর্ম্ম তিন প্রকার। সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ (১৪)। যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃত হইয়াছে, তাহা সঞ্চিত; তন্মধ্যে যে কর্ম্মগুলির ফল ইহ জন্মে ভোগ করা যায়, তাহা প্রারব্ধ বা প্রাক্তন, এবং যে কর্ম্ম ইহ জন্মে করা যাইতেছে ও যাহার ফল প্রায়ই (অত্যুৎকট পাপ পুণ্য ভিন্ন (১৫)) জন্মান্তরে ভোগ করিতে হয় তাহা ক্রিয়মাণ।

১৪। জগতের প্রায় সমুদয় পদার্থই সহজ অবস্থায় মলিন ও অবিশুদ্ধ।

---

(১৩) কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় প্রকাশিত মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় ৩৩১ পৃঃ।

(১৪) তস্য জন্ম ভেদাৎ ত্রিবিধং। সঞ্চিতং প্রারব্ধং ক্রিয়মাণঞ্চ।

ইতি বেদান্ত মতং।

(১৫) ত্রিভির্বর্ষৈ স্ত্রিভির্মাসৈ স্ত্রিভিঃ পক্ষৈ স্ত্রিভি র্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপ পুণ্যৈরিহৈব ফল মশ্নুতে॥

যেমন আকর জাত সুবর্ণাদি ধাতু সহজ অবস্থায় বিমিশ্র ও মলদূষিত, মায়াচ্ছন্ন জীবাত্মাও সেইরূপ সত্ত্ব রজস্তমোগুণ (১৬) দ্বারা সহজত জড়িত রহিয়াছে। যেরূপ অন্যান্য মল হইতে পৃথকভূত ও পরিষ্কৃত হইলে, সুবর্ণাদি বিশুদ্ধ হয়, সেইরূপ রজ ও তমোগুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবাত্মা শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবে উপনীত হইলেই তাহার বিশুদ্ধতা যথার্থ স্ফূর্ত্তি পায়।

১৫। মনুষ্য উল্লিখিত সত্ত্ব রজ তমো গুণাশ্রিত হইয়া যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহা ক্রমান্বয়ে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বলিয়া খ্যাত। আসক্তি রহিত, রাগদ্বেষ শূন্য ও নিষ্কাম হইয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা সাত্ত্বিক (১৭) ফলেচ্ছু ও আমি করিতেছি এবম্প্রকার অভিমান পরতন্ত্র হইয়া বহু পরিশ্রমে যে কর্ম্ম করা যায় তাহা রাজস, এবং অনুবন্ধ (পশ্চাদ্ভাবী শুভাশুভ) বিত্ত ব্যয়, পরপীড়া, ও নিজের ক্ষমতা আলোচনা না করিয়া মোহপ্রযুক্ত যে কর্ম্ম আরম্ভ করা যায় তাহা তামস (১৮)।

সাত্ত্বিক বা নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধি ও উর্দ্ধগতি, রাজস বা সকাম

---

(১৬) সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টং, উপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ, গুরুবরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তি।

সাংখ্যকারিকা।

লঘু ও প্রকাশক গুণের নাম সত্ত্ব, উপষ্টম্ভ ও সক্রিয় গুণের নাম রজঃ এবং গুরু ও আবরক গুণের নাম তমঃ।

(১৭) সাত্ত্বিক "নাহং কর্ত্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি।"

মলমাস তত্ত্ব।

(১৮) তত্তু ত্রিবিধং। সাত্ত্বিকং ১ রাজসং ২ তামসং ৩।

সাত্ত্বিকং যথা। নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগ দ্বেষতঃ কৃতং।
অফল প্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে।

রাজসং যথা। যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতং॥

তামসং যথা। অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসা মনপেক্ষ্য চ পৌরুষং।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতা।

কর্ম্মে যথোক্ত ফল লাভ ও মধ্যম গতি এবং তামস কর্ম্মে অধোগতি হইয়া থাকে (১৯)।

(ক্রমশ)

শ্রীহরচন্দ্র চৌধুরী।

আর্য্যজাতির জ্ঞানকাণ্ড।

রাগিণী গৌরী—তাল একতালা।

নাহি কোন গুণ, ওহে গুণাতীত,
তুমি গুণময়, সর্ব্ব গুণাধার ॥ ১ ॥

কে বলে সাকার, নাহি ত আকার,
কিন্তু প্রভু তুমি নও হে নিরাকার ॥

নাহি কোন নাম নাহি কোন রূপ,
কিন্তু প্রভু তোমার রূপ অপরূপ,
তব ভক্তগণে ভক্তি যুক্ত মনে,
সংখ্যাতীত নাম রেখেছে তোমার ॥

সর্ব্বব্যাপী বলে সকলে বাখানে,
কিন্তু লিপ্ত তুমি নহ ব্যাপ্তিগুণে,

---

(১৯) ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি স্বত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥

ভগবদ্গীতা।

তোমাকে ধরিয়া তোমাতে ব্যাপিয়া,
এ বিশ্ব রয়েছে সংস্কার নাহি তার ॥

সবে বলে তুমি আছ সর্ব্বস্থানে,
স্থানাশ্রিত তুমি একথা মানি নে,
তুমি সর্ব্বাধার বিশ্বমূলাধার,
তোমার আধার সম্ভবে না আর ।

কেহ বলে কাছে কেহ বলে দূরে,
কেউ বলে অন্তরে কেউ বলে বাহিরে,
কিন্তু নিকটে দূরে অন্তরে বাহিরে,
পূর্ণভাবে তুমি সবে একাকার ॥

তুমি আদি দেব অনাদি অনন্ত,
অসীম মহিমা নাহি তার অন্ত,
বাঙ্‌মনচক্ষুর তুমি অগোচর,
তোমাতে গোচর সকল সংসার ॥

নিত্য জ্ঞানময় সর্ব্ব শক্তিমান্,
পরমাত্মা বিভু পুরুষ প্রধান,
ভূত ভবিষৎ সবই বর্ত্তমান,
দিক্‌কাল বিমান শ্রীঅঙ্গ তোমার ॥

প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তিল তুল্য নয়,
সৃষ্টি স্থিতি লয় কটাক্ষেতে হয়,
তুরীয় চৈতন্য নাহি অস্তোদয়,
দেখে হারাধনের লাগে চমৎকার ॥

গুরু। বেদান্ত দর্শনে পঞ্চকোষের বিবরণ এইরূপ লেখা আছে। যথা ;—১ অন্নময় কোষ। ২ প্রাণময় কোষ। ৩ মনময় কোষ। ৪ বিজ্ঞানময় কোষ। ৫ আনন্দময় কোষ। ৬ পঞ্চ কোষাতীত অনুপহিত আধার—চৈতন্য ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। ইনিই সাংখ্যের আদি পুরুষ অথবা বীজ পুরুষ।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু উপস্থ (১)। সাংখ্যের এই বিংশতি স্থূল তত্ত্ব বেদান্তে অন্নময় কোষ নামে কথিত হইয়াছে।

শিষ্য। এই সকল তত্ত্বের মধ্যে পরস্পর কাহার সহিত কি সম্বন্ধ আছে, তাহা বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করি।—

গুরু। আকাশের গুণ শব্দ। বায়ুর গুণ স্পর্শ এবং শব্দ। অগ্নির গুণ রূপ এবং শব্দ, স্পর্শ। জলের গুণ রস এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ। ক্ষিতির গুণ গন্ধ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস।

আকাশের সত্ত্বাংশে কর্ণের উৎপত্তি এবং কর্ণের বিষয় শব্দ। বায়ুর সত্ত্বাংশে ত্বকের উৎপত্তি এবং ত্বকের বিষয় স্পর্শ। তেজের সত্ত্বাংশে চক্ষের উৎপত্তি এবং চক্ষের বিষয় রূপ, অপের সত্ত্বাংশে জিহ্বার উৎপত্তি এবং জিহ্বার বিষয় রস। মৃত্তিকার সারাংশে নাসিকার উৎপত্তি, এবং নাসিকার বিষয় গন্ধ। বস্তুত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে পঞ্চ তন্মাত্রার ভোক্তা বা আধার স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

শিষ্য বস্তু থাকিলেই তাহার অতি সূক্ষ্মশক্তি-বিশেষ বা গুণ থাকা অবশ্যম্ভাবী এবং গুণ থাকিলেই তাহার আধার স্থূল ও ক্রিয়া বিশেষ থাকিবেই থাকিবে। এস্থলে পঞ্চ ভূতের পঞ্চ সূক্ষ্মশক্তি বা গুণ এবং পঞ্চ গুণের ভোক্তা বা আধার স্বরূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং ক্রিয়াস্থল পঞ্চ কর্ম্মে-

---

(১) ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইহাদের নাম পঞ্চ মহাভূত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ গুণের নাম পঞ্চ তন্মাত্র। নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র, এই পাঁচটির নাম পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাচটির নাম পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়।

ক্রিয়ের বিবরণ অবগত হইলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার মনোমধ্যে আপাততঃ দুইটি প্রশ্নের উদয় হইয়াছে,—

১। বিজ্ঞান মতে তেষট্টি মূল পদার্থ বা তেষট্টি ভূত স্বীকৃত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও যে হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে? যাহা হউক বর্ত্তমানে তেষট্টী স্থানে পাঁচটি মাত্র ভূতের উল্লেখ বড়ই ভুলকথা। বিশেষত সে ভূত পাঁচটি আবার মিশ্র পদার্থ, মৌলিক নহে।—

২। আপনি বলিয়াছেন আকাশের গুণ শব্দ কিন্তু আমরা সম্মুখে যে শূন্য দেখিতে পাই, আবহমান কাল হইতে তাহাকেই লোকে আকাশ বলিয়া আসিতেছে। ফলত আকাশ কোন পদার্থ বিশেষ নহে। যাহা বস্তু নহে তাহার গুণ এবং ক্রিয়া ইত্যাদি থাকা কখনই সম্ভবে না। বিশেষত বিজ্ঞান মতে শব্দ বায়ুর গুণ বলিয়া নিশ্চয় হইয়াছে। আর সে কথা কেবল আনুমানিক মাত্র নহে। বায়ু নিষ্কাশিত যন্ত্রের দ্বারায় বায়ু পদার্থ স্থানান্তরিত করিয়া, তথায় ঘণ্টা বাজাইলে কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। তজ্জন্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা শব্দকে আকাশের গুণ না বলিয়া বায়ুর গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিতেছেন কেন?—

গুরু। আমি একে একে তোমার দুইটি প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিতেছি, মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

১। আমাদের দর্শন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে,

"অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যাদাকাশঃ আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নি রগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে।"

অথবা

"আকাশাজ্জায়াতেবায়ুঃ বায়োরুৎপদ্যতেরবিঃ রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী।

প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্য হইতে প্রথমত আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইয়াছে। যখন একমাত্র সূক্ষ্ম আকাশ হইতে অপরাপর ভূত সকল ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়াছে, তখন আকাশের পরবর্ত্তী ভূত চতুষ্টয়কে মিশ্রভিন্ন মৌলিক পদার্থ বলা যাইতে পারে না। বস্তুত শাস্ত্রেও আকাশাদি পদার্থ সকলকে মূল পদার্থ বলা হয় নাই, ভূত মাত্র বলা হইয়াছে এবং

পরবর্ত্তী ভূতে পূর্ব্ববর্ত্তী ভূতের গুণ সকলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। সে স্বীকার কেবল কথার কথা মাত্র নহে। তাহা অমোঘ সত্যরূপে সর্ব্বদা প্রতীয়মান হইয়া থাকে।—

আকাশের শব্দ গুণ বায়াদি ভূত চতুষ্টয়ে, বায়ুর স্পর্শগুণ অগ্ন্যাদি ভূত ত্রয়ে, অগ্নির রূপ জল স্থল উভয় ভূতে এবং জলের রস ক্ষিতিভূতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ পূর্ব্ববর্ত্তী ভূত সকলের গুণ যখন পরবর্ত্তী ভূত সকলে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন পরবর্ত্তী ভূত সকলের উত্তপত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী ভূত সকলের যোগ আছেই আছে। এ কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুত এক পদার্থের যোগে অপর পদার্থের উৎপত্তি হইলে তাহাকে যৌগিক ভিন্ন মৌলিক পদার্থ বলা যাইতে পারে না। অতএব সপ্রমাণ হইতেছে আমাদের শাস্ত্র মতে ভূত শব্দে পৃথক্ পৃথক্ এক একটি বিশুদ্ধ মৌলিক পদার্থ বুঝা যায় না। ভূত বলিলে বৈকারিক সৃষ্টির সমবায়ী কারণ বুঝায়। এবং গুণানুসারে তাহাদের জাতি নির্দ্দেশ হইয়া থাকে প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রেণী বিভাগ অনুসারে গুণের পরিচায়ক ভিন্ন ভূত শব্দের সহিত বিশুদ্ধ বিমিশ্র ভাবের কোন সম্বন্ধ নাই।—

মিল বলিয়াছেন আমরা কোন জড় বস্তু দেখিতে পাই না, কেবল তাহাদের কতকগুলিন গুণ মাত্র অনুভব করিয়া থাকি। বস্তু সকলের গুণ ভিন্ন আর যে কিছুই অনুভবনীয় নহে, ইহা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রেরই মত।

যাহা হউক আমাদের শাস্ত্র মতে সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারায় পঞ্চ আকারে আমাদের বস্তুজ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

যথা; কর্ণের দ্বারায় শব্দ, শব্দ গুণানুসারে যে সকল বস্তুজ্ঞান জন্মিয়া থাকে তাহারাই আকাশ পদবাচ্য। ত্বকের দ্বারায় স্পর্শ, স্পর্শ গুণানুসারে যে সকল বস্তুজ্ঞান জন্মে তৎসমুদয় মরুৎ শব্দের অন্তর্নিবিষ্ট। চক্ষের দ্বারায় রূপ, রূপগুণানুসারে যে সকল বস্তু জ্ঞান জন্মে তাহাদের নাম তেজ। জিহ্বার দ্বারায় রস, রস আস্বাদন দ্বারায় যে সকল বস্তুজ্ঞান জন্মে তাহারাই অপ শব্দে কথিত হয়। নাসিকার দ্বারায় গন্ধ, গন্ধানুসারে যে সকল বস্তুজ্ঞান জন্মে তাহারাই ক্ষিতি বলিয়া পরিগণিত। ঐ পঞ্চভূত পরস্পর

সংমিশ্রিত ও সংমিলিত হইয়া এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব রাজ্যের উৎপত্তি করিয়াছে। এক্ষণে জগতে পদার্থ সংখ্যা পাঁচ, তেষট্টী বা উনআশী, যাহাই বল, কিন্তু শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিধ গুণানুভব ভিন্ন আমরা জগতের অপর কোন তত্ত্ব অবগত নহি। ঐ পঞ্চ গুণানুসারে সমস্ত জড় পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া আমাদের শাস্ত্রে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

এক্ষণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে কি কি গুণানুসারে তেষট্টী ভূত নিরূপণ করা হইয়াছে তাহা তুমি বলিতে পার কি? পৃথক পৃথক তেষট্টী ভূত থাকিলে তাহাদের পৃথক পৃথক তেষট্টী গুণ ও তেষট্টী জ্ঞান ক্ষেত্র এবং তেষট্টী কার্য্যক্ষেত্র থাকা চাই। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিত্‌ পণ্ডিতেরা কদাচই তাহা দেখাইয়া দিতে সক্ষম হইবেন না। তাঁহারা যতই কেন পৃথক পৃথক পদার্থ সকল আবিষ্কার করুন না, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধের অনুভব ব্যতীত অন্য উপায়ে তাহাদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে পারিবেন না।—

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ বাহ্য বস্তু সকলের অনুভবের নিমিত্ত জগদীশ আমাদিগকে পাঁচটি মাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টির নিয়মানুসারে পঞ্চভূতের সত্বাংশে আমাদের দেহে পাঁচটি মাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারায় সমস্ত বাহ্য বস্তুর অনুভব ক্রিয়া অনায়াসে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। যদি বাহ্য বস্তুর সংখ্যা পাঁচের অধিক তেষট্টী বা উনআশী হইত, তাহা হইলে জগদীশ্বর আমাদিগকে তত সংখ্যক জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রদান করিতে পারিতেন। অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর সংখ্যা যত, সৃষ্টির নিয়মানুসারে তাহাদের প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ হইতে আমাদের দেহে এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইতে পারিত। তাহা যখন হয় নাই, তখন বাহ্য বস্তু সকলের আকৃতিগত যতই পার্থক্য থাকুক তাহাদের মূল তত্ত্ব যে, পাঁচের অধিক নয় ইহা নিশ্চয় কথা।—

আবার দেখ ঐ পঞ্চভূতের ক্রম পর্য্যায় কেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার। প্রথমতঃ আকাশ। এক্ষণে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি যে সকল গ্যাস্‌ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহারা আকাশেরই রূপান্তরমাত্র। তজ্জন্য ঐ সকল পদার্থকে স্থূল আকাশ বলা যায়। ঐ স্থূল আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি;

আকাশের অগ্রে কদাচই বায়ুর উৎপত্তি হইতে পারে না বায়ুর পর অগ্নি। বায়ু না থাকিলে অগ্নির অস্তিত্বের কিছুতেই সম্ভবে না। যে হেতু বায়ুর অভাবে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। অগ্নি হইতে জল; ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় যে, অগ্নির অভাবে জল কঠিন প্রস্তরবৎ হইয়া উঠে। অতএব জলের অগ্রে যে অগ্নির উৎপত্তি তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য তাহার পর জল হইতে মৃত্তিকা। জলাভাবে মৃত্তিকার অণু সকল পরস্পর সংমিলিত হইয়া স্থূলাকারে পরিণত হইতে পারে না। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া যায়। অতএব মৃত্তিকার অগ্রে যে জলের উৎপত্তি ইহা ভারতীয় শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

এক্ষণে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়া থাকেন যে কোন অপরিজ্ঞেয় শক্তি হইতে আদিতে ইথরের (আকাশ) উৎপত্তি হইয়াছিল। ইথর বহুকাল পর্য্যন্ত তদাকারে থাকিয়া কালক্রমে বায়ুতে পরে তেজেতে পরিণত হইয়াছিল। তেজও (heated gas) বহুকাল পর্য্যন্ত তদাকারে থাকিয়া তরল পদার্থে পরিণত হইয়াছিল। সেই তরল পদার্থ বহুকাল তদাকারে থাকিয়া পরিণামে কঠিন পদার্থ বা মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছিল; তাহার পর ঐ সকল পদার্থ নানাস্থানে তরল পিণ্ডাকার ধারণা করিয়া কালক্রমে তাহা কঠিন অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিব্যাদি প্রত্যেক জড়পিণ্ডেরই গর্ভস্থল অদ্যাপি সেই তরলাবস্থাতেই আছে।—আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত প্রাচীন সাংখ্য মতের সৃষ্টিতত্ত্বের কিছুমাত্র অনৈক্য নাই।

অপর গুণানুসারেও ভূত সকলের পূর্ব্ববর্ত্তিতা ও পরবর্ত্তিতা কেমন সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আদি ভূত আকাশে (ইথর) একমাত্র শব্দ গুণ। দ্বিতীয় ভূত বায়ুতে শব্দ,স্পর্শ দুইটি গুণ। তৃতীয় ভূত অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ তিনটি গুণ। চতুর্থ ভূত ক্ষিতীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটি গুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শিষ্য। আমি এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তেষট্টি মূল পদার্থ পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ঐ শ্রেণী বিভাগ হিন্দুশাস্ত্রে ভূত শব্দে কথিত হইয়াছে। আর ঐ তেষট্টি মূল পদার্থ বলিয়া যাহা স্থির হইয়াছে তাহারা সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্র হইতেই উৎপন্ন। এবং ভূত শব্দের অর্থও বিশুদ্ধ মূল পদার্থ নহে। এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে ফাক রহিয়াছে তুমি তাহাকে আকাশ বা শূন্য বলিতেছ। কিন্তু আকাশ ও শূন্য একার্থ বোধক শব্দ নহে। শূন্য শব্দে অত্যন্ত অভাব বুঝায়; অভাব কোন বস্তু নহে। সুতরাং অভাবের অস্তিত্ব নাই এবং তাহার কোন গুণ বা ক্রিয়াবিশেষও থাকিতে পারে না। 'অভাব' স্থলে 'নাই' শব্দ ব্যবহার হয় এই পর্য্যন্ত। আর আকাশ শব্দ এরূপ অভাবার্থ বোধক নহে। তাহা ভাব পদার্থ বিশেষ।

প্রাচীন ন্যায় দর্শনে ও আধুনিক বিজ্ঞান মতে যেমন পদার্থ সকলের অতি ক্ষুদ্রাংশকে পরমাণু বলা হয়। সেইরূপ বেদান্ত ও সাংখ্যমতে জাগতিক পদার্থ সকলের অতিশয় সূক্ষ্মাবস্থাকে আকাশ বলে। এক্ষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঐ আকাশকে ইথার বলিয়া বুঝিয়াছেন। যাহা হউক পৃথিব্যাদি জড়পিণ্ড সকলের চতুর্দ্দিকে যে অসীম ফাক অবলোকন করিতেছ, উহা বায়ু, আকাশ এবং স্থান এই তিনটি পদার্থের মিলিত অবস্থামাত্র। তবে বায়ুর অবস্থা সর্ব্বত্রে ঠিক সমান নহে। এবং আকাশ ও বায়ু দুইটি পদার্থ স্থূল ধর্ম্মাক্রান্ত। কিন্তু স্থান সূক্ষ্মধর্ম্মী ও স্থানের পরমাণু নাই।

শিষ্য। ঐ স্থানকেই লোকে সচরাচর শূন্য বলিয়া থাকে। তাহা যে কোন পদার্থ নহে এ কথা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। তবে শূন্য ও আকাশ শব্দ আমরা এক বলিয়া জানিতাম এবং একার্থেই উভয় শব্দের ব্যবহার করিতাম। কিন্তু পদার্থ সকলের অতি সূক্ষ্মাবস্থাকে আকাশ বলে এবং তাহা শূন্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, এ কথা আপনার মুখে আজ নূতন শুনিলাম।

গুরু। শূন্য ও স্থানকে এক বলিতেছ এবং বলিতেছ তাহা কোন পদার্থ নহে। শূন্য নামে কোন পদার্থ নাই সত্য, কিন্তু স্থান পদার্থ নহে এ কিরূপ কথা হইল। মনে কর শূন্য ঘর। শূন্য ঘর বলিলে ঐ ঘরের মধ্যে কোন বস্তু নাই ইহাই বুঝায়। কিন্তু কদাচই ঘরের অভাব বুঝায় না। সেইরূপ শূন্যময় স্থান বলিলে তথায় অপরাপর পদার্থ সকলের অভাব বুঝায়, কদাপি স্থানের অভাব বুঝায় না। সুতরাং শূন্য ও স্থান এক নহে। শূন্য শব্দের অর্থ অত্যন্ত অভাব সে কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। আর স্থান অতি মহান্ পদার্থ বিশেষ। এবং তাহা সমস্ত জগতের আধার। সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা পিণ্ড, ধূমকেতু প্রভৃতি সমস্ত জড়পিণ্ড ঐ

স্থানেতে অবস্থিতি করিতেছে। স্থান না থাকিলে সূর্য্যাদি জড়পিণ্ড ও তুমি আমি সকলে কোথায় অবস্থিতি করিতাম। এমন কি ভাবিয়া দেখ স্থানা ভাবে একটি মাত্র পরমাণুরও অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। অতএব স্থানকে শূন্যের ন্যায় অভাব বলিয়া মনে করিও না। তবে স্থান অতি সূক্ষ্ম এবং তাহাতে জড়ের কোনরূপ স্থূলত্ব লক্ষণ বা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি কোন গুণ নাই। সুতরাং তাহা পদার্থ হইয়াও অন্যান্য পদার্থের ন্যায় ইন্দ্রিয় গোচর নহে।

শিষ্য। স্থানের পরমাণু নাই তজ্জন্য আমি তাহা অভাব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু স্থান অতি সূক্ষ্ম অথচ অভাব নয় তাহা এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এবং অত্যন্ত শূন্য শব্দের অর্থ অত্যন্ত অভাব তাহাও বুঝিয়াছি। কিন্তু জড়ের ক্ষুদ্রাংশই হউক আর সূক্ষ্মাংশই হউক তাহাকে পরমাণু না বলিয়া আকাশ বলিবার তাৎপর্য্য কি? আমি ত বিবেচনা করি আকাশ শব্দের পরিবর্ত্তে পরমাণু শব্দ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

পদার্থ সকলে ক্ষুদ্রাংশও সূক্ষ্মাবস্থা বস্তুত এক হইলেও তাহাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। সুতরাং পদার্থ সকলের ক্ষুদ্রাংশের নাম পরমাণু ও সূক্ষ্মাবস্থার নাম আকাশ বলাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

খণ্ডীকৃত পরিশুষ্ক কাষ্ঠের এক মুখ অগ্নিতে প্রদান করিলে ক্রম তাহা দগ্ধ হইতে হইতে ঐ কাষ্ঠ খণ্ডের অপর মুখ দিয়া ফেনাকারে জল বাহির হইয়া পড়ে, তাহা কি তুমি কখন দেখিয়াছ?

শিষ্য। হাঁ দেখিয়াছি।

গুরু। আচ্ছা বল দেখি ঐ জল কাষ্ঠ মধ্যে কিরূপ অবস্থায় ছিল?

শিষ্য। কেন পরমাণু অবস্থায় ছিল।

গুরু। পদার্থ সকলের যে সকল ক্ষুদ্রাংশের আর অংশ হয় না তাহাকেই পরমাণু বলে। পরমাণু শব্দে দুইটি, চারিটি, বা দশ, বিশটি অংশ বুঝায় না। একটি মাত্র অংশ বুঝায়। এক্ষণে জিজ্ঞাসা কি বল দেখি কাষ্ঠ মধ্যে জলের একটি মাত্র অংশ ছিল, কি অনেক অংশ ছিল?

শিষ্য। একটি কেন থাকিবে, কাষ্ঠ মধ্যে সমষ্টিভাবে অনেক পরমাণু ছিল। একটি পরমাণুতেত আর জলের আকার ধারণ করিতে পারে না।

গুরু। ঐ সকল অংশ অতি ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়া এক একটি পৃথক

পৃথক ভাবে ছিল? কিম্বা অবিচ্ছিন্ন ভাবে জলের অংশ সকল কাষ্ঠের সমস্ত অংশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল?

শিষ্য। ঐ জল কাষ্ঠের কোন অংশে ছিল, আর কোন অংশে ছিল না,—এমন নহে। সুতরাং কাষ্ঠ মধ্যে জলাংশ সকল পৃথক পৃথক ভাবে না থাকিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবেই কাষ্ঠের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিব। কিন্তু জল সে অবস্থায় থাকিলে যখন আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয় না। তখন তাহা যে পরমাণুর আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গুরু। এস্থলে তুমি একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ, কাষ্ঠের সর্ব্বাংশে জলের ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কাষ্ঠ মধ্যে অবস্থিতি কালে জল পৃথক পৃথক এক একটি অংশে বিভক্ত হইয়া পরমাণুর আকার ধারণ করিয়াছিল না। বহুলাংশ জল অবিচ্ছিন্ন ভাবে অতি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর আকার ধারণ করিয়াছিল। ঐরূপ প্রসারিত সূক্ষ্মাবস্থাকে বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনে আকাশ বলে। আকাশ এক একটি পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত হইলে পরমাণু হইয়া যায়। কিন্তু তাহা তাহার স্বাভাবিক অবস্থা নহে, মিলিতাবস্থাই স্বাভাবিক। এই জন্য জড়ের অবিচ্ছিন্ন সূক্ষ্মাবস্থাকে পরমাণু না বলিয়া আকাশ বলাই সঙ্গত। কিন্তু আকাশও পরমাণুর ন্যায় অদৃশ্য বস্তু অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। তবে আকাশ অবিচ্ছিন্ন, পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন এই মাত্র বিশেষ।

শিষ্য। আপনি পরিশুষ্ক কাষ্ঠ মধ্যে জলের অবিচ্ছিন্ন যে সূক্ষ্ম অবস্থা দেখাইতেছেন, কাষ্ঠের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক কাষ্ঠের শতগুণ বা সহস্র গুণ স্থানেতে তাহার প্রসারিত ভাব কল্পনা করিয়া দেখুন, সমস্ত জলাংশ পরমাণুর আকার ধারণ করিবে। সে অবস্থাকে আকাশ না বলিয়া পরমাণুর বলিতেই হইবে।

গুরু। কাষ্ঠ মধ্যস্থিত জলভাগ কাষ্ঠের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রসারিত হইয়া যখন প্রসারণের চরম সীমায় গিয়া উপনীত হইবে তখনও তাহার আকাশত্ব ভাবের কোন অন্যথা ঘটিবে না। তাহার পর আরও বহু গুণে প্রসারিত করিলে অবশ্য তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। সেই বিচ্ছিন্ন

অবস্থায় আকাশের প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথক আকারে পরিণত হইলে তুমি তাহাকে পরমাণু বলিতে পার, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সেই সকল পরমাণুকে খণ্ডাকাশ বা ছিন্নাকাশ বলিবার অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। এস্থলে আর একটি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ, পরমাণু সকলের আকর্ষণ শক্তি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বে তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিতে পারে না। অবশ্যই মিলিত হইয়া থাকে। সেই মিলিত অবস্থায় যে পর্য্যন্ত ঘন হইয়া জমাট না বান্ধে, কেবল পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ মাত্র করিয়া থাকে, সেই পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আকাশ বলা যায়। আর সৃষ্টির আদিতে পরমাণু সকল যে আকাশ রূপধারণ করিয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অনেকের পরমাণুবাদীরা বলিয়া থাকেন, জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের উপাদান সকল পরমাণু অবস্থায় ছিল। কিন্তু যে শক্তি প্রভাবে পরমাণু সকলের উৎপত্তি সেই অনাদি অনন্তশক্তি সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বে পরমাণু সকল পৃথক পৃথক ভাবে উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ যে যে স্থানে পরমাণুর উৎপত্তি, সেই সেই স্থানে শক্তি সক্রিয়, আর উভয় পরমাণুর মধ্যগত যে ব্যবধান স্থান, সেই ব্যবধান স্থলে শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকিবে এ কথা কদাচই যুক্তি সঙ্গত নহে। শক্তি সক্রিয় হইলে সর্ব্বত্রই সক্রিয় হইবে। এবং সর্ব্বত্রে পরমাণু সকল উৎপন্ন হইলে তাহাদের পার্থক্য ভাব ঘুচিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া থাকিবে। পরমাণুর মিলিত অবস্থাকে আকাশ বলাই যুক্তি সঙ্গত। অতএব সাংখ্য ও বেদান্ত যে যুক্তি অনুসারে পরমাণুর পরিবর্ত্তে আকাশ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রসংশনীয়।

শক্তির তাড়নায় ঐ আকাশ ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রথমত বায়ু এবং পর পর অগ্নি, জল ও মৃত্তিকার উৎপত্তি, করিয়া থাকে। মৃত্তিকার অগ্রে জল, জলের অগ্রে অগ্নি, অগ্নির অগ্রে বায়ু, বায়ুর অগ্রে আকাশ—এ কথা বার বার বলা হইয়াছে। এস্থলে উত্তর গীতার একটি বচন শ্রবণ কর।

"আকাশ হ্যবকাশশ্চ আকাশেব্যাপিতঞ্চ যৎ।
আকাশস্য গুণঃ শব্দো নিঃশব্দ ব্রহ্ম উচ্যতে॥"

এই বচনটিতে আকাশের ব্যাপ্তি আছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বাস্তবিক আকাশ যদি ব্যাপনশীল পদার্থ বিশেষ না হইয়া কেবল শূন্য মাত্র হইত, তবে তাহার ব্যাপ্তি ও শব্দ গুণের এবং তাহা হইতে বায়ু আদি পদার্থ সকলের উৎপত্তি,--কদাচই শাস্ত্রে এরূপ কথার উল্লেখ থাকিত না।

জড় পরমাণু সকলের ঘাত প্রতিঘাতেই শব্দের উৎপত্তি। তজ্জন্য জড়ের অতি সূক্ষ্মাবস্থা আকাশ হইতে অতি স্থূল মৃত্তিকা পর্য্যন্ত সকল পদার্থেই শব্দ গুণের অস্তিত্ব রহিয়াছে। তাহা একমাত্র আকাশ বা বায়ুর গুণ নহে, তবে অন্যান্য ভূত চতুষ্টয়ে একমাত্র শব্দগুণ ভিন্ন যেমন অপরাপর গুণ সকল বর্ত্তমান আছে, আকাশে তাহা নাই। তজ্জন্য নির্দ্দিষ্টরূপে একমাত্র শব্দই আকাশের গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

শিষ্য। আমি যখন আকাশকে শূন্য অর্থাৎ কোন বস্তু নয় বলিয়া জানিতাম, তখন তাহার কোন গুণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। এক্ষণে আকাশকে জড় বস্তু সকলের অতি সূক্ষ্ম প্রসারিত অবস্থা বা পরমাণু সকলের মিলিত অবস্থা বলিয়া বুঝিয়াছি। এবং পরমাণুর সকলের ঘাত প্রতিঘাতেই যে শব্দের উৎপত্তি ইহা নিশ্চয় কথা। সুতরাং আকাশের গুণ শব্দ, এ কথায় আমার আর কোন আপত্তি নাই; আর শব্দের কারণ যে ঘাত প্রতিঘাত তাহা বায়ুশূন্য স্থানেও হইতে পারে। কিন্তু বায়ুশূন্য স্থানে বস্তুর সকলের ঘাত প্রতিঘাত সত্ত্বেও কোনরূপ শব্দ কর্ণগোচর হয় না কেন? তাহার কারণ কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না।

গুরু। কর্ণের বিষয় শব্দ। সুতরাং একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয় (কর্ণ) ভিন্ন, অপর জ্ঞানেন্দ্রিয় চতুষ্টয় শব্দ জ্ঞানের অধিকারী নহে। আর ঐ শব্দ আসিয়া বিশুদ্ধ (রোগহীন) কর্ণ পটহকে স্পর্শ ও কিয়ৎ পরিমাণে আঘাতিত না করিলে আমাদের শব্দ জ্ঞান জন্মে না। কিন্তু তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি আকাশ ও আকাশের গুণ শব্দ তন্মাত্র উভয়ই স্পর্শ গুণের অতীত। যাহা স্পর্শ গুণের অতীত, তাহা স্বয়ং সিদ্ধরূপে কোন বস্তুকে স্পর্শ করিয়া স্পর্শজ্ঞান জন্মাইয়া দিতে পারে না। ফলত শব্দের উৎপত্তির পর তাহা বায়ুর সহিত সংমিশ্রিত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে স্পর্শ-গুণ-বিশিষ্ট হয়। এবং বায়ুর সাহায্যে তাহা পরিচালিত হইয়া বিশুদ্ধ কর্ণপটহকে আঘাতিত করে। তাহার পর আমাদের শব্দজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এই

জন্য আমাদের শাস্ত্রে শব্দবহ বলিয়া বায়ুর একটি নামকরণ করা হইয়াছে।

বায়ুশূন্য স্থানে শব্দ স্পর্শ গুণ প্রাপ্ত হয় না এবং বায়ুর অভাবে তাহা পরিচালিত না হওয়ায় আমাদের কর্ণপটহে আসিয়া উপনীত হইতে পারে না। সুতরাং বায়ুশূন্য স্থানে শব্দের উৎপত্তি সত্ত্বেও তাহা আমাদের অনুভবে আইসে না। ইহার পরীক্ষার নিমিত্ত তুমি কোন বায়ুপূর্ণ ঘরের ভিতর বসিয়া তাহার দ্বার সকল অবরুদ্ধ কর। এবং ঘরের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর সহিত বহিস্থ বায়ুর কোন আকারে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দাও। তাহার পর তুমি ঐ ঘরের ভিতর বসিয়া মহাশব্দ করিতে থাক; সে শব্দ তুমি অবশ্যই শুনিতে পাইবে; কিন্তু বহিস্থ বায়ু-মধ্য স্থিত ব্যক্তিবর্গের সে শব্দ কিছুতেই কর্ণগোচর হইবে না। সেইরূপ আবার বহিস্থ লোকেরাও কোন শব্দ করিলে তাহারা অনায়াসে শুনিবে। কিন্তু বায়ু বিচ্ছেদহেতু তুমি তাহা কিছুতেই শুনিতে পাইবে না।

এ স্থলে শব্দের উৎপত্তি হয় নাই এমন কথা কেহ বলিতে পারিবেন না। উভয় স্থলে যে শব্দ হয় তাহা অমোঘ সত্য। কিন্তু মধ্যে বায়ু বিচ্ছেদহেতু সেই শব্দ এক পক্ষ ব্যতীত উভয় পক্ষ শুনিতে পায় না। এই ঘটনাদৃষ্টে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে যে, বায়ুশূন্য স্থানে বস্তু সকলের ঘাত প্রতিঘাতে (ঘণ্টা বাজনা ইত্যাদি) কোনরূপ শব্দ যে শুনিতে পাওয়া যায় না; শব্দের অনুৎপত্তি তাহার কারণ নহে। বায়ু বিচ্ছেদই তাহার একমাত্র কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিষ্য। শব্দ গুণ সকল ভূতে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা যে নির্দ্দিষ্টরূপে একমাত্র আকাশেরই গুণ, তাহা এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিলাম।

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। | কার্ত্তিক ১২৯৪। | ৪র্থ সংখ্যা।

হিন্দু বিবাহ।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ। মুক্তিলাভের অর্থ মায়া মোহ প্রভৃতি নষ্ট করিয়া বিশুদ্ধ চিন্ময় ও আনন্দময় আত্মার স্বরূপ দর্শন। সেই স্বরূপ দর্শনেই পরমাত্মা দর্শন হয়। মানুষ যত দিন বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের অধীন থাকিয়া কাম-ক্রোধাদির বশবর্ত্তী থাকে এবং হৃদয়ে বিষয় বাসনা, ভোগ বাসনা প্রভৃতি বাসনা ও কামনা পোষণ করে ততদিন তাহার আত্মা মোহাচ্ছন্ন থাকে, তত দিন তাহার আত্মার স্বাধীনতা থাকে না, তত দিন তাহার আত্মাকে সে দেখিতে পায় না। মানুষ সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি দমন করিয়া সমস্ত ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া এবং সমস্ত সাংসারিক মায়া খণ্ডন করিয়া আত্মার মায়াময় আবরণ উন্মোচন করিলে পর তবে আত্মার স্বরূপ দেখিতে পায় এবং স্বরূপ আত্মায় পরমাত্মা দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করে। অতএব মানুষের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য যে মুক্তি সেই মুক্তি, লাভার্থ আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন করা একান্ত আবশ্যক। আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন করার অর্থ আত্মার যে মায়াময় আবরণ আছে তাহা বিনষ্ট করা। আত্মার এই যে মায়াময় আবরণ ইহার উৎপত্তি মানুষের জড় প্রকৃতি হইতে। মানুষ যে কামক্রোধাদি রিপু কর্ত্তৃক তাড়িত হয় এবং ভোগবাসনা প্রভৃতির বশীভূত হয় তাহার কারণ এই যে মানুষ কেবল মাত্র চিন্ময় আত্মা নয়, মানুষে জড় প্রকৃতিও আছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট জড় দেহও আছে। অতএব মুক্তিলাভার্থ আত্মার স্বাধীনতা

সম্পাদন করিবার জন্য ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট জড় প্রকৃতি দমন করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু মনুষ্যের জড় প্রকৃতি বড়ই প্রবল। মনুষ্যের পার্থিব বাসনা বড়ই বেগবতী। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদি বড়ই দুর্দ্দমনীয়। এ হেন জড় প্রকৃতি জয় করা বিশেষ আয়াস সাধ্য প্রতিনিয়ত স্বার্থত্যাগ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং সংযম ব্যতীত এ হেন জড় প্রকৃতি জয় করা অসম্ভব। এক দিন দুই দিন কি একমাস দুই মাস স্বার্থত্যাগে, ইন্দ্রিয় নিগ্রহে বা সংযমে এ হেন জড় প্রকৃতি জয় করা যায় না। সমস্ত জীবন, হয় ত জন্ম জন্মান্তর, স্বার্থত্যাগ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও সংযম সাধন করিলে তবে এ হেন জড় প্রকৃতি জয় করিতে পারা যায়। এই জন্য গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া হিন্দুকে প্রতিদিন সংযত হইয়া দেবপূজা, পিতৃ শ্রাদ্ধ, অতিথি সেবা, ভূতপালন প্রভৃতি পাঁচটি মহাযজ্ঞ করিতে হয় এবং সর্ব্বদাই যাগ যজ্ঞ ব্রত প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়। এই সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে সংযম আবশ্যক, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আবশ্যক, স্বার্থত্যাগ আবশ্যক, ভোগস্পৃহা পরিহার আবশ্যক। সংযমাদি ব্যতীত এই সকল কর্ম্ম করা যায় না। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা বলেন যে গৃহস্থ পঞ্চ মহাযজ্ঞ বা বলিকর্ম্ম শেষ করিয়া যজ্ঞের যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিবে তাহা সস্ত্রীক ভোজন করিবে। অর্থাৎ দেব পূজা, পিতৃশ্রাদ্ধ অতিথি সেবা পশু পক্ষী কৃমিকীট প্রভৃতির জন্য যে অন্ন প্রস্তুত হয় তদ্দ্বারা ঐ সকলের বলি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া গৃহের সমস্তব্যক্তি এবং ভৃত্যাদিকে পর্য্যন্ত ভোজন করাইয়া সর্ব্বশেষে অবশিষ্ট অন্ন সস্ত্রীক ভোজন করিবে। না করিলে সস্ত্রীক মহাপাপে লিপ্ত হইবে। হিন্দুর নিত্য কর্ম্মে স্বার্থত্যাগ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ভোগস্পৃহা পরিহার এবং সংযম কত আবশ্যক, তাহা এই একটি মাত্র বিধান দৃষ্টেই বুঝিতে পারা যায়। যাঁহাকে এইরূপ বিধানানুসারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় তাঁহার বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত সুকোমল শয্যায় পড়িয়া গড়াগড়ি দেওয়া চলে না, শয্যাত্যাগ করিয়া দুগ্ধ শর্করা মিশ্রিত সুগন্ধ চার পিয়ালা এবং অর্দ্ধসিদ্ধ পক্ষীডিম্ব উদরস্থ করা চলে না, সকলের অগ্রে স্বয়ং বৃহৎ রোহিত মৎস্যের মুণ্ড ভক্ষণ করিয়া ভোগস্পৃহা পরিতৃপ্ত করা চলে না। এবং এই সকল নিত্য কর্ম্ম করিতে নিয়তই কত যে নিষ্ঠা একাগ্রতা ও অধ্যবসায় আবশ্যক তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আবার এই

সকল নিত্য কর্ম্ম করিবার জন্য সংযমাদি যেমন আবশ্যক, এই সকল নিত্য-কর্ম্ম করিতে করিতে সংযমাদি করিবার শক্তি ও তেমনি বাড়িতে থাকে। কারণ অভ্যাসে সকল শক্তিই বৃদ্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত হিন্দুর নৈমিত্তিক কর্ম্ম আছে। বিশেষ বিশেষ ব্রত বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ, বিশেষ বিশেষ পূজা নৈমিত্তিক কর্ম্মের অন্তর্গত। নিত্য কর্ম্মের ন্যায় নৈমিত্তিক কর্ম্মেও সংযমাদি আবশ্যক। অতএব নিত্য ও নৈমিত্তিক উভয় প্রকার কর্ম্মের দ্বারাই সংযমাদি করিবার শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জড় প্রকৃতি পরাস্ত হইয়া আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদিত হয় অর্থাৎ মানুষ আপনার আত্মাকে চিনিতে পাবে অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তিলাভের উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইজন্য বেদান্ত সূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের ষড়বিংশ সূত্র—‘সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি শ্রুতের শ্ববৎ” ইহার ভাষ্যে বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে আশ্রম কর্ম্মের (অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে যে কর্ম্ম করা যায় সেই কর্ম্মের) অপেক্ষা (অর্থাৎ আবশ্যকতা) আছে কিনা এই প্রশ্নের মীমাংসায় স্বয়ং ভগবান শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন যে “উৎপন্না হি বিদ্যা ফলসিদ্ধিং প্রতি ন কিঞ্চিৎ অন্যৎ অপেক্ষতে উৎপত্তিং প্রতি ত্বপেক্ষ’ত,” অর্থাৎ বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর ফলসিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তির প্রতি অন্য কিছুই অপেক্ষা করে না, কিন্তু নিজের উৎপত্তির প্রতি অপেক্ষা করে। কি অপেক্ষা করে? না, যজ্ঞাদি আশ্রম কর্ম্ম। “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা” ইত্যাদি শ্রুতি অর্থাৎ বেদবচন দ্বারা বিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে যজ্ঞাদি আশ্রম কর্ম্ম যে অপেক্ষিত বা আবশ্যক তাহা প্রমাণ হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে যজ্ঞাদি আশ্রম কর্ম্ম যে অপেক্ষিত বা আবশ্যক তাহা প্রমাণ হয়। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান একবার উৎপন্ন হইলে মুক্তিলাভের নিমিত্ত আর কিছুই আবশ্যক হয় না। কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি আইসে সেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পক্ষে দান পূজা যাগ যজ্ঞাদি আশ্রম কর্ম্ম আবশ্যক। অর্থাৎ আশ্রম কর্ম্ম না করিলে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সাংখ্যকারের ও এইমত। সাংখ্য প্রবচনের তৃতীয়াধ্যায়ের পঞ্চবিংশ সূত্র—

“নিয়তকারণত্বাৎ ন সমুচ্চয় বিকল্পৌ”

ইহার ভাষ্যে পরমজ্ঞানী বিজ্ঞানভিক্ষু কহিয়াছেন, "কর্ম্মণো ন সাক্ষাত মোক্ষ হেতুত্ব সমুচ্চয়ানুষ্ঠানং শ্রুতিষঙ্গাঙ্গিভাবাদিভিরভ্যুপ পদ্যতে," অর্থাৎ কর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোক্ষের হেতু নয় কিন্তু অঙ্গাঙ্গিভাবে কর্ম্ম যে মোক্ষের হেতু ইহা শ্রুতিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে ফল কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা যায় তদ্দ্বারা স্বর্গাদি ফল লাভ হয় বটে কিন্তু মুক্তির পক্ষে অন্তরায় বা ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু একটি কথা আছে। মানুষ যখন কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে তখন ফলকামনা করিয়া কর্ম্ম করে সত্য। কিন্তু কর্ম্মের জন্য যে সংযম স্বার্থত্যাগ ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি আবশ্যক যত্ন ও একাগ্রতা সহকারে তাহা অভ্যাস করিতে থাকিলে, জড় প্রকৃতি হীনবল হইয়া আত্মা যত ফুটিতে থাকে কর্ম্মীর ফল কামনা তত কমিয়া কমিয়া শেষে একেবারে অদৃশ্য হয় অর্থাৎ সকাম কর্ম্ম অবশেষে নিষ্কাম হইয়া পড়ে। বালক যখন প্রথম পাঠারম্ভ করে তখন তাহাকে পুরস্কার ভাল কাপড় এবং মিষ্টান্নাদির লোভ দেখাইয়া পড়াইতে হয়। কিন্তু মিষ্টান্নাদির লোভে পড়িতে পড়িতে বালকের ক্রমে বিদ্যানুরাগ জন্মে এবং তখন সে পুরস্কারাদির অপেক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র বিদ্যানুরাগ বলে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকে। মানুষও সেইরূপ ফললোভে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়া কর্ম্মের জন্য সংযমাদি সাধন করিয়া ক্রমে জড় প্রকৃতি পরাজয় করত কামনাশূন্য হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাকে। এবং কর্ম্ম নিষ্কাম হইলে মুক্তিলাভ হয়। যোগ সূত্রের প্রথমাধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ সূত্র—"ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রে ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে বিশিষ্ট উপাস্য দ্বারা অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম ফল ঈশ্বরে অর্পণ দ্বারাও মুক্তি হয়।

অন্যান্য দর্শনেও এই কথা বলে। কেন বলে, তাহাও কিঞ্চিৎ বুঝাইলাম। এক্ষণে বোধ হয় বলিতে পারি যে হিন্দু শাস্ত্রমতে মানুষের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য যে মুক্তি তাহা লাভ করিবার জন্য আশ্রম কর্ম্ম অপরিহার্য্য অর্থাৎ নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মুক্তিলাভ বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারার্থে যে আশ্রম কর্ম্ম এতই আবশ্যক সেই আশ্রমকর্ম্ম বিবাহ ব্যতীত অর্থাৎ সস্ত্রীক না হইয়া সম্পাদন করা যায় না। মনু বলেন—

বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্ব্বীত গৃহ্যং কর্ম্ম যথাবিধি।
পঞ্চযজ্ঞ বিধানঞ্চ পক্তিঞ্চান্বাহিকীং গৃহী॥ (৩—৬৭

গৃহস্থ ব্যক্তি দৈনিক হোমকার্য্য, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং দৈনিক পাকক্রিয়া বৈবাহিক অগ্নিতেই সম্পাদন করিবে।

এবং বৈবাহিক অগ্নি ভিন্ন গৃহস্থের দৈনিক হোমকার্য্য এবং পঞ্চ মহা-যজ্ঞাদি হয় না বলিয়া মনু আর এক স্থলে বলিয়াছেন—

ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দ্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেবচ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বমৃতা ভার্য্যার দাহকর্ম্ম সমাধা করিয়া পুরুষ পুনর্ব্বার স্ত্রী ও শ্রৌত অগ্নি গ্রহণ করিবেন। হোম এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির প্রধান উদ্দেশ্য আত্মার মঙ্গলসাধন, মানবের পারত্রিক সদ্গতি। অতএব রবীন্দ্র বাবু যে বলেন 'এখানে সংসারধর্ম্মের প্রতিই মনুর লক্ষ্য দেখা যাইতেছে' তাহা ঠিক নয়।

এবং মহামুনি কশ্যপ বলেন*—

দারাধীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
দারান্ সর্ব্ব প্রযত্নেন বিশুদ্ধানুদ্বহেত্ততঃ॥

গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না, বিশে-ষতঃ ব্রাহ্মণ জাতির। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে নির্দ্দোষা কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে।

গোভিল গৃহ্য সূত্রের প্রথম প্রপাঠকের চতুর্থ কাণ্ডের অষ্টাদশ সূত্র—"ইতি গৃহমেধি ব্রতম্" ইহার ভাষ্যে কথিত হইয়াছে—"ইত্যেবমহরহঃ পঞ্চানাং মহাযজ্ঞানামনুষ্ঠানম্ গৃহমেধিব্রতম্, গৃহে যযোর্মেধো যজ্ঞোভবতি, তাবিমৌ গৃহমেধিনৌ দম্পতী—ইতি ক্রমঃ। তয়োর্গৃহমেধিনোর্দম্পত্যো ব্রতং শাস্ত্রবিহিতোনিয়ম ইত্যর্থঃ।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন দ্বারা মুক্তি লাভার্থ যে আশ্রম কর্ম্ম আবশ্যক সস্ত্রীক না হইয়া তাহা সম্পন্ন করা যায় না। অতএব এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতেছে যে হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক, সাংসারিক বা পার্থিব নয়। রবীন্দ্র বাবু বলেন যে

---

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তক, ১৭২ পৃষ্ঠা।

"হিন্দুদের বানপ্রস্থকে আধ্যাত্মিক বলা যাইতে পারে। কারণ তাহা প্রকৃত পক্ষে আত্মার মুক্তিসাধন উপলক্ষেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে।" কিন্তু দেখা গেল যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্য ও মুক্তিসাধন। অতএব রবীন্দ্র বাবু আধ্যাত্মিক শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন সেই অর্থে হিন্দুবিবাহ এবং গৃহস্থাশ্রম ও আধ্যাত্মিক। ফল কথা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে হিন্দুর জীবন যে চারিটি আশ্রমে বিভক্ত, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস, সেই চারিটি আশ্রমই মুক্তির পথের চারিটি অগ্রপশ্চাৎ সোপান মাত্র। সেই চারিটি সোপান পরস্পর সংলগ্ন, তন্মধ্যে কোন একটিকে অপর গুলি হইতে পৃথক করিয়া লইলে মুক্তির পথে হানা পড়িয়া যায়। জন্ম গ্রহণ করিবার পর হইতেই হিন্দুকে মুক্তির পথে প্রবেশ করিতে হয়। সেই জন্য হিন্দু পাঠদ্দশায়ও ব্রহ্মচারী, গৃহস্থাশ্রমেও ব্রহ্মচারী। অতএব হিন্দুর গৃহস্থাশ্রমকে হিন্দুর বানপ্রস্থ হইতে পৃথক করিবার যো নাই। এবং হিন্দুর বানপ্রস্থকে যদি আধ্যাত্মিক বলা যাইতে পারে তবে হিন্দুর গৃহস্থাশ্রমকেও আধ্যাত্মিক না বলিলে চলে না। তাই বলিতেছি যে হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক, সাংসারিক বা পার্থিব নয়। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় যে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক অন্য কাহারো বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক নয়। খ্রীষ্টানের বাইবেল বল, মুসলমানের কোরাণ বল, ব্রাহ্মের সহজ জ্ঞান বল, কিছুতেই এমন কথা বলে না যে সস্ত্রীক না হইয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিবার যো নাই। খ্রীষ্টান স্ত্রী লইয়া গির্জ্জায় এবং ব্রাহ্মও স্ত্রী লইয়া সমাজমন্দিরে যান বটে, কিন্তু সেটা তাঁহাদের স্বেচ্ছামাত্র। এ সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম সস্ত্রীক না করিলেও তাঁহাদের ধর্ম্মচর্য্যার ব্যাঘাত বা হানি হয় না। কিন্তু সস্ত্রীক না হইয়া হিন্দুর ধর্ম্মচর্য্যা একেবারেই হয় না। এবং সেই জন্য সীতা যখন বনে তখন রামচন্দ্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে সীতার স্বর্ণময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল নতুবা তাঁহার যজ্ঞ হইত না। এবং সেই জন্যই এখনো যেখানে হিন্দুর ধর্ম্মজ্ঞান একেবারে লোপ হয় নাই সেখানে পতি পত্নীকে একত্রে দীক্ষিত হইতে, একত্রে উপবাস করিতে, একত্রে বারব্রত করিতে, একত্রে যাগযজ্ঞ করিতে, একত্রে তীর্থ দর্শন করিতে দেখা যায়। অতএব পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুর বিবাহ প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিক, অপরে আপন আপন বিবাহ

আধ্যাত্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও তাঁহাদের বিবাহ কথায় আধ্যাত্মিক বটে, কাজে নয়। মানব জীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য যে মুক্তি সেই মুক্তিলাভ সম্বন্ধে হিন্দু পুরুষ এবং হিন্দু স্ত্রী দুই জনে একজন—হিন্দু পুরুষ ব্যতীত হিন্দু স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব নাই অতএব তাহার কর্ম্মও নাই, পারত্রিক গতিও নাই, এবং হিন্দু স্ত্রী ব্যতীত হিন্দু পুরুষেরও ব্যক্তিত্ব নাই, অতএব তাহার কর্ম্মও নাই' পারত্রিক গতিও নাই। হিন্দু পুরুষ ও হিন্দু স্ত্রী পরস্পরের অংশ, পরস্পরের উপাদান, পরস্পরের ধর্ম্মশরীরের অঙ্গাঙ্গ, পরস্পরের ধর্ম্মজীবনের জীবনীশক্তি, পরস্পরের মুক্তির কারণ। দেহের জীবন সম্বন্ধে হৃৎপিণ্ডের সহিত শ্বাস যন্ত্রের এবং শ্বাসযন্ত্রের সহিত হৃৎপিণ্ডের যে রকম সম্বন্ধ, মুক্তিলাভ সম্বন্ধে হিন্দু পুরুষের সহিত হিন্দু স্ত্রীর এবং হিন্দু স্ত্রীর সহিত হিন্দু পুরুষের সেই রকম সম্বন্ধ। ইংরাজ বল, ফরাসী বল, খৃষ্টান বল, মুসলমান বল, ব্রাহ্ম বল, আর কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ একেবারেই এমন অঙ্গাঙ্গ-ভাবের অর্থাৎ organic, consti tutional এবং functional রকমের নয়।

হিন্দু পুরুষ ও হিন্দু স্ত্রীর মধ্যে এ রকম অঙ্গাঙ্গভাবের সম্বন্ধ নিরূপিত হইবার একটি মাত্র কারণ অতি সংক্ষেপে এ স্থলে নির্দ্দেশ করিব। সমস্ত জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়—এক ভাগ পুরুষ আর এক ভাগ স্ত্রী। এই দুই ভাগ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নয়—পরস্পরের অধীন বা সাপেক্ষ। দুইয়ের সংযোগ ও সম্মিলন ব্যতীত কাহারই অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না। অতএব পুরুষ বল স্ত্রী বল কেহই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়—দুইয়ে মিলিয়া সম্পূর্ণ হয়। অর্থাৎ পুরুষ নিজেও ১ নয় স্ত্রী নিজেও ১ নয়, পুরুষওস্ত্রী সংযুক্ত হইয়া ১ হয়। এই জন্য পুংজগৎ ও স্ত্রী জগৎ বলিয়া দুইটি স্বতন্ত্র জগৎ আছে এমন কথা কোন দর্শনে, বিজ্ঞানে বা শাস্ত্রে বলে না। পুং জগৎ ও স্ত্রী জগৎ দুইয়ে মিলিয়া একটি জগৎ এই কথাই সকলে বলে। এ কথা না বলিলেও চলে না। পুং জগৎ এবং স্ত্রী জগৎ দুই জগৎই সেই এক পরমব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত। অতএব পুং জগৎ ও স্ত্রী জগৎ দুইটি স্বতন্ত্র জগৎ নয়, কারণ দুই একে থাকে না এবং এক হইতে যাহা যাহা উদ্ভূত হয় তাহা সেই একের অধিক হইতে পারে না—সে সমস্ত সেই একের পরস্পর-সাপেক্ষ অংশ মাত্র, অতএব সকলে মিলিয়া এক। এই জন্য নর নারী সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে বলে যে "নারায়ণ বা ব্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়া-

ছেন। বিবাহের পর আবার সেই দুই শরীর এক হইয়া যায়।" অতএব স্ত্রী এবং পুরুষ যদি একের পরস্পর-সাপেক্ষ অংশই হইল তবে সে সাপেক্ষতাও আংশিক হইতে পারে না, উভয়ের যতদূর বিস্তার সে সাপেক্ষতাও ততদূর হইবে। উদ্ভিদের জনন ক্রিয়া পর্য্যন্ত আছে। অতএব জননক্রিয়া পর্য্যন্ত পুং উদ্ভিদ ও স্ত্রী উদ্ভিদ পরস্পরের সাপেক্ষ দেখা যায়। পশু পক্ষীর জনন স্পৃহা ছাড়া অপত্য স্নেহ পর্য্যন্ত আছে। তাই পশু পক্ষীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষের যোগ বা সাপেক্ষতা কেবলমাত্র জনন ক্রিয়ায় পর্য্যবসিত না হইয়া অনেকস্থলে অপত্যপালন পর্য্যন্ত থাকিতে দেখা যায়। মানুষের ধর্ম্মবৃত্তি পর্য্যন্ত আছে। অতএব পুং মানুষ ও স্ত্রী মানুষ ধর্ম্মচর্য্যা পর্য্যন্ত পরস্পরের সাপেক্ষ না হইলে চলিবে কেন? এই জন্য হিন্দু শাস্ত্রানুসারে স্ত্রী ও পুরুষ বিবাহ দ্বারা এক এবং একত্র না হইলে ধর্ম্মচর্য্যা হয় না। হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যায় যে কথা বলে হিন্দুর ক্রিয়া কর্ম্মে আচার অনুষ্ঠানে সেই কথারই প্রয়োগ ও সার্থকতা থাকে। তত্ত্ববিদ্যায় এবং আচার অনুষ্ঠানে এমন মিল আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মিল হিন্দু এবং অপরাপর জাতির মধ্যে একটি বিষম প্রভেদের কারণ। এবং সেই জন্য অপরাপর জাতি হিন্দুকে বুঝিতে পারে না।

সস্ত্রীক না হইয়া ধর্ম্মচর্য্যা হয় না হিন্দু শাস্ত্রের এই বিধানের মর্ম্ম এখন বোধ হয় কতক কতক বুঝা গেল। ইহার মর্ম্ম এই যে মানব জীবনের এত বড় উদ্দেশ্য যে মুক্তি তাহা লাভ করিতে হইলে স্ত্রী ভিন্ন গতি নাই। অতএব এখন নির্ভয়ে বলিতে পারি যে পুরুষ সম্বন্ধে স্ত্রীর পদ হিন্দুর মধ্যে প্রকৃত পক্ষে যেমন সম্মানের ও গৌরবের কি খ্রীষ্টান কি মুসলমান কি ব্রাহ্ম কাহারও মধ্যে তেমন নয়। হিন্দু কেবল etiquette দুরন্ত নয়। তাই আজ স্ত্রীর জন্য হিন্দুকে এত কথা শুনিতে হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা গেল তাহাতে তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে। প্রথম—হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক। দ্বিতীয়—হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্ত্রী এবং পুরুষ মিলিয়া এক হওয়া আবশ্যক। তৃতীয়—হিন্দু বিবাহের প্রকৃতি বিবেচনায় হিন্দু পুরুষের সম্বন্ধে হিন্দু স্ত্রীর বড়ই সম্মানের ও গৌরবের পদ। প্রত্যেক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এখন কিছু কিছু বলা আবশ্যক।

প্রথম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এই কথা বলি যে হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক হইলেও ঐ বিবাহের যে অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই বা থাকিতে পারে না এরূপ অনুমান করা অন্যায়। মৃত মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্ত বিদ্যালোচনা আপন জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন এ কথা বলিলে এমন বুঝায় না যে তিনি বিদ্যালোচনা ভিন্ন আর কোন কাজই করেন নাই; আহারও করেন নাই, নিদ্রাও যান নাই, সংসার ধর্ম্মও করেন নাই। অথবা বিদ্যালোচনা ছাড়া তিনি আহার বিহার ও সংসার ধর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়া এমন কথা বলা যায় না যে বিদ্যালোচনা তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক। অথচ সেই শাস্ত্রেই পতি পত্নীর পরস্পরের মনোরঞ্জন করিবার এবং সন্তানোৎপাদন দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা আছে। এরূপ ব্যবস্থার দোষ বা অসঙ্গতি কি বুঝিতে পারি না। উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য আছে বলিয়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারা যাবে না, এ কথার কোন অর্থই নাই। তবে যেখানে উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য থাকে সেখানে যাহাতে সেই উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাঘাত হয় এমন করিয়া নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করা উচিত নয়। হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রীগমন সন্তানোৎপাদন বেশ ভূষা প্রভৃতি বিষয়ে সেইরূপ ব্যবস্থাই আছে। তবে আর হিন্দু বিবাহের অনাধ্যাত্মিকতা প্রমাণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রজাবৃদ্ধি করাদি বিষয়ক ব্যবস্থা ধরিয়া টানাটানি করা কেন?

আমাদের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্ত্রী এবং পুরুষ মিলিয়া এক হওয়া আবশ্যক। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এখন এই মাত্র দেখা আবশ্যক যে আমাদের বিবাহ প্রক্রিয়া দ্বারা পতি পত্নীর একত্ব সম্পাদিত হয় কি না। আমাদের বিবাহের অনেক মন্ত্রের উদ্দেশ্য পতি পত্নীর একত্বসাধন, এ কথা আমি আমার "বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য" নামক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। অতএব এ স্থলে সে সকল মন্ত্রের পুনরুল্লেখ করিব না। কেবল একটি মন্ত্রের উল্লেখ করিবঃ—

• "প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্—" প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে এবং চর্ম্মে চর্ম্মে যোড়া লাগিয়া এক হউক। ইহা যদি একীকরণ না হয় তবে জানি না কি করিয়া

একীকরণ হইতে পারে। অতএব হিন্দুবিবাহ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য যে পতিপত্নীর একীকরণ এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই। তুমি বলিবে যে পতি পত্নীর একীকরণই যদি হিন্দু বিবাহ প্রক্রিয়ার অর্থ ও উদ্দেশ্য হয় তবে আবার হিন্দুর মধ্যে বহুবিবাহ হয় কেমন করিয়া? কেমন করিয়া হয় তাহা বুঝা বড় কঠিন নয়। সর্ব্ব প্রথমে লোকাচার শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় না। শাস্ত্র বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে অনেক লোকাচার উৎপন্ন হয়। সে উৎপত্তির নানা কারণ থাকে। সেইরূপ কোন কারণে এ দেশে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়েই এক সময়ে বহুবিবাহ করিত। ক্রমে সমাজে ধর্ম্মজ্ঞান বৃদ্ধি হইলে পর স্ত্রীর বহুবিবাহ বন্ধ হয়। পুরুষের বহুবিবাহ এখনও বন্ধ হয় নাই। কিন্তু পুরুষের বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত নয় পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বহুবিবাহ বিষয়ক পুস্তকে স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে কেবল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কারণে পুরুষ ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিতে সমর্থ। অর্থাৎ স্ত্রী চিররুগ্না হইলে এবং পুত্র সন্তান প্রসব না করিলে পতি দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' রবীন্দ্র বাবু কেবল এই কয়টি শব্দ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করাই হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ কয়টি শব্দের পরেই "পুত্র পিণ্ড প্রযোজনঃ" আরো এই যে কয়টি শব্দ আছে রবীন্দ্র বাবু তাহা উদ্ধৃত করেন নাই। কাণ টানিলে মাথা আসে—চির কাল এই কথা শুনা আছে এবং কথাটা সত্য কি না কাণ টানিয়া দেখাও গিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবু তিন চারি বার একটা শ্লোকের কাণ ধরিয়া টানিয়াছেন, কিন্তু একবারও শ্লোকের মাথাটা আসে নাই। মাথাটা আসিলেই জানা যাইত যে পিতৃলোকের পারলৌকিক মঙ্গলার্থ পুত্রোৎপাদনের জন্য পত্নী আবশ্যক। এবং সেই জন্য শাস্ত্রে প্রথম পুত্রকেই পুত্র বলে, অন্যান্য পুত্রকে কামজ পুত্র বলিয়া নিন্দা করে। অতএব পুত্রার্থে যে দারান্তরের ব্যবস্থা আছে তাহারও উদ্দেশ্য পারলৌকিক, পার্থিব নয়। কিন্তু বোধ হয় যে এ ব্যবস্থা সত্ত্বেও অনেকে দারান্তর পরিগ্রহ না করিয়া দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের উপায় বিধান করিয়া থাকেন। এবং হিন্দুর রাজশক্তি বিনষ্ট না হইলে বোধ হয় কালে দত্তক গ্রহণের নিয়ম বেশী প্রচলিত হইয়া দারান্তর পরিগ্রহের প্রথা বহু পরিমাণে রহিত হইয়া যাইত। এরূপ বিবেচনা করিবার পক্ষে একটি প্রধান কারণ

এই যে কোন ব্যক্তি অপুত্রক মরিলে তাহার পারলৌকিক মঙ্গলার্থে তাহার বিধবা পত্নীর গর্ভে নিয়োগ ক্রমে অন্যের দ্বারা পুত্র সন্তান উৎপন্ন করিবার এক সময়ে যে বিধি ছিল তাহা রহিত হইয়া গিয়াছে এবং বিবাহের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থ পূর্ব্বে যে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। মোট কথা, বৃহৎ ও বহু প্রাচীন সমাজে অনেক রকম লোকাচার থাকে। সে সকল লোকাচারের মধ্যে সকল গুলিই যে শাস্ত্রানুমোদিত হয় তা নয়। কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত না হইলেও সে গুলি শীঘ্র লোপ হয় না। এবং হিন্দুশাস্ত্রকারেরাও বিশিষ্ট কারণে লোকাচারের প্রতি কিঞ্চিৎ আস্থাবান বলিয়া তাহা শীঘ্র রহিত করিতে ইচ্ছুক নহেন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে বহুবিবাহ ক্রমে যে পঞ্চীকরণ ষড়ীকরণ ঘটিয়া থাকে তদ্দ্বারা একীকরণ অপ্রমানীকৃত হয় না।

হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু পার্থিব নয়, পারলৌকিকও বটে। সেই জন্য শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন যে বিবাহ দ্বারা পতি পত্নীর যে সংযোগ সম্পাদিত হয় তাহা পরলোকেও থাকে, ইহলোকে শেষ হয় না। রবীন্দ্র বাবু বলেন, এইটি শাস্ত্রকারদিগের ভুল। কেন না তাঁহাদেরই কর্ম্মফলবাদের অর্থ এই যে ইহলোকে যে যে রকম কর্ম্ম করিবে সেই কর্ম্মের ফল স্বরূপ পরলোকে সে তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, অতএব পতি পত্নী আপন আপন কর্ম্মের ফল স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দাম্পত্য যোগ হইতে স্খলিত হইবারই কথা। তবেই কর্ম্মফলবাদ মানিতে হইলে পতি পত্নীর যোগ পরলোকে থাকিতে পারে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু বিবাহের যে একীকরণ উদ্দেশ্য পতি পত্নীর যদি যথার্থই সেই একীকরণ হয়, অর্থাৎ পতি পত্নীর যদি এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক রুচি, এক প্রবৃত্তি, এক কর্ম্ম, এক ধর্ম্ম হয় তবে ত কর্ম্মফলবাদানুসারেই তাহারা পরলোকে এক ফল প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ সেই পতি পত্নীরূপেই থাকিবে। এবং সেই জন্যই ত মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন যে যে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর অনুগামিনী হন তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া সেই স্বামীলোকেই গমন করেন। কর্ম্মফলবাদ বিবাহের পারলৌকিকত্ব নাশ করে না, দৃঢ় করে। বিবাহের পারলৌকিকত্ব কর্ম্মফলবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল।

সীতা না কি রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—পরলোকে যেন তোমারই মতন

পতি পাই। রবীন্দ্র বাবু বলেন যে দাম্পত্য সম্বন্ধ পরলোকব্যাপী হইলে সীতা ‘তোমার মতন পতি পাই’ ও কথা না বলিয়া ‘তোমাকেই পতি পাই’ এই কথা বলিতেন। অতএব হিন্দুর দাম্পত্য সম্বন্ধ যে পরলোকব্যাপী নয় সীতার এই কথাটাও তাহার একটা প্রমাণ। কিন্তু রামচন্দ্রের প্রতি সীতার কথা, এই হিসাবে বিবেচনা করিলে—‘তোমার মতন পতি পাই’—এ কথার ‘তোমাকেই পতি পাই’ ইহা ভিন্ন আর কি অর্থ হইতে পারে? রামচন্দ্র ভিন্ন রামচন্দ্রের মতন আর কে হইতে পারে? সাধ্বী স্ত্রী মাত্রই আপন আপন পতিকে অতুলনীয় মনে করে। অতএব সাধ্বী স্ত্রী যদি পতিকে বলে যে পরলোকে যেন তোমার মতন পতি পাই, তাহার অর্থই এই হয় যে পরলোকে যেন তোমাকেই পতি পাই। আবার ভাষার্থ বিবেচনা করিলেও সীতার কথার সেই অর্থই হয়। ‘তোমার মতন লোকের এ রকম কাজটা করা ভাল হয় নাই’ এই কথায় ‘তোমার এ রকম কাজটা করা ভাল হয় নাই’ ইহাই বুঝায়। সম্মান বর্দ্ধনার্থ শুধু ‘তোমার’ না বলিয়া ‘তোমার মতন লোকের’ বলা যায়। অতএব যে দিক্ দিয়াই দেখ, সীতার কথার অর্থ এই যে হিন্দুর দাম্পত্য সম্বন্ধ পরলোকব্যাপী, ইহলোক সম্বন্ধ নয়।

আমাদের তৃতীয় সিদ্ধান্ত এই যে হিন্দু বিবাহের প্রকৃতি বিবেচনায় হিন্দু পুরুষের সম্বন্ধে হিন্দু স্ত্রীর বড়ই সম্মানের ও গৌরবের পদ। হিন্দু বিবাহ প্রক্রিয়া দ্বারা হিন্দু পত্নীকে অতি পবিত্র ও পূজ্য পদার্থ করা হয় এ কথা আমার ‘হিন্দু পত্নী’ নামক প্রবন্ধে বিশেষরূপে বুঝাইয়াছি। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই চলিবে যে বঙ্গের স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দনের ব্যাখ্যানুসারে আমাদের বিবাহ প্রক্রিয়ার অর্থ এই যে সপ্তপদী গমন বৈবাহিক হোম প্রভৃতি অলৌকিক ক্রিয়ার গুণে হিন্দু স্ত্রী আহবনীয় ও যজ্ঞের যূপ কাষ্ঠের ন্যায় অলৌকিক পদার্থ হইয়া থাকেন। অলৌকিক শব্দের অর্থ মানবধর্ম্মাক্রান্ত নয়, মানবধর্ম্মের অতীত যে দেবধর্ম্ম সেই দেবধর্ম্মাক্রান্ত। অতএব হিন্দু পত্নী অলৌকিক সংস্কার সম্পন্ন অতি পবিত্র ও পূজনীয় অলৌকিক পদার্থ বলিলে সাদা কথায় এই বুঝায় যে হিন্দু পত্নী দেবতা। ভগবান মনুও বলিয়াছেন—

স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।

গৃহে স্ত্রীতে ও শ্রীতে অর্থাৎ লক্ষ্মীতে কিছুমাত্র বিশেষ নাই।

সতী স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, 'যেখানে যেখানে তাহাদের পাদস্পর্শ হয়, সেইখানে সেইখানেই পৃথিবী মনে করেন যে আমার আর ভার নাই, আমি পবিত্রকারিণী হইলাম।" এবং পাপচারিণী ভিন্ন স্ত্রীলোক মাত্রেরই সম্বন্ধে লিখিত আছে যে 'সোম তাহাদিগকে শৌচ প্রদান করিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব তাহাদিগকে মধুরবাক্য প্রদান করিলেন, পাবক তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র করিয়া দিলেন। অতএব যোষিদগণ সর্ব্ব প্রকারে পবিত্র হইল।" সংস্কৃত পুরাণ স্মৃত্যাদির কত স্থানে যে এই রকম উক্তি আছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। ফল কথা, হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের মতে হিন্দু স্ত্রী যথার্থই অতি পবিত্র দেবতা। এবং আমরা আজ এত যে হীন হইয়াছি, আমাদের মধ্যে এখনও সেই সংস্কার বর্ত্তমান। অতি মূর্খ নিম্নজাতীয় হিন্দু কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে—শুধু আপন পত্নীকে নয়, যে কোন এবং যত অধম স্ত্রী হউক না কেন—তাহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিলে, নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে এই বলিয়া তাহাকে নিষেধ করে—'আহা, কর কি, কর কি, স্ত্রীলোক লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর গায়ে হাত তুলিতে নাই।' যে দেশে আজও আপামর সাধারণের মুখে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায় সে দেশের শাস্ত্রানুসারে এবং প্রকৃতজ্ঞানীগণের মতে স্ত্রী যে যথার্থই দেবতা এ কথা না মানিয়া কেমন করিয়া থাকা যায়? ফলতঃ যে দেশে সীতা স্বয়ং কমলাপতির কমলা বলিয়া পূজিতা, সাবিত্রী সৌভাগ্যরূপিণী ব্রতাধিষ্ঠিতা ব্রতফলদায়িনী দেবী বলিয়া অর্চ্চিতা, যে দেশে কুমারী পূজা ব্যতীত দেব পূজা ও দেব দর্শন সিদ্ধ হয় না, যে দেশে মঙ্গল ঘট কক্ষে লইয়া সতী স্ত্রী গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া মহাশক্তিকে আহ্বান না করিলে স্বয়ং মহাশক্তির গৃহ প্রবেশ হয় না সে দেশে স্ত্রীলোক পবিত্র পূজনীয়া ও দেবীপদারূঢ়া নন, এ কথা বলিলে বোধ হয় অধর্ম্মের সঞ্চার হয়।

মোক্ষ সাধনরূপ জীবনের সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্যসাধন সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষের যে রূপ সম্বন্ধ দেখা গিয়াছে তদ্দ্বারাই বুঝা যায় যে, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্ত্রী বড়ই আদরের, বড়ই গৌরবের সামগ্রী। স্ত্রী হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের ঘৃণা বা অবজ্ঞার জিনিষ হইলে তাঁহারা কখনই স্ত্রীকে পুরুষের মোক্ষসাধনের সহকারিণী করিতেন না—কখনই স্ত্রীকে অত উচ্চ পদে ও উচ্চ কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিতেন না। স্ত্রীকে বাসন মাজা সকড়ি দেওয়া প্রভৃতি দাস্য বৃত্তির

অধিক অধিকার দিতেন না। কিন্তু যে শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের এত আদর ও গৌরব সেই শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের নিন্দাও ত আছে। না থাকিবে এমন কোন কথা নাই। স্ত্রীলোকের রূপমোহে ও মাধুর্য্যকুহকে অনেক সংযমীর সংযম নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য সংস্কৃত গ্রন্থে স্ত্রীলোকের যে সকল নিন্দাবাদ আছে তাহার উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রণীত 'ভারতমহিলা' নামক অতি সুন্দর গ্রন্থে অনেক দিন হইল লিখিয়াছিলেন যে 'এ সকল সংসারবিরাগী যোগী প্রভৃতি লোকের উক্তি; তাঁহাদের মন অন্য দিকে আসক্ত, স্ত্রীলোক পাছে তাঁহাদিগকে সংসারে বদ্ধ করে, এই ভয়ে তাঁহারা বনে বাস করিতেন।' স্ত্রী নিন্দার অন্য কারণও ছিল। স্ত্রী পূজনীয়া হইলেও স্ত্রীলোকের মধ্যে যে অনেক নীচ বা দুষ্ট স্বভাবসম্পন্না আছে তাহার সন্দেহ নাই। পুরুষের মধ্যে যাহারা স্বভাবত দোষান্বেষী নিন্দাপ্রিয় ও তিক্তস্বভাব তাহারা কোন জিনিসের ভাল ভাগটা দেখে না, মন্দ ভাগটা দেখিয়া জিনিসটা একেবারেই মন্দ বলিয়া বর্ণনা করে। এবং সে রকম লোকে দুই পাঁচ জন দুষ্টা স্ত্রী দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতির যৎপরোনাস্তি নিন্দা করে। প্রাচীন ভারতেও সে প্রকৃতির লোক ছিল। এবং তাহারাই স্ত্রীলোকের নিন্দা করিয়া গিয়াছে। অতএব তাহাদের স্ত্রীনিন্দার উল্লেখ করিয়া হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ও হিন্দু সমাজে স্ত্রীজাতির পদ গৌরবের পদ নয় এরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা বোধ হয় বড় একটা ন্যায্য কাজ নয়। যাঁহারা বিলাতি সভ্যতার পক্ষপাতী তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে ইংরাজাদির মধ্যে স্ত্রীলোকের খুব বেশী সম্মান। কিন্তু কোন কোন ইংরাজকে এমন কথা বলিতে শুনিয়াছি যে বিলাতি স্ত্রী মাত্রই ব্যভিচারিণী। ইংরাজদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে মুখে অসম্মানের কথা কহিলে কোন দোষ হয় না, পুস্তকাদিতে লিখিলে বড়ই দোষ হয়। কিন্তু লিখিলে যদি দোষ না হইত তাহা হইলে সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় ইংরাজি সাহিত্যেও স্ত্রীজাতির বিষম নিন্দাবাদ দেখা যাইত। আবার ইংরাজি সাহিত্যে স্ত্রীজাতির নিন্দা যে একেবারেই দেখা যায় না তা নয়। পুরাতন ইংরাজি সাহিত্যে বিস্তর নিন্দা দেখা যায়। চূড়ান্ত উদাহরণ সেক্সপীয়রের Frailty, thy name is woman. স্ত্রীজাতির নিন্দা লেখা হইবে না বলিয়া ইদানীং ইংরাজদিগের মধ্যে একটা ধর্ম্মঘট হইয়াছে। কিন্তু সে ধর্ম্মঘট সত্ত্বেও

এখনকার ইংরাজি সাহিত্যে স্ত্রীলোক নানা অনর্থের মূল এইরূপ অনেক স্ত্রীনিন্দা দেখা যায়। কিন্তু সে নিন্দা দেখিয়া ইংরাজদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির পদ সম্মানের পদ নয় এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিশ্চয়ই ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে না। তবে সংস্কৃত সাহিত্যে স্ত্রীজাতির দুই চারিটা নিন্দাবাদ দেখিয়া হিন্দুর মধ্যে স্ত্রীজাতির পদ গৌরবের পদ নয় এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন্ নীতি অনুসারে যে ন্যায়সঙ্গত হয় তাহা এবেবারেই বুঝিতে পারি না।

পুরুষ স্বভাবতঃ স্ত্রীজাতির কিছু বশ হইয়া থাকে। অতএব পুরুষকে সতর্ক করিবার জন্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে কোন কোন স্থলে স্ত্রীনিন্দা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে।

ফল কথা, সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় অকপট সাহিত্যে সকল বিষয়ের সকল দিকই আলোচিত হইয়া থাকে—ভালদিক্ মন্দদিক্ আধ্যাত্মিক দিক্ অনাধ্যাত্মিক দিক্ আদর্শের দিক্ আচার আচরণের দিক্, সকল দিক্ই আলোচিত হইয়া থাকে। অতএব এরূপ সাহিত্যের এক দিক ধরিয়া অপর দিকের অসত্যতা বা অসারতা অনুমান করা নিতান্তই ন্যায় যুক্তি ও সুনীতি বিরুদ্ধ। এরূপ সাহিত্যের সকল দিকের সামঞ্জস্য করাই ন্যায়বান ব্যক্তির প্রধান ও প্রকৃত কর্ত্তব্য। নহিলে বিষম গোল বাধিবার সম্ভাবনা। কারণ তুমি যেমন স্ত্রীজাতির নিন্দাবাদের উল্লেখ করিয়া বলিতেছ যে শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির স্তুতিবাদের যে কথা আছে তাহা কোন কাজের নয়, তোমার প্রতিপক্ষও তেমনি স্ত্রীজাতির স্তুতিবাদের উল্লেখ করিয়া বলিতে পারে যে সংস্কৃত গ্রন্থে স্ত্রীজাতির যে নিন্দাবাদ আছে তাহা কোন কাজের নয়। এবং বলিলে তোমারও কথাটি কহিবার যো থাকে না।

ইংরাজের মধ্যে স্ত্রীজাতি সম্মানের সামগ্রী। তাই বলিয়া সকল ইংরাজই যে স্ত্রীজাতিকে সম্মান করে তা নয়। এবং বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ এক শত কি এক সহস্র ইংরাজ স্ত্রীজাতিকে অসম্মান করিলেও ইংরাজজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে স্ত্রীজাতি সম্মানিত এই মূল কথার বিপর্য্যয় ঘটে না। হিন্দুর মধ্যেও তেমনি যদি কেহ স্ত্রীজাতির প্রতি অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করে তবে তদ্দ্বারা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে স্ত্রীজাতি যে অতি পবিত্র ও পূজনীয়া এ কথার বিপর্য্যয় ঘটে না। অতএব যুক্তি শাস্ত্রানুসারে একজন যুধিষ্ঠির একটি দ্রৌপদীকে দ্যূতক্রীড়ায় বিক্রয় করিলেও শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির যে গৌরবের কথা

আছে তাহার বিপর্য্যয় ঘটে না। কিন্তু যুধিষ্ঠির যে দ্রৌপদীকে দ্যূতে পণ করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত অর্থ কি একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির যখন শাস্ত্রদূষিত ধর্ম্মবিগর্হিত দ্যূতক্রীড়ায় গমন করেন তখন ভারতের রাজবংশের উপর কালের কাল ছায়া পড়িয়াছে। সেই ছায়ায় লুকাইয়া এক অতি ভীষণ নিয়তি কুরুবংশ ও পাণ্ডুবংশ এবং ভারতের অপর সমস্ত রাজন্যবর্গকে সেই করাল কুরুক্ষেত্রের দিকে টানিতেছে। নিয়তি সকল দেশে সকলকেই এক সময় না এক সময় এই রকম করিয়া টানিয়া থাকে। সেই কালের ছায়ায় ধর্ম্মপুত্রের মতিবুদ্ধি আচ্ছন্ন, সেই নিয়তির টানে ধর্ম্মপুত্র আত্মকর্ত্তৃত্বহীন, আত্মহারা। উচ্ছন্নমতি বলিয়া, নিয়তির নিষ্ঠুর নিগড়ে আবদ্ধ বলিয়া তিনি আজ তাঁহার ধর্ম্মপত্নীকে দ্যূতে বিক্রয় করিতেছেন, এবং আপনাকে আপনি বিক্রয় করিতেছেন। উচ্ছন্নমতি না হইলে নিয়তির নিতান্ত অধীন না হইলে এ সংসারে কে আপনাকে আপনি বিক্রয় করিয়া থাকে? মৃগ আবার কখনও সোণা রূপার হইয়া থাকে? কিন্তু আজ সেই ভীষণ রাক্ষস সমরের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা দেবী পঞ্চবটী বনে সোণার মৃগের জন্য লালায়িত আর স্বয়ং বিষ্ণু রামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ লইয়া সোণার মৃগ মারিতে উদ্যত। এ সকল জীবনের মহানাটকের কথা। এত বড় কবি হইয়া রবীন্দ্রনাথ কেমন করিয়া মহাভারতের মহানাটকের এমন অর্থ করিলেন আমি ভাবিয়া পাই না। তবে ত তিনি এ কথাও বলিতে পারেন যে নলরাজা নিতান্ত অপ্রেমিক ও স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন বলিয়া নিবিড় অরণ্য মধ্যে নিতান্ত করুণাপ্রার্থিনী কায়মনোবাক্যে একান্ত অনুগামিনী সেই অঙ্কশায়িতা নিদ্রাভিভূতা দময়ন্তীকে ফেলিয়া গিয়াছিলেন! আর মহাভারতের যে স্থান ইচ্ছা সেই স্থান খুলিয়া দেখ- দেখিবে হয় ভীষ্ম, নয় বিদুর, নয় ধৃতরাষ্ট্র, নয় গান্ধারী, নয় পাণ্ডবগণ বলিতেছেন যে কৌরবেরা দ্রৌপদীকে অপমান না করিলে এত তুমুল কাণ্ড হইত না। এক স্থল হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তোমারই অদৃষ্টক্রমে এই মহতী শত্রুতা সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অনবরত লোক বিনাশ হইবে। যৎকালে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডব সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিবার পরামর্শ করে, মহাত্মা ভীষ্ম দ্রোণ ও বিদুর তাহাকে

বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন। দুরাত্মা তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাতও না করিয়া পাঞ্চালীকে আনয়ন করিতে আদেশ দিয়া সূতপুত্র প্রাতিকামীকে প্রেরণ করিল। * * * দুরাত্মা সভামধ্যে পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়া এই অতি ভয়ানক তুমুল কাণ্ড সমুপস্থিত করিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে কহিতেছেনঃ—"হে সঞ্জয়! তদনন্তর সর্ব্বধর্ম্মবিৎ বিদুর আমাকে কহিলেন যে, পঞ্চালরাজনন্দিনী কৃষ্ণা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, ইনি যখন সভামধ্যে আনীতা হইয়াছেন, তখন আর নিস্তার নাই; কুরুবংশের এই পর্য্যন্ত শেষ হইল। ঐ দেখ পাঞ্চালী পাণ্ডবগণের সহিত গমন করিতেছেন; উহাঁর এতাদৃশ ক্লেশ দর্শন করিয়া পাণ্ডবেরা কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না। * * অর্জ্জুন পঞ্চালগণ পরিবৃত হইয়া আসিবেন এবং মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তাহাদিগের মধ্যে যমদণ্ডের ন্যায় গদা ঘূর্ণন করিতে করিতে আগমন করিবেন। তখন ভূপতিগণ কখনই অর্জ্জুনের গাণ্ডীব নির্ঘোষ ও ভীমের ভীম গদা বেগ সহ্য করিতে পারিবেন না। অতএব আমার মতে পাণ্ডবগণের সহিত বিগ্রহ অপেক্ষা সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ।" (কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, সভাপর্ব্ব, অনুদ্যূত পর্ব্বাধ্যায়, ৯৭ অধ্যায়।)

দেখা গিয়াছে যে হিন্দুবিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক এবং উহার যে সাংসারিক বা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য আছে তাহা ঐ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের অধীন। এই সিদ্ধান্তের ফলে রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কারণ হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সাংসারিক এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্র বাবুর প্রায় সমস্ত কথাই লিখিত। অতএব হিসাব মত এই স্থানেই আমার প্রবন্ধ শেষ হয়। তথাপি আরও গুটিকতক কথা বলিব। হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক বলিয়া উহার বন্ধন ইহলোকে ছিন্ন হয় না, পরলোকেও থাকে। "এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্ পাণিগ্রহণমিষ্যতে। যদাপ্নোতি পতির্ভার্য্যামিহলোকে পরত্র চ॥" (মহাভারত) যে বিবাহের বন্ধন ছিন্ন হইবার নয় সে বিবাহ স্ত্রীপুরুষের চুক্তিমূলক হইতে পারে না। কারণ চুক্তির গোড়ায় নিয়ম থাকে এবং সেই নিয়ম ভঙ্গ হইলে চুক্তিও ভাঙ্গিয়া যায়। অতএব কোন কারণে ভঙ্গ হইবে না এমন চুক্তি হইতেই পারে না। আবার যাহারা চুক্তিতে বদ্ধ হয় তাহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকা

আবশ্যক, কিন্তু বিবাহ হইলে হিন্দু স্ত্রী ও পুরুষের স্বাতন্ত্র্য থাকে না, তাহারা দুই জনে মিলিয়া একজন হয়। চুক্তিতে দুই জনে মিলিয়া কিছুতেই একজন হইতে পারে না। অতএব হিন্দুর বিবাহে চুক্তির নিয়ম খাটে না। চুক্তির নিয়ম যদি না খাটিল, তবে বিবাহার্থ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পরকে পছন্দ করিবার আবশ্যকতা থাকে না। অতএব হিন্দু স্ত্রী ও হিন্দু পুরুষ উভয়েরই অল্প বয়সে বিবাহ হইতে পারে। হইলে সে বিবাহ অসিদ্ধ হয় না।

হিন্দু বিবাহ যদি অল্প বয়সে হইতে পারিল তবে ঐ বয়স কি রকম হওয়া উচিত, এই কথাটা একটু বিশেষ করিয়া বিবেচনা করা আবশ্যক। দেখা গিয়াছে যে ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা মুক্তি লাভ করিবার জন্য হিন্দু দার পরিগ্রহ করে। এ বড় সামান্য উদ্দেশ্য নয়। সামান্য কথায় যাহাকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা বলে, তদপেক্ষা এ উদ্দেশ্য যে কত উচ্চ তাহা বলিয়া উঠা যায় না। যাহাকে লইয়া এত বড় উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে তাহাকে নিজে গড়িয়া লওয়াই ঠিক পদ্ধতি। কোন একটা বড় কাজ করাইবা লইতে বা মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করাইতে হইলে সকলেই আপনার আপনার 'বনায়া' লোক দ্বারা তাহা করাইয়া থাকেন। সন্তান পিতার বংশের অনুযায়ী, পিতার ধর্ম্মাক্রান্ত, পিতার রুচি প্রবৃত্তি ব্যবসায় বৃত্তির অনুগামী হইবে বলিয়া পিতা শৈশব হইতেই সন্তানকে স্বয়ং শিক্ষা দিয়া থাকেন। সন্তান বড় হইয়া আপনিই পিতৃবৎ ও পিতৃবংশানুযায়ী হইয়া উঠিবে, এরূপ ভাবিয়া কোন পিতাই সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকিতে সাহস করেন না। পরের ছেলেকে আপনার করিতে হইলে শৈশবেই পরের ছেলেকে দত্তক গ্রহণ করিতে হয়। শৈশব হইতে শিক্ষা পাইয়া ব্যাঘ্রকেও মনুষ্যের অনুগামী হইবার কথা শুনা গিয়াছে। অতএব পত্নীকে আপন মহৎ উদ্দেশ্যের অনুগামিনী করিতে হইলে তাঁহার সমস্ত শিক্ষা আপনার হাতে রাখা আবশ্যক এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নিজের শিক্ষিতা নয় এমন বেশি বয়স্কা স্ত্রীলোকের মধ্যে সর্ব্ব রকমে ও সকল অবস্থায় ও চিরকালের মতন নিজের অনুগামিনী হইতে পারে, এমন স্ত্রী যে একেবারেই পাওয়া যাইতে পারে না, এমন কথা বলি না। কিন্তু পাইবার সম্ভাবনা বড় কম। কিন্তু সেরূপ স্ত্রীর প্রয়োজন সকলেরই, আর যে উদ্দেশ্যে

সেরূপ-স্ত্রীর প্রয়োজন, তাহা যার পর নাই উচ্চ ও গুরুতর। এমত স্থলে সম্ভাবনার পথে না গিয়া নিশ্চয়তার পথে অথবা কম সম্ভাবনার পথ ছাড়িয়া বেশি সম্ভাবনার পথে যাওয়াই কর্ত্তব্য। অর্থাৎ অন্যের শিক্ষিতা স্ত্রী না লইয়া নিজে স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিয়া লওয়া ভাল। অতএব স্ত্রী যৌবন প্রাপ্ত হইবার এবং শৈশবের সীমা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে তাহার পাণি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বিবাহ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য যে পতি পত্নীর একীকরণ তাহা সিদ্ধ হওয়ার পক্ষেও এইরূপ স্ত্রী গ্রহণ করা অধিকতর বিহিত বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীর দেহ মন হৃদয় আত্মা সব যখন শূন্য, কিছুই কোন রকমে অধিকৃত হয় নাই, তখন হইতে পতির শিক্ষাধীন হইলে তাহার সেই দেহ মন হৃদয় আত্মা সমস্তই তাহার পতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার যত সম্ভাবনা, কোন রকমে অধিকৃত হইবার পর, পতির শিক্ষাধীন হইয়া পতিকর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার তদপেক্ষা অনেক কম সম্ভাবনা। আমাদের সন্তানাদি যে আমাদের এত অনুরূপ হয় তাহার কারণই এই যে শৈশব হইতে আমরা সন্তানদিগকে আমাদের মনোমত শিক্ষা দি। এইরূপ শৈশব হইতে শিক্ষা দিয়া জেম্‌স্ মিল্ আপন সন্তান জন ষ্টুয়ার্ট মিলকে দোষে গুণে কেমন ঠিক্ আপনার মতন করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। অন্যকে আপনার মতন করিতে হইলে শৈশব হইতে অন্যকে শিক্ষা দ্বারা গড়িয়া লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। এইরূপে গড়িয়া লইলে সদ্ভাব ও প্রণয়ও খুব বেশি হয়। কারণ সদ্ভাব ও প্রণয় সর্ব্ব রকমে এক হইবারই ফল স্বরূপ। মানুষে মানুষে যত এক হইবে তাহাদের প্রণয়ও তত বাড়িবে। ইহা মানুষের প্রকৃতিগুণে হয়—ভগবানের নিয়ম গুণে হয়। ইহাকে জাঁতায় পেষা প্রণয় বলে না। অথবা ইহাকে যদি জাঁতায় পেষা প্রণয় বলা ঠিক হয়, তবে জগতের কি যে জাঁতায় পেষা নয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না—মানুষের বুদ্ধিও জাঁতায় পেষা, শিক্ষাও জাঁতায় পেষা, স্নেহ ও জাঁতায় পেষা, রুচিও জাঁতায় পেষা, সবই জাঁতায় পেষা। অতএব জীবনের মহদুদ্দেশ্য সাধিবার জন্য পতিপত্নীর যে একীকরণ আবশ্যক তাহা সম্পাদনার্থ বালিকা স্ত্রী বিবাহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। রবীন্দ্রনাথ বাবুও প্রকারান্তরে সেই কথা বলেন। তিনি বলেন, যে একান্নবর্ত্তী পরিবারে বালিকা স্ত্রী

আবশ্যক, কারণ সে পরিবারে স্ত্রীকে অনেকের সহিত মিলিতে মিশিতে হয়। কিন্তু অন্যের সহিত মিলিবার মিশিবার জন্য স্ত্রীর যদি বালিকা হওয়া আবশ্যক হয় তবে পতির সহিত মিলিবার মিশিবার জন্য বালিকা হওয়া আবশ্যক না হইবে কেন? বরং বেশি আবশ্যক হইবে। কারণ স্ত্রীর অন্যের অপেক্ষা পতির সহিত অনেক বেশি মিলিতে মিশিতে হইবে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবু বলেন যেখানে পরিবার একান্নবর্ত্তী নয়, সেখানে স্ত্রী বালিকা হইলে চলে না, কারণ বালিকা স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণাদি করে কে? কাজেই সে রকম পরিবারে একেবারে ঘর কন্না করিতে পারে, এমন বড় মেয়ে বিবাহ করা আবশ্যক। আজ কাল এ দেশে অনেক একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিতেছে। কেন ভাঙ্গিতেছে, ভাঙ্গা উচিত কি না ও ভাঙ্গা বন্ধ হইতে পারে কি না, এ স্থলে সে সব কথার বিচার নিষ্প্রোজন। কারণ উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে কেবল এইমাত্র দেখা আবশ্যক যে যেখানে একান্নবর্ত্তী পরিবার নাই, সেখানে মা বাপও কি নাই? মা বাপ থাকিলে, বালিকা স্ত্রী বিবাহ করিয়া ঘরে আনিবার আপত্তি কি? তবে যদি আজি কালিকার বিলাতি শিক্ষার গুণে মা বাপের সঙ্গে থাকিতেও কষ্ট হয় তবে আপনি যেমন মা বাপের দ্বারা মানুষ হইয়াছি, তেমনি স্ত্রীটিকেও তাঁহাদের সাহায্যে মানুষ করিয়া লইয়া তাঁহাদের কাছ থেকে সরিয়া পড়ায় ক্ষতি কি?

ধর্ম্মচর্য্যার দ্বারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যদি বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত হয়—উচিত নয় এমন কথা কে বলিবে?—তাহা হইলে খুব বেশি বয়স প্রাপ্ত হইয়া নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ না করাই কর্ত্তব্য। নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিলে, অতি অল্প সংখ্যক উৎকৃষ্ট নর নারী ছাড়া লোকে সাধারণত আপন আপন সুখ সচ্ছন্দকে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিতে শিখে। আমাদের মধ্যে যাহারা যৌবন বিবাহের পক্ষপাতী, তাহারা সেই জন্য এই বলিয়া বাল্যবিবাহের নিন্দা করে যে যে বিবাহের উপর লোকের সমস্ত সুখ দুঃখ নির্ভর করে * বাল্য বিবাহে সেই বিবাহ সম্বন্ধে লোকের নিজের মতামত চলে না।

---

* পিতা মাতাকে সন্তানের বিষয় সম্পত্তির উপর যখন অসংযত অধিকার দেওয়া হইতেছে না, তখন তাহার অধিকতর মূল্যবান সম্পত্তি—জীবনের

কিন্তু নিজের সুখ সচ্ছন্দ বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য এই সংস্কার প্রবল হইলে বিবাহের যে একটা উচ্চতর আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে বা থাকা উচিত এ সংস্কার লোকের মনে স্থান পায় না এবং পাইলেও শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। এ বড় কম অনিষ্ট নয়। এরূপ ঘটিলে বিবাহ পশু পক্ষীর মিলন অপেক্ষা বড় একটা উৎকৃষ্ট হয় না, এবং বিবাহ যদি পশু পক্ষীর মিলন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হয়, তবে বিবাহ না হওয়াই ভাল। আবার নিজের সুখসচ্ছন্দের জন্য বিবাহ—এরূপ সংস্কার হইলে নিজের সুখসচ্ছন্দেরই সমূহ ব্যাঘাত ঘটে। নিজের সুখসচ্ছন্দ নিজের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইলে সুখ-সচ্ছন্দের আকাঙ্ক্ষা কেবল বাড়িতে থাকে, সুখের পিপাসা কিছুতেই মিটে না, সুখসচ্ছন্দের পরিবর্ত্তে অসুখ ও অসন্তোষই বৃদ্ধি হয়। নিজের ভোগ স্পৃহা পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ যেটা বেশি অন্বেষণ করে সেইটাই মানুষ পায় না, সেইটা সম্বন্ধেই বেশি বঞ্চিত ও আত্মপ্রতারিত হয়। এইজন্যই হিন্দু শাস্ত্রে বাসনা বিসর্জ্জন ও নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যবস্থা, খৃষ্টধর্ম্মে resignation বা ঈশ্বরে আত্মা সমর্পণের কথা এবং ইরোপীয় সাহিত্যের সাত্ত্বিক অংশে contentment বা তুষ্টিভাবের উপদেশ। অতএব বিবাহের উচ্চ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে হইলে এবং বিবাহ করিয়া সাধারণত সুখ সন্তোষ লাভ করিতে হইলে,বেশি বয়সে নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ না করাই উচিত। বয়স বেশি হইবার পূর্ব্বে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনে দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ দিলে, লোকের মনে স্বভাবতই এইরূপ সংস্কার জন্মে যে বিবাহ নিজের নিজের সুখ সচ্ছন্দের জন্য নয়, বিবাহের অন্য উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। এইজন্য হিন্দুর মধ্যে পতিপত্নী পরস্পরের নিকট আপন আপন সুখসচ্ছন্দ অন্বেষণ করে না, পরস্পরে পরস্পরের ত্রুটি খুঁজিয়া বেড়ায় না, পরস্পরে কেবল পরস্পরের জনাই আছি, এইরূপ ভাবিয়া সংসার ধর্ম্ম করে না, উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া এবং সমস্ত পরিবারবর্গের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া অনায়াসে সুখ ও সন্তোষ লাভ করে। এইজন্য

সুখ দুঃখের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করিবার অধিকার পিতা মাতাকে দেওয়া কি প্রকারে সঙ্গত হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সঞ্জীবনী, ২৯শে শ্রাবণ ১২৯৪।

হিন্দু পতি পত্নীর রূপ খুঁজে না, বেশভূষা খুঁজে না, চমক্ চম্‌কে খুঁজেনা, চোকো চোকি, মুখোমুখি, ঘেঁষাঘেঁষি, হাত ধরাধরি পা-চলাচলি খুঁজে না। এবং নিজের নিজের বেশি খোঁজা খুঁজি নাই বলিয়া তাহাদের নিজের নিজের জন্য জ্বালা যন্ত্রণা অসুখ অসন্তোষও বড় একটা নাই। এই জন্যই এত অধঃপতনের দিনে এবং প্রকৃত হিন্দু শিক্ষার এত অভাবেও, এদেশে সাধারণত এবং নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেও স্ত্রী পুরুষের ভিতর যে পরিমাণ সুখ সন্তোষ ও সদ্ভাব আছে, ইংরাজাদি আজি কালিকার খুব সভ্য ও শিক্ষিতদিগের স্ত্রীপুরুষের ভিতর সে পরিমাণ নাই *। সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলার হিসাবে হিন্দু বিবাহ প্রণালীর এ বড় কম উপকারিতা নয়। সে প্রণালী পরিত্যাগ করিলে হিন্দু দম্পতীরও যেমন অসুখ অসন্তোষ অশান্তি

* "The proportion of unhappy marriages is larger in England than in India, still larger in America. After close observation during six years devoted especially to the study of social phenomena in the west I have come to the conclusion that the proportion of unhappy marriages in England and America is due to the very conception of marriage upon which the present reform agitation is based, namely, as an instrument of attaining personal happiness, and not as a means of serving family and society, of making others happy besides the couple themselves. I hold it as a strong conviction that this desire of personal gratification is an utterly unsafe thing to be trusted, even in the accomplishing of that which is its avowed object, namely, happiness. For being increased by cultivation it never succeeds in gratifying itself, while it encroaches upon the rights of others, even of the object of its own love. Facts and phenomena in modern Europe are obtruding illustrations of this truth, not only in the home, but also in the relations of the outside world."

Amrita Lal Ray.

The Speeches of Eminent Indian gentlemen on "Hindu marriage customs" delivered at the meeting held on the 6th August, 1887, at Sobhabazar Rajbati. Appendix B p. 96

ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হইবে হিন্দু সমাজেরও তেমনি অসুখ অসন্তোষ অশান্তি ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হইবে। অসুখ অসন্তোষ অশান্তি ও অস্থিরতা কি শারীরিক জীবন কি নৈতিক জীবন সকল প্রকার জীবনের প্রতিকূল। এবং হিন্দুজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ সমস্ত বিঘটনা হিন্দু প্রকৃতির কিছু বিশেষ রকম বিরোধী। অতএব হিন্দুর বিবাহ প্রণালী পরিবর্ত্তন করিলে হিন্দুর শারীরিক জীবন ও ধর্ম্ম জীবন উভয় জীবনই ক্রমে ক্ষীণ ও খর্ব্ব হইয়া শেষে লয় প্রাপ্ত হইবে।

তবেই বুঝা যাইতেছে যে বিবাহের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল রাখিবার জন্য, পতিপত্নীর সুখ, সন্তোষ ও সদ্ভাব পুষ্ট ও সহজ-লব্ধ করিবার জন্য, এবং পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য বিবাহ বেশি বয়সে নিজ নিজ পছন্দানুসারে না হইয়া অপেক্ষাকৃত কম বয়সে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের পছন্দানুসারে ও কর্তৃত্বাধীনে সম্পন্ন হওয়াই কর্ত্তব্য।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাহের যে প্রকার প্রয়োজনীয়তা দেখা গিয়াছে তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে হিন্দু বিবাহ স্বেচ্ছাধীন ও সখের কাজ নয়। বিবাহ মানবের একটি গুরুতর নির্ব্বন্ধ। তাই আমাদের বিবাহ কার্য্য নিজের নিজের হাতে নাই এবং আমাদের বিবাহ বন্ধনের ছেদও আমাদের স্বেচ্ছাধীন নয়। বিবাহের এই নির্ব্বন্ধ রূপ ভাব এবং যাহাদের বিবাহ, বিবাহে তাহাদের এই আত্ম কর্তৃত্ব-হীনতা—এই দুয়ের মধ্যে যে গূঢ় গুহ্য ও গভীর একতানতা আছে, তাহা জগৎপতির স্থাপিত জাগতিক নির্ব্বন্ধ ও জীবের জাগতিক নির্ব্বন্ধাধীনতা এই দুয়ের মধ্যস্থিত গূঢ় গুহ্য ও গভীর একতানতার সম্পূর্ণ অনুরূপ। এবং জগৎ ও জীবের নির্ব্বন্ধমূলক একতানতা যেমন জীব ও জগতের সদ্ভাব ও প্রণয়ের গূঢ় অপরিজ্ঞেয় কারণ, বিবাহ ও বিবাহিতের নির্ব্বন্ধ মূলক একতানতাও তেমনি পতি পত্নীর সদ্ভাব ও প্রণয়ের গূঢ় অপরিজ্ঞেয় কারণ। এই জনাই হিন্দুর ভিতর এত বেশী দম্পতীর মধ্যে এত বেশী প্রেম ও সদ্ভাব। হিন্দুর বাল্যবিবাহ বলিয়া যাহারা বলে, যে হিন্দু দম্পতির মধ্যে প্রণয় নাই তাহারা জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা কথা কয়। হিন্দুর বিবাহ প্রণালী জগৎ পতির গূঢ় জাগতিক নির্ব্বন্ধ-প্রণালীর অনুকরণে রচিত—মহানাটককারের মহানাটকের আভাসে

[illegible]। আমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বুঝিবে বিবাহের কথা লইয়া আর [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] নাই করিলাম না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক বলিয়া উহার যে অপর কোন উদ্দেশ্য নাই তা নয়। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা এমন মূর্খ ছিলেন না যে মনুষ্যের মধ্যে ভোগ-স্পৃহা রূপ-তৃষ্ণা প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পান নাই। মনু বলেনঃ—

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং॥

(৩ অ—১০)

কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্য কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্য বলিয়া উপভোগ করিলে মানুষ ভোগ স্পৃহা ও জড় প্রকৃতির দাস হইয়া পড়ে এবং তাহার নৈতিক উন্নতির পথ ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। অতএব শুদ্ধ শারীরিক রূপ দেখিয়া বিবাহ করিলে হিন্দু বিবাহের মহদুদ্দেশ্য বিফল হইবার কথা। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা ব্যবস্থা করিয়াছেন যে শারীরিক সৌন্দর্য্য মানসিক সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি বলিয়া শারীরিক সৌন্দর্য্য খুঁজিতে হইবে। মনু বলেনঃ—

উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং।

(৩ অ—৪

দ্বিজগণ সুলক্ষণাক্রান্ত সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিবেন।

জ্ঞানীমাত্রেই এ ব্যবস্থার সারবত্তা স্বীকার করিবেন। আমাদের মধ্যে প্রায় সকল পিতা মাতারও সুন্দরী বউ করিবার সাধ। এবং জাতি কুল বয় ও কন্যার সুলক্ষণাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যত সুন্দরী বধূ পাওয়া যায়, প্রায় সকল পিতা মাতাই সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। কেবল পিতা মাতার প্রতি প্রকৃত ভক্তি শ্রদ্ধা নাই বলিয়া এবং রূপ ছাড়া আর কিছুরই প্রতি শিক্ষিত যুবকদিগের লক্ষ্য নাই বলিয়া, আজ কাল অনেকে পিতা মাতার কন্যা নির্ব্বাচনে অসন্তুষ্ট এবং নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবার জন্য উদ্যত। ইহা নৈতিক অবনতির লক্ষণ এবং স্বয়ং নির্ব্বাচন

প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলে এই নৈতিক অবনতি ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে। যাহাকে গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহার শুধু রূপ দেখিলে চলিবে না, তাহার জাতি, কুল, ঘর ও সুলক্ষণাদিও বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক। নিজে কন্যা নির্ব্বাচন করিলে এ সকলের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, অতএব সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলার্থ পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন কর্তৃক কন্যা নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। এবং পিতা মাতা প্রভৃতির নির্ব্বাচনের কেহ বিরোধী না হয় এই জন্য পুত্র কন্যা উভয়েরই অপেক্ষাকৃত কম বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত এবং পিতা মাতার প্রতি যাহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি হয় পুত্র কন্যা উভয়কেই এই রকম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

কম বয়সে বিবাহের ফল স্বরূপ শারীরিক অপকার হয় কি না এখন এই কথার আলোচনা আবশ্যক। যাঁহারা বাল্যবিবাহের বিরোধী তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, যেখানে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকে, সেখানে লোকের শরীর দুর্ব্বল হয়, এবং উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতার উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই মত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বিবেচনা করা আবশ্যক।

প্রথম কথা এই যে উত্তর পশ্চিমে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু সেখানকার লোক বেশ বলিষ্ঠ—বাহুবলে ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষ। বিজ্ঞানের inductive প্রণালী অনুসারে এই একটি মাত্র ব্যতিক্রমে এই মতটি অসিদ্ধ হইতেছে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, যদি বল উত্তর পশ্চিমের জল হাওয়ার গুণে তথায় বাল্যবিবাহের দরুণ শারীরিক অপকার ঘটিতে পারে না, প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে বাঙ্গালার জল হাওয়া উত্তর পশ্চিমের জল হাওয়া অপেক্ষা অনেক পরিমাণে খারাপ। অতএব বাঙ্গালার জল হাওয়ার দোষে তথায় লোকের শরীর দুর্ব্বল হয়, বাল্যবিবাহের জন্য হয় না।

তৃতীয় কথা এই যে বাঙ্গালার শুধু মানুষ যে দুর্ব্বল তা নয়, ছাগ, মেষ, গো মহিষাদিও দুর্ব্বল। ইহাতেই বোধ হয় যে বাঙ্গালায় এমন একটা কিছু আছে যাহা বাঙ্গালার শুধু মানুষকে নয় গো মেষাদিকেও দুর্ব্বল করে। সে জিনিসটা বাল্যবিবাহ নয়, কারণ গো মেষাদির বাল্য বিবাহ নাই। রবীন্দ্র বাবু বাঙ্গালার বাঘের দৃষ্টান্ত দিয়া এই যুক্তিটা কাটিয়া ফেলিতে

চান। কিন্তু বাঙ্গালার জল হাওয়া বা বন জঙ্গল বাঘের স্বাস্থ্যকর বা উপযোগী হইতে পারে, মানুষের বা গো মেষাদির না হইতে পারে। এঁদো স্যাৎসেঁতে জায়গায় মশা মাছি কৃমি কীট খুব বাড়ে, কিন্তু মানুষ ও গো মেষাদির স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। রবীন্দ্র বাবু অনুমান করেন যে বাঙ্গালী গো মেষাদি পালন করিতে জানে না বলিয়া বাঙ্গালার গোমেষাদি দুর্ব্বল ও খর্ব্ব। কিন্তু উত্তরপশ্চিমের লোকও ত পশুপালন বিদ্যায় অনভিজ্ঞ, অথচ উত্তরপশ্চিমের গো মেষাদি বিলক্ষণ বলবান। আর বাঙ্গালী পশুপালনে অনভিজ্ঞ বলিয়াই যদি বাঙ্গালার গবাদি দুর্ব্বল হইয়া থাকে তবে বাঙ্গালী নিজের শরীর পালনে অনভিজ্ঞ বলিয়া বাঙ্গালার লোক দুর্ব্বল, একথা বলাই বা চলিবে না কেন?

চতুর্থ কথা এই যে বাঙ্গালার জল হাওয়ার দোষে বাঙ্গালার লোক যে দুর্ব্বল হইয়াছে এরূপ অনুমান করিবার একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় এখনকার ন্যায় প্রবল ও ব্যাপক ম্যালেরিয়া ছিল না। তখন এই বাঙ্গালার লোকই এখনকার অপেক্ষা অনেক গুণে বলিষ্ঠ সুস্থকায় কার্য্যক্ষম ও শ্রমশীল ছিল। আমি সে সময়ও দেখিয়াছি এবং সে সময়ের বাঙ্গালীও দেখিয়াছি। আর এই কয়েক বৎসরের ম্যালেরিয়াতে বাঙ্গালী কি হইয়া গিয়াছে, তাহাও দেখিতেছি। একটা জলপূর্ণ মশকের মুখ খুলিয়া দিলে তাহার জলটা যেমন হুড় হুড় করিয়া বাহির হইয়া যায় এবং মশকটা দেখিতে দেখিতে চুপ্‌সে যায়, এই কয় বৎসরের ম্যালেরিয়াতে তেমনি বাঙ্গালীর শারীরিক বল যেন হুড়হুড় করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে এবং তাহার দেহটা দেখিতে যেন চুপ্‌সে গিয়াছে। জল হাওয়ার এমন সর্ব্বনেশে প্রতাপ চক্ষে দেখিয়া কেমন করিয়া বলি যে বাঙ্গালার জল হাওয়ার দোষ বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার অন্তত একটা অতি প্রবল ও গুরুতর কারণ নয়। আর বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার এমন প্রবল কারণ চক্ষের উপর থাকিতে যাঁহারা ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা না করিয়া বাঙ্গালীকে বীর করিবার জন্য বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইবার অলীক আশায় বসিয়া থাকেন, তাঁহারা যে নিতান্তই কর্ত্তব্য পরাঙ্‌মুখ—এ কথাই বা না বলি কেমন করিয়া?

পঞ্চম কথা এই যে, বাঙ্গালার ট্যাস ফিরিঙ্গিরা বাল্যবিবাহ করে না—

ইংরাজদের ন্যায় বেশি বয়সে বিবাহ করে। কিন্তু তাহারা বাঙ্গালীদের অপেক্ষা বলবান্ নয়। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে বাঙ্গালার জল হাওয়ার কি অপর কিছুর দোষে বাঙ্গালায় মানুষ দুর্ব্বল হয়, বাল্যবিবাহের জন্য হয় না।

ষষ্ঠ কথা এই,—(১) বাঙ্গালীর আঁতুড় প্রণালীর দোষে বাঙ্গালায় অনেক শিশু মরে এবং বাঙ্গালীর শরীর প্রথম হইতেই দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়, এ কথা সকলেই বলিয়া থাকেন। (২) বাঙ্গালী সন্তান পালন করিতে জানে না বলিয়া বাঙ্গালায় অনেক বালক বালিকা মরে এবং বাঙ্গালী প্রথম হইতেই দুর্ব্বল ও রুগ্ন হয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। (৩) বাঙ্গালীর খাদ্য খুব পুষ্টিকর নয় এবং বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকেই যথেষ্ট পরিমাণ আহার পায় না বা করে না,—এ কথা সকলেই জানেন। (৪) বাঙ্গালী ব্যায়াম অভ্যাস করে না এবং সেই জন্য বাঙ্গালীর দেহ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয় না, বাঙ্গালীর মধ্যে লাঠিয়ালদিগের ন্যায় যাহারা ব্যায়াম অভ্যাস করে তাহারা বেশ বলিষ্ঠ এ কথা সকলেই জানেন ও বলিয়া থাকেন। (৫) স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতা হেতু বাঙ্গালি অস্বাস্থ্যকর প্রণালীতে জীবনযাপন করে, এ কথা সকলেই বলিয়া থাকেন। (৬) এখনকার শিক্ষাপ্রণালীর দোষে বাঙ্গালী রুগ্ন হইতেছে এ কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। (৭) বাঙ্গালীর দুর্ব্বল হইবার আরও অনেক কারণ আছে। জড়বিজ্ঞানের inductive প্রণালীতে যদি বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার কারণ নিরূপণ হয়, তবে এই সমস্ত কারণ গুলি হইতে কতটা দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয় তাহা নির্ণয় করিয়া যদি দেখা যায় যে আরও দুর্ব্বলতা আছে তখন সেই অবশিষ্ট দুর্ব্বলতা বাল্যবিবাহ ঘটিত কি না বিচার করিতে হইবে। এই সমস্ত কারণ হইতে কতটা দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয়, এই সমস্ত কারণ নষ্ট করিলেই নির্ণয় করিতে পারা যায় নতুবা পারা যায় না। অতএব অগ্রে এই সকল কারণ নষ্ট করাই সংস্কারকদিগের যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত কাজ।

কোন কোন দেহ বিজ্ঞানবিদ্ বলিয়া থাকেন যে স্ত্রীলোক প্রথম রজস্বলা হইবার পর কিছু দিন না গেলে গর্ভ ধারণের উপযোগী হয় না এবং রজস্বলা হইবার পরই গর্ভধারণ করিলে সেই গর্ভজাত সন্তানও দুর্ব্বল হয় এবং তাহাদের নিজেরও শারীরিক অনিষ্ট হয়। প্রথমে তাহাদের গর্ভধারণের

উপযোগী হইবার এবং গর্ভজাত সন্তানের কথা বিবেচনা করা যাক্। প্রথম রজস্বলা হইবার পরই স্ত্রীলোক গর্ভধারণের উপযোগী হয় না এই মতের পক্ষে সাধারণ-কথার যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু পরীক্ষার্ বা experiment-এর ফল প্রদর্শিত হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানের যুক্তির সফলতা যে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না তাহা সকলেরই জানা আছে। তা ছাড়া অনেক বিষয়েই দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের মতামতের স্থিরতা বা ঠিকানা নাই। মাংস খাওয়া ভাল কি মন্দ, ঘি খাওয়া ভাল কি মন্দ, পশমী বস্ত্র ব্যবহার করা ভাল কি মন্দ, জ্বর হয় কেন, ম্যালেরিয়া কি, মাথা ধরে কেন, খোষ হয় কেন—এইরূপ ছোট কথা বল, বড় কথা বল, বিজ্ঞানে কোন কথারই ত একটা মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায় না, সকল কথাতেই ত theory, hypothesis, মতের মারামারি ঠেঙ্গাঠেঙ্গি দেখিতে পাই। তবে এই বিবাহের বয়স ও গর্ভধারণের বয়স সম্বন্ধে জড়-বিজ্ঞানে যাহা বলে কেমন করিয়া তাহা বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করি? আর এ বিষয়ে জড়-বিজ্ঞানের মতটা যে কি তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। কোন্ বিজ্ঞানবিদ্ ষোল বৎসরে স্ত্রীলোকের বিবাহের ব্যবস্থা দেন। ইহার অর্থ এই যে ষোল সতর বৎসরে গর্ভধারণ করিলে অনিষ্ট হয় না। আবার অপর কোন বিজ্ঞানবিদ্ বলেন যে কুড়ি বৎসরের পূর্ব্বে গর্ভধারণ বিষম অনিষ্টকর। অতএব কোন্ বিজ্ঞানবিদের মত অনুসরণ করিতে হইবে তাহাও ঠিক করা যায় না এবং বিজ্ঞানবিদেরা কি প্রণালীতে আপন আপন মত স্থির করেন তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। বিজ্ঞানের একটা যুক্তি এই যে দাঁত বাহির হইলেই কঠিন দ্রব্য খাইতে দেওয়া বা খাইতে পারা যায় না। কিন্তু যাহারা দরিদ্রতা বশত ছেলেকে দুধ খাইতে দিতে পারে না, তাহাদের ছেলেরা দাঁত বাহির হইলেই অনেক স্থলে দাঁত বাহির হইবার পূর্ব্ব হইতেই কঠিন দ্রব্য খাইয়া থাকে। তবে যে বয়সে দাঁত বাহির হয়, সে বয়সে কঠিন দ্রব্য ভাল পরিপাক হয় না বলিয়া যাহারা দুধ কিনিতে পারে তাহারা দাঁত বাহির হইবা মাত্র ছেলেকে কঠিন দ্রব্য খাইতে দেয় না। তা ছাড়া প্রথম যে দাঁত উঠে, আট নয় বৎসরে তাহা পড়িয়া গিয়া আবার নূতন দাঁত হয়। অতএব দাঁতের উপমা খাটাইতে হইলে বৈজ্ঞানিককে প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে যে, উনিশ কুড়ি বৎসরে স্ত্রীদিগেরও নূতন

রকম একটা সংস্কার হয়। পশু পক্ষী ঐন্দ্রিয়িক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই গর্ভধারণ করিয়া থাকে এবং গর্ভধারণ বশত তাহাদের কোন ক্ষতি হয় বলিয়া বোধ হয় না। মনুষ্য সম্বন্ধে ভিন্ন নিয়ম, জড়বিজ্ঞানবিদ্ যদি এই কথা বলেন, তবে তাঁহাকে এই ভিন্নতার কারণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে হইবে। বুঝাইলে তাঁহার কথা মাথা পাতিয়া লইব, নচেৎ লইব না। ঐন্দ্রিয়িক-পূর্ণতা প্রাপ্তির পরই যে সন্তান জন্মে, তৎসম্বন্ধেও ঠিক এই রকম কথা বলি। এরকম সন্তান দুর্ব্বল হইবে বলিয়া শুধু সাজান কথার যুক্তি দিলে চলিবে না, পরীক্ষার ফল দেখাইতে হইবে। বাঙ্গালীর ছেলে দুর্ব্বল হইয়া থাকে ইহা পরীক্ষার ফল বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারেনা। বাঙ্গালীর ছেলে দুর্ব্বল হইবার অনেক কারণ পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। অতএব বাঙ্গালীর ছেলে দুর্ব্বল হয়, ইহা এরূপ গর্ভজাত-সন্তানের দুর্ব্বলতার প্রমাণ বলিলে ন্যায়শাস্ত্রানুসারে সাধ্য-সম দোষ অর্থাৎ Begging the question যাহাকে বলে, সেই দোষ ঘটিবে। অপর দিকে গাভী প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশুর মধ্যে দেখা যায় যে ঐন্দ্রিয়িক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পর তাহারা প্রথম যে বৎস প্রসব করে, তাহা দুর্ব্বল হওয়া দূরে থাক, তাহাদের অপর সমস্ত বৎসাপেক্ষা বলিষ্ঠ হয়। মানুষের বেলা কেন অন্যরূপ হইবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে না বুঝাইলে, তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে না।

এখন তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা যাউক যে ঐন্দ্রিয়িক-পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পরেই গর্ভধারণ করিলে গর্ভধারিণীর স্বাস্থ্যের হানি হয় এবং সেই গর্ভজাত সন্তানও দুর্ব্বল হয়। শুধু ইহাই নয়। এই প্রসঙ্গে আরো গুটিকতক কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। এখন কলিকাতা অঞ্চলে স্ত্রীলোকের বিশ ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে দেখা যাইতেছে। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। কলিকাতার ন্যায় সহরে এখন স্ত্রীলোকেরা, বিশেষ অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা বড়ই শ্রম-বিমুখী হইয়াছে। তাহারা রন্ধন, গৃহ মার্জ্জন প্রভৃতি শ্রমসাধ্য গৃহকার্য্য করে না। যে সকল কার্য্য তাহাদের আপনাদের করা উচিত তাহা দাস দাসী দ্বারা করাইয়া লয়। আপনারা শুইয়া বসিয়া বেশ-বিন্যাস করিয়া নাটক নবেল পড়িয়া গল্প গুজব করিয়া তাস খেলাইয়া দিন কাটায়। এজন্য তাহারা বড়ই রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

তাহাদের অম্লরোগ, অজীর্ণ-রোগ, অপস্মার রোগ, প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি রোগের জ্বালায় আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আর তাহাদের স্তন্য পান করিয়া তাহাদের সন্তানাদি ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে। আবার তাহাদের এখন বৎসরে বৎসরে সন্তান হইতেছে, সূতিকাগার হইতে বাহির হইতে না হইতে আবার সূতিকাগারে যাইবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। তাহাদের বাবু মহাশয়েরাও (আজ কাল সহরে নবীনারা পতিকে বাবু বলিয়া থাকেন) তাহাদের বাবু মহাশয়েরাও স্বেচ্ছাচারী হইয়াছেন। তাঁহাদের নীতিজ্ঞানও নাই, ধর্ম্মজ্ঞানও নাই। আছে কেবল এক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা জ্ঞান। ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করা ভিন্ন বিবাহে তাহাদের অন্য উদ্দেশ্য আছে বলিয়া বোধহয় না। তাই তাঁহারা আপন আপন পত্নী মহোদয়াদিগকে মোমের পুতুল করিতেছেন। আবার তাঁহারা সকাল সন্ধ্যা বিচার করেন না, দিবা রাত্রি বিচার করেন না, অসুখ অসুস্থতা বিচার করেন না, তিথি বিচার করেন না ঋতুকাল বিচার করেন না, সূতিকাগার বিচার করেন না। তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে না ত, হইবে কাহার? তাঁহাদের মহিষী মহাশয়েরা যৌবনে বৃদ্ধা হইবেন না ত, হইবে কে? তাঁহাদের ছেলে মেয়ে রুগ্ন হইবে না ত হইবে কে? বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দিলে ইহার প্রতীকার হইবে না। যে স্বেচ্ছাচারী অসংযমী ধর্ম্মজ্ঞানহীন সে চল্লিশ বৎসর বয়সে ত্রিশ বর্ষ বয়স্কা স্ত্রী বিবাহ করিলেও পাঁচ বৎসরের মধ্যে আপনি বুড়া হইবে, স্ত্রীকে বুড়ী করিবে এবং পাঁচটা ছেলে মেয়েকে যমের বাড়ী পাঠাইয়া দিবে। স্ত্রীসঙ্গম অতি ভয়ানক কাজ। খুব সাবধানে নানা দিক দেখিয়া, বিশেষ সংযমী না হইয়া স্ত্রী-সঙ্গম করিলে, যে বয়সেই স্ত্রী সঙ্গম কর, স্ত্রীসঙ্গমের ফল অতি ভয়ানক হইবে। সেই জন্য মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীগমন সম্বন্ধে অতি কঠোর নিয়ম করিয়াছেন। আমরা নাকি ভারি সভ্য হইয়াছি তাই মন্বাদিকে বর্ব্বর বলিয়া উপহাস করি। মন্বাদির কথা পুরাতন কথা বলিয়া তুচ্ছজ্ঞান করি। কিন্তু দেখিতেছি যে, পুরাতন কথা না মানিলে চলে না। দেখিতেছি যে, "আমরা পুরাতন কথা যতই ছাড়িতে চাই সে আমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না! পুরাতন কথা বার বার তুলিতেই হইবে—নাচার।"

বোধ হয়, এখন বুঝা গেল যে, স্ত্রীগমনাদি শারীরিক ক্রিয়া শুধু শারীর বিজ্ঞানের নিয়মাধীন হইলে দোষশূন্য হয় না। শারীরিক ক্রিয়াসম্বন্ধে শারীর

বিজ্ঞানের যে ব্যবস্থা তাহা সমাজ, নীতি ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ব্যবস্থার অধীন না হইলে, শারীরবিজ্ঞানের ব্যবস্থা কিছুমাত্র কার্য্যকর হয় না। অতএব স্ত্রীগমনাদি শারীরিক ক্রিয়া সর্ব্বপ্রকারে দোষ শূন্য করিবার জন্য নীতি শিক্ষা ও কঠোর নৈতিকশাসন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে তাহা ছিল। পূর্ব্বে শৈশব হইতে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা হইত, পারিবারিক নিয়মে, শৃঙ্খলায় ও শাসনে বাল্যকাল হইতে সংযম অভ্যাস হইত, এবং জীবন প্রণালীর গুণে চরিত্র গঠিত হইত। এখন সে সমস্তেরই অভাব হইতেছে। এখন সুশিক্ষা নাই, ধর্ম্মচর্য্যা নাই, সংযম সাধন নাই, চরিত্র গঠন নাই। ইংরাজি শিক্ষার গুণে ও প্রভাবে আজকাল স্বয়ং পিতা মাতাই সন্তানের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। পিতা মাতা আপনারাই যথেচ্ছাচারী, সন্তানকে সংযমী ও ধার্ম্মিক করিবেন কি করিয়া? শিক্ষা, ধর্ম্মচর্য্যা এবং পারিবারিক শাসনের অভাবে সন্তান আজ পিতা মাতাকে গ্রাহ্য করে না, যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দিলে, যথেচ্ছাচারিতা বাড়িবে বই কমিবে না, বিবাহের ফল আরো মন্দ বই ভাল হইবে না। অতএব নীতিশিক্ষা, ধর্ম্মচর্য্যা ও কঠোর পারিবারিক শাসন পুনঃপ্রবর্ত্তিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। বিবাহ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া। অতএব বিবাহের যে পার্থিব উদ্দেশ্য আছে তাহা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মে সাধিত হওয়া আবশ্যক। শারীর বিজ্ঞান স্ত্রীগমন সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি শারীরিকক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রমাণ করিয়া দিবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপায়েই তাহা পালন করা সম্ভব ও কর্ত্তব্য। শারীরবিজ্ঞান মানিতেই হইবে। কিন্তু শারীরবিজ্ঞানকে সমাজ, নীতি ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের অধীন না করিলে শারীর-বিজ্ঞান একেবারে নিরর্থক হইবে। দেখা গিয়াছে যে বিবাহের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধনার্থ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া আবশ্যক। অতএব অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে সন্তানাদির বিবাহ দিয়া সন্তানাদি যাহাতে নির্দ্দোষ প্রণালীতে বিবাহের শারীরিক ও পার্থিব উদ্দেশ্য সাধন করে, শিক্ষার সাহায্যে ও কঠোর পারিবারিক শাসন দ্বারা পিতা মাতা প্রভৃতি গুরু জনের তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। পিতা মাতা যদি তাহা না করিতে পারেন, তবে বুঝিতে হইবে যে আমাদের আর রক্ষা নাই—বিবাহের বয়স

বাড়াইয়াই কি আর আকাশ পাতাল ভেদ করিয়াই কি, কোন রকমেই আমাদের আর কোন বিষয়ে আশা ভরসা নাই। সুশিক্ষা ও ধর্ম্মচর্য্যা আমাদের আজ এত আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া হিন্দু ধর্ম্মের এই নূতন আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ইহাকে যাঁহারা নব্যবঙ্গের অকাল বার্দ্ধক্য বা বাঙ্গালা সাহিত্যে শীতের বাতাস বলিয়া বিদ্রূপ বা ক্ষোভ করেন, তাঁহারা বিষম ভুল বুঝিয়াছেন।

এখন স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহের বয়স এক রকম নিরূপণ করিলেই আজি-কার কাজ শেষ হয়। বিবাহের কথা যে রূপ পর্য্যালোচনা করা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স বিবাহ হওয়া উচিত। কাহার কত বয়সে বিবাহ হইলে ভাল হয় এখন তাহাই বিবেচনা করা উচিত। পুরুষের সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে অধ্যয়ন শেষ করিয়া পুরুষ বিবাহ করিবে। আজ কাল কুড়ি হইতে পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে অধ্যয়ন শেষ হয়। অতএব কুড়ির পর পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত। তদগ্রে হওয়া উচিত নয়। কারণ নিজে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে পুরুষ স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া গড়িয়া লইতে পারিবে না। স্ত্রীর সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে প্রথম রজোদর্শনের পূর্ব্বে স্ত্রীর বিবাহ হওয়া উচিত। শারীর বিজ্ঞানে বলে এবং আমরা নিজে নিজেও বুঝিতে পারি যে স্বাভাবিক গতিতে বার বৎসরের পূর্ব্বে প্রায়ই রজোদর্শন হয় না। অতএব কন্যার শারীরিক গঠনাদি বিবেচনা করিয়া ১০ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহার পূর্ব্বে বিবাহ দিলে কন্যা রীতিমত পতি গৃহে বাস করিয়া পতির এবং পতির পিতা মাতা প্রভৃতির নিকট শিক্ষা লাভ করিতেও পারে না। অতএব অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিবার যে উদ্দেশ্য তাহা ও ভাল সিদ্ধ হয় না। কিন্তু বার তের বৎসরের পরেও বিবাহ হওয়া উচিত নয়। যে বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যা-ত্মিক, শিক্ষা সম্বন্ধীয় সুবিধা বিবেচনা করিয়াই সে বিবাহের বয়স নিরূপিত হওয়া আবশ্যক।

যে রকম বয়সের কথা বলা গেল সেই রকম বয়সে পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে নবদম্পতীকে কিছু দিন কঠিন শাসনা-ধীন রাখিতে হইবে এবং উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও কর্ম্মের দ্বারা জীবনযাত্রা সম্বন্ধীয়

সকল বিষয়ে গূঢ় ও গুহ্য কথা সকল শিখাইতে হইবে। গুরুজনের কাছে এরূপ শিক্ষা না পাইলে পদে পদে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হয়। পুস্তকে এরূপ শিক্ষা পাওয়া যায় না। আজকাল আমাদের এরূপ শিক্ষার নিতান্ত অভাব হইয়াছে। আমাদের সন্তানেরা এরূপ শিক্ষা পায়, যেমন করিয়া হউক, আমাদের সকলেরই তাহার উপায় করিতে হইবে। নহিলে আমাদের মঙ্গল নাই। সুশিক্ষা ও সুশাসনের দ্বারা নবদম্পতীকে ধর্ম্মের পথে সুদৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সংসারধর্ম্ম করিতে দিতে হইবে। তবেই তাহারা বিবাহের মহদুদ্দেশ্য সাধন করিতে সক্ষম হইবে। আর সংযমী হইয়া সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের রোগ শোক ও শারীরিক দুর্ব্বলতাও উৎপন্ন হইবে না। রোগ শোক ও দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ—অনিয়ম অনাচার ও অত্যাচার—অল্প বয়স নয়। বয়স অল্প হইলেও ভোগে যদি সংযম শুদ্ধাচার ও সুনিয়ম থাকে, তাহা হইলে ভোগ হইতে রোগ শোক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয় না।

যুবক মহলে একটা কথা উঠিয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত স্ত্রীপুত্রকে প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না হয়, সে পর্য্যন্ত বিবাহ করা উচিত নয়। এটা ইংরাজী মত। কিন্তু মতটা পাকা কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। পাকা হইলে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় বার আনা ভাগ লোকের বিবাহ নিষেধ করিতে হয়। কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীর সংখ্যা সর্ব্বত্রই অত্যন্ত অধিক, সমাজের প্রায় বার আনা ভাগ। স্ত্রী এবং চারি পাঁচটি করিয়া সন্তানকে অন্ন বস্ত্র দিয়া সচ্ছন্দে রক্ষা করিতে পারে, এমন সঙ্গতি তাহাদের কখনই হয় না। অতএব উল্লিখিত মতটি যদি পাকা হয় তবে পৃথিবীর বার আনা লোকের বিবাহ হওয়া উচিত হয় না। কিন্তু বিবাহ অনুচিত বলিয়া রিপু ত লোপ হয় না; কাজেই যথেচ্ছা বিহার ও সন্তান বধ ভিন্ন আর উপায় থাকে না। যে মত অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে সমাজ যথেচ্ছাচার ক্ষেত্র হইয়া পড়ে, সে মতের সত্যতা বা সারবত্তা বিষয়ে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। ফল কথা, যে দেশের ঐ মত সে দেশেও ঐ মতানুসারে কার্য্য হয় না। হইলে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের লক্ষলক্ষ দরিদ্র এবং নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীদিগের মধ্যে বিবাহ প্রথা দেখিতে পাওয়া যাইত না। এবং তাহাদের মধ্যেও যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত এবং যথেচ্ছাগমন নিষিদ্ধ দেখিতে পাওয়া

যায়, তাহার অর্থ এই যে মানবের নীতি ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষাই বিবাহের উদ্দেশ্য, বিবাহ করিয়া সন্তান উৎপন্ন করিয়া সন্তানাদির ভরণপোষণ করা বিবাহের উদ্দেশ্য নয়। তবে কেন বল যে, যে পর্য্যন্ত স্ত্রী পুত্রাদিকে প্রতিপালন করিবার মতন সঙ্গতি না হয় সে পর্য্যন্ত বিবাহ করিব না, বা বিবাহ করা অন্যায়? তবে কি স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনের কথাটা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে? না, তা নয়। কিন্তু ভিন্ন রকমে উহার মীমাংসা করিতে হইবে। অর্থাৎ বিবাহের নৈতিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধনার্থ বিবাহের যে বয়স প্রশস্ত হয় সেই বয়সে বিবাহ করিয়া স্ত্রীপুত্রাদি প্রতিপালনের ভার যত লঘু করিতে পারা যায় তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। উপায়ও অনেক আছে। এক উপায় পারিবারিক সাহায্য। যে প্রকার পারিবারিক প্রণালী হইলে আপনার স্ত্রী পুত্রাদির প্রতিপালনার্থ পিতা পিতৃব্য বা সহোদরাদির সাহায্য পাওয়া যায়, পারিবারিক প্রণালী সেই প্রকার হওয়া উচিত। আমাদের পারিবারিক প্রণালী সেই প্রকার, ইহা আমাদের বড় সুবিধা ও সৌভাগ্যের কথা। আমরা নিতান্ত দৃষ্টিহীন হইয়াছি বলিয়া এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছি যে আমাদের পারিবারিক প্রণালী ভাঙ্গিয়া যাওয়া উচিত। আমাদের প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে বুঝিতে পারিতাম যে আমাদের পারিবারিক প্রণালীর বিনাশ বাঞ্ছনীয় নয়, সুসংস্কারমাত্র আবশ্যক। ইংলণ্ডাদি দেশে আমাদের ন্যায় পারিবারিক প্রণালী নাই। ইহা তথাকার দুর্ভাগ্য। ইহার অর্থ এই যে ঐ সকল দেশ চিরকাল পার্থিবতা লইয়াই থাকিবে, সভ্যতা কখনই তথায় নীতি ও ধর্ম্মমূলক হইতে পারিবে না। আর এক উপায় রিপু সেবায় সংযম—যাহাতে বেশি সন্তান না হয় তাহার উপায় বিধান। সন্তানোৎপাদন অনেক পরিমাণে মানুষের স্বেচ্ছাধীন কাজ। সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে পিতা মাতার সন্তানকে সর্ব্বদা স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া উচিত। কুরুচির ধূয়া তুলিলে চলিবে না। ঐ ধূয়া ইউরোপের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, আমাদেরও করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এবং সন্তান যাহাতে সেই সকল উপদেশ পালন করে পিতামাতাকে তেমনি করিয়া গৃহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর এক উপায় জীবনব্যাপী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য। পানে, ভোজনে, পরনে, শয়নে, বিলাসে, বিহারে,—সকল বিষয়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য। দুই টাকা যোড়া কাপড় পরিলে যদি চলে, তবে

আট টাকা যোড়া কাপড় পরি কেন? দুই টাকার জুতায় যদি চলে, তবে দশ টাকার জুতা পায়ে দি কেন? দাল ডালনায় যদি দেহের পুষ্টিসাধন হয়; তবে কালিয়া পোলাও খাই কেন? রুটি খাইলে যদি শরীরে বেশী বল হয় তবে কেবল খাইতে ভাল বলিয়া, অথবা লোকে বাবু বলিবে বলিয়া লুচি খাই কেন? হাঁটিতে যদি পারি, তবে গাড়ি ঘোঁড়া চড়ি কেন? সাধ করিয়াই ত সর্ব্বনাশের পথে যাইতেছি। ইউরোপ যাইতেছে বলিয়া আমরাও ত দেখাদেখি যাইতেছি। কিন্তু ও পথ হইতে ফিরিতে হইবে। যদি মানুষ হইতে চাই, যদি জাতি হইতে চাই, যদি মোক্ষ পথের পথিক হইতে চাই তবে ঐ সর্ব্বনেশে পথ হইতে ফিরিতেই হইবে। ইউরোপে গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি মহাপুরুষেরা ও পথে চলেন না। চলেন না বলিয়াই তাঁহারা মহাপুরুষ। ও পথের শেষ এই পৃথিবীতেই—পৃথিবীর বাহিরে যাইতে হইলে অন্য পথে—কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের পথে চলিতে হইবে। পার্থিবতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। পৃথিবী নয়, পার্থিবতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। পৃথিবী অসীম নয়। অতএব পার্থিবতার পথে চলিলে আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশ্ব ফাঁপরে পড়িতেই হইবে। ইউরোপ ও আমেরিকাও পড়িবেন—ঐ বিষম পার্থিবতার পথ না ছাড়িলে আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশ্ব ইউরোপ এবং আমেরিকাকেও ফাঁপরে পড়িতে হইবে—এখনি কোন্ না তাহার আভাস পাইতেছেন? ঐ সব socialism, communism, demonstrations of the unemployed—এর আর অর্থ কি? তাই বলিতেছি—এই বেলা আমাদের সেই পুরাতন ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। বিলাতি শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে সেই ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া social evolution বা কালোচিত পরিবর্ত্তনের নাম করিয়া উহার বিনাশ নিবারণ করিব না,—ইহাই বা কেমন কথা? কেন আমরা ত পশুপক্ষী নহি, যে ঝড় বৃষ্টি আসিল বলিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিব বা গাছের ডাল থেকে পড়িয়া পড়িয়া মারা যাইব? আমরা মানুষ—গৃহনির্ম্মাণ করিয়া আমরা ঝড় বৃষ্টি ব্যর্থ করিতে পারি। তাই বলিতেছি, যে কোন প্রকারে আমাদিগকে আবার সেই পুরাতন ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। করিলে আমাদের আর এত অভাব থাকিবে না। আজ কাল যে অভাবের কথা উঠিয়াছে তাহার বার আনা ভাগ বাবুগিরি। ও বাবুগিরি

ঘুচিলে জীবন সংগ্রাম প্রভৃতি বড় বড় আমদানি করা কথাগুলাও বড় একটা শুনিতে হইবে না। আর যদিই ইংরাজের সহিত জীবনসংগ্রাম চলে, তথাপি ঐ বাবুগিরি না ছাড়িলে সে সংগ্রামে আমাদের জয়লাভ হইবে না। বাবুগিরি লইয়াই ত ইংরাজের সহিত আমাদের প্রকৃত যুদ্ধ। ভাল, বাবুগিরি ছাড়িলে আর যুদ্ধ চলিবে কেমন করিয়া? সন্ন্যাসীর মতন সর্ব্বজয়ী ও দিগ্বিজয়ী আর কে আছে? আত্মজয়েই দিগ্বিজয়। অতএব কঠোর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া আমাদের আত্মজয় করিতে হইতেছে। আত্মজয়ী ব্রহ্মচারী হইলে আমাদের এ অভাব থাকিবে না। অভাব কমিলে স্ত্রীপুত্রাদির প্রতিপালনের ভারও লঘু হইয়া পড়িবে। সেইরূপ করাই প্রকৃত পদ্ধতি। অভাব বেশি বলিয়া বিবাহ না করা বা বিবাহ করিতে অধিক বিলম্ব করা প্রকৃত পদ্ধতি নয়। ইংরাজদের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা স্বজাতীয় দরিদ্রদিগের মধ্যে বিবাহ প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করেন না, দরিদ্রেরা যাহাতে সুরাপানাদি দ্বারা অর্থ নষ্ট না করে, সেই চেষ্টা করেন। আর এক উপায় উপার্জ্জন বৃদ্ধি করা। ব্রহ্মচারী হইলে উপার্জ্জন করিতে হইবে না এমন কোন কথা নাই। ব্রহ্মচারীর বিলাসিতা বাবুগিরিই নাই, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত আছে—পরিবার পালন, সমাজ সেবা, ধর্ম্মচর্চা এবং তদন্তর্গত লোকহিতানুষ্ঠান প্রভৃতি কর্ত্তব্য সাধ্য কর্ম্ম ত আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিলাসিতা বাবুগিরি নাই। নিজের আহার পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে তিনি ব্রহ্মচারী। তিনি সুনির্ম্মিত দ্বিতল অট্টালিকায় বাস করেন সত্য। সে কিন্তু ভোগ স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য নয়, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য। তিনি ব্রহ্মচারী বটে কিন্তু তাঁহার উপার্জ্জনও যেমন বেশী, তাঁহার লোকহিতকর কার্য্যও তেমনি অতুলনীয়। তিনি বিলাসপ্রিয় বাবু হইলে আজ কেহ তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় নাম শুনিতে পাইত না, তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহার ধনে আজ এত উপকৃত হইত না। বাবু অপেক্ষা ব্রহ্মচারীর অর্থে অধিকার বেশি, সদ্ব্যয়ের আবশ্যকতাও বেশি। ব্রহ্মচারী হইলে—বৃক্ষতলবাসী, ভস্মমাখা ভিক্ষোপজীবী ন্যাংটা সন্ন্যাসী নয়—জিতেন্দ্রিয় বিলাসবিদ্বেষী ধর্ম্মানুরাগী কর্ত্তব্যপরায়ণ সর্ব্বলোকহিতৈষী ব্রহ্মচারী হইলে আমাদেরই বেশি অর্থ আবশ্যক হইবে। অথচ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া বেশি অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিলে ভগ্ন হৃদয়েও মরিতে হইবে না অথবা সিংহ ব্যাঘ্র বা ইউরোপ বাসীদিগের

ন্যায় আপনা আপনি মারা মারি গুঁতো গুঁতি কামড়া কামড়ি করিতেও হইবে না। আবার বাবুগিরি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী হইতে পারিলে আমাদের অর্থোপার্জ্জনের সুবিধাও হইবে। যেখানে বাবুগিরি সেখানে বিষয় বুদ্ধি থাকে না। এখন আমরা অর্থোপার্জ্জনে যে এত অক্ষম হইয়াছি তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে বাবুগিরি করি বলিয়া আমরা অর্থসঞ্চয় করিতে পারি না। বরং ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ি। এইজন্য আমাদের মধ্যে মূলধনেরও সৃষ্টি হইতে পারিতেছে না। অতএব অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া লোকহিতানুষ্ঠান, পরিবার পালন, শরীর রক্ষা, আত্মমর্যাদাবর্দ্ধন প্রভৃতি অবশ্য পালনীয় ধর্ম সাধন করিতে হইলে ব্রহ্মচারী হওয়া--harsh ascetc নয়—উন্নতমনা বিশুদ্ধ চিত্ত লোকহিতৈষী অনন্তপথানুগামী ব্রহ্মচারী হওয়া—নিতান্ত আবশ্যক। মনুষ্য জীবন স্বপ্নও নয়, মরীচিকাও নয়। উহার আদি অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উহা একটি অতি কঠিন সমস্যা। অসাধারণ সাধনা ভিন্ন উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নয়। আর সে সাধনা শুধু এই পৃথিবীর জন্য হইলে চলিবে না—অনন্তকালের উপযোগী হওয়া চাই। অনন্তকালের উপযোগী হইলে এই পৃথিবীরও উপযোগী হইবে। পৃথিবী অনন্ত কালসমুদ্রের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিন্দু বই নয়। সেই বিন্দুকে সেই কাল সমুদ্রে মিশাইতেই হইবে।

কিন্তু যদি কোন কারণে কোন ব্যক্তি প্রশস্ত কালের মধ্যে বিবাহ করিতে না পারেন, অর্থাৎ যদি তাঁহাকে ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করিতে হয়, তবে তিনিও কি সেই বার বা তের বৎসরের মেয়ে বিবাহ করিবেন? করিবেন বৈ কি, তদপেক্ষা বেশী বয়সের মেয়ে পাইবেন কোথা? কিন্তু তাহা হইলে বয়সের কিছু বেশী প্রভেদ হইবে না? হইবে কিন্তু নাচার। সাধারণ নিয়মানুসরণ করিতে না পারিলেই কিছু না কিছু গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। আর অমন প্রভেদ, পছন্দের বিবাহেও অনেক স্থলে ঘটিয়া পড়ে। তাই সাহেবদের মধ্যে অনেক ত্রিশ বৎসরের বর ও ষাট বৎসরের কন্যা এবং কুড়ি বৎসরের কন্যা ও পঁয়ষট্টি বৎসরের বর দেখিতে পাওয়া যায়। এরকম দুই টা দশটা অসদৃশ বিবাহ সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। তজ্জন্য গণ্ডগোল করিবার প্রয়োজন নাই *।

* কন্যার বিবাহের বয়স ১০ হইতে ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্মশানে শিব।

বড ভালবাসি তোমারে,
প্রেমের প্রতিমা হেন দেখি না কারে!
কি জানি কি মনে লয়
পরাণ পাগল হয়
দেখিলে ও রূপরাশি (ভাসি) নয়ন-ধারে!

ইহা শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ১২ বৎসরে বিবাহ হইতে পারিবার পক্ষে মনুর স্পষ্ট বিধান আছে।

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বর॥ (৯অ—৯৪)

ত্রিশ বৎসরের পুরুষ মধুর দর্শনা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। চব্বিশ বৎসরের পুরুষ আট বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে। তবে যদি গৃহস্থাশ্রমের হানি হয়, তাহা হইলে আরো সত্বর বিবাহ করিতে পারিবে।

ফলতঃ মনুসংহিতা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে মনুর মতে কন্যার বিবাহের বয়সের ৮ কি ১০ কি ১২ এরূপ একটা কড়াকড় নির্দ্দেশ নাই। কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে পিতা কর্ত্তৃক তাহার সম্প্রদান হইলেই হইল, এ সম্বন্ধে মনুসংহিতার ইহাই পরিষ্কার তাৎপর্য্য। পশ্চাৎবর্ত্তী কোন কোন ঋষি দশ বৎসরের মধ্যে কন্যাকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং দশ বৎসরের পর কন্যা ঋতুমতী হয় বলিয়া দশ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহের প্রশস্ত কাল বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। মনুর সহিত এ ব্যবস্থার প্রকৃত বিরোধ নাই। মনুর এবং অন্যান্য সকলেরই মত এই যে কন্যা ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ আবশ্যক। তবে পরবর্ত্তী ঋষিরা তৎপর ঋতু হওয়া সম্বন্ধে একটু বেশী আশঙ্কাযুক্ত হইয়া দশ বৎসরের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহের প্রশস্ত কাল বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। আমরা যদি তত আশঙ্কাযুক্ত না হই, আর হইবারও বিশেষ কারণ দেখা যায় না, তাহা হইলে মনুর ব্যবস্থামতে কন্যার রজোদর্শনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার শারীরিক গঠনাদি বিবেচনা করিয়া ১০ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে তাহার বিবাহ দিলে বোধ হয় শাস্ত্র সম্মত কাজই হইবে—কোন ঋষিরই বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে না। পুরুষের বিবাহের বয়স ২০ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছি। ইহা সাধারণ নিয়ম। আবশ্যক হইলে বা কোন রকমে অসঙ্গত না হইলে দুই এক বৎসর এদিক ওদিকও হইতে পারে। সকল নিয়ম সম্বন্ধেই সেরূপ হইয়া থাকে। সে কথা বলা বাহুল্য।

তুমি হে পাগল ভোলা
দয়ার দুয়ার খোলা
জগতে জান না পর কখনো কারে!
নিষ্ঠুর মানুষ হায়
পোড়াইয়া ফেলে যায়
ভুলিয়া সে দয়া মায়া যখন যারে,
হে দেব তখনি তুমি
যেয়ে সে শ্মশান ভূমি
আকুল—অস্থির হও ভাবিয়া তারে!
হেরি সেই ছাই পাঁশে
নয়ন মুদিয়া আসে
দয়ার আঁখি কি তব দেখিতে পারে?
তাই হে কাতর প্রাণে
চেয়ে আছ শূন্য পানে,
কে বোঝে হৃদয় তব সুধাব কারে?
এত প্রেম এত স্নেহ
জগতে জানে না কেহ,
মাখ সে বিভূতি বুকে আদরে তারে!
পরের জন্য সন্ন্যাসী
তুমিহে শ্মশানবাসী
পর মহাশঙ্খ মালা সে মরার হাড়ে!
এমন হৃদয় আর
আছে কোন দেবতার
কে হেন পরের দুখে কাঁদিতে পারে?
সুখ শান্তি পায় ঠেলি
স্বর্গের সাম্রাজ্য ফেলি
উলঙ্গ সন্ন্যাসী—বেশে (কে) সংসার ছাড়ে
কার হেন দয়া বুকে,
কে হেন পরের দুখে

আকণ্ঠ গরল পান করিতে পারে?
কাঙ্গালের এই ভিক্ষা
দেও দেব এই শিক্ষা
শোষিব গরল সিন্ধু পর উপকারে।

শ্রী গোবিন্দচন্দ্র দাস।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

২।

অনুমান জিনিষটা কি তাহা পূর্ব্ব সংখ্যায় বলা হইয়াছে। এক্ষণে অনুমান সম্বন্ধে কতকগুলি প্রাচীন পরিভাষা বলা যাইতেছে। যাহা দেখিয়া অনুমান করা হয় প্রাচীনেরা তাহাকে হেতু বলেন। যেমন ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করা হইল ধূম—হেতু। যাহার অনুমান করা হয় তাহার নাম সাধ্য। যেমন বহ্নি সাধ্য। হেতু এবং সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ আছে; হেতু ব্যাপ্য, অর্থাৎ সাধ্যের সহিত সমান বা কম স্থানে বর্ত্তমান, এবং সাধ্য ব্যাপক, হেতুর সহিত সমান স্থানে অথবা হেতু অপেক্ষা অধিক স্থানেও বর্ত্তমান হয়। যেমন ধোঁয়া আর বহ্নি। ধোঁয়া হেতু, এবং সাধ্যের ব্যাপ্য; কেননা ধোঁয়া বহ্নি অপেক্ষা অধিক স্থানে কখনই থাকে না। বহ্নি কিন্তু ধোঁয়া অপেক্ষা অধিক স্থানে থাকে। দেখুন তপ্ত লৌহ পিণ্ড বা গুলের আগুণ, উহাতে ধোঁয়া নাই, অথচ বহ্নি আছে। অতএব বহ্নি ব্যাপক। যখন হেতু সাধ্য অপেক্ষা অধিক স্থানে বিদ্যমান হয়, তখন ঐ হেতুকে অসৎ হেতু বলা যায়, কারণ উহা দ্বারা অনুমান সিদ্ধ হয় না। বহ্নিকে হেতু করিয়া যদি কেহ ধোঁয়ার অনুমান করিতে যায়, তাহা হইলে হেতু অসৎ হওয়াতে অনুমান অসিদ্ধ হয়। বহ্নি ও ধোঁয়ার পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু বহ্নির সহিত ধোঁয়ার যে সম্বন্ধ, ধোঁয়ার সহিত বহ্নির সেরূপ সম্বন্ধ নয়। বহ্নি ভিন্ন ধোঁয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু

ধোঁয়া ভিন্ন বহ্নি থাকিতে পারে। এই নিমিত্ত ধোঁয়া ব্যাপ্য, বহ্নি ব্যাপক। যদি পূর্ব্বে আমরা সর্ব্বত্র ধোঁয়ার সহিত বহ্নির একত্রাবস্থিতি দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে ধোঁয়া দেখিয়া বহ্নির অনুমান হয়; কিন্তু যদি বহ্নির সহিত ধোঁয়াকে কখন একত্র থাকিতে দেখি, কখন নাও দেখি, তাহা হইলে পূর্ব্বে 'যেখানে বহ্নি সেইখানে ধোঁয়া' এরূপ নিশ্চয় না হওয়ায় কাজেই বহ্নি দেখিয়া 'ওখানে অবশ্য ধোঁয়া আছে' এরূপ নিশ্চয় হয় না। যেখানে সাধ্যের অবস্থিতি স্থির করা হয়, তাহাকে পক্ষ বলে। যদি কলের ধোঁয়া দেখিয়া বহ্নির অনুমান করা হয়, তাহা হইলে কল পক্ষ। পক্ষে সাধ্যের অবস্থিতি জ্ঞানকে পরামর্শ বলে। এই জন্য সাধারণত অনুমানের লক্ষণ এই রূপ করা হয় যে, 'হেতু দেখিয়া পক্ষে সাধ্যের সত্তা জ্ঞানের নাম অনুমান।' মূল সূত্রের ভাষ্যে মহর্ষি বেদব্যাস অনুমানের লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন—'অনুমেয়স্য তুল্যজাতীয়েষ্বনুবৃত্তোঽতুল্যজাতীয়েভ্যোব্যাবৃত্তঃ সম্বন্ধো যস্তদ্বিষয়া সামান্যাবধারণপ্রধানা বৃত্তিরনুমানম্।' বিজ্ঞানভিক্ষু উপরি উক্ত ব্যাস-বচনের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। সাধ্যবিশিষ্টঃ পক্ষঃ অনুমেয়ঃ, তস্য সাধ্যবত্ত্বেন তুল্যজাতীয়েষু সপক্ষেষু অনুবৃত্তোবিজাতীয়েভ্যো বিপক্ষেভ্যোব্যাবৃত্তো যঃ সম্বন্ধোঽর্থাত্তত্রৈবানুমেয়ে পক্ষবৃত্তির্ব্যাপ্তি যাবৎ তদ্বিষয়া, তদ্বিষয়জ্ঞানজন্যা যা সামান্যাঽবধারণপ্রধানাবৃত্তিঃ তদনুমানমিত্যর্থঃ।

অনুমেয় বলিতে সাধ্য বিশিষ্ট পক্ষ বুঝায়। যেখানে সাধ্যের অনুমান করা হয় এরূপ পক্ষ। যদি পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান করা হয় তাহা হইলে, পর্ব্বত অনুমেয়। যদি রসুই ঘরে বহ্নির অনুমান করা হয় তাহা হইলে রসুই ঘর অনুমেয়। সেই অনুমেয়ের তুল্যজাতীয় সাধ্যের অধিকরণ সমুদয় সপক্ষ বলিয়াও অভিহিত হয়। পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান করিলে রসুই ঘর, কল ঘর ইত্যাদি যাবতীয় বহ্নির অধিকরণই উহার সপক্ষ বা তুল্যজাতীয়। বিজাতীয় বলিতে যাহারা সাধ্যের অধিকরণ নয়, অর্থাৎ যাহাতে কখন সাধ্য অবস্থিতি করে না, তাহারা বিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। যেমন বহ্নির অনুমান স্থলে হ্রদ, পুষ্করিণী, জলাশয় ইত্যাদি সমুদয়। এক্ষণে দেখ, পক্ষের সমুদয় সজাতীয়ে বর্ত্তমান, এবং বিজাতীয়ে অবর্ত্তমান, এমন যে একটি সম্বন্ধ অর্থাৎ সেই হেতু জ্ঞান জন্য যে অপর একটি সামান্য-জ্ঞানের উৎপাদক মানসিক বৃত্তি, তাহার নাম অনুমান। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের মধ্যে আর

একটি মোটামুটি ভেদ এই যে প্রত্যক্ষে বস্তু বিশেষের, অর্থাৎ যাহার সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হইবে, সেই বস্তুরই বোধ হয়। অনুমানের দ্বারা বস্তু-সামান্যের বোধ হয়। পর্ব্বতে বহ্নি মাত্রেরই অনুমান হয়, বিশেষ বহ্নির নয়; অর্থাৎ পর্ব্বতে আগুণ আছে, এইরূপ একটা মোটামুটি জ্ঞান হয়, এইরূপ আগুন আছে বা সেইরূপ আগুন আছে, এমন একটি বিশেষ জ্ঞান হয় না। প্রত্যক্ষস্থলে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে যেরূপ বস্তু নিপাতিত হইবে সেই-রূপেরই জ্ঞান হইবে, যদি কাল ঘট ইন্দ্রিয় সম্মুখে পতিত হয়, তাহা হইলে ঐ কাল-ঘটেরই জ্ঞান হইবে, শাদা ঘটের নয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা প্রত্য-ক্ষকে বিশেষাবধারণ-প্রধানা এবং অনুমানকে সামান্যাবধারণ-প্রধানা বৃত্তি বলিয়াছেন।

আগম। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের বিষয় একপ্রকার বলা হইল। এই ক্ষণে আগমের বিষয় কিছু বলিব।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি বৃত্তি ভিন্ন আমাদের জ্ঞানের উপায় স্বরূপ আর একটি বৃত্তি আছে। উহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত-উভয়বিধ-বোধ হইতে ভিন্নরূপ বোধের উদয় হয়। এই বৃত্তি শব্দ-শ্রবণ-জন্য, আগম নামে প্রসিদ্ধ, এবং ইহা দ্বারা শব্দার্থের জ্ঞান হয়। পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ প্রমাণ-দ্বারা সামান্য বা বিশেষরূপে বস্তু স্বরূপ জানিতে পারি। অনুমান দ্বারা বস্তুর সাধারণ স্বরূপ, এবং প্রত্যক্ষ দ্বারা বিশেষ স্বরূপ জ্ঞাত হই। কিন্তু বস্তুর নাম বা প্রতিপাদ্যের স্বরূপ উভয়ের একটি দ্বারাও জানা যায় না। ঐ স্বরূপ জ্ঞানের কারণ আগম নামে আর একটি মানসিক বৃত্তি স্বীকৃত হয়। বিবেচনা কর, আমি সম্মুখে একটি শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট-প্রকাণ্ড পদার্থ দেখিলাম। উহার যাদৃশ স্বরূপ ঐ ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট হইল, অন্তঃকরণে তাহাই প্রতিভাত হইল। তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই হইল না। একটা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট-প্রকাণ্ড বস্তু, এই মাত্র বোধ হইল। কিন্তু উহা কি, তাহা জানা গেল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা কি? উত্তর পাইলাম, বৃক্ষ। আম্র বৃক্ষ বা অশ্বত্থ বৃক্ষ। এইরূপ এই বিচিত্র-নিয়মানুগত জগৎকার্য্য দেখিয়া অনুমান করি-লাম, ইহা যখন কার্য্য, তখন অবশ্যই ইহার কারণ আছে। তাহার কারণ আছে, এই অবধি মাত্র অনুমানদ্বারা বোধ হইল। কিন্তু তাদৃশ কারণের স্বরূপ কি, তাহা না প্রত্যক্ষ দ্বারা, না অনুমান দ্বারা জানা গেল। ঐ স্বরূপ

জানিবার নিমিত্ত বেদ বা পুরাণাদি মহর্ষি বাক্যের অনুসরণ করিতে হইল। ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া 'জগতের কারণ এইরূপ এইরূপ' জানিতে পারিলাম।

এই আগমই আমাদের সমুদয় জ্ঞানের মূল। আগম না থাকিলে আমরা জগতের কোন পদার্থেরই প্রতিপাদ্য নির্দ্দেশ করিতে পারিতাম না। কেবল বাহ্য আকারেই আমাদের জ্ঞান পর্য্যবসিত হইত। বিবেচনা কর কেবল বাহ্য আকার দেখিয়া আমাদের জিজ্ঞাসার সম্যক্ পরিতৃপ্ত না হওয়ায়, অতি শৈশবকাল হইতেই বস্তু সকলের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা "কি কি" বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। অন্য দূরে থাক, নিজের হাত, পা, নাক্, কাণ, মুখ, চোখ ইত্যাদি প্রত্যেক অবয়ব ধরিয়াই 'এতা কি' 'এতা কি, বলিয়া পিতা মাতাকে কতই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছি। তাঁহারা ঐ সকল কি-র উত্তর দিয়াছেন বলিয়াই আমরা ঐ সকল পদার্থ সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিয়াছি এখনও অনেক কি—র উত্তর পাই নাই। আবার প্রত্যহ অনেক নূতন নূতন কি—র সৃষ্টি হইতেছে। এই সমুদয় কি—র চরিতার্থ হইবার উপায় এক মাত্র আগম। আগমদ্বারা আমরা তিন প্রকার-বোধ প্রাপ্ত হই। (১) 'কি ?' এই প্রশ্নের উত্তরে (২) জ্ঞানী ব্যক্তির স্বয়ং প্রবর্ত্তিত শিক্ষা দ্বারা (৩) বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞান বৃদ্ধদিগের পরস্পর বাক্যালাপ শুনিয়া।

মহর্ষি বেদব্যাস মূলসূত্রের ভাষ্যে আগমের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন। 'আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতার্থঃ পরত্র স্ববোধ-সংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিশ্যতে। শব্দাত্তদর্থ-বিষয়াবৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ, যস্যাগমস্যাশ্রদ্ধেয়ার্থো বক্তা, ন দৃষ্টানুমিতার্থঃ, স আগমঃ প্লবতে, মূলবক্তরি তু দৃষ্টানুমিতার্থে নির্বিপ্লবঃ স্যাৎ।'

যে ব্যক্তিতে ভ্রম, প্রমাদ, বঞ্চনেচ্ছা, বা ইন্দ্রিয়ের শৈথিল্য ইত্যাদি দোষ নাই, তাহাকে আপ্ত বলা যায়। মোটামুটি বলিতে গেলে যাহার কথায় কোনরূপ অবিশ্বাসের কারণ দেখান যাইতে পারে না, সেই ব্যক্তি আপ্ত। আপ্ত ব্যক্তি অনুকম্পা-পর হইয়া, 'অন্যেরও আমার সদৃশ বোধ হউক' এই অভিপ্রায়ে আপনি প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা যে সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ঐ সকল বিষয় শব্দের দ্বারা উপদেশ করেন, অর্থাৎ কথায় ব্যক্ত করেন। ঐ কথা শুনিয়া শ্রোতার অন্তঃকরণে একটি বৃত্তির

উদয় হয়, যাহা দ্বারা ঐ সকল কথার অর্থ বোধ হয়। ঐ বৃত্তিই আগম। যে আগমের বক্তা নিজে প্রত্যক্ষ বা অনুমানদ্বারা কোন অর্থ জানেন নাই, তাঁহার কথার উপর সুতরাং বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সে আগমকে প্রমা বলা যাইতে পারে না, কারণ তাহা-দ্বারা বস্তুর ঠিক স্বরূপ-বোধ হয় না। যেখানে প্রথম বক্তা স্বয়ং প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা পদার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হন, সেই খানেই আগমের প্রমাণ্য জানিবা। বিজ্ঞান ভিক্ষু আগমের একটি বেস্ ছোট খাট লক্ষণ করিয়াছেন—"আপ্তোক্তার্থ-বিষয়িণী-শব্দ জন্যা বৃত্তিঃ" যে বৃত্তি শব্দ শ্রবণে উৎপন্ন হয়, এবং আপ্ত কথিত বাক্যের অর্থ যাহার বিষয়, তাহার নাম আগম।

এই তিন প্রকার বৃত্তির মধ্যে প্রত্যক্ষই অপর বৃত্তিদিগের মূলস্বরূপ। এই নিমিত্ত প্রথমে প্রত্যক্ষের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আমাদের অন্তঃকরণে জ্ঞানোদয়ের কারণ যতগুলি বৃত্তি আছে, তৎ-সমুদয়ই এই তিন প্রকারের মধ্যে কোন না কোন প্রকারের অন্তর্গত। এই তিনের অতিরিক্ত আর কোন প্রকার জ্ঞানের উপায় মানিবার আবশ্যকতা নাই। উক্ত তিন প্রকার প্রমাণের অতিরিক্ত আরও কতক-গুলি প্রমাণ শাস্ত্রান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। সেইগুলি উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব এবং ঐতিহ্য।

উপমান একটি বৃত্তি যাহা দ্বারা এক জাতীয় বস্তুর মধ্যে পরস্পরের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যেমন আমরা চক্ষু দ্বারা গোরু এবং বনগোরু এই দুইটি বস্তু দেখিলাম। প্রত্যক্ষ বৃত্তি দ্বারা এই দুইটি পদার্থের জ্ঞান হইল, কিন্তু ঐ দুইটি পদার্থের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পদার্থের জ্ঞান হইল, তাহা আর কিছুই নয়, ঐ উভয়ের সাদৃশ্য। আমরা বুঝিলাম বনগোরু এবং গোরু এক রকম। এই সাদৃশ্য জ্ঞানের প্রতি প্রত্যক্ষকে কারণ বলিতে পার না, কারণ উহা কোন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ জন্য নয়, এবং অনুমানও কারণ নয়; কোন হেতু দেখিয়া উহার সত্ত্বা নির্দ্ধারিত হয় নাই, আর উহা কোন ব্যক্তি কর্তৃক কথিত না হওয়ায় আগম জন্যও নয় কাযেই সাদৃশ্য জ্ঞানের নিমিত্ত উপমান নামক একটি অতিরিক্ত বৃত্তি স্বীকৃত হইয়াছে।

অর্থাপত্তি।—প্রাচীনেরা অর্থাপত্তি নামক আর একটি প্রমাণ স্বীকার

করিয়াছেন। ইহা দ্বারা একটি কথিত অর্থের সহিত অপর একটি অনির্দ্দিষ্ট অর্থের জ্ঞান হয়। যদি বলা যায় "ভুঁড়ে রামকৃষ্ট দিনের বেলা কিছু খায় না" তাহা হইলে যে বৃত্তি দ্বারা এই উক্ত অর্থের সহিত "রামকৃষ্ণ রাত্রে চর্ব্বচোষ্য আদি করিয়া নানাবিধ ভোজ্যের ধ্বংস করে"। এই অনির্দ্দিষ্ট অর্থের বোধ হয়, তাহার নাম অর্থাপত্তি। এইরূপ, "অমুক জীবিত ব্যক্তি ঘরে নাই. এই কথা বলিলে যে বৃত্তি দ্বারা সে বাহিরে আছে এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহার নাম অর্থাপত্তি। রামকৃষ্ণ রাত্রে খায়, এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ জন্য নয়; কারণ কেহই উহা চক্ষে দেখে নাই। অনুমান জন্যও নয়, কারণ তাহার প্রতি কোন হেতুর নির্দ্দেশ নাই। আর ঐ জ্ঞানকে আগমের অন্তর্গতও বলিতে পার না, কারণ ঐ অর্থের প্রতিপাদক কোন শব্দ নাই। অতএব উহার নিমিত্ত অর্থাপত্তি নামে আর একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছিল।

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন অর্থাপত্তি নামক আর একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই, উহা অনুমানের রূপান্তরমাত্র।

যে ব্যক্তি ভোজন করে সেই ভুঁড়ে হয়, যে কিছু খায় না সে রোগা হয়। রামকৃষ্ণ যখন ভুঁড়ে তখন ঐ ব্যক্তি অবশ্য ভোজন করে। এইরূপ ব্যাপ্তি স্থির করিয়া ভুঁড়ে ব্যক্তির দিবসে ভোজনাভাবকে হেতু করিয়া অনুমান দ্বারা রাত্রি ভোজন সিদ্ধ করা যাইতে পারে। এইরূপ—উপমানও অনুমানের অন্তর্গত।

অভাব—কেহ কেহ অভাব নামক আর একটি প্রমাণ স্বীকার করিয়াছিলেন। সাংখ্যাচার্য্যেরা উহাকে প্রত্যক্ষের অন্তর্গত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অভাব আর কিছু নয়, বস্তুর পরিণাম বিশেষ, কাযেই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। এইরূপ সম্ভবও অনুমানের অন্তর্গত। সম্ভব একটি প্রমাণ, যাহাদ্বারা বড় পরিমাণের উক্তি করিলে তদন্তর্গত ক্ষুদ্র পরিমাণ-নিচয়ের জ্ঞান হয়। যেমন মণ বলিলে সের, পোয়া, ছটাক, কাঁচ্চা এই সকলের জ্ঞান হয়। সাংখ্যচার্য্যেরা বলেন, ঐরূপ জ্ঞান আর কিছুই নহে, অনুমান সিদ্ধ। অনুমানের আকার এইরূপ—মণ সের ছাড়া হয় না, অতএব যেখানে মণ সেই খানে সের।

ঐতিহ্য, কিম্বদন্তী। যেমন ঐ গাছে ভূত আছে, ঐ খানে একটা

রাক্ষস ছিল। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন এই সকল কিম্বদন্তীর বক্তা যদি প্রামাণিক হয়েন, তবে ইহারা আগমের মধ্যে গণ্য; আর যদি ইহাদের বক্তা অপ্রামাণিক হয়েন, তবে উহারারা একটা নিশ্চয় জ্ঞানই হয় না। সে জ্ঞান কখন প্রমা বলিয়া গণ্য হয় না, তখন তাহার কারণ কি রূপে প্রমাণ হইবে।

প্রমার মত ভ্রম-জ্ঞানের প্রতিও ঐরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও আগমের কারণতা আছে বটে, কিন্তু ভ্রমস্থলে উহারা সকলেই দোষ স্পৃষ্ট হয়। প্রত্যক্ষের সময় ইন্দ্রিয় দুষ্ট হয়, অনুমানের সময় হেতুতে দোষ ঘটে, এবং আগমের সময় বক্তা সদোষ হয়েন। ভ্রম শব্দের অর্থ এক প্রকার বস্তুকে অন্য রূপে গ্রহণ করা। হেতুতে দোষ না থাকিলে আর ঐরূপ জ্ঞান হয় না, সুতরাং ভ্রম জ্ঞান স্থলে প্রমাণের দুষ্টতা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞান মতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্। ৮।

পদচ্ছেদঃ।—বিপর্য্যয়ঃ, মিথ্যাজ্ঞানম্, অ-তদ্ রূপ প্রতিষ্ঠম্।

পদার্থঃ।–বিপর্য্যয়ঃ=বিপর্য্যয়াখ্যাবৃত্তিঃ; মিথ্যাজ্ঞানং=অতথাভূতেঽর্থে তথোৎপদ্যমানং জ্ঞানম্, অতদ্বীতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানমিত্যর্থঃ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্=তদ্রূপে (স্ববিষয়ে) প্রতিষ্ঠা শূন্যম, তস্য (স্ব গোচরী ভূতস্যার্থস্য) যদ্রূপম, ন তস্মিন্ রূপে প্রতিষ্ঠতে,তস্যার্থস্য যৎ পারমার্থিকং রূপং ন তৎ প্রতিভাসয়তীতি যাবৎ।

ভাবার্থঃ।—বিপর্য্যয়ো লক্ষ্যম্, মিথ্যাজ্ঞান মিতি বিপর্য্যয়স্য লক্ষণম্, অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠমিতি মিথ্যাজ্ঞানস্য বিবরণম্, তথাহি বিপর্য্যয়ো নাম মিথ্যাজ্ঞানম্, তচ্চ মিথ্যাজ্ঞানং কিং স্বরূপমিত্যত আহ—অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠ মিতি জ্ঞানাসমানাকারবিষয় বিশেষ্যকম্ (জ্ঞানস্য অসমানাকারো যো বিষয়ঃ, যাদৃশং জ্ঞানং ভবতি তদ্ভিন্নরূপো যোবিষয়ঃ জ্ঞেয় বস্তু, তদ্বিশেষ্যকম্ তৎপ্রকারম্) ইতি তদর্থঃ। বিপর্য্যয়েত্যস্যাক্ষরার্থঃ বিরুদ্ধ রূপঃ, উক্তপূর্ব্বস্য প্রমাণস্য বিরুদ্ধা বা বৃত্তিঃ, স বিপর্য্যয়ঃ। তচ্চাত্র জ্ঞানং ভ্রম এব, ভ্রমস্থলে হি জ্ঞানাকারস্যৈব বিষয়ে সমারোপো, নতু বিষয়াকারস্য জ্ঞানে, যথা শুক্তিকায়াং রজতজ্ঞানম্। অত্র রজত জ্ঞানস্য শুক্তিকায়াং সমারোপো নতু জ্ঞানস্য শুক্তিকাকারেণ পরিণামঃ। যয়া বৃত্ত্যা যৎকিমপি বস্তু ভিন্ন স্বরূপেণ জ্ঞায়তে স এব বিপর্য্যয়ঃ তদাখ্যবৃত্তিঃ,

তচ্চাত্র জ্ঞানমেব জ্ঞানস্যাপি চিত্তপরিণামবিশেষাৎ। মণিপ্র
অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠ মিত্যস্য বাধবিরোধীত্যর্থং করোতি, যাদৃশং জ্ঞান
তন্ন চিরং তদ্রূপে প্রতিষ্ঠতে বাধোত্তরং তদন্যথারূপং ভবতীতি তদ
যথা—শুক্তিকায়াং রজতমিত্যত্র শুক্তিকাজ্ঞানেন রজতজ্ঞানস্য বা
মিতিজ্ঞানং ন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। অনেন সংশয়োঽপি গৃহীতস্তস্য
প্রতিষ্ঠত্বাৎ; যথা, স্থাণুর্ব্বা পুরুষোবেতি। অস্যৈব বিপর্য্যয়স
পঞ্চ ক্লেশা ইতি বক্ষ্যতে।

অনুবাদ—মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ ভ্রমের নাম বিপর্য্যয়। যেজ্ঞান
প্রতিষ্ঠ—যে বস্তু যেরূপ নয় তাহাকে সেইরূপে প্রকাশ করে, তা
মিথ্যাজ্ঞান। যেমন ঝিনুকে রূপা বলিয়া জ্ঞান। মণিপ্রভা নামক
অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠ শব্দের অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে যে, যে জ্ঞান ব
রূপে থাকে না, তাহার নাম অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠ। ঝিনুকে যে রূপ
জ্ঞান হয়, ঐ জ্ঞান বরাবর ঐরূপে থাকে না; একবার ঝিনুক বলিয়া
পারিলে, আর রূপা জ্ঞান থাকে না।

সমালোচনা।—বিপর্য্যয় শব্দের অর্থ বিপর্য্যয়াখ্য বৃত্তি। ঐ
কিছু নয়, ভ্রমজ্ঞান। যে বৃত্তি বা চিত্তের পরিণাম বিশেষ
স্বরূপ, তাহাকে বিপর্য্যয় বৃত্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহাই
অভিপ্রায়।

বিপর্য্যয় শব্দের অক্ষরার্থ বিপরীত বা উল্টা; পূর্ব্বে যে প্র
বলা হইয়াছে উহার উলটা বা বিপরীত বৃত্তিকে বিপর্য্যয় বলে
বৃত্তি দ্বারা যে বস্তু যেরূপ, তাহাকে ঠিক্ সেইরূপে জ্ঞান করা হ
র্য্যয় বৃত্তি দ্বারা যাহা যেরূপ নয়, তাহাকে ঠিক্ সেইরূপে জ্ঞান
প্রমাণ বৃত্তি দ্বারা ঝিনুককে ঝিনুক বলিয়া বোধ হয়, দড়িকে দা
বোধ হয়, কিন্তু বিপর্য্যয় বৃত্তি দ্বারা ঝিনুককে রূপা, দড়িকে সা
বোধ হয়। ইন্দ্রিয়াদিতে জ্ঞানসাধনের অসম্পূর্ণতাদি দোষ ঘটি
দের চিত্তের অবস্থা-বিশেষ হয়, যাহাতে একরূপ বস্তুকে অন্যর
বোধ হয়। চিত্তের সেই অবস্থান্তর বা বৃত্তির নাম বিপর্য্যয়। এ
অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান (যাহা যেরূপ নহে তাহাকে সেইরূপে জ্ঞান
ভ্রম বলিয়া অভিহিত হয়।

রাক্ষস ছিল। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন এই সকল কিম্বদন্তীর বক্তা যদি প্রামাণিক হয়েন, তবে ইহারা আগমের মধ্যে গণ্য; আর যদি ইহাদের বক্তা অপ্রামাণিক হয়েন, তবে উহাদ্বারা একটা নিশ্চয় জ্ঞানই হয় না। সে জ্ঞান কখন প্রমা বলিয়া গণ্য হয় না, তখন তাহার কারণ কি রূপে প্রমাণ হইবে।

প্রমার মত ভ্রম-জ্ঞানের প্রতিও ঐরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও আগমের কারণতা আছে বটে, কিন্তু ভ্রমস্থলে উহারা সকলেই দোষ স্পৃষ্ট হয়। প্রত্যক্ষের সময় ইন্দ্রিয় দুষ্ট হয়, অনুমানের সময় হেতুতে দোষ ঘটে, এবং আগমের সময় বক্তা সদোষ হয়েন। ভ্রম শব্দের অর্থ এক প্রকার বস্তুকে অন্য রূপে গ্রহণ করা। হেতুতে দোষ না থাকিলে আর ঐরূপ জ্ঞান হয় না, সুতরাং ভ্রম জ্ঞান স্থলে প্রমাণের দুষ্টতা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞান মতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্। ৮।

পদচ্ছেদঃ।—বিপর্য্যয়ঃ, মিথ্যাজ্ঞানম্, অ-তদ্ রূপ প্রতিষ্ঠম্।

পদার্থঃ।—বিপর্য্যয়ঃ = বিপর্য্যয়াখ্যবৃত্তিঃ; মিথ্যাজ্ঞানং = অতথাভূতেঽর্থে তথোৎপদ্যমানং জ্ঞানম্, অতথেতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানমিত্যর্থঃ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ = তদ্রূপে (স্ববিষয়ে) প্রতিষ্ঠা শূন্যম, তস্য (স্ব গোচরী ভূতস্যার্থস্য) যদ্রূপম্, ন তস্মিন্ রূপে প্রতিষ্ঠতে, তস্যার্থস্য যৎ পারমার্থিকং রূপং ন তৎ প্রতিভাসয়তীতি যাবৎ।

ভাবার্থঃ।—বিপর্য্যয়ো লক্ষ্যম্, মিথ্যাজ্ঞান মিতি বিপর্য্যয়স্য লক্ষণম্, অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠমিতি মিথ্যাজ্ঞানস্য বিবরণম্, তথাহি বিপর্য্যয়ো নাম মিথ্যাজ্ঞানম্, তচ্চ মিথ্যাজ্ঞানং কিং স্বরূপমিত্যত আহ—অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠ মিতি জ্ঞানাসমানাকারবিষয় বিশেষাকম্ (জ্ঞানস্য অসমানাকারো যো বিষয়ঃ, যাদৃশং জ্ঞানং ভবতি তদ্ভিন্নরূপো যোবিষয়ঃ জ্ঞেয় বস্তু, তদ্বিশেষ্যকম্ তৎপ্রকারম্) ইতি তদর্থঃ। বিপর্য্যয়েত্যস্যাক্ষরার্থঃ বিরুদ্ধ রূপঃ, উক্তপূর্ব্বস্য প্রমাণস্য বিরুদ্ধা বা বৃত্তিঃ, স বিপর্য্যয়ঃ। তচ্চাত্র জ্ঞানং ভ্রম এব, ভ্রমস্থলে হি জ্ঞানাকারস্যৈব বিষয়ে সমারোপো, নতু বিষয়াকারস্য জ্ঞানে, যথা শুক্তিকায়াং রজতজ্ঞানম্। অত্র রজত জ্ঞানস্য শুক্তিকায়াং সমারোপো নতু জ্ঞানস্য শুক্তিকাকারেণ পরিণামঃ। যয়া বৃত্ত্যা যৎকিমপি বস্তু ভিন্ন স্বরূপেণ জ্ঞায়তে স এব বিপর্য্যয়ঃ তদাখ্যবৃত্তিঃ,

তচ্চাত্র জ্ঞানমেব জ্ঞানস্যাপি চিত্তপরিণামবিশেষাৎ। মণিপ্র
অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠ মিত্যস্য বাধবিরোধীত্যার্থং করোতি, যাদৃশং জ্ঞান
তন্ন চিরং তদ্রূপে প্রতিষ্ঠতে বাধোত্তরং তদন্যথারূপং ভবতীতি তদ
যথা—শুক্তিকায়াং রজতমিত্যত্র শুক্তিকাজ্ঞানেন রজতজ্ঞানস্য বা
মিতিজ্ঞানং ন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। অনেন সংশয়োঽপি গৃহীতস্তস্য
প্রতিষ্ঠত্বাৎ; যথা, স্থাণুর্ব্বা পুরুষোবেতি। অস্যৈব বিপর্য্যয়স
পঞ্চ ক্লেশা ইতি বক্ষ্যতে।

অনুবাদ—মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ ভ্রমের নাম বিপর্য্যয়। যেজ্ঞান
প্রতিষ্ঠ—যে বস্তু যেরূপ নয় তাহাকে সেইরূপে প্রকাশ করে, তা
মিথ্যাজ্ঞান। যেমন ঝিনুককে রূপা বলিয়া জ্ঞান। মণিপ্রভা নামক
অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠ শব্দের অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে যে, যে জ্ঞান ব
রূপে থাকে না, তাহার নাম অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠ। ঝিনুকে যে রূপ
জ্ঞান হয়,ঐ জ্ঞান বরাবর ঐরূপে থাকে না; একবার ঝিনুক বলিয়া
পারিলে, আর রূপা জ্ঞান থাকে না।

সমালোচনা।—বিপর্য্যয় শব্দের অর্থ বিপর্য্যয়াখ্য বৃত্তি। ঐ
কিছু নয়, ভ্রমজ্ঞান। যে বৃত্তি বা চিত্তের পরিণাম বিশেষ
স্বরূপ, তাহাকে বিপর্য্যয় বৃত্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইহাই
অভিপ্রায়।

বিপর্য্যয় শব্দের অক্ষরার্থ বিপরীত বা উল্টা। পূর্ব্বে যে প্র
বলা হইয়াছে উহার উল্টা বা বিপরীত বৃত্তিকে বিপর্য্যয় বলে
বৃত্তি দ্বারা যে বস্তু যেরূপ, তাহাকে ঠিক্ সেইরূপে জ্ঞান করা হ
র্য্যয় বৃত্তি দ্বারা যাহা যেরূপ নয়, তাহাকে ঠিক্ সেইরূপে জ্ঞান
প্রমাণ বৃত্তি দ্বারা ঝিনুককে ঝিনুক বলিয়া বোধ হয়, দড়িকে দড়ি
বোধ হয়, কিন্তু বিপর্য্যয় বৃত্তি দ্বারা ঝিনুককে রূপা, দড়িকে সা
বোধ হয়। ইন্দ্রিয়াদিতে জ্ঞানসাধনের অসম্পূর্ণতাদি দোষ ঘটি
দের চিত্তের অবস্থা-বিশেষ হয়, যাহাতে একরূপ বস্তুকে অন্য
বোধ হয়। চিত্তের সেই অবস্থান্তর বা বৃত্তির নাম বিপর্য্যয়। এ
অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান (যাহা যেরূপ নহে তাহাকে সেইরূপে জ্ঞান
ভ্রম বলিয়া অভিহিত হয়।

যদি এরূপ আশঙ্কা করেন—তুমি বিপর্য্যয়ের লক্ষণ করিলে মিথ্যা-
থ্যাজ্ঞানের অর্থ করিলে " অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠ" অর্থাৎ যে যেরূপ
হাকে সেইরূপে জ্ঞান; তোমার উদাহরণ—ঝিনুককে রূপার জ্ঞান,
পা নয়, উহাকে রূপা বলিয়া জ্ঞান। ভাল, আমি বলি তুমি যে
দিলে উহা বিপর্য্যয়ের উদাহরণ নয় উহাকে বরং প্রমাণের উদা-
া যাইতে পারে। কারণ উহা অতদ্রূপ-প্রতিষ্ঠ হয় নাই। ঝিনুককে
প্রতীতি হইতেছে, ঐ প্রতীতি বশতই রূপার সিদ্ধি হইতেছে।
প্রতীতি হওয়াই অসম্ভব, অতএব যদি প্রতীতি বশত বস্তুর সিদ্ধি
ব ত ঠিক বস্তুতেই জ্ঞান হইতেছে, "অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠ" হইল কই?
উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—" যতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে, ভূতার্থ
প্রমাণস্য। তত্র প্রমাণেন বাধনমপ্রমাণস্য দৃষ্টম্, তদ্‌যথা দ্বিচন্দ্র
য়বেনৈক চন্দ্র—দর্শনেন বাধ্যতে ইতি।" ইহার অর্থ—প্রতীতি
স্তু সিদ্ধির কথা বলিতেছ, তাহা হইতে পারে বটে, যদি সেই
পরে কোনরূপ বাধা না ঘটে। প্রকৃত স্থলে এরূপ হয় নাই।
যে রজত জ্ঞান হইতেছে, ঐ জ্ঞান চিরস্থায়ী নহে। শুক্তিকে
যা একবার জানিতে পারিলে আর রজত জ্ঞান থাকে না, তাহার
। এক্ষণে দেখ, যখন প্রমাণ সিদ্ধ শুক্তিজ্ঞান দ্বারা রজত জ্ঞানের
ছে, তখন আর ঐ পূর্ব্বের রজত জ্ঞানকে প্রমাণ সিদ্ধ বলিয়া
বিতে পার না, কারণ প্রমাণের কখন বাধ হয় না। পূর্ব্বে ইহা
ছে যে, যাহা দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়, তাহার নাম
অতএব তাহার আর কোনরূপে বাধ হইতে পারে না। যাহা
হার এদিক ওদিক নাই। আর লোকের বুদ্ধিও যথার্থের পক্ষ-
যাহাকে একবার যথার্থ বলিয়া ঠিক ঠিক জানিতে পারিয়াছে,
ার অন্যরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছাই হয় না। বরং আমরা সর্ব্ব-
দ্বারা অপ্রমাণের বাধ দেখিতে পাই। দেখ, কখন কখন চক্ষুর
া আমরা একটি চন্দ্রকেই দুটি চন্দ্র রূপে দেখিতে পাই। কিন্তু
বস্থা প্রাপ্ত হইলে যে এক চন্দ্র সেই এক চন্দ্রই থাকে। তখন
ক দুই বলিয়া বোধ হয় না। এই বিপর্য্যয় বৃত্তিকেই ভাষ্যকার
নর্থ ঘটনার মূল, প্রধান অবিদ্যা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ইহা

(১) অবিদ্যা, (২) অস্মিতা, (৩) রাগ, (৪) দ্বেষ, (৫) অভিনিবেশ এই পাঁচ ক্লেশ সঙ্কুল পর্ব্ব অর্থাৎ শাখাতে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ উপরি উক্ত পাঁচ পর্ব্ব আবার তমো, মোহ মহামোহ, তামিস্র, এবং অন্ধতামিস্র নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। যথা—বিষ্ণুপুরাণে—

'তমোমোহো মহামোহ স্তামিস্রোহ্যন্ধসংজ্ঞকঃ।
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥

অবিদ্যাদির লক্ষণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে সূত্রপঞ্চক দ্বারা উক্ত হইয়াছে।

হিন্দু বিবাহের ব্যবস্থা।

মনুরবিধান সুপালনীয়।

ব্রাহ্মণ বালকের বিদ্যারম্ভের সাধারণত প্রশস্ত সময় ছয়বৎসর তিনমাস হইতে সাত বৎসর তিনমাস বয়স পার্য্যন্ত। বিশেষ স্থলে, তিন বৎসর তিনমাসের পর হইতে চারি বৎসর তিনমাস পর্য্যন্ত বিদ্যারম্ভের সময়। অর্থাৎ কোন স্থলেই তিন বর্ষ তিন মাসের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বালকের বিদ্যারম্ভ হইবে না। আর ষোড়শ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণ বালকের বিদ্যারম্ভ হওয়া একান্ত আবশ্যক; তদন্যথায় ধর্ম্ম নষ্ট কর্ম্ম নষ্ট হইবে। ৯ বৎসর তিনমাস হইতে ১০ বৎসর তিনমাস ক্ষত্রিয়ের প্রশস্ত কাল। বিশেষ স্থলে ৪ বৎসর তিনমাস হইতে ৫ বৎসর তিনমাস; অপারগ স্থলে বাইশ বৎসরের মধ্যে। বৈশ্যের সাধারণত ১০ বৎসর তিনমাস হইতে ১১ বৎসর তিনমাস; বিশেষ স্থলে, ৬বৎসর তিনমাস হইতে ৭ বৎসর তিনমাস; আপৎ স্থলে, ২৪ বৎসরের মধ্যে। বিদ্যারম্ভের কাল নিয়ম এইরূপ।

এখন দেখিতে হইবে শিক্ষার কাল নিয়ম কিরূপ; আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, সুতরাং দারপরিগ্রহ না করিয়া, সুতরাং গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন না

করিয়া বিদ্যানুশীলন করিব, এরূপ যাঁহাদের সংকল্প, তাঁহাদের পক্ষে তাহাই নিয়ম। সাধারণত সকলই গৃহধর্ম্মে প্রবেশপ্রয়াসী। তাঁহাদের পক্ষে নিয়ম এই যে, তাঁহারা উর্দ্ধত ছত্রিশ বৎসর অন্তত নয় বৎসর বিদ্যাশিক্ষা করিবেন।

যাঁহারা অধিক কাল বিদ্যাশিক্ষা করিবেন, তাঁহাদের জন্য বিদ্যারম্ভের বিশেষ কাল নিয়ম পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপ স্থলে ব্রাহ্মণের চল্লিশ বৎসরে পঠদ্দশার পরিসমাপ্তি হয়। আপৎপাতে যাঁহাদের বিদ্যারম্ভে বিলম্ব হইয়াছে, তাঁহাদিগকে কাজে কাজেই অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে পাঠ সমাপ্তি করিতে হইবে। আপৎপাতে ব্রাহ্মণ ষোড়শ বৎসরেও বিদ্যারম্ভ করিতে পারেন, তাহার পর অন্তত নয় বৎসরকাল তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা করিতেই হইবে; সুতরাং এরূপ স্থলেও তিনি ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে শিক্ষার অবস্থা ত্যাগ করিতে পারেন না। ছত্রিশ বৎসর ও নয় বৎসরের গড় পড়তা বাইশ তেইশ বৎসর। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে সাধারণত ব্রাহ্মণ এই সুদীর্ঘকাল গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে, তাহার সহিত ব্রাহ্মণের বিদ্যারম্ভের প্রশস্ত কাল ছয়, সাত বর্ষ ধরিলে, সাধারণত ব্রাহ্মণ ২৮।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন, ইহাই বুঝা যায়। ক্বচিৎ কেহ ৩৯।৪০ বর্ষ পর্য্যন্তও থাকিতেন, আবার ক্বচিৎ কেহ ২৪।২৫ বৎসরেই পাঠ শেষ করিতেন।

এখনকার দিনে জ্ঞানকরী শিক্ষার কোন নিয়মই এদেশে নাই। ইংরাজি ত অর্থকরী শিক্ষাই বটে, চতুষ্পাঠীর শিক্ষাও অর্থকরী হইয়াছে। এই বঙ্গদেশে সর্ব্বোচ্চ অর্থকরী শিক্ষা অর্থাৎ ইংরাজি ভাষা ও আইন শিক্ষা, আপাতত মনে হয়, ২১।২২ বৎসরেই সমাপ্তি হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ২১।২২ বৎসরে এম্‌, এ, বি এল্‌ হইলেও, তাহার পর হাইকোর্টের কোন উকীলের চিহ্নিত কেরাণী হইয়া (Articled clerk) অথবা মফস্বল বারে নাম মাত্র লেখাইয়া অন্তত তিন বৎসর কাল, যে বখামি ও বকামি শিক্ষা, ব্যবহার মতে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাও শিক্ষার কাল বলিতে হইবে। কেন না, ঐরূপ বিচিত্র শিক্ষা তিন বৎসর না পাইলে, হাইকোর্টের বারে বসিবার বা মুনসেফির জন্য রেজিষ্টার মহোদয়কে পঞ্চাঙ্গে সেলাম করিবার অধিকারই পাওয়া যায় না, এবং আইনের ব্যবসায়ে কোন

রোজগারই হয় না। রোজগারই এখনকার দিনে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রাণ। রোজগারের জন্য, রোজগারের পূর্ব্বে যে কিছু শিক্ষা, তাহাই তখনকার-কালের বিদ্যাশিক্ষা। এই শিক্ষা এখনকার দিনে, সুতরাং ২৪।২৫ বৎসরে শেষ হয়। অর্থাৎ প্রাচীন কালের অপেক্ষা ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে শেষ হয়। আমাদের আয়ুর তারতম্য দেখিলে, এই বিভেদ অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই বোধ হইবে।

পাঠ সমাপন হইলে, গুরুর অনুমতি লইয়া, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত শেষ করিয়া দ্বিজাতিরা সবর্ণা লক্ষণান্বিতা ভার্য্যা বিবাহ করিবেন।

কত বয়সেব ? কত বয়সের পাত্র কত বয়সের পাত্রীকে বিবাহ করিবেন, তাহার কোন বাঁধা বাঁধি নিয়ম নাই—দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি কথা বলা আছে। ত্রিশ বৎসরের পাত্র বাব বৎসবেব হৃদ্যা কন্যাকে বিবাহ করিবেন। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে ব্যাঘাত হইতেছে এমন হইলে, শীঘ্র বিবাহ করিতে পারেন—চব্বিশ বৎসরের পুরুষ অষ্ট বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধারণত ব্রাহ্মণ ২৮।৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া পাঠ সমাপন করিতেন, আবাব কচিৎ কেহ ২৪।২৫ বৎসরেই পাঠ সমাপন কবিতেন। সুতরাং ৩০ বর্ষের পুরুষে ১২ বৎসরের কন্যা, ও ২৪ বৎসরেব পাত্রে ৮ বৎসবের পাত্রী—এই দৃষ্টান্ত দুইটি—অকারণ আনীত উদাহরণ নহে। যে বয়সে সকলে সচরাচর বিবাহ করিত, সেই বয়সের দৃষ্টান্তই দেওয়া হইয়াছে। সে সময়ে বালিকার বিবাহকাল ৮।৯ হইতে ১২।১৩ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল, বলিতে হইবে।

উৎকৃষ্ট, সুরূপ, এবং কন্যার যোগ্য বর প্রাপ্ত হইলে, কন্যা যদি অপ্রাপ্ত-বয়স্কাও হয়, তথাপি তাহাকে সেই বরে যথাবিধি দান করিবে। অর্থাৎ কন্যা অপ্রাপ্ত বয়স্কা বলিয়া ইতস্তত করিবে না। কিন্তু কত বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত বয়স্কা বলা যাইবে ? অব্যবহিত পরের বচনে তাহা বুঝা যায়। ঋতুমতী হইয়াও কন্যা যাবজ্জীবন গৃহে বাস করিবে, সেও বরং ভাল, তথাপি গুণহীন পাত্রে কখন কন্যাকে প্রদান করিবে না। 'সেও বরং ভাল' এই কথা বলাতেই বুঝা যাইতেছে, যে ঋতুমতী হইয়া পিতৃগৃহে বাস কন্যার পক্ষে নিন্দনীয়।

উৎকৃষ্ট বর পাইলে, কন্যাকে অল্প বয়সেই দান করিবে,—গুণহীন বরে

কখনই দান করিবে না—বরং ঋতুমতী হইয়া চিরকাল ঘরে থাকুক—এই তিন কথায় বুঝা যায় যে সাধারণত মধ্যম রাশি বর সদ্য-সম্ভাবিত-ঋতু কন্যাকে যথাবিধি দান করিবে। ত্রিশ বৎসরের পাত্র বার বৎসরের হৃদ্যা কন্যাকে বিবাহ করিবে—এ স্থলে হৃদ্যা বিশেষণে বোধ হয়—কন্যাকে বার বৎসরের পরই সদ্য-সম্ভাবিত ঋতু বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। রস-গ্রীষ্ম-প্রধান বঙ্গদেশে এখনও সেইরূপ সময়ই ঋতুর কাল বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিজাতির বিবাহের কাল নিয়ম একরূপ মোটামুটি বুঝা গেল; তবে এই সঙ্গে আর একটি কথা আছে—জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইলে, কনিষ্ঠ কখনই বিবাহ করিবে না—তবেই প্রাপ্তকাল হইলেই যে বিবাহ করিতে পারিবে এমন নহে—কাল বিলম্ব করিতে হইবে। বোধ হয় জ্যেষ্ঠ চির ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে, এ বিধি খাটে না।

এই কাল নিয়মের স্থূল তাৎপর্য্য এই যে যথাসাধ্য বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া পুরুষ সদ্য-সম্ভাবিত-ঋতু বালিকার পাণি গ্রহণ করিবে। ইহাতে গর্ভাধানের নিয়ম কি তাহা এখনও জানা যায় নাই। বিবাহ কালের এই নিয়ম এখনও চলিতেছে বলিতে হইবে, অথবা চলিবার কোন বাধা দেখা যায় না। সুতরাং অনর্থক আমরা বয়োনিয়ম লইয়া গোল করি কেন? ডাক্তারেরা বলিতে পারেন, গর্ভাধানের সময়ের পক্ষে বালিকার বয়স প্রচুর নহে; কিন্তু তাহার জন্য বিবাহের কাল নিয়ম লইয়া আমরা গোল করি কেন? গর্ভাধানের সময় পুরুষ যদি আধুনিক বিজ্ঞান বা অবিজ্ঞান মত রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে, তাঁহার ত সে বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এখনকার দিনে আছে।

শ্রুতির পরেই মনুসংহিতা হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র। বিংশতি জন ঋষি আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজক। মনুর সহিত অন্য সকলের মত বিরোধ হইলে, মনুর মতই আমাদের অনুসরণ করিতে হইবে, ইহাও শাস্ত্রের অনুশাসন বাক্য। মনু প্রযুক্ত বিবাহের নিয়মগুলি—প্রাঞ্জল, পরিষ্কার, প্রশস্ত এবং উদার। আমরা দেখাইলাম, যে সেই সকল নিয়ম অনুসরণ করিলে, এখনকার দিনে সচ্ছন্দে চলিতে পারে—প্রায় কিছুই ভাঙ্গ-গড় করিতে হয় না, কোনরূপ সামাজিক বিপ্লবই সংঘটিত করিতে হয় না। আসল কথা—

আমরা সরলভাবে, শাস্ত্র, বিজ্ঞান, বা যুক্তি কোন কিছুরই অনুসরণ করিতে প্রস্তুত নহি—আমরা এখন চাই, কেবল আন্দোলন, আস্ফালন, আকর্ষণ এবং আকর্ণন।

যে যাহা কিছু বলিবে, তাহাতে অন্যের আপত্তি আছেই আছে। আপত্তি না করিলে discussion, percussion, concussion, ঘর্ষণ, মর্দন, লোমহর্ষণ ধণ প্রত্যাঘাত কোন কিছুই হয় না। ঘর্ষণ মর্দন, না হইলে অগ্নির উৎপত্তি হয় না। সমাজে যদি আগুণ উঠাইতেই না পারিলাম, তাহা হইলে এ জীবনেও ধিক, এ লেখনেও ধিক, এ রসনেও ধিক! সুতরাং আপত্তি করিতেই হইবে;—আগুন উঠাইতেই হইবে। আমরা বলি ভাই! আগুন উঠাইলে, কিন্তু সে আগুন রাখিতে ত পারিবে না—তোমার ত শোলা ধরান নাই। আর এক কথা—কঠোর প্রস্তরে, কঠিন লৌহে ঠকাঠাক করিলে, তবে আগুন উঠে,—পোড়ান পুরাণ ভাঁড়ে, আর কাঁচা নূতন ভাঁড়ে ঠকাঠকি করিলে ভাঁড় দুইটাই চূর্ণ হইবে মাত্র।

মনুসংহিতার সহজ-সোধ্য, সমাজ-সঙ্গত, যুক্তিপূর্ণ, উদারতাপূর্ণ বিবাহের কাল নিয়মে তুমি আমি বলিলেই, উহার তাঁহার আপত্তি আছে। বঙ্গের সম্ভ্রান্ত পরিবার সকলের মধ্যে মনুর ব্যবস্থিত কন্যার বিবাহ কাল নিয়ম সহজেই প্রতিপালিত হইতে পারে, সমাজের গতিও বোধ হয় সেই দিকে,—কিন্তু তথাপি সেই নিয়মের কথা তুমি আমি যে কেহ স্পষ্ট করিয়া বলিলেই উহার তাঁহার আপত্তি আছে। তাহার প্রথম কারণ আপত্তি করাই অভ্যাস। দ্বিতীয় কারণ ভাল মন্দ—সঙ্গত অসঙ্গত—কোনরূপ নিয়ম মানিতেই আমরা প্রস্তুত নহি।

কন্যার বিবাহ কাল নিয়ম সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থায়, দেখা যাইতেছে যে, প্রবীণ নবীন উভয় সম্প্রদায়েরই আপত্তি আছে। মনু বয়সের দৃষ্টান্ত স্থলে পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন দ্বাদশ বার্ষিকীং। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিশেষণ দিয়াছেন "হৃদ্যাং"। "হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং"। এই হৃদ্যা বিশেষণটি যে কেবল পাদপূরণার্থ বসিয়াছে, এমন বোধ হয় না। হৃদ্যা শব্দের সার্থকতা আছে, কাহার হৃদ্যা? ত্রিশ বৎসরের বরের। এখনকার ভাষায় বলিতে হইলে, বলিতে হইবে—বার বছরের বেশ সেয়ানা মেয়ে। যাহার মনে অনুরাগের সঞ্চরণ সম্ভব, তাহাকেই বিদ্যাপতি 'সেয়ানী [illegible]'।

গৃহিণীরাও সেইরূপ কন্যাকে সেয়ানা বলেন। এরূপ সেয়ানা মেয়ে না হইলে ত্রিশ বৎসরের বরের হৃদ্যা হইতে পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইতেছে যে, " দ্বাদশ বার্ষিকী " পদের ভাবার্থ পরিস্ফুট করিবার জন্যই হৃদ্যা পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

মনুর শ্লোকটি সম্বন্ধে আর একটি কথা বুঝা আবশ্যক। দ্বাদশ বার্ষিকী পদের অর্থ কি ? এগার হইতে বার বছরের ? না বার হইতে তের বছরের ? হৃদ্যা শব্দের সার্থকতা বুঝিলে, এবং শ্লোকের অপরার্দ্ধ ' অষ্ট ' পদ আছে, ' অষ্টম ' এরূপ পদ নাই। ইহা দেখিলে, এইরূপ মনে হয়, যে পূর্ণ বার বৎসর বয়স্কা কন্যার কথাই মনু বলিয়াছেন।

মনুর এই মতে প্রবীণের আপত্তি এই যে " তা হ'লে মেয়ের বয়স বড় বেশী হয়।" নবীনের আপত্তি এই যে, " তা হ'লে মেয়ের বয়স বড় কম হয়। "

রহস্যের কথা এই যে, প্রবীণেরা মনুর মত খণ্ডন করিবার জন্য 'শাস্ত্রের' দোহাই দিয়া থাকেন! শাস্ত্রবাদীর ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর নাই।

বিবাহ সম্বন্ধে ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতার সমগ্র প্রধান ব্যবস্থা আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, মনুর মতে কন্যার বিবাহের বয়োধাবধি কিছু কাল নিয়ম নাই—' বরং ঋতুমতী হইয়া পিতৃগৃহে থাকুক, বলাতেই ঋতুকালের পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহের প্রশস্ত কাল বলিয়া উপলক্ষ্য করা হইয়াছে। এবং পরে, পূর্ণ আট বছরের হইতে পূর্ণ বার বছরের পর্য্যন্ত বয়সের কন্যা বিবাহ যোগ্য এরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে অন্যান্য দুই একটি সংহিতায় কি আছে, তাহা দেখিলে ক্ষতি নাই। দেশে অষ্ট বর্ষে গৌরীদানের ফলশ্রুতি প্রচলিত আছে। আঙ্গিরসী এবং পারাশরী স্মৃতিতে তাহার অঙ্কুর পাওয়া যায়।

অঙ্গিরার বচন,—

অষ্ট বর্ষা ভবেদ্ গৌরী নব বর্ষাতু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
তস্মাৎ সম্বৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকাবুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কাল দোষতঃ॥

অষ্ট বর্ষা কন্যাকে গৌরী, নববর্ষাকে রোহিণী দশমে কন্যকা, ও তার পর রজস্বলা বলে। সেই জন্য পাণ্ডতেরা কন্যার দশম বৎসরে বিবাহ দিবেন, তাহাতে আর কাল দোষ জন্য দোষ হয় না।

এই কথাটি একটু বিস্তারিত করিয়া বুঝিতে হইবে। পূর্ণ আট বৎসর হইতে আট বৎসর এগার মাস উনত্রিশ দিন পর্য্যন্ত গৌরী; পূর্ণ নয় বৎসর হইতে নয় বৎসর এগার মাস উনত্রিশ দিন পর্য্যন্ত রোহিণী; দশমে কন্যকা অর্থাৎ দশ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত কন্যকা; তার পর রজস্বলা। এই শ্লোকটি স্পষ্টত পারিভাষিক। কিন্তু পরিভাষায়ও দোষ পড়িয়াছে। 'অষ্ট বর্ষা' 'নববর্ষা' প্রথমে বলিয়া পরে 'দশমে' বলাতে 'রোহিণী' ও 'কন্যকা' একই বয়সের কন্যাকে বুঝাইতেছে অথবা কন্যকাকাল গণিতের বিন্দু পরিমিত কাল হইতেছে। এইরূপ গোলযোগ দেখিয়াই বোধ হয়, পরাশর ঐ শ্লোকের সংস্করণ করেন, পরাশরের বচন এইরূপঃ—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেদ্ কন্যা অতউর্দ্ধং রজস্বলা॥
প্রাপ্তেতু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যা পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ং॥

অষ্ট বর্ষা কন্যাকে গৌরী, নববর্ষাকে রোহিণী দশ বর্ষাকে কন্যা ও তার পর রজস্বলা বলে। দ্বাদশ বৎসর (প্রাপ্ত) হইলে, যে কন্যাদান না করে তাহার পিতৃলোকেরা ইত্যাদি।

দেখা যাইতেছে যে পরাশর অঙ্গিরার গোলযোগের সংস্করণ করিতে গিয়া মনুর পথেই অগ্রসর হইয়াছেন। ঘুরে ফিরে দ্বাদশ বৎসরে আসিয়া পড়িয়াছেন। বাস্তবিক—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।

এই আধখানা বচন যদি বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে 'দশ বর্ষা ভবেৎ কন্যা' এইরূপ না বলিলে চলে না। সুতরাং দশ হইতে এগার বৎসর পর্য্যন্ত খাস্ কন্যাকাল; তাহার পর অর্থাৎ একাদশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর হইতে পারিভাষিক রজস্বলা কাল। এই পারিভাষিক রজস্বলা কালে অর্থাৎ কন্যার পূর্ণ এগার বৎসর বয়স হইলে পর তাহার বিবাহ দেওয়া চলিবে না কি? চলিবে, কিন্তু এগারর পর বার পূর্ণ হওয়ার মধ্যে দিতে

হইবে—ইহার মধ্যে যদি না দেও, তাহা হইলে তোমার পিতৃপুরুষের বড়ই দুর্গতি হইবে। তবেই পরাশরের মতে দশ হইতে এগার বৎসর পর্য্যন্ত খাস কন্যাকাল সেই সময় কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য অন্তত এগার হইতে বার বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক।

এই মতের সহিত মনুর মতের বিশেষ বিরোধ নাই। তবে মহাত্মা মনু কন্যাকর্ত্তাকে সৎপাত্র পাওয়ার দিকেই লক্ষ্য রাখিতে বলেন, কালাকালের বিশেষ নিয়ম ক'রন নাই এইমাত্র। আমরাও বলি, ইহাই সদ্বুদ্ধির কথা, ইহাই শাস্ত্র, ইহাই ধর্ম্ম।

দশ বার বৎসরে কন্যার বিবাহ দেওয়ায় নব্য সম্প্রদায়ের আপত্তি আছে; আপত্তি বৈজ্ঞানিক। নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই বিবেচনা করেন, যে বিবাহ হইলেই দম্পতির শারীরিক সম্মিলন হইবে। এগার বার বৎসরের বালিকার গর্ভাধান, তাঁহারা বিশেষ অনিষ্টকর বলিয়া বিশ্বাস করেন, কাজেই এগার বার বৎসরের কন্যার বিবাহে তাঁহাদিগের আপত্তি।

আমরা বলি, নব্য সম্প্রদায় ঐরূপ বিবাহে আপত্তি না করিয়া, যদি আপন আপন পুত্র কন্যার বধূ জামাতার সহিত বাল্যমিলন নিবারণের যত্ন করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। যদি তাঁহারা বলেন, যে বিবাহ দিয়া বর বধূর শারীরিক সংঘটন নিবারণ করা অসাধ্য, তাহা হইলে আমরা বলি,—যদি সম্পূর্ণ আয়ত্তিগত বধূর সহিত পুত্রের সংঘটন অনিবার্য্য হয়, তাহা হইলে আয়ত্তির একান্ত বহির্ভূত বারবনিতার সহিত পুত্রের অধিগমনও অনিবার্য্য হইবে। যদি বলেন, সৎশিক্ষায় ও সদ্দৃষ্টান্তে বেশ্যাগমন নিবারণ করা যায়; তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, সেইরূপ সৎশিক্ষা ও সদ্দৃষ্টান্তে কি বাল্য সংঘটন নিবারণ করা যায় না? অবশ্যই যায়। ওদিকে আমাদের দৃষ্টি নাই বলিয়াই যত গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে।

বঙ্গের প্রবীণ নবীন সকল সম্প্রদায়কেই আমরা বলি, যাহাতে কন্যার দ্বিতীয় সংস্কারের পূর্ব্বে বরবধূর সংঘটন না হয়, সে পক্ষে সকলেরই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ঐরূপ সংঘটন অস্বাভাবিক, অশাস্ত্রীয়, অনাচার। কিছু কাল পূর্ব্বে—এরূপ সংঘটন গৃহিণীরা পুত্রের অল্পায়ুষ্কর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; দ্বিতীয় সংস্কার না হইলে দ্বিরাগমন হইত না; হইলেও, বিবাহের এক বৎসর মধ্যে দ্বিরাগমন হইত না। এক বঙ্গদেশ ছাড়া, উৎকল

উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি সকল দেশেই এখনও দ্বিতীয় সংস্কার না হইলে, 'গহনা' বা দ্বিরাগমন হয় না, বা দ্বিরাগমন না হইলে, কখনই বর বধূর মিলন হয় না। বাস্তবিক তাহাই—ধর্ম্ম, তাহাই বিজ্ঞান, তাহাই সদাচার। আমাদের দেশে দেখিতে দেখিতে এই বিষয়ে অনাচার প্রবেশ করিতেছে। সর্ব্বদেশে ধূলা পায়ে দিন করা, সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এই প্রথার বিস্তৃতি রোধ করিতে হইবে, অস্বাভাবিক সংঘটন নিবারণ করিতে হইবে।

গারিবল্‌ডি।

১।

১৮০৭ সালের ২২ শে জুলাই ইটালি দেশের নাইস্ নগরে নাবিকগৃহে শুভক্ষণে গারিবল্‌ডি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নৌ-ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন তদ্দেশস্থ সামান্য নাবিকগণ অপেক্ষা তিনি সমধিক উন্নতমনা এবং অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ ও পরিবার প্রতিপালন করিতেন। আপনারা কষ্টে-সৃষ্টে দিনপাত করিয়া সন্তানকে বিশেষরূপে শিক্ষিত করেন, তাঁহার পিতার নিতান্ত বাসনা ছিল। তাঁহার মাতা সর্ব্বদা সামান্য মৎস্য ব্যবসায়িনী নাবিক রমণীদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন এবং সতত অসৎস্বভাবা কদভ্যাসরতা অবনতমনা নারীদিগের মধ্যে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বভাব দূষিত করিতে পারে নাই। তাঁহার মানসিক তেজ ও দর্প, তাঁহার স্বাভাবিক কোমলতা ও গাম্ভীর্য্য চির দিন অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার দয়া ও সহানুভূতি সকলের উপর সমান ছিল। তাঁহার নিকট হইতে গারিবল্‌ডি অতি শৈশবাবস্থাতেই দেশ-ভক্তি শিক্ষা করেন, এবং সেই ভক্তিই কালে দেশোদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল। তাঁহার মাতা এক দিকে পূর্ব্বোক্ত গুণরাশিতে বিভূষিতা ছিলেন অপর দিকে তাঁহার স্নেহ বাৎসল্যাদি স্ত্রী-সুলভ গুণেরও অভাব

ছিল না। গারিবল্‌ডি ভবিষ্যতে যে অসাধারণ নির্ভীকতার সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ হন, তাহার একমাত্র নিগূঢ় কারণ তাঁহাব মাতার একান্ত সন্তান-বাৎসল্য। তিনি স্বয়ং একদা বলিয়াছেন, 'লোকে আমার মাহাত্ম্য দেখিয়া বিস্মিত ও চকিত হন, তাঁহারা জানেন না যে যখন মাতার ন্যায় পরম পবিত্রস্বভাবা বমণী আমাব মঙ্গলেচ্ছায ঈশ্ববেব নিকট সতত প্রার্থনা কবিতেছেন, তখন আমার কোন প্রকাব অমঙ্গল হওয়া একেবাবেই অসম্ভব। এই সুদৃঢ় ধাবণাই আমাব অলৌকিক সাহসেব একমাত্র কারণ।'

পিতার অবস্থা সামান্য, অথচ তিনি গারিবলডিকে রীতিমত শিক্ষিত করিবাব জন্য বিশেষ সচেষ্ট ও সযত্ন ছিলেন। কিন্তু গাবিবল্‌ডি পিতার চেষ্টায় ও যত্নে বিশেষ শিক্ষালাভ কবিতে পারেন নাই। কালে তিনি বীবজনগণ মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার কবিযাছিলেন বটে, কিন্তু বাল্যকালে বিশেষ বুদ্ধির প্রাখর্য্য বা শিক্ষায় তৎপরতা দেখান নাই। তাঁহাব সমপাঠীগণ অপেক্ষা তিনি কিছুতেই অধিক উন্নতি লাভ কবিতে পাবিতেন না; ববং অনেক বিষয়ে তাহাদেব অপেক্ষা তিনি নিকৃষ্ট ছিলেন। তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহাকে নির্ব্বোধ অকর্ম্মণ্য বালক বলিযা তাঁহার শিক্ষাব জন্য অধিক যত্ন লইতেন না। তিনি একস্থলে নিজেই স্বীকাব কবিয়াছেন 'বাল্যকালেব প্রথমাবস্থায় আমি শিক্ষা অপেক্ষায় আমোদ আহ্লাদ ভাল বাসিতাম। এই কারণে পিতা মাতা আমার জন্য যে পরিমাণে যত্ন ও ব্যয় স্বীকার কবিয়াছিলেন, আমি সে পবিমাণে শিক্ষালাভ করিতে পাবি নাই।' অথচ বাল্যকালে তাঁহাব হৃদয় সততা ও কোমলতাব আবাসভূমি ছিল। তাঁহার এমনই কেমন এক প্রকার পবিত্র কোমল স্বভাব ছিল, একবাব তাঁহাকে দেখিলেই তাঁহাব প্রতি স্নেহেব উদ্রেক হইত। আবার এদিকে তাঁহাব সমবয়স্কদিগের ভিতব তাঁহাব ন্যায় একাগ্রচিত্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেহই ছিল না। প্রতিবেশির প্রাচীব অতিক্রম কবিয়া বাগান হইতে ফল মূল চুবি কবিতে গারিবল্‌ডি বালকদিগের অধিনায়ক হইতেন। পুস্তকেব প্রতি তাঁহার বড় বিতৃষ্ণা ছিল। স্বভাবত অনেক তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকের পুস্তকের উপদেশে আস্থা থাকে না। তাঁহারা বাহ্যপ্রকৃতি হইতে যথার্থ অকৃত্রিম জ্ঞান লাভ করেন। অত্যুচ্চ শৈল শিখরমালা কালের সর্ব্বনাশকর দর্প অতিক্রম করিয়া চির দিন সমভাবে দণ্ডায়মান, গভীর তরঙ্গময় সমুদ্র চিরকাল অপ্রতিহত ভাবে প্রবা-

ছিত, দেখিয়া তিনি যে স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, অচলতা, অক্ষুন্নতা শিক্ষা করিয়াছিলেন, সে শিক্ষা বাহ্যপ্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ না করিলে পাওয়া যায় না, এবং সে প্রকার শিক্ষা না পাইলে গারিবল্ডির জীবন অত্যুন্নত হইত কি না সন্দেহ।

নাবিকদিগের মধ্যে সতত বাস করায় অতি অল্পকাল হইতেই তাঁহার সমুদ্র গমনে ইচ্ছা জন্মে। বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে পিতার সহিত নৌকায় যাইতেন, এবং সেই অল্প বয়সেই প্রবীণ নাবিকদিগের ন্যায় নৌবিদ্যায় নিপুণতা লাভ করেন। তাঁহার আট বৎসর বয়সের সময় তিনি জলমগ্ন হইয়া একটি বৃদ্ধা রমণীকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। পাঠে বিরক্ত হইয়া ও শিক্ষকদিগের প্রতি রোষ পরবশ হইয়া, তিনি বাল্যকালে একদিন সমুদ্র পথে জেনোয়া বন্দরে যাত্রা করিবেন মনস্থ করিলেন। জেনোয়া বন্দর তাঁহার জন্মভূমি হইতে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূরে সমুদ্রকূলে অবস্থিত। সমাধ্যায়ী কতকগুলি বালককে সঙ্গী করিয়া মৎসজীবীদিগের একখানি ক্ষুদ্র তরি সমুদ্র বক্ষে ভাসাইলেন। এমত সময়ে একজন ধর্ম্মযাজক তাঁহার পিতাকে এই সকল সংবাদ দিলেন, তাঁহার পিতা পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সন্তানকে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। কথিত আছে যে এই সময় হইতেই গারিবল্ডি ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের উপর খড়্গাহস্ত হইলেন, এবং পরিশেষে পোপ ও অন্যান্য ধর্ম্মযাজকদিগের ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই ঘটনা হইতেই যে তাঁহার মনে ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের উপর বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা উদ্রিক্ত হইয়াছিল, এ কথা নিশ্চয় বলা যায় না।

তাঁহার সমুদ্রযাত্রার প্রথম উদ্যোগে পিতা বাধা দিলেন, এবং বাটীতে লইয়া আসিয়া ক্রমাগত সমুদ্রযাত্রার ক্লেশ, দুঃখ ও বিপদ সকল বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে বালকের মনে সমুদ্র গমনে ভয় ও বিরাগ জন্মে তাহার বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গারিবল্ডি সামান্য বালক নহেন, যত বিপদ ও ক্লেশের কথা শুনেন, ততই তাঁহার মন সমুদ্রের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। পিতা তাঁহার সমুদ্র গমনে একান্ত স্পৃহা ও সুদৃঢ়ানুরাগের খর্ব্বতা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া পিতা নিজের জাহাজ লইয়া যাত্রা করিতে পুত্রকে অনুমতি দিলেন। তিনি এক একবার করিয়া ওদেশা, রোম, লিবাণ্ট, গ্রীশ ও অন্যান্য প্রধান

প্রধান স্থানে গমন করিলেন। এই সকল জলযাত্রা কালে কতবার দস্যু-দলের সম্মুখীন হইয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনে সাহস ভিন্ন ভয় উৎপাদন করিতে পারে নাই। এই প্রকারে মহাবীর যোসেফ গারিবল্‌ডির সুমহৎ জীবনের প্রথমাংশ অতিবাহিত হইল।

গারিবল্‌ডি ১৮৩৩ সালে মার্সেলি নগরে যোসেফ মাট্‌সিনির সহিত প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন। ইটালীর পক্ষে এটি মাহেন্দ্র যোগ, দুই শুভগ্রহ একত্র আসীন। দুই জনের জীবনের একই উদ্দেশ্য, উভয়েই একই ভাবে উত্তেজিত। ইটালীর স্বাধীনতা উভয়ের জীবনেরই সুদৃঢ় সংকল্প। উভয়ে পরস্পর প্রথম সাক্ষাৎ কাল হইতে সুদৃঢ় প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও নিজ নিজ সঙ্কল্পে দৃঢ় বদ্ধ হইলেন। মাট্‌সিনি এমন একজন দেশভক্ত পাইলেন, যাঁহার বিপদই সম্পদ, দুঃখই সুখ, স্বদেশোদ্ধার যাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, যিনি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যতক্ষণ শরীরে বিন্দুমাত্র শোণিত থাকিবে, ততক্ষণ বিমুখ ও হতাশ হইবার নহেন। এ প্রকার অমিততেজা, অলৌকিক সাহসী, অকপট দেশভক্তের সহিত মিলিত হইয়া মহাত্মা মাট্‌-সিনির মন অধিকতর নাচিয়া উঠিল। এই সময়ে গারিবল্‌ডি মাট্‌সিনির নিকট সত্য-বদ্ধ হন, যে, যাহাতে ইটালিতে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

এই সময়ে মাট্‌সিনি পায়দমন্ত নগর আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন; এবং গারিবলডিকে তাহার ভারার্পণ করিলেন। গারিবল্‌ডির চেষ্টা বিফল হইল। প্রথমে অবরুদ্ধ হইবেন এবং পরে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে, এই আশঙ্কায় গারিবল্‌ডি তথা হইতে দূরদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার জীবনের এই অংশের ইতিহাস অতি আশ্চর্য্য। নিশাযোগে অজানিত পর্ব্বতময় দুর্গম পথে ভ্রমণ এবং দিবাভাগে শৈবালাচ্ছন্ন বা অনাচ্ছাদিত ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিতে লাগিলেন। কতদিন অনাহারে যাপন করিতেন, কখন বা কৃষক রমণীগণ দয়া করিয়া অতি অল্প পরিমাণে যৎকিঞ্চিৎ যাহা দান করিতেন, তাহাতেই প্রাণ ধারণ করিতেন। এই সময়ে তাঁহার চৈতন্য হইল যে, প্রকৃত দেশভক্তের জীবন কষ্টময় ও বিপদ সঙ্কুল। যিনি স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিয়া নরজন্মে অমরতা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাকে অতি কঠোর ক্লেশ, অনেক দারুণ যাতনা সহ্য করিতে

হয়। সামান্য লোকের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট হইলে গারিবল্‌ডি এত দিন বহুকাল এ সকল কষ্ট বিসর্জ্জন দিয়া, সুখে নিজ কুটীরে আশ্রয় লইতে পারিতেন। কিন্তু বিপদে অটল, কষ্টে অক্লান্ত, মহাবীরের দৃঢ়তা, পর্ব্বতের ন্যায় অচল। যতই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন ততই তাঁহার মন অধিকতর উত্তেজিত হইতে লাগিল। পদে পদে বিপদ, প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর আশঙ্কা, প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন নাশের ভয় অতিক্রম করিয়া স্বকার্য্য সাধনে অগ্রসর হইলেন। এই প্রকারে সুদারুণ কষ্টে প্রায় বিশ দিবস পথ অতিক্রম করিয়া অস্থিচর্ম্মসার দেহে ফরাশি দেশের সীমায় উপস্থিত হইলেন। এখন আর শত্রু ভয় রহিল না। কিন্তু তথায় তিনি নিশ্চিন্ত থাকিবার নহেন। শীঘ্রই টিউনিস্‌ নগরের একখানি জাহাজে উঠিয়া আবার মার্সেলিতে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে নগরে বিসূচিকা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এই অবসরে তিনি স্বাভাবিক দয়া ও স্বজাতিবাৎসল্য দেখাইবার সুযোগ পাইলেন। তিনি চিকিৎসালয়ে রোগীদিগকে বিনা বেতনে স্বেচ্ছাক্রমে স্বহস্তে ঔষধ সেবন ও সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের পরপারে স্বাধীনতা লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত। রায়গ্রাণ্ডি বাসীরা ব্রেজিলের অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া উহার কঠোর শাসন হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। গারিবল্‌ডি এই কথা শুনিবামাত্র যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন। তিনি আমেরিকা যাইয়া আপনার স্বভাব সুলভ শৌর্য্য বীর্য্য দেখাইবার পথ পাইলেন। এদিকে দেখিলেন, যে রাজবিদ্রোহের জন্য তিনি ও মাট্‌সিনি অপেক্ষা করিতেছেন, তাহা শীঘ্র ঘটিবার নহে এবং তৎকালে ঘটিলে তাঁহাদের পক্ষে অনর্থের মূল হইবে, সুতরাং কিছু দিনের জন্য স্বদেশ ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একখানি সামান্য ধীবরের জলযান অবলম্বন করিয়া ষোল জন মাত্র যাত্রী সমভিব্যাহারে গারিবল্‌ডি আমেরিকার দুর্দ্দান্ত ব্রেজিলের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। এই সামান্য জাহাজে থাকিয়া এবং জন কতক লোকের সাহায্যে তিনি অনেকগুলি বণিক পোত লুণ্ঠন করিলেন। তাহাতে তাঁহার বলবৃদ্ধি হইল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে একখানি জাহাজ আক্রমণ করিতে গিয়া স্বয়ং ধৃত, আহত ও কারারুদ্ধ হইলেন। এই সময়ে তিনি ক্ষণকাল সামান্য লোকের ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ছয় মাস কারাবাসের পর এক দিন কয়েক জন কর্ম্মচারীর সাহায্যে পলায়ন করিতে মনস্থ করিলেন। শীঘ্রই ধৃত হইলেন। নিষ্ঠুর রাজপুরুষগণ তাঁহাকে নানাবিধ কঠোর যন্ত্রণা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে জানিতে চাহিল কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পলায়নের সহায়তা করিয়াছিল। দুই ঘণ্টা তাঁহাকে উপর দিকে পদ ও নিম্ন দিকে মস্তক করিয়া বাধিল কিন্তু তিনি কিছুতেই উপকারকদিগের অপকার হইবে, এমত কার্য্য করিলেন না। দুই মাস ধরিয়া অতি কষ্টে কারাগারে অবস্থিতি করার পর কোন সুযোগে নিষ্কৃতি পাইলেন। কারাবাস বিমুক্ত হইবা মাত্র রায়গ্রান্দে আসিয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন। সকল কষ্ট, সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। ক্রমাগত ছয় বৎসর ধরিয়া অসীম সাহসের সহিত ব্রেজিলের বিপক্ষে অস্ত্র চালনা করিয়া যখন দেখিলেন তিনি আর কিছুতেই তাঁহার আশ্রিতদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বিশেষত তথাকার অধিবাসিগণ তাঁহার প্রতি যে প্রকার অসদ্ব্যবহার করিতেছিল, তাহাতে আর অধিক কাল থাকিতে পারিলেন না।

ব্রেজিলের সহিত যুদ্ধে একদিন অনেকগুলি স্বদলস্থ সৈনাক্ষয়ে হতাশ হইয়া মনে মনে বিবাহের কল্পনা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন মনের মত একজন সহবাসিনী পাইলে হৃদয়ের ভার অনেক লাঘব হইবে। পরে তিনি আনিটা নাম্নী রমণীকে নিজ প্রকৃতির অবিকল অনুরূপ দেখিয়া তাহার প্রতি প্রণয় পরবশ হইলেন। আনিটাও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। এমন কি উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ দিবসেই পরস্পরের মধ্যে এক প্রকার সৌহার্দ স্থাপিত হয়। কিন্তু উভয়ের মিলনের একটা ঘোরতর ব্যাঘাত ছিল। আনিটা পরিণীতা। গারিবল্ডি আনিটাকে লইয়া দেশান্তরিত হইলেন। তুমুল সংগ্রাম ক্ষেত্রেও আনিটা প্রণয়ী পাশ ত্যাগ করিতেন না, অনেক সময়ে বীরবরের সহকারিণী হইয়া স্বয়ং অস্ত্র ক্ষেপ করিতেন।

গারিবলডি রায়গ্রান্দি ত্যাগ করিয়া এক্ষণে মন্টবিদায় নগরে উপস্থিত হইলেন, এখানে ইটালি হইতে রাজ বিদ্রোহ অপরাধে নির্ব্বাসিত কতকগুলি লোক বাস করিত ইহাদিগকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। একদিন মান অন্তনীয় নামক স্থানে যুদ্ধ কালীন সৈন্যগণকে বিমনা

দেখিয়া বলিয়াছিলেন " শত্রু সংখ্যা অধিক, আমাদের লোকবল কম, ইহা আমাদের সৌভাগ্যের কথা। আমরা যত কম সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করত জয় লাভ করিব, তত অধিক গৌরবের কথা।' এই কথায় সৈন্যগণ উত্তেজিত হইয়া সাহসে ভর করিয়া শত্রুদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। তাঁহার দল জয়ী হইল, ইহাতে তাঁহার যশ বিস্তার পাইল এমন কি এই অবধি তাঁহাকে লোকে মন্দবিদায়ের বীর বলিতে লাগিল।

১৮৪৮ সালে ইটালিতে বিদ্রোহাগ্নি আবার প্রজ্বলিত হইল। সার্দিনিয়াধিপতি চার্লস আলবার্ট সৈন্যদিগের নেতা হইলেন। এই কথা গারিবল্ডির কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি শত সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে সার্দিনিয়াধিপতির সাহায্যার্থ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া অস্ট্রিয়ার বলক্ষয় করিতে মনস্থ করিলেন। চার্লস কিন্তু বীরবরের সাহায্য লইলেন না। তাঁহার মনোগত ভাব ছিল যে অস্ট্রিয়া হইতে ইটালি রাজ্য বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বয়ং রাজ মুকুট ধারণ করেন। গারিবল্ডি সঙ্গে থাকিলে সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না, এই আশঙ্কায় গারিবল্ডি সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেও সাহায্য গৃহীত হইল না। গারিবল্ডি ক্ষুব্ধ হৃদয়ে কর্ণেল মেদিসিনি সহিত মিলানে যাইয়া লম্বার্দি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিবেন মনস্থ করিলেন। অনতিবিলম্বে লম্বার্দি ও পায়দমন্দ হইতে অন্যূন পাঁচ সহস্র যুবক গারিবল্ডির দলভুক্ত হইল। মাটসিনি স্বয়ং দলস্থ হইলেন। এই দেখিয়া গারিবল্ডির আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সৈন্য সমভিব্যাহারে তিনি শত্রু পক্ষ আক্রমণ জন্য যেমন অগ্রসর হইবেন, অমনি শুনিলেন যে নেপল্স পরাজিত হইয়াছে। সুতরাং অস্ট্রিয়ার সৈন্য ভেদ করিয়া সুইজর্লন্দে পলায়ন ভিন্ন তাঁহার আর গত্যন্তর রহিল না। এই ব্যাপারে অনেক সৈন্যক্ষয় হইল, শত্রু সৈন্যও অনেক বিনষ্ট হইল। সুইজর্লন্দে পৌঁছিয়া দেখিলেন, তাঁহার পাঁচ সহস্রের মধ্যে কেবল পাঁচশত মাত্র জীবিত আছে।

১৮৪৯ অজিতচেতা গারিবল্ডি আবার রোমানদিগকে উত্তেজিত করিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ফরাশি সৈন্য রোমে প্রবেশ করিতে উদ্যত হওয়াতে প্রথমে তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন; কিন্তু অসংখ্য অস্ট্রিয় সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া যখন দেখিলেন জয়ের আশা নাই, তখন পাঁচ সহস্র সৈন্য লইয়া পলায়ন করিলেন এবং সান মরিনো নামক স্থানে

পঁহুছিলা সৈন্যদিগকে বিদায় দিলেন। যাহারা নিতান্ত তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না, তাহাদিগকে লইয়া সার্দ্দিনিয়া যাইবেন মনস্থ করিলেন।

পথিমধ্যে আহারাভাবে ও পথ কষ্টে একে একে প্রায় সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইল। গারিবল্ডির হর্ষে বিষাদ; এই সময়ে একটি শিশু সন্তানকে প্রসব করিয়া তাঁহার সুখদুঃখ ভাগিনী প্রিয় সহচরী লীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার দুঃখের পরিসীমা রহিল না। আরও দুঃখের বিষয় যে, যাঁহাকে তিনি আপনার হৃদয় অপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্তি পর্য্যন্ত স্বয়ং দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া গ্রামবাসীগণকে সৎকারের ভারার্পণ করিয়া সমভিব্যাহারীগণের প্রাণ রক্ষার্থ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এই প্রকার প্রায় পঞ্চত্রিংশ দিবস ভ্রমণ করিয়া নিদারুণ শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা জর্জরিত, জীর্ণ শীর্ণ কলেবরে সার্দ্দিনিয়ায় উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে যখন মনে হইত যে যে ব্যক্তি তাহার সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া তাঁহার হস্তে জীবন সমর্পণ করিয়াছিল যে ব্যক্তি স্বদেশ, স্বজন ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রণয় পরবশ হইয়া থাকিত, যে ব্যক্তি সুখে দুঃখে তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষের অন্তর করিত না, তাঁহাকে পথিমধ্যে চির দিনের জন্য ফেলিয়া যাইতেছেন, তখন বীরের কঠিন হৃদয়ের ভিতর হইতে অশ্রু প্রবাহ বিগলিত হইত। যখন ভাবিতেন যে সেই প্রণয়িনীর সৎকার পর্য্যন্ত স্বয়ং করিতে পারিলেন না, তখন এই কথা মনে করিতেন, স্বদেশের জন্য স্নেহ, দয়া মায়া সকলই ত্যাগ করিতে হয়। স্বদেশের মঙ্গলসাধন করা নিতান্ত কঠোর ব্রত।

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। | অগ্রহায়ণ ১২৯৪। | ৫ম সংখ্যা।

গারিবল্‌ডি।

২।

১৮৫৯ সালে ইটালির অবস্থা অতি শোচনীয়। ইটালির স্থানে স্থানে যে সকল রাজপুরুষগণ রাজ্যশাসন করিতেন তাঁহাদের অত্যাচারের, তাঁহাদের প্রজানিগ্রহের ও যথেচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁহারা কোনপ্রকার দুষ্কর্ম্ম, অন্যায়, অসদ্ব্যবহার করিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অষ্ট্রিয়ার রাজপুরুষগণের সহিত বিরাজ করিত। ইটালির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবল দুঃখের ও সন্তাপের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। যে ইটালি এককাল পাশ্চাত্য দেশের শীর্ষস্থানীয় ছিল, যে ইটালি, কি বিদ্যাগৌরবে, কি শিল্প-কৌশলে, কি রাজনৈতিক বলে, এককাল সভ্যজগতে বরণীয় ছিল, এখন সেই ইটালি ঘোর তামসে আচ্ছন্ন, অত্যাচারে জর্জ্জরিত। কিন্তু অধর্ম্মের দিন শীঘ্রই শেষ হয়। ইটালির দুঃখ রজনী প্রভাত হইয়া আসিয়াছে।

এই সময়ে সার্ডিনিয়ার প্রধান মন্ত্রী রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠ কবর দেখিলেন যে অষ্ট্রিয়ার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। যদিও ইটালিবাসীগণ এত পীড়নেও স্বাধীনতা-প্রিয়তা ভুলে নাই কিন্তু ইটালিতে এখনও এত অধিক অষ্ট্রিয় সৈন্য থাকিত যে কবর তাহাদিগকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য জ্ঞান করিলেন। ১৮৩১ সালে ফরাশিরাজ তৃতীয় নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়া কর্ত্তৃক

অপমানিত হইয়াছিলেন, কনব সম্প্রতি তাঁহাকে উত্তেজিত কবিয়া তাঁহার সাহায্যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবিতে পারিবেন ভাবিলেন। এই সময় কনর গারিবল্‌ডিকে টিউরিনে আহ্বান করিলেন। গারিবল্‌ডি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া টিউরিনে রাজা ও রাজমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কনব এই অবসরে গারিবল্‌ডিকে কহিলেন, "আমরা যে সময়ের প্রত্যাশায় বসিয়াছিলাম, আজ সে দিন উপস্থিত; আমাদিগকে সাহায্য করা তোমার কর্ত্তব্য।" গারিবল্‌ডি উত্তর করিলেন "আমি চির দিন দেশের কার্য্য করিতে নিরত।" ইতিমধ্যে গারিবল্‌ডির রাজনৈতিক মতের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মাট্‌সিনির ন্যায় সাধারণ তন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা না করিয়া তিনি ইংলণ্ডের ন্যায় মিশ্র তন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। সার্দ্দিনিয়াধিপতি বিকটর ইমানুয়েল সাহসী, বদান্য ও প্রজাবৎসল, সুতরাং ইটালি অস্ট্রিয়ার হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলে ক্ষতি নাই। এই প্রকারে গারিবল্‌ডি সার্দ্দিনিয়াধিপতির সহিত মিলিত হইয়া স্বদেশোদ্ধারে মনোনিবেশ করিলেন। কনব যে ফরাসিদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে কল্পনা করিয়াছিলেন, গারিবল্‌ডি তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। তিনি বলিলেন বিদেশীয় অত্যাচার হইতে বিমুক্ত হইতে বিদেশীয় সাহায্যের প্রয়োজন নাই। সত্যের জয় অবশ্যই হইবে।

গারিবল্‌ডি প্রধান সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। তিনি ক্রমশ দলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। উচ্চ বংশজ যুবকগণ দলে দলে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিলেন। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সংবাদ পৌঁছিল। ইটালি উত্তেজনায় মাতিয়া উঠিল। ছাত্রগণ বিদ্যালয় ত্যাগ করিল, শিল্পী ব্যবসায় ত্যাগ করিল, সকলে আসিয়া গারিবল্‌ডির নিকট উপস্থিত। সকলেই দেশ উদ্ধার জন্য প্রাণপণ। নির্ব্বাপিত দেশভক্তি পুনর্ব্বার ভয়ানকরূপে ইটালির সর্ব্বত্র ধূ ধূ করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অবিলম্বে অন্যূন ১৭ সহস্র সৈন্য গারিবল্‌ডির নিকট সমবেত হইল। অর্থেরও অভাব রহিল না। রমণীগণ দেশ উদ্ধার জন্য মাতিয়া উঠিলেন। তাঁহারা আপনাদের স্বর্ণ, রৌপ্য অলঙ্কার সকল গারিবল্‌ডির নিকট যুদ্ধ ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ইটালি পরাধীনতারূপ নিগড় ছিন্ন করিতে প্রস্তুত হইল।

গারিবল্‌ডি একটির পর আর একটি যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সেনাধ্যক্ষ মার্শল

অর্ানেকে পরাজিত করিলেন, অবশেষে বর্শেলি, ফোমো,বেরিশি, মাগনিটা, ও বারগামো যুদ্ধে অস্ট্রিয়া সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করেন। মাগনিটা সমরে গারিবলডি অস্ট্রিয়ার আধিপত্য একেবারে উচ্ছিন্ন করিয়া দেন। প্রায় সকল যুদ্ধেই গারিবলডিকে প্রভূত সৈন্যের বিপক্ষে ধাবমান হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অপরিসীম সাহসে,ও অতুল্য রণনৈপুণ্যে সকলগুলিতেই তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন। কএক মাস মধ্যেই ইটালি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল, ইটালিতে শান্তি সংস্থাপিত হইল এবং গারিবলডি নির্জ্জাল হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

কিছু দিন পরে আবার সিসিলিতে যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। আবার গারিবলডিকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল। অল্পকাল মধ্যে সিসিলির তিনটি প্রধান প্রধান নগর, পালামো, মেসিনা ও বিজিও বশ্যতা স্বীকার করিল; তৎপরে একে একে নিকোটেরা, পাইনো, মাগার্নো ও অন্যান্য স্থান সকল তাহাদের অনুগামী হইল। এই প্রকারে সৈন্য সকলকে পরাস্ত করিয়া তিনি সিসিলির রাজধানী নেপলস যাত্রা করিলেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিবামাত্র দুরাচার দ্বিতীয় ফান্সিস রাজধানী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। গারিবলডি পলায়িত রাজার দুর্গ অধিকার করিতে যাইতেছেন, পথিমধ্যে বিক্টর ইমানুএলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গারিবলডি তাঁহাকে ইটালির রাজা বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। বিক্টর ইমানুএল ও গারিবলডি হর্ষোৎফুল্ল জন স্রোতের মধ্য দিয়া নেপলস প্রবেশ করিলেন। নগরের সকল স্থানেই কেবল গারিবলডির জয় হউক, গারিবলডি দীর্ঘজীবী হউন,এইরব শুনা যাইতে লাগিল। গারিবলডি এক্ষণে পুনবায় তাঁহার নিভৃত নিবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জন্ম ভূমির নিকটস্থ হইয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। যেখানে তাঁহার পৈতৃক কুটীর ছিল সেই থানে এক বৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে; যে নিভৃত পল্লীতে তাঁহারা বাস করিতেন, এক্ষণে তাহা একটি রীতিমত সহর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরে শুনিতে পাইলেন যে বিক্টর ইমানুএল তাঁহার সন্মানার্থ সেই সকল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তথায় তাঁহার ইংরাজ ও মার্কীন বন্ধুগণ সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। অন্য সময় প্রায় একাকী বাস করিতে হইত। এজন্য শীঘ্রই নিকর্ম্ম জীবনে বিরক্ত হওয়াতে পোপের প্রতি তাঁহার আশৈশব যে

বিদ্বেষ ছিল, তাহার স্ফূর্ত্তি পাইল। পোপের অধিকার আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। ইটালিবাসী ও ফরাসিগণ তাঁহার সম্মুখীন হইল। ঘোর যুদ্ধ বাধিল। বিজয়লক্ষ্মী কোন্ দিকে অনুগ্রহ করেন ঠিক নাই, এমন সময়ে গারিবল্ডির উরুদেশে একটা গোলা লাগিল, তাহাতে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। যাঁহাদিগকে তিনি শত্রুহস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়াছিলেন,তাঁহারাই আবার তাহার জীবন মৃত্যুর কর্ত্তা হইলেন। স্পেজিয়া কারাগারে দুই দিন ধরিয়া মহাবীর অচৈতন্য ভাবে যাপন করেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি ইটালির প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। সময়ে সময়ে প্রলাপচ্ছলে বলিয়া উঠিতেন "ইটালি এক হইল।" তাঁহার দুর্ঘটনার সংবাদ দেশ দেশান্তে অতি অল্পকাল মধ্যে ঘোষিত হইল, স্বদেশ বিদেশ হইতে লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। মৃত্যুশয্যাশায়ী গ্যারীবল্ডিকে দেখিবার জন্য স্পেজিয়া জেল প্রত্যহ লোকে লোকারণ্য। বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলের মুখে এককথা "এখন গারিবল্ডি কেমন আছেন" ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হইতে ভিষকগণ দলে দলে আসিতে লাগিলেন। গারিবল্ডি সকলকে সুমধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন "এখনও গারিবল্ডি জীবিত আছে।"

১৮৫৯ ও ৬০ সালে তিনি যে সকল অলৌকিক সাহস ও বীরত্বের কার্য্য করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া ইটালিবাসিরা তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন। এই সময়ে একজন ইংরাজ চিকিৎসক ত্রিশ সহস্র ফ্রাঙ্ক দিয়া পাইজাতে গারিবল্ডির উরুদেশ হইতে বিদ্ধগোলা বাহির করিলেন। ১৮৭০ সালে ফরাসি দিগের জন্য গারিবল্ডিকে পুনরায় অস্ত্র গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তদবধি কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি অসুস্থ শরীরে দিন যাপন করিতে ছিলেন। ১৮৮৩ সালে ৩রা জুনে তাঁহার জন্মভূমি ইটালিকে ও তৎসঙ্গে সমগ্র সভ্য জগৎকে দুঃখাশ্রুতে পরিপ্লাবিত করিয়া গারিবল্ডি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

৩।

এক্ষণে বিপর্যায় কি তাহা বোধ হয় পাঠক এক রকম বুঝিতে পারিলেন। এই বিপর্যায়, প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শাব্দ সকল স্থলেই ঘটিতে পারে। যখন আমাদের চোখের দোষ বা আবশ্যক মত আলোকাদির অভাব বশত শাদা বস্তুকে লাল বলিয়া বোধ হয়, তখন আমাদের বিপর্যায় বা ভ্রম প্রত্যক্ষ হয়। উহা প্রমাণ নহে, কারণ পূর্ব্বোক্ত চোখের দোষ বা অন্যরূপ অভাব দূরীভূত হইলে আমরা উহাকে শাদাই দেখি, লাল দেখি না। এইরূপ যখন আমরা অসৎহেতু দেখিয়া সাধ্যের অনুমান করি, তখন আমাদের বিপর্য্যায় বা ভ্রম অনুমান হয়। এবং অপ্রামাণিক লোকের কথায় বিশ্বাস করিলে আমাদের বিপর্যায় বা ভ্রম শাব্দ হয়। জগতে যত প্রকার ভ্রম আছে উহারা সকলেই বিপর্য্যায় বৃত্তিজন্য।

বিপর্যায় শব্দের অর্থ ভ্রম হইলেও যোগাচার্য্যেরা সংশয়কেও ইহার অন্তঃপাতি করিয়াছেন। কারণ সংশয়ও অতদ্রূপ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা (সংশয়) দ্বারাও যে বস্তু যেরূপ, তাহার ঠিক সেইরূপে জ্ঞান হয় না। অন্ধকারে একটা গাছের গুঁড়ি দেখিয়া 'ইহা গাছের গুঁড়ি কি মানুষ' এইরূপ যে জ্ঞান হয় তাহাকে সংশয় বলে। এখানে দেখ, গাছের গুঁড়িকে ঠিক গাছের গুঁড়ি বলিয়া জ্ঞান হইতেছে না। 'গাছের গুঁড়ি কি মানুষ' এইরূপ জ্ঞান হইতেছে। সুতরাং সংশয়ও তদ্রূপ-প্রতিষ্ঠ না হওয়ায় বিপর্য্যয়ের মধ্যেই নিবিষ্ট হইয়াছে। বিপর্য্যয়ের পর বিকল্প।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যোবিকল্পঃ। ৯।

পদচ্ছেদঃ।—শব্দ জ্ঞান অনুপাতী, বস্তু-শূন্যঃ, বিকল্পঃ।

পদার্থঃ।—শব্দজনিতং জ্ঞানং শব্দজ্ঞানং, তদনুপতিতুং শীলং যস্য স শব্দজ্ঞানানুপাতী, বস্তুশূন্যঃ নির্ব্বস্তুকঃ, এবম্ভূতো যোঽধ্যবসায়ঃ স বিকল্প ইত্যুচ্যতে।

ভাবার্থঃ।—বস্তু ন বিদ্যতে তদর্থঃ শব্দো বিদ্যতে। তেন যজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে তদ্‌বিকল্প জন্যম্। যথা পুরুষস্য চৈতন্যং স্বরূপমিত্যত্র দেবদত্তস্য কম্বল ইতি বৎ শব্দ জনিতে জ্ঞানে ষষ্ঠ্যা যোঽধ্যবসিতো ভেদস্তমিহা-

বিদ্যমানমপি সমারোপ্য বর্ত্ততেহধ্যবসায়ঃ। বস্তুতস্তু চৈতন্যমেব পুরুষঃ। এবং রাহোঃ শিরঃ ইত্যাদীনি বিকল্পজ্ঞানানি। যয়া বৃত্ত্যা প্রযুক্তশব্দ প্রতিপাদ্যস্য বস্তুনোঽভাবেঽপি তথাবিধশব্দপ্রয়োগমাত্রজন্যং কিমপি জ্ঞানং ভবতি স বিকল্পঃ।

অনুবাদ।—বিকল্প একটি মানসিকবৃত্তি, যাহা দ্বারা যে পদার্থ আদৌ নাই, অথচ কেবল বাচক শব্দ প্রয়োগ বশত সেই পদার্থ বিষয়ে (মিথ্যা) জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

সমালোচনা।—বিকল্প শব্দ সচরাচর দুই অর্থে প্রসিদ্ধ। এখানে ইহার একটি পারিভাষিক অর্থ কল্পিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা একটি মানসিক বৃত্তি বা অবস্থার বাচক। সংস্কৃতে অনেক শব্দ আছে যাহার অভিধেয় কোন একটা প্রকৃত বস্তু নাই। যেমন শশশৃঙ্গ (খরগোসের শিং) আকাশ কুসুম (আকাশের ফুল) ইত্যাদি, এবং কোন কোন স্থানে একার্থক শব্দ দ্বয়কে ভেদ বাচক বিভক্তি যুক্ত করিয়া ভিন্নার্থক রূপে কল্পিত করা হয়; যেমন রাহুর মস্তক। এখানে দেখ, মস্তক ও রাহু একই পদার্থ—কিন্তু ভেদ বাচক সম্বন্ধ-বিভক্তির যোগ থাকায় মস্তক ও রাহু যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহাই জানা যায়। এইরূপ 'পুরুষস্য চৈতন্যম্' এস্থলে পুরুষ ও চৈতন্য দুটী এক জিনিষ হইলেও সম্বন্ধ বিভক্তির যোগে দুটীর মধ্যে সম্পূর্ণ ভেদ প্রতীযমান হইয়া থাকে। আরও দেখ, গগনকুসুম নামে কোন একটী বস্তু না থাকিলেও গগনকুসুম এই শব্দ শ্রবণমাত্র আমাদের চিত্তের একটি অবস্থান্তর হয়, যাহাতে গগনকুসুমনামক যেন বাস্তবিক কোন বস্তু আছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ পুরুষ ও চৈতন্যের মধ্যে বাস্তবিক কিছুমাত্র ভেদ না থাকিলেও 'পুরুষস্য চৈতন্যম্' এই খানে ভেদ বাচক ষষ্ঠী বিভক্তি শুনিবামাত্র আমাদের চিত্তের এরূপ অবস্থান্তর হয়, যাহাতে উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয়। চিত্তের উক্ত রূপ অবস্থান্তরের নাম বিকল্প। ইহা যে প্রমাণ বা বিপর্য্যয় এই দুয়ের মধ্যে একটিরও অন্তর্গত হইতে পারে না, তদ্বিষয় ভাষ্যকার যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

'স ন প্রমাণোপারোহী ন বিপর্য্যয়োপারোহী বস্তু শূন্যত্বেঽপি শব্দজ্ঞান মাহাত্ম্যনিবন্ধনো ব্যবহারোদৃশ্যতে। তদ্যথা চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপ মিতি যদা চিতিরেব পুরুষঃ তদা কিমত্র কেন ব্যপদিশ্যতে? ভবতি চ ব্যপ-

দেশে বৃত্তিঃ, যথা চৈত্রস্য গৌরিতি। তথা প্রতিষিদ্ধবস্তু' ধর্ম্মা নিষ্ক্রিয়ঃ পুরুষস্তিষ্ঠতি বাণঃ, স্থাস্যতি, স্থিত ইতি গতিনিবৃত্তৌ ধাত্বর্থমাত্রং গম্যতে, তথাঽনুৎপত্তিধর্ম্মা পুরুষ ইতি উৎপত্তি ধর্ম্মস্যাভাবমাত্রমবগম্যতে, ন পুরুষান্বয়ী ধর্ম্মঃ তস্মাৎ বিকল্পিতঃ স ধর্ম্ম স্তেন চাস্তি ব্যবহার ইতি।'

এই বিকল্পকে প্রমাণান্তর্গত বা বিপর্য্যয়ের অন্তর্গত করিতে পার না। কারণ প্রমাণান্তর্গত করিতে হইলে এক শব্দ মাত্র প্রমাণের অন্তর্গত করিতে হয়। তাহা হইতে পারে না, কারণ শব্দপ্রমাণ স্থলে বাচকশব্দের দ্বারা একটা নির্দ্দিষ্ট বস্তুর জ্ঞান হয়, বিকল্প স্থলে সেরূপ নির্দ্দিষ্ট বস্তুই নাই। আর ইহাকে বিপর্যয়ের অন্তর্গতও বলিতে পার না। তাহার প্রতি দুইটী কারণ। বিপর্যয়স্থলে একটী বস্তু অন্যরূপে জ্ঞাত হয়, অর্থাৎ যে যাহা নহে সেই রূপে জ্ঞাত হয়, কিন্তু যে বস্তু একেবারেই নাই তাহার জ্ঞান হয় না, বিকল্প স্থলে যাহা নাই তাহারই জ্ঞান হয়। দ্বিতীয়, শব্দ প্রমাণ স্থলে যেমন শব্দ প্রয়োগের কোনরূপ বাধা ঘটে না, একই প্রকার শব্দ বরাবর প্রযুক্ত হয়, সেই রূপ বিকল্প স্থলেও শব্দ প্রয়োগের কোনরূপ বাধা ঘটে না, একই প্রকার শব্দের বরাবর প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন 'চৈতন্যই পুরুষ' এইরূপ উভয়ের অভেদ নিশ্চয় থাকিলেও পুরুষস্য চৈতন্যম্, এইরূপ ভেদ প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু বিপর্য্যয় স্থলে সেরূপ হয় না, এস্থলে একই প্রকার শব্দের বরাবর প্রয়োগ হইতে পারে না। যতক্ষণ অবধি ভ্রম থাকিবে ততক্ষণ অবধিই শুক্তিকাতে 'ইদং রজতম্' এরূপ শব্দের প্রয়োগ হইবে। কিন্তু ভ্রম অপসৃত হইলে আর 'ইদং রজতম্' এইরূপ শব্দের প্রয়োগ হইবে না। অতএব বিকল্পকে প্রমাণ ও বিপর্য্যয় এই উভয় হইতে অতিরিক্ত বলিতে হইবে। এক্ষণে বিকল্পের উদাহরণ দেখাইতেছেন। 'চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ' এখানে যখন চৈতন্য ও পুরুষ একই পদার্থ, তখন ইহাদের একটী বিশেষণ বা একটী বিশেষ্য এইরূপ ভেদ নাই; তবে 'চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ' এই বাক্যে যে ভেদ জ্ঞান হইতেছে তাহা অবাস্তবিক।

অভাব প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা। ১০।

পদচ্ছেদঃ।—অভাব প্রত্যয়-অবলম্বনা, বৃত্তিঃ, নিদ্রা।

পদার্থ।—কার্য্যং প্রত্যয়তে গচ্ছতীতি প্রত্যয়ো হেতুঃ, জাগ্রৎস্বপ্ন

প্রবৃত্তীনানভাবস্যাভাবে যা হেতুঃ (নিমিত্তীভূতং তমঃ) আলম্বনং বিষয়োযস্যাঃ সা বৃত্তির্নিদ্রা। যা সততমুদ্রিক্তত্বাত্তমসঃ সমস্তবিষয় পরিত্যাগেন প্রবর্ত্ততে বৃত্তিঃ সা নিদ্রা।

ভাবার্থঃ।—নিদ্রেকা বৃত্তিঃ। সাচ চিত্তস্যৈকাবস্থা। তস্যামবস্থায়াং বুদ্ধিসত্ত্বাচ্ছাদকস্য তমসঃ সর্ব্বতশ্চিত্ত বিষয়ীভূতত্বান্নকিঞ্চিজ্জ্ঞায়তে, ন কিঞ্চিদনুভূয়তে। বুদ্ধের্হি ত্রিগুণতয়া, যদা সত্ত্বরজসী অভিভূয় সমস্ত করণাবরকং তম আবির্ভবতি, তদা মলিনস্য চিত্তসত্ত্বস্য তম আকারৈব বৃত্তিঃ স্বপিমীত্যাকারা জায়তে। স্বাপশ্চাত্র জাগ্রৎস্বপ্নপ্রবৃত্ত্যভাবঃ ততশ্চ বুদ্ধে র্বিষয়াকার পরিণামাভাবাৎ তমোময়ীং বুদ্ধিমববুধ্যমানঃ পুরুষঃ সুষুপ্তোন্তঃ সংজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। অস্যাশ্চ (নিদ্রায়াঃ) সুখমহমস্বাপ্স মিতিস্মৃতিনিদর্শনাৎ স্মৃতেশ্চানুভববাতিবেকেনাঽনুপপত্তের্বৃত্তিত্বম্।

অনুবাদ।—নিদ্রা একটী মানসিক বৃত্তি বা অবস্থা। ইহা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় উত্থিত প্রবৃত্তি নিচয়ের অভাব হেতু তমোগুণকে আলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ যখন তমোগুণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে আবরণ করে, উহাতে আর অন্য বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হয় না, চিত্তের তাদৃশ অবস্থাকে নিদ্রা বলে।

ওই সে পাষাণী।

"বাছনি রে! না কাঁদিস্ আর—

এ ধরা নহেক তোর, পাপে সদা এ যে ভোর,
স্বার্থের জ্বলন্ত মূর্ত্তি হেথা বিদ্যমান।
সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ করে ভ্রমে সর্ব্বস্থান॥
শঠতা বঞ্চনা যার, সর্ব্ব কাজে জয় তার,
গুণীদের অনাদর হেথা চির রীতি।
সুজন ধার্ম্মিক সদা পায় দুঃখ ভীতি॥
পরিহাস পরবাদ, হিংসা দ্বেষ বিসম্বাদ,

নিদারুণ বিভীষণ রিপুর পীড়ন,
নশ্বর-জগতে এই সৌন্দর্য্য ভূষণ।
দয়া স্নেহ মমতার, নাহি লেশ কণাকার,
হৃদয় মরুভূ সম অতীব কঠিন,
নীরস প্রকৃতি সবে ন্যায় ধর্ম্ম হীন।
পাশবীয় অত্যাচারে, জর্জ্জরিত পরস্পরে,
সুধা বোধে বিষ পানে উন্মত্ত সবায়,
মোহিনী মায়ার চক্র পাতিত হেথায়।
অধঃ পথে অগ্রসর, পদে পদে নিরন্তর,
হতেছে, দেখরে বাছা গভীর আঁধার,
কেমনে হইবে হেথা আলোক বিচার?
কাচ বিনিময়ে এরা, না দিবে রে কেন হীরা?
অমূল্য রতনে কেন করিবে যতন,
তা হ'লে যে মায়া-রাজ্যে হ'বে অনিয়ম।

রে বাছনি!

যে জগতে হেন রীত, না বুঝি আপন হিত,
আপন পায়েতে মারে আপনি কুঠার,
সে জগতে কিবা তুমি আশা কর আর?
কাঁদিতে জনম তব, কেঁদে কর শেষ সব,
আশা-বাসা হোক ভস্ম নিরাশা অনলে
ধন অর্থ মান যশ যাক রসাতলে।
অপমান নির্য্যাতন, দরিদ্রতা বিভীষণ,
দুর্ব্বিসহ মর্ম্মপীড়া নিত্য শোক তাপ
হউক দ্বিগুণতর বিচ্ছেদ সন্তাপ।
পাগল বলিয়ে তোরে, যেন সবে ঘৃণা করে,
নারকী দুর্জ্জন বলে সাধে যেন বাদ
এই মাত্র অকৃত্রিম করি আশীর্ব্বাদ।
ইথে রে বাড়িবে পুন, ভক্তি-তৃষা শতগুণ,

ব্যাকুল-পরাণ তোর কাঁদিবে নিশ্চয়,
লভিবারে এ রাজ্যের শান্তি মধুময়।

কিন্তু বৎস!

রহে যেন হেন ভাব, তোর মনে সমভাব,
বিপরীত কিছুমাত্র না হয় তিলেক
সাবধান—ক্ষণকাল ত্যেজ না বিবেক।

বাছনি রে!

ধৈর্য্য ধর্ কিছু দিন, পাবি শান্তি চির দিন,
হতেছে রে হেথা তোর আবাস নির্ম্মাণ
প্রীতি প্রেম শান্তিপূর্ণ ভিত্তি সুমহান্!
দু'দিনের সুখ তরে, কি কাজ রে ভেক ধরে',
বিশাল ও মহীতল স্থান পরীক্ষার,
জেনো স্থির, প্রিয় বৎস এ লীলা আমার!
পাপী হাসে পাপ করে, কবি সুখী আরো তারে,
অভীপ্সিত কার্য্য তার সাধি সযতনে,
কে বুঝিবে এ রহস্য পার্থিব-ভুবনে?

বৎস!

তুই যে ভুগিস্ হেন এও মঙ্গল কারণ,
মঙ্গলময়ী রে আমি ভক্তের দুয়ারে—
ভ্রমি অনিবার তথা প্রবোধি সবারে।
তৃষিত চাতক সম, ডাক আরো পুনঃ পুনঃ—
ক্ষুধা নিদ্রা পরিহরি ডাকরে সঘনে
অনন্ত পীযূষ পূর্ণ 'মা' নাম বদনে।
মা তোরে করিবে বুকে, ছেলে ফেলে মা কি থাকে,
মায়ে রে যদি রে চাস্ কাঁদ্ উভরায়—
কান্না বিনে জননীকে কে কোথা রে পায়?

তাই বলি বাছা—

ডাক্ ডাক্ আরো ডাক্ হৃদয় মাতিয়ে থাক্—

"মা মা ... নাম অমিয়-ভাষায়—
ঘুচিবে ভবের দুঃখ আসিবি হেথায়!"
সুখের স্বপন মোর, সহসা হইল ভোর,
চকিতের মত উঠি বলিনু এ বাণী—
'দেখ রে মা ডাকে ভাই—ওই সে পাষাণী!'

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।
(কর্ণধার সম্পাদক)

মাতর্গঙ্গে।

মাতর্গঙ্গে তোমার ঐ কুল্ কুল্ ধ্বনি—ঐ মধুর স্বর্গীয় সঙ্গীত—শুনিতে বড় ভাল বাসি। মা, তুমি অনন্ত শান্তি-প্রসবিনী! তোমার ঐ স্বর্গের ছবি, প্রেমমাখা বিশ্ববিমোহন রূপ দেখিলে, এই সংসার বিষ জর্জ্জরিত পাপ হৃদয়ে বড় শান্তি পাই। তাই, নিশীথ সময়ে দৈব শ্য-দগ্ধ এই পাপ-প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে তোমার এই পবিত্র কূলে আসিয়া বসি। মাথার উপর—ঐ সুদূর নীলাকাশে মোহন-চাঁদ জ্যোতির্ম্ময় রূপের ছটায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাতাইতেছে;—আর তুমি সোহাগ-ভরে ঐ চাঁদের হাসি মাখিয়া যেন আপন ভাবে-আপনি-বিভোর হইয়া কুল্ কুল্ ধ্বনিতে মধুর সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়াছ।—জগৎ-প্রাণ সমীরণের সহিত আমাদের জ্ঞানের অতীত কি এক অনন্ত খেলা খেলিতে খেলিতে সৈকতভূমির উপর দিয়া আপন মনে আপনি চলিয়াছ!—তোমার ঐ কবি-কল্পিত অমানুষিক গম্ভীর অথচ চঞ্চল-ভাব দেখিলে, আমাতে আর আমি থাকি না—হৃদয় আমার স্তম্ভিত হয়। তোমার নিকট যে, মর্ম্মবেদনায় কাঁদিতে আসি তাহা কেমন ভুলিয়া যাই;—তখন তোমার ঐ অনন্ত-ভাব-সাগরে আমার এই ক্ষুদ্র ভাব-বিন্দু মিলাইয়া যায়।

তোমার ঐ অমানুষিক মধুর সঙ্গীতের কেমন এক মোহিনীশক্তি আছে,

যাহাতে এই দগ্ধ হৃদয় সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া কি জানি—কেমন এক স্বর্গীয়ভাবে বিমোহিত হয়। মানব যে দিন ঐ অমানুষিক কথার নিগূঢ় ভাব বুঝিতে সমর্থ হইবে, সে দিন ত মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে;—সে দিন ত মানুষ ভাবোন্মাদে মত্ত হইয়া জ্ঞানের অতীত অনন্ত-শান্তি-লোকে মহা-শক্তির অনন্ত-প্রেম-জ্যোতি দেখিতে পাইবে। তোমার ঐ স্বর্গীয় সঙ্গীতের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে এই ক্ষীণ-মনা মানব ত পাগল হইয়া যায় মা! মানুষ কোন্ অকিঞ্চিৎকর,—তোমার এই—জগৎ-বিমোহন মহাসঙ্গীতের মহাতত্ত্ব সন্ধান করিতে সেই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মহাদেবও পাগল হইয়াছিলেন।

যে মহাঘোর ভাবসাগরে আপনার সত্তা মিশাইতে পারে, যে আপনা হইতে এই বাহ্যজগতকে পৃথক্ জ্ঞান না করিয়া আমার আমিত্ব হারাইতে পারে, যে ভাবপ্রবাহে গা ঢালিয়া আত্মহারা হইয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল বাহ্য বস্তুতেই আপনার সত্তা উপলব্ধি করিতে পারে, এ অন্ধ-সংসারে সেই ত পাগল মা! যে অনন্ত-বিশ্বপ্রেমে মজিয়া সাম্যের চক্ষে সকলকেই সমাদরে হৃদয়ে ধরিতে পারে, যে পূতি-গন্ধময় অতি বিকট-দর্শন-শবকেও আত্মজ্ঞানে বক্ষে তুলিয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে পারে, এ পাপলোকে সেই ত অস্পৃশ্য মহাপাগল মা!! আজ মহামূর্খ আমার নিকট—এই তত্ত্বজ্ঞানহীন পাপীর চক্ষে—মহাসন্ন্যাসী আত্মহারা ভাববিভোর ভোলানাথ মহাপাগল, ঘোর পিশাচাবতার!! কিন্তু তত্ত্বদর্শী সাধুর নিকট এই পাগল ভোলাই আবার দেবাদিদেব মহাদেব!! তাই বলি মা, আমি কীটাণুকীট অতি অকিঞ্চিৎকর,—তোমার অনন্ত মহিমা—তোমার ঐ মহাসঙ্গীতের মহাতত্ত্ব কি বুঝিব? যখন দেবাদিদেব মহাদেবও কেবল তোমারই ঐ অনন্ত মহাসঙ্গীতের নিগূঢ় মহাতত্ত্ব বুঝিবার জন্য শ্মশান-বাসী হইয়া তোমারই কূলে কূলে দিবারাতি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন—তখন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমি কে? * * * *

কি স্বর্গীয় সঙ্গীত!! কবি এ সঙ্গীতের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে মস্তক অবনত করে। কোথায় মধুপানমত্ত মধুকরের মধুর ঝঙ্কার? কোথায় বাসন্তী কোকিলের আকাশ ভরা পঞ্চমস্বর? কোথায় সপ্ততার বীণার প্রাণ-হরা ধ্বনি? কোথায় কবি-কল্পনা-প্রসূত প্রেমমাখা অপ্সরা-কণ্ঠ গীতি? কোথায়ই বা এই সব সুধার ধারা স্বর-লহরীর কল্পনাতীত স্বর্গীয় সুমধুর মমতা?

ঐ যে সঙ্গীত—ঐ যে হৃদয়োন্মত্তকারী কুল কুল ধ্বনি, কিছুই এ সঙ্গীতের তুলনায় আসিতে পারে না। অধম মানব তোমার এই মহা সঙ্গীতের অর্থ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এ দুর্ব্বল-হৃদয়ে—এ বিকৃত-মস্তিষ্কে—সে শক্তি নাই যে, মহাশক্তির মহালীলা বুঝিতে সমর্থ হইবে। অবিশ্বাসী মহাপাতকী মানব কোন্ পুণ্যফলে শান্তির উৎস এই মহাসঙ্গীতের মহাতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে?

এক দিন কেবল জগৎপূজিত আর্য্যঋষিগণ তোমার এই মহাসঙ্গীতের প্রকৃতভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা শান্তির অনন্তপ্রবাহ তোমার ঐ সঙ্গীতলহরীর পশ্চাতে স্বর্গের জ্বলন্ত ছবি—প্রেমময়ীর প্রেমরাজ্যের মহান্ দৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা জগৎ-সংসার বিস্মৃত হইয়া কলুষধ্বংস-কারিণী শান্তিদায়িনী নামে তোমারই মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকই মা তুমি কলুষধ্বংসকারিণী! যখন পাপানলে হৃৎপিণ্ড জ্বলিতে থাকে—যখন সংসারকুণ্ডের প্রজ্বলিত ভীষণ শিখায় সর্ব্ব শরীর ঝলসিতে থাকে, তখন একবার নয়ন ভরে তোমার ঐ স্বর্গের ছবি, ভুবনমোহন রূপ দেখিলে—তোমার ঐ প্রেমভরা সঙ্গীতধারা কাণের ভিতর প্রবেশ করিলে, এ পাপদগ্ধ হৃদয় বড় শীতল হয়—প্রাণের ভিতর যেন শান্তির উৎস ছুটিতে থাকে। তখন সংসার জ্বালা ক্ষণেকের জন্য ভুলাতে, তোমারই ঐ মহিমাময় সৌন্দর্য্যসাগরে ক্ষুদ্রপ্রাণ ডুবিয়া যায়।

তোমার ঐ সঙ্গীতসুধা কাণের ভিতর প্রবেশ করিলে, হৃদয়কন্দর শূন্য হইয়া মন কোথায় উধাও হইয়া যায়—বাহ্যবস্তু সকল চক্ষের উপরি থাকিলেও, তখন তাহাদের প্রকৃত সত্বা উপলব্ধি হয় না। ঐ যে বায়ুর বিকম্পিত তরুরাজি তোমার তীরে দাঁড়াইয়া নাচিতেছে,—আর মাথা নাড়িয়া তোমার বক্ষবিহারী ক্রীড়াশীল তরঙ্গমালাকে সোহাগভরে ডাকিতেছে, দেখিতেছি;—ঐ সুনীল নভঃস্থলে শশাঙ্ক সুধার হাসি ছড়াইয়া বিশ্বসংসার অনুপ্রাণিত করিতেছেন,—আর মদান্ধ মনুষ্যচক্ষে অতি ক্ষুদ্র ঐ তেজঃপিণ্ড নক্ষত্রপুঞ্জ সুদূর নীল গগনপটে যেন জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গের ন্যায় চিত্রিত হইয়া, এ পাপ মর্ত্তলোকে যেন এ ছার মনুষ্য ভাগ্য দেখিয়াই মিটি মিটি হাসিতেছে, দেখিতেছি;—কিন্তু হায়, এ সকল কি! কৈ কিছুই যে মনে ধারণা করিতে পারি না মা? তোমার ঐ স্বর্গীয় সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি প্রবাহে আমার

সংজ্ঞা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আইসে। জাগ্রতে যেন সব স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। সবই যেন ছায়াবাজি! চারি দিকে যেন সবই ছায়া—যেন বিশ্বগ্রাসী অনন্ত ছায়াতে নিমগ্ন হইয়া আছি। আমিও কি তবে ঐ অনন্ত ছায়া-রাশির একটু সামান্য অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহি!!

মা, তোমার ঐ স্বর্গীয় সঙ্গীতের মহিমা অনন্ত অসীম। ক্ষীণ-মনা ভ্রান্ত-মানব উহা কি বুঝিবে? কেবল আর্য্যঋষিগণই তোমার ঐ মহাসঙ্গীতের মহাতত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা আখ্যানে, পুরাণে, কাব্যে, ইতিহাসে, গানে কীর্ত্তনে,—তোমার মহিমা বর্ণন করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই। প্রাতে ও সন্ধ্যায় তোমার এই সৌন্দর্য্য-সার দিব্যরূপ দেখিলে তাঁহারা ভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। আর তাঁহাদের সেই জ্ঞান-জ্যোতি এই কলুষ-নাশিনী জ্ঞানদায়িনী মহাসঙ্গীত লহরীর সহিত মিশিয়া, মনুষ্য জ্ঞানাতীত এক অপূর্ব্ব অনন্তপ্রদেশে প্রস্থান করিয়া, সেই মহামায়া মহাশক্তির অনন্ত-জ্যোতি সন্দর্শন করিত। তাই তাঁহারা আত্মহারা হইয়া "মাতর্গঙ্গে ভাগীরথি" বলিয়া আজীবন তোমারই অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্যকুল-গৌরব রাজর্ষি ভগীরথ বুঝি সর্ব্বপ্রথমে তোমার এই পবিত্র সঙ্গীতে মোহিত হইয়া, সুখসেবিত রাজপ্রাসাদ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া বহুকাল কঠোর তপস্যাসাধনে তোমার ঐ মহাসঙ্গীতের মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তোমারই স্বরূপ আদি অন্ত নির্ণয় করিতে সেই পুণ্যাত্মা সংসার মায়া বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়া সাগর সঙ্গম হইতে হরিদ্বার গোমুখী পর্য্যন্ত দিবানিশি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। ধন্য সেই মহাত্মা, যিনি তোমা হইতে মহাজ্ঞান লাভ করিয়া লোকে তোমার অনন্ত মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাই মা, তোমার সেই সুসন্তানের নাম চিরস্মরণীয় করিতে আজ তুমি নিজে এই ভবসংসারে "ভাগীরথী" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছ। ভ্রান্ত মদগর্ব্বিত আমরা তোমার মহিমা কি বুঝিব মা?

মা, একবার চলিতে চলিতে দাঁড়াইয়া দেখ। তোমার বিহারভূমির আজ কি শোচনীয় দশা—একবার দেখ, সেই শান্তির আগার, জ্ঞানের খনি, স্বর্গীয় প্রভায় উদ্ভাসিত অনুগাঙ্গ দেশ আজ নরকের ঘোর-তামসে আচ্ছন্ন, অতি ভীষণ মরুভূমি!! মা, তোমার সেই অতি আদরের ধন জগৎপূজিত আর্য্যগণ আজ কোথায়! দেখ মা, সেই বিশ্বপূজিত আর্য জাতির আজ কি

শোচনীয় পরিণাম। তাই মা, এ দগ্ধ হৃদয়ের কথা তোমাকে এই নিশীথ সময়ে জানাইতে আসি। যদি এ দারুণ দুঃখগাথা তোমার ঐ স্বর্গীয় স্বরলহরীর সহিত মিশিয়া সেই অনন্ত প্রেমধামে গিয়া দয়াময়ীর দয়া আকর্ষণ করিতে পারে!

* * * * * * *

আহা! ও কি সাজে সাজিয়াছ মা? মরি, মরি, এ সুন্দর হইতে সুন্দরতর অপরূপ সাজে কে তোমাকে সাজায়েছে মা? নক্ষত্র-খচিত কৌমুদী বসন পরিয়া, চাঁদের মালা বুকে দোলাইয়া, এ রঙ্গভরে হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে কোথায় চলেছ মা? এ তোমার কি রঙ্গ মা? এই মহাদুদ্দিনে কে তোমার এই মহারঙ্গ দেখিবে বা বুঝিবে মা? আর কি তোমার সেই ধর্ম্ম-প্রাণ আর্য্যসন্তানগণ আছে যে, তোমার এই ভুবন ভোলানী ভাবে বিভোর হইয়া উদাত্ত স্বরে সামগান গাইতে গাইতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া তোমার সম্মুখে নৃত্য করিয়া বেড়াইবে? আর কি সেই মহাবীর্য্যশালী আর্য্যগণ দিগ্বিজয় করিয়া, অরাতিদল পদ দলিত করিয়া, মেদিনী বীর পদ ভরে বিকম্পিত করিয়া, জয় জয় রবে জয় পতাকা উড্ডীন করিয়া, সমর-শ্রান্তি দূর করিতে তোমার এই পবিত্র কূলে আসিয়া বসিবে এবং জয়নাদে তোমার নিকট বিজয়বার্ত্তা প্রচার করিবে?

মা, তোমার আজ সে দিন গিয়াছে। প্রকৃত আর্য্যসন্তান আর ভারতে নাই। আমরা পতিত পাতকী; তাই বলি মা! এই পতিত সন্তানগণকে *উদ্ধার করিয়া তোমার পতিতপাবনী নামের সার্থকতা সম্পাদন কর।*

বাইবেলের কথা

হিন্দুর সমালোচ্য।

ইংরাজ কবি শেলী এক স্থানে বলিয়া গিয়াছেন যে পরমেশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টি করেন নাই, মনুষ্যই পরমেশ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছে।' এই কথা শুনিলে হঠাৎ বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু উপহাস ও তাচ্ছিল্য না করিয়া ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহা যে সারগর্ভ বাক্য তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। অনেকে শেলী এবং শেলীর মতাবলম্বী ব্যক্তিকে নাস্তিক বলিয়া অবিহিত করেন কিন্তু ফলতঃ তিনি নাস্তিক ছিলেন না এবং নাস্তিক হইলেও শেলীর ন্যায় নাস্তিক অনেক আস্তিক হইতে আদরণীয় ব্যক্তি।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবিধ শাস্ত্রের আবিষ্কার, অনুশীলন এবং উন্নতি হইয়াছে কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্ব ভিন্ন আর কোন বিষয়ে মনুষ্য মধ্যে এত অধিক মতভেদ নাই। কোন জাতিমধ্যে ঈশ্বর পুরুষ এবং কোন জাতিমধ্যে স্ত্রী স্বরূপে পূজিত। কেহ তাঁহাকে মনুষ্যের ন্যায় দ্বিহস্ত ও দ্বিপদ বিশিষ্ট এবং কেহ তাঁহাকে চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ এবং কেহ বা তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কেহ তাঁহাকে উগ্রচণ্ডা, কেহ করুণাময়, কেহ ভক্তবৎসল এবং কেহ তাঁহাকে এককালে নিগুর্ণ এবং নির্ব্বিকার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

পূর্ব্বকালে গ্রীকদেশের লোকেরা জোব নামক এক মহাপুরুষকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানিত এবং সেই জোবের জুনো নাম্নী স্ত্রী এবং আপলো, মিনার্বা, মার্স, বীনস, প্রভৃতি সন্তান সন্ততি ছিল। ইহাঁরা সকলে গ্রীক দেশের উত্তরস্থিত ওলিম্পস্ নামক পর্ব্বতের শিখরে বাস করিতেন এবং সেই স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া মনুষ্যদিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। জোবের প্রধান অস্ত্র ছিল বজ্র এবং তাঁহার বাহন ছিল এক ঈগল অর্থাৎ বাজপক্ষী। শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে জোব বজ্র দ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিতেন। গ্রীকদিগের জোব প্রভৃতি আমাদের পৌরাণিক দেবতাগণের সদৃশ। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের প্রস্তাব যদি সত্য হয় যে হিন্দু গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি

জাতি, এক আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা, তাহা হইলে তাহাদিগের ভাষার ন্যায় আরাধ্য দেবতাগণও সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট হওয়া বিচিত্র নহে এবং ফলেও তাহাই দৃষ্ট হয়। কারণ হিন্দুর ন্যায় গ্রীকদিগের দেবতাগণের মধ্যে মিনর্বা বিদ্যার,মার্স যুদ্ধের ইত্যাদি প্রত্যেক কার্য্যের এক একজন পৃথক দেবতা ছিল।

ইহুদী অর্থাৎ হিব্রুদিগের ধর্ম্মই মূল ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম হইতে খ্রীষ্টান ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল ধর্ম্মে একের অধিক ঈশ্বরের পূজার বিধি নাই এবং তাহাতে বহু ঈশ্বরের পূজা মনুষ্য মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। এই ধর্ম্মে ঈশ্বরের কোনরূপ মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করা অতিশয় পাপের কার্য্য।

তাহাদিগের সেই এক ঈশ্বর স্বর্গ নামক স্থানে এঞ্জেল অর্থাৎ ফেরিস্তা নামক অমর জীব সকলের সংসর্গে অবস্থিতি করেন। ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বর্গীয় সহবাসীরা মনুষ্যের আকার বিশিষ্ট; কারণ বাইবেলে লিখিত আছে যে "ঈশ্বর তাঁহার আপন মূর্ত্তির অনুরূপ মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" তবে এঞ্জেলদিগের পৃষ্ঠদেশে পক্ষীর ন্যায় বড় বড় দুইটী পক্ষ আছে,তদ্দ্বারা তাহারা ইচ্ছামতে ইতস্তত শূন্য মার্গে ভ্রমণ করিতে পারে। ঈশ্বর তেজোময়, সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন এবং ফেরিস্তারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া নতশিরে উল্লাসের সহিত ঈশ্বরের বন্দনা এবং গুণগান করে। কিন্তু স্বর্গে এই ঈশ্বরের রাজত্ব সকল সময়ে এবং সর্ব্বতোভাবে শান্তিপূর্ণ হয় নাই কারণ সয়তান নামক একজন প্রধান ফেরিস্তা তাহার আজ্ঞাধীন অসংখ্য ফেরিস্তা লইয়া ঈশ্বরকে স্বর্গের সিংহাসন হইতে দূরীকৃত এবং তাঁহার স্থানে নিজে প্রভুত্ব করিবার মানসে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া বহু কাল ধরিয়া ঈশ্বরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। অবশেষে ঈশ্বর বজ্র বাণ সৃষ্টি করিয়া তাহা সয়তান এবং তাহার সঙ্গীগণের উপরে নিক্ষেপ করত তাহাদিগকে পরাস্ত করেন এবং চিরকালের নিমিত্ত তাহাদিগকে এক অন্ধকারময় বহু কষ্টদায়ক নরকে নির্ব্বাসিত করেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার শত্রুদিগকে এমন ঘোরতর অপরাধের প্রতিফলে নরকে নির্ব্বাসনের শাস্তি প্রদান করা ভিন্ন,তাহাদিগকে এককালে বিনাশ করিতে পারিলেন না; কারণ সয়তান এবং সমুদায় ফেরিস্তাগণ ঈশ্বরের ন্যায় অমর। এই যুদ্ধে সয়তান যদিও পরাজিত হইয়া স্বর্গবাসের সুখে চিরকালের নিমিত্ত বঞ্চিত হইল, এবং

পুনবায় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত রহিল তথাপি সে আর ঈশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিল না, শত্রুভাবে রহিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। ঈশ্বরের সদনুষ্ঠান সমূহে যাহাতে বিঘ্ন জন্মে, যাহাতে ঈশ্বরের মনে কষ্ট হয়, এবং যাহাতে তাঁহার কল্পনা সকল নিষ্ফল হয়, তাহা করিতেই সয়তানের পরমানন্দ, এবং তাহাতে সে কি প্রকারে কৃতকার্য্য হইবে,সতত সেই চেষ্টায় সে স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের সকল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে। মোট কথা সয়তান ঈশ্বরের অদম্য শত্রু হইয়া রহিয়াছে।

সয়তানের সহিত ঈশ্বরের এই যুদ্ধের পরে ঈশ্বর এক নূতন সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া ৬ দিবসে অর্থাৎ সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত বহু পরিশ্রমে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র এবং পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া ক্লান্তি দূরীকরণের জন্য সপ্তম অর্থাৎ রবিবাসরে বিশ্রাম করিলেন। তখন জগৎ ঘোর অন্ধকারে আবৃত ছিল, কিন্তু পৃথিবী সৃষ্টির পরে তাঁহার ইচ্ছামতে জগতে আলোকের আবির্ভাব হইল। শুদ্ধ পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া ঈশ্বরের সকল স্পৃহা পূর্ণ না হওয়াতে তিনি পৃথিবীর মৃত্তিকা দ্বারা আপন অবয়বের অনুরূপ এক মূর্ত্তি প্রস্তুত করিলেন এবং অবশেষে সেই মূর্ত্তির নাসিকারন্ধ্রে ফুঁ দিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ তেজ প্রবিষ্ট করত তাহাকে সজীব করিলেন। এইরূপে প্রথম মানবের সৃষ্টি হইল, ঈশ্বর তাহার নাম রাখিলেন আদম। অতঃপর আদমের ভোগার্থে পৃথিবীর নানাবিধ জীব ও উদ্ভিদ নিয়োজিত এবং তাহার বাসস্থানের জন্য এক মনোরম উদ্যান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, তাহাকে ইংরাজীতে ইডেন ও মুসলমানেরা জীন্নত বলে। কিন্তু যদিও পৃথিবীর সমুদায় জীব এবং বস্তু ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন এবং ভোগের নিমিত্ত নিয়োজিত হইল এবং প্রত্যহ ঈশ্বর আসিয়া সেই উদ্যানে আদমের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন, তথাপি আদমের সুখ সম্পূর্ণ হইল না ; তাহার অন্তরের মধ্যে যেন কি একটী অভাব বোধ হইতে লাগিল। ঈশ্বর তাহা বুঝিতে পারিয়া আদমের একটী দোসর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। এবং সেই জন্য তিনি আদমকে এক দিন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত করিয়া তাহার পঞ্জরের এক খানা অস্থি খুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা একটী স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেন। আদম তাহা দেখিয়া বলিল যে ইহা আমার অস্থির অস্থি, মাংসের মাংস অতএব

পুরুষ পিতা মাতা ত্যাগ করিয়া ইহাতেই লিপ্ত থাকিবে; ইহাতেই স্ত্রী পুরুষ অভেদ হইল। এই স্ত্রীর নাম ইংরাজীতে ইব্ কিন্তু হিব্রু এবং আরবী ভাষায় তাহাকে হাওয়া বলিয়া ডাকে। উক্ত ইডেন উদ্যানের মধ্যে দুইটী বৃক্ষের ফল ভিন্ন আর সকল দ্রব্যই আদম ও হাওয়ার ভক্ষ্য ছিল। ইহার এক বৃক্ষের নাম জ্ঞান-বৃক্ষ অপর বৃক্ষের নাম জীবন-বৃক্ষ। এই দুই বৃক্ষের ফলই ঈশ্বর আদম ও হাওয়াকে স্পর্শ কিম্বা আহার করিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দিলেন। ঈশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন যে, যে পর্য্যন্ত তাহারা এই দুই ফলে হস্তক্ষেপণ না করিবে সে পর্য্যন্ত তাহাদের শরীরে মৃত্যু কিম্বা অন্য প্রকার কষ্ট ক্লেশ প্রবেশ করিবে না এবং তাহাদের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ কৃপা থাকিবে। এইরূপে প্রথম পুরুষ ও স্ত্রী উক্ত ইডেন উদ্যানে মহাসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। তখন হিংস্রক জন্তুরা জীব ধ্বংশ করিয়া উদর পোষণ করিত না, সর্পে দংশন করিত না। সিংহ শার্দ্দূলের সহিত মৃগ মেষ, শৃগালের সহিত হংস কুক্কুট, মার্জ্জারের সহিত কপোত চঞ্চু ও সর্পের সহিত ভেক—একত্রে ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদ করিত। জীবের মধ্যে মৃত্যু কিম্বা কোনরূপ কষ্ট কিম্বা যাতনা ছিল না, সমস্ত জগতে শান্তি বিরাজমান ছিল। ঈশ্বরও স্বয়ং অবকাশ মতে ইডেন উদ্যানে উপস্থিত হইয়া আদম ও হাওয়ার সহিত মিষ্টালাপ করিতেন ও তাহাদিগকে সদুপদেশ দিতেন। সয়তান পৃথিবীতে আগমন করিয়া কোন বিঘ্ন ঘটাইতে না পারে তজ্জন্য ঈশ্বর কয়েক জন তাঁহার প্রিয় ফেরিস্তাকে ঐ উদ্যানের এবং পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। বাইবেল মতে সেই সৃষ্টি হইতে ৫৬৪৭ বৎসর বয়স হইয়াছে অর্থাৎ আমাদিগের কলিযুগের বর্ত্তমান বয়স ৪৯৮৭ বৎসর অপেক্ষা ৬৬০ বৎসর অধিক।

ঈশ্বর এত সাবধান হইয়াও কিন্তু সয়তানকে দমন করিতে পারিলেন না, কারণ সয়তান নরকে বসিয়া পরম্পরায় এই নূতন সৃষ্টির সংবাদ অবগত হইয়া ছদ্মবেশে প্রহরী ফেরিস্তাদিগকে বঞ্চনা করিয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হইল এবং ঈশ্বরের কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য সর্পরূপ ধারণ করিয়া হাওয়ার সম্মুখে নির্জ্জনে উপস্থিত হইল এবং মিষ্ট বাক্যের দ্বারা হাওয়াকে এবং হাওয়ার দ্বারা আদমকে মোহিত করিয়া ঈশ্বরের নিষেধিত ঐ দুই বর্জ্জিত বৃক্ষের মধ্যে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়াইতে কৃতকার্য্য হইল। দুঃখের বিষয় এই যে

জীবন বৃক্ষের ফল যাহা খাইলে তাহারা এবং তাহাদের সন্তান সন্ততি এবং ধারাবাহিক ক্রমে এক্ষণে আমরাও অমরত্ব লাভ করিতাম, মূর্খেরা অগ্রে সে ফল না খাইয়া জ্ঞানের ফল খাইয়াছিল। ঐ ফল খাইবামাত্র তাহাদের জ্ঞানের সঞ্চার হইল এবং তৎক্ষণাৎ বৃক্ষের পল্লব এবং বল্কল দ্বারা তাহাদের শরীর আচ্ছাদন করিল এবং যখন ঈশ্বর অন্য দিনের ন্যায় সেই দিনও ইডেন উদ্যানে আসিয়া আদম ও হাওয়াকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে ডাকিলেন, তখন তাহারা এক জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া উত্তর করিল যে ঈশ্বরের সম্মুখে যাইতে তাহাদের লজ্জা বোধ হইতেছে কারণ তাহারা উলঙ্গ। তখন ঈশ্বর তাহাদের অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপে তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন এবং ছাগ চর্ম্মের পোষাকের দ্বারা তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ইডেন উদ্যান হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং উহাতে পুনরায় প্রবেশ করিয়া জীবনের ফল খাইয়া অমর না হইতে পারে তজ্জন্য ফেরিস্তা প্রহরী এবং এক অগ্নিময় অসি ঐ উদ্যানের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। এই ধর্ম্মে যাহাদের বিশ্বাস, তাহারা এই উদ্যান পৃথিবীর কোন্ স্থানে ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া কহিতে পারে না। মুসলমানদিগের বিশ্বাস যে আমাদের সিংহল দ্বীপে সেই উদ্যান ছিল, কিন্তু ইংরাজেরা কেহ কেহ বলেন যে কাশ্মীর উপত্যকাই ঐ উদ্যানের স্থান।

আদম ইডেন উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সর্ব্ব শুদ্ধ ৯৩০ বৎসর জীবিত ছিল এবং তাহার ১৩০ বৎসর বয়সে সেথ নামক এক পুত্র জন্মে। সেথ ৯১২ বৎসর জীবিত ছিল এবং তাহার ১০৫ বৎসর বয়সে ইনস্ নামক এক পুত্র হয়। ইনস্ ৯০৫ বৎসর বাঁচিয়াছিল এবং ৯০ বৎসরে তাহার কৈনান নামক এক পুত্র হয়। কৈনান ৯১০ বৎসর জীবিত ছিল এবং ৭০ বৎসরে মহালীল বলিয়া তাহার এক পুত্র হয়। মহালীল ৮৯০ বৎসরে লোকান্তরিত হয় এবং তাহার ৬৫ বৎসরে জারদ নামে পুত্র জন্মে। জারদের ৯৬২ বৎসরে মৃত্যু হয় এবং ১৬২ বৎসর বয়সে এনক নামে পুত্র হয় কিন্তু এনক বড় ধার্ম্মিক ছিল বলিয়া ঈশ্বর তাহাকে মরিতে না দিয়া নিজে তাহাকে লইয়া গেলেন। এনেকের ৬৫ বৎসরে মেথুশালা নামক পুত্র হয়। মেথুশালা ৯৬৯ বৎসর বাঁচিয়া মরে এবং তাহার ১৮৭ বৎসরে লামে নামক পুত্র জন্মে এবং লামে ৭৭৭ বৎসর বাঁচিয়াছিল এবং তাহার ১৮২ বৎসর বয়সে নোয়া নামে যে

পুত্র হয়, তাহাকে মুসলমানেরা নূ প্যাগম্বর বলিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে আদমের ১০৫৬ বৎসর পরে নূব জন্ম হয়।

এই সময় স্বর্গবাসী পুরুষেরা পৃথিবীতে আসিয়া মানবীদিগেব সহিত সহবাস কবিতেন এবং মনুষ্যের সংখ্যা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের পাপ এবং অধর্ম্ম এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তাহা দেখিয়া ঈশ্বর কি জন্য মনুষ্য সৃষ্টি কবিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে তাঁহার মনস্তাপ উপস্থিত হইল এবং অন্য কোন উপায় না দেখিয়া পৃথিবীর সমস্ত স্থাবব জঙ্গম বিনাশ কবার অভিপ্রায় কবিলেন। কিন্তু কেবল নূ তাঁহাব আজ্ঞাধীন এবং ধার্ম্মিক ছিল বলিয়া পুবস্কার স্বরূপে তাহাকে ও তাহাব পবিবাবদিগকে রক্ষা করার উদ্দেশে তাহাকে ৩০০ হস্ত দীর্ঘ এবং ৫০ হস্ত প্রশস্ত এবং ৩০ হস্ত গভীর একখানি নৌকা প্রস্তুত করিতে ও তাহাব মধ্যে নূ ও নূর স্ত্রী ও তাহাদের তিন পুত্র এবং তাহাদেব স্ত্রীদিগকে এবং তাহাদেব সমভিব্যহারে সকল জীবেব এক একটী পুরুষ ও এক একটী স্ত্রী এবং তাহাদেব সকলেব খাদ্যোপযোগী আহাবেব দ্রব্যাদি লইতে আদেশ কবিলেন। তদনন্তর ঈশ্বব বিমানের সমস্ত দ্বাব ও গবাক্ষ খুলিয়া পৃথিবীব উপবে ৪০ দিন পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে এত জল বর্ষণ কবিলেন, যে তাহাতে অতি উচ্চ পর্ব্বতও জলে ডুবিযা গেল এবং সকল মনুষ্য এবং তাহাদেব সঙ্গে সঙ্গে সকল জীব জন্তু ও উদ্ভিদ বিনষ্ট হইল। কেবল নূ ও তাহাব সঙ্গীবা সেই নৌকাব মধ্যে বাস করিয়া জলের উপবে ভাসমান অবস্থায় বক্ষা পাইল। এই জলপ্লাবনের সময় নূব ৬০০ ও পৃথিবীর ১৬৫৬ বৎসর বয়স।

নূ তাহাব সঙ্গীগণেব সহিত ভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়া যজ্ঞেব এক উচ্চ বেদী প্রস্তুত কবিল এবং তাহাতে অগ্নি জ্বালাইয়া সকল পবিত্র পশু এবং পক্ষীর এক একটা লইয়া সেই যজ্ঞেব আহুতি প্রদান কবিল। সেই যজ্ঞের ধূম ঈশ্বরের নাসিকায় অতি উপাদেয় বোধ হওয়াতে তিনি নূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং মনে মনে স্থিব কবিলেন যে মনুষ্যেব পাপের জন্য তিনি আর জীব-ধ্বংশ করিবেন না। তদনন্তর ঈশ্বব নূকে বলিলেন যে, "দেখ নূ, আমি তোমার সঙ্গে এবং তোমাকে উপলক্ষ কবিয়া সকলের সহিত চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আমি আর কখনও জলপ্লাবনের দ্বারা সমুদায় মাংস অর্থাৎ জীব ধ্বংশ করিব না। এবং আমার এই চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞার সাক্ষি

স্বরূপে এক ধনুক সৃষ্টি করিয়া আকাশে মেঘের মধ্যে তাহা স্থাপিত করিলাম, যে তাহা দেখিলেই আমার মনে প'ড়বে যে জলপ্লাবনের দ্বারা আমি জীব ধ্বংশ করিব না বলিয়া আমি অদ্য তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম।" এই ধনুক আমরা পৌত্তলিকেরা রামধনু বলি এবং ইহাই বাইবেলের মতে মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের প্রথম চুক্তির কিম্বা প্রতিজ্ঞার নিদর্শন।

কিন্তু এমন জাজ্বল্যমান সাক্ষি থাকিলেও ঈশ্বরের সেই চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞার উপরে মনুষ্যের বিশ্বাস হয় নাই কারণ কিছুকাল পরে যখন মনুষ্যেরা ইট প্রস্তুত করার প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারিল, তখন তাহারা একস্থানে আসিয়া এক নগর স্থাপনা করিয়া ভবিষ্যতে জলপ্লাবনে তাহাদের মরিতে না হয় এবং পৃথিবীর নানাস্থানে তাহারা বিদূরিত না হয়, বিশেষত তাহাদের গৌরব চিরস্থায়ী করার উদ্দেশে এবং স্বর্গ গমনের উদ্দেশে একটি উচ্চ এবং বৃহৎ ইটের স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঈশ্বর ইহার সংবাদ পাইয়া এই নগর এবং স্তম্ভ দেখিতে আসিলেন এবং দেখিলেন যে মনুষ্যেরা তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে সক্ষম হইবে অতএব এমন স্পর্দ্ধা এবং অহঙ্কার দমনার্থ তিনি এক কৌশল করিলেন। মনুষ্যেরা সেই সময়ে সকলে এক ভাষী ছিল এবং সকলের কথা সকলে বুঝিতে পারিত; ঈশ্বরের কৌশলে প্রত্যেকের ভাষা তৎক্ষণাৎ পৃথক পৃথক হইয়া পড়িল, পরস্পর পরস্পরের কথা বুঝিতে পারিল না সুতরাং স্তম্ভ সমাপ্ত হইল না এবং মনুষ্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া নানা দেশে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। সেই কারণে এবং সেই সময় হইতে মনুষ্য মধ্যে ভাষার প্রভেদ হইয়া আসিতেছে।

ইহার পরে নুর বংশে ইব্রাহিম নামক এক ব্যক্তির জন্ম হয়। ঈশ্বর তাহার প্রতি সদয় হইয়া তাহার সহিত এক চুক্তি করিয়া বলেন যে "তুমি এবং তোমার বংশোদ্ভব সকল পুরুষে সুন্নত করিবে এবং তাহা হইলে আমি তোমার উত্তর পুরুষকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিব এবং তাহাদের বাসস্থানের নিমিত্ত এক সুন্দর দেশ প্রদান করিব।" তৎপরে তিনি ইব্রাহিমের পুত্র ইসাকের, ও ইসাকের পুত্র ইয়াকুবের ও ইয়াকুবের পুত্র ইউসফের সহিতও এইরূপ প্রতিজ্ঞা এবং চুক্তি করেন কিন্তু ইউসফের পুত্র

মুসাকে তিনি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া হিব্রুজাতিকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত করেন। মুসা এবং সহস্র সহস্র হিব্রু ইসাকের সময় হইতে ইজিপ্ট অর্থাৎ মিসর দেশে যাইয়া বাস করিতেছিল এবং সেই দেশের রাজা তাহাদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিত। কিন্তু ঈশ্বর মুসার দ্বারা অনেক অদ্ভুত কার্য্য করিয়া অবশেষে সমুদয় হিব্রুদিগকে মিসর হইতে উদ্ধার করেন, তন্মধ্যে দুইটী কার্য্যের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। মিসরের রাজা ফারুণ হিব্রুদিগকে তাহার দেশ পরিত্যাগ করিতে অনুমতি দিয়া বারম্বার তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করাতে, ঈশ্বর মিসর দেশে নানা প্রকার বিভ্রাট উপস্থিত করিয়া, অবশেষে মিসরবাসীদিগের প্রত্যেকের প্রথম সন্তান এবং তাহাদের পালিত পশ্বাদির প্রথম বৎস বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তজ্জন্য এক রাত্রি নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কিন্তু পাছে ঈশ্বর রাত্রে অন্ধকারে মিসরবাসীর এবং হিব্রুর গৃহের প্রভেদ করিতে না পারিয়া হিব্রুদিগের গৃহেও সেই বিপদ উপস্থিত করেন, এই আশঙ্কায় সকল হিব্রুকে সেই দিবস সন্ধ্যার সময় এক একটা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মেষ বৎস বধ করিয়া তাহার শোণিত লইয়া তাহাদের স্বীয় স্বীয় গৃহের বহির্দ্বারে চৌকাঠের শিরোভাগের এবং দুই পার্শ্বের কাষ্ঠে লেপন করিতে আজ্ঞা করিলেন, যে মধ্য রাত্রে যখন তিনি মিসরবাসীদিগের শিশু এবং বালকদিগকে বধ করিতে মিসর দেশের মধ্যে পর্য্যটন করিবেন, তখন তিনি যে সকল গৃহের চৌকাঠে রক্ত লেপিত দেখিবেন, তাহা হিব্রুগৃহ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবেন না এবং যে গৃহের দ্বারে এই চিহ্ন দেখিতে পাইবেন না, তাহা মিসরবাসীর গৃহ বুঝিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত সেই গৃহের শিশুর প্রাণ সংহার করিবেন। সেই রাত্রে গভীর নিশার সময় সমস্ত মিসর দেশ ভরিয়া ক্রন্দনের মহা এক রোল উঠিল। কেবল একমাত্র রাজার দোষে সহস্র সহস্র অবোধ এবং নির্দ্দোষী শিশু এবং বালকের এবং গো মেষ ছাগ অশ্ব গর্দ্দভ এবং উষ্ট্র বৎসের প্রাণ ইশু খ্রীষ্টের পিতা ধ্বংশ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা যাহাতে হিব্রুদিগের চিরকাল স্মরণ থাকে তজ্জন্য প্রতি বৎসর এই দিবসে এক উৎসব করিতে ঈশ্বর হিব্রুদিগকে আজ্ঞা করিলেন এবং এখনও তাহারা সেই দিবস 'পাসোবর' নামক এক পর্ব্ব অনেক উৎসাহের সহিত পালন করে।

এই শোচনীয় ঘটনাতে রাজা ফারুণ ভীত হইয়া হিব্রুদিগকে তাঁহার দেশ পরিত্যাগ করিয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং হিব্রুরাও ঈশ্বরের পরামর্শ মতে ছলে মিসরবাসীদিগের মূল্যবান অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্যাদি হস্তগত করিয়া লোহিত সাগরের উপকূলে উপস্থিত হইলে রাজা ফারুণ তাহাদের যাত্রায় ব্যাঘাত দেওয়ার জন্য বহু রথ ও যোদ্ধা সমবেত করিয়া তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন; কিন্তু ঈশ্বর সাগরের এক স্থানের জল দুই পার্শ্বে স্তূপীকৃত করত সাগরের মধ্য দেশ শুষ্ক করিয়া দিলেন। তাহার উপর দিয়া হিব্রুরা অনায়াসে সাগর পার হইয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হইল। ফারুণের সৈন্য সমস্ত ঐরূপ দেখিয়া সেই পথ অবলম্বন করিল কিন্তু তাহারা অপর পারে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ঈশ্বর সেই পথের দুই পার্শ্বের জল ছাড়িয়া দিয়া সমুদায় মিসর সৈন্যকে জলে ডুবাইয়া মারিলেন।

লোহিত সাগরের পূর্ব্ব পারে হিব্রুরা একমরুভূমে উপস্থিত হইয়া দিশাহারা হইল, কাজেই ঈশ্বর তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া তাঁহার অঙ্গীকৃত স্থানে লইয়া যাওয়ার নিমিত্ত তাহাদের অগ্রে অগ্রে দিবাভাগে এক ধূমের স্তম্ভ এবং রাত্রিকালে এক অগ্নির স্তম্ভ হইয়া পথ দর্শক স্বরূপে চলিতে লাগিলেন, এবং সিনাই নামক পর্ব্বতে আসিয়া তাহার চূড়ার উপরি ভাগে তিনি অগ্নি মধ্যে থাকিয়া মূসাকে দর্শন দিলেন এবং দুই খণ্ড প্রস্তরে তাঁহার আজ্ঞা সমস্ত লিপি বদ্ধ করিয়া হিব্রুদিগকে দেখাইতে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে মূসার হস্তে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে "হিব্রুজাতির সহিত পুনরায় চুক্তি ও প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে যেহেতু তিনি অনেক কষ্টে ও অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়া হিব্রুদিগকে মিসরবাসীর দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছেন অতএব যে পর্য্যন্ত তাহারা অন্য ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া কেবল তাঁহাকেই পূজা করিবে এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে চলিবে সে পর্য্যন্ত তিনি তাহাদিগের প্রতি সদয় থাকিয়া তাহাদিগের শত্রু সমস্ত নিপাত করিবেন এবং দুধে ঘৃতে পূর্ণ এক দেশে লইয়া যাইয়া তাহাদিগকে স্থাপিত করিবেন এবং চিরকাল তাহা-দিগেরই ঈশ্বর হইয়া থাকিবেন।" পরন্তু হিব্রুরা যে প্রণালীতে তাঁহাকে পূজা করিবে এবং যে যে আচার ব্যবহার অবলম্বন এবং পালন করিবে

তিনি তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন তাহার পরিষ্কার উপদেশ মুসাকে দিলেন এবং যে ব্যক্তির বংশোদ্ভব ব্যক্তিরা তাঁহার পবিত্র বেদী স্পর্শ ও তাহাতে বলিদান হোম যাগ পূজা ও অর্চ্চনা প্রভৃতি করিতে পারিবে তাহাও তিনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে সিটিম নামক কাষ্ঠের ২॥০ হস্ত লম্বা ১॥০ হস্ত প্রশস্ত এবং এক হস্ত উচ্চ পরিমাণে এক আর্ক অর্থাৎ নৌকার ন্যায় বাক্স নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতর এবং বাহিরে খাটি স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করিতে হইবে এবং তাহার চারি কোণে চারিটা সোণার কড়া (অঙ্গুরী) লাগাইয়া তাহার মধ্যে দুইটা স্বর্ণ বেষ্টিত কাষ্ঠের দণ্ড (বাঁট) লাগাইতে হইবে, যে আবশ্যক হইলে সেই দণ্ড অবলম্বন করিয়া "আর্ক" স্থানান্তর করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন আর একটী "দয়ার আসন" নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সেই আসনও খাটি সোণার ২॥০ হস্ত লম্বা ও ১॥০ হস্ত প্রশস্ত পরিমাণ বিশিষ্ট হইবে এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী চেরুবিন (অপ্সরার) মূর্ত্তি গড়িয়া পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী করিয়া বসাইতে হইবে। অপ্সরা দ্বয়ের পৃষ্ঠে দুইটী করিয়া পক্ষ থাকিবে এবং প্রত্যেক পক্ষ মস্তকের উপর দিয়া সম্মুখে আসিয়া অপর মূর্ত্তির পক্ষ স্পর্শ করিবে এবং এই দয়ার আসন উক্ত আর্কের উপরে স্থাপিত হইবে এবং ঈশ্বর তাঁহার প্রতিজ্ঞার সাক্ষি স্বরূপ যে এক দ্রব্য প্রদান করিবেন, তাহা এই আর্কের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। এই সকল কার্য্য সম্পাদিত হইলে পরে তিনি আসিয়া দয়ার আসনে ঐ দুই অপ্সরা মূর্ত্তির মধ্য স্থলে অধিষ্ঠান করিবেন এবং সেই স্থানে বসিয়া পূজা গ্রহণ ও কথোপকথন করিবেন। পরন্তু ইহার সম্মুখে আর একটী মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সোণার চামচ, সোণার কাঁটা ও এক খণ্ড রুটী রাখিতে এবং একটা নিরেট খাটি সোণার ছয় শাখার গাছ-প্রদীপ প্রস্তুত করিতে ও তাহা আর্ক ও আসনের সম্মুখে জ্বালিতে এবং ধূপ ধুনা পোড়াইতে আদেশ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে নীল, লাল এবং ধূমল রঙ্গের উত্তম বস্ত্রের ১০খানি যবনিকা প্রস্তুত করিয়া আর্কের চতুষ্পার্শ্বে ঝুলাইয়া ছাগ লোমের বস্ত্র দ্বারা উপরিভাগ আচ্ছাদন করিতে হইবে। পরন্তু এই আবরণের মধ্যে চারিটা সিটিম কাষ্ঠের স্তম্ভ পুতিয়া তাহাতে চাঁদোয়ার মত নীল লাল ও ধূমল রঙ্গের উত্তম বস্ত্র

ঝুলাইয়া তন্মধ্যে আর্ক ও আসন সংস্থাপন করিতে হইবে এবং এই চন্দ্রা-তপের মধ্যস্থিত স্থানই মন্দিরের সকল স্থান অপেক্ষা পবিত্র হইতে পবিত্রতম স্থান বলিয়া পরিগণিত হইবে। তদ্ভিন্ন যেরূপে বলিদানের ও হোম যজ্ঞের স্থান প্রস্তুত করা উচিত তাহারও উপদেশ ঈশ্বর প্রদান করেন। পরে ঈশ্বর মুসার ভ্রাতা এরণ ও তাহার পুত্রদিগকে তাঁহার পূজার পৌরহিত্য কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া তাহারা যে প্রকার পোষাক ও অলঙ্কার পরিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিবে, তাহাও তিনি বিবৃত করিলেন। তদনুসারে মুসা এক মেষ বৎসকে বলি দিয়া তাহার কতক মাংস দিয়া হোম করাতে সেই হোমের ঘ্রাণে ঈশ্বর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। পরে মুসা আর একটা মেষ বৎস বধ করিয়া তাহার বক্ত লইয়া এরণ ও তাহার পুত্রগণের দক্ষিণ কর্ণের উপরিভাগে ও দক্ষিণ হস্তের ও দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে তিলক স্বরূপে ফোঁটা দিয়া অবশিষ্ট বক্ত বেদীর উপরে নিক্ষেপ করিলেন এবং পবিত্র তৈল লইয়া এরণ ও তাহার পুত্রদিগের মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। এইরূপে তাহাদিগকে পৌরহিত্য কার্য্যে বরণ করিয়া মুসা মেষ বৎসের এক খণ্ড মাংস হস্তে করিয়া স্বয়ং সম্মুখ হস্ত নাড়াইয়া ঈশ্বরের আরতি করিলেন এবং তাহাতেও ঈশ্বর বিশেষ তৃপ্তি বোধ করিলেন।

এইরূপে পূজা পদ্ধতির উপদেশ দিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে আর হুকুম দিলেন যে, যে সকল পশু গিলিত চর্ব্বণ করে এবং যাহাদের খুর আছে এই উভয় গুণ বিশিষ্ট সকল প্রকার ভূচর এবং চিল শকুনী, হাড়গিলা, শিকরা, কাক, বক, পেঁচা, বাদুড় প্রভৃতি অনেক প্রকার পক্ষী ভিন্ন সমুদায় খেচর এবং যাহাদের পৃষ্ঠে আঁইষ ও ডানা আছে, এমন সমুদায় মৎস্য ইস্রেরা খাইতে পারিবে। আর সকল জীব জন্তু তাহাদের পক্ষে অপবিত্র সুতরাং অখাদ্য এবং হারাম যথা শূকর, কারণ যদিও শূকরের বিভক্ত খুর আছে তথাপি গিলিত চর্ব্বণ করে না, ও কর্কট কচ্ছপ প্রভৃতিও হারাম—কারণ ইহাদের শরীরে আঁইস ও ডানা নাই। যদি কোন গতিকে তাহারা এই সকল নিষিদ্ধ জীবের মৃত দেহ স্পর্শও করে তাহা হইলে তাহারা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে এবং সন্ধ্যার সময় স্নান এবং বস্ত্র ধৌত করিয়া পুনরায় পবিত্র হইতে পারিবে। এইরূপ নিষেধ করার কারণ ঈশ্বর নিজেই লেবি-টিকস্ পুস্তকের ১১শ অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে বলিয়া গিয়াছেন যে "কারণ

আমি সেই প্রভু, যে তোমাদিগের ঈশ্বর হওয়ার নিমিত্ত তোমাদিগকে মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি' অতএব তোমাদের শুদ্ধ থাকা উচিত কারণ আমি নিজেই শুচি।" হিব্রুরা কি ভাগ্যবান জাতি যে তাহাদিগের প্রভু হইয়াছেন বলিয়া তাহাদিগকে পবিত্র রাখার নিমিত্ত স্বয়ং ঈশ্বর এত যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কয়েক শত বৎসর পরে হিব্রুদিগের চেলারা খাদ্যাখাদ্যের বিচার উঠাইয়া দিয়া মনুষ্যকে যথেচ্ছা আহারের প্রবৃত্তি দিয়া বেড়াইতেছেন!

আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও ঈশ্বর হিব্রুদিগকে অনেক উপদেশ দেন এবং নিয়ম স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তিনি বিধান করিলেন যে স্ত্রীলোক পুত্র সন্তান প্রসব করিলে দুই সপ্তাহ অপবিত্র ও ৩৩ দিবস অশুচি এবং কন্যা সন্তান প্রসব করিলে দুই সপ্তাহ অপবিত্র এবং ৬২ দিবস অশুচি থাকিবে। ইহার মধ্যে কোনও পবিত্র [illegible] করিতে কিম্বা দেব মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে অথবা কোন পবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিতে তাহাদের অধিকার থাকিবে না। অশুচি কাল অতীত হইলে পরে সেই স্ত্রী কোন এক বস্তু লইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাহা ঈশ্বরের নিকট উৎসর্গ করিয়া শুচি হইবে। ঋতুমতী স্ত্রীলোকের প্রতিও ঐরূপ অশুচি থাকার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি আরও আজ্ঞা করিলেন যে হিব্রু-দিগের মধ্যে কেহ কোন পশু বধ করিয়া তাঁহার বিষদংশ মাংস লইয়া অগ্রে তাঁহার নিকট [illegible] না করিয়া বৃথা মাংস ভক্ষণ করিলে, সে জীব হত্যার [illegible] হইবে এবং তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে হইবে। সকল জাতির বিশেষতঃ মনুষ্যের এবং মনুষ্যের গৃহ-জাত পশু সকলের প্রথম সন্তান এবং [illegible] উপরে ঈশ্বরের অধিকার, অতএব তাহা আনিয়া মন্দিরে ঈশ্বরের নিকট উৎসর্গ করিতে হইবে; মনুষ্যের সন্তানের পরিবর্ত্তে কোন এক পশু বলি দিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে কিন্তু গো মেষ প্রভৃতির প্রথম বৎস আনিয়া মন্দিরে বলি প্রদান করিতে হইবে। গর্দ্দভের বৎসের পরিবর্ত্তে এক মেষ বৎস দিলে চলিবে, মেষ বৎস দিতে অসমর্থ হইলে সেই গর্দ্দভের বৎসের ঘাড় ভাঙ্গিয়া মারিতে হইবে। রবিবার দিবস পবিত্র বার বলিয়া তাহাতে কোন কর্ম্ম কাজ করিতে নিষেধ করিলেন, কেহ করিলে তাহার প্রাণদণ্ড করিতে হইবে।

পুত্র সন্তান জন্মিলে শিশুর অষ্টম দিবসে তাহার সুন্নত করিতে বিশেষ নিয়ম সংস্থাপন করিলেন। স্ত্রীর সতীত্বের প্রতি স্বামীর সন্দেহ উপস্থিত হইলে সে তাহাকে মন্দিরে লইয়া যাইয়া বেদীর চরণামৃত পান করাইয়া পরীক্ষা করিতে পারিবে। এক যুবা বৃষ উৎসর্গ করিলেই অজ্ঞাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

এবম্প্রকারে মনুষ্য সমাজের আবশ্যকীয় সকল বিষয়ের রীতি নীতি প্রস্তাব করিয়া ঈশ্বর হিব্রুদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন যে যদি তাহারা তাঁহার আজ্ঞা সমস্ত বিধিমতে পালন করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদের দেশে উচিত সময়ে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি, ভূমিতে প্রচুর শস্য ও বৃক্ষে ফল প্রদান করিবেন. দেশে শান্তি বিরাজ করিবে এবং তাহারা সুখে এবং নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারিবে। এবং তিনি তাহাদিগকে এত বল বীর্য্য প্রদান করিবেন যে পাঁচ জন হিব্রুতে একশত জন শত্রুকে ও ১০০ এক শত জন হিব্রুতে সহস্র জন শত্রুকে পরাজয় করিতে পারিবে। ফলে সকল বিষয়ে তিনি তাহাদিগকে সুখী করিবেন, এবং তিনি তাহার আসন তাহাদিগের মধ্যে সংস্থাপন করিয়া তাহাদিগেরই প্রভু হইয়া থাকিবেন। এবং হিব্রু-জাতিকে পৃথিবীর অন্য জাতির সহিত পৃথক করিয়া তাহাদিগকে তাঁহার নির্ব্বাচিত এক প্রিয় জাতি করিবেন। কিন্তু তিনি হিব্রুদিগকে অন্য ঈশ্বর কিম্বা হস্ত নির্ম্মিত কোন মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়া দিলেন, কারণ তিনি বলিলেন যে "আমি তব ঈর্ষাভাবাপন্ন ঈশ্বর" অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিলে আমার সহ্য হইবে না।" এই ঈর্ষাভাবাপন্নতাতেই যবনদিগের কল্পিত ঈশ্বরের সহিত আর্য্যপণ্ডিত গণের ঈশ্বরের পার্থক্য। বাইবেলের ঈশ্বর যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠকগণ শুনিলেন কিন্তু ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সেই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাও শ্রবণ করুন।

যেহপ্যন্য দেবতা ভক্ত্যা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা।
তেপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-পূর্ব্বকং॥

অর্থাৎ যে অন্য দেবতাকে শ্রদ্ধার সহিত ভক্তি করে, সে আমাকেও পূজা করে, কিন্তু তাহা বিধিপূর্ব্বক হয় না।

এবং সেই ভাব অনুকরণ করিয়া আমাদের ঈশ্বরগুপ্ত কবি তাঁহার এক সখীসম্বাদ গীতে যথার্থই বিবৃত করিয়াছেন যে,—

'আমায় যে ভাবে যে ভাবে, সেই ভাবেরও প্রভাবে
পুরাই তার মনস্কাম।
আমি ভক্তের হরি নবীন ত্রিভঙ্গ শ্যাম॥"

এই দুই ভাবের মধ্যে কোন ভাবটী ঈশ্বরের যথার্থ উপযুক্ত ভাব, তদ্বিষয়ে আমি কোন বাক্যব্যয় না করিয়া, তাহার বিচারের ভার বিজ্ঞ পাঠকগণের উপরে রাখিলাম।

অবশেষে ঈশ্বর হিব্রুদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন, যে তাহারা যদি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার নিয়ম সকল লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগের মধ্যে নানারূপ পীড়া ও রোগ প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দিবেন ও তাহাদের প্রতি তিনি বৈমুখ হইয়া তাহাদের এমন দর্প চূর্ণ করিবেন যে তাহাদের শত্রুরা তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করিবে, এবং তাহাদের মধ্যে হিংস্রক জন্তু সকল প্রেরণ করিবেন, যাহারা তাহাদের বালক বালিকা ও পশ্বাদি ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে, এবং তাহাদের মধ্যে এমন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে, যে তাহারা আপন আপন বালক বালিকাদিগের মাংস খাইবে ও তাহাদের দেশ ছারখার হইবে ও তাহারা নানা দেশ এবং কাফের অর্থাৎ পৌত্তলিকদের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হইবে ও তাহারা এমন বল বীর্য্য হীন হইবে যে বৃক্ষের একটী পল্লব কম্পিত হইলে, তাহাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে, এবং শত্রুর আশঙ্কায় তাহারা পলায়ন করিবে। এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশিষ্ট হিব্রুদিগের যখন অনুতাপ উপস্থিত হইবে এবং যখন তাহারা বুঝিবে যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে ঈশ্বর তাহাদিগের বৈমুখ হইয়া তাহাদিগের প্রতি এইরূপ দুর্গতি উপস্থিত করিয়াছেন, তখন ঈশ্বরের পুনরায় কৃপা হইবে এবং ইসাক ইয়াকুব ইব্রাহিম ও মুসার সহিত তিনি চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে পড়িবে এবং ইহাও তিনি স্মরণ করিবেন যে হিব্রুদিগের ঈশ্বর হওয়ার জন্য তিনি পৌত্তলিকদিগের চক্ষুর উপর দিয়া তাহাদিগকে মিসর দেশ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন।

সেনাই পর্ব্বতের উপরে ঈশ্বর এই সকল আজ্ঞা মুসার নিকট প্রচার

করায় পরে তিনি ক্যানানাইট, মোয়াবাইট, ও ফিলিস্থিনীদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের দেশে হিব্রুদিগকে সংস্থাপিত করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের এত অনুগ্রহ এত যত্ন এবং এত আকিঞ্চন থাকিলেও হিব্রুরা তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া রহিল না। মধ্যে মধ্যে তাহারা অন্য দেব দেবী ও হস্ত নির্ম্মিত মূর্ত্তি সকল পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইত। তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগকে অনেক শাস্তি দিতেন এবং তাহাদের অনুতাপ উপস্থিত হইলে পুনরায় তিনি সদয় হইয়া তাহাদিগকে ক্রোড়ে টানিয়া লইতেন। যখন হিব্রুরা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিত, তখনই তিনি এক এক জন রাজা কিম্বা ভবিষ্যদ্‌বক্তার মুখে হিব্রুদিগের নিকট মহা আক্ষেপ করিতেন এবং ক্রোধে তাহাদিগকে দণ্ড করার ভয় দেখাইতেন। এইরূপ কিছুকাল গতে হিব্রুদিগের মধ্যে দাউদ (ডেভিড) নামক এক ব্যক্তি রাজা হইলে ঈশ্বর তাঁহাকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করিতেন এবং তাহার নিকট তিনি এক দিবস আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে হিব্রুদিগকে তিনি স্নেহ করিতে আরম্ভ করার সময় হইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার উপযুক্ত একটা মন্দির হইল না। তিনি হিব্রুদিগের সঙ্গে মিসর দেশ হইতে বাহির হইয়া মাঠে মাঠে মরুভূমে কেবল এক শিবির অথবা পট্টাবাসের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া আসিতেছেন, অতএব তাঁহার নিমিত্ত এক উপযুক্ত মন্দির করা হিব্রুদিগের উচিত। কিন্তু দাউদের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিবে না। দাউদকে ঈশ্বর সুলেমান নামক যে এক অদ্বিতীয় পুত্র দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন এবং যাহাকে তিনি পৃথিবীর মধ্যে সকল রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম করিবেন, সেই সুলেমান কর্ত্তৃক ঐ মন্দির সংগঠিত হইবে। ঈশ্বরের এমন অনুগ্রহের পাত্র সুলেমানের জন্ম বৃত্তান্ত এই স্থানে বিবৃত করা উচিত। বাথশীবা নাম্নী এক স্ত্রীলোকের রূপ লাবণ্যে রাজা দাউদ বিমোহিত হইয়া তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করেন এবং বাথশীবাকে তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার স্বামী উরিয়াকে দাউদ প্রকারান্তরে বধ করেন। এই সংযোগে বাথশীবার গর্ভে দাউদের এক পুত্র জন্মে, কিন্তু ঈশ্বর এই ব্যাপার অবগত হইয়া দাউদকে ধিক্কার দান করেন এবং দণ্ড স্বরূপে সেই শিশুটীকে অভিসম্পাত দিয়া নষ্ট করেন। ইহাতে দাউদ এবং বাথশীবার অত্যন্ত শোক হওয়াতে ঈশ্বর তাহাদিগকে সান্ত্বনা করার নিমিত্ত দাউদকে বলিলেন যে পুনর্ব্বার বাথশীবার গর্ভে যে একটী পুত্র

জন্মিবে, তাহাকে লোকে য়িহুদিগের রাজকুলের তিলক বিশেষ করিবেন, এমন কি পৃথিবীর মধ্যে চিরকাল সকল মনুষ্যের নিকট সুলেমান উপমার স্থল হইবে। ফলেও তাহাই হইয়াছিল। দাউদ গতাসু হইল পরে সুলেমান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অন্যান্য অনেক দেশের রাজাদিগকে পরাভূত করিলেন এবং তাহাদের প্রদত্ত কর ও দ্রব্যাদি দ্বারা জেরুসিলাম নগরে এক বৃহৎ এবং সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে মুসার কৃত উপরি উক্ত আর্ক প্রভৃতি সংস্থাপন করিলেন। সুবিচার সুবুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের জন্য রাজা সুলেমান অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন এবং সেই সময় য়িহুদিজাতির গৌরবের চরমাবস্থা হইয়াছিল।

প্রাচীন বাইবেলের সমালোচনায় জোবের উপাখ্যানের উল্লেখ না করিলে সমালোচনা সম্পূর্ণ হয় না। য়িহুদিগের চরম গৌরবের সময় জোব নামক এক ব্যক্তি ছিল। ঈশ্বর তাহাকে ধনে জনে খুব ভাগ্যধর করিয়াছিলেন। তাহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা ছিল ও সে সাত সহস্র মেষের তিন সহস্র উষ্ট্রের, পাঁচ শত জোড়া বলদের ও পাঁচ শত গর্দ্দভীর অধিকারী ছিল। কিন্তু এত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও জোব ঈশ্বরের সেবায় সম্পূর্ণ রূপে অনুরক্ত ছিল। প্রত্যহ ঈশ্বরের পূজা ও মন্দিরে বলিদান করিত এবং কোন অন্যায় ও গর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিত না। আমাদের বড় লাটের লেবি অর্থাৎ দরবারের ন্যায় স্বর্গেও এক এক দিবস ঈশ্বরের দরবার হইয়া থাকে। এইরূপ এক দরবারে যখন ঈশ্বরের পুত্রেরা অর্থাৎ স্বর্গবাসীরা ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শয়তানও ছিল। ঈশ্বর শয়তানকে দেখিয়া সে কোথা হইতে আসিতেছে বলিয়া জিজ্ঞাসা করাতে শয়তান উত্তর করিল যে, সে পৃথিবীতে ইতস্তত বিচরণ করিয়া আসিতেছে। তাহাতে ঈশ্বর পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "তুমি পৃথিবীতে জোব নামক আমার সেবককে দেখিয়াছ, সে কেমন আমার ভক্ত?" শয়তান তাহাতে হাঁসিয়া উত্তর করিল যে "জোব আপনার অনুগত সেবক না হইবে কেন? তাহাকে আপনি ধন, জন, সুখ সম্পদ দিয়া গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কোনরূপ ক্লেশ কিম্বা দুঃখ নাই কাজেই সে আপনার একান্ত বশীভূত হইয়াছে। কিন্তু আপনি একবার তাহার বিত্তবিভোগে হস্তক্ষেপণ করিয়া দেখুন দেখি, সে

কেমন আর আপনার বশে থাকে।" এই কথা শুনিয়া ঈশ্বর শয়তানকে বলিলেন যে "আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি কেবল জোবের শরীরের উপর হস্তক্ষেপণ না করিয়া, আর তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিয়া দেখ, তথাপি সে অবজ্ঞা করিবে না।" শয়তান 'তথাস্তু' বলিয়া চলিয়া আসিয়া জোবের সাত পুত্রের ও তিন কন্যার প্রাণ ধ্বংশ ও শত্রু দ্বারা তাহার পশ্বাদি অপহরণ করিয়া লইল এবং নানাপ্রকারে জোবকে কষ্ট দিল। তথাপি জোবের মতি টলিল না এবং তাহার ঈশ্বর ভক্তি অক্ষুণ্ণ রহিল। সে কেবল এই মাত্র বলিল যে "ঈশ্বর দিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরই লইয়া গিয়াছেন, অতএব ঈশ্বরের নাম ধন্য থাকুক।" ইহার পরে পুনরায় এক দরবারে ঈশ্বরের সমক্ষে শয়তান উপস্থিত হইলে ঈশ্বর শয়তানকে বলিলেন যে "তুমি ত জোবকে কষ্ট দিতে ত্রুটি কর নাই, তথাপি দেখ আমার প্রতি জোবের শ্রদ্ধা অবিচলিত রহিয়াছে।" শয়তান উত্তরে বলিল যে মনুষ্যের যাহা কিছু আছে তাহা সকলই সে তাহার প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত দিবে, অতএব আপনি এই ক্ষণে জোবের অস্থি মাংসে হস্তক্ষেপণ করিয়া দেখুন সে তাহা হইলে আপনার মুখের উপরে অভিসম্পাত করিবে।" এই কথা শুনিয়া ঈশ্বর বলিলেন যে, "যাও কেবল জোবের প্রাণ নষ্ট করিও না, তদ্ভিন্ন তোমার আর যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করিয়া দেখ।" তদনুসারে শয়তান আসিয়া জোবের শরীরে আপাদ মস্তক বিস্ফোটকে প্রপীড়িত করিয়া তাহাকে অকথ্য যন্ত্রণা দিল। তথাপি জোবের ভক্তি বিচলিত হইল না। তাহা দেখিয়া ঈশ্বর পুনরায় জোবকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃপা করিলেন। অন্তে তাহাকে তিনি চৌদ্দ হাজার মেষ, ছয় সহস্র উষ্ট্র, এক সহস্র জোড়া বলদ এবং এক সহস্র গর্দ্দভ এবং ১১ জন পুত্র এবং তিন কন্যা প্রদান করিয়া সুখী করিলেন।

কিন্তু হিব্রুরা সকলে জোবের ন্যায় ঈশ্বরানুগত ছিল না। অধিকাংশ ব্যক্তিরা ঈশ্বরের নিয়ম সকলে তাচ্ছিল্য করিয়া হস্ত নির্ম্মিত মূর্ত্তি পূজা এবং নানা প্রকার অহিতাচরণ করিতে লাগিল। ঈশ্বর তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া হিব্রুদিগের দুর্গতি করিতে আরম্ভ করিলেন। পারস্যস্থানের রাজা তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের বহুলোককে বান্ধিয়া লইয়া আপন রাজ্য মধ্যে তাহাদিগকে ক্রীতদাস করিয়া রাখিলেন। দাউদ ও সুলেমান রাজার পূর্ব্বে

এবং য়িহুদিগের নির্ব্বাসনের সময় ঈশ্বর তাহাদের শাসনের নিমিত্ত জোশুয়া ইলাইজা, ইলাইসা, জেরিমিয়া, ইজিকিয়েল প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তিকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে জোশুয়া এক যুদ্ধে ঈশ্বরের আজ্ঞামতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সূর্য্য ও চন্দ্রকে ঠিক এক স্থানে দণ্ডায়মান করিয়া রাখিয়াছিল, এবং যে পর্য্যন্ত শত্রুরা পরাজিত না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত ঐ দুই গ্রহ বিমানে তাহাদের নিয়মিত গতি পরিচালন করিতে পারে নাই। এই ব্যক্তির আজ্ঞায় জর্ডান নামক নদীর জলও এক স্থানে শুষ্ক হইয়াছিল এবং সেই শুষ্ক স্থান দিয়া য়িহুদি সৈন্য পার হইলে, পরে নদী পুনরায় স্রোতস্বতী হয়। ইলাইজা নামক আর একজন ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল, সে শত্রু ভয়ে এক জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করিলে পরে, সেই স্থানে কতকগুলি কাকে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত ঠোঁটে করিয়া খাদ্য দ্রব্য এবং জল যোগাইয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু এই ব্যক্তি কিরূপে কাকের মুখের আনীত দ্রব্য আহার ও পান করিয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না; কারণ কাক অপবিত্র পক্ষীর মধ্যে পরিগণিত এবং অপবিত্র পশু পক্ষীর স্পৃষ্ট দ্রব্য সকল ব্যবহার করিতে ঈশ্বর স্বয়ং সেনাই পর্ব্বতে মুসাকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। বোধ হয়, আমাদের মধ্যে প্রচলিত "আতুরে নিয়মো নাস্তি" বিধি এই অবস্থায় অবলম্বিত হইয়াছিল, কিম্বা ইলাইজা পুনরায় লোকালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহার এই অনিবার্য্য পাপ খণ্ডন করিয়াছিল। কিন্তু বাইবেলে তাহার কোন নিদর্শন নাই, ইহা কেবল আমার অনুমান। ইলাইসা নামক আর এক ভবিষ্যদ্বক্তা আমাদের দুর্ব্বাসা মুনির ন্যায় অত্যন্ত রাগান্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এক দিন বেথেল নগরের ৪০টী বালক তাহাকে "নেড়া নেড়া" বলিয়া করতালী দিয়াছিল, এবং উপহাস করিয়াছিল, সেই জন্য তিনি তাহাদিগকে অভিসম্পাত করেন এবং সেই অভিসম্পাতের ফলে জঙ্গলের মধ্য হইতে দুইটা ভল্লুকী আসিয়া ঐ চল্লিশটী শিশুকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছিল।

য়িহুদিরা তাহাদের ঈশ্বরের নিয়ম সকল লঙ্ঘন করার ফলে বহু কষ্ট পাইলেও তাহাদের জ্ঞানের উদয় হইল না এবং ক্রমে তাহারা অধিক হইতে অধিকতর পাপ এবং দুষ্কর্ম্মে রত হইতে লাগিল। সেই পাপের

অবশেষে তাহারা তাহাদের দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পৃথিবীর নানা দিগে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। অন্য জাতীয় লোকে তাহাদের ঈশ্বরের প্রদত্ত জুডিয়া দেশ অধিকার করিয়া সুলেমান রাজার নির্ম্মিত মন্দির ভাঙ্গিয়া তন্মধ্যস্থিত মূল্যবান দ্রব্য সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল। মুসলমানেরা যেমন হিন্দুদিগের দেব মন্দির সমস্ত পদদলিত করিয়াছিল, জেরুসিলামের এই প্রসিদ্ধ মন্দিরের ভাগ্যেও তদ্রূপ হইয়াছিল; এক্ষণে তাহার ভগ্নাবশেষ পর্য্যন্তও নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও হিব্রুদিগের জুডিয়া দেশ অন্য জাতীয় এবং অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের শাসনাধীন হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু হিব্রুদিগের মধ্যে এক ভবিষ্যদবাণী আছে যে হিব্রুদিগের শাস্তির এবং দুঃখের চরমসীমা উপস্থিত হইলে, তিনি একজন মেসাইয়া অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা পাঠাইয়া হিব্রুদিগকে একত্রিত করিয়া, পুনরায় তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ববৎ বিরাজ করিবেন এবং অদ্য হইতে ১৮৮৭ বৎসর পূর্ব্বে যীশুখ্রীষ্ট নামক একজন হিব্রু জুডিয়া দেশে উপস্থিত হইয়া প্রচার করেন যে, তিনিই সেই ভবিষ্যদ্ বাণী পূর্ণ করিতে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। কিন্তু হিব্রুরা তাঁহাকে ঈশ্বর প্রেরিত মেসাইয়া কিম্বা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিল না বরং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহাকে শূলে দিয়া বধ করাইল। হিব্রুরা বলে যে ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত মেসাইয়া এখনও পৃথিবীতে আবির্ভাব হয় নাই, কিন্তু তিনি যে এক সময়ে আসিয়া ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সমগ্র রূপে পূর্ণ করিবেন, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সেই নিমিত্ত ইউরোপ খণ্ডে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পরে ইউরোপবাসী খ্রীষ্টিয়ানদিগের হস্তে বহু শতাব্দী ধরিয়া হিব্রুরা অনেক অত্যাচার ও নিষ্ঠুরাচরণ ভোগ করিয়াছিল। খ্রীষ্টিয়ানদিগের গৃহের নিকট হিব্রুরা বাস করিতে পারিত না, নগরে খ্রীষ্টিয়ানদিগের বাসস্থানের দূরে হিব্রুদিগের বস বাসের নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইত। খ্রীষ্টিয়ানেরা হিব্রুদিগকে স্পর্শ করিলে পাপ বিবেচনা করিত। হিব্রু দেখিলে খ্রীষ্টিয়ানেরা তাহার গাত্রে নিষ্ঠীবন উদ্গীরণ করিয়া নিক্ষেপ করিত। টাকার প্রয়োজন হইলে রাজারা ধনাঢ্য হিব্রুদিগের নিকট ধন বাহির করার নিমিত্ত তাহাদিগকে নানা রূপ জ্বালা যন্ত্রণা দিত, এমন কি

হস্ত পদ বন্ধন করিয়া অগ্নির উপরে কাবাবের ন্যায় ক্রমে দগ্ধ করিত। এইজন্য হিব্রুরা ধনবান হইলেও সর্ব্বদা মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া অতি জঘন্য অবস্থার কাল যাপন করিত। কারণ খ্রীষ্টিয়ানদিগের মনে যদি কিছুমাত্র সন্দেহ হইত, যে অমুক হিব্রুর ধন আছে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া ধন পাইবার নিমিত্ত যন্ত্রণা দেওয়া হইত। যদি কোন হিব্রু রমণীর রূপে কোন খ্রীষ্টিয়ান পুরুষ আকর্ষিত হইত তাহা হইলে সেই পুরুষের বন্ধু বান্ধবেরা বিবেচনা করিত যে হিব্রু রমণী কোন রূপ অভিচার কিম্বা জাদু করিয়া খ্রীষ্টিয়ান পুরুষের মন ভুলাইয়াছে অতএব সেই স্ত্রীলোককে তাহারা জলে ডুবাইয়া নচেৎ অগ্নিতে পোড়াইয়া মারিত। হিব্রুরা প্রকাশ্যরূপে কোনও স্থানে তাহাদের ঈশ্বরের মন্দির স্থাপন কিম্বা তাঁহার উপাসনা অথবা পর্ব্বাহ দিনে কোন উৎসব করিতে পারিত না। হিব্রুদিগের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিতে খ্রীষ্টিয়ানেরা কিছুমাত্র পাপ কিম্বা দুঃখ বিবেচনা করিত না বরং খ্রীষ্টিয়ান পাদরিরা এই সকল কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিতেন যে,এই জাতিকে নির্যাতন করিলে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা হয়। এক্ষণেও রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি দেশে হিব্রুদিগের প্রতি খ্রীষ্টিয়ানের শত্রুতা এবং বিদ্বেষ ভাবের হ্রাস হয় নাই। কিন্তু ধন্য হিব্রুজাতি। কি চমৎকার এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও দার্ঢ্যতা সহকারে অদ্য দেড় হাজার বৎসর যাবৎ ইহারা নিজ দেশ হইতে পরিত্যক্ত হইয়া পৃথিবীর দেশ দেশান্তরে ছত্রভঙ্গ হইয়া অকথ্য এবং অসীম ক্লেশ যন্ত্রণা এবং অপমান ভোগ করিয়াও নানা কৌশলে আপনাদের জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা ও জাতীয় আচার ব্যবহার পালন করিয়া আসিয়াছে এবং স্থির ভাবে ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত সেই মেসাইয়ার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ইংরাজীতে হিব্রুদিগের আর এক নাম "জু এবং এই বাক্য ঘৃণা ব্যঞ্জক হইলেও ইহা যেমন কৃপণের তেমন ধনবানেরও উপমা। ফলত পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেতেই হিব্রুজাতীয় লোকেরা বিপুল ধনবান। আমাদের কলিকাতায় এজরা ও গব্বাই এবং বোম্বাইয়ে সাসুন্ নামক হিব্রুরা আফিমের ব্যবসার রাজা এবং ইউরোপ খণ্ডে রথচাইল্ডের বংশ শত শত কোটী মুদ্রার অধিকারী। এমন রাজ কিম্বা রাজ্য নাই যাহারা রথচাইল্ডের

নিকট ঋণী নহেন। এমনও প্রবাদ আছে যে ইউরোপ খণ্ডে যুদ্ধ উপস্থিত হিলে রথচাইল্ডের বংশ ইচ্ছা করিলে যুদ্ধের ব্যয় বন্ধ করিয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে পারে।

মুসলমানদিগের প্যাগম্বর মহম্মদও সেই ভবিষ্যদ্বাণী অবলম্বন করিয়া যীশুখ্রীষ্টের ছয় শতাব্দী পরে আরব দেশে আপনাকে মেসাইয়া বলিয়া নূতন এক ধর্ম্ম প্রচার করেন। ফলে খ্রীষ্টিয়ান ও মহম্মদীয় উভয় ধর্ম্মের মূল ভিত্তি হিব্রুদিগের এই ধর্ম্ম পুস্তক ও মূসার আইন। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে খৃষ্টান ও মহম্মদীয়দিগের মধ্যে প্রভেদ এই যে খৃষ্টানেরা হিব্রুদিগের ধর্ম্ম পুস্তক তালমদ গ্রন্থকে যথার্থ পুরাবৃত্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং তাহাতে যাহা লিখিত আছে তাহাই সত্য এবং অখণ্ডনীয় ইতিহাস স্বরূপে জ্ঞান করেন, কিন্তু মহম্মদ নাকি বলিয়াছেন যে যদিও তালমদের কথা সত্য তথাপি তাঁহার কৃত কোরাণই অন্যান্য পুরাতন কেতাবের পরিবর্ত্তে গ্রহণীয় এবং তদপেক্ষা অধিক বিশ্বস্ত এবং মনুষ্যের অনুকরণীয়। মুসলমানেরা বলেন, যে যতক্ষণ মহম্মদের কোরাণ প্রচারিত না হইয়াছিল, ততক্ষণ উপরি উক্ত পুস্তক সকল কার্য্য-কারক ছিল বটে, কিন্তু কোরাণ লিপিবদ্ধ হওয়ার পরে কোরাণের সমক্ষে মনুষ্যের অন্য কেতাব বিশ্বাস করার আবশ্যক নাই। মুসলমানদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার এই স্থলে কিছু বলিবার নাই, যাহা কিছু বলিব তাহা খৃষ্টান সম্বন্ধেই বলিব।

যাঁহারা যীশুখৃষ্টের ঈশ্বরত্বের উপর বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের হিব্রুদিগের এই পুরাতন ধর্ম্ম পুস্তক সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ব্যতীত উপায় নাই, কারণ পুরাতন বাইবেলের উপরেই যীশুখৃষ্টের দেবত্ব নির্ভর করে। কিন্তু খ্রীষ্টানেরা বলিতে পারেন যে যীশুখ্রীষ্ট এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। করুন, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই কিন্তু তাহা বলিয়া পুরাতন বাইবেলে যে সকল বিধি ব্যবস্থা আছে তাহা খ্রীষ্টানেরা অসত্য কিম্বা পাপ জনিত বলিতে পারেন না। এবং ইহাও তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে হিব্রুরা যদি তাহাদের ঈশ্বরের আজ্ঞা সকলে অবজ্ঞা না করিত এবং ঠিক ঠিক তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিত, তাহা হইলে যীশুখৃষ্টের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার আবশ্যক হইত না; কারণ ইহাই বাইবেলের মর্ম্ম যে ঈশ্বর তাঁহার স্নেহের পাত্র হিব্রুদিগের সংস্কার এবং পরিত্রাণের নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় পুত্র

যীশুকে জুডিয়া দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং পুরাতন বাইবেলের লিখিত ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল যে পবিত্র এবং পুণ্যের আকর তৎপ্রতি খ্রীষ্টান দিগের কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এখন অপক্ষপাতী পাঠক দেখুন দেখি, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের রচিত বিধি ব্যবস্থা ও আচার ব্যবহারের সহিত যীশুখৃষ্টের পূর্ব্ব পুরুষের বিধি ব্যবস্থা এবং আচার ব্যবহারের কতটুকু প্রভেদ আছে এবং খৃষ্টিয়ানেরা যে আমাদের কার্য্য সকল দেখিয়া তাঁহাদের নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাহাই বা কতদূর ন্যায় সঙ্গত?

ঈশ্বর হিব্রুদিগকে আমাদের ন্যায় অগ্নি দ্বারা হোম যজ্ঞ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তবে আমরা ঘৃত দ্বারা আহুতি দিয়া থাকি, হিব্রুরা মাংস দিয়া আহুতি দিত। আমাদের মধ্যেও রাহু কেতুর যজ্ঞে মাংসের আহুতি দেওয়া হয়। আমাদিগের বালকদিগের আমরা কর্ণবেধ করি, হিব্রুরা সুন্নত করে। আমাদের স্ত্রীলোকেরা ঋতুমতী হইলে এবং সন্তান প্রসব করিলে আমরা তাহাদিগকে কয়েক দিবসের নিমিত্ত অশুচি এবং অপবিত্র জ্ঞান করি, হিব্রুদিগের মধ্যেও স্ত্রীলোকের সেই ব্যবহার আছে। আমাদের দেব পূজার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবংশীয় লোকেরা নিয়োজিত আছে, হিব্রুদিগের মধ্যেও ঈশ্বর এরনের বংশোদ্ভব ব্যক্তিদিগকে তাঁহার পূজায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমাদিগের মধ্যে বিধি আছে যে ব্রাহ্মণেরা শুচি ও পবিত্র হইয়া থাকিবে, এরনের সন্তানগণের উপরেও তদ্রূপ আদেশ আছে, বিশেষতঃ এরনের সন্তানদিগকে ঈশ্বর বিধবা কিম্বা অসতী স্ত্রী বিবাহ করিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে যীশু খ্রীষ্টের পিতা বিধবা এবং অসতী স্ত্রীলোককে বিবাহ করা একই প্রকার অপবিত্র কার্য্য বিবেচনা করিতেন। আমাদের খাদ্যাখাদ্যের বিচারের ন্যায় হিব্রুদিগের আহারের নিমিত্ত ঈশ্বর কতিপয় পশু এবং জীব নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহারা যদিচ্ছা আহার করিতে পারে না। হিন্দুদিগের পূজার সময় ধূপ ধুনা পোড়াইবার ও দীপ জ্বালাইবার প্রথার ন্যায় হিব্রুদিগের মধ্যেও ঠিক সেই ব্যবহার আছে। আমাদের মধ্যেও যেরূপ বৃথা মাংস ভক্ষণের নিষেধ আছে, হিব্রুদিগকেও তদ্রূপ ঈশ্বর বৃথা মাংস খাইতে বারণ করিয়াছেন। আমাদেরও যেমন চতুর্ম্মাস্য ব্রত করিবার নিয়ম আছে নম্বর্স পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়েও ঈশ্বর হিব্রুদিগকে ব্রত করিবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন।

মৃতদেহ স্পর্শ করিলে আমাদের ন্যায় হিব্রুরাও কয়েকদিবস অশুচি থাকিয়া পরে স্নান ও ক্ষৌর কর্ম্ম করিয়া শুচি হয়। আমাদের মধ্যে পাপী এবং নির্দ্দোষী নির্ব্বাচনের নিমিত্ত অগ্নি এবং অন্যান্য দৈব পরীক্ষার ন্যায় তাহাদের মধ্যে সেইরূপ করিতে ঈশ্বর উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে যে পূর্ব্বকালে মনুষ্যের দীর্ঘায়ু ছিল, বাইবেলেও ঠিক তাহাই দৃষ্টি হয়। মানবের যুদ্ধে আমাদের দেবতারা আসিয়া অনেক সময় যোগ দান করিয়াছিলেন, হিব্রুদিগের পূজিত ঈশ্বরও তাহাদিগকে সহায়তা করিয়া তাহাদের শত্রু নিপাত করিয়াছিলেন। পুরাতন বাইবেল পাঠ করিলে কেবল হস্ত নির্ম্মিত মূর্ত্তি সকল ঈশ্বর স্বরূপে পূজা করার প্রথা ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে হিব্রুদিগের আচার ব্যবহার হিন্দুর আচার ব্যবহারের সদৃশ বলিয়া দৃষ্ট হইবে। ইহার মধ্যে হিব্রুদিগের আরাধ্য ঈশ্বর কি হিন্দুর ঈশ্বর সত্য, আমি তদ্বিষয়ে তর্ক কিম্বা মীমাংসা এই স্থানে করিতে ইচ্ছা করি না। আমি কেবল এই মাত্র বলিতে চাহি যে আমাদের যে সকল আচার ব্যবহার দেখিয়া এক্ষণে সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিরা ঘৃণা ও উপহাস করেন, তাহা এক সময়ে যীশু খৃষ্টের পিতা ঈশ্বরকর্তৃক অনুমোদিত ছিল এবং হিব্রুরা তাহা অতিক্রম করিয়া অন্য আচার ব্যবহার অবলম্বন করাতেই পৃথিবীতে যীশু খৃষ্টের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু আমরা পৌত্তলিক আমরা জানি যে পরমেশ্বরের নিয়ম ও বিধি সমস্ত অখণ্ডনীয় এবং চিরস্থায়ী, আমাদের বড় লাট কৌন্সিলের আইনের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল নহে, তবে কি কারণে মুসার আইন সকল যাহা ঈশ্বরের স্বীয় অনুজ্ঞামতে বিধিবদ্ধ এবং প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্ট পরিবর্ত্তন করিলেন, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। আমি সাহেবদিগের কথা ধরি না, কারণ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম তাঁহাদের পৈত্রিক ধর্ম্ম এবং তাহা সমর্থনের জন্য তাঁহারা অনেক কথা কহিতে পারেন এবং কহিয়াও থাকেন, কিন্তু আমাদের দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের উচিত যে আমাদের আচার ব্যবহার পরিত্যাগ কিম্বা নিন্দা করার পূর্ব্বে, সাহেবদিগের ধর্ম্ম পুস্তক গুলি আদ্যোপান্ত যত্নের সহিত পাঠ করিয়া দেখেন এবং খৃষ্টান ধর্ম্মপ্রচারকগণের বাক্যে মোহিত হইয়া নৃত্য না করেন।

হিন্দু ধর্ম্মের সংস্কার।

প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর।

(আজ প্রায় চারি বৎসর হইল বাঙ্গালায় নব ধর্ম্মযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রাচীন ও নব্য হিন্দুসম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া এই শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুজাতির দুর্ভাগ্যক্রমে এই শুভ সংযোগে বিয়োগ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। প্রাচীন সম্প্রদায়ের দোষে কি নব্য সম্প্রদায়ের ধৃষ্টতায়, এরূপ দলাদলি ঘটিতেছে, তাহা এখনও সাধারণে বুঝিতে পারে নাই। অথচ এই দলাদলি কোন্ সম্প্রদায়ের দোষে ঘটিয়াছে, অথবা উভয় দলেরই অল্প বিস্তর দোষ আছে কি না, তাহা না বুঝিলে উভয় দলেরই শুভ অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত হইবে।) আমরা হিন্দুসন্তান, প্রাচীন কি নব্য দলের খাতায় নাম না লিখাইলেও, এ দলাদলিতে আমাদের অনিষ্ট আছে। তাই বিগত আষাঢ় মাসের নবজীবনে প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায় কর্তৃক হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার নামধেয় একটী প্রবন্ধ লিখিয়া, কি প্রাচীন কি নব্য উভয় দলের নেতাগণকেই তুল্যরূপে কয়েকটী কথা বলি।

আমি মনে করি নাই যে আমার সেই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ কোন সহৃদয় পাঠক বা লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। কিন্তু আমার সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বিগত ভাদ্রমাসের নবজীবনে একজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ লেখক আমাকে কয়েকটী উপদেশ দিবার জন্য হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার নামক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া আমার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। লেখক, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিরও যে সময় সুলভ স্মরণের পক্ষপাতী, ইহাও আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করি। লেখক মহোদয় আমার লিখিত প্রবন্ধের সৎপ্রতিবাদ করিতে গিয়া, পরিশেষে একটু সৌজন্য রক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, 'আমি প্রতিবাদ করিতে এই প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই।' আমিও তাঁহার সৎপ্রতিবাদে পরম সন্তুষ্ট হইয়া বলিতেছি, লেখক যদি আমার প্রবন্ধের অনেক কথাই উলটা না বুঝিতেছেন, এবং উলটা বুঝিয়া নবজীবনের পাঠকমাত্রকেই উলটা বুঝাইবার চেষ্টা না করিতেন, তবে

আমাকে এই অসার প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করিতে হইত না। প্রাচীন ও নব্যসম্প্রদায় কর্তৃক হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার এক্ষণে কি ভাবে চলিতেছে, তাহাতে সাধারণের মতিগতি প্রধানত কোন্ দিকে যাইতেছে, আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাই উভয় দলের নেতাগণকে বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিতাম।

কিন্তু আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই যদি সকলে উলটা বুঝিল, তবে আমার আর লেখনী ধারণ বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। লেখক আমার প্রবন্ধের যেমন ভাব বুঝিয়াছেন, প্রাচীন ও নব্যদলের নেতাগণও যদি সেইরূপ বুঝেন, তবে আমার অরণ্যেই রোদন হইয়াছে বলিতে হইবে। এজন্য আমার প্রবন্ধের ভাব লেখক যে উলটা বুঝিয়াছেন, আমি তাহাই যথাসাধ্য প্রদর্শন করিব। ভরসা করি লেখকও আমার অদ্যকার বক্তব্য বিষয় গুলি বিশেষ বিবেচনা করিয়া বুঝিয়া নবীন ও প্রবীণ সম্প্রদায়ের নেতাগণের সম্মিলনের জন্য, আমারই ন্যায় সকলের দ্বারে দ্বারে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিবেন।

বিজ্ঞ লেখক, প্রাচীন ও নব্য হিন্দুসম্প্রদায়ের ধর্ম্ম সংস্কারের উদ্দেশ্য যেরূপ বুঝিয়াছেন সেইটাই আদৌ উলটা। তিনি লিখিয়াছেন,—'নব্যেরা অন্য ধর্ম্মের সহিত যোগ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের কলম বাঁধিতে চান; হিন্দু প্রাচীন দল তাহাতে বিরূপ, তাঁহারা স্বধর্ম্মবৃক্ষের কেবল পরগাছা কাটিতে চান।' লেখক কি জানেন না শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রধান উদ্দেশ্য এবং সম্পূর্ণ ইচ্ছা, হিন্দু ধর্ম্ম চিরকাল যেরূপ ভাবে চলিয়া আসিয়াছে, সেই ভাবেই ইহাকে রক্ষা করা। তবে আজ কাল হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় তাৎপর্য্য সকলে বুঝিতে পারে না; এইজন্য তিনি হাঁচি, টীকটীকি হইতে স্নান, শয়ন, ভোজন প্রভৃতি হিন্দুর যাবদীয় লোকাচারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন, যে,হিন্দুর আচার ব্যবহার যাহা কিছু আজ কাল (প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে) প্রচলিত আছে, তৎ সমস্তই ধর্ম্মমূলক, তাহার কোনটাই পরিত্যাজ্য নহে।' নব্যহিন্দুসম্প্রদায়ের নেতা বঙ্কিম বাবুর উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে 'ধর্ম্মই ধর্ম্ম, আচার ধর্ম্ম নহে * * * হিন্দুধর্ম্ম মানি, হিন্দুর্ম্মের বথামি মানি না * * * হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে আজ্ কাল অনেক ভেল মিশ্রিত হইয়াছে। সেই সকল উপধর্ম্মকে কাটিয়া ছাঁটিয়া

বিশুদ্ধ যে হিন্দুধর্ম্ম তাহাই সকলের গ্রহণীয়।' পরন্তু বেদব্যাসের সূচনাতেই ভূধর বাবু বলিয়াছেন," 'কাটিয়া ছাঁটিয়া হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারের আমরা পক্ষপাতী নহি। হিন্দুধর্ম্ম বৃক্ষ চিরকাল যেমন আছে সেইরূপই রক্ষা করিয়া, তাহার আপদ গুলিকে দূর করাকেই আমরা প্রকৃত সংস্কার বলি।' এখন বিজ্ঞ লেখক বলুন দেখি, কোন্ দল স্বধর্ম্ম বৃক্ষের কেবল পরগাছা কাটিতে চান? আমরা দেখিতেছি প্রাচীন ও নবীন উভয় দলই পরগাছা কাটিতে চান। তবে প্রবীণ দল খৃষ্টিয়ান ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করাই পরগাছা কাটিয়া স্বধর্ম্ম বৃক্ষকে রক্ষা করা বলেন; নব্য সম্প্রদায়ের নেতাগণ খৃষ্টিয়ান কি ব্রাহ্ম দলের ত কথাই নাই, বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের ভিতর হইতেও কুসংস্কারগত উপধর্ম্ম গুলি, যাহা হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া সাধারণ হিন্দু সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তৎসমস্তকেই বিদায় দিয়া স্বধর্ম্ম বৃক্ষকে পরিষ্কারভাবে সাধারণের হৃৎক্ষেত্রে বিদ্যমান রাখিতে চান। লেখক এই মত-দ্বয়কে পূর্ব্বপশ্চিমাভিমুখীন বলিয়াছেন। এই মত দ্বয়ের সম্মিলন অসম্ভব বলিয়াছেন। স্থূলত দেখিতে গেলে নবীন ও প্রবীণ দলের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসংস্কারের পথ বিপরীত পথ-মুখীন সন্দেহ নাই। কিন্তু চিন্তাশীল, নিরপেক্ষ হিন্দু, যাঁহারা উভয় দলের নেতাগণকেই তুল্যরূপে ভক্তির চক্ষে দেখেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, প্রাচীন ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণের অন্যান্য বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও, একটী বিষয়ে সম্পূর্ণ মতের ঐক্য আছে। আমরাও বিশ্বাস এবং ভরসা করি, প্রাচীন ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণের একতার সেই সূত্রগাছি বিচ্ছিন্ন না হইলে কালে উভয় দলের নেতাগণের ধর্ম্মমত পার্থক্য বিদূরিত হইয়া, একই পথে পরিচালিত হইবে। সেই মতটী 'চিত্ত শুদ্ধি'। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে এই বোধহয়, প্রচীন সম্প্রদায়ের নেতাগণ সদাচারের দ্বারা এই চিত্তশুদ্ধি লাভের উপায় বলিতেছেন; নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণ, চিত্তশুদ্ধিকেই ধর্ম্ম যাজনের ভিত্তি বা সোপান বলিয়া, সদাচারকে তাহার সহকারী করিয়া, ধর্ম্মের সহজ পথে অগ্রসর হওয়ার উপদেশ দিতেছেন। তবে কেহ কেহ 'ধর্ম্মই ধর্ম্ম, আচার ধর্ম্ম নহে' এই কথাটি দেখিয়াই চম্‌কিয়া বলিয়া থাকেন, নব্যদল সদাচারকে কর্ম্মনাশায় নিক্ষেপ করিয়া অন্য ধর্ম্মের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের যোগ করিয়া একটা মন গড়া ধর্ম্ম সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হই-

য়াছেন। নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণের উপদেশের আগাগোড়া না পড়িয়া অনেকেই এই উদ্ভট সিদ্ধান্ত করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বীরেশ্বর বাবুর সম্পাদিত পত্রিকা বিশেষে এ কথা স্পষ্ট বুঝাইলেও, কেহ সে দিকে তাকায় নাই। সকলেই হট্টগোল করিতেছেন। যাঁহারা বুদ্ধিমান এবং নিরপেক্ষ হিন্দু, তাঁহারা সকলের সকল কথাই কাণ পাতিয়া শুনিতেছেন। হট্টগোলে যোগ দিতেছেন না। বলা বাহুল্য তাঁহারাই এই হট্ট-গোল মধ্যেও প্রোক্ত চিত্তশুদ্ধি বাক্যের একতা দৃষ্টে সম্মিলনের ছায়া দেখিতেছেন। এই শ্রেণীর হিন্দুগণ বুঝিয়াছেন, উভয় দলেরই উদ্দেশ্য এক, পথও এক; তবে মাঝে একটা ত্রিপথের সম্মুখে আসিয়া উভয় দলের নেতা-গণই দাঁড়াইয়া সোজাপথ নির্ণয়ে ব্যগ্র হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রবীণ ও নবীন দলের নেতাগণের মতের একতার সেই সূত্রটী ছিন্ন না হইলে, কালে অবশ্য সম্মিলন হইবে? মতানৈক্য কালে মিটিবে না, কে বলিল? (১) তবে যে সকল স্বেচ্ছাচারী শিক্ষিত তাঁহাদের মনোমত একটা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ গড়িয়া লইতে চান, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের সহিত যে প্রবীণ সম্প্রদায়ের একতা বন্ধন প্রকৃতি বিরুদ্ধ, তাহা আমিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। বোধ হয় নব্যসম্প্রদায়ের নেতাগণও প্রোক্ত মতাব-লম্বীগণের মতকে মনে মনে উপেক্ষাই করেন। তবে কি না 'ঠক বাছিতে গাঁ উজার' বলিয়াই প্রকৃত নব্যহিন্দুসম্প্রদায়ের নেতাগণ ইহাঁদিগকে কিছু বলেন না। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর শিক্ষিতগণের ধর্ম্ম মতের ভিত্তি স্থাপনোদ্দেশেই প্রচারে ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যা আরম্ভ হইয়াছে। এবং নবজীবনের 'ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা' ও 'উদ্ভট কথা' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় ক্রমশ প্রকাশিত

---

(১) তবে কোন কোন পণ্ডিত যে বলেন, বৈদিক কালে যখন 'অগ্নিমিলে পুরোহিতং' ইতি প্রথম ঋকের সৃষ্টি হয় তখন ভারতবাসী যেরূপ সভ্যতা সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, তেমন সভ্য আর হয় নাই। ক্রমেই ঋষিগণ স্থূল বুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্যাস, জৈমিনি প্রভৃতি ষড়্‌দর্শনকার এবং ভগবদ্‌গীতাকারও সেরূপ সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রাপ্ত হন নাই, একালের চৈতন্য, রঘুনাথ শিরোমণি শঙ্করাচার্য্যের ত কথাই নাই। এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের সহিত নব্যদলের যে মিল হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য। ৯।

হইতেছে। এই শ্রেণীকে শিক্ষা দানে নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণ যেমন কৃতকার্য্য হইবেন, প্রাচীন দলের নেতাগণ তেমন সমর্থ হইবেন না। কেননা প্রাচীন দলের নেতাগণের কথা এই শ্রেণীর শিক্ষিতগণের হৃদয়স্পর্শী হইবে না। অপিচ প্রাচীন দলের নেতাগণের উপদেশ যেমন প্রাচীন হিন্দুদল আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন, তেমন নব্যদলের নেতাগণের ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় ফল দর্শিবে না। এই জন্যই আমি সকল শ্রেণীর লেখকগণের একত্র সম্মিলনে সম্পাদিত একখানি পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বোধ করি। তদ্ভিন্ন নবজীবন বিদ্যমানে, বেদব্যাসের আবির্ভাবে আমাদের লাভ ভিন্ন ক্ষতি কি?

শ্রদ্ধাস্পদ লেখক বলিয়াছেন 'চন্দ্রমোহন বাবু নবজীবনের ভূমিকায় মুগ্ধ হইয়া ভাবিয়াছিলেন 'এইবার বুঝি নবীনে প্রবীণে প্রীতি হইবে' ইত্যাদি 'কত সুখ দেখিয়াছিলেন।' নবজীবনের পাঠকমাত্রেই জানেন, আমি নবজীবনের ভূমিকায় মুগ্ধ হইয়া নবীনে প্রবীণে মিলনের আশা করি নাই। নবজীবনের ভূমিকায় (সূচনায়) নবীনে ও প্রবীণে সম্মিলনের কোনই আভাস ছিল না। নবজীবনের অনুষ্ঠান পত্রে লেখকগণের নাম দেখিয়াই সকলে নবীনে ও প্রবীণে মিলনের পূর্ব্বাভাস বুঝিয়াছিল। আমি আমার প্রবন্ধের ভূমিকাতেই সে কথা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছি। লেখক আমার এই কথা যেমন বুঝিয়াছেন, অনেক কথাই সেইরূপ উল্‌টা বুঝিয়াছেন। তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

লেখক আগা গোড়া যুক্তি তর্কের দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,— এবং স্পষ্টত বলিয়াছেন, "একটু আকাশ পরিষ্কার হইবার যো হইয়াছিল। সম্মিলনের কিরণ অল্প মেঘাবৃত হইলেও ঈষৎ বিকীর্ণ হইতেছিল, অমনি কোথা হইতে রমেশ-মেঘে আকাশ ছাইয়া পড়িল; সেই সময়ে সকলের আশা সমূলে উৎপাটিত হইল।" কিন্তু সকলেই জানেন, নবজীবনের প্রথম বৎসর, নবীনে প্রবীণে সম্মিলনের কোন চিহ্নই দেখা যায় নাই। কেবল পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের একটী প্রতিবাদ মূলক প্রবন্ধ ভিন্ন শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি প্রাচীন দলের নেতা ও পণ্ডিতগণের লিখিত কোন প্রবন্ধ প্রথম বৎসরের নবজীবনে প্রকাশিত হয় নাই। আমরা যে মাসেই নবজীবন পাইয়াছি, তখনই আগ্রহের সহিত খুলিয়া অগ্রে দেখিয়াছি,

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের কোন প্রবন্ধ আছে কি না? কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলী এক বৎসরকাল আমাদের সে আশা পূর্ণ করিতে যত্নশীল হন নাই। রমেশ মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, নবজীবনের দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম সংখ্যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে চূড়ামণি মহাশয়ের সেই প্রবন্ধও সেই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়। আমরা বুঝিতে পারি নাই, রমেশ বাবুর ঋগ্বেদের দেবগণ শীর্ষক (প্রথম) প্রবন্ধে এমন কি তীরবৎ তীক্ষ্ণাস্ত্র ছিল যে, সেই খোঁচাতেই কাল সর্প সদৃশ প্রাচীন পণ্ডিতগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। স্বর্গীয় বাবু রামদাস সেন যখন বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন—'সোমরস এবং গোমাংসের প্রশংসাযুক্ত মন্ত্রে যে কিরূপ জ্ঞানলাভ হয় তাহা বলিতে পারি না' (২)। তখন প্রাচীন পণ্ডিতগণকে ত গর্জ্জন করিতে শুনি নাই। না, তখন বঙ্গীয় গগন ঘোর অমানিশায় আচ্ছন্ন ছিল; শশধরের কিরণে তখন বাঙ্গালা আকাশ উজ্জ্বল হয় নাই। বিষ হীন সর্প সকল, ইতস্তত বিবরে মুখ গুঁজিয়া ছিল, গর্জ্জন করিবে কি? কালের গতিতে সব হয়। রামদাস বাবু বেদকে গোমাংসের প্রসংশা-যুক্ত বলাতেও কেহ গর্জ্জন করেন নাই। রমেশ বাবুর মুখে বেদের প্রশংসা ধরে না, তথাপি তাঁহার খোঁচায় সকল বিষধরই গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

আমি এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞ লেখকের প্রবন্ধের যে উত্তর গাহিলাম, তাহাতে কি প্রবীণ, কি নবীন উভয় দলের আদরণীয়—নবজীবনকে প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রবীণ দলের মনোমত একখানি পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা হইয়াছিল বলিয়া কাহারও বোধ হয় না। অথচ আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ লেখক, ইহার পরই এক নিশ্বাসে বলিতেছেন,—'পাঠক! পূর্ব্বোক্ত কুজ্ঝটিকাই বেদব্যাসের উৎপত্তির অপর কারণ। সেই অবধি বা তাহার কিছু পূর্ব্বাবধি নব্যের প্রিয়, প্রাচীনের অপ্রিয় প্রবন্ধ নবজীবনে বেশী বেশী বাহির হইতে লাগিল; নব্যদল দলে দলে দ্বিগুণ উৎসাহে নব্য হিন্দুধর্ম্মে (?) দিন দিন আকৃষ্ট হইতে লাগিল; × × × দাদা ভাই নবজীবন ও প্রচারের ধর্ম্ম কথায় নব্যের অনেক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে প্রাচীন বা তন্মতাবলম্বীর মনস্তুষ্টি হইল না, তাঁহাদের উপযোগী একখানি সংবাদ-

(২) ঐতিহাসিক রহস্য প্রথমভাগ ১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পত্রের প্রয়োজন হইল। নতুবা শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা শীর্ষক প্রবন্ধ কাটিয়া ছাঁটিয়া ছাপা হওয়াতে বেদব্যাসের সৃষ্টি হয় নাই।' পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আমি 'চূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধ কাটিয়া ছাঁটিয়া প্রকাশের জন্য বেদব্যাসের উৎপত্তি হইয়াছে' ঠিক এ কথা বলি নাই। আমার লিখিত পূর্ব্ব প্রবন্ধ আর একবার পাঠ করিলেই সকলে দেখিতে পাইবেন, আমি এই প্রতিযোগী পত্র সৃষ্টির অনেক গুলি কারণ প্রদর্শন করিয়াছি, চূড়ামণি মহাশয়ের প্রবন্ধ কাটা ছাঁটাই এ দলাদলির মুখ্য কারণ নয়। অন্য দশবিধ কারণের মধ্যে একটি কারণ মাত্র। চূড়ামণি মহাশয় বঙ্গবাসীতে যে ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেন, তাহাতেই বুঝা যায়, যে কেবল নবজীবন ও প্রচারের ধর্ম্ম মতের সহিত তাঁহার সহানুভূতি নাই বলিয়া তিনি নবজীবন ও প্রচারের সংস্রব ত্যাগ করেন নাই। প্রোক্ত প্রবন্ধ কাটা ছাঁটার অকারণ অভিযোগ উপস্থিত করাতেই তাঁহার মনের গুমর ফাঁক হইয়াছে। লেখক মহাশয় এখন তাঁহার সাফাই গাহিয়া কি করিবেন? যাহা হউক, না হয় স্বীকার করিলাম, চূড়ামণি মহাশয় কেবল গ্লানির ভয়েই নবজীবন-সম্পাদকের উপর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যের অনুরোধে এতটুকু স্বীকার করিতে হইবে যে, আমি এই কাটা ছাঁটার কথাটা না উঠাইলে, নবজীবন সম্পাদকও তাঁহার সাফাই দিবার ফাঁক পাইতেন না। লেখক মহাশয়ও সম্পাদকের সম্পাদকীয় নীতির প্রশংসা করিতেন না। সম্পাদকের দোষেই এ বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়াছে, এইরূপ একটা স্থির সিদ্ধান্ত সকলেরই মনে থাকিয়া যাইত। আমার এই খোঁচা মারাতে অন্তত এতটুকু বুঝাগেল যে, কেবল নবজীবন সম্পাদকের দোষে এ দলাদলি ঘটে নাই। লেখক যে বলিয়াছেন 'সেই অবধি বা তাহার কিছু পূর্ব্বাবধি নব্যের প্রিয়, প্রাচীনের সম্পূর্ণ অপ্রিয় প্রবন্ধ নবজীবনে বেশী বেশী বাহির হইতে লাগিল ; × × × × কিন্তু তাহাতে প্রাচীন বা তন্মতাবলম্বীর মনস্তুষ্টি হইল না, তাঁহাদের উপযোগী একখানি সংবাদ পত্রের প্রয়োজন হইল। এই সমাগমে বেদব্যাসের উৎপত্তি'—একথা কতদূর সত্য তাহারও আলোচনা করা যাউক।

সকলেই জানেন, বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বাবু নীলকণ্ঠ মজুমদার, বাবু চন্দ্রশেখর বসু, বাবু কালীনাথ দত্ত, বাবু বীরেশ্বর

পাঁড়ে, বাবু দেবেন্দ্রবিজয় বসু, বাবু কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেথক গণের এবং সম্পাদকের লিখিত প্রবন্ধাবলি প্রথম বৎসরের নবজীবনে বেশী বেশী বাহির হইয়াছে। বোধ হয় কেহই বলিতে পারিবেন না, অন্তত সেই সময়ে কেহ বলেন নাই, যে প্রোক্ত লেথকগণের প্রবন্ধ নব্য দলেরত কথাই নাই, প্রবীণ দলের অপ্রীতিকর হইয়াছিল। বরং হিন্দু সমাজের মুখ-পত্র বলিয়া যে বঙ্গবাসী স্পর্দ্ধা করেন, তিনি সেই বৎসরের নবজীবনের অনেক প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া জয় জয়কার দিয়াছিলেন। এবং ব্রাহ্মদল-ঘেঁসা-হিন্দু আর্য্য দর্শন সম্পাদক বরং নবজীবন ও প্রচার পৌত্তলিকতার দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছে বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছিলেন। তবে লেথক মহাশয় কিসে সিদ্ধান্ত করিলেন, নবজীবনে নব্য দলের প্রীতিকর, প্রাচীন দলের অপ্রীতিকর প্রবন্ধ বেশী বেশী বাহির হইতেছিল বলিয়া প্রাচীন দলের মনস্তুষ্টিকর প্রবন্ধ-পূর্ণ একখানি পত্রিকার প্রয়োজন হইয়াছিল? যে প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য বেদব্যাসের সৃষ্টি, নবজীবনকে কি তদুপযোগী করা অসম্ভব হইয়াছিল? প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলী মনে করিলেই 'ভূয়সাব্যবদিশাতে' বাক্যের সার্থকতা নবজীবনেই করিতে পারিতেন। সে চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছিলেন, বা চেষ্টা করিয়াও নবজীবন সম্পাদক কর্ত্তৃক কোন বাধা পাইয়াছিলেন কি? সকলেই অবগত আছেন, নীলকণ্ঠ বাবুর 'শাস্ত্র সমর্থন' প্রবন্ধের (৫৭৩ পৃষ্ঠা) ফুট নোটে নবজীবন সম্পাদক বলিয়াছেন, 'তারাপ্রসাদ রত্ন তুলিতে গিয়া যদি সঙ্গে সঙ্গে বিষ তুলিয়া থাকেন, নীলকণ্ঠ তাহা পান করিয়া হজম করিলে ক্ষতি কি?' সকল শ্রেণীর হিন্দুকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশে যে পত্রিকার জন্ম, সকল শ্রেণীর লেথকের লেখা প্রকাশ না করিলে পত্রিকা সম্পাদন যখন অসম্ভব, তখন এরূপ উদারতাই প্রশংসনীয়। এ হেন গুরু গম্ভীর, অথচ বিনয় নম্র উপদেশেও যদি প্রাচীন পণ্ডিতগণের বা তন্মতাবলম্বীর মনস্তুষ্টি না হয়, তবে আর কিসে হইবে?

লেথক বলেন, "রমেশ বাবুর ঋগ্বেদ শীর্ষক প্রস্তাব যে প্রাচীনের নিতান্ত অপ্রীতিকর তাহা সাধারণে অবগত আছেন। এই সজ্ঘর্ষণে নবীনের আর প্রবীণের বিদ্বেষানল সমধিক জ্বলিয়া উঠে।" তবেই বুঝা গেল, প্রবীণ দলের পূর্ব্ব হইতেই নবীন দলের উপর বিদ্বেষ ছিল। রমেশ

বাবুর ঋগ্বেদের দেবগণ-শীর্ষক প্রবন্ধ অছিলা মাত্র। না হয় স্বীকার করিলাম, রমেশ মেঘেই প্রাচীন ও নব্যদলের সম্মিলনের আকাশ আচ্ছন্ন করিল। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলী যদি এক রমেশ মেঘেই দিশাহারা, দেশছাড়া হন, তবে আর তাঁহাদের দ্বারা এই পাশ্চাত্য সভ্যতান্দোলিত বঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারের আশা কি? বেদ-বিবাদে সে আশা কি কাহারও পূর্ণ হইয়াছে? আমাদেরত বোধ হয় না। প্রায় সকল হিন্দুই বলেন, রমেশ মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন করিলে, প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলী সদ্যুক্তি পূর্ণ শাস্ত্রের তর্ক-বাত্যায় মেঘ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন না কেন? বেদ-বিবাদে দলাদলি, গলাগলির ঘোঁট না করিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ মিলিয়া, একখানি ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা সহ অনুবাদ প্রকাশ করিলেইত সাগর পারের রমেশ-মেঘ, সাগর পারে উড়িয়া যাইত? "বেদার্থ বোধ অতি কঠিন কথা" ইহা বলিলেই কি সকলের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়?

বলা অসঙ্গত নয় যে চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মান্দোলনের ফলই নবজীবন। অথচ তিনি প্রথম বৎসর নবজীবনে একটী প্রবন্ধও লিখেন নাই। তিনি যে 'ধর্ম্মব্যাখ্যা' পুস্তকাকারে খণ্ড ক্রমে প্রকাশ করিতেছেন, তাহা অগ্রে নবজীবনে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিলেই ত লোকে তাঁহার ধর্ম্ম মত সাদরে পঠন, শ্রবণ এবং হৃদয়ঙ্গম করিত? বোধ হয় পুস্তকাকারের 'ধর্ম্ম ব্যাখ্যা' অল্প লোকেই চক্ষে দেখিয়াছে। নবজীবনের সাহায্যে তাহা দেশময় প্রকাশিত হইত। এবং তাহা হইলে, যাহারা নবজীবনের অনুষ্ঠানপত্র পাঠে আহ্লাদে নৃত্য করিয়াছিল,তাহাদের নিকট তিনি কেবল তর্কচূড়ামণি(!) বলিয়া অভিহিত হইতেন না। হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারকদলের উপযুক্ত অধিনেতা বলিয়াই আপামর সাধারণের ভক্তি উপহার পাইতেন। এমন সুযোগ এপর্য্যন্ত কোন পণ্ডিতের ভাগ্যে ঘটে নাই, অথচ চূড়ামণি মহাশয় এই সুযোগ ত্যাগ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা শীর্ষক প্রবন্ধের শেষ ভাগ (যে অংশের লেখার ভঙ্গি নবজীবন সম্পাদক কয়েক পংক্তি উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন) প্রকাশ হইল না বলিয়া, প্রোক্ত প্রবন্ধ কাটাছাঁটার অভিযোগ দিয়া, নবজীবনের সংস্রব ত্যাগ করিয়া, একখানি প্রতিযোগী পত্রিকা প্রকাশের সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন। পাঠক! আমাদের বিজ্ঞ লেখক যাহাই বলুন, সকলেই কিন্তু জানেন, সেই সুবিধা খুঁজিবার ফল,—

'বেদব্যাস'। অথচ চূড়ামণি মহাশয়ের যেন নবজীবনে লিখিবার অনিচ্ছা ছিল না, নবজীবন সম্পাদক তাঁহার সহিত একমতাবলম্বী হইয়া পত্রিকা সম্পাদন করিলে, কখনই এরূপ বিচ্ছিন্নতা ঘটিত না।—বঙ্গবাসীতে তিনি যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহাতে আমরা এইরূপই বুঝিয়াছিলাম। এখন বুঝা গেল, আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা ত ভুলই, আমাদের ভ্রম সংশোধনার্থ বিজ্ঞ লেখক যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ ভ্রম-মূলক। দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, লেখক একজন বেদব্যাসের পৃষ্ঠ পোষক বলিয়াই যেন, আমাদের ভ্রমসংশোধন করিতে গিয়া নিরপেক্ষতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রত্যুত ওকালতীই করিয়াছেন। কিন্তু ওকালতী করিতে গিয়াও নূতন উকিলের ন্যায় নথী ছাড়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ লেখক আর একটী কথা উলটা বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন "লেখক বেদব্যাসকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর মুখপাত্র স্বীকার করিতে বড় নারাজ।" আমি অনুরোধ করিয়া বলিতেছি নবজীবনের লেখক, পাঠকগণ আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধ একবার আগা গোড়া পড়িয়া দেখিবেন; দেখিবেন,— আমি গোড়া হইতেই বেদব্যাসকে প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীর মুখপাত্র বলিয়া আসিয়াছি। তবে ইহাও বলিয়াছি যে, "বঙ্গদর্শনের তিরোভাবের পর (কেবল নব্য সম্প্রদায়ের সম্মিলনে) ধর্ম্ম সংস্কার জন্য নবজীবনের আবির্ভাবে বিশেষ কোন ফল হইবে না বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। পরন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণের মুখপাত্র কোন পত্রিকাও সে আশা পূর্ণ করিতে পারিবে না। তবে প্রাচীন ও নব্যসম্প্রদায়ের লেখকাগ্রণীগণের রাসায়নিক সম্মিলনে সে আশা পূর্ণ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল।" এই কথা গুলির যাথার্থ্য প্রদর্শন জন্যই শেষে বলিয়াছি, "কেবল চন্দ্রশেখর বসু কেন, বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি লেখকের প্রবন্ধ বেদব্যাসে প্রকাশ করিতে যখন ভূধর বাবুর আপত্তি নাই, তখন অবশ্য তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, যে বেদব্যাসকে ঠিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর মুখপত্র করিলে চলিতেছে না। সকল শ্রেণীর হিন্দুকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া বেদব্যাসের যখন উদ্দেশ্য, তখন এইরূপ উদারতা ভিন্ন গোঁড়ামিতে সে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। নবজীবন ও প্রচারের এ বিষয়ে উদারতা প্রশংসনীয়।" পাঠক! দেখিলেন,

আমি "বেদব্যাসকে" ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর মুখপাত্র পত্রিকা বলিতে কিরূপ নারাজ! তবে বঙ্গবাসীর মতে "বেদব্যাসই একমাত্র হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ পত্রিকা" সেই কথায় আমি তেমন সায় দিই নাই। বঙ্গবাসীর কথায় সায় না দেওয়াতেই কি লেখক মহাশয় আমাকে প্রোক্ত অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন?

আমি স্বীকার করি, "ব্রাহ্মণ অথচ পণ্ডিত ব্যতীত ধর্ম্মের মৌলিকতা রক্ষিত হওয়া কঠিন। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে কেবল ধর্ম্মান্দোলন করিয়া আসিতেছেন, ধর্ম্ম তাঁহাদের হাড়ে মাসে জড়িত * * *। কিন্তু উদারচেতা পণ্ডিতমাত্রেই বলেন, 'জাতিতে ব্রাহ্মণ নহে, ব্রাহ্মণ গুণে।' "ব্রাহ্মণ অথচ পণ্ডিত" বলিয়া লেখককেও সে কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইয়াছে। "গোবরেও পদ্ম হয়; ঘৃতও তেল হয়" বলায় সকলের সকল আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু লেখক "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-কল্প-পাশ্চাত্য-শিক্ষিত" কাহাকে বলেন, বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় লেখকের অভিপ্রায় এই যে, যে সকল পাশ্চাত্য-শিক্ষিত হিন্দুসন্তানকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দয়ার চক্ষে দেখেন, তাঁহারাই "ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-কল্প পাশ্চাত্য-শিক্ষিত"। এ কথা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে, বঙ্কিমবাবু, চন্দ্রনাথবাবু. চন্দ্রশেখরবাবু প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দয়ার চক্ষে দেখেন না বলিয়া তাঁহারা "ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-কল্প পাশ্চাত্য-শিক্ষিত" নহেন; বীরেশ্বরবাবু, ইন্দ্রনাথবাবু, নীলকণ্ঠবাবু প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ দয়ার চক্ষে দেখেন বলিয়াই "ইহাঁরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-কল্প পাশ্চাত্য-শিক্ষিত!" তাই বেদ-ব্যাসে পশ্চাদুক্ত লেখকগণের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলেও, লেখকের মতে বেদ-ব্যাস খাঁটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর মুখপাত্র। কেন না ভূয়সা ব্যবদিশ্যতে! নবজীবনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইতে রামা শ্যামার লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ হইলেও তাহা অহিন্দু মতের পত্রিকা! অনেকে বলেন, "নবজীবন যদি দুই ফর্ম্মা-আকারে প্রকাশিত হইত এবং হিন্দু, অহিন্দু, পণ্ডিত, অপণ্ডিত, শিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত সকল শ্রেণীর পাঠক পাঠিকার মনোরঞ্জন করা যদি নবজীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য না হইত, তবে বেদব্যাসের ন্যায় নবজীবনও 'ভূয়সা ব্যবদিশ্যতে' বাক্যের সার্থকতা রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু সে পথে চলিলে, নবজীবন এতদিন ধূমকেতুর ন্যায় দেখা দিয়া অচিরে অন্তর্দ্ধান

হইতেন। কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর লিখিত প্রবন্ধের আশায় বসিয়া থাকিয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষিতের প্রবন্ধ প্রত্যাখ্যান করিলে, বর্ত্তমান আকারে নবজীবনকে প্রকাশ করিতে সম্পাদককে আরও একযুগ অপেক্ষা করিতে হইত।

আমাদের বিজ্ঞ লেখক শেষে একটি রহস্যের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "প্রাচীন আর নব্য এই দুইটি মাত্র সম্প্রদায় ধরিলে, লেখকও এই দুইএর একটির অন্তবর্ত্তী হইবেন। নব্য সম্প্রদায়ের দিকে একটু আন্তরিক টানের আব ছায়া পরিলক্ষিত হওয়ায়, তাঁহাকে নব্য হিন্দুসম্প্রদায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করি।" আমি বলি আপত্তি নাই। নবজীবন সম্পাদকের 'হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা?" শীর্ষক প্রবন্ধ শুনিয়া বা পড়িয়া অনেক নব্য হিন্দু, নব্য হিন্দু সম্প্রদায় হইতে নাম কাটাইলেন; রমেশ-মেঘ-বাত্যায় বিঘূর্ণিত হইয়া অনেক নব্য হিন্দু প্রাচীন পণ্ডিত বিশেষের উত্তরীয় ধরিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দলে গিয়া, নাম লিখাইলেন; আমার ন্যায় নগণ্যকে কেহ ডাকিলও না, কোন ঝাঁকে মিশিবার সাধ্যও আমার নাই; সুতরাং লেখক যে আমাকে নব্য হিন্দুসম্প্রদায় বলিয়াছেন, তাহাতে আমি সুখী ভিন্ন দুঃখিত নহি। বরং তিনি যে আমাকে না নবীন, না প্রবীণ তৃতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বলিতে চাহেন, সে স্পর্দ্ধা আমার নাই। তবে একথা আমি পুর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলি, কি নব্য, কি প্রাচীন কোন দলেরই আমি গোঁড়া বা উকীল নহি। যে দলের যে টুকু দোষ বা গুণ দেখিব, তাহা মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিব। কিন্তু আমার বুঝিবার বা বলিবার দোষে, যদি প্রাচীন সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ, এবং নব্য হিন্দু-সম্প্রদায়ের প্রশংসা প্রকাশ পায়, সেরূপ ভ্রম আমাকে যিনি দেখাইয়া দিবেন, তাঁহাকে আমি প্রকৃত বন্ধু এবং সদুপদেষ্টা মনে করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। লেখক মহাশয় আমার সেরূপ (প্রকৃত পক্ষে) ভ্রম একটিও দেখাইতে পারেন নাই। অথচ আমার নব্য দলের দিকে একটু আন্তরিক টানের আবছায়া দেখিয়া আমাকে সেই শ্রেণীর উকীল (প্রকারান্তরে) বলিয়া রহস্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে আমি দলাদলির অগ্রণী বলায় যেন লেখকের আঁতে ঘা লাগিয়াছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গে অনেক মহা মহো-

পাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে চূড়ামণি মহাশয়কে আমরা প্রাচীন দলের যে নেতা বলি, তাহা কি তাঁহার পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়? নেতৃত্ব করিতে গিয়া দলাদলির ঘোঁট করিয়াছেন, ইহা তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির চিহ্ন বা পরিচয় বটে; ধর্ম্ম-সংস্কারক দলের উপযুক্ত নেতার চিহ্ন বা লক্ষণ নহে। যাঁহার উপর লোকের বেশী আশা, তিনি যদি নিরাশার অধিনায়কতার পরিচয় দেন, তবে কি আমাদের সকলেরই আক্ষেপের কথা নয়? নব্য দল মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে বরাবর রাজি; এখনও আগ্রহান্বিত; সুতরাং তাঁহাদের প্রতি একটু আন্তরিক টানের আব্ছায়া থাকা না হউক, উভয় দলের দোষ গুণ বলিতে গেলে, ইহাদের প্রশংসাটা একটু ঘোরাল হইবে আশ্চর্য্য কি? আমি আমার লিখিত প্রবন্ধে প্রাচীন ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণকে লক্ষ্য করিয়া দুইটি বিশেষ গুরুতর কথা বলিয়াছি। পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত ন্যায়লঙ্কার মহাশয়ের ("বেদব্যাসে" প্রকাশিত) 'স্বধর্ম্ম রক্ষা' নামধেয় প্রবন্ধের সার কয়েকটি কথা কোটেশ্যান্ দিয়া তুলিয়া (৭৬৬।৭৬৭ পৃষ্ঠা) নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাগণকে লক্ষ্য করিয়া শেষে যাহা যাহা বলিয়াছি, ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের কথা গুলির সমাপ্তি কোটেশ্যান্ মুদ্রাকরের ভ্রম বশত মুদ্রিত না হওয়ায়, লেখক বোধ হয় 'অপিচ' শব্দের (৭৬৭ পৃষ্ঠায়) পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত কথা গুলিই ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এবং পরিশেষে (অপিচ শব্দের পরে) প্রাচীন-সম্প্রদায়ের নেতাগণকে লক্ষ্য করিয়া 'রামা শ্যামা তীর্থ যাত্রিগণের' গালাগালি নিবারণ করিতে বলিয়াছি ও লেখক তাহাতেই হয় ত আমার নব্যদলের দিকে টানের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এবং বুঝিয়াছেন, আমি ঘুসো ঘুসী ঠেকাইতে গিয়া পাশ কাটিবার সময় এক ঘুসি মারিয়া আসিয়াছি। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাক্য সমাপ্তি করিয়াই আমি বলিয়াছি,—"বাস্তবিক নব্যসম্প্রদায়ের এ রোগটী অনেক দিন হইতে হইয়াছে * * *" ইত্যাদি। সেই কয়েক পংক্তি পড়িয়াও যদি কেহ বলেন, আমি নিরপেক্ষভাবে উভয় দলের নেতাগণকে তুল্যরূপে সত্য কথা বলি নাই, তবে আমার আর বলিবার কি আছে!

লেখক মহাশয় আমার প্রতি একটি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, সরল ভাবে তাহার একটা উত্তর দিয়া সাফাই দেওয়া আমার কর্ত্তব্য

হইয়াছে। লেখক বলিয়াছেন "পাঠক! আমি একজন রামা শ্যামা তীর্থ যাত্রী; সুতরাং আমার আঁতে ঘা লাগিয়াছে; * * * তিনি কীলোকীলি থামাইতে গিয়া এক কীল মারিয়া আসিলেন। বাছিয়া বাছিয়া গরিবকে মারিলেন, তাই কীল কিছু বেশী জোরে বোধ হইয়াছে।" উপসংহার কালে লেখক এই রামা শ্যামা তীর্থযাত্রী, যে শ্রেণীর লোককে বলিয়া বুঝিয়াছেন, যদি সকলেই সেইরূপ বুঝিয়া থাকেন, তবে বাস্তবিকই আমি কীলোকীলি থামাইতে গিয়া এক কীল মারিয়া আসিয়াছি সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যে শ্রেণীর লোককে বাঙ্গালী হিন্দু বলিয়া আসিতেছি, এবং প্রাচীন ও নব্য হিন্দুসম্প্রদায়ের দলাদলিতে যে শ্রেণীর হিন্দুগণের অধিক অনিষ্ট হইবে বলিয়া, আমি আশঙ্কিত ভাবে উভয়দলের নেতাগণকে লক্ষ্য করিয়া, মিলিয়া মিশিয়া ধর্ম্মসংস্কার করিতে বিনীতরূপে অনুরোধ করিয়াছি, সেই সাধারণ হিন্দুসম্প্রদায়কে কেহ 'রামা শ্যামা তীর্থ যাত্রী' বলিয়া বুঝিবে, এবং আমার কথায় কাহারও আঁতে ঘা লাগিবে, ইহা আমি কখন মনেও ভাবি নাই! আমার লেখার ভঙ্গি তেমন হইলে, হয়ত নবজীবন সম্পাদক সেই অংশ প্রকাশই করিতেন না। লেখক যে বলিয়াছেন "কালে বাপুও পণ্ডিত হয়" তাহা আমিও জানি। এই বাপু শ্রেণীর হিন্দুকে জব্দ করা দূরে থাকুক, আমি এই শ্রেণীর জন্যই ওকালতী গ্রহণ করিয়াছি। তদ্ভিন্ন শিক্ষিত এবং পণ্ডিত-গণের দোষ গুণ বিচার করিতে যাওয়া কি আমার শোভা পায়? আমি রামা শ্যামা তীর্থ যাত্রী বলিয়া যাহাদিগের বাড়াবাড়ি নিবারণের কথা বলিয়াছি, তাহাদের একটা আব্‌ছায়া মত স্বরূপ বর্ণনাও আমার প্রবন্ধের স্থানে স্থানে আছে। চক্ষুষ্মান পাঠক মাত্রেই তাহা দেখিয়া চিনিতে পারিবেন—আমার মতে রামা শ্যামা তীর্থ যাত্রী কাহারা। কিন্তু লেখকের ন্যায় অনেক পাঠক, লেখকই—হয়ত আমার বর্ণিত রামা শ্যামার চিত্র-দর্শনে সক্ষম হন নাই। অধিকন্তু প্রবন্ধ লেখকের লেখার ভঙ্গিতে অনেকেই উল্‌টা বুঝিয়া মর্ম্মাহত হইতে পারেন। এজন্য অদ্য আমি রামা শ্যামা তীর্থ যাত্রীদিগের একটা চিত্র সহ পরিচয় দিব। ভরসা করি কোন পাঠক 'কবির' দলের দোহারের ন্যায় সেই চিত্র নিজের মনে করিয়া 'আমার আঁতে ঘা পড়িয়াছে' বলিয়া আর গোল যোগ করিবেন না।

আমাদের বিজ্ঞ লেখকই বলিয়াছেন "বড়ই আক্ষেপের বিষয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম

শৈশব অতীত করিতে না করিতেই গুরুজনের সহিত পৃথক্ হইলেন। তাই আজ উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম আদি, নববিধান ও সাধারণ এই ত্রিধা—বিভক্ত মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।” আমরাও দেখিয়া আসিতেছি, এই বাঙ্গালায়, কি সামাজিক, কি ধর্ম্মনৈতিক, কি রাজনৈতিক যে কোন নূতন বিষয়ের আন্দোলন বা অনুষ্ঠান হইয়াছে, তখনই এক শ্রেণীর লোক তাহার চাঁই হইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছে। “আমি সকলের নেতা, আমার মতে সকলে চল, না চলিলে আমি এ দলে থাকিব না” বলিয়া প্রথমত আবদার,—আপত্তি; পরিশেষে পৃথক্ একটা দলের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের দেশের যাত্রাওলারা ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু এদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণ যাত্রাওলাদিগকেও পরাস্ত করিয়াছেন। এই শিক্ষিতগণের গুণেই ‘উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্রিধা মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।’ ইহাদেরই গুণে ভারতসভার অনুষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতাগণের তিনটী দল হয়। এই শিক্ষিতগণই বহু-বিবাহ-নিবারণী আন্দোলনায়, বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন অনুষ্ঠানে, বাল্য-বিবাহ-নিবারণী হুজুকে, প্রথম ‘ঢেরা সই’ করেন। আবার অন্য একজন নামজাদা পণ্ডিত, যেই সেই সকল বিষয়ের প্রতিবাদ করিলেন, অমনি “বাবুর দল” তদ্বিষয় বিবেচনা, আলোচনা, অবধারণা না করিয়াই, পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে জলাঞ্জলি দিয়া নূতন মতে ‘ডিটো’ লিখিয়া স্বাক্ষর করিলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাঁরা—চৌকোষ মানুষ! এই সকল মহাত্মারাই একবার খ্রীষ্টানের বাইবেল পাড়িয়া—হিন্দুগণকে গালাগালি দেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক পাইয়া দেশশুদ্ধ হিন্দুকে কুসংস্কারাপন্ন মূর্খ বলেন; অলকট সাহেবের মুখে যোগ মাহাত্ম্য শুনিয়া মাথায় চুলের খোঁপা, মুখে দাড়ী গোঁফ, হস্তে দীর্ঘ দীর্ঘ নখ রাখিয়াই ‘যোগে যাগে’ যোগী হইবার আশায় থিওসফিষ্ট হইয়া বসেন! আবার, হিন্দু-পণ্ডিত বিশেষের ‘ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা’ শুনিয়া প্রতি স্রোতে ফিরিয়া খাটী হিন্দু সাজিয়া—(এক সময় স্বেচ্ছাচারিতার জন্য যে সকল বন্ধুর নিকট তিরস্কৃত হইয়াও তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, এখন সেই সকল) উন্নতমনা প্রকৃত বন্ধুগণকে “অহিন্দু, শাস্ত্রজ্ঞান-হীন, ঋষি-মাহাত্ম্য-বোধ-হীন, গুরূপদেশ-বিহীন, ধর্ম্মের ষাঁড়” প্রভৃতি ‘নানা বিশেষণে বিশেষিত করেন।’ আমি নিরপেক্ষ সকল পাঠককেই জিজ্ঞাসা করি, এই শ্রেণীর লোকের দ্বারা কি এত দিন হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ

রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে? ইহারাই কি হিন্দুসমাজের প্রধান অঙ্গের মধ্যে গণ্য? এই শ্রেণীর লোককে 'রামা শ্যামা তীর্থ যাত্রী' বলায় কি সাধারণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর 'আঁতে ঘা লাগে'? না বাছিয়া বাছিয়া গরিবকে মারা হয়? কে আমাদের বিজ্ঞ লেখক তা জানি না। তিনি যদি আমার বর্ণিতরূপ 'রামা শ্যামা তীর্থ যাত্রীর' দলের হন, তবে তাঁহার আঁতে ঘা লাগিলে আমার দুঃখ নাই। ঐ সকল তীর্থযাত্রীগণকে কৌশলে কটাক্ষ করা ভিন্ন অন্য কি প্রকারের গুরু-গম্ভীর উপদেশ আছে তাহা আমি জানি না। অনেক দিন হইতে গুরু-গম্ভীর উপদেশের কথাটা শুনিতেছি বটে, আমাদের দুর্ভাগ্য ক্রমে কোন গুরুকেই সেই স্বর্গীয় উপদেশটী দিতে শুনিলাম না।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস স্বধর্ম্ম বৃক্ষের পরগাছা কাটিয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে যাহারা সক্ষম, তাঁহারা মিলিয়া মিশিয়া ধর্ম্ম সংস্কার করা অপমান কি ধর্ম্মহানি মনে করিবেন না। গোঁড়াগণই দলাদলির ঘোঁট করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত। সুখের বিষয় এই যে বেদব্যাসে এখন আর বিদ্বেষ বিজৃম্ভিত অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ বাহির হইতেছে না। এবং 'প্রবীণের ও নবীনের অপ্রীতিকর প্রবন্ধ বেশী বেশী বাহির হওয়া' অপবাদের পর হইতেই (লেখক স্বীকার করুন বা নাই করুন) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের লিখিত প্রবন্ধে নবজীবনের কলেবর উজ্জ্বল করিতেছে। ভরসা করি, কালে প্রচারের ন্যায় বেদব্যাসও নবজীবনের সহিত সৌভ্রাত্র প্রেমে আবদ্ধ হইয়া, একই উদ্দেশে জীবন তরী ভাসাইয়া, আমাদিগকে ধর্ম্মের সহজ উন্নতিকর বিশুদ্ধ পথে লইয়া যাইবেন। অপিচ সাধারণের সে আশা পূর্ণ করিতে যদি নবজীবন কি প্রচার অসমর্থ হন, তবে আমরা নবজীবন ও প্রচারের দীর্ঘ জীবন কামনা করি না। বেদব্যাস যদি সকল শ্রেণীর হিন্দুর উপদেষ্টা বন্ধু বা গুরুর ন্যায় কুহকাবৃত হিন্দুধর্ম্মের গূঢ় রহস্য সকল সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারেন, তবে বেদব্যাসকেই আমরা বৃহদাকারে দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য গগণে বিরাজ করিতে দেখিলে সুখী হইব। যে সদুপদেষ্টা সেই আমাদের বন্ধু। আমরা খ্যাতি প্রতিপত্তির খাতিরে আসল কথা ভুলিব না।

শ্রীচন্দ্রমোহন সেন।

তৃমি আর আমি।

বিপুল সংসারে কে চিনে আমারে ?
তুমিত সবার হৃদয় সরে--
বিকচ কমল শোভা অচঞ্চল,
অহর্নিশ নাচ হরষ ভরে।
ভকতি-সমীর, পিরীতির নীর,
নাড়িয়া যতই তরঙ্গ তোলে,
সৌরভের রাশি মৃদু মন্দ হাসি,
ছড়াও ততই স্রোতের কোলে।
শিশিরের বিন্দু পিয়ে মুখ-ইন্দু,
কভু না সম্পূর্ণ প্রফুল্ল হয় ;
প্রেম অশ্রুজল পাইলে কমল,
আর কি মুহূর্ত্ত মুদিত রয় ?
ভকতি অনিলে, তুমিত ফুটিলে,
সাজালে মানস-সরসী-বর ;
ভক্তি কোথা পাই ভাবিয়া বেড়াই,
কলঙ্কিত মন মোরা যে নর।
ভকতি মুকতি, তোমারি শকতি,
তোমারি নিয়ত সেবিকা দাসী।
কৃপা করি নাথ ! ঘুচাও বিষাদ !
ঘুচাও হৃদের কলুষ রাশি !
নাহি পার কিবা, সসাগর-দ্বীপা,
অবনী, অমরা, সকলি তব !
চন্দ্র-তারা-ভরা কারু-কার্য্য-করা
নৈপুণ্য তোমার প্রকাশে নভঃ।
কুমুদা, নলিনী, প্রফুল্ল কামিনী,
ধরার মন্দার গোলাপ দাম,
দিবা, বিভাবরী সুগন্ধ বিতরি
প্রকাশে নিয়ত তোমার নাম।

ডঙ্কান্ স্কটলাণ্ডের রাজা। রাজ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়াছে। মাক্‌ডন্ ওয়াল্ড বিদ্রোহীর সর্দ্দার। মাক্‌বেথ ও বাঙ্কো—ডঙ্কানের দুই জন প্রধান সেনাপতি। ইহাঁরা অসাধারণ বিক্রমে বিদ্রোহ দমন করিলেন, বিদ্রোহীর মুণ্ডপাত করিলেন। সেই সময়ে অন্য দিকে নরওয়ে-রাজ স্কটলাণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন। কডরের সর্দ্দার বিদ্রোহী হইয়া নরওয়েরাজকে দলে বলে সাহায্য করেন। মাক্‌বেথ ও বাঙ্কো মাক্‌ডন্ ওয়াল্ডকে বিনষ্ট করিয়া, নরওয়ের অধিপতি রোএনো এবং কডরের সর্দ্দারকে তুমুল সংগ্রামে অতুল বিক্রমে পরাভূত করেন। এই যুদ্ধ ক্ষেত্রের অনতিদূরে প্রান্তরস্থ বন-ভূমিতে, এই মহা সমর সমাপ্তির অনতি পূর্ব্বে, মাক্‌বেথ মহানাটকের আরম্ভ। দুরাকাঙ্ক্ষার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি তিনটা প্রেতিনী প্রথম দৃশ্যের রঙ্গ-চারিণী। তাহারা পরস্পরে বলা ব'লি করিল, যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মাক্‌বেথের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। উদার মানসের সুধীর আশা সূর্য্যোদয়ের সহিত হৃদয় আলো করিয়া উঠিতে থাকে; দুরাকাঙ্ক্ষীর দুরাশা সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে উদয় হয়; প্রথমে বড় উজ্জ্বল ছটা; কিন্তু ক্রমেই করাল হইতে করালতর ছায়ায় হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। দুরাকাঙ্ক্ষা-রূপা প্রেতিনীগণ কাজেই বলিয়া যাইতেছে, তাহারা সূর্য্যাস্তের সময় মাক্‌বেথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে—তাহারা যাইবার সময় সকলে মিলিয়া নাটকের প্রস্তাবনা-গীতি গান করিয়া গেল;

> Fair is foul and foul is fair,
> Hover through the fog add filthy air.
> সুন্দরকে মন্দ ভাবি, মন্দকে সুন্দর;
> বদ্ হাওয়া কুয়া দিয়া ফিরি নিরন্তর।

দুরাকাঙ্ক্ষা এমনই প্রেতিনীই বটে। যে সকল ভাল জিনিষ আছে, তাহা মন্দ বলিয়া মনে হয়, তাহাতে মন উঠে না, আশা পূরে না, তুষ্টি হয় না; এক একটা মন্দ জিনিষকে তখন কতই না সুন্দর বলিয়া মনে হয়—সেইটা পাইবার জন্য, হাঁকু পাঁকু করিতে হয়। পাপের ধর্ম্মই এই যে, সুন্দরকে মন্দ ভাবে, মন্দকে সুন্দর। সুতরাং মাক্‌বেথ-রূপ মহাপাপ নাটকের ইহাই মহতী প্রস্তাবনা।

দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজ শিবিরে রাজা ডঙ্কান কডরের বিদ্রোহের সংবাদ এবং

মাক্‌বেথের বিক্রম ও বিজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিদ্রোহী কডরের সর্দ্দারি কাড়িয়া লইবার এবং মাক্‌বেথকে সেই পদ প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

তৃতীয় দৃশ্যে তৃণ-লতা-হীন প্রান্তর ভূমিতে সেই প্রেতিনীগণের লীলা-খেলা। দুরাকাঙ্ক্ষার বিহার ভূমি এই রূপই বটে; কেবল ধূ ধূ করে। সমরাবসানে বিজয়ী ব্যাঙ্কো ও মাক্‌বেথ সেই প্রান্তর দিয়া শিবিরে আসি-তেছেন। সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন; গোধূলি আসিতেছে।

'সুন্দরে মন্দ, মন্দে সুন্দর' সেই যে ডাকিনীরা প্রথম ধুয়া গাইয়াছে, সেই ধুয়া ধরিয়াই তাহারা মাক্‌বেথের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে—মাক্‌বেথ হয় ত মনে মনে তাহাই ভাবিতেছিলেন—মুখেতে স্পষ্টই বলিলেন—এই নাটকে মাকবেথের প্রথম কথা—

এমন সুন্দরে মন্দ দিন আর দেখি নাই!

বাস্তবিক, আজি অতুল সাহসে মাক্‌বেথ বিদ্রোহ দমন করিয়া স্কটলাণ্ড নিষ্কণ্টক করিয়াছেন—আজি বড় শুভ দিন; কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা রাক্ষসীরা আজি মাক্‌বেথের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে—ঐ চতুর্দ্দিকস্থ সান্ধ্য কুজ্ঝ-টিকাচ্ছন্ন শৈলমালার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় হইতেছে—আজি বড় দুর্দ্দিন; তাহাতেই আমরাও বলি—

এমন সুন্দরে মন্দ দিন—আর দেখি নাই! এই দিনে এই ক্ষণে সেই তৃণ-লতা-হীন প্রান্তর ভূমিতে, সেই প্রেতিনীরা বিজয়ী ব্যাঙ্কো ও মাক্‌বেথের দৃষ্টি পথ বর্ত্তিনী হইল।

একজন বলিল 'জয় মাক্‌বেথকি জয়, গ্লামিসের সর্দ্দারকি জয়।' আর একজন বলিল—'জয় মাক্‌বেথকি জয়, কডরের সর্দ্দারকি জয়।' তৃতীয়া বলিল—'জয় মাক্‌বেথকি জয়—ভাবি মহারাজকি জয়!' মাক্‌বেথ শিহরিয়া উঠিলেন,—এমন সুন্দর কথায় কি যেন একটা মন্দ আছে—এই আশঙ্কায় যেন শিহরিয়া উঠিলেন *। ভাবিতে লাগিলেন। ব্যাঙ্কো জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমার কথা কিছু বলিলে না?

---

* .... and seem to fear
Things that do sound so fair.

একজন বলিল—মাক্‌বেথের চেয়ে কম অথচ বেশী;
আর একজন বলিল—অত সুখী নয়, কিন্তু সুখী বেশী;
তৃতীয়া বলিল—তব বংশ রাজা হবে, নিজে রাজা নয়,
কাজে কাজে মাক্‌বেথ বাঙ্কো—উভয়েরই জয়!!

ডাকিনীরা অদৃশ্য হইল—মাক্‌বেথের হৃদয়ে কু-আশা গাঢ় হইতে লাগিল। এই সময়ে সেই পথে রাজ সভাসদেরা আসিয়া মাক্‌বেথকে রাজাদেশ জ্ঞাপন করিল; বলিল—মহারাজ আপনাকে কডরের সর্দারি-পদ প্রদান করিয়াছেন। মাক্‌বেথ প্রথমে বিশ্বাসই করেন না; তাহার পর যখন বুঝিলেন, যে কথাটা সত্য, তখন, ভাবিতে লাগিলেন 'আমিত পিতৃ-মৃত্যুতে গ্লামিসের সর্দ্দার বটেই কিন্তু আমি যে হঠাৎ রাজ প্রসাদে কডরের সর্দ্দার হইব, একথা প্রোতনীগুলা জানিল কিরূপে? হয়ত তারা ভবিষ্যৎ জানিতে পারে; তবে হয়ত সত্য সত্যই আমি রাজা হইব—তবে কি রাজাকে হত্যা করিতে হইবে নাকি?—দূর হোক, অত শত ভাবনা কেন? যদি অদৃষ্টে রাজ্যলাভ থাকে, তাহা হইলে আমি কোন চেষ্টা না করিলেও রাজা হইব।' দেখুন, পাপ কেমন ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করিতেছে। অভাবনীয় রাজ-প্রসাদ লাভ করিয়া কোথায় কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরিয়া উঠিবে? না কোথায় সেই রাজাকে হত্যা করিবার কল্পনা মনে উঠিতেছে। দেখুন, প্রস্তাবনা গীতি মিলিতেছে কিনা; দুরাকাঙ্ক্ষা সুন্দরকে মন্দ করিয়া তুলে কিনা। কোথায় হৃদয়-দ্রাবিনী ভক্তি সহচরী কৃতজ্ঞতা, আর কোথায় নরকের পিশাচী কৃতঘ্নতা—কোথায় হৃদয়ে দেবী উজ্জ্বলা হইবেন! না কোথা হইতে রাক্ষসী আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল তখন মাক্‌বেথ মহা প্রপীড়িত হইয়া, তাহাকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিলেন। ভাবিলেন, 'দূর হোক, ওসব কথা আর ভাবিব না. অদৃষ্টে থাকে হবে—আমার চেষ্টার প্রয়োজন কি?' যে বলিতে পারে অদৃষ্টে রাজ্য-ভোগ থাকে—অবশ্য হইবে—সে পরক্ষণে ভাবিতে পারে—পাপ কর্ম্ম থাকে, অবশ্য হইবে—এই অদৃষ্ট-বাদই পাপের প্রশ্রয়-দাতা।

চতুর্থ দৃশ্যে রাজা ডঙ্কানের সহিত মাক্‌বেথের সাক্ষাৎ হইল। মাক্‌বেথের কৃতকার্য্যের কিরূপে প্রশংসা করিবেন, রাজা, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পান না, কিরূপে মাক্‌বেথের সম্মাননা করিবেন, তাহা ভাবিয়া পান না—

রাজার এমনই আনন্দ! এতই কৃতজ্ঞতা! রাজা মহানন্দে মাক্‌বেথকে বলিলেন, 'এই রাত্রি তোমার ভবনেই যাপন করিব।' মাক্‌বেথ বলিলেন 'তবে আমিই দূত স্বরূপ অগ্রসর হইয়া গৃহিণীকে আপনার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে যাই।' মাক্‌বেথের হৃদয়ে কিন্তু তুষানল লাগিয়াছে—রাজ-সম্মানায় মাক্‌বেথ অস্থির। আপনা আপনি বলিতেছেন—

Stars hide your fires!

Let not light see my black and deep desires:

দেখো না, সম্বর আলো, তারকা নিকর!

কূপ সম এই মম তামস অন্তর।

পঞ্চম দৃশ্যে—লেডি মাক্‌বেথের প্রবেশ। ইনি মাক্‌বেথের প্রবৃত্তি-রূপা গৃহিণী।

সকল মনুষ্যেরই বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি আছে; সেই প্রকৃতির উপর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নিয়তই ক্রীড়া করিতেছে, মানব প্রকৃতির উপর আধি-পত্য লাভের নিমিত্ত নিয়তই পরস্পর মারামারি করিতেছে—যে যখন প্রবলা হয়, সেই তখন প্রকৃতিকে আপনার পথে লইয়া যায়। তন্ত্র বলেন—মাতা প্রকৃতি—বনিতা প্রবৃত্তি—দুহিতা নিবৃত্তি। মাতা হইতে জন্ম—জন্ম হইতে আমরা বিশেষ প্রকৃতি লাভ করি, বনিতায় ভোগ—ভোগে প্রবৃত্তি; দুহিতায় সম্প্রদান ও সমর্পণ শিক্ষা—নাড়ী ছেঁড়াধন নিস্বার্থ ভাবে পরকে সমর্পণই নিবৃত্তি শিক্ষা ও নিষ্কাম ধর্ম্ম। বনিতা হইতে কাম, বনিতা হইতে ভোগ, বনিতা হইতে সংসার। কামে প্রবৃত্তি, ভোগে প্রবৃত্তি; সংসারে প্রবৃত্তি। বনিতা সকল দিকেই প্রবৃত্তি রূপা। এই প্রবৃত্তি রূপা গৃহিণীর চালনায় মানব প্রকৃতি কি ভাবে পরিচালিত হয়—মাক্‌বেথ চরিত্রে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে।

মাক্‌বেথের প্রকৃতি সাহসবতী, তেজস্বিনী, বিক্রম-শালিনী ও দুরা-কাঙ্ক্ষাময়ী। মাকবেথ যখন জয়োল্লাসে উল্লসিত, তখনই তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা প্রেতিনীরূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া, তাঁহার হৃদয়ে রাজ-পদ লালসার অঙ্কুর রোপণ করে। এখন দেখ, তাঁহার গৃহিণী-রূপা প্রবৃত্তি মানব অবয়বে নিশাচরী রূপে তাঁহার সেই প্রকৃতিকে কোন পথে লইয়া যায়! মাক্‌বেথের বিশাল সতেজ প্রকৃতিতে আকাঙ্ক্ষা-রূপা অতিক্ষুদ্র পাপের অঙ্কুর ছিল—

অনেক হৃদয়েই থাকে—কিন্তু তেমন সৎপ্রবৃত্তি তাঁহার সঙ্গিনী হইলে, তাঁহাকে সৎ পথেই লইয়া যাইত; কিন্তু মাকবেথ-গৃহিণী দুঃসাহসময়ী লালসার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। এই গৃহিণীর প্ররোচনায় মাক্‌বেথ হৃদয়স্থ ক্ষুদ্র পাপাঙ্কুর সুবৃহৎ কণ্টক তরুতে পরিণত হইতে চলিল।

প্রকৃতির প্রেতিনী ডাকিনী মূর্ত্তি সকল মাক্‌বেথকে যেখানে সেখানে দুরাকাঙ্ক্ষার পথ প্রদর্শন করে, প্রবৃত্তির রাক্ষসী-রূপা গৃহিণী অন্তঃপুরে নিয়তই সেই পথে তাড়না করিয়া লইয়া যায়,—কাজেই মাক্‌বেথ ক্রমেই মহাপাপে লিপ্ত হইতেছেন।

পঞ্চম দৃশ্যে মাক্‌বেথের প্রবৃত্তিরূপা গৃহিণীর আবির্ভাব। ইতিপূর্ব্বে মাক্‌বেথ গৃহিণীকে পত্র লিখিয়াছেন, যে তাঁহার সহিত তিনটা ডাকিনীর পথে দেখা হয়, তাহারা তাঁহাকে কডরের সর্দ্দার বলিয়া অভিবাদন করিয়াছিল, তাহার পর তিনি সংবাদ পান, যে সত্য সত্যই মহারাজ তাঁহাকে ঐ পদ প্রদান করিয়াছেন। ডাকিনীরা তাঁহাকে ভাবি মহারাজ বলিয়াও অভিবাদন করে।—'এ সকল সুসম্বাদ ও সুখাশার আহ্লাদের ভাগ তোমায় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না—এই কথা তোমার অন্তরের অন্তরে রাখিও এক্ষণে বিদায়।' দৃশ্যারম্ভে মাক্‌বেথ গৃহিণী এই পত্র পাঠ করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন—'রাজা ত হবে, তা খুব সহজ উপায়ে হতে পারিবে কি? তোমার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষার সহচর সকল তোমাতে নাই—

Art not without ambition, but without
The illness should attend it—

যাই হৌক, বাড়ীতে আসিলে বুঝিতে পারি, তোমাকে বাগাতে পারি কি না?'

মাক্‌বেথ-গৃহিণী যখন এইরূপ চিন্তাকুলা, তখন সংবাদ আসিল যে, মহারাজ সেই রাত্রি তাঁহাদের বাড়ীতে অতিথি হইবেন। তাঁহার দুঃসংকল্প সিদ্ধির হঠাৎ যে, এমন সুসংযোগ হইল, তাহা লেডি মাক্‌বেথ প্রথমে বিশ্বাসই করেন না—শেষে বলিলেন, বড় সুসংবাদ বটে। মনে মনে ভাবিলেন এমন সুসংযোগ আর হবে না। শুনিতে পাইলেন, দাঁড়কাক গুলা কর্কশ রবে ক-অ অ ক-অ-অ করিতেছে। বড় আহ্লাদ হইল। তখন তিনি কিরূপে আপনাকে আপনি কঠিন নিষ্ঠুর কঠোর প্রকৃতির করিবেন, সেই

ভাবনাই ভাবিতে লাগিলেন। মাক্‌বেথ রাজাগমের সংবাদ দিতে স্বয়ং উপস্থিত। গৃহিণী বলিলেন, 'তোমার পত্র পাইয়া এখনই ভবিষ্যতের সুখ-ভাগিনী হইয়াছি। মাক্‌বেথ বলিলেন--'অদ্য রাত্রি ডঙ্কান এখানে আসিতেছেন।' গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন 'এখান থেকে যাবেন কখন?' মাক্‌বেথ বলিলেন 'আগামী কল্যই এখান হইতে যাইবার সংকল্প।' লেডি মাক্‌বেথ কঠোর কণ্ঠে বলিলেন 'তাঁহার এখানে এই নিদ্রার নিশা আর কখন প্রভাত হইবে না।' মাক্‌বেথ স্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝিলেন, কিন্তু এই প্রবৃত্তির প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না, বলিলেন 'পরে এ বিষয়ে কথা হইবে।' পাপের অঙ্কুরে প্রবৃত্তির সেবনে, পত্র নির্গমন হইল।

ষষ্ঠ দৃশ্যে মাক্‌বেথ ভবনে ডঙ্কান অতিথি। রাজা বড় আদরে, বড় আহ্লাদে, বড় গৌরবে, লেডি মাক্‌বেথের হাত ধরিয়া বলিলেন 'চলুন, আপনার স্বামীর নিকট আমাদের লইয়া চলুন।'

সপ্তমে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিবাদ।

পাপের পথে অগ্রসর হইয়া, তুমি যখন দুস্তর মহানরকে ঝম্প দিতে পারকে পতনোন্মুখ পতঙ্গের মত হেট মুণ্ডে প্রস্তুত, তখন নিবৃত্তি কখন নিশ্চিন্ত থাকে না। নিমকের পুরাণ চাকরের মত, তুমি মান, আর নাই মান, সে তাহার সকল কথা বলিবেই বলিবে। মাক্‌বেথ মহাপাপের পূর্ব্বে, পূর্ব্ব কথিত মহামন্ত্র 'শুভাশুভস্য শীঘ্রং' জপ করিতে করিতে উপস্থিত; নিবৃত্তি নানা ছাঁদে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল; মাক্‌বেথ বুঝিলেন দয়া, ধর্ম্ম, কৃতজ্ঞতা, রাজভক্তি, আতিথেয়তা সকলই তাঁহার বিরোধী, কেবল এক দুরাকাঙ্ক্ষাই তাঁহার হৃদয়ে এই গুরুতর অসৎ কার্য্যের একমাত্র উত্তেজনা—কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষায় ত সর্ব্বনাশ হয়।

I have no spur
To prick the sides of my intent, but only
Vaulting ambition which o'erleaps itself
And falls on the other.

এইরূপে মাক্‌বেথের হৃদয়ে নিবৃত্তি একটু অধিকার করিতেছে, এমন সময়ে দুঃসাহস-সহচরী লালসা-রূপা তাঁহার রাক্ষসী গৃহিণী আসিলেন।

শুনিলেন, মাকবেথ ইতস্তত করিতেছেন, বলিলেন 'এই, তোমার আমাকে ভালবাসা? তুমি নয় পুরুষ? তবে মনে যাহা হয়, কাজে তাহা করিতে পার না কেন? যদি পারিবেই না, তবে আমাকে এ কথা ভাঙ্গিলে কেন? করিব, বলিয়া এখন পিছাইয়া যাও? 'আমার ছেলেকে মারিব' এমন কথা যদি কখন বলিতাম, ত দেখিতে—আমার কোলে শুইয়া হাসিয়া হাসিয়া মাই খাইতেছে, সেই সময়ে তাহার মুখ হইতে মাই খসাইয়া লইয়া আছাড় মারিয়া তাহার মাথার ঘি বাহির করিয়া ফেলিতাম—যারা করিব বলিয়া, পরে পারিব না বলে, তারা আবার মানুষ!'

এই মানবী-রাক্ষসী-প্রেতিনী ভাষায় অভাগা মাক্‌বেথ ছিন্ন ভিন্ন বিচূর্ণ হইয়া গেলেন। এই স্থলেই পিশাচী প্রবৃত্তির পূর্ণবিকাশ। ভয়ানক রৌদ্র, বীভৎস রসের এমন বিকট উৎকট সমাবেশ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। লেডি মাক্‌বেথের কথা গুলি পড়িতে পড়িতে হৃদয় চমকিয়া উঠে; অভাগা মাক্‌বেথের জন্য দুঃখ হয়, পাপিষ্ঠার উপর রাগ হয়, রাগ করিতে গিয়া ভয় হয়—ভয় করিতে গিয়া ঘৃণা হয়। যে কবি বলিয়াছিলেন, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী,—তিনিই বুঝিয়াছিলেন—লেডি মাক্‌বেথ কিরূপ পদার্থ? লেডি মাক্‌বেথ প্রলয়ঙ্করী। এই প্রলয়ঙ্করী পিশাচীর প্ররোচনায় মাক্‌বেথ রাজ হত্যায় দৃঢ় সংকল্প হইলেন। পাপতরু শিকড় গাড়িয়া বসিল; এখন কাটিতে পার, উপড়াইতে আর পার না।

পাপের দৃঢ়সংকল্পে এই মহাপাপ নাটকের প্রথম অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল; অদ্য এই পর্য্যন্ত।
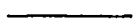
নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। | পৌষ ১২৯৪। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

*৪।

অনুভূত বিষয়াহসংপ্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

পদচ্ছেদঃ।—অনুভূত বিষয় অসংপ্রমোষঃ স্মৃতিঃ।

পদার্থঃ।—অনুভূতঃ, ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞাতঃ চেতসা হৃত্ত্বিদিতশ্চ; বিষয়ঃ, বৃত্তিস্তদারূঢ়ঃ পদার্থশ্চ, অসম্প্রমোষঃ, অস্তেয়-মনপহরণমিতি যাবৎ, স্মৃতিঃ স্মরণং, ইন্দ্রিয়াদি-দ্বারা জ্ঞাতস্য চেতসা হৃত্ত্বিদিতস্য বা বিষয়স্য বৃত্তেঃ পদার্থস্য বা যোহয়ং অসম্প্রমোষঃ সংস্কারদ্বারেণ বুদ্ধৌ যথাযথমুপারোহঃ সা স্মৃতিঃ।

ভাবার্থঃ।—বিষয়ানুভবানন্তরং হি চিত্তে কোহপি সংস্কারোজায়তে স চ সংস্কারো যদা স্বাভিব্যঞ্জকেন কালাদিনাহভিব্যক্তো ভবতি তদা স্বসমানাকারামেব স্মৃতিং জনয়তি, সা স্মৃতিরনুভূতান্নাধিকা নাপ্যল্পা।

তত্র প্রমাণ-বিপর্য্যয বিকল্পা জাগ্রদবস্থাঃ। ত এব যদাহনুভববলাৎ প্রত্যক্ষায়মানাস্তদা স্বপ্নঃ। নিদ্রাত্বসংবেদ্যমানবিষয়াঃ। স্মৃতিশ্চ প্রমাণ বিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রা-নিমিত্তা।

অনুবাদ—আমরা পূর্ব্বে যাহা ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অনুভব করি, সংস্কার বশতঃ অন্তঃকরণে সেই অনুভূত বিষয়ের যে যথাযথ স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার নাম স্মৃতি।

অর্থাৎ পূর্বে আমরা যে কোন প্রমাণ (প্রত্যক্ষ, অনুমান বা শব্দ) দ্বারা যে কোন বিষয়ের অনুভব করি না কেন, সেই বিষয়ের একটি সংস্কার হয়; ঐ সংস্কার বশত অন্তকরণে পুনর্ব্বার যে সেই বিষয়ের যথাযথরূপে স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার নাম স্মৃতি।

সমালোচনা।—স্মৃতি বা স্মরণ একটি চিত্তের বৃত্তি বা পরিণাম। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ করি, বা অনুমান দ্বারা যে কোন বিষয় নির্দ্ধারিত করি অথবা আপ্ত লোকের মুখ হইতে যে কোন বিষয় শ্রবণ করি, অথবা শাস্ত্রে যে সকল বিষয় অধ্যয়ন করি, সেই সকল প্রত্যেক বিষয়ের এক একটি পৃথক পৃথক সংস্কার অন্তঃকরণে উৎপন্ন হয়। সেই সংস্কার বশত আমাদের চিত্ত আবার কখন কখন সেই পূর্ব্বের প্রত্যক্ষীকৃত, অনুমিত, শ্রুত বা অধীত বিষয়ের আকারে পরিণত হয়। চিত্তের এইরূপ পরিণামকে স্মৃতি বলে। স্মৃতির জন্য বিষয়ের ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ, ব্যাপ্তি-জ্ঞান বা বক্তার প্রামাণিকতা ইত্যাদি কোন কারণের আবশ্যকতা নাই। একমাত্র সংস্কারই কারণ, সেই সংস্কার আবার যেরূপ কেন হউক না, প্রকৃত বিষয়ের হউক বা ভ্রান্ত বিষয়েরই হউক সেই সংস্কার অনুসারেই আমাদের স্মৃতি হইবে। স্মৃতির প্রতি একমাত্র সংস্কারই কারণ। আমরা দশ বৎসর পূর্ব্বে আগরার তাজমহল দেখিয়াছি, কিন্তু দর্শন অবধি আমাদের মনে এমনি একটি সংস্কার জন্মিয়াছে যে, আমরা যখন মনে করি, তাজমহলের কাছে যাইতে হয় না, আগরায় যাইতে হয় না, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেও যাইতে হয় না, বাঙ্গালাদেশে ঘরের ভিতর দ্বার রুদ্ধ করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া আমাদের অন্তঃকরণকে তাজমহল আকারে পরিণত করিতে পারি। অর্থাৎ মনের মধ্যে তাজমহল দর্শন করিতে পারি। এইরূপ তাজমহল দর্শনের নাম তাজমহল স্মৃতি। এইরূপ পূর্ব্বানুমিত বা পূর্ব্বশ্রুত বস্তুর কেবল একমাত্র সংস্কারের উদ্দীপন বশত স্মরণ হইয়া থাকে। সংস্কারের উদ্দীপন নানা কারণে হয়। আমাদিগের ইচ্ছা বশত, পূর্ব্বানুভূত বস্তুর সদৃশ বা একেবারে বিসদৃশ অন্য বস্তুর দর্শনে, বা শ্রবণে, অথবা যে সময় সেই বস্তুর অনুভব হয় সেই সময়ের উপস্থিতিতে, কিম্বা যে ব্যক্তির সহিত উহার অনুভব হইয়াছিল, সেই ব্যক্তির দর্শনে, অথবা তাহার নাম শ্রবণে, অথবা তাহার সম্পর্কীয় কোন বস্তু দর্শনে—এইরূপ অসংখ্য কারণে পূর্ব্বানুভূত বস্তুর সংস্কার উদ্দীপিত হইয়া স্মৃতি

যা স্মরণের উৎপাদন করে। সংস্কার অনুসারে বস্তুর স্মৃতি হয়। স্মরণে আর বস্তুর যথার্থতা বা অযথার্থতার বিচার করিতে হয় না। আমরা যদি পূর্ব্ব মুখ গৃহকে পশ্চিম-মুখ বলিয়া দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের পশ্চিম-মুখই স্মরণ হইবে। স্মরণের কাছে প্রমাণ ও অপ্রমাণ দুই সমান। এই নিমিত্ত প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প ও নিদ্রা এই চারি বৃত্তির দ্বারা গৃহীত বস্তুরই স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং স্মরণ পূর্ব্বোক্ত চারি বৃত্তির কোনটির অন্তর্গত হইতে পারে না।

ভাষ্যকার বেদব্যাস স্মৃতির বিষয় এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন—"কিংপ্রত্যয়স্য চিত্তং স্মরতি আহোস্বিৎ বিষয়স্যেতি গ্রাহ্যোপরক্তঃ প্রত্যয়ো গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াকারনির্ভাসঃ তথা জাতীয়কং সংস্কারমারভতে সচ সংস্কারঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনস্তদাকারামেব গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াত্মিকাং স্মৃতিং জনয়তি। তত্র গ্রহণাকারপূর্ব্বা বুদ্ধিঃ গ্রাহ্যাকারপূর্ব্বা স্মৃতিঃ। সা চ দ্বয়ী ভাবিত-স্মর্ত্তব্যা অভাবিত-স্মর্ত্তব্যা চ। স্বপ্নে ভাবিতস্মর্ত্তব্যা। জাগ্রৎ সময়ে ত্বভাবিত-স্মর্ত্তব্যেতি। সর্ব্বাঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা স্মৃতীনামনুভবাৎ প্রভবন্তি।"

চিত্ত কাহার স্মরণ করে? কেবল প্রত্যয় অর্থাৎ অনুভব মাত্রের স্মরণ করে? অথবা কেবল অনুভূত বিষয়ের স্মরণ করে? পূর্ব্বে যদি ঘটজ্ঞান হইয়া থাকে তবে স্মরণ কালে কি সেই জ্ঞান মাত্রের স্মরণ হয়, অথবা কেবল ঘটের স্মরণ হয়। এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিষয় ও প্রত্যয় এই উভয়েরই স্মরণ হয়। কেন তাহা বুঝাইতেছেন—'আমাদের প্রত্যয় অর্থাৎ অনুভব বা জ্ঞান—গ্রাহ্যোপরক্ত। গ্রাহ্য—জ্ঞানের বিষয় (ঘটাদি), তাহা দ্বারা উপরক্ত, অর্থাৎ আমাদের যে সকল বস্তুর জ্ঞান হয়, আমাদের জ্ঞান সেই বস্তুর আকারে পরিণত হয় সুতরাং আমাদের অনুভব (প্রত্যয়) গ্রাহ্য ও গ্রহণ, জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞান, এই উভয় আকারেই প্রকাশমান, এক্ষণে দেখ, আমাদের অনুভব যখন অনুভূয়মান বিষয়ের আকারে পরিণত, তখন সেই অনুভূয়মান বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অনুভবের স্বতন্ত্রভাবে সত্তা নাই। আরও দেখ, আমাদের প্রথম অনুভব যখন জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই উভয়াকার-সংশ্লিষ্ট, তখন উহা হইতে উৎপন্ন সংস্কারগুলিও জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই উভয়াত্মক হয়। ঐ সকল সংস্কার আবার আপনার ব্যঞ্জক

বা উদ্বোধক কালাদি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই উভয়াত্মিকা স্মৃতিরই উদ্ভাবন করে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অনুভব—জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই উভয়াত্মক, স্মৃতিও—জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই উভয়াত্মক, তবে অনুভব ও স্মৃতি এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? ভাষ্যকার বলিতেছেন, হাঁ দুইটিই উভয়াত্মক হইলেও ইহাদের মধ্যে একটি মহৎ প্রভেদ আছে, তাহা এই যে, বুদ্ধি বা অনুভব গ্রহণাকার-পূর্ব্বা এবং স্মৃতি গ্রাহ্যাকার-পূর্ব্বা। অনুভব বা বুদ্ধিকে গ্রহণাকার পূর্ব্বা বলা হইয়াছে। গ্রহণাকার-পূর্ব্বা অর্থ জ্ঞান বিশেষ্যক। গ্রহণ শব্দের অর্থ জ্ঞান। অনুভব বা বুদ্ধিতে জ্ঞান বিশেষ্যাকারে প্রতীয়মান হয়। দেখ অনুভবের উদাহরণ 'আমার ঘট-বিষয়ক জ্ঞান আছে, বা হইতেছে।' এখানে দেখ, জ্ঞান বিশেষ্য এবং ঘট বিশেষণ। আমার জ্ঞানটী কেমন হইয়াছে? না, ঘট বিষয়ক। স্মৃতির নাম করিলেন গ্রাহ্যাকার পূর্ব্বা। গ্রাহ্য বলিতে জ্ঞেয় পদার্থ ঘটাদি [illegible] গ্রাহ্য, জ্ঞেয় (ঘটাদি) যখন বিশেষ্য রূপে প্রতীয়মান হয়, তখন স্মৃতি হয়। স্মৃতির উদাহরণ দেখ 'সেই ঘট, সেই কি না পূর্ব্ব জ্ঞাত, অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম সেই ঘট' পূর্ব্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত ঘট। এখানে ঘট বিশেষ্য এবং পূর্ব্ব জ্ঞান বা অনুভব তাহার [illegible] হইয়াছে [illegible] না, পূর্ব্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত। এখানে পূর্ব্বজ্ঞান দ্বারা ঘটকে বিশেষিত করা হইয়াছে এই নিমিত্ত ঘট বিশেষ্য।

সেই স্মৃতি আবার দুই প্রকার। (১) ভাবিতস্মর্ত্তব্যা, (২) অভাবিত স্মর্ত্তব্যা। ভাবিতস্মর্ত্তব্যার অর্থ যে স্মৃতি দ্বারা স্মর্ত্তব্য অর্থ সূচিত হয়। এইরূপ স্মৃতি স্বপ্নকালে উৎপন্ন হয়, কারণ, শাস্ত্রে কোন কোন স্বপ্ন ভবিষ্যৎ অর্থের সূচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বপ্নে যাহা দৃষ্ট হয় তাহা স্মর্ত্তব্য, কেবল স্মৃতির বিষয় হয়। অভাবিত-স্মর্ত্তব্যার অর্থ, ভাবিত-স্মর্ত্তব্যা ভিন্ন। ইহা জাগ্রদবস্থার স্মৃতি, জাগ্রৎ অবস্থায় কোন ভাবি অর্থের স্মরণ হয় না। প্রমাণাদি সমুদয় বৃত্তি জন্য অনুভূত পদার্থ স্মরণের বিষয় হওয়ায় এই বৃত্তিকে অপর বৃত্তির পরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

'মণিপ্রভা' নামক বৃত্তিকার বলেন, অনুভব হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয়। অতএব অনুভব স্মৃতির পিতা। পুত্র যেমন পিতার বিষয় অধিকার করে, সেইরূপ স্মৃতিও অনুভবের বিষয়কে অধিকার করে। অনুভব শব্দের অর্থ

বোধ। বোধ হইতে সংস্কার উৎপন্ন হয়। সেই সংস্কার হইতে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের পুনর্ব্বার যে অনুভব হয়, তাহার নাম স্মৃতি।

যে পাঁচ প্রকার বৃত্তির নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল, তাহাদের সকলেরই স্বরূপ বলা হইল। বোধ হয় পাঠকগণও বুঝিতে পারিলেন, বৃত্তিগুলি কি। এই সকল বৃত্তিরই নিরোধ করা উচিত, কারণ ইহারা সকলেই সুখ দুঃখ মোহময়। এক্ষণে বলিতে পার, দুঃখ ও মোহময় বৃত্তিগুলিকে রোধ করিতে হয় কর, সুখময় বৃত্তিগুলিকে রোধ করিতে চাও কি বলিয়া? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন 'এতে ক্লেশেষু ব্যাখ্যেয়াঃ।' ক্লেশ সূত্রের ব্যাখ্যার সময় ইহাদের সকলকেই ক্লেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সে স্থলে সুখকে অভিলাষের জনক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যে বিষয়ে যত সুখ পাওয়া যায়, তত সেই বিষয় ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, সুখ অনুসারেই বিষয় ভোগের ইচ্ছা প্রবল হয়। কাজেই সুখই দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। অতএব দুঃখের ন্যায় সুখও পরিত্যাজ্য; আর যাহাতে কখন সুখ অনুভূত না হইতে পারে, এই নিমিত্ত সুখোৎপাদক বৃত্তি সকলের একেবারেই নিরোধ করা উচিত। যখন সুখানুভাবক বৃত্তিই নিরোদ্ধব্য বলিয়া যুক্তিসিদ্ধ হইল, তখন দুঃখ ও মোহময় বৃত্তিগুলি যে অগ্রে নিরোদ্ধব্য সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

পদচ্ছেদঃ। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং, অভ্যাসশ্চ বৈরাগ্যঞ্চ তে, তাভ্যাম্ তাসাং নিরোধঃ।

অন্বয়ঃ। অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ তাসাং চিত্তবৃত্তীনাং ক্লিষ্টরূপাণাং নিরোধঃ সিধ্যতীতিশেষঃ

পদার্থঃ। অভ্যাসো নাম বক্ষ্যমাণশ্চিত্তস্যৈকাগ্রতায়াং ধারাপ্রবাহী যত্নবিশেষঃ, বৈরাগ্যঞ্চ রাগাভাবঃ, বিষয়প্রবাহমুখতেতি যাবৎ, তাভ্যাং করণাভ্যাং তাসাং চিত্তবৃত্তীনাং নিরোধঃ অবরোধনং ব্যাপারনিবৃত্তিরিতি যাবৎ।

ভাবার্থঃ। অগ্রে ব্যাখ্যাস্যমানাভ্যামভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তাসাং প্রকাশ-বৃত্তি-নিয়ম-রূপাণাং চিত্তবৃত্তীনাং নিরোধঃ, প্রতিহননং, বিনিবৃত্তঃ বাহ্যাভিনিবেশানাং তাসামন্তর্মুখতয়া স্বকারণে চিত্তএব শক্তিরূপতয়াহ

বস্থানং ভবতীতি শেষঃ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তাশ্চিত্তবৃত্তয়ো বাহ্যবিষয়েভ্যো বিনিবৃত্তব্যাপারাশ্চিত্ত এব প্রলীনাস্তিষ্ঠন্তীতিভাবঃ। তত্র বিষয়দোষ দর্শনজেন বৈরাগ্যেণ বিষয় বৈমুখ্য মুৎপাদ্যতে, অভ্যাসেন চ সুখজনকশান্তপ্রবাহপ্রদর্শনদ্বারেণ দৃঢ়ং স্থৈর্য্যমুৎপাদ্যতে, ইত্যাভ্যাং ভবতি চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

অনুবাদ। অভ্যাস, চিত্তের একাগ্রতা সাধক ধারা প্রবাহী যত্ন বিশেষ; এবং বৈরাগ্য, বিষয় ভোগ হইতে পরাঙমুখতা, এই উভয় উপায় দ্বারা পূর্ব্বোক্ত চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধ হয়। অর্থাৎ এই উভয় উপায় দ্বারা তাহারা স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্তঃকরণে লীন ভাবে অবস্থান করে।

সমালোচন —অভ্যাস এবং বৈরাগ্য কাহাকে বলে, তাহা গ্রন্থকার স্বয়ং পরেই এক একটি সূত্র দ্বারা যথাক্রমে ব্যক্ত করিতেছেন, সুতরাং তাহা এখানে বলা অনাবশ্যক। চিত্তবৃত্তির নিরোধ কাহাকে বলে, তাহাও আমরা এক প্রকার বলিয়া আসিয়াছি কেবল তাহা স্মরণ করাইবার জন্য এখানে এই বলিলেই হইবে যে বৃত্তি গুলির বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ উন্মূলন দ্বারা তাহাদিগকে ক্রিয়-শূন্য করিয়া অন্তঃকরণে প্রলীন ভাবে অবস্থাপনের নাম নিরোধ। বৃত্তিদিগের উক্ত রূপ ক্রিয়া শূন্য অবস্থা করিবার নিমিত্ত দুইটি মাত্র উপায় আছে। প্রথম, অভ্যাস, দ্বিতীয়, বৈরাগ্য। অভ্যাস দ্বারা চিত্তের সুদৃঢ় স্থৈর্য্য সম্পাদন করা হয়, এবং বৈরাগ্য দ্বারা বিষয় ভোগের অভিলাষ হইতে চিত্তকে বিমুখ করা হয়। অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই উভয় মিলিত হইয়াই বৃত্তিদিগের নিরোধ সাধন করে। কেবল অভ্যাস বা কেবল বৈরাগ্য কখনই বৃত্তিদিগের নিরোধ সাধনে সক্ষম হয় না। এই কথা ভাষ্যকার একটি রূপক দ্বারা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—

"চিত্তনদী নামোভয়তো বাহিনী, বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ। যাতু কৈবল্য প্রাগ্‌ভারা বিবেক-বিষয়-নিম্না সা কল্যাণবহা, সংসার প্রাগ্‌ভারাঽবিবেক বিষয়-নিম্না পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে, বিবেক দর্শনাভ্যাসেন বিবেক-স্রোত উদ্‌ঘাট্যতে ইত্যুভয়াধীনশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

চিত্ত একটী নদীর স্বরূপ, যেমন নদী সমুদ্রের জোয়ার ও ভাটা এই দুই রূপ গতি লক্ষিত হয়, কখন সমুদ্রাভিমুখে এবং কখন বা তাহার বিপরীত দিকে যায়, চিত্ত নদীরও সেইরূপ দুইটী বিপরীত প্রবাহ লক্ষিত হয়; কখন উহা মঙ্গলময় মোক্ষ অভিমুখে, আর কখন বা এই পাপসঙ্কুল সংসারের দিকে গমন করে। এই চিত্তনদী যখন মোক্ষাভিমুখী হয়, তখন বিবেক রূপ প্রণালী বা নির্গম মার্গদ্বারা প্রবাহিত হয়; আর যখন সংসারাভিমুখী হয়, তখন অবিবেক রূপ প্রণালী দ্বারা বহিয়া যায়। যেমন পর্ব্বতাদি কোন আগন্তুক প্রতিবন্ধ ঘটিলে নদীর বেগের হ্রাস হয়, সেইরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে চিত্তনদীর সংসারগামী স্রোত ক্রমশ কমিয়া পড়িতে থাকে। আর যেমন একটা নদীর প্রবাহে আর একটা নদীর প্রবাহ আসিয়া পড়িলে, প্রথম প্রবাহকে বলবৎ করে, সেইরূপ অভ্যাস দ্বারা বিবেকগামী চিত্তনদীর স্রোত পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়। অতএব চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণভাবে নিরোধ করিতে হইলে অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই উভয়েরই আবশ্যকতা আছে। উপরি উক্ত রূপকের মর্ম্ম এই যে, আমাদের চিত্তের স্বভাবতঃ সৎ ও অসৎ এই উভয়দিকেই প্রবৃত্তি আছে, উহাদের মধ্যে বৈরাগ্য দ্বারা অসৎ প্রবৃত্তি সকলের হ্রাস হয়, কিন্তু ঐ অসৎ প্রবৃত্তির হ্রাসের সহিত যদি সৎ প্রবৃত্তির বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে ঐ হ্রাস কোন কার্য্যেরই হয় না। হয়ত অল্পক্ষণ মাত্র এই অবস্থা থাকিয়া আবার অসৎ প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হইতে পারে। এই নিমিত্ত যে পরিমাণে অসৎ প্রবৃত্তির হ্রাস হইবে, সেই সঙ্গেই সেই পরিমাণে সৎ প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। সৎ প্রবৃত্তির বৃদ্ধির প্রতি একমাত্র অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুশীলনই কারণ; বৈরাগ্য বশতঃ অসৎ প্রবৃত্তি একেবারে নির্ম্মূল হইলে এবং অভ্যাস দ্বারা সৎ প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ বৃদ্ধিলাভ করিলে আমাদের অন্তঃকরণ কেবল সত্ত্বময় হইয়া স্থির সুখভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্থির ভাব ধারণ করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নদীর তরঙ্গের মত বৃত্তি সকল অন্তঃকরণের তরঙ্গ স্বরূপ। নদী স্থির হইলে যেমন তরঙ্গ সকল অদৃশ্য হয়, তেমনি অন্তঃকরণ স্থির ভাব ধারণ করিলে বৃত্তি সকলও অদৃশ্য হয়।

মণি-প্রভা নামক বৃত্তিকার বলেন, মনুষ্যের চিত্তনদী স্বভাবতঃ সংসারাভিমুখী বৈরাগ্য বলে উহার সেই সংসারাভিমুখ স্রোত রুদ্ধ হয়;

এবং বিবেকাভ্যাস বশত ঐ স্রোত আবার সংসারের বিপরীত অর্থাৎ মোক্ষাভিমুখে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। যদি অভ্যাস না থাকিত তাহা হইলে বৈরাগ্য প্রভাবে চিত্তের সংসারাভিমুখ প্রবাহের নিরোধ হওয়ায়, হয় ত, চিত্ত কেবল সর্ব্বদা নিদ্রাভিভূত হইয়াই থাকিত। এই নিমিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই উভয়ই চিত্তের নিরোধ সাধনের উপায়।

অভ্যাস কি, বলিতেছেন:—

তত্র স্থিতৌ যত্নো২ভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

পদচ্ছেদঃ।—তত্র, স্থিতৌ, যত্নঃ, অভ্যাসঃ।

অন্বয়।—স্পষ্টম্।

পদার্থঃ—তত্র অভ্যাস বৈরাগ্যযোর্ম্মধ্যে স্থিতৌ (বৃত্তিরহিতস্য চিত্তস্য স্বরূপনিষ্ঠ পরিণামঃ প্রশান্তবাহিতা, একাগ্রতারূপবৃত্তি ধারেতি যাবৎ স্থিতিঃ) তত্রস্থিতৌ (নিমিত্তার্থে সপ্তমী, স্থিতিং প্রাপ্তু মিত্যর্থঃ) যত্নং উৎসাহঃ পুনঃ পুনঃ স্থিতিসাধনা২নুষ্ঠান মিতিযাবৎ, স অভ্যাসঃ, তাদৃশস্য যত্নস্য অভ্যাস ইতি সংজ্ঞা।

ভাবার্থ।—চিত্তস্যৈকাগ্রতাং সাধয়তি পুনঃপুনঃ যঃ প্রযত্নঃ ক্রিয়তে সএবাভ্যাসঃ।

অনুবাদ—স্থিতি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা সাধনের নিমিত্ত বারম্বার যে প্রযত্ন করা হয়, তাহার নাম অভ্যাস।

সমালোচনা।—এই সূত্রে বিশেষ আলোচনার বিষয় কিছুই নাই। কেবল স্থিতি ও যত্ন এই দুইটি শব্দের অর্থ ভাল করিয়া জানিতে পারিলেই আর কিছুই আপত্তি থাকে না। এইজন্য ভাষ্যকার ঐ দুইটি শব্দের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

'চিত্তস্যাবৃত্তিকস্য প্রশান্তবাহিতা স্থিতিঃ, তদর্থঃ প্রযত্নঃ বীর্য্যমুৎসাহঃ তৎসংপিপাদয়িষয়া তৎসাধনা২নুষ্ঠা নম্'—

অবৃত্তিক, বৃত্তিশূন্য, অর্থাৎ রাজস তামস বৃত্তি রহিত, চিত্তের যে প্রশান্ত বাহিতা, হর্ষ শোকাদি তরঙ্গের অভাব হেতুক স্থির বা একাগ্র ভাবে অবস্থান, তাহার নাম স্থিতি। সেই স্থিতি, অর্থাৎ তাদৃশ একাগ্রতা, লাভের নিমিত্ত যে প্রযত্ন, উৎসাহ,—অর্থাৎ যে সকল উপায়ে ঐ স্থিতি সম্পাদিত হয়, সেই সকল উপায়ের যে বারম্বার অনুষ্ঠান তাহার নাম

প্রযত্ন। নির্ব্বিকার চিত্তের স্বাভাবিক নিশ্চল ভাবে থাকার নাম স্থিতি; এবং যে যে উপায়ে চিত্ত বরাবর ঐরূপ নিশ্চলভাবে থাকিতে পারে, নিরন্তর সেই সকল উপায় অবলম্বন করাই প্রযত্ন। ঐ প্রযত্নকেই অভ্যাস বলা যায়।

মণি-প্রভা নামক বৃত্তিকার বলেন, 'রজস্তমোবৃত্তিশূন্যায়া চিত্তস্যৈকাগ্রতা স্থিতিঃ, তস্যাং কার্য্যায়াং যানি সাধনানি যম নিয়মাদীনি, তদ্বিষয়ঃ প্রযত্নোহনুষ্ঠান—মভ্যাস ইত্যর্থঃ।

রাজস এবং তামস বৃত্তিশূন্য চিত্তের একাগ্রতাকে স্থিতি বলা হয়। সেই স্থিতি লাভ করিবার নিমিত্ত যে সকল যম নিয়ম আদি উপায় পরে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল উপায় অবলম্বন করিবার নিমিত্ত যে যত্ন, অর্থাৎ বারম্বার সেই সকল উপায়ের অনুষ্ঠান, তাহাকে অভ্যাস বলে।

যদি বল, আমাদের মনে রাজস তামস বৃত্তি সকলের সংস্কার সেই অনন্ত-কাল হইতে প্রবলভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহারা চিত্তের একাগ্রতা সাধনের সম্পূর্ণ বিরোধী। অতএব সেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যমান থাকিতে অভ্যাস কি প্রকারে একাগ্রতা সাধনে সমর্থ হইবে? এই আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ পতঞ্জলি পর সূত্রের উপন্যাস করিতেছেন।

সতু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ। ১৪॥

পদচ্ছেদঃ।—স, তু, দীর্ঘকাল, নৈরন্তর্য্য, সৎকার, আসেবিতঃ, দৃঢ়-ভূমিঃ।

পদার্থঃ।—সঃ অভ্যাসঃ তু (চ, হি, বা), দীর্ঘকালঃ বহুকালঃ, নৈরন্তর্য্যং, অবিচ্ছেদঃ; সৎকারঃ, আদরঃ, আসেবিতঃ, সেব্যমানঃ, দীর্ঘকালশ্চ, নৈরন্তর্য্যং, সৎকারশ্চ, তৈ রাসেবিতঃ, দৃঢ়ভূমি রনৈর্য্যবনভিভবনীয়ঃ।

অন্বয়ঃ।—স তু অভ্যাসঃ দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতশ্চেৎ দৃঢ়-ভূমির্ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ।—"দ্বন্দ্বাৎপরঃ শ্রূয়মানঃ শব্দঃ প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে" ইতি ন্যায়াৎ আসেবিতেতিপদেন দীর্ঘকালাদেঃ প্রত্যেকস্যাহন্বয়স্তথাহি দীর্ঘকালা-সেবিতঃ, নৈরন্তর্য্যাসেবিতঃ, সৎকারাসেবিত ইতি বিভাগঃ। স অভ্যাসঃ যদা দীর্ঘকালাসেবিতোভবেৎ, বহুকালপর্য্যন্তঃ সেব্যমানোভবেৎ নৈরন্তর্য্যেণ অবিচ্ছেদেন সেব্যমানোভবেৎ, তথা তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া চ

আসেবিতঃ সম্পাদ্যমানোভবেৎ তদা দৃঢ়ভূমির্ভবেৎ দার্ঢ্যায় প্রভবতীত্যর্থঃ, তদা ন কোঽপি স স্বাবস্তমভ্যাসং নিবারয়িতুং শক্নুয়াদিতি ভাবঃ।

অনুবাদ —সেই অভ্যাস বহুকাল পর্য্যন্ত অনবরত তপস্যাদি সৎকার্য্য জ্ঞান ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলে অতিশয় দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। সেই অভ্যাস আর কিছুতেই বিচলিত হয় না।

সমালোচন। এক আধ দিনের অভ্যাস বৃত্তান্তরের প্রাবল্য-বশত নিবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু যদি বহুকাল পর্য্যন্ত একাদিক্রমে তপশ্চরণ, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন প্রভৃতি সংযমের জ্ঞান পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে অভ্যাস একেবারে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, আর কোনরূপ প্রতিকূল বৃত্তিতে অভিভূত হইয়া স্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় না। মণিপ্রভা নামক বৃত্তিকার বলেন, সূত্রে যে 'তু' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, উহা পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা নিবারণার্থ, তদ্ভিন্ন ইহার আর কিছুই অর্থ নাই।

অভ্যাসের পর বৈরাগ্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। ১৫ ॥

পদচ্ছেদঃ।—দৃষ্ট, আনুশ্রবিক, বিষয়, বিতৃষ্ণস্য, বশীকার, সংজ্ঞা, বৈরাগ্যম্।

দৃষ্টশ্চানুশ্রবিক-শ্চেতি বিশেষণ সমাসঃ দৃষ্টানুশ্রবিকৌ বিষয়ৌ ইতি কর্ম্মধারয়ঃ, তত্র বিতৃষ্ণঃ বিগতা তৃষ্ণা যস্য সঃ তস্য।

পদার্থঃ।—দৃষ্টঃ, ইহৈবোপলভ্যমানো গন্ধমাল্যাদিভোগ্যবস্তুনিচয়ঃ, আনুশ্রবিকঃ অনুশ্রূয়তে গুরুমুখাদিত্যনুশ্রবো বেদঃ, তত আগতঃ তৈর্নিরূপিত ইত্যর্থ আনুশ্রবিক—বিষয়ঃ স্বর্গাদিঃ তয়োর্বিতৃষ্ণস্য তৎপ্রাপ্ত্যভিলাষশূন্যস্য বশীকারসংজ্ঞা—মমৈতে বশ্যা নাহমেতেষাং বশ্য ইত্যাকারক-পরামর্শঃ, বিরাগস্য ভাবঃ বৈরাগ্যম্।

অন্বয়ঃ।—স্পষ্টম্।

ভাবার্থঃ। বিষয়ো দ্বিবিধঃ, দৃষ্টঃ, আনুশ্রবিকশ্চ দৃষ্ট-বিষয়া নাম সংসারে অনুভূয়মান স্রক্চন্দনবনিতাদয়ঃ আনুশ্রবিকাশ্চ বেদাদিভির্নিরূপিতাঃ স্বর্গাদয়ঃ, তেষাং বিষয়াণাং দোষাবলোক্য তত্র বীতাঽভিলাষং যোগিনঃ বিষয়া মমৈব বশ্যাঃ নাহং বিষয়ানামিত্যাকারকং যৎ স্বাধীনং চিত্তং বর্ত্ততে তদেব বৈরাগ্যম কথ্যত ইতি শেষঃ। রাগাঽভাবমাত্রং বৈরাগ্যং ন নিরোধহেতু-

রোগাদি নিমিত্তকাহরুচিতো যোগাঙ্গমুদয়াৎ। দোষদর্শন-জন্য-রাগাভাবোহপি ন নিরোধ হেতুঃ, দোষদর্শনজবৈরাগ্যাদনন্তরমপি বিষয়-সান্নিধ্যেন চিত্তক্ষোভতঃ সৌভর্য্যাদের্যোগাঙ্গনিষ্পত্তেশ্চ। অতোহত্র বৈরাগ্যস্য বৈতৃষ্ণ্যমাত্রং ন লক্ষণং কিন্তু যথোক্ত বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞোক্ত।

অনুবাদ।—দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভূয়মানসাংসারিকভোগ্য-বস্তু, আনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র নিরূপিত-পারলৌকিক-স্বর্গাদি বিষয়, এই উভয়বিধ বিষয়ের দোষ দর্শন করিয়া উহাদিগের প্রতি অভিলাষ-শূন্য ব্যক্তির স্বচিত্তের বশীকরণ অর্থাৎ স্বাধীনতা উৎপাদনের নাম বৈরাগ্য।

সমালোচন।—আমরা এই সংসারে দুই প্রকার লোক দেখিতে পাই। একজন কেবল ঐহিক সুখের জন্য লালায়িত, ভাল খাইব, ভাল পরিব, টাকা জমাইব, বাড়ী বনাইব, নাম কিনিব, যশ পাইব, ইত্যাদি। ইহারা সকলে যে সকল ভোগের নিমিত্ত লালায়িত, সেই সকল ভোগের নাম দৃষ্ট। আবার এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের কেবল দেবদুর্গে ৎসব প্রভৃতি কার্য্য করিব এই বুদ্ধি, তাঁহারা ইহলৌকিক সুখে পরাঙ্মুখ, কেবল পারত্রিক সুখের জন্য লালায়িত, স্বর্গভোগ করিব, নন্দন বনে অপ্সরা লইয়া ক্রীড়া করিব, অমৃত খাইব, এই সকল আশায় তাঁহারা মোহিত, বাজেই সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া যাগযজ্ঞ করিতে ব্যতিব্যস্ত। ঐহিক ভোগও বিষয়, পারত্রিক ভোগও বিষয়। সুতরাং উভয় প্রকার ভোগেচ্ছুকেই বিষয়ী বলা যাইতে পারে। কিন্তু যে সকল তত্ত্বদর্শী সাধু ব্যক্তি এই উভয়বিধ বিষয়কে দুঃখ সংশ্লিষ্ট দেখিয়া তাহাদের উপর বীতরাগ হইয়া মনকে আপনার বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, অর্থাৎ আপনার ইচ্ছায় সেই সকল বিষয়ের আপাত-মধুর প্রলোভন হইতে অপসৃত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা বিরাগী এবং তাঁহাদের সেইরূপ চিত্তকে স্ববশে আনাকে বৈরাগ্য বলা হয়।

মহর্ষি পতঞ্জলি কেবল বিষয় বিতৃষ্ণাকে বৈরাগ্য বলিলেন না, কারণ অনেক সময় আমাদের রোগাদি দ্বারা অনেক বিষয়ে অরুচি জন্মে, কিন্তু সে অরুচি বৈরাগ্য নয়। বিষয়ের দোষ দেখিয়া অনেক সময়ে বিষয়ে বিতৃষ্ণা হয় বটে, মৃত স্ত্রীর দাহ করিতে করিতে বোধ হয় এইত সংসার! আর ইহাতে মগ্ন হইব না, আর বিবাহ করিব না, কিন্তু সে বিতৃষ্ণা অতি অচিরস্থায়ী। দুদিন যাইতে না যাইতে কেবল বিবাহ করা হয়, এমন নয়,

পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণবেগে সংসার করিতে প্রবৃত্ত হই। তাই মহর্ষি পতঞ্জলি বলিলেন, বিষয়ের দোষ দেখিয়াই হৌক আর না দেখিয়াই হৌক, বিতৃষ্ণা মাত্রকে বৈরাগ্য বলা যাইতে পারে না। কারণ আবার প্রলোভনে পড়িয়া বিষয় তৃষ্ণা প্রবল হইতে পারে। অতএব সেইরূপ বিতৃষ্ণার পর চিত্তকে যে স্ববশে স্থাপন করা, আর প্রলোভনের অধীন হইতে না দেওয়া, তাহার নাম বৈরাগ্য। বিষয়ের দোষ মণি প্রভা নামক বৃত্তিতে উল্লিখিত হইয়াছে। সে গুলি এই। বিনাশ (বিষয়ের ধ্বংস), পরিতাপ (অপ্রাপ্তি বা ক্ষতি নিবন্ধন মানসিক দুঃখ ইত্যাদি), অতিশয় আধিক্য (একজনের বেশী একজনের কম) ও অসূয়া ইত্যাদি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি চিত্ত বৃত্তির নিরোধের নামই যোগ। চিত্ত বৃত্তির নিরোধ কিছু সহজ নয়। অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই দুইটী একত্রিত হইলে তবে চিত্ত বৃত্তির নিরোধ হয়। আজকাল যোগ যত সুলভ হইয়াছে, বাস্তবিক আসল যোগপদার্থ এরূপ জলযোগের মত সুলভ নয়। ইহার অনুষ্ঠান করিতে অনেক সময় এবং অনেক মানসিক বলের আবশ্যক। অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের লক্ষণ ভাল করিয়া আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন, যোগানুষ্ঠান কত বড় কঠিন। চিত্তকে এইরূপ করা চাই যে সহস্র সহস্র প্রলোভনের বস্তু দেখিলেও চিত্ত না বিচলিত হয়। যাহাদের দোকানে মিষ্টান্ন দেখিলে পথ দিয়া যাইতে যাইতে জিহ্বাগ্র লালাকীর্ণ হয়, তাহাদের পক্ষে প্রবল প্রলোভন হইতে চিত্তকে বাঁচাইয়া রাখা একটা কম কথা নয়। তাহার নিমিত্ত অধিক অন্তঃসারের প্রয়োজন। বৈরাগ্য হইলে ক্রমশ চিত্তের স্থিরতা জন্মিবে। ঐ স্থিরতাকে আবার স্থায়ী করিতে হইবে, তবে নিরোধ হইবে। এগুলি কথায় বলিতে তাদৃশ কঠিন বোধ না হইলেও হইতে পারে, কাজে করা বড় কঠিন।

পরিশেষে ভাষ্যকার বৈরাগ্যের বিষয় যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা সানুবাদ উদ্ধৃত করিব:—

"স্ত্রিয়োঽন্নপান মৈশ্বর্য্য মিতি দৃষ্ট-বিষয়-বিতৃষ্ণস্য স্বর্গ বৈদেহ্য-প্রকৃতি লয়ত্ব প্রাপ্তাবানুশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণস্য দিব্যাদিব্য বিষয় সংযোগেঽপি চিত্তস্য বিষয় দোষ দর্শিনঃ প্রসংখ্যানবলাদনাভোগাত্মিকা হেয়োপাদেয় শূন্যা বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।"

স্ত্রী, অন্ন, পানীয়, ঐশ্বর্য্য, এই সকল দৃষ্ট বিষয়ে তৃষ্ণা-শূন্য—স্বর্গ, বৈদেহ্য, (লিঙ্গ শরীর দ্বারা বিষয় ভোগিতা), এবং প্রকৃতি-লয়তা প্রাপ্তি রূপ আনু শ্রবিক বেদোক্ত বিষয় হইতে বিতৃষ্ণ ব্যাক্তির দিব্য এবং অদিব্য বিষয়ের সান্নিধ্যেও, বিষয়ের দোষ দর্শন করত চিত্তের যে ভোগে উপেক্ষা বুদ্ধি তাহার নাম বৈরাগ্য।

সরস্বতী পূজা।

১।

এস মা ভারতি রাণি! এস দয়াবতি!
এই সে পঞ্চমী তিথি, লইয়া ভকতি প্রীতি,
পূজিতে এসেছে আজ সন্তান সন্ততি।
কত আশা মনে মনে, নিবেদিব ও চরণে,
তুমি যে প্রসন্না চির ভারতের প্রতি।
তোমারি মমতা স্নেহে, ভারতের মৃত দেহে,
এখনো জীবন চিহ্ন আছে ভগবতি!
এখনো এখনো প্রাণ, হয় নাই অবসান,
লইয়া অমৃত-বীণা এস সরস্বতি!
তুমি যে প্রসন্না চির ভারতের প্রতি!

২।

লইয়া অমৃত-বীণা এস বীণাপাণি।
কে বলে গো ছিন্ন-তার, ভাঙ্গা বীণা মা তোমার,
কে বলে ও নবরাগে জাগে না ধমনী?

তোমারি বীণার গানে, তোমারি বীণার তানে,
ভারত আকাশে উঠে শশী দিনমণি।
ভারতের ঋতু ছয়, ও ললিত রাগময়
বসন্তে কুসুম হাসে—মেঘে সৌদামিনী।
ভারতের লক্ষ লক্ষ, মৃণ্ময় বল্মীক-বক্ষ
কাঁপে ঘোর ভূকম্পনে এখনো জননি!
কি আছে ও সমাধিতে, বীণায় ঝঙ্কার দিতে
মোহ মূর্চ্ছা ভেঙ্গে চায় উঠিতে অমনি।
কি আছে ও ছাই মাখা, কি আছে ও ভস্মে ঢাকা,
কি আছে সুষুপ্ত শক্তি শ্মশান-শায়িনী,
কে জানে মা তুমি বিনা? বাজাও ভৈরবে বীণা,
ঢাল সে অমর সুধা মৃত-সঞ্জীবনী,
লইয়া অমৃত-বীণা এস বীণাপাণি।

৩।

এই যে মা মন্দ্রবাদ্যো—সাগরের কূলে,
মিলে মিশে ভাই ভাই,————দ্বেষ নাই, হিংসা নাই
করেছি বোধন তব ঘাট গিরি মূলে!
সিন্ধু বঙ্গ এক-স্বরে, ডাকিয়াছি মা তোমারে,
ভাঙ্গেনি কি দেবনিদ্রা? দেখ আঁখি খুলে
বাসন্তী পঞ্চমী ঊষা, পরিয়া বিনোদ ভূষা
সাজায়েছে উপবন মঞ্জরী মুকুলে।
কোকিল আকুলে গায়, ভারত ভাসিয়া যায়
অলির ললিত তান মাখা ফুলে ফুলে।
দিব প্রাণ—দিব মন, পূজিব মা শ্রীচরণ,
এসেছি সন্তানগণ পর ভাব ভুলে।
জেগেছে ত্রেতার আশা, সিন্ধু কূলে সে পিপাসা,
পার না ছলিতে আর নীলপদ্ম ফুলে।
যা চাহিবে দিব তাই, পঞ্চবিংশ কোটি ভাই!—

উপাড়ি ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব দিব পদ-মূলে।
এসেছি সন্তানগণ পর-ভাব ভুলে।

৪।

মা!

তোমারি বীণার গানে, তোমারি কৃপায়,
মান্দ্রাজ পাঞ্জাব বঙ্গ, ভারতের ছিন্ন অঙ্গ,
কেমন লাগিছে যোড়া স্নেহ মমতায়।
আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য, হয়ে গেছে এক-আত্ম
নুইয়া পড়েছে বিন্ধ্য মিশে মৃত্তিকায়।
যেন সবে এক জাতি, এক গোষ্ঠী এক জ্ঞাতি,
অপার ভারত বংশ সাগরের প্রায়।
ভারতের নদ নদী, বহিছে পৃথক যদি,
প্রণয়ের পারাবারে চিনা নাহি যায়।
তরঙ্গে তরঙ্গে আছে, এ উহার পাছে পাছে
উঠিছে পড়িছে যেন ধরে দু'জনায়।
অপার ভারত বংশ সাগরের প্রায়।

৫।

মা!

কে বলে ভারতবর্ষ গেছে রসাতল?
যদিও সরযূ তীরে, যদিও সরযূ নীরে
ডুবিয়াছে অযোধ্যার বীরেন্দ্র যুগল।
যদিও সে বীরধামে, নাহি কেহ বীর নামে,
হইয়াছে যোধ শূন্য অযোধ্যা কোশল।
নিশ্চিহ্ন হয়েছে কেতু, বিচ্ছিন্ন সাগরে সেতু,
গরবে উছলে আজ জলধির জল।
তথাপি মা আশা আছে, তোমার দয়ার কাছে,
হাসাইবে নব রবি উদয় অচল।
অতি ক্ষুদ্র পারাবার, বৃথা আস্ফালন তার
আবার পরিবে গজে পাষাণ শৃঙ্খল।

বান্ধিলে অকূল সিন্ধু, অতি ক্ষুদ্র জলবিন্দু
রাখিবে যে কহিনুর, ভুজে কত বল?
বিনিময়ে "পাঁচ জুতি" লইব কেবল।

৬।

মা!
কে বলে ভারতবর্ষ জাগিবে না আর?
কে বলে গো কুরুক্ষেত্রে, অতীত স্মৃতির নেত্রে,
দেখিয়া বর্ষিবে সদা নয়ন আসার।
গেছে বটে এক ভীষ্ম, উজলি নিখিল বিশ্ব
পালিবে না আর কেহ সত্য অঙ্গীকার?
মরি মরি হা কি লজ্জা, বীরের সে শর-শয্যা
দেখিয়া হবে কি ভীত চিত্ত সবাকার?
আর কোন্ ধনঞ্জয়, করিতে দানব জয়,
খুলিয়া শমীর শাখে ধনু আপনার,—
মেদিনী কম্পিত করি, কোদণ্ড গাণ্ডীব ধরি,
আর কি ভীষণ বলে দিবে না টঙ্কার?
তোমার দয়ার কাছে, অবশ্যই আশা আছে,
বাজাও মা সঞ্জীবনী বীণা একবার।
বাজাও ভৈরবে বীণা, দেখি দেখি বাঁচে কি না,
অযুত অর্জ্জুন ভীম বরি মার মার।
কে বলে ভারতবর্ষ জাগিবে না আর?

৭।

মা!
কে বলে ভারতবর্ষ জাগিবে না আর।
যে দেশে পথের ধূলি, বীরের মাথার খুলি
ছড়াইয়া পথে ঘাটে রাজপুতানার,
থর্ম্মপলি মারাথন, প্রতি গিরি প্রতি বন,
ভুবন ব্যাপিয়া যায় বীর অহঙ্কার,

যে দেশে লিওনিডাস, শিশু করে উপহাস,
যে দেশে জহর ব্রত বীর অঙ্গনার,
পর্ব্বতে প্রান্তরে মাঠে, আরাবল্লী, হলদি ঘাটে
নিশীথে এখনো বাজে বীর হুহুঙ্কার,—
বাজাইলে বীণা তুমি, এখনো সে মরুভূমি
ঝলসিবে প্রতাপের প্রিয় তরবার।
এখনো—এখনো আছে অমৃত ছুঁইলে বাঁচে
ক্ষত্রিয় পবিত্র রক্ত শ্মশানে তাহার,
বাজাও বাজাও বীণা, দেখি দেখি বাঁচে কি না
মৃত সঞ্জীবনী তানে জননী আমার।
কে বলে ভারতবর্ষ জাগিবে না আর?

৮।

মা!

কে বলে ভারতবর্ষ জাগিবে না আর!
তোমার বীণার গানে, তোমার বীণার তানে,
নিদ্রিতা সুষুপ্ত শক্তি জাগে পুনর্ব্বার।
ওই যে প্যাট্রিক ক্যাসে, ফিরিতেছে দেশে দেশে
কে জানে কি ভবিষ্যত সূচনা তাহার।
ত্যজিয়া অতুল ধন, ত্যজি প্রিয় পরিজন
জীবনের যত আশা করি পরিহার,
উন্মত্ত ক্ষিপ্তের মত, সাধে কি মহান ব্রত
উদাসী সন্ন্যাসী বেশে, ত্যজি নিদ্রাহার।
নহে রাজ্য ধন আশে, পঞ্জাবের অভিলাষে
পঞ্চ নদ সিংহাসন নাহি চাহে আর।
তোমারি বীণার গানে, এমন বৃদ্ধের প্রাণে
কি জানি তাড়িত শক্তি হয়েছে সঞ্চার।
কে বলে ভারতবর্ষ জাগিবে না আর?

৯।

মা!

বাজাও অমৃত বীণা গভীর গর্জ্জনে,
আরো ঘন ভ্রাতৃভাব, ভারত করুক লাভ,
মিশুক একত্রে সবে গাঢ় আলিঙ্গনে।
আরো হৌক আত্মীয়তা, এক সুখ, এক ব্যথা,
একত্রে করুক ভোগ একই জীবনে।
এক চিন্তা এক আশা, মনে মুখে এক ভাষা,
রাখুক সকলে প্রাণ, এক প্রয়োজনে।
সংকল্প, সাধনা, পণ, এক আত্মা, এক মন,
ভারত ব্যাপিয়া থাক গিরি নদী বনে।
মমতা বর্ষক মেঘে, উদ্দাম ঝটিকা বেগে,
ভাসুক ভারত ভাগ্য গগনে গগনে।
দয়াকর শ্বেত ভুজা, শিখুক মায়ের পূজা
পতিত ভারতবর্ষ আত্ম বিসর্জ্জনে,
রাখুক সকলে প্রাণ এক প্রয়োজনে।

১০।

বাজাও অমৃত বীণা জননী আমার।
সমাজের দুর্দ্দশায়, যে দুঃখ ভারত পায়,
সামান্য ভাষায় তাহা নহে বলিবার।
দেখে না, শোনে না কেহ, ঘৃণায় এ মৃতদেহ
বরষে জলদ কত আঁখি জল তার।
হায় হেন শোকে তাপে, কেমনে জীবন যাপে,
নিয়ত এমন যার গৃহে হাহাকার?
তোমার বীণার গানে, কঠিন পাষাণ প্রাণে
কর গো করুণাময়ী চেতনা সঞ্চার।
যেন গো সকলে মেলি, শত যত্নে তুলে ফেলি
অসংকোচে সমাজের পাপ দুর্নিবার,
না হয় কুণ্ঠিত ভীত হৃদয় কাহার॥

১১।

বাজাও অমৃত বীণা, বাজাও জননি !
পবিত্র ভারত ধামে, আর যেন ধর্ম্ম নামে
করে না প্রচার কেহ জাল হিন্দুয়ানি !
না বাড়ায় বৈরিভাব, আত্মদ্রোহ মহাপাপ
যে পাপে এখনো মৃত রয়েছে জননী।
যে ধর্ম্মে জননী মরে, মিত্রতা বিনাশ করে,
চাহিনা শুনিতে আর সে ধর্ম্ম কাহিনী।
কর সেই ধর্ম্মব্যাখ্যা, দেও সেই ধর্ম্ম শিক্ষা,
না আছে যাহাতে ভেদ হিন্দু মুসলমানি।
ভারত জুড়িয়া ভাই, ভাই ছাড়া কেহ নাই,
মায়ের সন্তান সবে এই মাত্র জানি।
বুঝাও সে প্রেম বেদ, ঘুচে যাক্ ভেদাভেদ
ভারতে জাতীয় ধর্ম্ম ভ্রাতৃ সম্মিলনী,
হিম গিরি গারো হিলে, বিন্ধ্য ঘাট গিরি নীলে,
কোলাকুলি কোলে ভীলে,—হোক জয়ধ্বনি।
ভারতে জাতীয় ধর্ম্ম—'ভ্রাতৃসম্মিলনী।"

১২।

এস মা ভারতি বাণি ! তোমারি কৃপায়,—
তোমারি চরণ স্পর্শে, পতিত ভারতবর্ষে
কোমল ঊষার আলো দূরে দেখা যায়।
তোমারি মা রাঙ্গা পদে, ও কনক কোকনদ
নবীন জীবন জ্যোতিঃ ভারতে ছড়ায়।
যুগে যুগে অবিরত, যে রবি ডুবিল কত,
ভারতের ঘোরতম নিশি তমসায়,
তোমারি চরণতলে, উঠে মা সে কুতূহলে
ভারতে বাসন্তী শুক্লা পঞ্চমী ঊষায়।
জ্ঞানদা মোক্ষদা বাণি, এস দেবী বীণাপাণি

অর্পিব অঞ্জলি আজি ও কোমল পায়,
ভারতেব পুণ্য দিন পঞ্চমী উষায়।

১৩।

এস মা ভারতিবাণি এস দয়াবতি!
এই সে পঞ্চমী তিথি, লইয়া ভকতি প্রীতি,
পূজিতে এসেছে আজ সন্তান সন্ততি।
কত আশা মনে মনে, নিবেদিব ও চরণে
তুমি ত প্রসন্না মাতো ভারতের প্রতি।
তোমারি মমতা স্নেহে, ভাবতের মৃতদেহে
এখনো জীবন চিহ্ন আছে ভগবতি।
এখনো এখনো প্রাণ, হয় নাই অবসান
লইয়া অমৃত বীণা এস সবস্বতি!
তুমি যে প্রসন্না চিব ভাবতেব প্রতি!

গোবিন্দচন্দ্র দাস।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মধুসূদন নামটী বড মধুব! কিন্তু এমন যে বিপদ-ভঞ্জন মিষ্ট নাম, তাহাব পূর্ব্বে কোথা হইতে এক বিদেশী বিধর্ম্মী বিচিকিৎসা মাইকেল শব্দ প্রয়োগ কবিয়া মেঘনাদ বধ কবিতাব বচিয়তব নাম হিন্দুর নিকট কর্ণ-কটু কবা হইয়াছে। এখন প্রায় কেহই সেই সোণাব মধুকে মাইকেল বলিয়া না ডাকিলে, চিনিতে পাবে না। একেই ত মেঘনাদ বধ প্রভৃতি কাব্যে পিঁয়াজ রসুনের গন্ধ কম, তাহাতে আবাব গ্রন্থকর্ত্তাব যাবনিক নাম দেখিলে, পুস্তকেব মধ্যে হিন্দুব দেবতাকে উদ্দেশ্য কবিয়া যে সকল ভক্তিভাব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা হিন্দু পাঠকের নিকট কপটতা বলিয়া বোধ হয়; কবির

প্রকৃত মনের ভাব বলিয়া গৃহীত হয় না। যাহাতে রচয়িতায় বিশ্বাস কিম্বা ভক্তি নাই, কেবল রচনার খাতিরে ভাব ব্যক্ত হয়, সেই রচনা এক প্রকার, আর যাহা ভক্তি মূল করিয়া রচিত হয়, তাহার শক্তি এবং মধুরতা স্বতন্ত্র ভাবের। রামপ্রসাদের গীত গুলি যদি মাইকেল কিম্বা কোন যবন কর্তৃক রচিত হইত, তাহা হইলে শ্রোতার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইত, তাহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে। অধিক হইলেও লোকে তাহা উত্তম গীত কিম্বা কবিতা বলিয়া স্বীকার করিত, কিন্তু রচয়িতাকে পরম ভক্ত অথবা গীত গুলিকে ভক্তির উচ্ছ্বাস বলিত না। মিল্‌টন প্রভৃতি খৃষ্টান কবিরা রচনার খাতিরে গ্রন্থারম্ভে যেমন পুরাতন গ্রীক দেব দেবীদিগের অর্চ্চনা এবং আরাধনা করিয়াছেন, মাইকেল কর্তৃক সরস্বতীর বন্দনাও সেই রূপ। কবিতা হউক কিম্বা বক্তৃতা হউক, যাহাতে কবির কিম্বা বক্তার বিশ্বাসের এবং ভক্তির অভাব থাকে, তাহাতে রচনার সহস্র ছটা থাকিলেও তাহা আলুনী বোধ হয়। মধুসূদন যদি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিত, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে মেঘনাদ বধ কাব্য অনেক রূপে আদরণীয় হইত, পুস্তকও অনেকাংশে এখনকার অপেক্ষা ভাল হইত।

কবির কবিত্বের দোষ গুণ নির্ব্বাচন করার ক্ষমতা আমার নাই কিন্তু মিষ্ট কবিতা আমার কর্ণে বড়ই মিষ্ট লাগে। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি অনেক বড় দরের লোককে মধুসূদনের কবিতা অতি উচ্চ অঙ্গের কবিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়াছি; কিন্তু সত্য কথা বলিতে ভয় হয়,—আমি ক্ষুদ্রপ্রাণী, আমার নিকট ঐ কবিতা কেমন কট্‌ র মট্‌ র বোধ হয়। সাহেবী মটন চপ্‌. ও করি, কটলেট খাইতে হইলে যেমন টেবিল, চেয়ার, কাঁটা চামচা ও খানসামা খিদমদগার না হইলে আহারের সুবিধা হয় না, সেই রূপ মাইকেলের মেঘনাদ বধ পড়িতে হইলে দক্ষিণে এক খানা অভিধান এবং বামে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত লইয়া না বসিলে, বড় সুবিধা হয় না। কবিকঙ্কণের চণ্ডী, কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব বর্ণন—এ সকল পিঠা পরমান্নের ন্যায়, আমাদের যেমন রসনা তৃপ্তি করে, মেঘনাদ বধে তেমন করে না। যাঁহাদের ইংরাজী কবিতায় ভাল জ্ঞান আছে, তাঁহারা দেখিবেন যে মাইকেলের কবিতার ভাব রস ইউরোপীয় কবিতা হইতে অনেক পরিমাণে উদ্ধৃত,

মাইকেলের কবিতা পাশ্চাত্য কবিতার অনুকরণ অথবা অনুবাদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং সেই কারণেই আমি ইতাগ্রে বলিয়া আসিয়াছি যে মেঘনাদ বধে পিঁয়াজ রসুনের গন্ধ আছে। আর এক বিষয়ে মাইকেলের সহিত আমাদের হিন্দু কবির প্রভেদ এই যে, মধু রাক্ষস প্রভৃতি অনার্য্যদিগের গুণ গরিমা ও বীরত্ব বর্ণন করিতেই সর্ব্বদা আনন্দিত এবং মেঘনাদবধ তাহাতেই পরিপূর্ণ। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির প্রকৃত পরিচয় কাব্যে নাই।

এক দিবস একটা দস্তার হুকা মেরামত করার নিমিত্ত আমি বেলা ১৷৷০ টার সময় আমার চাকরকে একটা পয়সা দিয়া বাসার নিকট এক পশারীর দোকানে কিছু সীসা কিনিতে পাঠাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম, ক্রমে ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল কিন্তু ভৃত্য আমার প্রত্যাগমন করিল না দেখিয়া, আমি স্বয়ং ধীরে ধীরে দোকানের নিকট যাইয়া দেখি, যে দোকানদার এক পিতলের চশমা নাকে দিয়া তাহার দোকানের চৌকিতে উপবিষ্ট হইয়া, মিষ্ট স্বরে সুর করিয়া অন্নদামঙ্গলের পুঁথি খুলিয়া "এবে ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ দিব কার, আমি মলে [illegible] জঞ্জাল" পাঠ করিতেছে, এবং আমার চাকর ও আর চারি জন খরিদ্দার তাহার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট চিত্তে পুলকিত হইয়া শ্রবণ করিতেছে। এমনই কবিতার মধুরতা যে বণিক তাহার উপার্জ্জন এবং ক্রেতারা তাহাদের স্বীয় স্বীয় উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইয়া কেবল তৃষ্ণান্বিত চাতকের ন্যায় ভারতচন্দ্রের অমৃত সুধা পান করিতে মগ্ন। জানি না মাইকেলের মেঘনাদ বধ গ্রন্থ, কবে এইরূপ সর্ব্বলোকের চিত্ত রঞ্জন করিতে পারিবে? অনেকের বিশ্বাস যে ক্রমে আমাদের দেশে যতই উচ্চ শিক্ষা বিস্তীর্ণ হইবে অর্থাৎ যখন আমাদের কুলী মজুরেরা প্রত্যেকে নর্ম্মাল ইস্কুলের হেড পণ্ডিতের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ হইয়া বনকে বিটপী বিড়ালকে মার্জ্জারী, ঢেউকে বীচি এবং নাড়ীকে স্নায়ু বলিতে শিখিবে, তখনই মাই-কেলের কবিতার আদর বাড়িবে। কিন্তু আমি বলি, তাহার বহু বিলম্ব আছে, এবং যে পর্য্যন্ত সেই সুখের কাল উপস্থিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, কাশীরাম দাস প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি বঙ্গের কবি সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন।

মধুসূদন দত্তের আমি একজন সহাধ্যায়ী ছিলাম। বয়সে মধুসূদন

আমা অপেক্ষা ছোট ছিল কিন্তু এমনই তাহার বিদ্যা বুদ্ধির জোর, যে আমাদের অনেক পরে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করিয়া, লম্ফে লম্ফে নিম্নশ্রেণী সকল অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সে আমাদের সমাধ্যায়ী হইয়াছিল। মধুসূদনের ব্যঙ্গ করার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল এবং গীত বাদ্যে কম অধিকার ছিল না। খ্রীষ্টান হওয়ার পূর্ব্বেই মধু পারসী শিখিয়াছিল এবং খ্রীষ্টান হইয়া বিশপ্‌স্ কলেজে অধ্যয়ন করার সময় সংস্কৃত এবং লাটিন গ্রীকও পাঠ করিয়াছিল। পরে বিলাত যাইয়া ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান ভাষা সংগ্রহ করে, অতএব দেখা যাইতেছে যে মাইকেল কেবল কবি ছিল এমন নহে পৃথিবীর পুরাতন এবং প্রচলিত অনেক ভাষাতে ও তাহার অভিজ্ঞতা ছিল। মধুসূদনের আমি সমপাঠী ছিলাম বলিয়াই তাহার সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল এমন নহে, তাহার সহিত আমার আত্মীয়তা হওয়ার আর এক কারণ এই যে আমার মাতুলের সহিত মধুর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের অত্যন্ত বন্ধুতা ছিল এবং সেইজন্য মাতুলের সহিত আমি রাজনারায়ণ বাবুর খিদিরপুরের বাসা বাটীতে সর্ব্বদা যাইতাম। রাজনারায়ণ বাবু আমার মাতুলের সম্পর্কে আমাকে ভাগিনেয় বলিয়া স্নেহ করিতেন এবং মধুও সেই কারণে আমাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিত। কিন্তু মধুর আন্তরিক বন্ধুত্ব ছিল রাজা দিগম্বর মিত্রের ভ্রাতা ও বাবু গোবরদাস বসাকের সহিত। রাজনারায়ণ বাবু সে কালের সদর দেওয়ানী আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান যশোহর জেলার সাগরদাড়ী গ্রামে এবং তন্নিকটে তাঁহার অনেক বিত্ত বিভব ছিল মধুসূদন রাজনারায়ণ বাবুর একমাত্র সন্তান, অধিকন্তু বিদ্যাতে তাহার প্রখর বুদ্ধি দেখিয়া স্বভাবতই রাজনারায়ণ বাবু মধুকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাহার আকৃতি পালন করিতে ত্রুটি করিতেন না। রাজনারায়ণ বাবু মধুসূদনের গুণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু এক বিষয়ে তাহার অত্যন্ত ক্ষোভ ছিল। আমি এক দিবস পিতার নিকট পুত্রের গুণ কীর্ত্তন করিতেছিলাম, তাহাতে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে "বাপু তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য হইতে পারে কিন্তু কোষ্ঠীতে উহার ধন স্থানে শনি ঠাকুর আছেন, আমার অভাবে মধুর যে কি দশা হইবে, তাহা ভাবিয়া আমি অস্থির।"

মধু বড় খোস্‌পোষাকী ছিল এবং সাহেবদিগের ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিত। আমাদের সময়ে হিন্দু কলেজ কলিকাতার ধনী বালকে খচিত ছিল কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদে মধু এই সকল লক্ষপতি বালকদিগের কাহারও ন্যূন ছিল না। বালক কাল হইতেই মধুর সাহেব হওয়ার বাসনা ছিল এবং সেই উদ্দেশে সে চাদর ব্যবহার করা পরিত্যাগ করিয়া এক ছুট ইস্কুলে আসিত এবং তজ্জন্য আমারা তাহাকে এবং তাহার সঙ্গীগণকে "একছুটের দল" বলিয়া অভিহিত করিতাম। সাহেব হওয়ার জন্য তাহার এমনই প্রবল ইচ্ছা ছিল যে ইহার বহুকাল পরে বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সে এক দিবস কথায় কথায় আমাকে বলিল যে "এক্ষণে আমি সাহেবী পোষাক পরি, সাহেবী খানা খাই, ইংরাজী স্ত্রী করিয়াছি, অনর্গল ইংরাজী বলিতে পারি, কেবল ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখিতে পারিলেই, আমার দীর্ঘ কালের মনস্কামনা পূর্ণ হয়, পুরা সাহেব হইতে পারি।" মধুর প্রায় সকল পরিচিত ব্যক্তিই অবগত আছেন যে বাবু মধুসূদন দত্ত বলিয়া তাহাকে পত্র লিখিলে,সে তাহা গ্রহণ করিত না; গ্রহণ করা দূরে থাকুক আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে এইরূপ এক খানা পত্র পাইয়া মধু পত্র বাহককে গালাগালি দিয়া পত্র খানা তাহার দিকে নিক্ষেপ করিয়া ঘর হইতে ক্রোধ ভরে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। বাবু শব্দের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা রোগটা কেবল মধুর ছিল এমন নহে বিলাত ফেরত অধিকাংশ বাঙ্গালীর বিশেষত যাঁহারা ব্যরিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও বিলক্ষণ আছে। (Squire) স্কোয়ার বাক্য প্রয়োগ না করিলে তাঁহাদের সম্মানের ত্রুটি হয়, কিন্তু স্কোয়ার বাক্যের অর্থ ভৃত্য। অতএব দেখা যাইতেছে এই সকল ব্যক্তির নিকট বাঙ্গালীর সম্মান-সূচক বাবু উপাধি অপেক্ষা ইংরাজী ভৃত্য উপাধি সহস্রগুণে আদরণীয়।

ইহা বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন যে বিলাত ফেরত বাঙ্গালী-দিগের সাহেবী পোষাক অবলম্বন করার মূলাধার মাইকেল মধুসূদন দত্ত। প্রথম বিলাত যাত্রীরা ইংলণ্ডে এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এ দেশে চাপকান চোগা ও দেশী টুপি ব্যবহার করিতেন কিন্তু মাইকেল বিলাত হইতে কলিকাতায় পৌছিয়া এই সকল ব্যক্তির ফুঁ ফিরাইয়া দিলেন। আমার উত্তম স্মরণ আছে যে, মধু

তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিল, যে যে পর্য্যন্ত তাহারা সাহেবী পোষাক অবলম্বন না করিবে, সে পর্য্যন্ত মাইকেলের পরিবার কলিকাতায় পৌছিলে তিনি কিম্বা অন্য কোন মেম তাহাদিগকে খানায় নিমন্ত্রণ করিবেন না, কিম্বা তাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিবেন না অর্থাৎ বিলাত ফেরত বাঙ্গালীদিগকে মাইকেলের স্ত্রী মাইকেলের তুল্য সভ্য ব্যক্তি বিবেচনা করিবেন না। এই কথাতেই তাঁহাদের ভয় হইল, মতি টলিল এবং ক্রমশ তাঁহাদিগের মধ্যে হেট, কোট, প্রচলিত হইল। মধুর বড় আক্ষেপ ছিল, যে সে বাঙ্গালী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আমি তাহার মুখে শুনিয়াছি যে বিলাতে কিম্বা ফ্রান্সে কেহ তাহাকে সে কোন দেশী লোক বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে কখনও Indian অর্থাৎ ভারতবর্ষের লোক বলিয়া পরিচয় দিত না, বলিত যে আমি a Foreigner—একজন পরদেশী।

ধর্ম্ম বিষয়ে মধুর যে অধিক টান্ কিম্বা আকিঞ্চন ছিল, তাহা আমরা তাহার সহাধ্যায়ীরা, কিছুই জানিতাম না বরং আমরা তাহাকে খোস-পোষাকী, ব্যঙ্গ-প্রিয় এবং আমোদ বিলাসী (Jolly fellow) ছোকরা বলিয়া জানিতাম। ইতিমধ্যে হঠাৎ এক দিবস শুনিতে পাইলাম যে মধু তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোথায় গিয়াছে তাহা কেহ জানে না। তখন মধু এবং আমি হিন্দু কলেজের সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্টের তৃতীয় ক্লাসে পড়িতাম। ক্রমে ব্যক্ত হইয়া পড়িল যে মধু খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য পাদ্রীদিগের আশ্রয় লইয়াছে। তাহার পিতা মাতা এই কথা শুনিয়া শোকে আকুল হইয়া পড়িলেন। একে রাজনারায়ণ বাবু বিত্তশালী মনুষ্য, তাহাতে কলিকাতার অনেক বড় বড় লোকের সহিত ভাব ছিল, রাজনারায়ণ বাবুর পুত্রকে পাদ্রীরা লইয়া গিয়াছে শুনিয়া তাঁহারা সকলে রাজনারায়ণ বাবুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। মধু কোন্ স্থানে লুক্কায়িত আছে তাহা জানিতে পারিলে সেই স্থান হইতে তাহাকে বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া লওয়ার নিমিত্ত তাহার পিতা দেশ হইতে লাঠিয়াল ও সড়কীওয়ালা আনিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া জনরব উঠিয়াছিল। আমার মাতুল ইহার প্রধান উদ্যোগী এবং কলিকাতার অনেকে তাঁহার প্রতিপোষক ছিলেন। এইরূপ কোলাহল হইতেছে এমন সময় হঠাৎ এক দিবস রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বাসাতে

আমার মাতুলের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই বৈঠকে হিন্দু কলেজের শিক্ষক বাবু রামচন্দ্র মিত্রও ছিলেন। কৃষ্ণমোহন বাবু মাতুলকে বলিলেন যে "আপনারা অনর্থক মধুর জন্য চেষ্টা করিতেছেন, খ্রীষ্টান হওয়ার নিমিত্ত তাহার দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছে। সে খোকা নয়, দুগ্ধপোষ্য বালক নয়, যে পাদ্রীরা তাহাকে ভুলাইয়া খৃষ্টান করিবে। ধর্ম্মের দোষ গুণ নির্ব্বাচন করিতে তাহার উপযুক্ত বুদ্ধি ও বয়স হইয়াছে এবং হিন্দু ধর্ম্মের অসারতা জানিয়া মধু খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই দেখুন তাহার কেমন বুদ্ধি, আপনারা তাহার প্রতি বল প্রয়োগ করার আশঙ্কায় সে লাট পাদ্রীর নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহার অনুরোধ মতে কেল্লার মধ্যে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে এবং কেল্লার কর্ত্তা ব্রিগেডিয়ার পেউনি সাহেব সাদরে মধুকে আপন কুঠিতে স্থান দিয়াছেন যে আপনারা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে না পারেন।" কৃষ্ণমোহন বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, জীবিত থাকিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে হইত, যে কেল্লার ভিতরে আশ্রয় লওয়ার বুদ্ধি কি ১৭,১৮ বৎসরের বয়সের বালক মধুসূদন দত্তের মস্তিষ্কের ঘট হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, না অন্য কোনও স্থির মতি ঘরের ঢেঁকী কুম্ভীর চক্রীর চক্রান্তে সেই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল?

তদনন্তর কৃষ্ণমোহন বাবুর মুখে মধুর কেল্লার মধ্যে অবস্থিতি করার সংবাদ অবগত হইয়া আমার মাতুল ও উক্ত রামচন্দ্র বাবু ও রাজনারায়ণ বাবুর একজন ভ্রাতুষ্পুত্র মধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কেল্লায় গিয়াছিলেন। আমিও সেই সঙ্গে গিয়াছিলাম। মধু কয়েকজন পাদ্রী ও সৈনিক সাহেবের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কেল্লার মধ্যস্থিত গির্জা ঘরে আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল। আমার মাতুল মধুকে তাহার পিতা মাতার শোকের কথা বর্ণনা করিয়া তাহাকে একবার বাড়ী যাইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"; মধু সে সকল বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া আমাদিগকে এক সেলাম ঠুকিয়া গির্জা ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিল, আমরা ও নিরাশ হইয়া কেল্লা হইতে ফিরিয়া আসিলাম। ইহার কয়েক দিবস পরে ছোটলাট পাদ্রী আর্চ ডিকন ডলট্রী সাহেব মহা সমারোহ করিয়া কলিকাতার মিসন রোর গির্জাতে মধুসূদন দত্তের মস্তকে পবিত্র জর্ডন নদীর জল সেচন পূর্ব্বক মাইকেল নামোচ্চারণে তাহাকে অন্ধকার

হইতে আলোকে লইয়া গেলেন। মধুসূদনও আহ্লাদে পুলকিত হইয়া সেই উপলক্ষে (On my seeing the light) অর্থাৎ 'আমি আলোক দেখিলাম' বলিয়া ইংরাজীতে এক কবিতা রচনা করিয়া সংবাদ পত্রে প্রকাশ করে। আমাদের সকলের শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রাজনারায়ণ বসু তখন হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি মধুর ঐ কবিতার বিদ্রূপ করিয়া (On my circumcision) অর্থাৎ 'আমার সুন্নত হইল' বলিয়া এক পালটা কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া কলেজের ছাত্রেরা অত্যন্ত হর্ষিত হইয়াছিল।

মধুসূদনস্তর বিশপ্ স্ কলেজে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া মান্দ্রাজের এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া মান্দ্রাজে গমন করে এবং সেই স্থানে এক পাদ্রী সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করে কিন্তু কিছু কাল পরে আর একটি বিবির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করত সেই বিবিকে লইয়া বিলাত চলিয়া যায়। মান্দ্রাজে মধু Captive Ladie নামক এক খানা ইংরাজী কবিতা প্রণয়ন করে; সেই পুস্তক খানা সাধারণের নিকট বড় আদরণীয় হয় নাই। বিলাত যাইয়া মধু ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করে এবং তাহার এক কি দুই বৎসর পরে সেই বিবি আসিয়া তাহার সহিত একত্রিত হয়। সাধারণের নিকট ঐ স্ত্রীলোকটী মধুর স্ত্রী বলিয়া পরিচিত ছিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মধুর বিবাহিতা স্ত্রী মান্দ্রাজে তাহার পিতার আশ্রমে ছিলেন। মধুর সন্তান গুলি ঐ দ্বিতীয় বিবির গর্ভজাত। তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত নহে।

পৃথিবীতে মধুসূদন দত্তের যত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা সমস্তই তাহার নিজের কর্ম্ম দোষের ফল। পৈতৃক বিত্ত সমস্ত বিলাতের ও সাহেবী খরচের অনুরোধে উড়িয়া গেল। এক সতী লক্ষ্মী পাদ্রী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া চির দুঃখিনী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সাহেব হইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু সাহেবেরা তাহাকে এতই ঘৃণা করিত যে তাহারা তাহাকে হাইকোর্টের বার লাইব্রেরির মধ্যে প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত প্রদান করিতে প্রথমে সম্মত হয় নাই। ব্যারিষ্টার হইলেন, কিন্তু এ জন্মে একটি বড় মকদ্দমা পাইলেন না, অবশেষে সর্ব্বস্ব হারাইয়া, রোগের তাড়নায় এক

হাঁসপাতালে যাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। জন্মদাতা পিতা রাজনারায়ণ দত্ত যে ভয় করিয়াছিলেন, সেই ভয়ই শেষে ঘুড়াইল। কেবল রহিল কি? না, যে সমাজকে তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন সেই সমাজের ভাষায় তাঁহার প্রণীত কয়েক খানি গ্রন্থ।

মধু হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল, হিন্দু আচার ব্যবহার ঘৃণা করিয়া সাহেবী ধর্ম্ম এবং সাহেবী আচার ব্যবহার অবলম্বন করিল, এমন কি বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে তাহার লজ্জা বোধ হইত তথাপি যখন তাহার দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ত বাঙ্গালীরা তাহাকে উপেক্ষা করিল না, তখন অনেক হিন্দু সন্তান তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন বিশেষত বিদ্যাসাগর মহাশয় মধুকে সাহায্য করিয়া নিজে বিস্তর ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মধুর মৃত্যুর পরেও দয়াশীল এবং দানশীল কয়েক জন হিন্দুসন্তান তাহার পুত্র কন্যাদিগকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন এবং এক্ষণেও তাহার পুত্র আলবর্ট দত্তকে বিলাত পাঠাইয়া বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য এবং মাইকেলের সমাধি স্থানে কোন স্মরণ চিহ্ন স্থাপনা করার নিমিত্ত হিন্দু সমাজ কৃতসংকল্প হইয়াছে।

মধুর প্রসঙ্গের উপসংহারে তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর সদ্‌গুণের কথা প্রচার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শেষাবস্থায় যখন মধু রোগাক্রান্ত হইয়া সঙ্গতি অভাবে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতেছিল, তখন সেই পাদ্রী কন্যা মধুর পূর্ব্ব কুব্যবহার বিস্মরণ করিয়া উপযাচিকা হইয়া মধুকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে মধু যদি তাহাকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তিনি অতি আহ্লাদের সহিত কলিকাতায় আসিয়া স্বামীর সেবা শুশ্রূষা ও অন্যরূপ যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন মধু সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই।

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার।

৪।

গৌরচন্দ্রিকায় রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল; খৃষ্টীয় প্রস্তাবনা করিব, কি প্রস্তাবনার প্রারম্ভেই কোকিল ডাকিয়া উঠিল, বোধ হয় অব্যবহিত পরেই পাশ্চাত্য গগনে অরুণাভাস দৃষ্ট হইবে। ভাবি নাই আমার মতটী বিজ্ঞ

সমাজে আলোচিত হইবে; সত্যের সহায়তা যিনি করেন, তৎ প্রসাদাৎ লোকের মনে প্রজ্ঞার উদয় হইয়াছে। জগতের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেই শ্রবণ পরিতুষ্ট হইবেন যে দূরবর্ত্তী খৃষ্টীয় জন মণ্ডলে "উপপ্লবের" প্রতিধ্বনি হইতেছে। (১)

ইংলণ্ডস্থ "রয়াল আসিয়াটিক সোসাইটি" নামক সভার সভ্য মহাত্মা আর্থর লিলি সম্প্রতি এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বীকার করিয়াছেন বৌদ্ধধর্ম্মই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্মোৎসাহী মহারাজা অশোক পাশ্চাত্য প্রদেশে স্থবির প্রেরণ করেন, উক্ত স্থবিরদিগের ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা জস্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মূল উক্ত জস্তির সমাজ। (২)

ইতিপূর্ব্বে উক্ত মত উপপ্লবে প্রকাশ করা হইয়াছে, খ্রীষ্টীয় যাজক দিগের বাক্য কতদূর সত্য তাহার আন্দোলন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ১৯৪৫ সম্বতে প্রাচীন ভারতের গৌরব প্রসঙ্গ এতকাল পরে উত্থাপিত হইবার সূত্রপাত হইল। আর্য্য দেশ কোন কালেই পরভূষণ গলে ধারণ করেন নাই, বীর্য্যবন্ত এবং অসীম প্রতিভা-সম্পন্ন সন্তানগণকে ক্রোড়ে লইয়া চিরকাল প্রফুল্ল মুখে অতিবাহিত করিয়াছেন; আজি ভারতের এই দশা! এ সময় যদি কেহ তাঁহার পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাঁহার যশঃ কীর্ত্তন করে, তাহাতেও ভারতের দুঃখ কথঞ্চিত প্রশমিত হয়। মহাত্মা আর্থর লিলি তাহার পূর্ব্ব সূত্র ধরিয়া ভারতের অপার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

জস্তিক ধর্ম্ম কি? কেহই তাহার অনুসন্ধান করেন না; তাহা না করাতেই পুরাতত্ত্ব বিষয়ে ঘোরান্ধকার ঘুচিতেছে না। পৃথিবী মহা ভ্রমে নিমজ্জিত রহিয়াছে। ইহা কাহার দোষ? চক্ষের দোষ না, আলোকের দোষ? খৃষ্টীয় যাজকেরা যাহা বলিবেন, অবনত মস্তকে তাহারি অনুসরণ করিতে হইবে, ভগবানের এরূপ ইচ্ছা কখনই নহে। আপনাদিগের হস্ত পদ তবে কি নিমিত্ত? ভগবান শুদ্ধ ধীর সমীর সৃষ্টি করেন নাই, তিনি

---

(1) (2) Buddhism in Christendom or Jesus the Essene.
Arthur Lillie.

ভূমিকম্প ও প্রবল ঝটিকারও সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মেষেরও স্রষ্টা এবং ব্যাঘ্রেরও আহার প্রদান করেন। তাঁহার কল্পনাপ্রসূত মানবজীবন! কি আর অধিক বলিব। কোথা হইতে জ্ঞস্তিক ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং বিকাশ আপনারা চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, পাশ্চাত্যেরা তাহা জানিবার কোন চিহ্নই রাখিয়া যান নাই। বিধর্ম্মী কুতীর্থিকদিগের কঠিন হস্তে বিশাল জ্ঞস্তিক কুলের পতন হইয়াছে। কিন্তু আফরিকা, ইউরোপ, এবং আসিয়া মহাভূমিতে সর্ব্বত্র জ্ঞস্তিক ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এতাদৃশ বৃহৎ গোষ্ঠীর একজনও পাশ্চাত্যে নাই যে তাহাদিগের শত্রুগণের পাশব উৎপীড়নের পরিচয় দেয়? আজি সংসার জ্ঞস্তিক শূন্য ও সংসারে জ্ঞস্তিক নাম বিলুপ্ত হইয়াছে কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীগণ বলেন, যে, তাঁহাদিগের সমাজ মধ্যে জ্ঞস্তিকদিগের অনেক আচার নিয়ম বর্ত্তমান আছে, যাজকেরা বলেন জ্ঞস্তিক মত পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছে (৩) অথচ জ্ঞস্তিকদিগের পরিচয় প্রদান কালে তাঁহারা অম্লান মুখে বলেন জ্ঞস্তিক তত্ত্ব নিরূপণ করা দুঃসাধ্য (৪)।

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠ হইল সীতা কে জানা গেল না। আমার বোধ হয়, জ্ঞস্তিক তত্ত্বই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পুরাবৃত্ত; জ্ঞস্তিক তত্ত্বানুসন্ধানে খ্রীষ্টীয় তত্ত্ব প্রাঞ্জল হইয়া পড়িবে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, মহাত্মা লিলিও আমার মত সমর্থন করত প্রদর্শন করিয়াছেন, যে জ্ঞস্তিক মত হইতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোৎপত্তি হইয়াছে, এ কথা কি মিথ্যা? জ্ঞস্তিক সম্প্রদায় ধর্ম্ম প্রয়োজক, শান্ত ও দার্শনিক ছিলেন, তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। ফাইলো, যোসেফঃ, ইউসিবিয়ঃ, রোসোবার, প্লিনি, প্রেদোঁ, ও জেনিংস্ প্রভৃতি বিজ্ঞ লোকেরা জ্ঞস্তিক তত্ত্বের সম্যক্ বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না, কিন্তু ফাইলোর বৃত্তান্ত হইতে জ্ঞস্তিকদিগের সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়, এতৎসম্বন্ধে প্লিনিরও প্রশংসা করা যায়। কিন্তু যোসেফঃ যে সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ফাইলোর উক্তির সহিত ঐক্য হয় না। (৫) প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা গিবন্ বলেন

(3) Gibbon II. 284.
(4) Marshden. I. 481.
(5) P, C. .Hessena.

জ্ঞস্তিক সম্বন্ধে উপকথার প্রবাহ আছে। (৬) ইরিনিয়ঃ ও ইপিফানিয়ঃ জ্ঞস্তিক সম্প্রদায়ের একটি তালিকা দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তাহারা পঞ্চাশেরও অধিক শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। (৭)

পাশ্চাত্য লেখকেরা বলেন প্রাচীন ধর্ম্মযাজকগণ কাথলিক সমাজের বিরুদ্ধ মতবাদীদিগকে জ্ঞস্তিক নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা বড় সন্দেহের কথা। মহাপ্রাজ্ঞ বাস্‌নেজ সাহেব তৎকৃত হিষ্টয়ার দে জুইস্‌ গ্রন্থে, ও টেলর সাহেব কাল্‌মেটের অভিধান প্রকাশ কালে, সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, জ্ঞস্তিকগণ বহু প্রাচীন এবং তাহারা খ্রীষ্টিয়ান ছিল না। তবে পাশ্চাত্যে জ্ঞস্তিকগণ কোথা হইতে আসিয়াছিল? আর তাহাদের কোন ধর্ম্ম? কোন্‌ সূত্রে উদ্ভব হয়, ইহার তদন্ত কেহ করিয়া থাকেন কি?

ইংরাজী অভ্যাস বশত অনেকে নষ্টিক পাঠ করেন, গ্রীক পাঠ গ্নস্তিক। জ্ঞা ধাতু সংস্কৃতে বোধনে প্রযোজ্য হয়। আবার গ্রীক গ্নসিস (gnosis) শব্দের অর্থ জ্ঞান, দুইটী এক ধাতু হইতে উৎপন্ন। সুতরাং ইহা সংস্কৃতেরই অপভ্রংশ, ভিন্ন জাতির উচ্চারণ জন্য কিছু বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, তদ্ধেতুক নষ্টিক না বলিয়া জ্ঞষ্টিক বলাই সুসঙ্গত বোধ হইতেছে। খ্রীষ্টিয় সমাজের পুরাবৃত্ত লেখক মার্শডেন গ্রীক গিগনস্কো gignosko শব্দ হইতে জ্ঞস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। (৮) কিন্তু গ্রীক ভাষায় গিগ্‌নো শব্দের অর্থ গর্ভবতী হওয়া। এ অর্থে জ্ঞস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তি করা সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই। মার্শডেন বিজ্ঞলোক, বিজ্ঞ লোকের ভ্রম হয় না; বোধ হয় তিনি ব্যস্ততা প্রযুক্ত গ্রীক গিনস্কো ginosko (বোধনে) শব্দটি পরিহার করিয়া থাকিবেন। উক্ত শব্দ হইতে কেহ কেহ জ্ঞস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তি করিতে ত্রুটি করেন নাই। মিছে বিবাদ করিয়া কেন মরি, জ্ঞস্তিক শব্দের দার্শনিক অর্থ আছে, তাহাতে কিরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হয় দেখা যাউক।

গ্রীক তত্ত্বে পরম পদার্থকে দার্শনিকেরা গ্নসিস gnosis অথবা সোফিয়া sophia বলিতেন। ইহার অর্থ বুদ্ধি। জ্ঞনিস্‌ শব্দের সহিত জ্ঞস্তিক

---

(6) Gibbon. II. 283.

(7) Catalogue of Irenaeus and Eapiphaneus.

(8) Marshden History of the Church. I. 479.

শব্দের যে সম্বন্ধ। সোফিয়া শব্দের সহিত সোফস শব্দের সেই সম্বন্ধ। গ্রীক দার্শনিকগণ সোফসাভিখ্যাত ছিলেন। সোফস এবং জ্ঞস্তিক, সোফিয়া এবং জ্ঞসিস, পরস্পর অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ। বিশেষত জ্ঞস্তিকদিগের শেষাবতার বুদ্ধি। (৯) দার্শনিক অর্থ দ্বারা ফিলসফার, সোফস, সোফিষ্টী এবং জ্ঞস্তিক শব্দের পরস্পর অতি নিকট সম্বন্ধ বিজৃম্ভিত হয়। আমি অনুমান করি, ভিন্ন ভিন্ন ক্যাথলিক দ্বারা ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জ্ঞস্তিক ধর্ম্মোৎপত্তির নানামত প্রচার আছে। ফাইলোর মতে মিসরদেশ হইতে কিন্তু অধিকাংশ লোকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পশ্চাত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার জন্যই জ্ঞস্তিক ধর্ম্মের জীবন সঞ্চার হইয়াছিল। (১০) আমি দেখাইয়াছি ইতালীর সমাজ হইতেই পাশ্চাত্যে নানা দার্শনিক মতের সৃষ্টি হইয়াছে, জ্ঞস্তিক সমাজ তাহার মূল, কিম্বা শাখা। (১১) তাহাদের মতের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ আছে এইজন্যই অনুমান করি জ্ঞস্তিকগণ বৌদ্ধ ছিল, বৌদ্ধদিগের ন্যায় তাহারা স্রষ্টা স্বীকার করিত না, এইজন্যই জড়কে নিত্য কারণ বলিত। (১২) জড়ের অপকর্ষ ও দুঃখদায়ক ধর্ম্ম মানিত। কেবল জড়ের মোহিনী শক্তিই মনুষ্যকে প্রলুব্ধ এবং ভ্রান্ত করে। ইহার সেই মোহিনী শক্তি চূর্ণ করিবার উপায় সমাধি। (১৩) খ্রীষ্টীয়ান দিগের শয়তানের সহিত বৌদ্ধদিগের জড় বা প্রলোভনে কি প্রভেদ আছে? জ্ঞস্তিক ও বৌদ্ধদিগের বহু বিষয়ে বিশেষ সারূপ্য ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। জ্ঞস্তিক ইয়ন (Aeon) দিগের উৎপত্তি ও বৌদ্ধদিগের ত্রিবিধ বুদ্ধোৎপত্তির বৃত্তান্ত একই পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। অর্থাবিষ্কারকদিগের দোষে তাহার রূপান্তর বলিয়া বোধ হয় মাত্র। তথাপি বিজ্ঞ রিস্ ডেবিডস্ প্রকৃত মত স্বীকার করেন। ইয়ন শব্দটী অর্থাবিষ্কারকগণ এক দুর্জ্ঞেয় করিয়া তুলিয়াছেন,

---

(9) Moshein I. 229.

(10) Mansel's Gnostic Hecretis. P. 35.

(11) Court of the Gentiles. III. 123.

(12) P. C.

(13) Mystus.

যে উহার অর্থ পণ্ডিতেরা বোধগম্য করিতে অসমর্থ। (১৪) রিস্‌ডেবিডস্ স্পষ্ট বক্তা, এই জন্যই বৌদ্ধ এবং জ্ঞস্তিক ইয়নের কতক সাদৃশ্য স্বীকার করিয়াছেন। (১৫)

দ্বিতীয় বিষয়টী মিল্লোনিয়ম। ইহা বিজাতীয় শব্দ। ইহার অর্থ সহস্র অব্দ। এ শব্দ কি অর্থে জ্ঞস্তিকেরা ব্যবহার করিয়া ছিলেন, তাহার কেহ মর্ম্ম বুঝিতে পারেন কি? ইহা এক্ষণে পাশ্চাত্য জাতির হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারাই ইহার অর্থ বোধজ্ঞ। আমরা ত কেহই নই, সুতরাং মিল্লোনিয়ম শব্দের অর্থ আমরা বুঝি না, কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থে [illegible] বৃত্তান্ত এবং খৃষ্টীয় গ্রন্থ বাইবেলের 'প্রকাশিত' নামক পর্ব্বের বিংশ অধ্যায়ের কয়েকটি পদের যেরূপ অর্থ দেখি, তাহাতে উক্ত উভয় বৃত্তান্তের ত স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাই না। খ্রীষ্টীয়ানেরা খ্রীষ্টের জন্মের ভবিষ্যবাণী প্রদর্শন করেন, খৃষ্টের সহস্র বৎসর ধর্ম্মরাজত্বের প্রমাণ উল্লেখ করেন, (১৬) কিন্তু এটী নূতন কথা বলিয়া আমার বিশ্বাস হইল না। খ্রীষ্ট আসিবেন এই ভবিষ্যবাণীর উচ্চতর রব জেরুশালেমে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই ভারত কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। জ্ঞানী বল্‌নি এবিষয়ের সাক্ষ্য দিয়াছেন। (১৭) বৌদ্ধ গ্রন্থ জাতকে এরূপ ভবিষ্যবাক্য আছে যে, ভগবান বুদ্ধদেব ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া পঞ্চ সহস্র বৎসর ধর্ম্ম শাসন স্থাপনা করিবেন, ইহা স্পষ্ট বৌদ্ধ "ভদ্রকল্প"। অর্থাবিষ্কারকগণ ইহার কি অর্থ করেন? এ বল্ল ব্যাপার বৌদ্ধ বা জ্ঞস্তিকদিগের, খৃষ্টীয়ানদিগের এ শিক্ষা জ্ঞস্তিক ধর্ম্মোপদেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত প্রমাণ দ্বারাই খৃষ্টের জন্মের মূল পুরাবৃত্ত সপ্রমাণ হইবে।

বৌদ্ধ এবং জ্ঞস্তিক মতে আত্মার শেষ উন্নতি একই প্রকার। (১৮) জ্ঞস্তিক সম্প্রদায়ের একটী শাখা সম্প্রদায় কার্পোক্রেশন নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

(14.) Mohsheim I 89.

(15.) Rhysdavid's Buddhism p. 287.

(16.) Revelation. Ch XX.

(17.) Volney on the Revolutions of Empire. 155.

(18) Rose Crusians. p. 47.

এই সম্প্রদায়ের সবলি বৌদ্ধদিগের ন্যায়। (১৯) এরূপ সর্ব্ব বিষয়ে সমরূপতার কারণ কি, অর্থাবিষ্কারকেরা বলিতে পারেন কি?

ফাইলো ও প্লিনির লিপি দ্বারা ব্যক্ত হয়, পালেষ্টিনের হেসেনি সম্প্রদায় বৌদ্ধ ছিল, তাহাদিগের রীতি নীতি সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, তাহারা সমৃদ্ধিশালী নগর ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন প্রদেশে বাস করিত, বৌদ্ধ বিহারের ন্যায় তাহাদিগের মঠ ছিল। ঐ মঠ তাহাদের আশ্রম-ছিল। মঠের নিয়ম সকল বৌদ্ধ বিহারের ন্যায়; বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিষিদ্ধ পাণিগ্রহণ, মাদক সেবন, মাংস ভক্ষণ, অসত্য কথন, ও নৈশ ভোজন প্রভৃতি কর্ম্মে তাহারা কদাচ প্রবৃত্ত হইত না। পুণ্য দিবসে অনশনে থাকিত ও আন্তরিক যত্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিত; কেহ ধর্ম্ম বিগর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা আপনাদিগের মঠ ও শ্রেণী হইতে তাহাকে বিনিষ্ক্রান্ত করিয়া দিত (২০) পরোপকার এবং দয়া, শান্তি এবং প্রেম তাহাদিগের অন্তঃকরণের ভূষণ ছিল। ধর্ম্ম পালন জন্য অনায়াসেই তাহারা মৃত্যুর বশীভূত হইত। ধর্ম্ম জীবনে প্রবিষ্ট করাইবার সময় তাহারা "শীল" গ্রহণ করাইত। এ রীতি বৌদ্ধদিগের চির বর্ত্তমান; বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ—হীনযান ও মহাযান; হেসেনিরা তাহাই অবলম্বন করিত, এই হেতু অনেকেই অনুমান করেন যে ইতালীয় সমাজের মত হইতেই হেসেনি ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃষ্টরূপে দীক্ষিত না হইলে তাহারা কাহাকেও আপনাদিগের শ্রেণী মধ্যে গ্রহণ করিত না। অহিংসা এবং ভ্রাতৃভাব হেসেনিদিগের শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম ছিল (২১), প্লিনি বলেন ডেড্ সির পশ্চিম পারে তাহাদের প্রথম অবস্থিতি, তথা হইতে উহারা ক্রমে সিরিয়া, পালেষ্টিন ও মিসর দেশে বিহার স্থাপনা করিয়াছিল। প্লিনি ইহাদের আদি বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত নহেন (২২)। বাইবল গ্রন্থের নিউটেষ্টেমেণ্ট মধ্যে ও হেসেনিদিগের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। কিন্তু যীশুকে যিনি বাপ্তাইজ করিয়াছিলেন, সেই যোহন এবং যীশু উভয়েই হেসেনি গোত্রীয় (২৩)।

(19) Beeton. 423.
(20) Philo, Leo Vita Contempt. 478.
(21) Pliny Nat Hist. V 17.
(22) P. C.
(23) Beeton.

হেসেনিদিগের অপর কয়েকটী শাখা মিশরে বাস করিত, তাহারা থিরাপুতিক নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পুরাতত্বজ্ঞেরা বলেন থিরাপুতিকদিগের আর এক সম্প্রদায় ছিল তাহারা আস্কেতি নামে খ্যাত। আস্কেতি গ্রীক শব্দ, ইহার অর্থ অভ্যাসকারী। থিরাপুতিক শব্দের অর্থ চিকিৎসক। হেসেনির অর্থ পূতবুদ্ধি বা শুদ্ধমতি। ভিন্ন ভিন্ন নাম হইলেও ইহারা একই ধর্ম্মাবলম্বী এবং এক গোত্রজ। প্রাগুক্ত লেখকগণ বলেন কাথলিক মঙ্ক ও আস্কেতি ভিন্ন নহে, এক ধর্ম্মাবলম্বী। অত্যন্ত প্রাচীন খৃষ্টীয় সমাজের বৃত্তান্ত লেখকগণ বলেন যে উক্ত আস্কেতিগণ স্পৌদে নামে খ্যাত ছিল। ইহার সহিত বৌদ্ধ শব্দের সম্পূর্ণই সমরূপতা লক্ষিত হয়। কাথলিক মঙ্ক ও উক্ত সম্প্রদায় ভিন্ন নহে। এ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বে লোকে তত সভ্য ছিল না, এই নিমিত্ত এ বিষয়ের তৎকালে কোন মীমাংসা হয় নাই; কিন্তু এক্ষণে আস্কেতি, কাথলিক মঙ্ক বা যাজক, থিরাপুতিক ও হেসেনি, বৌদ্ধ ও জ্যোস্তকদিগের গভীর তত্ব নিরূপণ করিবার সময় আগত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় মতাবলম্বীগণ থিরাপুতিকদিগকে খৃষ্টীয়ান বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর বাসনেজ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে তাহারা খৃষ্টীয়ান নহে। (২৪) কিন্তু তিনি বলেন যে কাথলিক যাজকদিগের উপদেষ্টা উপরোক্ত সন্ন্যাসীগণ। তাহাদের আচার ব্যবহার মত বিশ্বাস—সমস্তই বৌদ্ধ সম্প্রদায় সদৃশ। (২৫) উহারা পূর্ব্ব নাম ত্যাগ করত ক্রমেই মঙ্ক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাসনেজের উপর আমি টীকা করি, এমন যোগ্য লোক আমি নই, তথাপি আত্মমত প্রকাশে সকলেরই স্বাধীনতা আছে। আমি অনুমান করি রোমীয় সম্রাট কনষ্টাণ্টাইন ঘোর কুতীর্থিক দলের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহারই উৎপীড়নে কুতীর্থিক দলের প্রশ্রয় বৃদ্ধি ও জ্যোস্তক ধর্ম্মের লোপাপত্তি হইয়াছিল। (২৬)।

প্রগাঢ় খৃষ্টীয় তত্ত্ববিদ্‌গণ এক তানস্বরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, প্রাচীন

---

(24) Basnage. Histoire des Jues. Ch. 87.

(25) I bid.

(26) Ibid.

গাথা ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তক অবলম্বনে রোমীয় খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু উক্ত মণ্ডলীর সকলেই ধর্ম্মজ্ঞগণ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে ইহা স্বীকার করেন না। তন্নিবন্ধন ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, কাথলিকগণ কোন্ জাতীয় ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, এ পর্য্যন্ত ইহার নিরাকরণ হয় নাই। (২৭)

এই সন্দেহ অপনোদন জন্য কৈশব বারোনিয়স খৃষ্টীয় তত্ত্বের পুরাবৃত্ত লিখিয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা কাথলিক মণ্ডলীকে চক্ষুষ্মান্ না করিয়া তাহাদিগকে আরও অন্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে ভ্রমের অন্ত হয় না; ধর্ম্ম পুরাতত্ত্বে ভ্রম বড়ই শোচনীয় এবং লজ্জাবহ (২৮)।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিশ্বাস প্রেরিত গণের কার্য্য কোন মতেই মিথ্যা হইতে পারে না। অতএব তাঁহারা যাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা সত্য। কিন্তু প্রেরিত চরিত লেখকগণ যাহা বলেন তাহা সন্দেহময়, উপকথায় পূর্ণ এবং অত্যন্ত দুর্ব্বর্ণাঢ্য। (২৯)

খ্রীষ্ট স্বয়ং ধর্ম্ম প্রচার জন্য সত্তর জন শিষ্য প্রেরণ করেন। কেবল লুক এই কথা বলেন, যোহন, মথি, এবং মার্ক একথা বলেন না; অধিকন্তু পাশ্চাত্য সমালোচকেরাও ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। (৩০)

সত্যের অনুরোধ বলিতে হইল এ ব্যাপার বৌদ্ধ সমাজে অপরিজ্ঞাত নহে। কারণ বিদিত আছে যে ভগবান্ বুদ্ধদেব বর্ষাকালে মৃগদাব বনে মাসত্রয় অতিবাহিত করিয়া ষাইট জন শিষ্যকে ধর্ম্ম প্রচারার্থ দিগ্ দিগন্তে প্রেরণ সময় আদেশ করিলেন "স্বধর্ম্ম প্রচারার্থ তোমরা এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন অভিমুখে গমন কর, ধর্ম্মের সঞ্চার কর, নীচ উচ্চ মধ্য সর্ব্ব গৃহেই ধর্ম্মের কথা প্রচার কর, ধর্ম্মের প্রসঙ্গ দিবসের ন্যায় পরমানন্দে সকলের মনের গোচর কর।" (৩১)

---

(27) Mosheim. IV 208

(28) Ibid. 206

(29) Mohsheim Eccch. Hist. I.95.

(30) Ibid I 96

(31) Bauddha Jataka

রোমে বহুকালাবধি পোপের প্রাদুর্ভাব, সেই পোপের আদি বৃত্তান্তই সন্দেহাত্মক। রোমে কে প্রথম বিশপ হইয়াছিলেন, কাথলিকগণ তাহা সপ্রমাণ করিতে পারেন না। (৩২)

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কোন পুরাবৃত্ত লেখকও রোমের আদি বিশপদিগের বৃত্তান্ত নির্ণয় করিতে পারেন নাই। (৩৩)

পক্ষান্তরে কাথলিকগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়াও নিবৃত্ত নহেন। ফরাশি পণ্ডিত কার্লস ডি, প্রন্সি, বুদ্ধদেবকে কালমুখ তাতারী জাতির উপন্যাসোক্ত নায়ক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; তথাপি কাথলিকগণ দেববৎ তাঁহাকে পূজা করেন। (৩৪)

পৃথিবী মধ্যে অনেকেই জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবত্ব লাভ পূর্ব্বক লোকের পূজা এবং উপাস্য হইয়াছেন, কিন্তু খৃষ্টীয়ানেরা সে সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধদেবকে যখন তখন ক্রাইষ্ট বলিয়া গোলোক ধাঁধা দেখেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? তবে ক্রাইষ্ট কি বুদ্ধ? না বুদ্ধ ক্রাইষ্ট? (৩৫)

ম্যাক্‌বেথ ও হাম্‌লেট্‌।

২।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ম্যাক্‌বেথ ভবনে অন্যতর রাজ সেনাপতি বাঙ্কো স্বীয় পুত্রের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, গভীর করাল নিশীথে নক্ষত্র

---

(32) Mosheim I. 139.

(33) Church History. Mosheim.

(34) Bibliothique Sacree of Lather Richard.

(35) Origin of Pagan Idolatry III 60.

সকল অদৃশ্য হইয়াছে ; বাঙ্কোর হৃদয়ে করালচ্ছায়া পড়িয়াছে ; তিনি পুত্রকে আত্মরক্ষার্থ স্বীয় তরবারি প্রদান করিলেন ; দুঃস্বপ্ন হইতে রক্ষার্থ দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—এমন সময় মাক্‌বেথ আসিলেন। রাজা ডঙ্কান্ আতিথ্যে পরিতুষ্ট হইয়া মাক্‌বেথ-গৃহিণীকে যে হীরক খণ্ড উপহার দিয়াছেন, বাঙ্কো তাহা মাক্‌বেথের হস্তে প্রদান করিলেন। বাঙ্কো বলিলেন, 'আমি গত রাত্রি সেই তিনটা প্রেতিনীকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম' ; মাক্‌বেথ্ বলিলেন 'আমি তাহাদের কথা আর ভাবি না—সময় পাইলে তাহাদের ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে তোমায় আমায় পরামর্শ করিব।' বাঙ্কোরা পিতা পুত্রে শয়ন করিতে গেলেন। মাক্‌বেথ দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইলেন ; সম্মুখে শূন্যে দেখিলেন, তরবারি লম্বমান, তাহার মুট তাঁহার হস্তের দিকেই রহিয়াছে ; ধরিতে গেলেন, ছায়া তরবারি ধরা যাইবে কেন? তখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার দুশ্চিন্তাই তাঁহার দৃষ্টিপথে তরবারি রূপ ধরিয়া তাঁহাকে দুষ্কার্য্যে পথ প্রদর্শন করিতেছে. তখন মাক্‌বেথ আপনার করাল হৃদয়ে সেই গভীর মেঘাচ্ছন্ন নিশীথের করালচ্ছায়া অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। অন্য গৃহ হইতে মাক্‌বেথ গৃহিণী সঙ্কেত ঘণ্টাধ্বনি করিলেন ; অমনি মাক্‌বেথ ডঙ্কানের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। প্রথম দৃশ্য শেষ হইল। দুরাকাঙ্ক্ষার দাহনে, দুষ্প্রবৃত্তির বাতাসে, এহেন বীর মাক্‌বেথ পতঙ্গের মত ভস্মীভূত হইতে চলিল।

দ্বিতীয় দৃশ্যে এক প্রকোষ্ঠে একাকিনী মাক্‌বেথ্ গৃহিণী দণ্ডায়মানা। পিশাচী সুরাপান করিয়াছে ; সুরার অস্বাভাবিকী উত্তেজনায় আহ্লাদ করিতেছে, পেচকের বিকট শব্দে, ডঙ্কানের কাল নিকট বুঝিয়া প্রেতের মত আনন্দ করিতেছে। পার্শ্বস্থ গৃহে মাক্‌বেথের কম্পিত কণ্ঠরব হইল—'ওখানে কে ও—কি ও'—পিশাচী ভাবিতে লাগিল 'তবে হয়ত প্রহরীরা জাগিয়াছে, কাজটা তা হ'লে, হলো না—দেখিতেছি, নিদ্রিত ডঙ্কানকে যদি আমার পিতার মত না দেখাইত, তাহা হইলে আমিই কার্য্য শেষ করিতাম'। সৎকর্ম্মে অসৎকর্ম্মে—প্রবৃত্তি-রূপারা লওয়াইতে পারেন। আপনারা করিতে পারেন না—লেডি মাক্‌বেথ পিশাচী বটে। পিশাচ নহে। লওয়াইতেই পারে, স্বহস্তে করিতে পারিবে কেন? কিন্তু পারিল না বলিয়া, যেন একটু দুঃখিত হইল ; আপনাকে আপনি প্রবোধ দিল, 'পিতার মত

দেখিলাম,বলিয়াইত পারিলাম না।' এমন সময় রক্তাক্ত-হস্তে মাক্‌বেথ আসিয়া বলিল 'আমি কার্য্য শেষ করিয়াছি।'

দেখ কি বিষম পাপের কাণ্ড! ডঙ্কান মাক্‌বেথের পরম আত্মীয় নিকট কুটুম্ব; প্রভু হইয়াও সহচরের ন্যায় ব্যবহার করিতেন; রাজা হইয়া, বন্ধুর ন্যায় ভাল বাসিতেন; মাক্‌বেথকে সম্মানিত করিয়া ডঙ্কান আপনাকে শ্লাঘ্য বলিয়া মানিতেন। ম্যাক্‌বেথকে সম্মানিত করিবার জন্য, মাক্‌বেথ আহ্লাদিত হইবেন মনে করিয়া, আহ্লাদ করিয়া তাঁহার ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন; অৰ্দ্ধ ঘণ্টা পূৰ্ব্বে মাক্‌বেথ-গৃহিণীকে বহুমূল্য হীরক খণ্ড উপহার প্রদান পূর্ব্বক, আনন্দে অকাতরে নিঃশঙ্ক নিদ্রায় শায়িত হইয়াছেন। সেই আত্মীয়, কটুম্ব রাজা, বন্ধু, পরমোপকারী প্রভু, যখন স্বগৃহে আশ্রিত অতিথি হইয়া নিঃশঙ্কে নিশ্চেষ্ট ভাবে, আতিথ্যে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তখন মাক্‌বেথ তাঁহাকে স্বহস্তে হত্যা করিল!!! আমরা শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক গোপনে বালীবধের কথা, সপ্তরথী কর্ত্তৃক বালক অভিমন্যুর হত্যাকাণ্ড, যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাবাদে শোকার্ত্ত দ্রোণাচার্য্যের হত্যাকাহিনী, অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক সুপ্ত পঞ্চপাণ্ডব শিশুর বধ বিবরণ প্রভৃতি পাপ হত্যাকাণ্ড শুনিয়াছি কিন্তু এমন হত্যাকারী মহাপাপী আর দ্বিতীয় দেখি না। প্রথমেই বলিয়াছি মাক্‌বেথ পাপের পাপ,মহাপাপ।

মাক্‌বেথ নাটকের প্রথমাঙ্ক, পাপের উদ্যোগ পর্ব্ব। এই উদ্যোগ পর্ব্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা প্রথম প্রবন্ধে করিয়াছি। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের আরম্ভেই মহাপাপের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তি। তাহার পর বাকি বার আনা ভাগে, পাপের পরিণাম প্রদর্শন। মহাপাপের গুরুভারে বীর মাক্‌বেথের হৃদয় দিন দিন কিরূপে নরকে নিমজ্জিত হইতে লাগিল, যে লেডি মাকবেথ একদিন আপনার পৈশাচিকী কঠোরতার স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিল, যে প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ চুম্বিত-চুচুক শিশুকে সে বক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া সচ্ছন্দে চূর্ণ করিতে পারে, সেই রাক্ষসীর এখন কি ভাবে সুষুপ্তিতেও স্বস্তি নাই, মহাপাপী দম্পতি হৃদয়ে মহাপাপ কিরূপে লীলা খেলা করিতে লাগিল—নাটকের এই শেষ বার আনা ভাগে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে মহাপাপ-ভয়ে পাপীর লাঞ্ছনা বিকট বিচিত্র মূৰ্ত্তিতে দেখান হইয়াছে।

পাপের অনাবিল পরিণাম হামলেট্ নাটকে আছে। হামলেট্ নাটকে পাপের গর্ভাধান বা ভ্রূণ সঞ্চার দেখান হয় নাই। সাঙ্গোপাঙ্গ পূর্ণাবয়ব পাপ দিনামার ভূমির রাজ মূর্ত্তিতে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর, হামলেট্ নাটকের আরম্ভ। এখানেও সেই দারুণ বিশ্বাস-ঘাতকতা সেই আত্মীয় হনন, সেই সুপ্ত ও নিশ্চেষ্টের বিনাশ, সেই রাজ-হত্যা। এখানে পাপ অতি গুরুতর; রাজা—অগ্রজ সহোদর; অনুগত অনুজ রাজ্যের উপর লোভ পরবশ হইয়া, রাজ মহিষীর উপর কামপরবশ হইয়া, সেই রাজাকে সুপ্তাবস্থায় হত্যা করিয়া রাজ্য করগত এবং রাজ মহিষীকে শয্যাভাগিনী করিল। রাজহত্যা, অগ্রজ হত্যা, সুপ্ত হত্যা, গুপ্ত হত্যা প্রভৃতি মহাপাপের সহিত গুর্ব্বিনী-গমন রূপ আর একটি মহাপাপ এখানে মিলিত হইয়াছে। এই পাপের পাপী ক্লডিয়স্ যখন দিনামার ভূমির সিংহাসনে নির্ব্বিবাদে নিঃশঙ্ক ভাবে অধিষ্ঠিত, তখনই হামলেট নাটকের আরম্ভ।

ম্যাক্‌বেথ নাটকের যে পর্য্যন্ত আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি, সেই ভাগের ব্যক্তিগত ও স্থানগত বৈশেষিকত্ব বাদ দিলে, তাহার পর, অর্থাৎ ম্যাক্‌বেথ কর্ত্তৃক ডঙ্কান্ হত্যার পর, ম্যাক্‌বেথ, নাটকের অংশরূপে হামলেট নাটক আরম্ভ করা চলে। হামলেট নাটকের প্রথমাঙ্কের প্রধান কথা—হামলেটের অপঘাত-মৃত পিতার প্রেতাত্মা গভীর নিশীথে রাজ প্রাসাদের সম্মুখে বিচরণ করে, প্রহরীরা দেখিল, হামলেটের বন্ধু হোরেশিওকে বলিল, হোরেশিও স্বচক্ষে দেখিয়া হামলেটকে বলিলেন। হামলেট দেখিলেন, প্রেতযোনি প্রতিহিংসা করিতে হামলেটকে উত্তেজনা করিলেন। হামলেটের পিতার প্রেতাত্মার পরিবর্ত্তে ডঙ্কানের প্রেতাত্মা এবং হামলেটের পরিবর্ত্তে মালকোমকে স্থাপনা করিলেই—হামলেট নাটকের প্রথমাঙ্কটি সম্পূর্ণরূপে ম্যাক্‌বেথ নাটকের অংশ হইয়া উঠে। ইহাতে ইহাই বুঝা যায়, যে দুই খানি নাটক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পৃথক্ হইলেও, অস্থিমজ্জায় এক। পাপের সামান্য স্ফুলিঙ্গ ধূমাইয়া ধূমাইয়া কিরূপে ক্রমে ক্রমে দুরাকাঙ্ক্ষার শুষ্ক সমৎকাষ্ঠের পরিপোষণে, কুপ্রবৃত্তির কুবাতাসের পরিসেবনে, দারুণ দাবানলে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, কিরূপে আপনার বাস্তুক্ষেত্র দগ্ধ করিয়া ফেলে, ম্যাক্‌বেথ নাটকে তাহাই দেখান হইয়াছে; আর সেই পাপানল আপনার জন্মভূমি দগ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, পার্শ্বস্থ বনভূমিতে ছড়াইয়া পড়ে,

কিরূপে সেই সকল দগ্ধ করে, তাহাই হাম্‌লেট নাটকে দেখান হইয়াছে। তা কি মাক্‌বেথ নাটকে নাই? আছে। গৌণভাবে আছে। মুখ্য কথা—মাক্‌বেথ দম্পতির হৃদয়ে পাপের উৎপত্তি, আধিপত্য এবং দৌরাত্ম্য প্রদর্শন। বাঙ্কোর হত্যায়, বালক মাক্‌ডফের বা তাহার মাতা লেডি মাক্‌ডফের হত্যায় বা যুবক সিওয়ার্ডের মৃত্যুতে, মূলপাপী মাক্‌বেথেরই ক্রম পরিণাম দেখান হইয়াছে। ইহাই বুঝান হইয়াছে যে এক মহাপাপ পাপকারীকে আরও শত পাপে লিপ্ত করে। মুঞ্জ তরু যেমন, আপনার বীজকোষেই বীজ সকল অঙ্কুরিত ও অঙ্কুর বর্দ্ধিত করিয়া আপনার হৃদয়েই শত শত ক্ষুদ্র তরু ধারণ করে, একটি জীবন্ত মহাপাপ তেমনই শত শত পাপাঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিরাজমান হয়, ইহাই মাক্‌বেথ নাটকের কথা। আর যেমন, 'নগর পুড়িলে দেবালয় না এড়ায়' সেইরূপ মহাপাপ নিষ্পাপ হৃদয়ও অধিকার করে। পাপ দুঃখের সূত্র সঞ্চারে সংক্রামক হয়—ইহাই হাম্‌লেট্‌ নাটকের কথা। দেখ এক ক্লডিয়সের মহাপাপ হামলেটে মহাদুঃখের অবতারণা করিল, সেই মহাদুঃখের সঞ্চারে হামলেট্‌ পাপে লিপ্ত হইতে লাগিলেন, হামলেট স্বহস্তে নরহত্যা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নারী হত্যার পাপের ভাগী হইতেছেন, স্বহস্তে জাল করিয়া দূত হত্যার দুষ্কৃতি করিতেছেন। ক্লডিয়সের মহাপাপে হাম্‌লেট্‌ মহাদুঃখী, হামলেট্‌ মহাদুঃখের মহাভাবে, নানা পাপে লিপ্ত; ক্লডিয়সের মহাপাপ কি কেবল নিকটস্থ নিষ্পাপ হামলেটকে পাপে লিপ্ত এবং ভস্মীভূত করিয়াই ক্ষান্ত? তাহা নহে; মহাদুঃখের সূত্র সঞ্চারে সেই পাপের প্রসব বৃদ্ধিতে অশীতি-পর বৃদ্ধ অমাত্য পলোনিয়সের অপঘাত মৃত্যু, ননীর পুত্তলী অফিলিয়ার পাথারে প্রাণ বিসর্জ্জন, সাহসী উৎসাহপূর্ণ লায়র্টিসের মহাপাপে লিপ্ত হইয়া অকালে কালমুখে প্রবেশ, দুই জন রাজদূতের বিদেশে ঘাতুক হস্তে অকারণ প্রাণ সমর্পণ, রাজসংসারের আকস্মিক শ্রী-হীনতা এবং রাজ্যে পরদেশীর অধিকার,—এ সকলই সেই মহাপাপের আনুসঙ্গিক ফল। মাক্‌-বেথ নাটকে সেক্‌স্‌পীয়র বলেন পাপ পাপীকে পোড়ায়—হাম্‌লেট নাটকে বলেন, তাত পোড়ায়ই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ বিস্তার করিয়া, পাপ ছড়াইয়া, চতুষ্পার্শ্বস্থ পাপী ও নিষ্পাপকে সমানে দগ্ধ করিয়া ফেলে। দুই খানি নাটক একটি নকসায় এইরূপে দেখান যাইতে পারে,—

মাক্‌বেথ

পাপের উৎপত্তি, পরিপুষ্টি, আধিপত্য, দুঃখ জনকতা, সংক্রমণ পরিণাম

হ্যাম্‌লেট

পাপের পরিণাম প্রদর্শন উভয় নাটকেরই মুখ্য উদ্দেশ্য। মাক্‌বেথ নাটকে পাপের উৎপত্তি, পরিপুষ্টি, আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে দেখান হইয়াছে, দুঃখজনকতা গৌণভাবে আছে; হ্যাম্‌লেট নাটকে আধিপত্য, দুঃখ জনকতা সংক্রমণ বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে—পরিপুষ্টি গৌণভাবে আছে। আধিপত্য উভয়েই সমান, পরিণাম একরূপ হইয়াও স্বতন্ত্র। উভয় নাটকেই বিদেশী রাজা কর্ত্তৃক স্বদেশ আক্রমণের কথা আছে। উভয় নাটকেই নরওয়ে রাজ আক্রমণকারী। মাক্‌বেথ নাটকে নরওয়ে রাজকে পরাভূত করিয়াই মাক্‌বেথের মনে দুরাকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, তাহাতেই পাপের সূত্রপাত—কিন্তু পরিণামে স্কটলণ্ডের সিংহাসনে প্রকৃত উত্তরাধিকারী মালকোম্‌ অধিষ্ঠিত; দেশে শুভকর শান্তি বিরাজিত। হ্যামলেট্‌ নাটকের আরম্ভে নরওয়ে রাজের আক্রমণ সূচনা, পরিণামে সেই নরওয়ে রাজ কর্ত্তৃক দিনামার ভূমির অধিকার, দিনামারগণের স্বাধীনতাচ্যুতি। ক্লডিয়সের পাপ সংক্রামক বলিয়া তাহার পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর। ভাল, ক্লডিয়সের পাপই বা সংক্রামক হইল কেন? আর মাক্‌বেথেরই বা সংক্রামক না হইল কেন?

পূর্ব্বেই ঐ প্রশ্নের উত্তরের আভাস দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাক্‌বেথ অপেক্ষা ক্লডিয়স্‌ গুরুতর পাপে পাপী। ক্লডিয়স্‌ লোভের সহিত কামপরবশ হইয়া অতি গুরুতর দুষ্কার্য্য করেন। গুরুপত্নী-গমন অতি গুরুতর পাপ। ইহার সংক্রামকতা অতি ভয়ঙ্কর; পিতৃ হন্তা অবাধে পিতৃবৈভব অধিকার করিতেছে, বিষয়ী লোকের পক্ষে এ দুঃখ মহাদুঃখ সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই পিতৃহন্তা, বৈভবাপহারী, আবার মাতাকে স্বীয় শয্যাভাগিনী করিয়াছে,—এ দুঃখ বিষয়ী অবিষয়ী সকলেরই শিরে শিরে লূণ লঙ্কার মত নিয়ত জ্বালা দিতে থাকে। মাতা দুশ্চারিণী বলিয়াই ধীর স্থির গম্ভীর প্রকৃতির হ্যাম্‌লেট দুশ্চিন্তায় অবসন্ন। পিতৃব্যের দুষ্কৃতি ও মাতার দুশ্চরিত্র ভাবিয়া ভাবিয়া হ্যাম্‌লেট—পাগল বল, চিন্তাপ্রিয় বল, দার্শনিক বল,—কবি বল, পাপী বল, অকর্ম্মণ্য বল, mystic বল, দুর্জ্ঞেয়

বল, বিশ্বাস হীন বল,যাহা বল, —তাহাই হইয়াছেন—তিনি সেক্‌সপীয়রের হাম্‌লেট হইয়াছেন—দুঃখের একরূপ জীবন্ত মূর্ত্তিমন্ত অবতার হইয়াছেন।

দুশ্চিন্তায় যে দুঃখী তাহার উপর পাপ যেন সহজেই সংক্রমণ করে। তাই আজি এ হেন হাম্‌লেট, নানা পাপে পাপী। মাতার দুশ্চরিত্রে হাম্‌লেটের ঘোরতর দুশ্চিন্তার উৎপত্তি—সেই দুশ্চিন্তার দুঃখসূত্রে পাপের সঞ্চরণ ও সংক্রমণ; তাহাতেই—রাজ পরিবার একেবারে শ্রীভ্রষ্ট ও রাজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট হইল। ডঙ্কানের পুত্রদ্বয় মলকোম্‌ ও ডনালবেনেরও পিতৃমৃত্যুতে ও রাজ্য নাশে মহাদুঃখ হইয়াছিল কিন্তু মাতার দুশ্চরিত্রের কলঙ্ক-রূপ দুশ্চিন্তায় তাঁহাদিগকে জর্জ্জরিত করে নাই। তাহারা আত্মরক্ষার্থ সময়ে বিদেশে গমন করিলেন, এবং জ্যেষ্ঠ মালকোম বীরের মত সসৈন্যে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া মাক্‌বেথকে পরাজিত করিয়া পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তবেই দেখা যাইতেছে,—পাপীর পক্ষে মহা পাপের পরিণাম সকল সময়েই ভয়ঙ্কর হইলেও সেই পাপের সংস্রব যদি স্ত্রী চরিত্র জড়িত থাকে, তাহা হইলে তাহাতে গৃহিণীতে গৃহস্থের গৃহস্থালি নষ্ট মহিষীতে রাজ্য নষ্ট হয়। আমাদের চলিত পদ্যে বলে,—

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, প্রজা কষ্ট পায়,
গৃহিণীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।

গৃহিণীর ব্যভিচার বাস্তবিক এমনই পাপই বটে; হাম্‌লেট নাটকে রাজার পাপের সহিত গৃহিণীর ব্যভিচার সংযুক্ত হওয়াতে,এক মহাপাপ, তুমুল মহা পাপ হইয়াছে। সেই পাপে—রাজার রাজ্য নষ্ট, প্রজার মহা কষ্ট, গৃহস্থের সর্ব্বস্ব নষ্ট এবং দিনামার ভূমি স্বাধীনতা ভ্রষ্ট হইল। লোভত মহাপাপ বটেই, কাম আবার সেই মহা পাপের মহাপাপ। লোভ নিজেই উচ্ছিন্ন যায়—কাম আবার আর একজনকে জড়াইয়া ক্রমে দশজনকে নষ্ট করে। লোভের পরিণাম ভয়ঙ্কর; কামের সংক্রামকতা অতি ভয়ঙ্কর।

মহাপাপের পরিণাম সর্ব্বত্র একরূপ হইলও মূলের বিভিন্নতা বশত প্রসবে ও বিস্তারে সেই পরিণামের বিভিন্ন মূর্ত্তি হয়, বোধ হয় এই কথাটি বুঝাইবার জন্যই সেক্‌সপীয়র একই রূপ কাহিনী লইয়া দুই খানি পৃথক নাটক লিখিয়াছেন। মাক্‌বেথ কাহিনীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এই কথা আরও বিশদ হইবে।

সেক্‌সপীয়রের নাটকগুলি সমস্তই প্রাচীন কাহিনী ও ইতিহাস হইতে গৃহীত; লীয়র প্রভৃতি কোন কোন নাটকে আবার দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন গল্পের একত্র সমাবেশ আছে। মাক্‌বেথ নাটকও স্কটলণ্ডের রাজাদিগের প্রাচীন কাহিনী হইতে গৃহীত। ডঙ্কান-মাক্‌বেথ বৃত্তান্ত বিভিন্ন পুরাবৃত্তে বিভিন্ন প্রকারে আছে, ঠিক কোন্ খানি হইতে সেক্‌সপীয়র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না—সম্ভবত তিনি তিন চারিটি বৃত্তান্তই দেখিয়া থাকিবেন। এক খানি পুরাবৃত্তের এক ভাগের সারাংশ আমরা দিতেছি,—

In Wyntown's Cronykil of Scotland an entirely different version is given Duncan is there the uncle of Macbeth who is Thane of Cromarty and Gruoch is Duncan's wife, who after the murder of her husband marries Macbeth * * It is in Wyntown that we first meet with the weird sisters, who however only manifest themselves to Macbeth and spur his ambition in a dream

Notes Clarendon series

কথাটা হইতেছে এই,—একখানি পুরাবৃত্তে আছে যে, ডঙ্কান মাক্‌বেথের পিতৃব্য, এবং ডঙ্কানের স্ত্রী, স্বামীর অপঘাত মৃত্যুর পর মাক্‌বেথকে বিবাহ করে। সেই পুরাবৃত্তেই তিনটা ডাকিনীর কথা আছে; তবে তাহারা স্বপ্নে দেখা দিয়াছে মাত্র।

এই তিনটা ডাকিনীকেই যখন সেক্সপীয়র নাটকের প্রস্তাবনাকারিণী-রূপে প্রথমেই আনয়ন করিয়াছেন, তখন তিনি যে ঐ পুরাবৃত্ত দেখিয়াছিলেন, তাহাই সম্ভব। সুতরাং পিতৃব্য পত্নী ডঙ্কানের স্ত্রীকে যে মাক্‌বেথ বিবাহ করেন, একথাও তিনি অবশ্য জানিতেন, কিন্তু এই মূল কথা তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা প্রথম প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি, মাক্‌বেথের ও হামলেটের কাহিনীর একই মূল কথা—রাজ্যলোভে রাজহত্যা। এখন দেখাইতেছি, যে মূল কাহিনীতে আরও ঐক্য ছিল, সেক্সপীয়র তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আদি কাহিনী দ্বয়ের মূল কথা—রাজ্য লাভে রাজ্য হত্যা, পরে

কাম মোহে গুর্ব্বিনী-গমন। কিন্তু মাক্‌বেথ নাটকে সেক্সপীয়র এই শেষ ভাগ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মূলে বিভিন্ন করিয়া তুলয়াছেন—কাজেই পরিণামে বিভিন্ন হইয়াছে। একটি কথা ভাগাভাগি করিয়া দুই খানি নাটকে বুঝান হইয়াছে।

সেক্সপীয়র যে কেবল এই দুই খানি নাটকেই একটি বিস্তৃত কথা ভাগাভাগি করিয়া লিখিয়াছেন এমন নহে, তাঁহার অন্যান্য নাটকেও এইরূপ আছে—রূপজ গুণজ মোহের অর্দ্ধেক পরিস্ফুটন রোমিও জুলিয়েট, অর্দ্ধেক আণ্টনি ও ক্লিওপেট্রায়, অবিশ্বাস খানিক লীয়ারে, খানিক ওথেলেও। একপ ভাগাভাগি ভাব, পরস্পর সাপেক্ষ ভাবত আছেই, এমন কথাও বলা যাইতে পারে, যে সেক্সপীয়রের সমস্ত গম্ভীর নাটক গুলি একত্র একখানি বৃহদ্গ্রন্থ, এক এক খানি নাটক একটি পরিচ্ছেদ মাত্র।

কেবল সেক্সপীয়র বলিয়া নয, প্রায়ই মহাকবিদের পৃথক পৃথক গ্রন্থের মধ্যে একটা গাঁথনী, একরূপ বাঁধনী থাকে। বিক্টর হুগো আপনার নবেল গুলি সম্বন্ধে নিজেই সে কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশের মহাকবিদের পৃথক্ পৃথক্ কাহিনীতেও এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণের ভক্তিকাহিনী দুইটিতে—ধ্রুবচরিত্রে ও প্রহ্লাদ চরিত্রে—ভক্তির দুইটি বিভিন্ন পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে। ধ্রুব প্রহ্লাদ—উভয়েরই অচলা ভক্তি—কিন্তু ধ্রুব রাজপদের অপেক্ষাও উচ্চপদের জন্য কামনা করে, প্রহ্লাদ রাজপদ, ইন্দ্রত্বপদ তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রহ্লাদের ভক্তি নিষ্কাম; ধ্রুবের ভক্তি সম্পূর্ণ সকাম। কাজেই ধ্রুব ও প্রহ্লাদের পরিণাম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভক্তিতে ভগবান্ মিলে—পরিণামে এতটুকু সমানই আছে—কিন্তু ধ্রুব—ধ্রুব লোকে, উচ্চপদে। আর প্রহ্লাদ বৈকুণ্ঠে; সেথানে—উচ্চ নীচে প্রভেদ নাই।

হাম্‌লেট ও মাক্‌বেথ নাটকের মূল পরিণাম একই—লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। কিন্তু মাক্‌বেথ দম্পতি লোভের বলে কয়জন লোককে মারিল, আর আপনারা মরিল, কিন্তু ক্লডিয়স্, লোভী অথচ কামী ক্লডিয়স্, ঝাড়ে বংশে সকলকে টানিয়া, হাম্‌লেট বংশে নির্ম্মূল করিয়া, স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমিকে পর-দেশীর কবল-গ্রস্ত করিয়া নরকে গমন করিল।

এই জগতের এক দিকে পাপে দুঃখে বড়ই মাখামাখি, বড়ই ঘেঁষাঘেঁষি;

অথচ কিন্তু বেষা বিষিও আছে; পাপ বলে দুঃখ, তোর সর্ব্বস্বত আমা-হতেই, ঐ দেখ, মহতেজা মাক্‌বেথ আমার ভাণ্ডারের ধনেই তোর গৃহ পূরণ করিতেছে। দুঃখ বলে, তা সত্য, আমি গোড়ায় তোমার নিকট ঋণী বটে কিন্তু এখানে সেই মূলধন খাটাইয়া দেখ দেখি, হাম্‌লেট—আজ কি ধনে ধনী হইয়াছে; হাম্‌লেট—চিন্তা জীবন, অকর্ম্মণ্য, কবি-কল্প, দার্শনিক, বাতুল, বিশ্বাস-হীন, দুর্জ্জেয় ও দুরধিগম্য, হাম্‌লেট সকলই—কেননা হাম্‌লেট দুঃখের অবতার—হামলেট—মহাদুঃখী।

শ্মশানে শিব।

১।

গভীর আঁধারময়ী নীরবা অবনী,
ভাসিছে কালের স্রোতে স্তম্ভিত অন্তর;
প্রকৃতির শিরোপরি অগণিত ফণী,
বিজলীর ছটা রূপ গর্জ্জে ভয়ঙ্কর।
সমস্ত গগন ব্যাপ্ত জীমূত মালায়,
আঁধার নিশীথে আরো আঁধার খেলায়

২

অদূরে শেখর রাজি দাঁড়ায়ে নিশ্চল,
স্থির মনে উদাসীন মহামূর্ত্তি ধরি,
নাহি গণি আঁধারের পরাক্রম বল;
পড়ে পদতলে তার দলিত কেশরী।
বিরাগ—বিরাগ—যেন অচলের গায়;
ভূষিত, আসক্তি ছাড়ি, বৈরাগ্য ভূষায়।

৩

সম্মুখে প্রবাহমানা ভীমা তরঙ্গিণী;
ঘনরাজি ভীমাকাশে করি বিলোকন,
আস্ফালনে তরঙ্গের তথা নিশীথিনী
কাঁপিছে, হতেছে যেন অতলে মগন।
শান্তি নাই, কোথা শান্তি? এ যে ভীম বেশ,
মহা প্রলয়ের এই বুঝি বা আবেশ।

৪

ভীষণ দৃশ্যের মাঝে উহা কি আবার?
ঐ যে ভীষণ-তর পাবক জ্বলন,
লক লক শত জিহ্বা উচ্চ চূড়াকার,
পুনঃ নদী বক্ষ ভেদি অতলে মগন;
অগ্নিময় চারি দিক ভীষণ আকার;
নহে রে আলোক ইহা জীবন আঁধার।

৫

ছুটিছে ভীষণ বেগে ভীম প্রভঞ্জন;
উপাড়িবে যেন দর্পে সমস্ত ধরণী,
একটী জীবন তার তুলার মতন
উড়ে যায়—কোথা যায় ছাড়ায়ে মেদিনী।
আঁধারে প্রলয় ভীম, মহা ভীমবেশ,
আঁধারে আঁধার মিশি গাঢ় তম শেষ।

৬

প্রভঞ্জন সহ মিশি পাবক ভীষণ,
ছড়াইছে চারি দিকে শিখা আপনার
ছুঁইছে আকাশ পুন, ভীষণ দর্শন।
একস্থানে সমাবেশ আলোক আঁধার।
এ অগ্নি আলোক নয় আঁধার কেবল,
শ্মশান, যাহাতে দগ্ধ মানব সকল।

৭

কিছু কাল আগে যারে দেখেছি হাসিতে,
চিতায় শয়ান সেই, ত্যজিয়ে জীবন ;
প্রতি রোম কূপে অগ্নি, প্রত্যেক মজ্জাতে,
পশি পরমাণু তার করিছে দাহন।
পরতে পরতে এবে হৃদয়ের ভার
পুড়িয়া করিছে তায় শুধু ভস্মসার।

৮

উঠিছে আকাশে ধূম শরীর নাশিয়া,
পড়ে আছে ধরণীতে বিভূতি অসার ;
জীবনের সহ তেজ গিয়াছে চলিয়া
শূন্যে শূন্যে মিশা মিশি সব শূন্য সার।
কোথায় মানব তুমি দর্প অবতার ?
না হয় মনেতে ছিলে, সংসার মাঝার।

৯

নহে রে মানব শুধু গেল যে চলিয়া,
ঐ আরো কত প্রাণী কত সৃষ্টি হায়।
শূন্যেতে জন্মিয়ে, গেল শূন্যেতে মিশিয়া,
অণু পরমাণু তার পাবে না কোথায়।
সবার বিনাশ যবে হয় এক কালে,
ভীষণ শ্মশান বলি জানেরে সকলে।

১০

একটি সুন্দর ফল জন্মিল শাখীতে,
সুন্দর কুসুম এক হাসিল ধরায় ;
ছড়ায়ে বল্লরী কোম হৃদি বিটপীতে,
প্রকাশিল প্রেমতার, সোহাগ বাড়ায়।
সেই সব শ্মশানে একত্র মিশিয়ে
পুড়ে গেল নিজ প্রিয় ধন তেয়াগিয়ে।

১১

সুন্দর গঠন হায় ভাঙ্গিল ফলের
খান খান হয়ে গেল, পুড়িল শ্মশানে।
কঠিনতা অবিদিত যেই কুসুমের,
হাসি যার সখা, প্রেম কটাক্ষ ক্ষেপণে,
সোহাগে গঠিত সেই বল্লরী সুন্দরী,
পুড়িছে শ্মশানে এবে সব পরিহরি।

১২

আরো যে ভীষণ দৃশ্য এ মহাশ্মশানে,
ডাকিনী যোগিনী অই, হাসে বে উল্লাসে,
শোষিছে শোণিত যত; বিশাল বদনে
রক্তধারা পড়িতেছে উন্নত উরসে।
প্রাঙ্গনে দেউটী জ্বলে ভীষণ দর্শন!
দেখিলে তা দিকে মুদে আপনি নয়ন।

১৩

হস্ত নাই কারো পদ অর্দ্ধাঙ্গ কাহার,
কবন্ধ কেহ বা, কেহ কণ্ঠ আপনার
ভাঙ্গিয়ে শোণিত পিয়ে পিপাসা দুর্ব্বার
শোষি তিরপিছে; দেখ ভীষণ আকার!
কেহ বা নাচিছে লয়ে বিশাল কৃপাণ,
কেহ তার করে নিজে দেয় বলিদান।

১৪

নাহি দয়া নাহি মায়া এদের সহিত,
যত প্রাণ, যত জীব সবংশ ধরিয়া,
ফেলে অগ্নি মাঝে তায়, হয়ে উল্লসিত
পাবক ছড়ায় শিখা আকাশ ছুঁইয়া।
কঠিন কঠিন তম বজ্জর হইতে
করে, সবে ফেলে দেয় অগ্নির কুণ্ডেতে।

১৫

কে ওই বসিয়া হেথা যোগরত মন,

মহাযোগী মহাজ্ঞানী অনন্ত শরীর ;
জ্যোতির্ম্ময় দিব্য কান্তি ; প্রভায় আপন
দৃষ্টি মাত্র করে দূর মানস তিমির।
কে ওই শ্মশানে বসি পুণ্য জ্ঞানচ্ছায়া !
দিব্য জ্ঞান জনমিল কাহারে হেরিয়া ?

১৬

এই কি সে মহাদেব শিব মহেশ্বর,
মহাযোগী শিব ময় অনাদি কারণ !
এই কি বিরাগী সেই, শুনেছি যাহার
শ্মশানেই বাস, আর বিভূতি ভূষণ।
শ্মশানে মশানে থাকি মহাযোগী বেশে
মহাযোগ শিক্ষা দেয় তৃষিত মানুষে।

১৭

হেরি এই মহাযোগী পুণ্য প্রস্রবণ,
চলি গেল শ্মশানের ভীতি চিত হতে,
ডাকিনী যোগিণী আর ভীষণ-দর্শন।
কিছুমাত্র শঙ্কা মোর নারে জন্মাইতে।
আঁধারে ছিলাম যেন নিমিষের আগে
আলোকিত হলো চিত দিব্য জ্ঞান রাগে।

১৮

বৈরাগ্য বিভূতি লিপ্ত অনন্ত শরীরে
প্রেম পুন তার মাঝে বিজলী খেলায় ;
বৈরাগ্য প্রেমের সমাবেশ একাধারে
কার নাহি হয় এতে দিব্য জ্ঞানোদয় ?
শিখ রে মানব হেথা অসার সংসার,
হের রে শ্মশানে, হবে বৈরাগ্য সঞ্চার।

১৯

হের রে মানব এই মহা যোগী পানে
কেমন হাসিছে প্রেম বদনে সুন্দর :

শিখ রে করিতে প্রেম আপনার জনে,
কিন্তু নাহি রবে মজি তাদের ভিতর ;
সংসারে বাসিবে ভাল, সৃষ্টি বিধাতার,
শিখিবে শ্মশান হতে বৈরাগ্য আবার।

২০

ঐ দেখ,

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মাগুলি পড়িছে আসিয়া,
তাঁহার চরণতলে ; অনিত্য শরীর
ভস্মীভূত অইখানে ; দূরেতে থাকিয়া
কি সাধ্য পর্শিতে তাঁর চরণ সুস্থির ;
পার্থিব ইন্দ্রিয় নর করি ব্যবহার
দেখিবে কি তারে ? উহা অসাধ্য চেস্টার।

২১

প্রেমের আদর্শ পুন এই মহেশ্বর,
শিখাইছে প্রেম সবে দেখায়ে সংসারে,
"প্রকৃতি পুরুষরূপে," যাহার অন্তর
প্রেমে বশীভূত নয়, বাঁচিবে কি করে ?
এই প্রেমে এ বৈরাগ্য নাই রে কখন,
—মোহ নির্দ্দয়তা, করি অনিত্য লোকন।

২২

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল—
ইঁহার চরণ লাভ, বাসনা করিলে
বৈরাগ্য, প্রেমের চাই সাহায্য কেবল ;
শ্মশান সংসার দুই আছে এক কালে।
কিন্তু রে শ্মশানে পাবে,— ব্যাকুলিত মন !
ত্যজিয়ে এ "অহংভাব"— তাঁহার চরণ।

২৩

"মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা মৈথুন" মকার
একাধারে সমাবেশ এই শ্মশানেতে,

তাঁহার চরণ তলে ; খোঁজ একবার
পাইবে সকল, হবে দিব্যজ্ঞান চিতে।
ইনিই শিখান ক্রম পঞ্চ মকারের
ইঁহার করুণা, পথ সমাধি-লাভের।

২৪

বৃথা চেষ্টা মানুষের বৃথা পরিশ্রম
নিজ বলে পুণ্য শান্তি লভিবার তরে ;
দুঃখ নিমজ্জিত আত্মা করিয়া গ্রহণ
ইনিই শিখান পুণ্য লভিবে কি করে ;
সংসারের মাঝে সত্য চির অবস্থিত,
কিন্তু মায়া তমো ঘোর, পাবে না তাহায়,
দুর্ব্বল হৃদয় লয়ে ; আসবে শ্মশানে
পুণ্য-শান্তি-প্রদ-পদ লভিবে এথায়।

২৫

পিতৃদেব !

পেয়েছি তোমার দেখা বহু ভাগ্য ফলে ;
অভয়ে বসিতে দেও তব শ্রীচরণে ;
এ পাপ হৃদয় দগ্ধ সংসার জঞ্জালে
জানাইবে কটী কথা আশান্বিত মনে।
সন্তান অধম হলে, নিকটে পিতার
সমান স্নেহের ধন,— ভরসা আমার।

২৬

অর্দ্ধেক জীবন গেল অতীত হইয়া,
না শিখিনু না জানিনু লভিব কেমনে
দিব্য জ্ঞান, যার বলে স্বরূপ জানিয়া
গঠি পরকাল তরে আত্মা সাবধানে।
সুন্দর করিয়া আত্মা বিধানে তোমার
গঠিত না হলে, সব যতন অসার।

২৭

মজিয়াছি সংসারের অলীক মায়ায়,

না জানিয়া আত্মতত্ত্ব, অনিত্যে আপন
বিশ্বাস স্থাপন করি, প্রাণ মন কায়
সঁপিয়ে তাহার করে, করেছি গ্রহণ
অসার অশান্তি রাশি হৃদি দুর্ব্বলতা—
প্রতিক্ষণে কক্ষ চ্যুত ভূমে তারা যথা।

২৮

অনন্ত জীবন করি এদেহে ধারণ,
মরেছি অনন্ত বার,——গণনা অতীত,
অনন্ত জীবন তাই অনন্ত মরণ,
প্রতিক্ষণে বাঁচি পুন প্রতিক্ষণে মৃত।
মরিয়াছি ততবার গেল যতক্ষণ,
যতক্ষণ পুন পাই,— ততই জীবন।

২৯

জীবাত্মাও সংসারের ক্ষুদ্র শক্তি লয়ে,
মরেছে অনন্তবার; বাঁচিছে আবার;
কিন্তু দেব শিখে নাই কেমন করিয়ে
দিব্য জ্ঞান লাভ হবে; কিম্বা আপনার
কেমনে হইবে যোগ পরমাত্মা সনে—
কেমনে রহিবে সুখে তাঁহার চরণে।

৩০

পিতৃদেব।

চাহিয়াছি শতবার কত চেষ্টা করি
পরাজিতে রিপুগণে; কিন্তু সে যতনে
হয়েছি বিফল; আরো সমুদয় অরি
প্রবল বেগেতে রত মোরে আক্রমণে,
জানিয়াছি তাই, বিনে করুণা তোমার,
সাধ্য নাই মানবের রিপু নাশিবার।

৩১

তুমি যবে দয়া করি দীন-প্রার্থনায়

বল দেও শত্রুগণে করিতে বিনাশ,
মুহূর্ত্তেকে পায় নাশ রিপু সমুদায়;
কিন্তু নিজ বলে নর বিফল প্রয়াস।
তাই পিতঃ ক্লান্ত হয়ে তোমার চরণে
করি আত্ম সমর্পণ দয়া কর দীনে।

৩২

বিস্তৃত শ্মশান ক্ষেত্র— আমার হৃদয়,
কতশত "আমি" গুলি কত কাল ধরে,
মরিয়াছে মরিতেছে, সংখ্যা নাহি হয়,
"মহা শ্মশানের" সম ভাবিনু ইহারে।
একটী মহাশ্মশান এক যুগ হলে
দুই যুগে সেই নাম অবশ্যই ফলে।

৩৩

জানি কিন্তু—কর স্থিতি সে মহা শ্মশানে
চিরকাল; তাই আজি বড়ই উল্লাস—
আমারো হৃদয়ে স্থিতি তেমনি বিধানে
করিবে অনন্তকাল, শ্মশান-নিবাস।
আত্মা মোর নিত্য নিত্য হেরিবে তোমারে,
পূজিবেও নিত্য নিত্য ভক্তি উপহারে।

৩৪

পিতৃ দেব!

শিখাও আমায় আজি নূতন বিধান,
চালাও তোমার আজ্ঞা পালিতে সতত,
সংসারে আজ্ঞায় তব করি অবস্থান
কাটি এ জীবন-কাল না হয়ে মোহিত;
নূতন জীবন দেও হৃদয়ে আমার,
প্রণামি তোমার পদে শত শত বার।

শ্রীকামিনীকুমার দাস।

কৃষ্ণনগরের রাজবংশ।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশাবলির বৃত্তান্ত চারিখানি প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রথম খানি কোন অপ্রকাশিতনামা পণ্ডিতের লেখা, সহজ সংস্কৃতে গদ্য গ্রন্থ—ক্ষিতীশ বংশাবলি-চরিতম। ইহাতে আদিশূরের সময়ে ভট্ট নারায়ণের আগমন অবধি কৃষ্ণচন্দ্রের অভিষেক পর্য্যন্ত আছে। দ্বিতীয় খানি রাজীবলোচন কর্ত্তৃক বিরচিত, বাঙ্গালা গদ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের বংশ বিবরণ, ইহাতে ভবানন্দ মজুন্দারের পিতামহ কাশীনাথের বাগুয়ানে আগমন অবধি কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামের মৃত্যুপর্য্যন্ত আছে। ৩য়টী। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের লিখিত বিবরণ। চতুর্থ—কৃষ্ণনগরের রাজের টীর ভূতপূর্ব দেওয়ান স্বর্গীয় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ রাজা ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণের বাঙ্গালায় আধিপত্য স্থাপনাবধি বর্ত্তমান রাজা ক্ষিতীশচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত (১৮৭১) নবদ্বীপ রাজবংশের ইতিহাস, গ্রন্থখানি ১৮৭৫ সালে লিখিত।

শেষোক্ত গ্রন্থ বঙ্গের শিক্ষিতমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল দেশপ্রসিদ্ধ; প্রথম দুইখানি বড় দুষ্প্রাপ্য। বাঙ্গালা গ্রন্থখানি সমগ্র দেখি নাই, উদ্ধৃত অংশ বিশেষ দেখিয়াছি মাত্র। সংস্কৃত ক্ষিতীশ-বংশাবলি চরিতম্ সম্প্রতি একখানি দেখিতে পাইয়াছি।*

প্রথম তিনখানি গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

সংস্কৃত ক্ষিতীশবংশাবলি চরিতের শেষ কথা—রাজা রঘুরাম নিজেও যাগাদি ক্রিয়া করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষ রাজ্য পালনপূর্ব্বক ষোল শ পঞ্চাশ শকে ভাগীরথীতীরে মুক্তপ্রাণ হইয়া পরমগতি লাভ করিলেন।

তাহার পর সেই বর্ষে, মুর্শিদাবাদাধিকৃত যবনের অনুমতি অনুসারে অমা-

---

* সংস্কৃত গ্রন্থখানি ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের। মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের দৌহিত্র আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্যামাধব রায় আমাদিগকে দেখিতে দিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি ১৮৫২ সালে বর্লিনে ছাপা। আমরা উহা পুনর্ব্বার মুদ্রিত করিব এবং শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্কৃত মাসিকপত্র বিদ্যোদয়ের অংশ রূপে উহা প্রকাশিত হইবে। বাঙ্গালা গ্রন্থের কেহ সন্ধান বলিয়া দিলে পুনর্মুদ্রন করিতে পারি।

-ত্যেরা কৃষ্ণচন্দ্র নামে তাঁহার বহুগুণ নিধান পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিল।

বাঙ্গালা গ্রন্থখানির শেষ কথা এই;—

কিয়ৎকাল পরে রঘুরাম কৃষ্ণচন্দ্রকে রাজ্য দিয়া ঈশ্বর সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

তৃতীয় পুস্তক অন্নদামঙ্গল সম্বন্ধে সকলেই জানেন,—

বেদলয়ে ঋষি বসে ব্রহ্ম নিরূপিলা,
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

অর্থাৎ—১৬৭৪ শকে অন্নদামঙ্গল সাঙ্গ হয়। তখন কৃষ্ণচন্দ্র চব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিতেছেন। অন্নদামঙ্গলের কল্পনা ইহার দশ বৎসর পূর্ব্বে হয় নাই, তাহার প্রমাণ আছে। ভারত নিজ গ্রন্থ সূচনার বিবরণ নিজেই গ্রন্থের দুই স্থানে দিয়াছেন। দুই স্থানে একই কথা। গ্রন্থারম্ভে আছে,—

মহাবদ জঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরাণা বলে বার লক্ষ টাকা চায়॥
* * * *
বন্ধ করি রাখিলেক মুরসিদাবাদে।
কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে॥
* * * *
অন্নপূর্ণা ভগবতী মূরতী ধরিয়া।
স্বপনে কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়॥

গ্রন্থ শেষভাগে আছে,—

শাকে আগ মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে।
বরগীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে॥
আলিবর্দ্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে।
নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে॥
বন্ধ করি রাখিবেক মুরসিদাবাদে।
মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে॥

স্বপ্নে দেখা দিব অন্নপূর্ণা রূপ হয়ে।
এই গীতে পূজার পদ্ধতি দিব কয়ে॥

এই শেষ ভাগের কবিতার প্রথম পংক্তির অর্থ—১৬৬৪ শক। সেই শকে বর্গীর বিভ্রাট, তাহার পর কৃষ্ণচন্দ্র বন্দী, তাহার পর অন্নদামঙ্গলের সূচনা। সুতরাং রায় গুণাকরের কথাতেই বুঝা যাইতেছে, যে অন্নদামঙ্গলের সূচনা ১৬৬৪ শাকের পূর্ব্বে হয় নাই।

বাঙ্গালা গ্রন্থখানিতে যদিও কৃষ্ণচন্দ্রের নাম আছে কিন্তু রঘুরামের মৃত্যু বা কৃষ্ণচন্দ্রের অভিষেকের কথা নাই। তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে, যে ওখানি রঘুরামের জীবদ্দশাতেই লিখিত হয়।

সংস্কৃত গ্রন্থখানি কৃষ্ণচন্দ্র অভিষেকের পরে লিখিত। কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণচন্দ্রের বিবরণ বিদ্যমান নাই। গ্রন্থের পূর্ব্বে কৃষ্ণচন্দ্র বোধ হয় কোন বিশেষ কীর্ত্তি কিছু করেন নাই। বাজপেয় যজ্ঞ, জ্ঞানবাপীর সোপান, বা অন্নদার পূজা প্রচার প্রভৃতি, কিছু গ্রন্থে তাহার উল্লেখের সম্ভাবনা ছিল। সম্ভবত ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্ কৃষ্ণচন্দ্রের অভিষেকের কিছু পরেই লিখিত।

কৃষ্ণচন্দ্র যখন চৌদ্দবৎসর সিংহাসনে, তখন অন্নদামঙ্গলের সূচনা। যখন অন্নদামঙ্গল শেষ হয়, তখন কৃষ্ণচন্দ্র চব্বিশবৎসর রাজত্ব করিতেছেন।

এই সমালোচনায় ইহাই অনুমান হয়—বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থখানি সর্ব্বাগ্রে লিখিত, তাহার পর সংস্কৃত গ্রন্থ, সর্ব্ব শেষে অন্নদামঙ্গল রচিত হয়।

অন্যবিধ সমালোচনাতে এই মতের প্রতীকার হয়। তিন খানি গ্রন্থের বিবরণ তুলনা করিলে দেখা যায়—বাঙ্গালা গ্রন্থে অনেক কথা নাই কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থে আছে। ভবানন্দের পিতামহ কাশীনাথ হইতে বাঙ্গালা গ্রন্থের আরম্ভ। কাশীনাথ নদিয়ার জমীদার বলিয়া কথিত হন। কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থে দেখান হইতেছে যে এই বংশ চির প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ। ভট্টনারায়ণ বঙ্গদেশে আসিয়া প্রদেশাধিপতি রাজার মত বাস করেন, আদিশূরের নিকট গ্রাম ভূমি ক্রয় করেন, শুধু তাহাই নহে, তিনি রাজকুমার, তাহার পিতা ক্ষিতীশ কান্যকুব্জ দেশের কোন প্রদেশে রাজা ছিলেন। আবার দেখা যায় যে এই দুই খানি গ্রন্থের একটী কথা কোন বিশেষ উদ্দেশে ভারতচন্দ্র যেন একটু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

বাঙ্গালা গ্রন্থে রঘুরাম রায়ের বন্দী হওয়ার কোন কথাই নাই। আমাদের পূর্ব্ব অনুমান মত রঘুরামের জীবদ্দশায় এই গ্রন্থ লিখিত হইলে, ওরূপ একটি গুরুতর কথা কেন লেখা হয় নাই, তাহা বুঝা যায়।

আবার একটি কথা বাঙ্গালা গ্রন্থে আছে, কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থে নাই। সেটি ভবানন্দ মজুমদার কর্ত্তৃক বর্ণিত বিদ্যাসুন্দরের কথা। সংস্কৃত গ্রন্থ পরে রচিত হইলেও এই ভাগটি কেন পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালা গ্রন্থের ভাব এইরূপ, সমস্ত গল্পটি বিশেষরূপে চোরপঞ্চাশতে আছে, ভবানন্দ তাহা হইতেই মানসিংহকে শুনান। এখন দেখা যাইতেছে, যে ক্ষিতীশবংশাবলি চরিতের গ্রন্থকার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত—তিনি জানিতেন যে চোরপঞ্চাশতে ওরূপ কিছুই গল্প নাই—সুতরাং তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে গল্পটা কেবল গল্প মাত্র—সম্ভবত তাহাতেই ঐ ভাগ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আর একটি কথায় অন্নদামঙ্গলের সহিত অন্য দুই খানি গ্রন্থের বিরোধ আছে।

বাঙ্গালা গ্রন্থে আছে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী বড়গাছি গ্রামের হরিহোড়ের বাটী হইতে ভবানন্দ মজুন্দারের বাটীতে ঝাঁপি লইয়া আগমন করেন। ইহাও আছে যে ভবানন্দের লক্ষ্মী-সেবা ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থে আছে, ভবানন্দ প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী ও গোবিন্দ বিগ্রহদ্বয়ের মহা সমারোহপূর্ব্বক বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, হঠাৎ বর্ষা উপস্থিত হওয়াতে সেই বিবাহ দেওয়া হইল না, কিন্তু সঙ্গৃহীত দ্রব্যজাতে মানসিংহের সমগ্র সৈন্যসমূহের রসদ যোগাইলেন; তাহাদিগকে ঘোর দুর্যোগে রক্ষা করিলেন এবং তাহাতেই মানসিংহের প্রিয়পাত্র হইলেন।

ভারতচন্দ্র কিন্তু এমন কথার কোন আভাস কোথাও দেন না যে ভবানন্দ কখন লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বা লক্ষ্মীসেবা তাঁহার ছিল। ভবানন্দের ভবনে যে গোবিন্দ বিগ্রহ ছিল, একথা অন্নদামঙ্গলে আছে;—একস্থানে,—

মানসিংহ গেলা মজুন্দারের আলয়।
দেখিয়া গোবিন্দ দেবে মহানন্দময়॥

আসরফী বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত।
দিলেন গোবিন্দ দেবে কব আমি কত॥

অন্যস্থানে ভবানন্দ নিজ বাটীতে যাইয়াই—

প্রথমে গোবিন্দ দেবে প্রণাম করিলা।
জনকের জননীর চরণ বন্দিলা॥

কিন্তু কোথাও ভবানন্দের লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর কথা ভারতে নাই। ভারতের মতে ভবানন্দের গোবিন্দজী—হয়, বাচিলাব,না হয় উইডোয়র।

ভারতচন্দ্র লক্ষ্মীঠাকুরাণীর পরিবর্ত্তে অন্নদা দেবীকে হরিহোড়ের বাটী হইতে ভবানন্দের ভবনে আনিয়াছেন, এবং আড়ম্বরে ভবানন্দকে দিয়া অন্নদার পূজা ও আয়োজন করাইয়াছেন। দেবী অন্নদা বা অন্নপূর্ণার মহিমা প্রচারই অন্নদামঙ্গলের স্পষ্ট লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে গিয়া ভারতচন্দ্র প্রকারান্তরে ভবানন্দকে অন্তত তাঁহার গোবিন্দদেবকে লক্ষ্মী-ছাড়া করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ইহাতে গ্রন্থে একটু অসঙ্গতি দোষও হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত গ্রন্থ সূচনার কথা স্মরণ করুন—অন্নপূর্ণা বলিছেন—

শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়॥
আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ।
কয়ে দিলা পদ্ধতি, গীতের ইতিহাস॥
চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায়॥

অর্থাৎ অন্নপূর্ণা নিজমূর্ত্তি স্বয়ং প্রকাশ করিতেছেন,পূজার পদ্ধতি গীতের ইতিহাস, পূজার সময়,—সমস্তই বলিয়া দিয়া মঙ্গলগীত প্রকাশ করিতে আদেশ করিতেছেন। যদি ইহার বহু পূর্ব্বে ভবানন্দ এইরূপ চৈত্রমাসে অন্নদার পূজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি করিয়াছিলেন, আর সে সকল কথা যদি রাজসংসারে পরিজ্ঞাত ছিল, তবে আবার স্বপ্ন দৃষ্টমূর্ত্তি চৈত্রমাসে, কথিত পদ্ধতিতে, পূজা কর—এ কথা অন্নপূর্ণা বলেন কেন? আপনারা বলিতে পারেন, দেবতার মায়া আমরা কিরূপে বুঝিব? আমরা বলি, কবির মায়ায় এখানে দেবতার মায়া হইয়াছে। যখন প্রথম দুইখানি গ্রন্থ লিখিত হয়, তখন কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক

অন্নপূর্ণা পূজা প্রচারের কল্পনাই উঠে নাই, সুতরাং গোবিন্দদেবের কমলা বিচ্ছেদ হয় নাই এবং ভবানন্দও লক্ষ্মীলাভ করেন। অন্নদামঙ্গলের রচনা কালে রায়গুণাকর অন্নদার মহিমা বর্ণনা মানসে একটু হেরফের করিয়াছেন।

সে যাহা হউক এখন আমরা ভারতচন্দ্রের সমালোচনা করিতেছি না—পূর্ব্বোক্ত তিনখানি গ্রন্থের, অগ্রপশ্চাৎ কাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। এই কথার পর, আবার দৃঢ়তা সহকারে বলা যাইতে পারে, যে গদ্য গ্রন্থখানি প্রথম, পরে সংস্কৃত চরিতখানি, সর্ব্ব শেষে অন্নদামঙ্গল হয়। অন্নদামঙ্গলের সমাপ্তি কাল কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বের চত্বারিংশতিতম বৎসর। বাঙ্গালা গ্রন্থখানির সময় সম্ভবত কৃষ্ণচন্দ্রের কিছু পূর্ব্বে। ২৫, ৩০ বৎসরের মধ্যে তিনখানি গ্রন্থই লিখিত হয়।

এই তিনখানি গ্রন্থের কথিত বৃত্তান্ত কতদূর ঐতিহাসিক, এক্ষণে তাহা দেখা যাইতেছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণা মহিমার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা প্রচার করিতে ব্যস্ত। ভবানন্দ মজুন্দার বঙ্গপুরুষ পূর্ব্ব হইতে, কৃষ্ণচন্দ্রের বংশ,—রাজবংশ, ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে এ কথা প্রচারিত হইলেও, সে কথা [illegible] ভারতচন্দ্র দেন নাই। নানা স্থলে দিতে পারিতেন। [illegible], [illegible] যে কোন স্থলে দিলেই চলিত। অন্নদাদেবী ভবানন্দকে [illegible] কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন, সচ্ছন্দে পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় দিতে পারিতেন, তা দেন নাই।

সংস্কৃত গ্রন্থে আছে—মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিয়া একদা মজুন্দারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

ভো মজমুদার! ভবতো ব্যাপারেণ অস্মিন্ সংগ্রামে মহান্ সন্তোষো বৃত্তঃ, অবিরল সপ্তাহ দুর্দ্দিনে চ মম সৈন্যানাং প্রাণরক্ষা কৃতা, অতঃ তব সমীহিতং ব্রূহি; ময়া তৎ অবশ্যং করণীয়ং। ইতি এবং সমাদিষ্টো, মজমুদারো ভট্টনারায়ণস্য আদিশূর নৃপাগমন বংশ বিস্তার রাজ্যশাসন, কাশীনাথ রায় পলায়ন, জবনাধিপ কর্ত্তৃক তৎ নিধন প্রভৃতিং সর্ব্বং কথয়ামাস, বাগোয়ানাখ্য প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পরগণাধিকারস্য অভিলাষং চ উদঘটয়ামাস। (১)

(১) উদ্ধৃত অংশ অতি সহজ সংস্কৃত, সেই জন্য ইহার অনুবাদ আর দেওয়া গেল না। সন্ধিবিচ্ছেদ ও পদবিচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই স্থলে ভারতচন্দ্র কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

মজুন্দারে মানসিংহ কহিলা কি বল।
পাতশার হজুরে আমার সঙ্গে চল॥
পাতশার সহিত সাক্ষাত মিল হইব।
রাজ্য দিয়া ফরমানি রাজা করাইব॥

* * *

অন্নপূর্ণা দেবীরে পূজিয়া মজুন্দার।
মানসিংহ সহিতি চলিলা দরবার॥

দিল্লীতে ভবানন্দ পৌছিলে,—

পূর্ব্ব-নিহত-স্বীয হস্তিক কাশীনাথ রায়স্য সুতো মজমুদার ইতি পরিচয়ং জানন্ তথাবিধ আতিথ্যাদি শ্রবণেন চ পরম পরিতুষ্টো জবনেশ্বরো মানসিংহম্ আহ, মানসিংহ! কাশীনাথ সুতো মজমুদারো মহানুভাবঃ—ইত্যাদি।

অন্নদামঙ্গলে দেখুন, মানসিংহ ভবানন্দের কি বলিয়া পরিচয় দিতেছেন;—

গিয়াছিনু বাঙ্গালায় ঠেকেছিনু বড দায়,
সাত রোজ দারুণ বাদলে।
বিস্তর লস্কর মৈল, অবশেষ যাহা রৈল,
উপবাসী সহ দল বলে॥
ভবানন্দ মজুন্দার নাম, পুর ভূসিয়ার
বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ এই জন।
সপুষ্ঠ খোরাক দিল, সকলেরে বাঁচাইল,
সবে হইল ইহার কারণ॥

* * *

রাজা দিব কহিয়াছি, সঙ্গে করি আনিয়াছি,
গোলাম কবুলে পাব পায়।
স্বদেশে রাজাই পায়, দোয়া দিয়া ঘরে যায়,
ফরমান ফরমাহ তায়॥

তাহার পর, ভবানন্দ দিল্লীতে বন্দী হওয়াতে তাঁহার অনুচরদ্বয় খেদ করিতেছে,—

হেদে বামুনেব ছেলে, আগু পাছু নাহি চেলে,
দিল্লী আইল বাজাই কবিতে।
দুধে ভাতে ভাল ছিল, হেন বুদ্ধি কেটা দিল,
পাতশার দেয়ানে আসিতে।
মানসিংহ সঙ্গ পেযে, বাজা হৈতে এল ধেয়ে;
এখন সে মানসিংহ কই? •
গাঁজাখোব বজপুত, আফিঙ্গেতে মজবুত,
ব্রহ্মহত্যা কবিলেক অই॥

তাহাব পব, ভবানন্দকে দেবীপুত্র জানিযা পাতশা বিনয় কবিয়া বলি-তেছেন;—

জাহাঁগীব কহে শুন বামুণ ঠাকুব।
না জানি কবিনু দোষ, বোয কব দূব॥

ইহাতে দেখা গেল, ক্ষিতীশবংশাবলিব যে সকল স্থলে, ভবানন্দেব রাজবংশে উৎপত্তির কথা আছে সে সকল স্থলে ভাবতচন্দ্র সেরূপ কোন আভাস ত দেনই নাই ববং ভবানন্দ যে একজন সামান্য ব্রাহ্মণ মাত্র তাহাই বিশেষ কবিযা বলিয়াছেন।

তাহাব পব অন্নদামঙ্গলে ভবানন্দেব পিতৃ পবিচয স্থলে—ভাবতচন্দ্র বলিতেছেন;—

ধন্য ধন্য পবগণা বাগুযান নাম।
গাঙ্গিনীব পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম॥

* * *

তাহে রাম সমদ্দাব নাম একজন।
শ্রোত্রিয় কেশবী গাঁই বাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ॥
সীতাঠাকুবাণী নামে তাঁহার গৃহিণী।

ঐ কয় পংক্তি পাঠ কবিলেই বুঝা যায়, যে বাম সমাদ্দারের যে রাজ-কুমার বলিয়া কোন পবিচয় ছিল, তাহা ভাবতচন্দ্র জানিতেন না বা মানিতেন না; শাদা সিধা একজন শ্রোত্রিয ব্রাহ্মণেব পবিচয দিয়াছেন মাত্র।

শেষের উদ্ধৃত সংস্কৃত অংশে দেখুন, তাহাতে মজন্দারকে বারবার কাশীনাথ সুত বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মূল পুস্তকে মজুন্দার কাশীনাথের পৌত্র, এ গোল স্বয়ং গ্রন্থকারই করিলেন? না জাহাঙ্গীর শাহ করিলেন? আসল কথা ভবানন্দ মজুন্দার হইতে প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাঁহার ফরমানও রাজ সরকারে আছে,—তাহার পশ্চাতে দৃষ্টি করিলেই গোল, —মহাগোল এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই ভারতচন্দ্র ঐ ভাগে নীরব; কেবল নীরব নহে, এই বংশে ভবানন্দের যে প্রথম রাজালাভ হইল, খোদ ভবানন্দের কথায়, তাঁহার অনুচরদের কথায়, মানসিংহের কথায়, জাহাঙ্গীরের কথায় এবং নিজ কথায় তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা রায় গুণাকরের পন্থাই নিরাপদ মনে করি।

ভবানন্দ মজুন্দার মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের অতিবৃদ্ধ পিতামহের পিতা—সপ্তম পুরুষ। ভবানন্দের সময় খৃষ্টাব্দ ১৬০৫ হইতে ১৬২৫। ভবানন্দের তিন পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপাল; ভবানন্দের পর কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত কে কে রাজা অন্নপূর্ণার ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা যাইতেছে,—

খৃষ্টাব্দ	
	অন্নদা কহেন তবে ভবিষ্যত কই।
১৬২৫	মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই॥
	সমাদরে মোর ঝাঁপি রাখিবেক এই।
	যার স্থানে ঝাঁপি রবে রাজা হবে সেই॥
	গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর।
১৬৩২	রাঘব হইবে নাম রাঘব-সোসর॥
	দেগাঁয়ে আছিল রাজা দেপাল কুমার।
	পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার॥
	আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
	রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্যধন॥
(কৃষ্ণনগর)	গ্রাম দীঘী নগর সে করিবে পত্তন।
(দীঘনগর)	দীঘী কাটি করিবেক শঙ্কর স্থাপন॥
১৬৭৬	তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্ররায়।
১৬৮৩	বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায়॥
	গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে।

পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি কৈলাসে যাইবে ॥
তিন পুত্র রুদ্রের হইবে নিরুপম ।
রামচন্দ্র বড় রাম জীবন মধ্যম ॥
১৬৯৪ রাম কৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার ।
রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার ॥
জিনিবেক সংগ্রামসিংহ আদি রাজা রাজি ।
সোমযাগ করি নাম হবে সোমযাজী ।
এই রূপে হেলন করিবে অহঙ্কারে ।
সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে ॥
নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে ।
১৭০৪ রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে ॥
অবিবাদে তার ঘরে থাকিব সচ্ছন্দে ।
রাজাই করিবে রামজীবন আনন্দে ॥
তিন পুত্র হবে তার প্রথম ভার্য্যার ।
রাজা রাম, কৃষ্ণ রাম, রঘুরাম রায় ॥
ভূমি দান দয়া দম রাজধর্ম্ম বলে ।
১৭১৫ রঘুবীর খ্যাত হবে ধরণী মণ্ডলে ॥
১৭২৮ তার পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান ।
কাশীতে করিবে জ্ঞান বাপীর সোপান ॥
বিগ্রহ ব্রাহ্মণ দেবমূর্ত্তি প্রকাশিয়া ।
নিবাস করিবে শিব নিবাস করিয়া ॥
আমার প্রতিমা পূজা প্রকাশ তাহাতে ।
১৭৮২ কত কব তার যশ প্রকাশ ইহাতে ॥

বাস্তবিক মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র নিজে যেমন গুণবান্ তেমনই বিলক্ষণ গুণ-গ্রাহক রাজা ছিলেন ।

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। | মাঘ ১২৯৪। | ৭ম সংখ্যা।

ভালবাসাবাসি।

(বাসন্তী গীতি)

প্রকৃতি গো---প্রকৃতি গো একি রীতি তোর!
যথা যাই এক চাঁদ,
এক ঢালা, এক বাঁধ,
একই বাসন্তি তানে, বিশ্ব খানি ভোর,
অণু হ'তে হিমাচল,
শিশির, সাগর জল,
একই নিয়মে সব করিছে প্রয়াণ,
একটু ফুলের কোলে
"রজ-বাজ" হেলে দোলে!
কে বুঝে এ লীলা খেলা—নিগূঢ় সন্ধান।
কা'র কাছে বল্ বল্,
শিখিলি এ প্রেম ছল,
কা'র গুণে, নভে ভবে, করে দিলি মিল।
কেন বা তপন করে,
কমলের হাসি ঝরে,
কোমলে কঠিনে কেন লেগে গেল খিল্!

চকোর চাঁদের লাগি
সারা নিশি থাকে জাগি।
কে দিল প্রেমের রাগ পাখীর পরাণে!
ক্ষুদ্রপ্রাণে রবি কর
ধরিয়ে, শিশির থর
হরষে মরিয়া যায় প্রেম-আলাপনে!
বুঝি না এ কোন খেলা?
কেমন প্রেমের মেলা,
ছোট বড় এক ছাঁদে বুক বেঁধে যায়,
চাতক "দে জল" যাচে,
মেঘেতে বিজলি নাচে,
বসন্ত আসিবে বলি, পিক্ অই গায়।
মাধবী সোহাগে হায়?
সহকারে মিশে যায়
পতঙ্গ আপনা ভুলি, অনলেতে ধায়,—
প্রেমের এ লীলা খেলা, বুঝা বড় দায়!
নির্ঝর ঝরিয়ে শেষে,
তটিনীর কোলে মেশে,
আবার তটিনী ধায় সাগরের পানে,
সকলি আপনা ভুলি,
প্রাণে প্রাণে কোলাকুলি,
বেহুস—বিভোর সবে, পরস্পর টানে।
ফুল তোর একি ছাঁদ,
নভে ভবে দিলি বাঁধ,
কঠিন গাছেরে তুই, দিস্ চারু আলা,
হেরে তোর রম কায়
পাষাণ (ও) গলিয়া যায়,
ভাবে শেষে—"মানে মানে কেন হনু কালা?"
পরিতাপ হৃদে উঠে,
অমনি সলিল ছুটে,

অভিমানী পাষাণের বুকখানি চিরি;
ওরে ফুল কিবা তোর
প্রেমের কোমল ডোর!
বাঁধিয়াছ এ সংসার, সেই ডোরে ঘিরি।
যেখানে ফুটিস্ তুই
কিবা মরু—কিবা ভুঁই,
স্বরগের শশী তারা, দেয় সেথা চুম্,
মানুষ, আকুল প্রাণে,
তোরে যে হৃদয় টানে,
বুকে করি, দুখ ভুলি সুখে যায় ঘুম্।
প্রকৃতি গো, জননী গো,
জগতের জুড়নী গো—
এই ভরা তোর, লইনু তুহাঁরি কোল্,
ফেলো না শিশুরে ভুয়ে,
তুলে লও চুমে চুমে,
দাও দাসে, জননী গো মৃদু মৃদু দোল!
প্রকৃতি গো তোর ধারা,
দেখে শু'ন দিশে হারা!
আদি নাই—অন্ত নাই,—ধীরা স্রোতস্বতী,
মহান্ তুহার তান্,
মহান্ তুহাঁর গান,
প্রেমের পাথার লীলা সুন্দরে মহতী।
সাধে কি "বিবর্ত্ত—বাদ"।—
বিজ্ঞানের অবসাদ।
অবাক্ জ্ঞানের কথা, প্রকৃতি ছটায়।
ধন্য ধন্য জননী গো,
কৈলাশের কামিনী গো!
প্রেম প্রবাহিণী তোর চরণে লুটায়!
স্বর্গ মন্দাকিনী-ধার
মন্দার-কুসুম হার,

রজত চন্দ্রমা রশ্মি, পূত পরিমল,
প্রেম বিনে সকলিত গরল—গরল।
প্রেমের কুসুম তুলে,
যেই জন সেই ফুলে,
পূজে নাই একদিন সোনার পুতুল,
ভালবাসা—ভালবাসা,
ভবের ভরসা, আশা—
বুঝে নাই যেই জন, সেই রে বাতুল,
শরীর মাটির দেহ,
মিছার অসার গেহ,
রেখে দাও ছুটাছুটি পোড়া অভিমান,
প্রকৃতির দেখ খেলা,
মানুষে মানুষে মেলা,
একের লাগিয়ে কাঁদে, অপর পরাণ।
দুটী প্রাণ একাকার,
নদ নদী একধার,
দুটী ফুল এক বোঁটে, দুলিবে দুদুল,
একই দোঁহার তান,
একই দোঁহার গান
একই বাতাসভরে দুজনা আকুল;
এক ভালবাসা বাসি,
এক কান্না, এক হাসি,
একই দোলার দোল একই ঝঙ্কার,
মিশে যায় লতা গাছ,
পাতায় পাতায় নাচ,
মূলে জড়া জড়ি—নাহি ছাড়া ছাড়ি আর,
স্বরগের সুধা রাশি,
মরতে পড়েছে আসি,
তাই সে কুসুম হাসে, মাতায়ে কানন;—
যাব না উহার কাছে,

শ্বাস লাগি গলে পাছে !
স্বরগের বালা ওটি, নিখুঁত্ আনন;
না— উহারে হৃদয়ে ধরে,
শিখে নিব ভাল করে,
কেন নিতি ফুটে বনে, ছড়াইয়া হাসি,
শিখাবে ও ভালবাসা,
প্রাণে দিবে প্রেম আশা,
গাইব বাসন্তীগীতি, ভাল বাসা বাসি॥

পাতঞ্জল যোগসূত্রম্।

৫।

তৎপরং পুরুষখ্যাতে গুর্ণ-বৈতৃষ্ণ্যম্॥ ১৬।

পদচ্ছেদঃ।—তৎ-পরং, পুরুষখ্যাতেঃ, গুণ-বৈতৃষ্ণ্যম্।

পদার্থঃ।—তৎপরং তস্মাৎ (পূর্ব্বোক্তাৎ বৈরাগ্যাৎ) পরং উৎকৃষ্টং অথবা তৎ বৈরাগ্যং, পরং উৎকৃষ্টং,পুরুষখ্যাতেঃ পুরুষঃ, আত্মা, তস্য খ্যাতিঃ জ্ঞানং তস্মাৎ আত্মসাক্ষাৎকারাদ্ধেতোঃ, গুণ বৈতৃষ্ণ্যম্ গুণেভ্যঃ, গুণেষু গুণানাং বা বৈতৃষ্ণ্যম্ তৃষ্ণাবিরহঃ। গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ।

অন্বয়ঃ।—পুরুষখ্যাতে গুর্ণ বৈতৃষ্ণ্যম্ তৎ পরম্, তং,পরমিতি বা।

ভাবার্থঃ।—বৈরাগ্যং দ্বিবিধং, একং বিষয়-বৈরাগ্যম্। অন্যচ্চ গুণ বৈরাগ্যম্। তত্র প্রথমং তাবৎ পূর্ব্বস্মিন্ সূত্রে নিরূপিতং অত্রান্ত্যং গুণ বৈরাগ্যং নিরূপ্যতে। পুরুষখ্যাতেঃ আত্মসাক্ষাৎকারাৎ, বিষয়-দোষদর্শিনঃ জনস্য পুরুষদর্শনাভ্যাসাদিত্যর্থঃ গুণেভ্যঃ কার্য্য-সহিতেভ্যঃ সত্ত্বাদিগুণেভ্যঃ যৎ বৈতৃষ্ণ্যং নিস্পৃহত্বং, বিরক্ততেতি যাবৎ তদপি বৈরাগ্যম্, তচ্চ তৎপরম্

পূর্ব্বস্মাদুৎকৃষ্টম্, অন্যা তু তদিতি বৈরাগ্যম্ পরামৃশ্যতে তেষাং মতে পুরুষ-খ্যাতে-র্গুণ বৈতৃষ্ণ্যং তৎ (বৈরাগ্যম্) তচ্চ পরমিত্যন্বয়ঃ। পুরুষপদমত্র-বুদ্ধের প্যুপলক্ষকমিতি বিজ্ঞান-ভিক্ষুস্তথা হি তন্মতে পুরুষখ্যাতে-বিত্যস্য আত্মনযাঽন্যতর-সাক্ষাৎকারাভ্যাসাদিত্যর্থঃ আত্মদ্বয়ং বুদ্ধিপুরুষদ্বয়ং। শুদ্ধং চিত্তং বৃত্তি বর্জ্জিতং যদাত্মনি লীয়তে তদগুণ বৈতৃষ্ণ্যমুৎকৃষ্টং বৈরাগ্য-মিত্যর্থঃ।

অনুবাদঃ।—আত্মসাক্ষাৎকার-নিবন্ধন সত্ত্বাদি গুণ ও তাহাদের কার্য্য হইতে চিত্তের যে বিরক্তি,—তাহাও বৈরাগ্য, উহা পূর্ব্ববৈরাগ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সমালোচন। এই সূত্রে পর শব্দের ব্যবহার হওয়ায় আমরা এক প্রকার জানিতে পারিতেছি যে, বৈরাগ্য দুই প্রকার (১) পর, (২) দ্বিতীয় অপর। প্রধান এবং অপ্রধান। যদি বল লোকে প্রধানের বিষয় অগ্রে বলিয়া তাহার পর অপ্রধানের কথা বলিয়া থাকে, এ স্থলে সেই লৌকিক রীতির পরিহার করিয়া অগ্রে অপ্রধান এবং পরে প্রধানের কথা বলিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে দুই প্রকার বৈরাগ্যের মধ্যে আবার পূর্ব্বাপরীভাব আছে। একটি অগ্রে না হইলে আর একটি উৎপন্ন হয় না। প্রথমে অপর বৈরাগ্যের উৎপত্তি হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে পর বৈরাগ্যের অধিকারই হয় না। মণিপ্রভা নামক বৃত্তিকার স্পষ্টই বলিয়াছেন "পূর্ব্ব বৈরাগ্যং পর বৈরাগ্য-হেতুঃ।" পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্য পর বৈরাগ্যের প্রতি কারণ। এই নিমিত্তই প্রথমে অপর বৈরাগ্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলেন, পরে হয় বলিয়া উহার নাম পর বৈরাগ্য।

পুরুষখ্যাতি নিবন্ধন (গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্র প্রমাণে আত্মার স্বরূপ বিজ্ঞানের পর) যে 'গুণ-বৈতৃষ্ণ্য' ইহার অক্ষরানুবাদ, গুণে নিস্পৃহা বা গুণের উপর বীতরাগ হওয়া, গুণ এবং বৈতৃষ্ণ্য এই দুইটি কথায় ৭মী তৎপুরুষ বা ৫মী তৎপুরুষ সমাস করিয়া ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। গুণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রধানত তিনটি, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। এই প্রধান গুণ-ত্রয়ের পরস্পর ব্যামিশ্রণে আবার নানাবিধ জ্ঞানাদি পৌরুষ গুণ উৎপন্ন হয়। যখন চিত্ত সেই সকল গুণ হইতে বিরক্ত হয়, তাহাদিগের উপর আর স্পৃহা থাকে না, অথবা তাহাদের অধীন ভাব পরিত্যাগ করিয়া অবিকৃত ভাবে অবস্থান করে, চিত্তের সেই অবস্থার নাম 'গুণ বৈতৃষ্ণ্য'। আত্মার স্বরূপ ঠিক্ ঠিক্ জানিতে পারিলে চিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনের মধ্যে কোন গুণের দ্বারাই পরিচালিত হয় না, তখন উহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এবং

নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাব ধারণ করে। এই সূত্রের ভাষ্যকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয় দোষদর্শী বিরক্তঃ পুরুষ দর্শনাভ্যাসা তচ্ছুদ্ধি-প্রবিবেকাপ্যায়িত বুদ্ধি গুণেভ্যোব্যক্তাব্যক্ত ধর্ম্মকেভ্যোবিরক্ত ইতি তৎদ্বয়ং বৈরাগ্যম্। তত্র যদুত্তরং জ্ঞান প্রসাদ-মাত্রং যস্যোদয়ে প্রত্যুদিতখ্যাতিরেবং মন্যতে প্রাপ্তং প্রাপণীয়ং, ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্লেশাঃ, ছিন্নঃ শ্লিষ্ট-পর্ব্বোভব-সংক্রমো, যস্য—বিচ্ছেদাৎ জনিত্বা ম্রিয়তে, মৃত্বা চ জায়ত ইতি জ্ঞানস্যৈব পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্যম্।"

দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক এই উভয় বিধ বিষয়ের দোষ মনুষ্য দেখিয়া তাহাতে বিরক্ত হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার পর আত্ম স্বরূপ দর্শন ও বারম্বার আত্মতত্ত্ব অনুশীলন করত আত্মা বিশুদ্ধ (নির্ম্মল) ও অপরিণামী এইরূপ বিবেক দ্বারা বুদ্ধি আপ্যায়িত (পরিতৃপ্ত) হইলে সত্ত্বাদিগুণ ও তাহাদের ব্যক্ত ও অব্যক্ত (স্থূল সূক্ষ্ম) কার্য্য-কলাপের উপর গতস্পৃহ হয়, অর্থাৎ কোনরূপ প্রাকৃতিক কার্য্যে আর তাহার আসক্তি থাকে না। তাদৃশ আসক্তি-শূন্যতার নামই গুণ-বৈতৃষ্ণ। অতএব দুই প্রকার বৈরাগ্য (প্রথম এবং পর,) তাহার মধ্যে পর (দ্বিতীয় বা উত্তর কাল জাত) বৈরাগ্য জ্ঞানের প্রসাদ মাত্র, জ্ঞানের সম্পূর্ণ ঔজ্জ্বল্য স্বরূপ। ভাষ্যকার নিজেই জ্ঞান-প্রসাদ শব্দের জ্ঞানের পরাকাষ্ঠারূপ অর্থ করিয়াছেন, অর্থাৎ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত জ্ঞান—তাহার পর আর কোন বস্তু জানিতে বাকী রহিল বলিয়া একটা স্পৃহা থাকে না, জ্ঞান ঐ স্থানেই চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। যাহার উদয় হইলে প্রত্যুদিত-খ্যাতি অর্থাৎ আত্ম তত্ত্বদর্শী যোগী মনে মনে বিবেচনা করেন, যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি, আর আমার প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, যে সকল ক্লেশ দূর করিবার ইচ্ছা ছিল, তাহারা দূর হইল, এবং যন্নিবন্ধন জন্ম মরণ ধারা অবিরত প্রবাহিত হইতে ছিল, সেই শ্লিষ্ট পর্ব্ব (শৃঙ্খলাবদ্ধ) ভব সংক্রম (সংসারে যাতায়াত) নিবৃত্ত হইল; এই বৈরাগ্য আর কিছুই নহে, জ্ঞানেরই পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ চরম সীমারূঢ় জ্ঞানেরই স্বরূপ।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, এও ত বড় মজার কথা, মহর্ষি পতঞ্জলি সূত্রে লিখিলেন "গুণ বৈতৃষ্ণ্য" গুণেতে তৃষ্ণার অভাব বা নিস্পৃহতা, ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যা করিলেন, উহা আর কিছুই নয়, চরম সীমারূঢ় জ্ঞানেরই স্বরূপ। ইহাদের পরস্পরের সামঞ্জস্য কিরূপে হইতে পারে? বার্ত্তিককার

বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার উত্তর এইরূপ করিয়াছেন " ইতি চেৎ ন শব্দভেদেঽপ্যর্থাভেদাৎ নহ্যভাবোঽস্মন্মতেঽতিরিক্তোঽস্তি,অধিকরণস্যাবস্থা বিশেষশ্চৈবাভাবত্বাৎ, তথাচ চিত্তস্যৈব তাদৃশী জ্ঞানবত্ত্বৈব তৃষ্ণাবিরহ ইতি অপিচ ভবতু বৈতৃষ্ণ্যমেব বৈরাগ্যং তথাপি জ্ঞান প্রসাদেনৈব বৈতৃষ্ণ্যলাভো বিশেষোঽনুমীয়ত ইতি লিঙ্গলিঙ্গিনো রভেদোপচারাৎ সূত্র ভাষ্যয়োর্ন বিরোধঃ"। ইতি।

একথা বলিও না, কারণ তুমি দুটা দুই রকম শব্দ দেখিয়া ভয় পাইতেছ মাত্র, একটু তলাইয়া বুঝিলেই বেশ জানিতে পারিবে যে উহাদের একই তাৎপর্য্য। দেখ আমাদের মতে অভাব নাম একটা অতিরিক্ত পদার্থ নাই, আমরা বস্তুর অবস্থা বিশেষকেই অভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করি, অতএব চিত্তের উক্তরূপ জ্ঞানাবস্থাকেই আমরা তৃষ্ণা বিরহ বলিব। যদি অভাব একটা স্বতন্ত্র পদার্থ হয়,তাহা হইলেও তুমি ইহা অবশ্য স্বীকার করিবে যে জ্ঞানের প্রসাদ চিত্তের তাদৃশ বৈতৃষ্ণ্য বিশেষের অনুমাপক। তাহা যদি হয়, তবে প্রাচীন একটা নিয়ম আছে " অনুমাপক ও অনুমেয় এই উভয় অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, অতএব সেই নিয়মানুসারে গুণ বৈতৃষ্ণ্যের অনুমাপক জ্ঞান প্রসাদের গুণ বৈতৃষ্ণ্য অর্থ, এইরূপ আত্মা প্রসাদ যাহা চিত্তের গুণ বৈতৃষ্ণ্যের সহিত সম্বন্ধ, সেইরূপ জ্ঞান প্রসাদ হইলে চিত্তের গুণ বৈতৃষ্ণ্য অবশ্যই উৎপন্ন হয়, কখনই ব্যভিচার ঘটে না।

পূর্ব্বসূত্রে যে প্রকার বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে সেইরূপ বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলেও মনুষ্য যোগী হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যোগ শব্দের অর্থ চিত্তবৃত্তির নিরোধ। নিখিল চিত্ত বৃত্তির প্রসরাবরোধ বা কার্য্য নিবৃত্তি। এই চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। সমুদ্র যেমন সর্ব্বদা তরঙ্গ ভঙ্গে টলটলায়মান, মনুষ্যের চিত্ত, বৃত্তি ভরে ঠিক সেইরূপ। সমুদ্রের ঢেউ-এরমত ইহাতে প্রতিক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য বৃত্তি নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে, খেলিতেছে, আবার আর একদল বৃত্তিকে অবকাশ দিয়া (তাহাদের পথ মুক্ত করিয়া) আপনি আপনিই লীন হইতেছে। এই অসংখ্য বৃত্তির মধ্যে পূর্ব্বে যে বৈরাগ্যের উক্তি হইয়াছে তাহা দ্বারা কতিপয় মাত্রের নিরোধ সম্ভাবনা, কারণ সে বৈরাগ্য বিষয় বিতৃষ্ণা,বিষয়ে নিস্পৃহতা বা বীতরাগ হওয়া। বিষয় শব্দের অর্থ স্ত্রী, অন্ন, পানীয় অথবা এক কথায় বলিতে হইলে, সমুদয় ভোগ্য জাত এবং ঐশ্বর্য্য—প্রভুতা, সামর্থ্য ও সম্পৎ; তাহা হইলেই হইল, অভিলষণীয় বস্তুর নাম বিষয়; যাহা লোকে চায় তাহার নাম বিষয়। আমাদের

চাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য সুখ হইলেও চাওয়াটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখের উপকরণ সামগ্রীরই ঘটিয়া থাকে। কারণ সুখ মনের একটী বৃত্তিমাত্র, অন্যের সম্বন্ধ ব্যতীত স্বয়ং উৎপন্ন হইতে পারে না, সাধারণতঃ বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধেই উহা উৎপন্ন হয়, এজ নিমিত্ত সুখোৎপাদক বস্তুদিগকেই আমরা চাই। সাধারণতঃ সুখের উৎপাদক বস্তুদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভাল খাওয়া ভাল পরা প্রভৃতি, ভোগ্যবস্তুসকল, দ্বিতীয় ঐ সকল ভোগ্যবস্তুর সম্পাদক প্রভুত্ব, সামর্থ্য এবং সম্পৎ। সুতরাং একমাত্র সুখ মুখ্য অভিপ্রেত হইলেও সাধারণত চাওয়াটা দুই রকমের ঘটে, "ভার্যাং দেহি, ধনং দেহি, পুত্রং ভগবতি দেহি মে।" ভোগ্য বস্তু ও তাহার সম্পাদক প্রভুত্বাদি বিষয়ে: ঐ দ্বিবিধ চাওয়ার বস্তুই—বিষয়। বিষয়গুলি আবার ঐহিক পারত্রিক ভেদে দ্বিবিধ; ঐ সকল বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মাইলে আমাদের কাম লোভ প্রভৃতি কতকগুলি বৃত্তির নিরোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু যাবদীয় বৃত্তির নিরোধ হয় না।

যদি বল, পুরুষের বৃত্তিমাত্রই স্বার্থসাধনেচ্ছামূলক। যদি সেই মূলের উচ্ছেদ হয়, তবে শাখা পল্লব ফল ফুল ইত্যাদি সকলেই সেই সঙ্গে শুষ্ক হয়, তাহাদের নাশের নিমিত্ত আর স্বতন্ত্র উপায় করিতে হয় না। যদি অপর বৈরাগ্য দ্বারা সমগ্র বৃত্তির ছেদ সম্ভব হয় তবে পর বৈরাগ্য নিষ্প্রয়োজন।

মোটামুটি দেখিলে ঐরূপ বিবেচনা হয় বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে কাম ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, অসূয়া, দ্বেষ, মদ মাৎসর্য্য ইত্যাদি বৃত্তির লোপ হইলেও, মানুষ মাটির মানুষের মত নিশ্চেষ্ট জড়ভাব প্রাপ্ত হইলেও চিত্ত একেবারে বৃত্তিশূন্য হয় না, কারণ বিষয় বিতৃষ্ণার সহিত জ্ঞান শক্তির লোপ হয় না। আমার ইচ্ছা নাই, নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমার চক্ষুর দর্শন শক্তির লোপ হয় নাই, আমার সম্মুখে যাহা আসিতেছে তাহাতেই চক্ষু পড়িতেছে, আমি তাহাদিগকে যে ভাবেই গ্রহণ করি, চক্ষু দ্বারা অবশ্যই তাহাদিগকে সেই ভাবে গ্রহণ করিতেছি। এইরূপ বিষ ও অমৃতের স্বাদ আমার নিকট তুল্য হইলেও তাহাদের একটা স্বাদ অবশ্যই অনুভব হইবে। এইরূপ কাণে শ্রবণ করি, আর ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ করি। এক্ষণে দেখ এতগুলি কাজ যখন নির্ব্বাহ হয় তখন চিত্ত বৃত্তিশূন্য হয় ইহা আর কিরূপে বলা যায়? এখানে এইটুকু সার কথা বুঝিতে পারিলেই সকল বিষয় খোলাসা হইবে। আমরা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি বৃত্তি শব্দ চিত্তের অবস্থান্তর বা পরিণাম বুঝা যায় ঐ চিত্তের পরিণাম গুণ যেমন বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ঘটে, তেমনি চিত্তের উপাদান ভূত সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের তারতম্য অনুসারেও উৎপন্ন হয়। অতএব আমাদের চিত্তবৃত্তিগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কতকগুলি বাহ্য বস্তু সম্বন্ধ জন্য, আর কতকগুলি গুণ জন্য! পূর্ব্বোক্ত প্রথম বৈরাগ্য দ্বারা বাহ্য বস্তু সম্বন্ধ জাত কতকগুলি বৃত্তির লোপ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু গুণোৎপন্ন বৃত্তির লোপ হয় না। যতদিন ত্রিগুণাত্মক মোহ বা অবিদ্যা বিদ্যমান থাকিবে, যতদিন "আমার" "আমি" ইত্যাদি বোধ থাকিবে ততদিন ত্রিগুণোৎপন্ন বৃত্তির অধিকার থাকিবে, গুণের উচ্ছেদ না হইলে আর উহাদের লোপ হইবে না। অপিচ—

যতক্ষণ চিত্তের একটি মাত্র বৃত্তি অবস্থান করিবে ততক্ষণ অবধি চিত্তকে সম্পূর্ণ স্থির বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পার না। অতএব যদি সেই অবস্থায় আর কোন বৃত্তির স্বীকার নাই কর, কিন্তু তুমি ইহা অবশ্য স্বীকার করিবে যে লোকের ইচ্ছা লোপের সহিত আত্মজ্ঞানের লোপ হয় না, নিশ্চেষ্ট বা সচেষ্ট, ব্যাপক বা সঙ্কীর্ণ যে ভাবেই থাকি "আমি" এইরূপ একটা বোধ অবশ্যই থাকিবে, তাহা হইলেই চিত্ত সবৃত্তিক হইল। যতক্ষণ অবধি আমি বলিয়া বোধ থাকিবে ততক্ষণ অবধি চিত্ত সবৃত্তিক। আমি এই বোধ মোহ বা অবিদ্যামূলক। সেই মোহ বা অবিদ্যা আবার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক। কাজেই চিত্তকে একেবারে বৃত্তি শূন্য করিতে হইলে অবিদ্যা বা মোহের হাত হইতে আপনাকে মোচন করা আবশ্যক, আমার আমিত্বকে বিস্মরণ করিতে যত্নবান্ হওয়া বিধেয়। আমার আমিত্বের উপর বিতৃষ্ণ হইতে চেষ্টা করাই প্রধান কার্য্য। উহা যিরূপে সাধিত হয়, তাহা মণিপ্রভা নামক বৃত্তিতে লিখিত হইয়াছে।

বিষয় দোষ দর্শন নিবন্ধন চিত্তের বশীকার সংজ্ঞা নামক প্রথম বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তাহার পর গুরুমুখ এবং শাস্ত্রের বচন হইতে পুরুষের (জীবাত্মার) স্বরূপ জানিতে পারে; জানিতে পারে আত্মা বিশুদ্ধ এবং অপরিণামী; তখন বাহ্য বিষয় পরিহার করিয়া সেই আত্মদর্শনে আগ্রহ জন্মায়, আত্মদর্শন করিবার সময় ধর্ম্মমেঘ নামে চিন্তার উদয় হয়, তখন চিত্ত হইতে রজঃ এবং তমোগুণরূপ মল অপগত হয়, খাটী সত্ত্বগুণ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। চিত্ত অতিশয় প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়। সেই সম্পূর্ণ নির্ম্মল চিত্তে স্বভাবত বিশুদ্ধ

চৈতন্য-রূপী পুরুষ প্রতিবিম্বিত হওয়ায় চিত্ত ও পুরুষ এক হইয়া যায়, আমার আমিত্ব দূর হয়, গুণত্রয়ের বন্ধন উচ্ছেদ হয়, চিত্ত বৃত্তি শূন্য হয়।

চিত্তে আত্মার প্রতিবিম্ব হওয়াতে উহা জ্ঞান বটে, কিন্তু চরমসীমা প্রাপ্ত জ্ঞান, ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, কিছুরই পরিচ্ছেদ নাই। উহা আমার আমিত্ব দূর করিয়া জড়ে ও চৈতন্যে প্রভেদ করিয়াছে। ত্রিগুণ মূলক আমিত্বের মোহিনী শক্তির ছেদ হয় বলিয়া উহাকে গুণ বৈতৃষ্ণা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব বৈরাগ্যদ্বয়কে যথাক্রমে বিষয় বৈরাগ্য এবং গুণ বৈরাগ্য বলিয়া অভিহিত করা হইতে পারে। যতদিন অবধি আর কিছু না থাক্ আমার আমিত্ব এইটুকু মাত্র থাকিবে, তত দিন এ চিত্ত সম্পূর্ণ স্থির নয়, চিত্তকে সম্পূর্ণ স্থির করিতে হইলে বিষয় বৈরাগ্যের মত গুণ বৈরাগ্যেরও আবশ্যক।

বিলাতী জুয়াচুরি।

ভুক্তভোগীর লেখা হইতে গৃহীত।

লণ্ডনের বণ্ডষ্ট্রীটে আমাদের দোকান। অন্যান্য দোকান অপেক্ষা আমাদের দোকানে অনেক বহুমূল্য ও পছন্দসই হীরা জহরত থাকিত বলিয়া আমাদের দোকানের খুব পসার ও নামডাক ছিল, অনেক বড় বড় ধনী লর্ড আমাদের দোকান হইতে জড়াও গহনাপত্র ক্রয় করিত। এ স্থলে বলা উচিত আমি নিজে দোকানদার নাই, তবে আমি অনেক দিন এ দোকানে কাজ করায় আমার এ কাজে বহুদর্শিতা জন্মিয়াছে বলিয়া ও বহুদিন বিশ্বস্তভাবে কাজ করিতেছি বলিয়া এখানে এক প্রকার আমি কর্ত্তার মত হইয়া আছি। জহরতের দোকানে প্রায় চুরি জুয়াচুরি হয় বলিয়া আমাদের প্রদর্শনী গৃহে (show room) কিছু বেশী পাহারার আঁটা আঁটি, খরিদ্দারের প্রতি সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আমরা বেচা কেনা করিয়া থাকি, আর আমাদের বড়

কর্ত্তার বিশেষ নিয়ম এই যে বিশেষ পরিচিত না হইলে আমরা কাহাকেও ধারে কোন জিনিস বেচি না, বা কেহ কোন ব্যাঙ্কের উপর টাকার বরাত দিলে যতক্ষণ না সে টাকা আদায় হয় ততক্ষণ বিক্রীত দ্রব্য আমরা ক্রেতাকে ছাড়িয়া দিই না। এক কথায় অন্যান্য দোকানদারদিগের অপেক্ষা আমরা বেশী সতর্ক ও হিসাবী।

সচরাচর এই সকল চোর জুয়াচোরেরা বড় বড় জুড়ী গাড়ি করিয়া এরূপ জমকালরূপে দোকানে আসিয়া থাকে যে হঠাৎ ইহাদিগের প্রতি কাহারও সন্দেহ হয় না ও সন্দেহ করিতে সাহস হয় না। এছাড়া বিলাতে সস্ত্রীক লোককে সকলে অধিক বিশ্বাস করে বলিয়া অনেকেই প্রায় একজন স্ত্রীলোক সঙ্গে করিয়া লয়। এই যুবতীর বেশভূষা অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকদিগের ন্যায়, কাহার সাধ্য মনে করে যে ইহারা দোকানে চুরি করিতে আসিয়াছে। কিন্তু এই সকল সুন্দরী বেশভূষাবৃতা যুবতীরাই এই সকল কার্য্যের প্রধান অংশীদার, ইহাদের সাহায্যেই জুয়াচোরেরা নিজ নিজ অভিপ্রায় সহজে বিনা বাধায় সম্পন্ন করে। জুয়াচোরেরা দোকানে যাইয়া এই স্ত্রীলোকদিগের সহিত এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহে যেন তিনি সম্প্রতি এই যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা শীঘ্র তাহাকে বিবাহ করিবেন। কখন কখন কেবল স্ত্রীলোকেরাই এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

এইরূপ ছদ্মবেশে ইহারা দোকানে প্রবেশ করিয়া এজিনিস ওজিনিস দেখিয়া কিছু পছন্দ না হওয়ায়, কিছু ক্রয় না করিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু তাহার পরেই প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই দোকান হইতে কোন একটা দামী অলঙ্কার এই মাত্র খোয়া গিয়াছে। ইহাদের এমনি হস্তসৌষ্ঠব! কেহ কেহ ইহা অপেক্ষাও নিপুণ ব্যবসায়ী, তাহারা দোকানে যাইয়া চুরি না করিয়া নিজ গৃহে বসিয়া চুরি করে। ইহারা দোকানে আসিয়া জিনিস পছন্দ করিয়া দোকানদারকে কোন হোটেলের বা অপর কোন বাটীর ঠিকানা বলিয়া দেয়, যে তাহার সেই ক্রীত জিনিস দোকানের কোন লোক মারফত পাঠাইয়া দিলে তাহার হস্তে মূল্য দিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। দোকানদার সেই হুকুমমতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দোকানের কোন কর্ম্মচারী দ্বারা সেই জিনিস পাঠাইয়া দেয়, কিয়ৎক্ষণ পরে সে ব্যক্তি রিক্ত হস্তে ও শুষ্ক মুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই সকল জুয়াচোর ধরিবার নিমিত্ত সচরাচর দোকানদারেরা খরিদ্দারদিগের প্রতি দুই প্রকারে লক্ষ্য রাখিয়া থাকে।

প্রথম, তাহাদের হাতের প্রতি, দ্বিতীয়, তাহাদের কথোপকথনের ভাষার প্রতি। এই সকল চোর জুয়াচোরদিগকে প্রায় ধরা পড়িয়া জেলে যাইতে হয়; সেখানে হাতে করিয়া শ্রমজীবীর কঠিন কাজ করিতে হয় বলিয়া ইহাদিগের হস্ততল প্রায় কঠিন কর্কশ হইয়া পড়ে, কোন ভদ্রলোকের এরূপ হয় না, ইহাদিগকে ধরিবার এই এক উপায়। তৃতীয়, ইহারা যত কেন ভদ্রলোক সাজুক না, যত কেন ভদ্র ভাষায় কথা কহুক না, ইহাদের ভাষায়, কথার প্রণালীতে, গলার স্বরে এরূপ একটা বিকৃত ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে যে তাহাতেই দোকানদারের ইহাদের উপর সন্দেহ জন্মে, সুতরাং তাহারা সতর্ক হয়। কিন্তু অধিকাংশ চোর এরূপ কৌশলী যে দোকানদারদিগের এই সকল সতর্কতাকে তাহারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। এক্ষণে আমার নিজের কথা বলা যাউক।

একদিন নির্দিষ্ট সময়ে আমি দোকানে আপন কাজে ব্যস্ত আছি, এমন সময় আমাদের বড় কর্তা এসে আমার কাণে চুপ চুপি বল্লেন, "তুমি প্রদর্শনী ঘরে গিয়ে দুজন খরিদ্দার আসিয়াছে, তাদের পছন্দসই জিনিসপত্র দেখাও, কিন্তু সাবধান; তাঁদের চাউনিতে আমার কেমন সন্দেহ বোধ হচ্চে।" আজ্ঞামাত্র আমি তথায় যাইয়া দেখি একজন ভদ্রলোক একটি সুন্দরী যুবতীর সহিত জিনিসপত্র দেখিতেছেন। ভদ্রলোকটী দেখিতে কিছু কৃশ ও রুগ্ন, আর তাঁহার গলার স্বর কিছু খারাপ হয়ে গেছে। ভদ্রলোকটির সঙ্গে একটি নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র (respirator) রহিয়াছে; তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল যেন তাঁহার হাঁপানিকাশীর ব্যারাম আছে। সঙ্গের যুবতীটি দীর্ঘাঙ্গী, মুখের উপরিভাগ নব বিবাহিতার ঘোমটা দ্বারা আচ্ছাদিত, তাঁহার আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু ও সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া তাঁহাকে কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা বলিয়া বোধ হইল; এক কথায় ইহাদিগের উপর আমার কোন সন্দেহ উপস্থিত হইল না। ইহাঁরা দুইজনে এটা ওটা দেখিয়া শেষ একটি হস্তের ও একটি গলার অলঙ্কার দেখাইতে আমাকে আজ্ঞা করায়, আমি একে একে অল্প ও বহুমূল্যের নানাবিধ উক্ত দুই প্রকার অলঙ্কার দেখাইতে লাগিলাম। ভদ্রলোকটি দুই চারিটি অলঙ্কার দেখিয়া আমাকে বলিলেন, "বেশী দামী জিনিসের কোন প্রয়োজন নাই, অল্প দাম অথচ বেশ পরিষ্কার গড়নের জিনিস দেখাও।" আমি তাঁহার আজ্ঞা অনুযায়ী পঞ্চাশ হইতে ৫০০০ টাকার জিনিস পর্য্যন্ত দেখাইতে লাগিলাম। অনেক

দেখাশুনার পর ভদ্রলোকটি একযোড়া মাঝারি গোচ দামের অথচ বেশ পরিষ্কার কাজ করা হাতের গহনা নিয়ে বলিলেন, 'এই যোড়াটা আমার বেশ পছন্দ হচ্চে, এর দাম কত হবে?' আমি বলিলাম '৬০ গিনি।' সঙ্গী স্ত্রীলোকটি এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, তিনি এই কথা শুনিয়া একটু নাকতোলা গোছ করে বল্লেন, "হাঁ, বালা জোড়াটা মন্দ নয় বটে, কিন্তু খুব যে ভাল তাও নয়।" ভদ্রলোকটি জবাব দিলেন, 'কেন, তুমিত বলেচ বেশী দামী দরকার নাই। আর এতগুলোর মধ্যে এই যোড়াটাই আমার বেশী পছন্দ হচ্চে।' স্ত্রীলোকটি তাহাতেই সম্মত হইয়া গলার গহনার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'বা, কি চমৎকার গড়ন, অতি সুন্দর দেখতে ত।' আমি খরিদ্দারের মুখে এই প্রশংসা শুনিয়া দোকানদারের দস্তুরমত সেটিও তাঁহার হাতে তুলে দিলাম। বলা বাহুল্য, তাঁদের ভদ্রলোকের ন্যায় ভাব দেখে আমার সন্দেহটা একপ্রকার দূর হয়ে ছিল, এছাড়া আমার মনিব যে সন্দেহ করে আমাকে এদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেটাও আমি একপ্রকার ভুলে গিয়েছিলাম। স্ত্রীলোকটি গলার গহনাখানি একবার হাতে করে এদিক ওদিক নেড়েচেড়ে আবার প্রশংসা করে বল্লেন, "বা, দিব্য জিনিসটি, কি, চমৎকার! বড় সুন্দর কাজ করা, পছন্দসই জিনিস বটে!" সঙ্গী ভদ্রলোকটি সঙ্গিনীর—এই বারম্বার প্রশংসাধ্বনি শুনিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এটাও নেবার ইচ্ছা হয়েচে নাকি?' রমণী যেন উল্লসিত হয়ে অথচ লজ্জার খাতিরে বল্লেন, 'না না, তবে জিনিসটা ভাল তাই দেখচি।" ভদ্রলোকটি যেন আরো আপ্যায়িত হয়ে বল্লেন 'তার দোষ কি? বেনাবেচার দস্তুরই এই; চক্ষে ভাল ঠেকলে নিতে হানি কি?' এই কথার পর উভয়ের চারি চক্ষু একবার সম্মিলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে কাণে কাণে কি কথাও হইল। তাহার পর আমার জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম ৫০ গিনি। ভদ্রলোকটি আশ্চর্য্য ভাবে যেন একটু থাকিয়া চোক দুটো বিস্তারিত করে আশ্চর্য্য ভাবে বলে উঠলেন, 'উঃ ওই রত্তি জিনিসের এত দর।' কিন্তু জিনিসটি তাঁহার হাতেই নাড়াচাড়া হতে লাগল। আমি একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্লুম, 'জিনিসটা ছোট হলেও ওতে যে মুক্তা কটা রয়েচে, ওরূপ মুক্তা সচরাচর পাওয়া যায় না।' এই কথায় ভদ্রলোকটী একটু নিমরাজি হয়ে যেন অনিচ্ছা সত্বেও সেটি নিতে সম্মত হলেন। সঙ্গিনী এইরূপ খরিদ করায় বড় আহ্লাদিত হলেন, এবং আমি ভদ্রলোকটিকে জিনিসটি বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে দিলুম

বলে আমার প্রতি একবার সকৃতজ্ঞ সহাস্য দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। কে এরূপ সুন্দরী যুবতীর সকৃতজ্ঞ সহাস্য দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে? আমিও বিনীত ভাবে অভিবাদন করিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞ দৃষ্টির সম্মান রক্ষা করিলাম ও আমি মনে মনে তাঁহার বুদ্ধির বড় প্রশংসা করিয়া বলিলাম, যে এরূপ বুদ্ধিমতী খরিদদার না হইলে কি আমাদের দোকান চলে? পুরুষ গুলো কেবল শস্তার দিকে যায়। এক্ষণে আমি তাঁদের বুদ্ধিকোশলে এতদূর মোহিত হইয়াছি ও তাঁহাদের প্রতি এতদূর আমার বিশ্বাস জন্মেছে, যে দোকানের প্রতি আমার আর চক্ষু নাই।

বিলাতের দস্তুর ক্রেতারা প্রায় সঙ্গে করিয়া টাকা আনে না, দোকানদার ক্রীত জিনিষ পাঠাইয়া দিয়া বাড়ি হইতে টাকা আদায় করে। সেই রীতি অনুসারে আমি বলিলাম 'মহাশয়, আপনাদের এসব কোন ঠিকানায় পাঠাতে হবে?' সঙ্গী স্ত্রীলোকটি বলিয়া উঠিলেন, 'আমরা সঙ্গে করেই নিয়ে যাব, তোমাকে আর কষ্ট করে পাঠাতে হবে না।' আমি এই প্রত্যুত্তরে অপ্যায়িত হয়ে দাম চাইলাম। ভদ্রলোকটি এই কথায় পকেট হইতে এক চেক বই বাহির করিয়া একটা ব্যাঙ্কের নামে এক শত দশ গিনির এক রসিদ লিখে দিলেন। চেক খানি হাতে লইয়া এইবার আমাকে একটু চক্ষু লজ্জা পরিত্যাগ করে বলতে হ'ল, 'মহাশয়, আমাদের দোকানের বরাবর নিয়ম আছে যে ব্যাঙ্ক হতে যতক্ষণ না চেকের টাকা আদায় হয়, ততক্ষণ আমরা কোন জিনিষ খদ্দেরকে ছেড়ে দিই না?' এই সময় আমার মনিবের সেই সতর্ক বাক্য মনে পড়িল, যদিও একজন ভদ্রলোককে এই প্রকার রূঢ় কথা বলতে আমার একটু লজ্জাবোধ হইল, আমি মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হলেম, কিন্তু ভদ্রলোকটি আমার এই প্রকার সতর্কতা দেখে কিছুমাত্র বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং সহাস্য মুখে বলিলেন 'বেশত বেশত, আপনাদের এইরূপ সাবধান হওয়াইত উচিত, বিশেষত আজ কাল যেরূপ দিন কাল পড়েছে।' তাঁহার এই উদারতায় আমি আরো লজ্জিত হলেম, এবং তাঁর প্রতি আমার যে একটু সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছিল, সেটুকুও একেবারে গেল। কিন্তু সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটির ভাবে একটু বিরক্তির চিহ্ন দেখা গেল। যাহাই হউক, ভদ্রলোকটি আপনার নাম ও ঠিকানার কার্ড দিয়ে চলে গেলেন। অতঃপর আমাদের একজন লোককে সেই চেকের টাকার জন্য ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া আমি Show room এর যে যে জিনিষ খুলে তাঁদের

দেখিয়ে ছিলাম, সব মিলিয়ে দেখ্‌লাম ঠিক আছে, কোন গোল মাল হয় নি। এই সময় তাঁদের চেকের টাকা আদায় হয়ে এল, সুতরাং আর আমাদের সন্দেহের কোণ কারণ রহিল না, বরং আমার অকারণে একজন ভদ্রলোকের প্রতি একপ সন্দেহ করা হয়েছে, বলে মনে মনে আমি বড় লজ্জিত হলেম; এবং সেই ভদ্রলোকের নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় তাঁর ক্রীত অলঙ্কার দুটি পাঠিয়ে দিলাম।

* * * *

ইহার পর একমাস সময় অতীত হইল। একদিন আমি নিয়মিত সময়ে Show room এ বসে আছি, এমন সময় সেই পূর্ব্বোক্ত যুবতী পুনরায় একা আমাদের দোকানে এসে দেখা দিলেন। এবারও তাঁহার মুখ ঘোমটায় অর্দ্ধাচ্ছাদিত বটে, কিন্তু এবার আর সেই নব প্রস্ফুটিত গোলাপ সদৃশ সুন্দর মুখশ্রী নাই, এবার তাঁহার মুখ খানি কিছু ম্লান, বিমর্ষ, তাতে যেন অস্বাভাবিক ভাবে কোন মানসিক দুঃখের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্চে। প্রথমেই দুচার কথায় তাঁর স্বামীর, সেই ভদ্রলোকটির, কঠিন পীড়ার কথা উল্লেখ করে, তাঁর দোকানে একা আসবার ও বিমর্ষ ভাবের কারণ বলে সেই পূর্ব্বোক্ত গলার গয়নাখানি বার করে বল্লেন, এখানা ভেঙ্গে যাওয়াতে মেরামতের জন্য এবার আমি এসেছি, তাঁর স্বামীর কঠিন পীড়ার কথা শুনে আমি একটু দুঃখিত হলেম ও মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করে তাঁকে আশ্বস্ত করে সেই অলঙ্কার খানি মেরামতে স্বীকৃত হলেম। এবার এঁর সহিত কথা বার্ত্তায় ইনি যে যথার্থ একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের সুশিক্ষিতা মহিলা সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তাঁর স্বামীর পীড়ার পরিচয়ে বুঝতে পাল্লেম, যে তিনিই আরোগ্যের জন্য এখানে (লণ্ডনে) এসে বাস কচ্চেন। স্ত্রীলোকটি লণ্ডনের একজন খুব বড় নামজাদা ডাক্তারের নাম করে বল্লেন, তিনিই এখন তাঁর স্বামীর চিকিৎসা কচ্চেন, কিন্তু এখানে এসে অবধি রোগ ক্রমাগত বাড়চে বলে তিনি তাঁকে শীঘ্র স্পেনে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আদেশ করেছেন। ইহার পর তিনি আমাদের দোকানের দুই চারি খানি সাজান গহনার প্রশংসা করাতে আমি তাঁকে দু এক খানি করে গহনা দেখাতে আরম্ভ কল্লেম, তিনি স্বামীর পীড়ার জন্য দুঃখ কর্‌তে কর্‌তে সেগুলি দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে কয়েক খানি ভাল কাজ করা দামী জড়ওয়া গহনা পছন্দ করায় আমি তাঁর অনুমতি অপেক্ষায় বলিলাম, যদি

আপনি অনুমতি করেন, তাহলে এগুলি সব কাল আপনার স্বামীর নিকট আমাদের লোক মারফত পাঠিয়ে দি ; যদি এর মধ্যে তিনি আপনার জন্য কিছু গ্রহণ করেন।' স্ত্রীলোকটি আবার এই প্রস্তাবে বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করে বিনীত ভাবে বল্লেন, 'আমার স্বামী এসব গহনা পত্র পছন্দ করেন বটে, কিন্তু তিনি এখন যেরূপ পীড়িত, তাতে যে এসময় তিনি কিছু নেবেন এমন আমার বিশ্বাস হয় না, তবে আপনি যখন অনুরোধ কচ্চেন, তখন একবার পাঠিয়ে দেখবেন, যদি এর মধ্যে তিনি কিছু গ্রহণ করেন, বিশেষ তিনি হীরার আংটি আর ঘড়ির চেন বড় পছন্দ করেন।' এই সব কথা বার্ত্তার পর যুবতী আমাকে অভিবাদন করে প্রস্থান কল্লেন। বলা বাহুল্য তাঁর সুমধুর আলাপে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলাম।

পর দিন নির্দ্ধারিত সময়ে নানাবিধ অলঙ্কার লইয়া নির্দ্দিষ্ট আবাসে হোটেলে যাইয়া উপস্থিত হইলাম—সঙ্গে আমাদের দোকানের একজন মাত্র দরোয়ান ছিল। যাইবা মাত্রই প্রথমে আমার সহিত হোটেলের অধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার দুএক কথায় আমাদের ক্রেতার পরিচয় পাইলাম। তিনি তাঁহার বড় প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে ইনি yorkshire এর একজন ধনী লোক ও অনেকগুলি কয়লার খনির অধিস্বামী। পীড়িত হইয়া ইনি এখানকার বাজ চিকিৎসক Sir Ealing Dean এর পরামর্শ গ্রহণের জন্য এসেছেন। ইনি আরো একবার এইজন্য এখানে এসেছিলেন, ইনি অতি ভদ্রলোক, আর ইহাঁর স্ত্রী বড় সতী সাধ্বী, দিন রাত স্বামীর সেবায় নিযুক্ত আছেন। হোটেলাধ্যক্ষের মুখে এই পরিচয় পেয়ে আমি পরম আহ্লাদিত হলেম। পরে আমাদের ক্রেতা যে ঘরে ছিলেন আমি সেই ঘরে প্রবেশ কল্লেম। ভদ্রলোকটির স্ত্রী সেই ঘরে বসে ছিলেন, তাঁর স্বামী তার পাশের ঘরে শুয়ে ছিলেন, আমার প্রবেশ মাত্র তিনি উঠে আমাকে ভদ্রোচিত অভ্যর্থনা করে, বসতে একখানা চৌকী দেখিয়ে দিলেন, আমি তাহাতে বসলেম, তিনি পার্শ্বের ঘরে তাঁর স্বামীর নিকট আমার আগমন সংবাদ দিতে উঠে গেলেন। এস্থলে বলা উচিত আমার সঙ্গী দরোয়ান হোটেলের দ্বারে আমার প্রতীক্ষায় নীচে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত পরে তিনি প্রত্যাগমন করিয়া আমাকে তাঁহার স্বামীর নিকট লইয়া গেলেন। যে ঘরটিতে আমাদের ক্রেতা মহাশয় ছিলেন, সেটি একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর গৃহ, দোর জানালাগুলি সব পরদা ঢাকা, ভদ্রলোকটি

এক খানি কৌচে শুয়ে খবরের কাগজ পড়চেন; এবার দেখে বোধ হল যেন তিনি পূর্ব্বের অপেক্ষায় কাহিল হয়ে পড়েচেন, চোক মুখ বসে গেছে। আমি গৃহে প্রবেশ মাত্র ক্লেশযুক্ত সহাস্য বদনে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আমায় অভিবাদন কল্লেন, পরে শিষ্টাচার সহকারে বল্লেন, 'আপনাকে এই কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি বড় দুঃখিত হলেম, আমার বড় অসুখ শরীর বলে আমি আপনাদের দোকানে যেতে পারি নে, আমার বড় ইচ্ছা ছিল, আমি স্বয়ং গিয়ে পছন্দ-সই দুটা একটা অলঙ্কার কিনে আনব। যাহা হউক, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করে এতদূর কষ্ট স্বীকার করে আমার জন্য এসেছেন, এজন্য আমি আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিচ্চি, আপনার এই অনুগ্রহে আমি অত্যন্ত অপ্যায়িত হলেম।' এই প্রথম শিষ্টাচারের পর আমি গহনার বাক্স খুলে তাঁহাকে একে একে দেখাবার উপক্রম কর্‌চি, এমন সময় তিনি পুনরায় বলে উঠলেন, 'অধিক কিছু আনেন্ নিত, আমার এখন অসুস্থ শরীর আমি বেশী জিনিষ পত্র পছন্দ কর্‌তে পারব না, তবে নুসির জন্য অল্প দামের মত দু এক খানা নেব।'

রোগীর শয্যার পার্শ্বে ঔষধের শিশি, গ্লাস, আর একটা বড় গলা উঁচু পাত্র রয়েছে, বোধ হয়, সেটায় জল বা ঐরূপ কোন জিনিস ছিল। আর একখান ফ্লানেলের চাদরে তার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ছিল।

আমি একে একে দুই এক খান করে অলঙ্কার তাঁর হাতে তুলে দেখাতে লাগলেম; তিনি দেখিতে লাগলেন; কিন্তু তার মুখের ভাবে বোধ হতে লাগল, যেন এগুল তার তত পছন্দ হচ্চে না, আমি একে একে ভাল ভাল জিনিস বার কর্ত্তে আরম্ভ কল্লেম। তার পর একযোড়া হাতের অলঙ্কার নিয়ে তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্লেন, 'দেখদেখি এ যোড়াটা তোমার হাতে কেমন হয়?' যুবতী সহাস্যবদনে যোড়াটি নিয়ে হাতে দিয়ে তাঁর স্বামীর প্রতি আহ্লাদপূর্ণ দৃষ্টিতে কটাক্ষপাত করিলেন। এই সময় ভদ্রলোকটি তাঁর স্ত্রীকে এক গ্ল্যাস সেরি মদ প্রদানের আদেশ কল্লেন, স্ত্রীলোকটি সেরি এনে দিবা মাত্র ভদ্রলোকটি অমনি আর এক গ্ল্যাস পোর্টের জন্য স্ত্রীকে অনুরোধ কল্লেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার এই অনুরোধে বাধা দিয়া বলিলেন "সার ই— তোমাকে অধিক মদ খেতে বারণ।" স্বামী এই কথা শুনে যেন কাতর হয়ে বল্লেন, 'আমার প্রাণ যায়, শীঘ্র দাও, ডাক্তারের জ্বালায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল, এখন আমাকে সুখে মরতে দাও।' এই কথায় তার স্ত্রীর বক্ষে দুই এক

বিন্দু জলধারা পতিত হইল, তিনি নিঃশব্দে এক গেলাস পোর্ট আনিয়া স্বামীর সমক্ষে রক্ষা করিলেন। তাহার পর ভদ্রলোকটি নিজে এক গ্লাস পান করিয়া আমাকে এক গেলাস পানে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহার শিষ্টাচারের জন্য ধন্যবাদ দিয়া সুরা পানে অস্বীকার করায়, তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন তবে 'পোর্ট খাবেন কি? অতি চমৎকার পোর্ট।' আমি তাহাতেও অস্বীকার করায় ভদ্রলোকটি পুনরায় গহনা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার কাছে আর কিছু গহনা আছে,' আমি আরো কয়েকখানি দেখাইয়া বলিলাম, "আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি এখনি দোকান হতে আরো নূতন জিনিস এনে দেখাচ্ছি।" আমার সঙ্গে প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা ছিল। ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন,'না, না, আমি ওই হতেই একটা পছন্দ করে নিচ্চি', তাহার পর একযোড়া বালা লইয়া তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বলিলাম ৩৫ গিনি। ভদ্রলোকটি চমকিয়া উঠিয়া তাহা রাখিয়া বলিলেন,'উঃ এত দর।' তাহার পর আমায় বলিলেন, "আচ্ছা আপনি যখন কষ্ট করে এনেছেন তখন কিছু না নেওয়া ভাল দেখায় না।" আমি তাঁহার এই সৌজন্যে বড় বাধিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলাম,'আপনারা ভদ্রলোক, অবশ্য কিছু না নিলে আমাদের দোকান চলিবে কেমন করে, অবশ্য নেবেন বই কি।' এই সময় ভদ্রলোকটি হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন,'উঃ গেলুম, গেলুম, বড় দুর্গন্ধ, লুসি, শীঘ্র খানিকটা ভিনিগার ঘরে ছড়িয়ে দাও।' আমি হঠাৎ তাঁহার এই প্রকার ভাব দেখে কিছু চমৎকৃত হলেম, বস্তুত, আমি ঘরে কোন প্রকার দুর্গন্ধ অনুভব করি নাই। লুসি এই কথায় খানিকটা ভিনিগার ঘরে ছড়াইয়া দিল। তাহার পর ভদ্রলোকটি সহাস্য বদনে পুনরায় অলঙ্কার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। পুনরায় একছড়া মুক্তার মালা লইয়া দাম জিজ্ঞাসা করায় আমি ৪০০০ টাকা বলিলাম। ভদ্রলোকটি এই কথায় মালাছড়াটি আমার হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, 'না মশায়, আমরা গরিব মানুষ, চার হাজার টাকার মুক্তার মালা কেনা আমার মত লোকের সাধ্য নয়। ডাক্তারেই আমার সর্ব্বনাশ কল্লে।' এই সময় পুনরায় সেইরূপ চীৎকার করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ভিনিগার ছড়াইয়া দুর্গন্ধ নিবারণ করিতে আদেশ করিলেন। আমি কিছু আশ্চর্য্য হইলাম, বোধ হইল, এই বুঝি এঁর রোগের খেয়াল।

কিন্তু এবার তাঁহার স্ত্রী আর ঘরে ভিনিগার না ছড়াইয়া একখান রুমাল লইয়া তাহাতে খানিকটা ভিনিগার লইয়া নাড়িতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আরো খানিকটা ঘরে ছড়াইতে আদেশ করিয়া আমাকে ঘড়ি ও চেন দেখাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি ভাল চেন বাছিতে লাগিলাম, তাঁহার স্ত্রী আমার নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, ভদ্রলোকটি এই সময় বলিয়া উঠিলেন 'শীঘ্র, শীঘ্র, গেলুম, গেলুম।' এই কথা বলিয়াই তিনি নিজে এক শিশি লইয়া ঘরে ছড়াইলেন; আমি ভয়ানক তীব্র গন্ধ অনুভব করিতে লাগিলাম ও কিছু কষ্ট হওয়াতে আঁকুপাঁকু করিয়া উঠিলাম, আমার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। আমাকে এই প্রকার করিতে দেখিয়া ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন,'মহাশয়, বোধ হয়, আপনার কিছু কষ্ট বোধ হচ্চে',বলিয়াই সেই ভিজা রুমাল দ্বারা আমার নাক মুখ চাপিয়া ধরিয়া আমাকে জোর করিয়া একখান চৌকিতে শোয়াইয়া দিলেন। তাহার পর কি হইল আমার ঠিক স্মরণ হয় না। তবে আমার বোধ হয়, যেন আমি একবার নিতান্ত দুর্ব্বলভাবে তাঁহার এই কার্য্যে বাধা দিয়াছিলাম। কিন্তু যেন এক প্রকার অনন্তভূত শক্তি আমার সমস্ত বল হরণ করিয়া লইল। আমি যদিও একবারে অজ্ঞান অচেতন হইয়া পড়িলাম না বটে, কিন্তু এমনি আমার হাত পা দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল যে আমার নাড়িবারও শক্তি থাকিল না। আমি জীবিতাবস্থায় যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। যেন ঘুমের ঘোরে ক্ষীণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম, ভদ্রলোকটি আমার হাতদুটি ধরিয়া রাখিয়াছে, আর তাহার স্ত্রী আমার সঙ্গে যাহা কিছু ছিল সমস্ত আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতেছে। তাহার পর আমার মুখ চিরিয়া আমার মুখে কি যেন জলের মত ঢালিয়া দিল। পরে আমার কানে স্বপ্নবৎ বোধ হইল, যেন ঘরের দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া তাহারা চলিয়া গেল। আমি জাগ্রত অবস্থায় এই স্বপ্নবৎ কার্য্য দেখিতে লাগিলাম। নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া দেখি সেই ঘরে আমি একা। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব কথা মনে স্মরণ করিয়া জ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল। তখন একে একে আমি গহনাপত্র খুঁজিতে গিয়া দেখি যে সে সকল কিছুই নাই। দ্বারের নিকট গিয়া দেখি দ্বার বাহির দিক হইতে রুদ্ধ। তখন আমার সম্পূর্ণ চেতনোদ্রেক হইল। তবে কি আমি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম, না উহা সত্য ঘটনা। অলঙ্কারের বাক্স নিকটেই পড়িয়াছিল, খুলিয়া দেখি যে উহা শূন্য।

এখনও আমি মাতালের ন্যায়, অ মার মস্তিষ্ক ভালরূপ প্রকৃতস্থ হয় নাই; যদিও আমি অনেকটা নিজ অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি, নিকটে চাকরদের ডাকিবার জন্য ঘণ্টা ছিল,তাহা বাজাইলাম; একজন চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে ইহাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। চাকর জবাব দিল তাঁহারা ত অনেকক্ষণ এখান হইতে চলিয়া গেছেন, 'আপনার আহার প্রস্তুত, আসুন।' আমি (আশ্চর্য্য ভাবে) 'আহার প্রস্তুত।' চাকর। 'আজ্ঞা, হাঁ মহাশয়, তাঁরা আপনার জন্য আহার প্রস্তুত রাখিতে বলে গেছেন।'

আর আমার বুঝিতে বাকি রহিল না। ইহার পর যাহা হইল পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন, তবে হোটেলাধ্যক্ষ অনেকক্ষণ তাঁহাদের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন।

শ্রী কালীপ্রসন্ন দত্ত।

কাব্যের কোকিল।

একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে; প্রবাদটী প্রায় সকলেই সময়ে সময়ে ব্যবহার করে, প্রবাদটী এই:—"কৃষ্ণ কেমন? যার মনে যেমন।" পৃথিবীর পদার্থপুঞ্জ সকলে সমান চক্ষে দেখিতে পায় না—সকলে সমান ভাবে ধারণা করিতে পারে না। একজন, সামান্য বালুকারেণু হাতে লইয়া ভাবে তদ্গত; আর একজন শত শত পাহাড়, পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া হুহু শব্দে চলিয়া যাইতেছে, ভ্রূক্ষেপও নাই। একজন একটী সাধারণ পত্রের শোভা সৌন্দর্য্যে বিমোহিত; আর একজন হাটিতে হাটিতে, সেই পত্রটী বৃন্তচ্যুত করিয়া নখে ছিঁড়িয়া অম্লান বদনে চলিয়া যাইতে সমর্থ। একজন নদী, মাঠ, ঘাট—সবই সুন্দরতাময় দেখে; আর একজন

তাজমহলে যাইয়াও এটী ওটীর দোষ অনুসন্ধানে তৎপর! কাহারও পৃথিবী—সুখের পরিবার, ভাবময়, আবেশময়; কাহারও পৃথিবী চিরশুষ্ক—মরুভূমি।

জগতের সর্ব্বত্র এই মতদ্বৈধ, সর্ব্বত্র এই বৈষম্যবাদ। এই বৈষম্য প্রার্থনীয় হউক আর নাই হউক, সকল বিষয়েই ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয়: বর্ণ, আকার, গঠন, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোক সৌন্দর্য্যের উপাদান কল্পনা করে, কিন্তু, এসকল ত সবই বাহ্যিক; প্রকৃত সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক অতি অল্প—আদবে আছে কি না সন্দেহ। সৌন্দর্য্য—জড়ত্ববিরোধী উদ্বোধন, চখে মুখে এর সত্তা নাই; এর স্থান হৃদয়ে।

সময়ে সময়ে, সংসার যেন কুজ্ঝটিকাবৃত—ঘোর তমসাচ্ছন্ন, গাছগুলি অন্ধকারে ভূত প্রেত বলিয়া ভয় হয়, চারিদিকে সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভ্রান্তি। মন যেন কি জানিতে চায়, ঘোর পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ; জলের অত্যন্তাভাব। যেদিক দেখা যায় কি যেন দেখি, দেখি—দেখিতে পাই না, যেন কেমন অভেদ্য, দুর্ব্বোধ। এমন অনেক সময় আসে,—

In which the burthen of the mystery,
In which the heavy and the weary weight
Of all this unintellegible world,—

যখন এই দুর্ব্বোধ জগতের দুর্ভার রহস্য রাশি আমাদের উপর আসিয়া চাপিয়া পড়ে। ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই স্থির করা যায় না, হৃদয়ের অন্তস্তল প্রদেশ হইতে কে যেন ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে —

কোথা হতে আসি, কোথা ভাসি যায়?
সঞ্চার আবার হয় কি হেথায়?
বীজে অঙ্কুরিত, বীজে পরিণতি?
চক্রাবর্ত্ত ভাবে দুরলঙ্ঘ্য গতি?
গ্রহের মতন চক্রেতে ভ্রমণ?
ধূমকেতু মত অথবা গমন,
অনির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমি চির দিন,
ভ্রমি ভ্রমি সূর্য্যে হইবে বিলীন?

পৃথিবীর দিকে তাকাইলেও সমস্তই কোলাহল—গণ্ডগোল—বিশৃঙ্খলা! গুণীর আদর নাই, নির্গুণ বেশ গণ্য মান্য; গগনস্পর্শী বৃক্ষশাখায় সিমুল

ফুলের স্থান ; আর গোলাপ ? গোলাপ গাছটী আওতায় পচিতেছে—টপ্ টপানি খাইতেছে। ধার্ম্মিকের সমৃদ্ধি নাই, যত সব ভণ্ড তপস্বী বেশ আসর জমকাইয়া ধার্ম্মিক নামে পরিচিত; যার যেখানে সমাবেশ প্রার্থনীয়, সেখানে তার নামগন্ধও নাই ; যেন রেলের গাড়ী পূরা দমে চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে—সকলই ওতপ্রোত, অর্দ্ধ সম্পন্ন ;—

যে দিকে চাওয়া যায় সেই দিকেই "অহো বিধাতঃ শিশুতা তবৈব।" বলিয়া উষ্ণ শ্বাস ফেলিতে হয়। সমস্তই অনিয়ম—সমস্তই কবির chaos !

যাহাতে জগতের এই বিরোধের ভঞ্জন হয়, যাহাতে ইহার পরিবর্ত্তে অপূর্ব্ব শান্তি সদ্ভাব সংস্থাপন করে,—তাহাই সৌন্দর্য্য, যাহাতে ধরার সচ্ছন্দ সদ্ভাবে বিশ্বময়ের বিশ্বরূপ প্রকটিত করে ; যাহাতে প্রতি পরমাণুতে তাঁহার শৃঙ্খলা, অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের বিকাশ হয় ; যাহা মনে ধরিয়া, ইচ্ছাময়ের ব্রহ্মাণ্ডময় অপ্রমিত তেজ, ফুটন্ত ফুলের ন্যায় মনশ্চক্ষুর গোচর হয়, তাহারই নাম সৌন্দর্য্য। প্রেম, মিলন—সৌন্দর্য্যের কাজ, সামঞ্জস্য—সুন্দর, অসামঞ্জস্য—অসুন্দর। এই জন্যই, চন্দ্রবাবু বলেন, যাহা সুন্দর নয়, তাহাকে যাহা অতীব সুন্দর দেখে, এমন মনই সৌন্দর্য্য দেখিতে পারে, চক্ষু এবিষয়ে অন্ধ। বঙ্কিম বাবুর এই স্থানটি বড়ই রমণীয় ; "গোবিন্দলাল উদ্যানে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন প্রকৃতি করুণাময়ী।" প্রকৃতির এই করুণা—সৌন্দর্য্যের অপর নাম—এই করুণা সতত সামঞ্জস্য স্থাপনে চেষ্টিত। প্রকৃতি ধীরে ধীরে ছাটিয়া ছাঁটিয়া সকলের উচু নীচু দূর করিয়া সমান করিতেছে ; প্রকৃতির সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য ; প্রকৃতি হইতে আর অধিক সুন্দরী কে ? কবি রবি ঠাকুর এ কথা বেশ বুঝাইয়াছেন।

এখন কাব্যের কোকিলের কথা বলিব। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ বিরহিণী রাধা "পায়স লেই করে বায়স নিয়ড়ে ফুকারি," যেন কাকে আর কোকিল পালন-না করে—যেন কোকিলের ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া ফেলে—বিরহিণীর এক প্রধান শত্রু নিপাত হইবে। বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের অসীম মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন ; কিন্তু, কোকিল, ভ্রমর, চাঁদ, মলয়বায়ু, এ সকল সম্বন্ধে তাঁহাদের বর্ণনা প্রেমের ব্যাকুলতার সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে গিয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ কেন ? কালিদাসও বলেন ;—

"সমদ মধুকরাণাং কোকিলানাঞ্চনাদৈঃ। *
কুসুমিত সহকারৈঃ কর্ণিকারৈশ্চরম্যৈঃ॥

ইষুভিরিব সুতীক্ষ্ণৈ র্মনসং মানিনীনাং।
তুদতি কুসুমবাণো মন্মথোদ্দীপনায় ॥"

এইরূপ আদি কবিগণ প্রায় সকলেই কোকিলরবে একরূপ ভয়ানক লালসা—এক ভয়ানক গলা শুকানো পিপাসা সংযোগ করিয়া গিয়াছেন। এ পিপাসা দেশ, দিক, পাত্র ভেদে যেরূপই ধারণ করুক, সাধারণত ধারণা—ইহা একরাশি বিষ মিশ্রিত। কিন্তু তাম্র পাত্রে দুগ্ধ রাখিলে যে বিষ হয়, তা কি দুগ্ধের দোষ? দুগ্ধ জগতের জীবন, কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগী দুগ্ধ পান করিলে স্বতই অধিকতর বিকারতা প্রাপ্ত হয়! ফল কথা,—

"There is nothing good or bad;
But thinking makes it so"
ভাল মন্দ কিছুই নাই,
মনের গুণে ভেদ রে ভাই।

চন্দ্রবাবু বলেন, সরল বালক সমস্ত রাত্রি সুখের ঘুম ঘুমাইয়া নিশিশেষে কোকিল রবে আহ্লাদে মাতিয়া খেলা করিতে ছোটে। কই? সে তো কোকিলের গরলের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠে না।

বঙ্কিমবাবু কোকিলের বেশ চিত্রটী আঁকিয়াছেন, তাঁহার কোকিলেও বিষ আছে—সে বিষ শোধিত বিষ, সে বিষের জ্বালায় অন্তর দহে বটে, কিন্তু, সে প্রদাহের পরিণাম মৃত্যু নয়—শান্তিপূর্ণ স্থির ভাবও নয়। উহা ব্যাকুলতা; সে ব্যাকুলতায় মানুষকে বসাইয়া দেয় না—সামনের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। অথচ বঙ্কিমবাবুর কোকিল যেন কেমন এক হা হতোঽস্মির ভাব আনিয়া ফেলে। "কি যেন ছিল, কি যেন নাই, যেন তাহার অভাবে জীবন অসার হইয়া পড়িয়াছে।"

তার পর, ওয়ার্ডসোয়ার্থের কোকিল। যে সকল অপরিস্ফুট তত্ত্ব দার্শনিকগণ সংসার সংস্রব-বিহীন নিরবচ্ছিন্ন সত্য বলিয়া ধ্যান করেন, সেই সকল নানা অপরিজ্ঞেয় উপায়ে মানব মনে সমুদিত হইয়া তাহাকে স্বর্গীয় মত্ততায় মাতাল করিয়া তোলে, ব্যক্তি বিশেষকে মহাশক্তি স্বমূর্ত্তিধরিরা দেখা দেন, আর নাই দেন, সাধারণ মানব জাতির নিকট তিনি অল্প অধিক পরিমাণে স্বতই পরিস্ফুট। এই স্বর্গীয় মত্ততা—এই আগ্রহাতিশয্যই প্রকৃত উদ্বোধন। চৈতন্যকে যখন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বিগলিত নেত্রে গাইতে দেখি—

"পরম দয়াল আমার গোসাঞি।
যখন যা চাই তখন তা পাই॥"

যখন দেখিতে পাই, যিশুখ্রীষ্ট বিশ্বাস বিস্ফারিত লোচনে বলিতেছেন "Ask and it shall be given ; knock and it shall be open ;"

যাচিতে থাকিলে মিলিবে ধন, দুয়ারে ঘা দিলে, খুলিবে কবাট।

তখন আমরা বুঝিতে পারি প্রার্থনা দ্বারা কত কি করা যায়। বস্তুত প্রকৃত প্রার্থনা, আধ্যাত্মিক জগৎ সম্মুখ লইয়া আসে। আবার প্রেম—বিশ্বজনীন প্রেম, সার্ব্বভৌমিক প্রীতি—স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করে। ওয়ার্ডসোয়ার্থও এই কথাই বলেন, কিন্তু তিনি এখন একটু বাড়াইয়া বলেন, তিনি যা বাড়াইয়াছেন, তা সকলেরই অনুকরণীয়-শিক্ষণীয়। তিনি দেখাইয়াছেন, ফুল, ফল, লতা, পাতা, একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকণা—ধ্যান করিয়াও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। তিনি বলেন প্রকৃতির প্রকৃত ধ্যান করিয়া মানুষ জড় পদার্থের জীবন দেখিতে পায়। ওয়ার্ডসোয়ার্থ নিজেই এ কথার বিশিষ্ট প্রমাণ; তাঁহার জীবন দেখিলে একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি, তিনি বলেন;—

"I have felt a presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts.

আমি এমন সত্তা উপলব্ধি করিয়াছি যে, তাহাতে কি এক মহান্ ভাবে আমাকে ব্যাকুল করিয়াছে।

তিনি বলেন জীবনে এমন সময় আসিয়াছে—

"When the light of sense goes out, but a flash has revealed the invisible world."

যখন এই বাহিরের আলোকে নিবিয়া যায় কিন্তু অন্তরে বিদ্যুৎ বিকাশে অদৃষ্ট জগৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

ওয়ার্ডসোর্থের কোকিলে—অন্যান্য লেখার কথা বলিতেছি না—এই প্রাকৃতিক ধ্যানের উন্মেষ মাত্র পরিলক্ষিত হয়;

And listen till I do beget
That golden time again,
O blessed bird ! the earth we pace,
Again appear to be
An unsubstantial, fairy place
That is a fit home for thee."

ওয়ার্ডসোয়ার্থের কোকিলে যে ভাবের উন্মেষ, চন্দ্র বাবুর কোকিলে সেই ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ; পূর্ব্বোক্ত স্বর্গীয় ভাবের—চরম সীমা। তাঁহার কোকিলের রবে প্রেম, জ্ঞান, ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া ফেলিতেছে। ভাগবতী ভক্তি, সারস্বতী শক্তি একত্র মিলিত, গঙ্গা যমুনার সঙ্গম, সেই দেবারাধ্য প্রয়াগ তীর্থ। প্রয়াগে নাকি নর লোচনের অগোচর, অন্তঃ-সলিলা সরস্বতী প্রবাহিতা আছে, যখন প্রয়াগে গিয়াছিলাম, চর্ম্মচক্ষে তা দেখিতে পাই নাই। চন্দ্রবাবুর কোকিলে সেই গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর একত্র মিলন—"একত্র মিলন—একতাত্মক, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশ"—দেখিতে পাইলাম।

বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে কেহ কেহ মোহন মুরলীর কোন্ রন্ধ্রের শব্দের কি গুণ তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, একজন লিখিয়াছেন, শ্রীরাধিকা প্রেমের আবেশে গলিয়া মুরলী বদনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

কোন্ রন্ধ্রে কোন্ ধ্বনি কহ গুণমণি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা রবে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফোটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে ফোটয়ে কদম্ব প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু বহে এক কালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে॥

রাধিকা বাঁশরী রবে মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছেন, ঐ রবেই ময়ূরিণীর কেকা রবে নৃত্য; ঐ রবেই রসালে পারিজাত প্রস্ফোট, ঐ রবেই ষড়ঋতুর একত্র সমাবেশ।

সিদ্ধার্থ বিলাস ভবনে, ভোগ সুখে পরিবেষ্টিত হইয়া, বেণু বীণার রবে শুনিতে পাইতেন—

সর্ব্বভূত ক্ষয়-ধর্ম্মী, অনিত্য সংসার;
সুমহান্ কৃচ্ছ্র ভোগ প্রাণী সবাকার;
জরা ব্যাধি মৃত্যু দুঃখ—প্রদীপ্ত দহন
দহিছে রজনী দিনে অনাথ ভুবন।
মৃত্যু বশীভূত সবে হইবে বিলয়;
নদী ক্ষিপ্ত দারু মত মৃত্যু হরি লয়!

পুন আগমন নাই, পুন সংমিলন
নদী স্রোতে বহমান ফল পত্রগণ!
কামনা নটের নাট, নিশার স্বপন;
সলিল বুদ্বুদ মরীচিকা প্রদর্শন!

যে বেণু বীণা অঙ্গনা হস্তে যাইয়া স্থান বিশেষে মানুষকে নরকের দিকে টানিয়া লয়, সেই বেণু বীণা'র রবে, নর্ত্তকীর কাকলীতে সিদ্ধার্থ জন্ম-জরা-মৃত্যুর তরঙ্গে হৃদয়ে আহত হইলেন; তিনি শুনিতে পাইলেন, যেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধিসত্ত্বগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন; —

বিপরীত রাগ দ্বেষে দহে ত্রিভুবন,
কৃপা মেঘ শীতপাম্বু কর বরিষণ,
স্বর্গের অমৃত দ্বার কর উন্মোচন,
বোধহ নিনয়, কর মুক্তি প্রদর্শন।
অবিদ্যা মোহ তামস লিপ্ত ধরাতল,
নিরঞ্জন ধর্ম্ম চক্ষু দাও সুবিমল।

চন্দ্রবাবু কোকিলের রব পূর্ব্বোক্ত রূপ তন্ময়তার সহিত শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহার কোকিলের রবে ইহারই অনুবৃত্তি, শুধু অনুবৃত্তি নয়, এইরূপ কয়েকটী ভাবের মিশ্রণ; মিশ্রণে এক অদ্ভুত পূর্ণ অমিশ্র পদার্থের সৃষ্টি! "বসন্ত পৃথিবীর চরম বিকাশ, কোকিল-কণ্ঠে সেই চরম বিকাশ স্বরূপে পরিণত। কু—উ স্বরে ব্রহ্মাণ্ডের স্ফোট একত্রীভূত। কু—উ ধ্বনি স্ফোটের সঙ্গীতাত্মক প্রতিকৃতি। সৌন্দর্য্য সরলতা, বীরতা, দয়া, প্রেম ভক্তি, জ্ঞান, কু উ স্বরে বিকশিত—কোকিল রবে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশের সঙ্গীত।"

তার পর, আবার কোকিলের পঞ্চম।

এই সুন্দর হইতে সুন্দরতর, সুন্দরতর হইতে সুন্দরতম, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, বৃহত্তর হইতে বৃহত্তম, বৃহত্তম হইতে অনন্ত, উন্নতি, উন্নতি উন্নতি, আরো উন্নতি; অনন্ত উন্নতি, এই মন্ত্রেই কোকিলের কু, কু—উ, কু—উ, কু—উ, কূ। এই ধারাবাহিক অনবচ্ছিন্ন উন্নতিই চন্দ্র বাবুর কোকিলের পঞ্চম।

অনেক দিন হইল হেমচন্দ্র কোকিলরবে প্রকৃতিকে নব কিসলয়ে সাজিতে দেখিয়া, অচেতন মলয়বাত, অচেতন কুসুম রেণুকে কোকিল কাকলী

শুনিয়া অধীর হইতে দেখিয়া, প্রবাহিণীকে কোকিলের ভাবে মাতিয়া, কল কল স্বরে সাগর পাশে ছুটিতে দেখিয়া—জড়কে চেতনের ভাষা বুঝিয়া সচেতন হইতে দেখিয়া—গাইয়া ছিলেন—

"বহে যদি সে তরঙ্গ কাহারও হৃদয়ে,
গাও হে তবে সে গীত শুনায়ে কর জীবিত
নিঃস্রোত বঙ্গের হৃদি স্রোতেতে ডুবাও।
রহস্য, রোদন, কিম্বা উৎসাহে ভাসাও।
কে আছে হে রবি কুলে গভীর হৃদয়,
গাও একবার শুনি জীবন সার্থক গুণি
অমনি মধুর স্বরে গভীর উচ্ছ্বাস
জুড়াবে এ গউড়ের প্রাণের হুতাশ।"

"গভীর হৃদয" চন্দ্রবাবু কোকিলের 'মধুর স্বরে" "গভীর উচ্ছ্বাসে" সেই রহস্য উৎসাহের গীত গাইয়াছেন, কোকিল রবে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশের একতানাত্মক সঙ্গীত চিত্রিত করিয়াছেন। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর একবার এই সঙ্গীত দেখা উচিত। দেখিয়া, শিখিয়া 'জীবন সার্থক" করা কর্ত্তব্য।

যম-যাত্রীদের সেতোগণের সভা।

এখন সকল রকমেই সুবিধা হইয়াছে' পূর্ব্বে বিলাতে যাইতে হইলে ছয় মাস লাগিত, এখন একুশ দিনের বেশী লাগে না,—পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ হইতে গয়া কাশী যাইতে হইলে তিন মাস লাগিত, এখন দুই দিনেই যাওয়া যায়। এই অনুপাতানুসারে যমালয়ের পথও অনেক নিকট হইয়াছে। কিন্তু হৈম পথ, জলীয় পথ, তাড়িত পথ প্রভৃতি নূতন নূতন পথ হওয়াতে, "এলো পথের" যাত্রীর সংখ্যা মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, সেই পথের সনন্দ

প্রাপ্ত ইজারদারগণ কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন; বিশেষ, কালিঘাটের হালদারদিগের ন্যায় ইহাঁদের অংশীদারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়াতে লাভের অংশ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তাই ইহাঁরা ধর্ম্মঘট করিয়া অপরাপর পথগুলি বন্দ করিবার এবং অপ্রাপ্ত-সনন্দ পাণ্ডাগণকে অনর্থক অংশ দান করিতে না হয়, তাহার চেষ্টায় আছেন।

ইতিমধ্যে ইজারদারগণ গুপ্ত সভা আহ্বান করেন। সকল সভ্য সভাস্থ হইলে একজন সভ্য এই প্রস্তাব করিলেন, যে আজ কাল গবর্ণমেন্ট যেরূপ ক্ষিপ্র হস্তে সনন্দ বিতরণ করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয় যে অতি অল্পকাল মধ্যেই যাত্রী অপেক্ষা সনন্দ প্রাপ্ত অংশীদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। আর গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উদার, তাহাতে সনন্দ বিতরণে বাধা জন্মাইবার আশাও দুরাশা মাত্র। বরং সেরূপ চেষ্টা করিলে গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হইবার সম্ভাবনা। অথচ অংশীদারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইলে "কুতের" ভাগ ক্রমশই হ্রস্ব হইয়া আসিবে; অতএব যাহাতে সকল দিক বজায় রাখিয়া পূর্ণ মাত্রায় যমযাত্রী পাওয়া যাইতে পারে, এরূপ একটী উপায় উদ্ভাবন করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এই কথা শুনিয়া সভ্যগণ "সাধু সাধু" উচ্চারণ করিয়া প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। অতঃপর আর একজন সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবকারীকে ধন্যবাদ প্রদান করত বলিলেন, বর্ত্তমান বিপদ দূরীকৃত করিবার একটী সুন্দর উপায় আমি উদ্ভাবন করিয়াছি, সভ্যগণের মনোনীত হইলেই কৃতার্থ হইব। উপায়টী এই যে অনেক যাত্রী আমাদের সাহায্যে একেবারেই যম-কবলে নিপতিত হয়; তাহাদের কাছে আমরা একবার বই "কুত" পাই না। আমরা আবহমান কাল যমরাজের সাহায্য করিয়া আসিতেছি, এই ক্ষণে তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যদি ক্ষুধা নিরোধ করেন, কোন লোককে কবলিত না করেন, অথচ প্রত্যেককে বৎসরে ৪।৫ বার তলপ করিয়া কাছে নিয়া ছাড়িয়া দেন, তবে আমরা, প্রত্যেক মানুষের নিকট প্রতিবারে যাইতে আসিতে দুইবার করিয়া বৎসরে ৮।১০ বার "কুত" পাইতে পারির; আর যাত্রীগণ যমের কবলের-অগ্রাহ্য হইলে, আমাদের লাভের অঙ্ক অনন্তকালপর্য্যন্ত এমনই অসংখ্যরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। অতএব এই গুপ্ত সভা হইতে এই বিষয়ের জন্য যমরাজকে অনুরোধ করা হউক। এই প্রস্তাব শ্রবণান্তে সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আত্মহারা হইলেন এবং সজোরে করতালি দ্বারা গুপ্ত সভা ব্যক্ত করিলেন।

অনন্তর তৃতীয় ব্যক্তি সভাগণকে গম্ভীর ভাবে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আপনারা উল্লাসে মত্ত হইয়া অধীর হইবেন না। ধৈর্য্যাবলম্বন না করিলে উপস্থিত কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; তিনি দ্বিতীয় প্রস্তাবকারীকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন প্রস্তাবকারীর সারগর্ব্ভ বক্তৃতা তাঁহার অগাধ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছে কিন্তু যমরাজের ক্ষুধা নিবোধ সম্বন্ধে আমার এই বক্তব্য যে আমরা যখন যমরাজের এত উপকার করিয়াছি, তখন তিনি যে আমাদের মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু, ক্ষুধা, স্বাভাবিক বৃত্তি, ইচ্ছা করিলেই ইহাকে নিরোধ করা যায় না, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির হিতাহিত জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না ; এ অবস্থায় যমরাজ আহার না করিয়া যে সহজে সুস্থ থাকিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। তবে আমাদিগকে ঔষধের সাহায্যে এরূপ করিতে হইবে, যাহাতে যমরাজের ক্ষুধাবৃত্তির উদ্রেক হইতে না পারে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানে আজ পর্য্যন্তও এমন কোন ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার সাহায্যে ক্ষুধা-বৃত্তিকে নির্ব্বাণ মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

এই কথা শুনিয়া চতুর্থ ব্যক্তি ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—কথার ভাবে বোধ হইতেছে আপনি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। বিজ্ঞানের অসাধ্য কি কোন কাজ আছে ? আমি এইক্ষণেই তিব্বতীয় কোন মহাত্মার নিকট অনুরোধ পত্র দিতেছি, সেই পত্র নিয়া যমরাজ, মহাত্মার নিকট গিয়া যদি কিছু দিন শিক্ষানবিশী করেন, তবে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে ক্ষুধাকে "নির্ব্বাণে" দেওয়া কতদূর সহজ। অবশ্য এ কথা আপনাদিগকে বলিয়া দিতেছি, মহাত্মার উপদেশে যমরাজ স্বীয় জিহ্বাকে কণ্ঠোর্দ্ধস্থ রন্ধ্রের মধ্য দিয়া ব্রহ্মতালুতে ঠেকাইতে পারিলে, আর তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকিবে না। অনন্তর আর একজন সভ্য উঠিয়া বলিলেন, এ বড় দুঃখের বিষয় যে আপনারা সকলেই "উপায়ের" চিন্তা করেন কিন্তু "অপায়ের" চিন্তা করেন না। ব্রহ্মতালুতে জিহ্বা ঠেকাইতে পারিলে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ হয়, তাহা যোগ শাস্ত্রের নিগূঢ় সত্য, সে কথা কেহই খণ্ডন করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ অবস্থায় মানুষের বহিরিন্দ্রিয় সকল কার্য্য না করিয়া জড়ভাব ধারণ করে। আমরাতো আর যমরাজকে যোগী করিতে বসি নাই। যমরাজের নির্ব্বাণ মুক্তি বা অনন্ত শক্তি লাভও আমাদের লক্ষ্য নহে। যমরাজের বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইলে

আর তিনি সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না সুতরাং কাহা-কেও তিনি তলপ করিবেন না। আর তলপ না করিলেই বা কে ইচ্ছা করিয়া যমপুরে যাইবে? এর ফল এই হইবে যে এখন তবু আমরা ভাগের ভাগ দুই দশজন পাইতেছি, যমপুরী যোগীরাজের আবাস হইলে, তাও যাইবে; আমাদিগকে অনশনে জীবন হারাইতে হইবে। অতএব জিহ্বা ব্রহ্মতালুতে ঠেকাইয়াও যমরাজ যাহাতে বহিরিন্দ্রিয়ের পরিচালন দ্বারা লোকের প্রতি আধিপত্য খাটাইতে পারেন, তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, তাহা হইলেই আমাদের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে। এই কথার পর, গুপ্ত সভা গুপ্তত্বরূপ ধারণ করিল, কাহারো মুখে আর কথা ফুটে না, সক-লেই নির্ব্বাক্।

কিয়ৎক্ষণ পরে, বিশালদেহ একজন সভ্য গম্ভীর ভাবে গাত্রো-ত্থান করিয়া, সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তির মুখাবলোকন করত ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, সভ্যগণ আপনারা যে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি, নতুবা এ অধীনকে আজি আপনাদের সমক্ষে বাচালতা করিতে হইত না। আমি প্রস্তাব করিতেছি, যে যমরাজকে প্রত্যহ বাইট গ্রেন করিয়া কুইনাইন দেওয়া হৌক, তাহার ক্ষুধা অত্যন্ত মন্দা থাকিবে, অথচ তিনি গাত্র জ্বালায়, যাত্রীগণকে অনবরত তলপ তাগাদা করিতে থাকিবেন। এই কথায় সকলেই সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চট্‌কা ভাঙ্গিয়া উঠিলেন—এবং বলিলেন ইহাই সাধু পরামর্শ, তখন সেই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল, ও আনন্দে সভা ভঙ্গ হইল।

শুধুই রহস্য।

পরলোক গত ডাক্তার রামদাস সেন 'ঐতিহাসিক রহস্য,' 'রত্নরহস্য' লেখেন; ইহলোকস্থিত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবু 'বিজ্ঞান-রহস্য' 'লোক-রহস্য' লিখিয়াছেন। ঐহিক পারত্রিক বড় লোকেদের দেখাদেখি আমারও কিঞ্চিৎ

রহস্য লিখিতে সাধ হইয়াছে। কিন্তু গুরুতর অন্তরায় উপস্থিত ; ইতিহাসে—আমার হাসি আসে ; বস্ত্র—আমি চিনিতে পারি না ; বিজ্ঞানে—অজ্ঞান ; লোক বুঝিবার আলোক আমাতে নাই। কাজেই, আমাকে শুধুই রহস্য লিখিতে হইল, সুতরাং আপনাদিগকেও অগত্যা শুধুই রহস্য পড়িতে হইতেছে।

সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—বলি হাঁগা, শুধুই রহস্য কি লিখিব ?

সর্ব্বাগ্রে একালের ছাত্র বিস্মিত মুখে বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

রাগ অর্থ ভালবাসা, ঘৃণা অর্থ দয়া মায়া।

তখন একালের শিক্ষক গম্ভীর মুখে বলিলেন তা নয়,শুধুই রহস্য এই যে,—

যে লেখে সে শেখে না,
যে শেখে সে লেখে না।

একালের দরিদ্র বক্ষে হাত দিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল, শুধুই রহস্য এই যে,—

ক্ষুধায় যে ক্ষিপ্ত, শাকান্ন তাহার যোটে না।

ধনী উদরে হাত দিয়া তেমনই কাতর কণ্ঠে বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

প্রচুরে যে বিভোর মন্দাগ্নি তাহার ঘোচে না।

একালের সংবাদপত্র তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—

গরীবের তেলনুণের উপর বাটা চড়ানই রাজনীতি,

একালের রাজপুরুষেরা উত্তর চ্ছলে বলিলেন, আর শুধুই রহস্য এই যে,—

রাজার রাগ বাড়ানই প্রজানীতি।

একালের সাময়িক পত্র সকল দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—

বহুপরে যে মূল্য পাওয়া যায়, বা তাও যায় না—তাহার নাম অগ্রিম মূল্য ;—

একালের গ্রাহকেরা শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি রাগ করিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

সময়ে যাহা কখনই বাহির হয় না, তাহার নাম সাময়িক পত্র।

একালের আহেলেমামলা আদালতের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—

ইষ্টাম্পের যে ব্যবসা তাহার নাম ন্যায়রক্ষা।

আর পল্লীগ্রামের লোকে পোলিস্‌কে দেখাইয়া বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,—

দুপর রাত্রিতে যে চীৎকার, তার নাম শান্তি রক্ষা।

নাইট সাহেব মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,

সব চেয়ে দুঃখী এই ভারত ভূভাগে,
সব চেয়ে বেশী বেশী বেতনাদি লাগে।

গ্রিফিন্‌ হাত কামড়াইয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,

তোমরা— যার শীল, তার নোড়া,
তারই ভাঙ্গিবে দাঁতের গোড়া।

তখন সেকালের দিকে পশ্চাৎ দৃষ্টি করিলাম।

সেকালের শম্ভু খুড়ো হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—শুধুই রহস্য এই যে,—

মনের কথা খুলে বলিলেই বাতুল,
চেপে রাখিলেই প্রতুল।

সেকালের আমলা মহাশয় ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

আমলাকে পয়সা দিয়া কাজ করাইলে—অপব্যয়,
উকীলকে মোহর দিয়া কথা কহাইলে—সদ্ব্যয়।

সেকালের শাশুড়ীরা কপালে হাত দিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

ডাকিলে, জামাই খায় না,
বাঁচিলে, জামাই পায় না।

সেকালের দিদী শাশুড়ীরা গালে হাত দিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

পোড়া দেশের দেখ কাপ,—
যা নইলে, পেট ভরে না, তারেই বলে, সক্‌ড়ি,
যা নইলে ঘর ভরে না, তারেই বলে পাপ।

সেকালের বঙ্গদর্শন আমার চক্ষে আঙ্গুল দিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

যুবকের ভিক্ষার নাম ডেলাফেলানি, যুবতীর ভিক্ষা শয্যাতোলানি,

গুরু পুরোহিতের—প্রণামি, জমীদার নায়েবের—সেলামি,

কিন্তু কেবল দরিদ্রের ভিক্ষাই লাঞ্ছনা র'হল।

সেকালের হুতোম পেঁচা সহরের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

এখানে খেঁদীপুতেরা—পদ্মলোচন,

আর প মণ্ড ভণ্ড গুলা—ভাগবতভূষণ।

সেকালের সাধক রামপ্রসাদ গাহিতে গাহিতে বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

দুটা গজ দুটা অশ্ব স্থানে বসে' কাল কাটালো,

আর বড়ের ঘরে বরে ভর মন্ত্রীটা বিপাকে মলো।

সেকালের মাতাল টলিতে টলিতে বলিল, শুধুই রহস্য এই যে,

বিশবাঁও জলের নীচে ইলিশ ঠাকুরাণী, সে হলো গরম,

আর সূর্য্যি খুড়োর লেজে বাঁধা ঝাটার ফল,—ডাব্—সে হলো ঠাণ্ডা।

সে কালের পক্ষী কবি আপশোষ করিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,—

ইংরাজ জাতি হল জ্ঞাতি, উপার্জ্জনের অংশ চায়।

সে কালের ভট্টাচার্য্য একটু হাসিয়া একটু কাঁদিয়া বলিলেন, শুধুই রহস্য এই যে,

দাতায় দান করে,

হিংসকে হিংসায় মরে।

তখন সম্মুখ পশ্চাৎ শেষ করিয়া ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। শুনিলাম দৈব-ভারতী বলিতেছেন, 'বাছা একাল সে কালের এত কথা শুনিয়াও এখনও বুঝিলে না যে শুধুই রহস্য কি,—তবে শুন, সর্ব্বকালের শুধুই রহস্য এই যে,

যে জানে সে বলে না,

যে বলে, সে জানে না।

যারে চাই তারে পাই না,

যারে পাই তারে চাই না।

আরও রহস্য এই যে,—

লোকে, ডাঙ্গায় ভাসে, জলে চসে,
দাঁতে হাসে, ঠোঁটে ভাষে।

তখন ভারতীর ভাষায় শুধুই রহস্য শুনিয়া আমি গলবস্ত্রাঞ্চলে মায়ের চরণাঞ্চলে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম, বলিলাম—'আমি এইবার শুধুই রহস্য বুঝিয়াছি।' প্রশ্ন হইল, 'কি বুঝিলে?' আমি বলিলাম, 'সর্ব্বাপেক্ষা উপর রহস্য—'অদ্যকার এই প্রবন্ধ।' দেবীর হাস্যধ্বনি যেন শুনিতে পাইলাম—বলিলেন, 'তুমিই বাছা রহস্যবিৎ, 'যাও ছাপ।'

সুতরাং আমি ছাপিলাম।

মাক্‌বেথ্ ও হাম্‌লেট।

৩।

আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধে মাক্‌বেথ্‌কে রক্তাক্ত হস্তে দণ্ডায়মান রাখিয়া, হাম্‌লেট্ মাক্‌বেথ্ এই দুই খানি নাটকের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিয়াছি। আমরা কি ভাবে ঐ দুই খানি নাটকের সমালোচনে প্রবৃত্ত, তাহার অনেকটা আভাস দিয়াছি। এখন আবার মাক্‌বেথ নাটকের ক্রমানুসরণ করা যাউক।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের আরম্ভেই মাক্‌বেথ কর্ত্তৃক ডঙ্কান হত্যায় পাপের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তি; আত্মীয় হত্যা, বন্ধু হত্যা, প্রভু হত্যা, রাজ হত্যা, গুণী হত্যা, সুপ্ত হত্যা, আশ্রিত হত্যা, অতিথি হত্যা—মাক্‌বেথ এই সকল পাতকের পাতকী।

মাক্‌বেথ রক্তাক্ত হস্তে পাপে প্রবৃত্তি-দাত্রী কর্ত্রীর সম্মুখে আসিয়া বলিল, 'আমি কার্য্য শেষ করিয়াছি, তুমি কিছু শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলে কি?'

মাক্‌বেথ গৃহিণী। আমি কেবল পেচকের চীৎকার ও পতঙ্গের ঝিল্লি রব শুনিয়াছি মাত্র।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, পিশাচী সুরা পান করিয়া পেচকের বিকট শব্দে আনন্দ করিতেছিল। আর কিছুই শুনে নাই; পেচক

ও পতঙ্গের বিকট রব শুনিয়াছে, তাহাতেই আনন্দ করিয়াছে। এখানের সেই মূল কথা—

'মন্দকে সুন্দর।'

রাত্রি কালে কাল পেঁচার চীৎকার কেহই ভাল বাসে না—পাপীয়সীর তাহাতেই আনন্দ।

রাজা ডঙ্কানের শয়ন গৃহে দুই জন রক্ষক শুইয়াছিল। মাক্‌বেথ গৃহিণী তাহাদিগকে অতিরিক্ত সুরা সেবন করাইয়া একেবারে অজ্ঞান করিয়াছিলেন। মাক্‌বেথ বলিতেছেন 'ডঙ্কানের হত্যার পর, তাহাদের একজন ঘুমাইতে ঘুমাইতে হাসিয়া উঠিল, আর একজন বলিয়া উঠিল, 'হত্যাকাণ্ড।' আমি দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। তাহারা একত্র ভগবানের স্তবোচ্চারণ করিল, একজন বলিল, 'ভগবান আমাদের রক্ষা কর,' আর একজন বলিল, 'কৃপা কর।' আমি মহা পাপী, ভগবানের কৃপার কাঙ্গাল, কিন্তু আমি ত বলিতে পারিলাম না, ভগবান আমায় কৃপা কর। কথাটা আমার গলায় আটকাইয়া রহিল।'

যে দুঃখে পড়িয়া পাপে মগ্ন হইয়া দুঃখভঞ্জন ভগবানকে ডাকিতে পারে না, তাহার দুঃখের সীমা নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি--মাক্‌বেথ মহাপাপী বলিয়া মহা দুঃখী।

মাক্‌বেথের মহা কষ্ট দেখিয়া গৃহিণী অনেক সান্ত্বনা করিলেন। বলিলেন 'ও সকল কথা অত করিয়া ভাবিতে নাই—যাও একটু জল দিয়া তোমার হাত দুটি ধুয়ে ফেল গে, ও বীভৎস রক্তগুলা আর রেখে কাজ কি?—তরবারি দুই খানি সঙ্গে আনিয়াছ কেন? যাও, ও দুখানা সেই নিদ্রিত রক্ষকদের নিকটেই রাখিয়া তাহাদের রক্ত মাখাইয়া এসো।' মাক্‌বেথ বলিলেন 'আমি আর যাব না। আমি যাহা করিয়াছি—তাহা ভাবিতেই পারিতেছি না, তা আবার দেখিতে পারিব কেন?' তখন মাক্‌বেথ গৃহিণী একটু ঘৃণার স্বরে, একটু স্পর্দ্ধার স্বরে বলিলেন—'তুমি বড় শিথিল-সংকল্পের লোক; দাও আমাকে তরবারি দুখানা দাও—ঘুমন্ত আর মৃত, তারা ত চিত্রের পুত্তলি; ছবির ভূতে ত, ছেলেরাই ভয় করে—আমি রক্ষকদের রক্ত মাখাইয়া আসিতেছি; এই হত্যাকাণ্ডে তাদের দোষী করা চাই।' এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই কাল নিশীথিনীর নীরবতা নষ্ট করিয়া বহির্দ্বারে গুম গুম্ করিয়া বুলে আঘাত হইতে লাগিল। সেই আঘাতের পর আঘাত মাক্‌বেথের বুকে

পড়িতে লাগিল। মাকবেথ মনে করিতে লাগিল, যেন সমস্ত বহির্জগৎ কেবল ধারাবাহিক আঘাতে পরিণত হইয়াছে; আর তাহার সমস্ত অন্তর্জগৎ সজাগ হইয়া তাহার বক্ষে আসিয়াছে; সেই বহির্জগতে আর সেই অন্তর্জগতে ধারাবাহিক ঘাতপ্রতিঘাত হইতেছে—গুম্ গুম্ গুম্—দুম্ দুম্ দুম্। প্রকৃতি যেন এতক্ষণে দণ্ড প্রণেত্রীভাবে তাহার পাপ হৃদয়ের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিয়াছেন; সেই মহতী প্রকৃতির সহিত পাপের কুণ্ঠিত কুঞ্চিত প্রকৃতির প্রথমে ধীরে ধীরে, ক্রমে জোরে জোরে—সম্মিলন হইতেছে গুম্ গুম্ গুম্—দুম্ দুম্ দুম্।

সহ-পাপিনী পাপ-সঙ্গিনী তাঁহার গৃহিণী তখন পাপ লুকাইতে গিয়াছেন; আমায় একা ফেলিয়া গেলে—আমার বুকে আঘাত লাগিতেছে, শুনিতেছ না? কাহার কাছে লুকাইবে? বুঝিতেছ না—আমাদের কথা সকলেই জানিতে পারিয়াছে; ঐ দেখ জগৎশুদ্ধ এক হইয়া ঘা মারিতেছে—গুম্ গুম্ গুম্—দুম্ দুম্ দুম্।

মাকবেথ মুখ ফুটিয়া ভাবিতেছেন,—

'কোথা হতে হতেছে আঘাত?
প্রতি শব্দে কেন মোরে করে ভয়াকুল!
কি বীভৎস হস্ত মোর! চক্ষে বিঁধে শূল:
বরুণের অম্বুরাশি পারিবে কি কভু
ধুইতে হস্তের রক্ত? না—এই হস্ত মম
সমগ্র সাগর বারি রঞ্জিবে কেবল,
নীল জল হবে রক্ত।

মাকবেথ গৃহিণী ফিরিয়া আসিবার সময় শেষের কথাগুলি শুনিতে পাইলেন। বলিলেন—'তোমার মতন আমার হাতও রক্তে ভিজিয়াছে—কিন্তু তোমার মত অমন ভিজে হৃদয় আমার নয়।' বাহিরে আবার আঘাত হইতে লাগিল—গুম্ গুম্ গুম্। যে আঘাতে মাকবেথকে স্তব্ধ আড়ষ্ট করিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার গৃহিণীকে চঞ্চল করিল। তিনি স্বামীকে বলিলেন,—'চল্, আমরা ঘরে যাই, হাত ধুইগে; আমাদের রাত্রিবাস পরিগে; হঠাৎ উঠিতে হইলে, লোকে যেন কিছু মনে করিতে না পারে—অত ভাবনায় আত্মবিস্মৃত হইও না।' মাকবেথ বলিলেন 'যে কার্য্য করিয়াছি তাহাতে আত্মবিস্মৃতিই—আমার পক্ষে পরম মঙ্গল।' তখনও আঘাত হইতেছে—মাকবেথ যাইতে

যাইতে বলিলেন, 'ঘা মারিয়া আর তোমরা ডঙ্কানকে জাগাইতে পারিবে কি ? তাত পারিবে না !'

দম্পতি নিষ্ক্রান্ত ; দ্বিতীয় দৃশ্য সমাপ্ত।

এই দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষ ভাগের স্থূল কথা—পাপে মাক্‌বেথের বিহ্বলতা ও মাক্‌বেথ গৃহিণীর পাপ লুকাইবার জন্য আয়োজন, ও সতর্কতা, এবং স্বামীকে সাহস ও সান্ত্বনা দান। পাপিষ্ঠা নারী, স্বামীকে পাপের পরামর্শ গ্রহণে বিরত দেখিয়া 'তবে বুঝি আমাকে ভাল বাসে না' মনে করিয়া যেমন ভালবাসার ধূয়া ধরিয়া পুরুষকে পাপের পথে লইয়া যায়,—মাক্‌বেথ গৃহিণীর মত, চোক মুখ ঘুরাইয়া ' এই তোমার ভালবাসা' বলিয়া পুরুষের মাথামুণ্ড ঘুরাইয়া দেয়,—সেইরূপ পাপ-পরামর্শ মত কার্য্য হইলে,'তবে ত আমায় বড়ই ভালবাসে' মনে করিয়া পাপ ভারাবনত পুরুষকে উত্তোলিত করিবার চেষ্টা করে। পুরুষের কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে, পাপের ভাবনা ভাবিতে দেয় না , পুরুষের কাছে পুরুষত্বের গৌরব করিয়া তাহাকে খাড়া রাখিবার চেষ্টা করে।

মাক্‌বেথ গৃহিণী পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি প্রদানের সময় বলিয়াছিলেন 'তুমি নয় পুরুষ ? তবে মনে যাহা হয়,কাজে তাহা করিতে পার না কেন ?' তখন মনই প্রধান। কিন্তু সান্ত্বনা দিবার সময় বলিতেছেন ' ছি ও সব কথা কি আর মনে করিতে আছে ?' এখন যেন মনে করাটাই মন্দ , মন কিছু নয়। তখনকার কথা—' তুমি নয় পুরুষ ? তবে এমন কাজ করিতেছ না কেন ?' এখনকার ভাষা ' তুমি পুরুষ, তবে অমন করিতেছ কেন ?' এই রূপে দেখা যায়, যে প্রবর্ত্তনা ও সান্ত্বনার উভয়ের ধূয়া পুরুষত্ব হইলেও রাগ রাগিণীতে কোমল তীব্র ভেদ হওয়ায়, সকাল সন্ধ্যার ভেদ হইয়াছে। আমরা স্থূল কথাগুলি বলিতেছি মাত্র, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেক্‌সপিয়রের দুই একটা কারচুপির কথা না বলিয়াও থাকা যায় না। এই সকল কারচুপির কাজ, চসমা চক্ষে দিয়া আধ ছায়ায়, আধ আলোকে, দেখিতে হয়, বুঝিতে হয়, আর আপনার মনে কারুকার্যের প্রশংসা করিতে হয়।

রাজা ডঙ্কান কেবল মাক্‌বেথের সম্মানবর্দ্ধনার্থ, তাঁহার গৃহিণীকে আপ্যায়িত করিবার জন্য, মাক্‌বেথের ভবনে উপযাচক হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি প্রত্যুষেই তাঁহার ওখান হইতে প্রস্থান করিবার কথা ছিল। মাক্‌ডফ্ ও লেনক্স নামে দুই জন ওমরাকে অতি প্রত্যুষেই আসিতে

বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারাই বহির্দ্বারে আঘাত করিতেছিলেন। প্রভুর আমোদ প্রমোদের জন্য বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া ভৃত্যকে ভোরে উঠিতে হইলে, সে মহা বিরক্ত হয়। মাক্‌বেথের দ্বাররক্ষকও এই গুম্‌গুম্‌নি শব্দে মহা বিরক্ত ভাবে শয্যা হইতে উঠিয়া ভাবিতে লাগিল, 'ছাই এমন রাত্রি-তেও একটু নিস্তার নাই, লোক আস্‌ছেই আস্‌ছেই—এ যে নরক হয়ে উঠ্‌লো—আমি ত দেখিতেছি নরকের দ্বারপাল।' বাস্তবিক মাক্‌বেথ-ভবন যে নরকের নরক হইয়াছে, তাহা দ্বিরক্ত দ্বাররক্ষক ঘুমের ঘোরে, মদের জোরে, না বলিলেও আমরা বুঝিতে পারিয়াছি।

মাকডফ্‌ ও লেনক্স ভবনে প্রবেশ করিল, একটু পরেই মাকবেথের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হইল; রাজা কখন উঠিবেন, কখন যাবেন—এই সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। মাকবেথ অতি অল্প কথায় কেবল উত্তর দিতে লাগিলেন। হৃদয়ে গুরুভার চাপিয়াছে—বেশী কথা কহিতে পারিবেন কেন?

মাক্‌ডফ্‌ রাজার শয়ন গৃহে অগ্রে প্রবেশ করিয়াছিল,—ছিন্নশিরা রাজ-দেহ দেখিয়া চীৎকারে বাড়ীর সকলকে জাগরিত করিল। লেডি মাক্‌বেথ যেন সেই চীৎকারেই আসিলেন, বাঙ্কো আসিলেন। রাজকুমারদ্বয় মাল্‌-কোম্‌ ও ডনাল্‌বেন্‌ আসিলেন। মাক্‌বেথ্‌ ও লেনক্স রাজার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন—মাক্‌বেথ্‌ বলিলেন, 'লোক দুটাকে কাটিয়া ফেলিয়া আমি ভাল করি নাই।' মাকডফ্‌ বলিলেন, 'কাটিলে কেন?' তখন, আবার দুই জনকে হত্যা করাতে মাক্‌বেথের পাপাগ্নি ইন্ধন পাইয়াছে—মাক্‌বেথ্‌ পাপে অভ্যস্ত হইয়াছে; মাক্‌বেথ প্রথম হত্যাকাণ্ডের পর আপনার গৃহিণীর সম্মুখেই পাপের ভারে ম্রিয়মাণ ছিল, যখন মাক্‌ডফ্‌ ও লেনক্স আসিল, তখন ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে নাই, এখন হত্যার পর হত্যা করিয়া লোকের সমক্ষে রাজরক্ষক-দ্বয়কে হত্যা করিয়া নরকের সাহস সঞ্চয় করিয়াছে। যখন মাক্‌ডফ্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন 'কাটিলে কেন?' তখন আবেগপূর্ণ ভাষায় প্রকৃত বাগ্মীর মত উত্তর করিলেন;—

Who can be wise amaz'd, temperate and furious,
Loyal and neutral in a moment? No man:

হঠাৎ বিস্মিত হলে, বিবেচনা শক্তি থাকে না, ক্রুদ্ধ হয়ে ধৈর্য্য রাখা

যায় না, রাজভক্ত হয়ে উদাসীন থাকিতে পারিলাম না—কেহই পারে না।

শুনিতে শুনিতে লেডি মাক্‌বেথ মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যে লেডি মাক্‌বেথ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি বক্ষস্থ শিশুকে ইচ্ছা করিলে আছাড় মারিয়া চূর্ণ করিতে পারেন, যে লেডি মাকবেথ স্বামীকে ধিক্কার দিয়া মহাপাপে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন, সেই পাষাণী পিশাচী স্বামী কর্ত্তৃক আবার হত্যার কথা শুনিয়া মূৰ্চ্ছিতা হইয়া পড়িল! স্ত্রীচরিত্রের বৈচিত্র বুঝিলে কি?

স্ত্রী প্রকৃতি স্বভাবতই জলের ন্যায় তরলা। শৈত্যাধিক্যে জল যেমন প্রস্তরবৎ কঠিন হয়, স্ত্রীলোকও কখন কখন তরল হৃদয়, সাহসে বাঁধিয়া, পাষাণবৎ করে। কিন্তু একটু আঁচ লাগিলেই বরফ যেমন গলিয়া যায়, স্ত্রীলোকের সাহসে বাঁধা বুকও তেমনই অল্পেতেই গলিয়া যায়।

রাজা রাত্রিতে অতিথি হইবেন, এই কথা শুনিয়া অবধি মাক্‌বেথ গৃহিণী আপনাকে কঠোর প্রকৃতি করিবার জন্য দুঃসাহসে বুক বাঁধিবার জন্য, দানবী শক্তির আরাধনা করিতেছিল *। মাক্‌বেথ ডঙ্কানকে হত্যা করিবে, কিন্তু সুরাপান করিয়াছিল, লেডি মাক্‌বেথ। পৈশাচিকী আরাধনায়, পৈশাচ পানীয় সেবনে তবে গৃহিনী দুঃসাহসিকতার সহায়তায় বুক বাঁধিয়া ছিল। যাই শুনিল, যে স্বামীকে সে কাপুরুষ বলিয়া কিছু পূর্ব্বে ধিক্কার দিয়াছিল, সে সচ্ছন্দে দুইজন নির্দ্দোষ রক্ষককে হঠাৎ হত্যা করিয়াছে—এত যে বুকের বাঁধনি, সমস্ত যেন এক আঘাতে খুলিয়া গেল, এত যে জমাট, সব যেন গলিয়া গেল। আমাকে ধর ধর বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

---

* Come you spirits!
That tend on mortal thoughts, unsex me here,
And fill me from the crown to the toe topfull
Of direst cruelty; make thick my blood;
Stop up the access and passage to remorse,
That no compunctious visiting of nature
Shake my fell purpose, nor keep peace between
The effect and it! come to my woman's breasts
And take my milk for gall, you murth'ring ministers,
Whenever in your sightless substances
You wait on nature's mischief!

এই হত্যাকাণ্ড বিষয়ে কিং কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য কিছু পরে সকলে একত্র হইবেন, স্থির হইল। রাজকুমারদ্বয়ের মনে কিন্তু মহা সন্দেহ হইয়াছে; তাহারা একজন ইংলণ্ডে, ও আর একজন আয়র্লণ্ডে পলায়ন করা স্থির করিয়া তাহাই করিলেন। এই খানেই তৃতীয় দৃশ্য শেষ।

চতুর্থ দৃশ্যে বিষ্কম্ভক, ইহাতে অন্তর্ব্বর্ত্তী ঘটনা সকলের আভাস পাওয়া যায়। মাক্‌ডফ্ এরূপ আভাস দিতেছেন, যে রাজকুমারদ্বয় যখন হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের উপর সন্দেহ হয়; তাঁহারাই হয়ত রক্ষকদিগকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে দিয়া এই কাজ করাইয়াছেন।

কুমারদ্বয় রাজ্য ছাড়িয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের পরই মাক্‌বেথ উত্তরাধিকারী। সুতরাং স্কটলাণ্ডের রাজ্য তাঁহাকেই অর্শিয়াছে, মাক্‌বেথ স্কটলাণ্ডের রাজা এবং শীঘ্রই স্কোন নগরে তাঁহার অভিষেক হইবে বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। রস নামে একজন সম্ভ্রান্ত লোক, সেই অভিষেক দেখিতে যাইতেছেন, রাজকুমারদ্বয়ের উপর সন্দেহের কথা, মাক্‌বেথ রাজা হইবার কথা,—শুনিয়া একজন অশীতিপর বৃদ্ধ বলিল;—

God's benison go with you, and with these
That would make good of bad, and friends of foes!

ভগবান্ তোমাদিগকে রক্ষা করুন, আর যাহারা মন্দকে ভাল মনে করে, শত্রুকে মিত্র মনে করে, তাহাদিগকেও তিনি রক্ষা করুন।

প্রবীণ বিচক্ষণ বৃদ্ধের কথায় নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হইল, আর নাটকের মূল ধুয়া মন্দকে সুন্দর ভাবা—আর একবার আমাদের মনে জাগরুক করিয়া দেওয়া হইল।

আমরা প্রথম অঙ্কের শেষে দেখিয়াছি, জ্বলন্ত বহ্নি মুখে পতঙ্গ পতনোন্মুখ হইয়াছে, দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সেই পতঙ্গ দগ্ধ হইতেছে, তাহার পক্ষপত্র সকল জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে, জ্বলন্ত শিখা লইয়া পতঙ্গ ফর্ ফর্ করিয়া উড়িতেছে—দহ্যমান, উড্ডীয়মান, ফর্‌ফরায়মান, দেদীপ্যমান, মহাপাপী মাক্‌বেথ—স্কটলাণ্ডের মহারাজা।

বৈশেষিক দর্শন।

(১) বৈশেষিক সূত্র—কণাদ মুনি প্রণীত,১০ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, প্রত্যেক অধ্যায়ে ২ টী করিয়া আহ্নিক।

(২) পদার্থ-ধর্ম্ম-সংগ্রহ।

(৩) উপস্কার—শঙ্করমিশ্র প্রণীত।

(৪) বিবৃতি জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন প্রণীত।

(৫) বৈশেষিক দর্শনং মহামহোপাধ্যায় শ্রী চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার কৃত ভাষ্য সমেতং।

সকলেই জানেন, সংস্কৃতে ন্যায় সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা ও বৈশেষিক এই ছয়টি দর্শনই প্রাচীন এবং প্রধান, এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ, জৈন, রামানুজ প্রভৃতি অনেকগুলি নব্য দর্শনও আছে। ইহার মধ্যে বৈশেষিক দর্শন মহর্ষি কণাদ প্রণীত। কণাদের আর একটি নাম উলুক। "বিরুদ্ধা-সিদ্ধ সন্দিগ্ধ মলিঙ্গং কাশ্যপোহব্রবীৎ" এই বচনে বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা 'কাশ্যপ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কণাদের অন্য পরিচয় নাই, বৈশেষিক দর্শনের সময় নিরূপণ করাও অসাধ্য।

এই জগতে অনন্ত পদার্থ, জড়, চেতন, উদ্ভিদ, অনন্তরূপ। এই অনন্ত পদার্থরাশিকে এক একটি করিয়া জানিতে হইলে অনন্তকালেও জানা যাইতে পারে না,মনুষ্য জীবনের অল্প কালের ত কথাই নাই। এদিকে উহাদের জ্ঞান না হইলেও মনুষ্যের পুরুষার্থ লাভ হয় না। এই নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ সেই অনন্ত পদার্থসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সংক্ষেপে শিক্ষাদিবার নিমিত্ত দর্শন-শাস্ত্রগুলির সৃষ্টি করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনে সমুদয় পদার্থগুলি এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়। এই ছয়টি মাত্র পদা-র্থের নাম করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ বলেন এই ছয়টি ভাবাভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে মাত্র, এতদ্‌বিরুদ্ধ অভাব নামক এক স্বতন্ত্র পদার্থ যে সূত্রকারের অভিপ্রেত, সে বিষয় কোন সংশয় নাই, কারণ তিনি নিজে অনেক সময় অনেক সূত্রে অভাবশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। অভাব পদার্থ যে বৈশেষিক দর্শন সম্মত সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবে তাহার নামো-ল্লেখ না করিবার কারণ এইরূপ বোধ হয়। সূত্রকার পদার্থ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গ্রন্থ রচনা করেন নাই, মনুষ্যকে মোক্ষপথের পথিক করিবার নিমিত্তই তাঁহার প্রবৃত্তি এবং সেই জন্যই প্রকৃত গ্রন্থারম্ভ করিলেন—

ধর্ম্ম বিশেষ প্রসূতাৎ দ্রব্যগুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্॥

ধর্ম্মবলে বা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বলে, উৎপন্ন যে তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, ও সমবায়—এই কয়টি পদার্থের সাধর্ম্ম্যের (অনুগত ধর্ম্মের) এবং বৈধর্ম্মের (বিরুদ্ধ ধর্ম্মের) যে জ্ঞান, তাহা হইলেই মোক্ষ পথের পথিক হওয়া যাইতে পারে। কোন ধর্ম্ম কোন পদার্থে আছে, কোন পদার্থেই বা নাই, ই া ঠিক ঠিক জানিতে পারিলেই মোক্ষ হয় ইহাই তাৎপর্য্য।

এরূপ স্থলে অভাবের উল্লেখ না থাকিবারই সম্ভাবনা। বিশেষ বৈধর্ম্ম্য কথাটি যখন অভাবসংশ্লিষ্ট, তখন অভাব পদার্থ যে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে এ কথাও আমরা বলি না।

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কিরূপে মুক্তিলাভ হয় তাহা বিবৃতি-কার জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন মহাশয় এইরূপে বলিয়াছেন। পুণ্য বিশেষ বলে দ্রব্যাদি পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের প্রকৃতস্বরূপ জ্ঞান হয়, তাহার পর আত্মমনন, আত্মমননের পর নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলে ক্রমে ক্রমে মিথ্যাজ্ঞানাদির নাশ হইয়া মোক্ষ লাভ হয়। বৈশে-ষিকদিগের মতে মোক্ষ শব্দের অর্থ দুঃখ নিবৃত্তি। পদার্থ ধর্ম্মসংগ্রহকার ঐ দ্রব্যাদি পদার্থের সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য কাহাকে বলে, এইরূপ প্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, জীবাত্মা, পরমাত্মা এবং মন এই নয়টি দ্রব্য। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন এই সপ্তদশটী গুণকে কণাদ স্পষ্ট করিয়া সূত্র দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট এবং শব্দ এই সাতটি গুণ ও তাহার অভিপ্রেত, সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশটী গুণ।

উৎক্ষেপণ (ঊর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ,) অবক্ষেপণ (নীচের দিকে নিক্ষেপ,) আকুঞ্চন (জড় করা,) প্রসারণ (বিস্তার করা) এবং গমন (যাওয়া) এই পাঁচ প্রকার কর্ম্ম, (ক্রিয়া)। ভ্রমণ, রেচন, স্পন্দন, ঊর্দ্ধজ্বলন, তির্য্যক গমন প্রভৃতি ক্রিয়াসকল গমনেরই অন্তর্গত সুতরাং পাঁচের অধিক কর্ম্ম (ক্রিয়া) নাই।

সামান্য দুই প্রকার, পর এবং অপর, তাহার মধ্যে দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম্ম এই

তিনেতে বর্ত্তমান সত্ত্বানামক সামান্য পর, অর্থাৎ অধিক পদার্থে বর্ত্তমান। এবং কেবল দ্রব্যত্বাদি অপর, অর্থাৎ অল্প পদার্থে বর্ত্তমান।

বিশেষ—এক প্রকার ধর্ম্ম। সমবায় এক প্রকার সম্বন্ধ।

পদার্থ ধর্ম্মসংগ্রহকার এইরূপে ষট্ পদার্থের ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ভেদ মাত্র জানিয়া পদার্থের স্বরূপ জ্ঞান হওয়া যায় না, এই নিমিত্ত আমরা প্রথমে দ্রব্যাদির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইলাম।

দ্রব্য।—মহর্ষি কণাদ দ্রব্যের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন,—

ক্রিয়া গুণবৎ সমবায়ি কারণং দ্রব্যম্। ১। ১। ১৫ ॥

যাহা ক্রিয়া ও গুণের আশ্রয় এবং সমবায়ি কারণ তাহার নাম দ্রব্য। সমবায়ি কারণ শব্দে উপাদান বা প্রকৃতি। দ্রব্য কি তাহা আমরা প্রকৃতরূপে জানিতে বা বলিতে পারি না, তবে তাহার কতকগুলি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারি মাত্র, সে লক্ষণগুলি এই—ক্রিয়াযুক্ততা, গুণযুক্ততা এবং সমবায়ি কারণতা।

গুণ। মহর্ষি কণাদ গুণের লক্ষণ বলিতেছেন,—

দ্রব্যাশ্রয্য গুণবান্ সংযোগবিভাগেষকারণমনপেক্ষ ইতি গুণ লক্ষণম্। ১। ১ ১৬ ॥

যাহা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, স্বয়ং 'গুণ'শূন্য, যাহা কখন কোন গুণের আশ্রয় হয় না, এবং যাহা সংযোগ বিভাগ বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া কাহারও কারণ হয় না অর্থাৎ যাহা কর্ম্ম নয়, তাহার নাম গুণ।

কর্ম্ম। মহর্ষি কণাদ কর্ম্মের লক্ষণ বলিতেছেন,—

এক দ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেস্বনপেক্ষকারণমিতিকর্ম্ম লক্ষণম্। ১। ১। ১৭ ॥

যাহা একমাত্র দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, যাহা কোনরূপ গুণের আশ্রয় নয় এবং যাহা সংযোগ বিভাগ বিষয়ে নিরপেক্ষ কারণ, তাহার নাম কর্ম্ম বা ক্রিয়া।

এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডলে অনন্ত পদার্থরাশি অনন্তরূপ হইলেও বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাদিগের মধ্যে তিনটীমাত্র মৌলিক ভেদ লক্ষিত হয়। (১) কতকগুলি,জগতের যাবৎ বস্তুর উপাদানস্বরূপ এবং ক্রিয়া ও

গুণের আশ্রয়। (২) ঐ সকল বস্তুর ধর্ম্ম, যেমন রূপ, পরিমাণ ইত্যাদি। (৩) ক্রিয়া গতি, বৃদ্ধি, উৎপত্তি, বেগ প্রভৃতি জগতে যা কিছু পদার্থ আছে, সমুদায় এই তিনেরই অন্তর্গত। উহাদের মধ্যে প্রথমটির নাই দ্রব্য, দ্বিতীয়টির নাম গুণ, তৃতীয়টির নাম কর্ম্ম *।

বিবৃতিকার জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় সামান্য বিশেষ ও সমবায়ের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন।

"নিত্যত্বে সত্যনেক সমবেতত্বং সমানত্বং।" সামান্য একটি ধর্ম্ম যাহা নিত্য, অবিনাশী, ভূত ভবিষৎ বর্ত্তমান এই তিন কালেই বিদ্যমান এবং একেবারে অনেকে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে। যেমন গোত্ব, অশ্বত্ব, মনুষ্যত্ব, প্রভৃতি জাতি। জাতি নিত্য, কোন কালেই উহার ধ্বংশ নাই, এবং যুগপত্ অনেকেতে অবস্থান করে। সমুদয় গোরুতেই গোত্ব আছে, সমুদয় অশ্বতেই অশ্বত্ব থাকে, এইরূপ মনুষত্ব সমুদয় মনুষ্যে বর্ত্তমান।

বৈশেষিকদিগের মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও তাহাদের অবান্তর ভেদেই এই জাতি অবস্থান করে। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্ম্মত্ব এবং পৃথিবীত্ব, জলত্ব, রূপত্ব এই সকল জাতি, জাতির আর জাতি নাই, কেন না জাতির জাতি তার জাতি এইরূপে অনবস্থা হয়, বরাবরই চলিতে থাকে, কোন ঠাঁই আর নাগাড় মরে না।

"জাতিমদ্ভিন্নত্বে সত্যেকমাত্র সমবেতত্বং বিশেষত্বম্।"

জাতিমদ্ভিন্ন হইয়া, অর্থাৎ দ্রব্য গুণ কর্ম্মে না হইয়া, একমাত্র সমবায় সম্বন্ধে যাহা অবস্থিত, তাহার নাম বিশেষ। এই বিশেষ পদার্থের জন্য বৈশেষিক দর্শন। এই বিশেষ ও একটী ধর্ম্ম—একজাতীয় পরমাণুকে অন্য জাতীয় পরমাণু হইতে ভেদ করিবার নিমিত্তই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

কারিকাবলীতে সমবায়ের স্বরূপ অতি সুন্দররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

---

* তর্কালঙ্কার মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে বাস্তবিক ধরিতে হইলে এই তিনটাই মূল পদার্থ, অবশিষ্ট সামান্যাদি তিনটীকে ইহাদের মধ্যে কোন না কোনটির অন্তর্গত করা যাইতে পারে, অতএব উহারা অতিরিক্ত পদার্থ নয়।

অর্থাৎ অবয়ব অবয়বীতে, (সমুদয়ে ও অংশে) যে সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধে দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়া অবস্থান করে, এবং দ্রব্য গুণ ক্রিয়াতে জাতি যে সম্বন্ধে থাকে,—সেই সম্বন্ধের নাম সমবায়। এই সমবায় সম্বন্ধ সকল স্থলেই একরূপ; ইহার আর ভেদ নাই *।

দ্রব্যের বিভাগ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে; উহাদের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারটি দ্রব্য নিত্য (অবিনাশী) এবং অনিত্য (বিনাশী) এই দুই প্রকারই হয়। ইহারা পরমাণুরূপে নিত্য এবং তদ্ভিন্নরূপে অনিত্য। ইহাদের শেষ সূক্ষ্ম অংশ, যাহা হইতে আর অংশ নির্গত হয় না, তাহার নাম পরমাণু। পরমাণুসকল নিত্য এবং রূপ বিশিষ্ট। অগ্নি সংযোগ দ্বারা পার্থিব পরমাণুর রূপান্তরও ঘটিয়া থাকে। অবশিষ্ট পাঁচটী দ্রব্য নিত্য, সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, তাহাদের ধ্বংশ নাই। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটী ভূত বলিয়া অভিহিত হয়; আর পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায় ও মনঃ এই পাঁচটী মূর্ত্ত (আকারবিশিষ্ট) বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনিত্য পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুকে কার্য্য দ্রব্য নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক কার্য্য দ্রব্য—শরীর ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার। তাহার মধ্যে শরীর আবার দুই প্রকার: কতকগুলি যোনিজ ও কতকগুলি অযোনিজ।

পৃথিবী—গন্ধের সমবায়িকারণ দ্রব্যকে পৃথিবী বলে। গন্ধ পৃথিবীরই গুণ; তবে জলাদিতে যে গন্ধের অনুভব হয়, তাহা কেবল উহাতে পার্থিবাংশ মিশ্রণ নিবন্ধন সংক্রান্ত হয় মাত্র। গন্ধ দুই প্রকার সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধ। গন্ধ ভিন্ন পৃথিবীতে রূপ, রস, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, (দূরত্ব) অপরত্ব (নিকটত্ব) গুরুত্ব, দ্রবত্ব, বেগ এবং স্থিতি এই সকল গুণও থাকে †।

---

* পদার্থধর্ম্মসংগ্রহকার বলেন—"অযুত সিদ্ধানা মাধার্য্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ" অর্থাৎ যে সকল বস্তু অমিশ্রণে সিদ্ধ অথচ পরস্পর আধার আধেয় ভাববিশিষ্ট, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের নাম সমবায়। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন ইহা আর কিছুই নয় পৃথক্ত্বের বিপরীত গুণ মাত্র। বিবেচনা করিলে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটিই গুণ বিশেষ সুতরাং তিনটীকে পৃথক্ পদার্থ না বলিয়া গুণশ্রেণীর অন্তর্গত করা যাইতে পারিত।

† সূত্রকার পৃথিবীর পরীক্ষা স্থলে কেবল রূপ, রস, গন্ধ, ও স্পর্শ এই

কষায়, মধুর, লবণ, কটু, তিক্ত, অম্ল এই ছয়টি রসই পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে অনুষ্ণ, অশীত এই দ্বিবিধ স্পর্শ অবস্থিত। পার্থিব শরীর চারি প্রকার,—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ। পার্থিব ইন্দ্রিয় ঘ্রাণ। আর বিষয়—দ্ব্যণুক হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত।

জল।—শুক্লরূপবিশিষ্ট দ্রব্যের নাম জল—জলের জলত্ব ধর্ম্ম জাতি। জলের শুক্লরূপই স্বাভাবিক, তবে কারণবশত অন্যপ্রকার রূপও ঘটিতে পারে; যেমন যমুনার জলের কাল রূপ। জলের মধুর রস স্বাভাবিক বিশেষ কারণাধীন ইহাতে অন্যপ্রকার রসও অনুভূত হয়। জলের নিজ স্পর্শ শীতল তবে অগ্নি প্রভৃতির সংযোগে অন্যরূপ স্পর্শও অনুভূত হয়, বটে তাহা কৃত্রিম মাত্র। স্বভাবতই জলের দ্রবত্ব গুণ। এতদ্ভিন্ন সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, স্নেহ এবং বেগ এ সকল গুণও জলে অবস্থান করে। জলীয় শরীর অযোনিজ বরুণ লোকে প্রসিদ্ধ; ইন্দ্রিয়;—রসনা, এবং বিষয় হিমকণা হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত।

তেজঃ—উষ্ণ স্পর্শ বিশিষ্ট দ্রব্যের নাম তেজঃ। চন্দ্রকিরণ তেজঃ পদার্থ বটে কিন্তু উহাতে জলের সংশ্লেষ হেতু উহার স্বাভাবিক উষ্ণ স্পর্শ অনুভূত হয় না। এইরূপ মরকত সুবর্ণ প্রভৃতি তৈজস পদার্থে মৃত্তিকার

চারটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। উপস্কার রচয়িতা শঙ্করমিশ্র বলেন পৃথিবীতে নীল, পীতাদি অনেক প্রকার রূপ আছে। বিবৃতিকার জয়নারায়ণ বলেন নীল, শুক্ল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ এবং চিত্র এই সাত প্রকার রূপই পৃথিবীতে থাকে। ভাষ্যকার তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন কৃষ্ণরূপই স্বাভাবিক। তাঁহার কথায় আগন্তুক কারণবশত পৃথিবীর অন্যপ্রকার রূপ হইলেও হইতে পারে এইরূপ বুঝাইতেছে বটে, কিন্তু কৃষ্ণরূপ যে স্বাভাবিক এই কথা প্রমাণ-সাপেক্ষ, সেই প্রমাণটুকু দর্শিত না হওয়ায় গোলযোগ বাধিয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন পৃথিবীর কৃষ্ণরূপই স্বাভাবিক। তাহার পরই বলিতেছেন গন্ধই পৃথিবীর নিজ গুণ, রূপাদি কারণ গুণক্রমে উৎপন্ন। সুতরাং কথাটা শুনিলেই মনে যেন একটা ধাঁধা লাগে। ফল তিনি ভাষ্য করিতেছেন বলিয়া সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করা উচিত হয় নাই। এ সকল কথা একটু খুলে না লিখিলে, আমাদের মত মূর্খ লোকে বুঝে কিরূপে?

সংমিশ্রণ নিবন্ধন, উহাতে স্পর্শের উষ্ণতা অনুভূত হয় না। উপরিউক্ত উষ্ণ স্পর্শ ভিন্ন তেজে রূপ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব এবং বেগ এই সকল গুণও লক্ষিত হয়। তেজের স্বাভাবিক রূপ ভাস্বর শুক্ল অর্থাৎ চক্চকে শাদা, তবে অগ্নিতে বা সুবর্ণাদি তৈজস পদার্থে, পার্থিব রূপের সম্মিশ্রণ থাকায় উহা লক্ষিত হয় না। তেজে যে দ্রবত্বের (চল চলে ভাবের) কথা বলা হইয়াছে, উহা নৈমিত্তিক, এবং সুবর্ণাদি তৈজস পদার্থ মাত্রে বর্ত্তমান হয়। কার্য্যরূপ তেজও—শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয় ভেদে তিন প্রকার, তৈজস অযোনিজ শরীর সূর্য্যালোকাদিতে প্রসিদ্ধ; তৈজস ইন্দ্রিয় চক্ষুঃ, এবং বিষয়—বহ্নি ও সুবর্ণাদি। অত্যন্ত অগ্নি সংযোগেও সুবর্ণাদির চল চলে ভাব একবারে শুকাইয়া যায় না দেখিয়া উহাদিগকে প্রাচীন পণ্ডিতগণ তৈজস পদার্থ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

বায়ু— বায়ু এক প্রকার দ্রব্য উহারও স্পর্শ গুণ স্বাভাবিক, কিন্তু সে স্পর্শ অনুষ্ণ বা অশীত নয়। উক্ত স্পর্শ ভিন্ন বায়ুতে সংখ্যা, পরিমিতি পৃথক্ত্ব সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব এবং বেগ এই আটটি গুণও থাকে। প্রাচীনেরা বলেন বায়ুতে উদ্ভূত রূপ না থাকায় উহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না বটে কিন্তু উদ্ভূত স্পর্শ থাকায় ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়। এবিষয়ে কণাদমুনি কি বলেন দেখা যাউক—

মহর্ষি কণাদ প্রথমে প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ নির্দ্দেশ করিলেন—

মহত্যনেকদ্রব্যবত্ত্বাৎ রূপাচ্চোপলব্ধিঃ। ৪। ১। ৫।

এই সূত্রের প্রাচীন সম্মত অর্থ—

উপলব্ধি শব্দের অর্থ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ; এই প্রত্যক্ষ মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট বস্তুরই হইয়া থাকে, পরমাণুর মহত্ত্ব না থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না? যদি বল বায়ু প্রভৃতির ত মহৎ পরিমাণ আছে, তাহার কেন প্রত্যক্ষ হয় না? ইহার উত্তর এই যে, সূত্রে এই জন্যই রূপাৎ এই কথা বলিয়াছেন; রূপাৎ শব্দের অর্থ রূপ থাকা চাই। কেবল মহৎপরিমাণ থাকিলেই যে বস্তুর উপলব্ধি হইবে, তাহা নয়, উহাতে রূপ থাকা আবশ্যক। অতএব বায়ু প্রভৃতির পরিমাণের মহত্ত্ব থাকিলেও, রূপ না থাকায় প্রত্যক্ষ হয় না।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল যে স্পর্শ এবং রূপ—দ্রব্যে একরূপই সম্বন্ধে থাকে, এক্ষণে দেখ বায়ুতে যখন স্পর্শ আছে, তখন রূপ থাকিবার যোগ্য

সম্বন্ধ ও আছে; একটা নিয়ম আছে যেখানে সম্বন্ধ আছে সেইখানে সম্বন্ধীও আছে; অতএব বায়ুতে রূপ থাকা হেতু বায়ুর উপলব্ধি হওয়া উচিত। ইহার উত্তরে মহর্ষি কণাদ বক্ষ্যমাণ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

সত্যপি দ্রব্যত্বে মহত্ত্বে রূপ সংস্কারা ভাবাদ্বায়ো রনুপলব্ধিঃ॥ ৪। ১। ৭।

বায়ু মহৎপরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্য হইলেও উহাতে রূপ সংস্কার না থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না। এই সূত্রের তাৎপর্য্য কেবল সংস্কার পদের অর্থের উপর নির্ভর করিতেছে। শঙ্কর মিশ্র বলেন—"সংস্কার পদেন রূপ সমবায়ো রূপোদ্ভবো রূপানভিভবশ্চ বিবক্ষিতঃ।" সংস্কার শব্দের অর্থ রূপ নিরূপিত সমবায় বা রূপের উৎপত্তি, অথবা অন্য রূপ দ্বারা অনাবরণ। এই কথা বলিয়া তিনি আবার বলিতেছেন যে, যদ্যপি বায়ুতে যে স্পর্শ সমবায় তাহা রূপ সমবায়ের সহিত এক হইলেও উহাতে রূপ নিরূপিতত্ব নাই, কারণ বায়ুতে রূপের অত্যন্তাভাবই দেখা যায়, এইরূপ চক্ষুর রশ্মিতে রূপের উদ্ভব নাই এবং মধ্যাহ্নকালীন উল্কাপাতে অন্য রূপের অনাবরণ নাই বলিয়া উহাদের প্রত্যক্ষ হয় না। তাহলে শঙ্কর মিশ্রের মতে রূপ সংস্কারের অর্থ তিন প্রকার দেখা গেল; উহাদের মধ্যে যে কোন একটির অভাব থাকিলে আর প্রত্যক্ষ হয় না।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন বলেন "রূপসংস্কারঃ সংস্কৃতং রূপং উদ্ভূতানাভিভূতরূপমিতি যাবৎ। তদভাবাৎ তাদৃশ রূপত্বাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বাভাবাৎ।" রূপ সংস্কার বলিতে সংস্কৃত রূপ অর্থাৎ কোন প্রত্যক্ষ যোগ্য অথচ, অনভিভূত রূপ; তার অভাব হেতুক অর্থাৎ তাদৃশ রূপের অধিকরণ না হওয়ায় বায়ুর রূপের উপলব্ধি হয় না, যদি বল যেখানে সম্বন্ধ থাকে সম্বন্ধীও সেই স্থলে থাকে,—এই নিয়মে বায়ুতে রূপ কেন না থাকে? এই আশঙ্কা করিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলেন যে এ কথা বলিতে পার না; বায়ুতে রূপ নাই ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ; এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ রূপের অভাবই ঐ নিয়মের বিরোধী। যেখানে এরূপ কোন বাধক নাই বরঞ্চ কোনরূপ সাধক থাকে, সেইখানেই —যেখানে সম্বন্ধ সেইখানে সম্বন্ধী—এই নিয়মের প্রবৃত্তি জানিবে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় পরসূত্রের সহিত স্বমতের মিল রাখিবার জন্য ৪।১।৫ *

---

* দ্রব্যের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল আমরা কতকগুলি গুণের প্রত্যক্ষ করিয়া সেই সকলের আশ্রয় দ্রব্যের জ্ঞান লাভ করি;—এই

সূত্রস্থিত রূপ শব্দের অর্থ—রূপ-সংস্কার করিয়াছেন। তাহার পর ৪।১।৬ সূত্রের অর্থ করিলেন বায়ুতে রূপ আছে বটে কিন্তু সে রূপের সংস্কার না থাকায় তাহার উপলব্ধি হয় না। তাঁহার এই সংস্কার কথাটিই মহা গোল বাধাইয়াছে; কারণ সংস্কার জিনিসটা যে কি,তাহা তিনি স্বয়ং কিছুই ভাঙ্গিয়া দেন নাই; কাযেই রূপের সংস্কার স্বতঃসিদ্ধ অথবা নিমিত্তাধীন এবং কিরূপ সংস্কার হইলেই বা প্রত্যক্ষ হয়, এই সকল ভাল করিয়া বুঝান নাই।

বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু তাই বলে বায়ুতে যে রূপ নাই ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ খোলা হাঁড়ীর উত্তাপ, গ্রীষ্মের উষ্ম, চক্ষুর আলোক,—ইহাদের রূপ আছে, অথচ উহাদের প্রত্যক্ষ হয় না। তবে বায়ুর রূপ নাই শুধু এই কথা মাত্রে যদি বায়ুর রূপ না থাকে, তা হলে আর কথা নাই। যদি বল পুরাণাদিতে আকাশ হইতে বায়ু এবং বায়ু হইতে তেজ এইরূপ সৃষ্টি ক্রম কথিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে বায়ুর উপাদান আকাশ তাহাতে রূপ না থাকায় বায়ুতে রূপ হইবে কোথা হইতে? ইহার উত্তরে আমরা বলিব তেজে যে রূপ আছে ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য, কিন্তু তেজের উপাদান বায়ু বায়ুতে রূপ না থাকিলে তেজে রূপ আসিবে কোথা হইতে? অতএব যদি উপাদান অনুসারে বস্তুর গুণ নির্দ্দেশ করিতে হয় তবে বায়ু যে একেবারে রূপ শূন্য এ কথা বলা যাইতে পারে না।

শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়ভেদে ঐ বায়ু আবার তিন প্রকার; বায়বীয় শরীর অযোনিজ পিশাচাদির দেহ, ইন্দ্রিয়—সর্ব্ব শরীর ব্যাপি ত্বক্, এবং বিষয় প্রাণ অপানাদি হইতে মহা প্রলয়কারী ঝড় অবধি।

আকাশ—শব্দের সমবায়ি কারণ অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে শব্দের আশ্রয়ের নাম আকাশ। যদি বল আকাশনামক একটী স্বতন্ত্র দ্রব্য স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? বায়ুকেইত সমবায় সম্বন্ধে শব্দের আশ্রয় বলিলে হয়, ইহার উত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন,এ কথা বলিতে পার না; কারণ বায়ুর

আধুনিক মতের খণ্ডন করিতে তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রয়াস করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে যদি কেবল গুণ মাত্রের প্রত্যক্ষ হইত, তাহলে আমাদের জল ও স্থলের মধ্যে প্রভেদ জ্ঞান হইত না, স্থলে জলের কার্য্য এবং জলে স্থলের কার্য্য করিতে হয়ত আমরা প্রবৃত্ত হইতাম।

বিশেষ গুণ স্পর্শ--যাবদ্দ্রব্য স্থায়ী (যতক্ষণ আশ্রয় দ্রব্য বর্ত্তমান হয়, ততক্ষণ অবস্থান করে); শব্দ সেরূপ নয়, অল্পক্ষণেই নাশ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং উহাকে বায়ুর বিশেষ গুণ বলিতে পার না; এই নিমিত্ত শব্দের আশ্রয় বলিয়া আকাশ নামক একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য স্বীকার করিতে হইবে *। আকাশে ছয়টি গুণ থাকে; শব্দ এবং সংখ্যাদি পাঁচ। আকাশ এক হইলেও কর্ণকুহর প্রভৃতি উপাধিভেদে নানা প্রকার। আকাশের ইন্দ্রিয়—কর্ণ।

কাল বা সময়—বড়, ছোট ইত্যাদি বুদ্ধির হেতু, ইহা নিত্য এবং এক অর্থাৎ স্বজাতীয় রহিত। কাল এক হইলেও ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, প্রহর আদি উপাধি ভেদে নানা রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কাল কালিক সম্বন্ধে সমুদয় জগতের আশ্রয়, এবং সমুদয় জন্য বস্তুর প্রতি নিমিত্ত কারণ। "কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং সকালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" ইত্যাদি পুরাণ বাক্যই কালের সত্তা বিষয়ে প্রমাণ।

দিক্—দূর এবং নিকট ইত্যাদি ব্যবহারের হেতুই দিক্; কালের মত

---

* আকাশ একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য ইহা স্বীকার করাইবার নিমিত্ত বিবৃতিকার নিম্নলিখিত অনুমান পরম্পরা দেখাইয়াছেন। (১) শব্দ একটি বিশেষ গুণ (কোন এক বিশেষ দ্রব্যাশ্রিত গুণ) কারণ ইহা চক্ষুর গ্রাহ্য নয় অথচ বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য, যাহা চক্ষুর গ্রাহ্য না হইয়া বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় তাহা-কেই বিশেষ গুণ বলে যেমন স্পর্শ; তাহার পর (২) শব্দ যখন গুণ, তখন উহা সমবায় সম্বন্ধে কোন দ্রব্যে অবশ্যই বর্ত্তমান হইবে, কারণ গুণ মাত্রেই দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিবে। এক্ষণে শব্দ কোন্ দ্রব্যের বিশেষ গুণ? ইহা ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ুর বিশেষ গুণ হইতে পারে না; কারণ ইহা অপাকজ (অগ্নি সংযোগাদি জন্য পরিণাম জাত নয়) অকারণ-গুণ-পূর্ব্বক (কারণ=উপাদান তাহার গুণের অনুযায়ী নয়) এবং প্রত্যক্ষ; ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ুর বিশেষ গুণ ইহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহারা পাকজ, উপাদান গুণানুসারী। তাহার পর শব্দ যখন বিশেষ গুণ তখন উহা দিক্, কাল, বা মনের গুণ হইতে পারে না; কারণ দিক্, কাল ও মনে কোন বিশেষ গুণ থাকে না, এবং ইহা যখন বহিরিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ তখন আত্মার বিশেষ গুণ হইতে পারে না; কাজেই শব্দের আশ্রয় একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সেই স্বতন্ত্র দ্রব্যের নামই আকাশ।

দিক্ নিত্য ও এক। দিক্ এক হইলেও পূর্ব্ব পশ্চিম ইত্যাদি উপাধি ভেদে নানারূপে প্রতীত হয়; যাহার যে দিকে সূর্য্য উদিত হয় সেই তাহার পূর্ব্বদিক, এবং যেদিকে সূর্য্যের অস্ত হয়, উহা পশ্চিম দিক্; পূর্ব্বাভিমুখ দাঁড়াইলে বাম হাতের দিকের নাম উত্তর এবং দক্ষিণ হাতের দিকের নাম দক্ষিণ। বোধ হয় দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণদিকের নামের মধ্যে পরস্পর এইরূপ কোন কার্য্যকারণতা থাকিবে। দিকে সংখ্যা আদি পাঁচটি গুণ অবস্থান করে। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন কাল, দিক্ এবং আকাশ এই তিনটি একই পদার্থ কেবল কার্য্যভেদে ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। এ একটা নূতন কথা বটে একটু স্পষ্ট করে বুঝাইলে ভাল হইত।

আত্মা—আত্মা দুই প্রকার জীবাত্মা এবং পরমাত্মা; এই উভয়বিধ আত্মাই চৈতন্যের আশ্রয়। ইহার মধ্যে জীবাত্মাকে সংসারী বলিয়া অভিহিত করে। ছেদনাদির সাধক কুঠারাদি যেমন কর্ত্তা ভিন্ন কোন কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ জ্ঞানের সাধক চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও কর্ত্তা ভিন্ন কিরূপে ফল নিষ্পাদনে সক্ষম হইবে? এই নিমিত্ত দেহের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মা নামক একটি অতিরিক্ত পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেহ কেহ বলিয়াছিল দেহাতিরিক্ত আত্মার কল্পনা করিবার আবশ্যক নাই; এই দেহই চৈতন্যের আশ্রয় এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে নিজ ব্যাপারে প্রেরণ করিয়া থাকে। বৈশেষিকেরা বলেন তাহা হইতে পারে না; যদি দেহই আত্মা হইত, তাহলে বাল্যকালে অনুভূত বস্তুর বৃদ্ধাবস্থায় স্মরণ হইত না; কারণ বাল্যকালের দেহ এবং বৃদ্ধকালের দেহ দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, কেননা পরিমাণ ভেদে যে দ্রব্যসকল ভিন্ন হয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে দেখ বাল্যকালের দেহ এবং বৃদ্ধকালের দেহ যদি ভিন্ন হইল তবে একের অনুভূত পদার্থ অপরে কিরূপে স্মরণ করিবে? রামের অনুভূত বস্তুর কি গোপাল স্মরণ করিতে পারে? যদি বল বাল্যকালের দেহ এবং বৃদ্ধকালের দেহ ভিন্ন হইলেও উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে; বাল্যকালের দেহকে বৃদ্ধকালের দেহের কারণ বলা যাইতে পারে, অতএব কারণের অনুভূত বস্তু কার্য্য স্মরণ করুক না কেন? ইহাও যুক্তিসিদ্ধ নয়, তাহলে মায়ের অনুভূত পূর্ব্ব বস্তু পুত্রে স্মরণ করিতে সক্ষম হইত। আরও দেখ শরীরের চৈতন্য হইলে, সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপানে এবং অর্দ্ধ প্রসূত বানর শিশুর সন্নিহিত শাখা অবলম্বনে প্রবৃত্তি হইত না, কারণ তৎকালে ঐ সকল

কার্য্য যে আপনার হিতকর এরূপ বুদ্ধি হওয়াই অসম্ভব ; কিন্তু আমাদের যত্ত পূর্ব্বজন্মে অনুভূত ইষ্টসাধনতার তখনই স্মরণ হওয় য়,তাহারা ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যদি বল পূর্ব্বজন্মানুভূতের স্মরণ হওয়া য'দ সম্ভব হয়, তবে পূর্ব্বজন্মেত্ত আরও কত বস্তুর অনুভব হয়, তাহাদের স্মরণ হয না কেন ? ইহার উত্তর এই যে সেরূপ স্মরণ হওয়ার প্রতি কোনরূপ উদ্বোধক কারণ উপস্থিত হয় না।

পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করায় বৈশেষিকদিগের মতে সংসার যে অনাদি তাহা এক প্রকার সিদ্ধ হইল এবং সংসারের অনাদিত্ব সিদ্ধির সঙ্গে আত্মাও যে অনাদি তাহাও সিদ্ধ হইল এব' সেই অনাদি ভাবের নাশ না হওয়ায় আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল , যদি বল দেহ ও আত্মা ভিন্ন হউক, মন এবং আত্মা কেন এক হউক না ? মন হইতে স্বতন্ত্র আত্মা মানিবার আবশ্যকতা কি ? ইহার উত্তরে বৈশেষিকাচার্য্যগণ বলেন,—মন, অতি সূক্ষ্ম পদার্থ ; উহার জ্ঞানাদি স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষই অসম্ভব হইয়া পড়ে; কারণ প্রত্যক্ষে আশ্রয়ের (যাহার প্রত্যক্ষ হয় তাহার) মহত্ত্বই কারণ ; মন সূক্ষ্ম হওয়ায় কোনরূপ প্রত্যক্ষের আশ্রয় হইতে পারে না *। এই সকল কারণে দেহ ও মন

---

* চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়, শরীর ও মনের চৈতন্যাভাবের প্রতি নিম্নলিখিত যুক্তি কয়টি দেখাইয়াছেন,—শরীরে চৈতন্য নাই, কারণ শরীরের কারণ পরমাণুতে চৈতন্য থাকার কোন প্রমাণ নাই। আরও দেখ পার্থিব বস্তুর গুণ সকল উপাদান কারণের গুণ অনুসারেই উৎপন্ন হয়, কোন কোন শরীরে জ্ঞান থাকিতে দেখা যায়, কোন কোন শরীরে জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাবই দেখা যায় ; অতএব শরীরের চৈতন্য স্বীকার করিতে হইলে এরূপ বৈষম্যের প্রতি একটা বিশেষ হেতুর নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আরও দেখ শরীরের গুণ রূপাদি প্রতি শরীরেই ভিন্ন প্রকার দেখা যায়, এবং শরীরের উপলব্ধির সহিতই তাহাদের উপলব্ধি হয় কিন্তু শরীরের সহিত জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না। ইন্দ্রিয়দিগের চৈতন্য নিরাকরণের পক্ষে এই যুক্তি জানিবা। মনও আত্মার সহিত অভিন্ন হইতে পারে না, কারণ মন আত্মার সুখাদি অনুভবের করণ মাত্র, যাহা করণ, তাহা কখন কর্ত্তা হইতে পারে না। যেমন রূপাদি জ্ঞান সাধনের সহিত বর্ত্তমান এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার সাধন, সেইরূপ সুখাদি অনুভবেরও একটা সাধন আবশ্যক করে ; মনই তাহাদের সাধন।

হইতে ভিন্নরূপ একটি স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই কল্পনীয়। জীবাত্মা অনেক এবং প্রতি দেহে ভিন্নস্বরূপ; পরমাত্মা একই; তিনিও আবার জীব-সকল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ *। উভয় আত্মাই পরম মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপক; কিন্তু বুদ্ধি আদি ছয় সংখ্যা আদি পাঁচ, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম ভাবনা নামক সংস্কার—এই চতুর্দ্দশটি গুণ আত্মাতে বর্ত্তমান, ঈশ্বরে কেবল আটটি গুণ অবস্থান করে সংখ্যাদি পাঁচটি, বুদ্ধি, ইচ্ছা, এবং যত্ন। ঈশ্বরস্থিত বুদ্ধি, ইচ্ছা এবং যত্ন নিত্য এবং সর্ব্ব বিষয় ব্যাপী। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতি অনুমান এবং আগম উভয়বিধ প্রমাণই স্বীকৃত হইয়াছে। অনুমানের আকার—ক্ষিতি অঙ্কুর প্রভৃতি জগৎসৃষ্টি যখন কার্য্য, তখন তাহাদের অবশ্য একজন না একজন কর্ত্তা আছেন, কারণ কার্য্য মাত্রেরই কর্ত্তা থাকে; জগৎ সৃষ্টি কার্য্যের কর্ত্তা একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই হইতে পারে না। আগম "দাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ"।

মনঃ—সুখাদি জ্ঞানের সাধন। মনের অস্তিত্ব বিষয়ে বৈশেষিকেরা এইরূপ অনুমান করেন যে, আমাদের সকল প্রকার জন্য জ্ঞানেরই এক একটা করণ আছে; সুখাদির জ্ঞানও জন্য জ্ঞান, অতএব উহারও একটা না একটা করণ অবশ্য অঙ্গীকার্য্য; সেই করণকেই মন বলে। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের যোগই বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ; কিন্তু মন পরমাণুতুল্য অতি সূক্ষ্ম; এককালে একের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইতে পারে না, এই জন্য এককালে একমাত্র ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানই হয়, কখন দুই ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান এককালে হয় না। মনের অবয়ব বা অংশ নাই এবং প্রতি শরীরে একএকটি স্বতন্ত্র মন অবস্থান করে।

---

* চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার বলেন—উপাধি ভেদেই আত্মার ভেদ লক্ষিত হয়; বস্তুগত্যা আত্মা একই। যদি বল আত্মা যদি একই, তবে ঐ একই আত্মার সুখ দুঃখাদি ভিন্নরূপ ভোগ সম্বলিত নানাবিধ দেহে অবস্থান কিরূপে সম্ভবপর? ইহার উত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন, ইহা বড় আশ্চর্য্য নয়; কারণ একই প্রদেশে কাল-ভেদে, এবং একই কালে দেশ ভেদে, নানারূপ দেহ ধারণ করা—আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়।

উচ্ছ্বাস।

অশান্ত অবোধ মন ! ঘোর অন্ধকারে বসি,
কত কাল র'বি আর নিঝুম হইয়া ?
বুকের ভিতরে তোর, অন্ধকার স্তূপীভূত,
হইতেছে,—একবার দেখ নিরখিয়া।
পাপের সংসার সদা, টলমল করে পাপে,
প্রাণ ভরি পাপ তুই কেন নিস বুকে ?
আপনার মর্ম্ম স্থলে, আপনি বিন্ধিয়া ছুরী,
সহিষ্ণুর পরিচয় কেন দিস মুখে ?
হৃদয়েতে বল নাই, দুবলী হয়েছ বড়
শান্তিহারা এখন(ই) যে হবি তুই মন।
নিরাশা বুকেতে বসি দেখাইছে ভয় তোরে,
নিরাশার ভয়ে তোর অশ্রু বরিষণ।
কেঁদে কেঁদে কগ্ন মন বিকারে বিহ্বল হবে
যে টুকু চেতনা আছে, হবে বিচেতন।
তাই বলি এই বেলা স্থির ভাবে বসি ও রে
চৈতন্য মধুর মূর্ত্তি কর রে স্মরণ।
"নীরদ বিজলীমাখা আধা রাধা আধা শ্যাম
মাধুর্য্য রসের খনি উজ্জ্বল বদন।"
মন তুই কর বিলোকন।
হৃদয়েতে শক্তি হ'বে অন্ধকার পলাইবে,
হরি হরি বলি মন ডাক রে উল্লাসে।
বিদারিবে স্বর্গজ্যোতিঃ অন্ধকার পূর্ণ মনে ;
পূর্ণ হবে চিত্ত আহা পারিজাত বাসে।

জগাই মাধাই আয় দুই ভাই,
কণ্ঠে কণ্ঠে বাঁধি হরি গুণ গাই,

প্রেমোন্মত্ত হ'য়ে নাচিয়া নাচিয়া,
নামের গরিমা গাহিয়া গাহিয়া,
প্রেমের মহিমা প্রচার করিয়া,
মাতোয়ারা করি প্রাণ।

ছুটে আয় হেথা জগাই মাধাই,
করতালি দিয়া হরি গুণ গাই,
তোদের সরস কণ্ঠ গীতি হায়!
করিলে শ্রবণ আবার ধরায়,
জগত মাতাতে আসিবে নিমাই,
এই বেলা আয় সবে মিলে গাই—
পাতকী মোচন গান;

বাজাইয়া খোল, বল হরি বোল,
নিমাই আসিয়া দিবে সবে কোল;
কে আছিস আয় উচ্চ কণ্ঠে গাই,
হরি গুণ গান দিবা নিশি ভাই!
দুনয়ন দিয়া প্রেমের নির্ঝর,
ঝর ঝর করি ব'বে নিরন্তর,
হৃদয় আঁধার পলায়ে যাবে,
নব বল মন আপনি পাবে,
মলয় পবন প্রাণেতে ব'বে॥

ধর ধর ধর তান
গাও তবে মন গান।
দুঃখেরই আগার,
তাপিত সংসার,
বারেক ভুলিয়া যা,
মুখে হরি গুণ গা,
মনে হরি গুণ গা,
মনে প্রাণে আহা এক করিয়া
বল তোরা ঐ বা॥

প্রিয় মন রে আমার!
র'বি কত কাল পাপে ডুবে আর?
কিসের সংসার? কাহার সংসার?
পাপের সংসার, পাপের আধার।
থাকিস্ আবদ্ধ কেন?
কেন রে উন্মাদ হেন?
নিজের মঙ্গল ক'রের মনটি, কর কর বিলোকন।
আপন বলিয়ে, যাহার নিকট
কৃতদাস হ'তে চাও,
(তা'রা) কখনই তোর আপন হবে না
চিরদিন তোর নিকটে র'বে না
তবে —— তা'দের কেন রে চাও?
চিরদিন যেই আপন আপন,
তাহার নিকটে বিকাইতে মন
মন রে আমার ধাও।
প্রাণ ভরি সেই দয়াময় নাম
মন রে আমার গাও।

ঘুমায়ে ঘুমায়ে মায়ার স্বপন
দেখিয়ে আর কি ফল?
নীদ পরিহরি মন রে আমার
মুখে হরি নাম বল।
প্রাণের আঁধার দূরে পলাইবে,
হৃদয়ের পাপ টুটিয়া যাইবে,
রাধা শ্যাম নাম কর উচ্চারণ
ওরে রে অবোধ মন!
ঐ দুটি নাম ভকতি নিঝরে,
স্থাপন করিলে হৃদয়ের পরে,
দুটি মিলি এক হ'বে।
মনে যদি ভক্তি থাকে তবে রে হৃদয় দিয়া
ভক্তিকালিন্দীর বেগে ছুটিবে এখন,
মনকদম্বেরই মূলে রাধা শ্যাম কুতূহলে
ধীরে ধীরে করিবে নর্ত্তন।
কখন বা ক্লান্ত হ'য়ে ভক্তি যমুনার জলে
রাধা শ্যাম দুই জনে দিবে গো সাঁতার।
মনের বাসনা গুলি গোপিকার বেশ ধরি,
সদাই হরষে মাতি করিবে বিহার।

ধাবমান কাদম্বিনী মনকুঞ্জ বিতানেতে
বিষাদে বিথারি আহা পড়িবে যখন,
শ্যামের সোহাগ পেয়ে মানমেঘ প্রেমে মিশি
মনোহর ইন্দ্র ধনু করিবে সৃজন।
মনের বিজন বনে নিশীথ মুরলী ধ্বনি
'মঞ্জমান' বলি আহা উঠিবে বাজিয়া,
ভকতির যমুনা গো অমনি উজান বহি
শুনিতে বেণুর গান আসিবে ছুটিয়া।
ত্যজি জগতের আশা,
ত্যজি সিন্ধু ভাল বাসা,
প্রফুল্ল তরঙ্গ গুলি বুকেতে ধরিয়া।
লালসা বাসনা নীরবে থেক না
কেশবের নাম গাও।
কিছুরই অভাব রবে না রবে না
কেশবের গুণ গাও।
মায়ার শিকল ভেঙ্গে চুরে ফেলি,
বারেক অবোধ মন।
ত্রিভঙ্গ মুরতি ধ্যান কর তুই
করিয়া কঠোর পণ,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে মায়ার স্বপন
দেখিয়া কি আর ফল?
নীদ পরিহরি মন রে আমার
সদা হরিনাম বল।

কঙ্গ্রেস।

আমরা নিয়ত যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেই সকল কার্য্যে, আমরা ভাল করিতেছি, কি মন্দ করিতেছি তাহাই অনেক সময় বুঝিতে পারি না। আমরা অনেকেই সিদ্ধ তণ্ডুল ধ্বংশ করি, না করিলে চলে না; কিন্তু সেই কাজটাই যে আমাদের ঠিক কাজ হইতেছে, তাহা আমরা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না, বুঝান ত দূরে আস্তাং। অনেক সময় অনেকের মনে এমন ধারণা হয়, যে আমরা যদি তণ্ডুল ধ্বংশ না করিয়া গোধূম চূর্ণ বা যব চূর্ণ প্রত্যহ ধ্বংশ করি, তাহা হইলে, আমাদের ভাল হয়।

আমাদের নিজের নিত্যকার্য্যের ভাল মন্দ বিচারে যখন এইরূপ খটকা হয়, তখন এক ব্যক্তির বা ব্যক্তিসমূহের অনুষ্ঠিত কোন একটি নূতন কার্য্যে

যে অন্যান্য ব্যক্তির নানারূপ খট্‌কা হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কঙ্গ্রেসের মত একটি গুরুতর নতন ব্যাপারে, যে শত্রু মিত্র উভয় পক্ষ হইতেই নানারূপ খট্‌কা উঠিতেছে—তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই।

রাজা প্রজা মধ্যে অস্ত্রের সংঘর্ষণ অতি ভয়াবহ ব্যাপার হইলেও, পৃথিবীর কুত্রাপি ওটি নূতন জিনিস নহে। 'বলং বলং বাহুবলং' 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' 'জোর যার, মুলুক তার,' এ সকল কথা সকল দেশের রাজা প্রজা সকল সময়েই জানেন। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাহুবলের, বা অস্ত্রবলের কোন প্রয়োগ না করিয়া রাজা প্রজা মধ্যে দাবি দাওয়ার নিয়ত সংঘর্ষণ—অতি নূতন বাও, বড় বিচিত্র ব্যাপার।

আজি পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ য়ুরোপীয় রাজনীতি ক্রমে ক্রমে এই ছাঁচে গঠিত হইতেছে, রাজনীতি বলিয়া একটা জিনিষ সকল দেশেই ছিল ও আছে, এই পঞ্চাশ বৎসর য়ুরোপে রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি প্রজানীতি বলিয়া একটা জিনিশ খাড়া হইয়া উঠিতেছে।

য়ুরোপীয় রাজনীতিকে ক্রমে বিশুদ্ধ হইতে বিশুদ্ধতর করিবার প্রধান যন্ত্র এই প্রজানীতি, প্রধান মসলাও এই প্রজানীতি। আজি কালি আয়র্লাণ্ড সম্বন্ধে ইংলণ্ডের প্রবলা রাজনীতি আয়র্লণ্ডের প্রজানৈতিক যন্ত্রে, আর প্রজানৈতিক মসলায়, ক্রমাগত পরিবর্তন হইতেছে, ভরসা করা যায় আয়র্লাণ্ড সম্বন্ধে ইংলণ্ডের রাজনীতি অচিরাৎ বিশুদ্ধতরা হইবে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের রাজনীতি, কিয়ৎপরিমাণে, অজ্ঞতা-মলে, আর কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার জঞ্জালে,—বিষম দূষিত। এই মল জঞ্জাল দূরীকরণের জন্য, ভারতবর্ষে প্রজানীতি সংগঠন ও সংস্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। য়ুরোপীয় রাজনীতি সংশোধনের এমন কার্য্যকর যন্ত্র, এরূপ কার্য্যকরী মশলা,—আর নাই।

লর্ড লীটন হঠাৎ অস্ত্র আইন, ও সংবাদপত্রের আইন দেশ মধ্যে প্রচলিত করাতে, প্রজার মধ্যে যাহারা য়ুরোপীয় রাজনীতির যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়াছিল, তাহারা বাঝল, রাজার কাছে ভারতীয় প্রজা একেবারে নগণ্য নহে। লর্ড রীপণের সময় ইলবর্ট বিলের ঘোরতর আন্দোলনের অবসরে, আবার বুঝদার প্রজারা বুঝিল, যে ইংরাজ জাতি, সহজে ভারতবর্ষের প্রজাবৃন্দকে আপনাদের সঙ্গে সমান স্বত্ব বা অধিকার প্রদান করিবেন, এমন আশা করাই ভুল, রাজনীতির সহিত প্রজানীতির রীতিমত নিয়ত সংঘর্ষণ আবশ্যক। সেই জন্য সুচারুরূপে প্রজানীতির সংগঠন ও সংস্থাপন আবশ্যক।

লর্ড রীপণের বিদায় কালে, ভারতীয় সমগ্র প্রজা কৃতজ্ঞতা ভরে এক হৃদয়ে অভ্যুত্থান করিল; রীপণের শত্রুপক্ষ অনুদার ইংরাজদল চমকিয়া গেল। সমজদার লোকে সেই চমকে বুঝিতে পারিল,—প্রজার বল বুঝিতে পারিল; য়ুরোপীয় প্রথায়, ভারতে প্রজানীতি সংগঠন করা সম্ভব, ক্রমে এই ধারণা হইল।

লর্ড ডফরীণের আমলে, সেই প্রজানীতি সংগঠনের চেষ্টা হইতেছে। তাহারই নাম কঙ্গ্রেস। ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতে প্রচলিত এই প্রবলা প্রথরা রাজনীতির পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারে এমন একটি প্রজানীতি গঠিত করা বড় সহজ কথা নহে। সেরূপ প্রজানীতি সংস্থাপন করিবার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ হইয়াছে কি না, উপযুক্ত প্রকরণ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে কি না,—এ সকল কথার মীমাংসা করা ক্ষণে অসম্ভব, এই মাত্র বলিতে পারা যায়, যে য়ুরোপীয় রাজনীতির সহচারিণী রূপা প্রজানীতি সংগঠনের চেষ্টা এই কঙ্গ্রেসে হইতেছে।

ধীর স্থিরভাবে,—নির্ভয়, ধাত সহিষ্ণু, শক্ত সমর্থ, রক্ত অস্থিময়-প্রজানীতি ভারতে সংগঠিত করিতে পারিলে, ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ইংরাজের রাজনীতির সংশোধন হইবার সম্ভাবনা—তাহাতে আমাদের মঙ্গল আছে। বুঝিতে পারিলে, তাহাতে ইংরেজেরও মঙ্গল আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাহুবলের বা অস্ত্র বলের কোন প্রয়োগ না করিয়া রাজা প্রজা মধ্যে দাবি দাওয়ার সংঘর্ষণ দ্বারা ক্রমে প্রজার স্বত্ব সংস্থাপন এবং অধিকার বর্দ্ধন—প্রজানীতির কার্য্য। এরূপ প্রজানীতি ভারতে একবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইলে, অস্ত্র বলে বিপ্লবের সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে। ইংলণ্ডের পক্ষে সেটি বড় অল্প লাভের কথা নহে? ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যদি সুগঠিত প্রজানীতি থাকিত, তাহা হইলে, সেই প্রজানীতির সাহায্যে সিপাহীরা আপনাদের আবেদন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট জ্ঞাপন করিতে পারিত, প্রজানীতিতে রাজনীতিতে রীতিমত সংঘর্ষণ চলিত, বন্দুকে কামানে হয়ত সমর বাধাইতে হইত না।

কোন দেশে প্রবলা প্রজানীতি থাকিলেই যে সে দেশে রাজা প্রজায় অস্ত্র বিপ্লব হয় না, বা হইতে নাই, এমন কথা আমরা বলিতেছি না, তবে রক্তাস্থিময়, সতেজ, সবল, প্রজানীতি থাকিলে, রাজনীতি তাহাকে আদরে সঙ্গিনী করিয়া লন, তাহাতেই অস্ত্রবল পরীক্ষার অবসর কমিয়া আসে।

যে দিক্ দিয়াই দেখা যাব, ভারতে প্রজানীতির সংগঠন করা যে আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কঙ্গ্রেস্ সেই কার্য্যে ব্রতী। সুতরাং কঙ্গ্রেস্ অতি গুরুতর ব্যাপার।

প্রথমেই বলিয়াছি, আমাদের নিজের নিত্য কার্য্যের 'ভাল' 'মন্দ' সম্বন্ধে নিজের মনেই অনেক সময় খট্‌কা উঠে, সুতরাং এমন একটা প্রকাণ্ড কাণ্ডে দুই জন, দশ জন, শত জন, বা সহস্র জন খট্‌কা তুলিলে, তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। বরং যত খটকা উঠে ততই ভাল, যদি খাটি সোণা মলা মাটিতে মিশিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা যত পোড়াইবে, ততই নিখাদ হইবে, উজ্জল হইবে, ঘা মারিলে বাড়িবে,—ফাটিবে না, চটিবে না।

যাহাতে, প্রজানীতির পরিচর্য্যায় যাপিত জীবন দাদা ভাই নওরোজি, য়ুরোপীয় রাজনীতির মর্ম্মজ্ঞ, বিজ্ঞ বিচক্ষণ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

প্রভৃতি ভারতীয় ধুবন্ধরগণ যোগ দান করিয়াছেন, উদার রাজপুরুষ গণের প্রতিনিধি আলেন হিউম প্রভৃতি যে কঙ্গ্রেসের পরিচালনে নিয়ত ব্যাপৃত, সেই কঙ্গ্রেসকে যে বালকের ছেলে খেলা মনে করে, সেই বালকের ছেলেখেলা হইলে, সর লিপেল গ্রিফিনের মত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা, বিলাতের টাইমসের মত বজ্রঘোষ সংবাদ পত্র সকল,—উহার উপর ভ্রূকুটি করিবে কেন?

কিন্তু কঙ্গ্রেস বালচাপল্য না হইলেও, নানা কারণে বয়স্কের বিড়ম্বনা হইতে পারে, কিয়ৎ পরিমাণে হইতেছে।

প্রজার যেটি মর্ম্ম কথা, সেইটি লইয়া প্রজানীতি গঠন করা আবশ্যক, সেইটি লইয়াই প্রজানীতি গঠিত হইতে পারে। অন্য উপায় অসম্ভব। ভারতীয় প্রজার মর্ম্ম কথা—তাহাদের দারিদ্র দুঃখ। ইংরাজ শাসনে এই দারিদ্র দুঃখ দিন দিন বাড়িতেছে। দাক্ষিণাত্যে দানব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, উত্তর পশ্চিম ক্রমেই অধিকার করিয়াছে, অপর্য্য উর্ব্বর ভূ বঙ্গে ক্রমে ক্রমে বিস্তার বৃদ্ধি করিতেছে। এই সর্ব্বব্যাপী মর্ম্মঘাতী দারিদ্র দুঃখকে জ্ঞান করিয়া সুর বাঁধিতে পারিলে, তবে প্রজানীতির সুর লাগিবে; রাজনীতি যতই কেন কঠোর হউক না, প্রজানীতির মর্ম্মের কাঁদনি সুর, তাহাকে কাণ পাতিয়া শুনিতে হইবে, ক্রমে সেই মর্ম্ম দুঃখ রাজনীতিকে দূর করিতে হইবে।

ইংলণ্ডের প্রজা চাহিয়াছিল,—স্বাধীন ব্যক্তির অধিকার, আমেরিকার প্রজা চাহিয়াছিল, স্বাধীন জীবনের অধিকার; আয়র্লণ্ড চাহিতেছে, স্বাধীন শাসনের অধিকার, আমরাও এই সকলের দেখা দেখি, বলিতেছি আমাদিগকে তোমাদের সঙ্গে সমান অধিকার দাও। সিবিল বিচারের অধিকার দাও, কৌন্সিলে বসিবার অধিকার দাও, যুদ্ধ করিবার অধিকার দাও—কিন্তু এ সকল পরের সুরে সুর লাগান মাত্র, নিজের কাঁদুনীর রাগিণী নহে।

নিজের প্রাণের কথায় জ্ঞান লাগাইয়া, রাগিণী ধরিতে না, পারিলে সুর লাগিবেই না। কৌন্সিলে প্রতিনিধি প্রণালীতে দেশীয় সদস্য গৃহীত হৌক, জেলার শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তা পৃথক্ পৃথক ব্যক্তি হউন, উচ্চ উচ্চ পদে দেশের যোগ্য ব্যক্তিদের গ্রহণ করা হৌক, রণকৌশল শিক্ষার্থীদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হৌক—ইত্যাদি প্রার্থনা প্রজানীতি গঠন ব্যাপারে অবাস্তব কথা, ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারতের উপর নিত্য, নৈমিত্তিক, অনিয়মিত, নিয়ত ধারা বাহিক শোষণ ক্রমে ক্রমে কমান হৌক ইহাই আমাদের মূল প্রার্থনা। এই মূল কথা, স্বল্পাক্ষরী, সারবতী, সন্দেহশূন্য ভাষায় কাতর কোটি কণ্ঠে নিয়ত নিবেদন করিতে হইবে। ইংরাজ বণিকদের অস্বাভাবিক বাণিজ্য শোষণে এবং ইংরাজ রাজের স্বার্থপর সরকারি শোষণে দিন দিন ভারতের কিরূপ দারিদ্র বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা দেশের প্রদেশের, জেলার পরগণার, গ্রাম নগরের তালিকা দিয়া তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতে

হইবে। দুর্ভিক্ষ কমিশন এই দারিদ্রের কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন; হণ্টর প্রভৃতি বিচক্ষণ উচ্চ কর্ম্মচারীরা, দাদাভাই প্রভৃতি প্রকৃত দেশভক্তগণ সংখ্যা পরিমাণাদি দেখাইয়া উহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এই দারুণ দারিদ্র প্রত্যহ প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। তথাপি রাজপুরুষ নামে বিরাট কঠোর পুরুষের হৃদয়ে এ কথা এখনও লাগে নাই। কোটি কাতর কণ্ঠে নিয়ত সপ্তস্বরা ভৈরবী রাগিণীতে গান্ধারের তান লাগাইলে তবে সে হৃদয় গলিবে।

কঙ্গ্রেসের গায়কেরা এখনও গলা সাধিতেছেন, যন্ত্র বাঁধিতেছেন, সুর মিলাইতেছেন, প্রকৃত গাওনার সময় এখনও হয় নাই—সুতরাং সমালোচনা চলে না। আমরা জানি, কঙ্গ্রেসের প্রবীণ গায়কের মধ্যে দুই চারি জন প্রজার প্রাণের কথা লইয়া সুর বাঁধিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা যে হইতেছে না সেটি কেবল আসরের তামাসগীরদের বিড়ম্বনায়। সর্ব্বত্রই তামাসগীর লোকে সং দেখিতে ভাল বাসেন, সুর বুঝিতে পারেন না। কাজেই আসরের দোষে, অনেক স্থলেই সুর লাগে না, গান জমে না। কঙ্গ্রেসেও তাহাই হইতেছে। প্রথম প্রথম সর্ব্বত্রেই তাহা হয়, কিন্তু গায়কদের প্রাণের ভিতর সুর থাকিলে, আর হৃদয়ে অধ্যবসায় থাকিলে, শেষে গান জমিতেই হইবে।

বিগত কঙ্গ্রেসের প্রকৃতি প্রবৃত্তি ও প্রবর্ত্তন পদ্ধতি সম্বন্ধে এবং তামাসগীর 'প্রতিনিধিগণের আচরণ সম্বন্ধে, কঙ্গ্রেসে উপস্থিত আমাদের একজন বন্ধু আমাদিগকে যে দুইখান পত্র লিখিয়াছেন, তাহার একখানির কিয়দংশ এই প্রবন্ধের উপসংহাররূপে এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"বলা বাহুল্য কঙ্গ্রেসে আমি দেখিতে গিয়াছিলাম, দেখাইতে যাই নাই। দেখাইবার শক্তি আমার নাই—সুতরাং বাধ্য হইয়াই আমাকে ঐ সংকল্প অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এবং দেখিতে গিয়াছিলাম বলিয়া কেবল দেখিতেই ছিলাম। সেই জন্য বক্তাদের বক্তৃতার উপর যত না কাণ না দিয়াছিলাম, শ্রোতাদের মুখের ভাব ভঙ্গির উপর তাহার অধিক দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। হিউম সাহেবের মুখের দিকে তিন দিন ক্রমাগতই আমার দৃষ্টি ছিল। এখানে থাকিতে শুনিয়াছিলাম তিনি নাকি একজন দেবতা, সাক্ষাতে যাহা দেখিলাম, তাহাতে তাহার উপর আমার ভালবাসার লাঘব হয় নাই কিন্তু ভক্তির উদয় হয় নাই। তিনি ভারতবন্ধু সন্দেহ নাই কিন্তু তিনি নিস্বার্থ ভারতবন্ধু নহেন। তিনি স্বজাতির স্বার্থান্বেষী স্বদেশহিতৈষী ভারতবন্ধু। ইহাও সামান্য প্রশংসার কথা নহে। অস্ত্র আইনের রিজোলিউসন লইয়া গোলযোগ বাঁধিবার সময়, হিউম সাহেবের প্রথম চিন্তাকুল ভ্রূভঙ্গি, পরে ব্যাকুল ভাব, ক্রমে অস্থির এবং অধৈর্য্য ভাব, অবশেষে তাঁহার দৌড়াদৌড়ি পর্য্যন্ত দেখিয়া এবং অস্ত্র আইন উঠাইবার প্রস্তাবে তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া এবং আর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া, আমার বিশ্বাস হইয়াছে হিউম সাহেব নিস্বার্থভাবে কেবল ভারতেরই হিত ইচ্ছা করেন না, স্বজাতির স্বার্থের দিকেও তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। সঙ্ক-

ষত ভারতের নব অঙ্কুরিত জীবনের সঙ্গে আর তাঁহার স্বজাতির স্বার্থের সঙ্গে একটি গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দিবার জন্যই তিনি এত যত্ন করিতেছেন। আমার নিকট বোধ হইল ‘কঙ্গ্রেসই’ এই গ্রন্থি বন্ধনের চেষ্টা। ইহাতে ভারতের উপকার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আপনাকে আমার মনের কথা বলিতে কি, এই আশার সঙ্গে সঙ্গে আমার একটু আশঙ্কাও হইতেছে। এই নূতন ধরণের গ্রন্থিতে উভয় জাতির স্বার্থ এক রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে বিলাতে ভারতে “হরিহর” আত্মা হইয়া উঠিবে? কি কোন গভীর জল সঞ্চারী চতুর রাজনৈতিকের কৌশলে আমাদের নব অঙ্কুরিত জীবনী শক্তিটি ভারতের নরম মৃত্তিকা হইতে এই গ্রন্থির টানে উৎপাটিত হইয়া উঠিয়া পড়িবে, কিছুই এখন বুঝিতে পারিতেছি না। প্রথমটি হইলেই ভাল এবং ভরসা করি হইবেও তাহাই। কিন্তু অন্ধীয় কুটুম্বের মনে ভাল অপেক্ষা মন্দের কথাই সর্ব্বদা জাগিয়া উঠে। কঙ্গ্রেসে সামাজিক কথার আলোচনার চেষ্টা যে হইয়াছে এবং আগামী বৎসরেও আরও যে পরিষ্কাররূপে হইবে, সেটা আর কিছু নহে, নদীর একদিকের স্রোত খাল কাটিয়া আর এক দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা মাত্র। “তোমরা কৃষিকার্য্য কর আমরা অন্ন ভোজন করি এবং তোমরা সমাজ লইয়া থাক আমরা সমাজের মল দেশের শাসনকার্য্য লইয়া খেলা করি।” এই মত মধ্যে দীক্ষিত অনেক গুলি রাজনৈতিক পণ্ডিত আছেন। এই শ্রেণীর দুই একটি লোক যে কঙ্গ্রেসে এবার ছিলেন আমার এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল। হিন্দুবিবাহ আইনের কিছু পরিবর্ত্তনের জন্য কঙ্গ্রেস হইতে গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করা হউক না কেন, এমন কথাও ঘরওয়া ভাবে দুই একজনে উপস্থিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কয়েকজন প্রধান প্রধান ব্যক্তির অমত হওয়াতেই এবার এ শ্রেণীর কোন কথা কঙ্গ্রেসে উঠে নাই। কিন্তু আগামী বারে সামাজিক কথা কঙ্গ্রেসে তুলিবার জন্য আবার চেষ্টা হইবে, কঙ্গ্রেসের পরিচালকগণ। কত দিন এরূপ চেষ্টা নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিবেন, বলা যায় না। কঙ্গ্রেসের নায়কদের মধ্যেও কাহারও কাহারও এই চেষ্টা আছে ইহাই আরো অধিক চিন্তার কারণ, কঙ্গ্রেসের একজন নায়ক আমাকে পরিষ্কাররূপেই বলিলেন “আর কিছু না হউক সমুদ্রে জাহাজে এতগুলি বাঙ্গালি আসিল, এটিও কম লাভ নহে।”

কঙ্গ্রেসের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্ব পত্রে যে আমার আশঙ্কার কথা লিখিয়াছিলাম, তাহার কারণ এবার পরিষ্কার করিয়াই বলিতেছি। প্রথমত যিনি কঙ্গ্রেসের ধাত্রী স্বরূপ সেই মহাত্মার যে দিকে লক্ষ্য, নদীর স্রোত তাহার অনুকূলে কি না জানি না। নানা পদার্থে গঠিত সাতশত সভ্যের নৌকার ঠিক উপযুক্ত মাঝি তিনি কি না, তাহাও বলা যায় না। তাহার পর—সুরেন্দ্র বাবু, নরেন্দ্রবাবু, মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই শ্রেণীর কঙ্গ্রেসের আর আর পরিচালকগণের এখনই যখন এক এক জনের এক এক দিকে মতি গতি, তাহার উপর, ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ক্ষমতা পরিচালনের ইচ্ছায়

কতকগুলি লোক এখনই যেরূপ ঘোর উন্মত্ত দেখিলাম, তাহার উপর কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর যেমন প্রকরণ পদ্ধতি দেখিলাম, তাহাতে কঙ্গ্রেস পার্লিয়ামেন্ট রূপে পরিণত হউক না হউক, বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টের সভাদের কাঁদবাসিতে কঙ্গ্রেস শীঘ্রই বোধ হয় পরিণত হইবে। এবার একজন মান্দ্রাজি ভদ্রলোক ইনকম টেক্সের রিজোলিউসানের সময় কিছু বলিবার জন্য প্ল্যাটফরমে উঠিয়াছিলেন। দুরদৃষ্ট বশত তিনি খঞ্জ। প্ল্যাটফরমে উঠিবার সময় যখন তিনি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে লাগিলেন, তখন চারিদিক হইতে অনেক "ডেলিগেট" হাততালি দিয়া উঠিলেন। থিয়েটর ঘরে অভিনেতাদের কোন ত্রুটি হইলে, আট আনা টিকিটের গ্যালারির দিক হইতে যেমন হাত-তালি এবং হো হো শব্দ উঠিতে থাকে কঙ্গ্রেসে সেইরূপ অতি অভদ্রোচিত কুৎসিত দৃশ্য দেখিয়া আমি যে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়াছি, তাহা দেখিতে পারি না। দেশের প্রতিনিধি হইয়া যাঁহারা ভারতের অদৃষ্টচক্র ফিরাইবার জন্য একস্থানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের এরূপ বাল চপলতা দেখিয়া আর বলিব কি বলুন? ফল কথা কঙ্গ্রেসে তামাসা দেখিতেই অধিকাংশ লোক গিয়াছিলেন। যাঁহারা ক্ষমতাবান, তাঁহারা আপনাদের ক্ষমতা দেখাইতে গিয়াছিলেন, কেহ কেহ এই সুবিধায় নিজের সংবাদপত্রের গ্রাহক বৃদ্ধির চেষ্টাতেও ছিলেন। প্রকৃত দেশহিতৈষী এবং ভাল লোকও ছিলেন। কিন্তু প্রায়ই পশার শূন্য মক্কেল হীন অল্পবয়স্ক উকীল এবং সংবাদপত্রের সংস্রবিত লোক এবং দুই চারি দশজন আমার মতন শিক্ষায় বঞ্চিত অথচ "জানো প্রাপ্ত" তরুণ বয়স্ক জমীদার সন্তান এবং কতকগুলি অপরিণামদর্শী স্বদেশহিতৈষী একত্র হইয়া—বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণকে কথা বলিতে অবকাশ না দিয়া এবং তাঁহাদের ভাল কথা উড়াইয়া দিয়া, তাল বেতালে সকল সময়ে সমান হাততালি দিয়া, কোন ক্রমে কঙ্গ্রেস ব্যাপার এবার সমাধান করিয়াছেন। কঙ্গ্রেস দ্বারা উপকার পাইতে ইচ্ছা করিলে এবং ইহাকে স্থায়ী করিতে ইচ্ছা করিলে

ন্যায় কতকগুলি লোককে ইহার মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্তই আবশ্যক। কার্য্যের লোকের পরিবর্ত্তে কেবল বক্তৃতার লোক লইয়া কঙ্গ্রেস গড়িতে চেষ্টা করিলে, সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে।

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। | ফাল্গুন ১২৯৪। | ৮ম সংখ্যা।

বৈশেষিক দর্শন।

১।

গুণ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ এবং বেগ এই দশটি কেবল মূর্ত্ত পদার্থের অর্থাৎ আকার বিশিষ্টেরই গুণ; বুদ্ধি আদি ছয়টি গুণ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা এবং শব্দ—এই দশটি কেবল অমূর্ত্ত পদার্থের অর্থাৎ নিরাকারের গুণ; সংখ্যা আদি পাঁচটি গুণ, মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত এই উভয়েতেই বিদ্যমান হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, বুদ্ধি আদি ছয়টি গুণ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা এবং শব্দ ইহারা বিশেষ গুণ অর্থাৎ কোন এক বিশেষ বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সংখ্যা আদি সাতটি গুণ, নৈমিত্তিক দ্রবত্ব, গুরুত্ব, এবং বেগ ইহারা সামান্য গুণ অর্থাৎ কোন এক নির্দ্দিষ্ট বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে না। সংখ্যা আদি সাতটি গুণ, দ্রবত্ব, স্নেহ, এবং বেগ ইহারা দুইটি ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয় হইতে পারে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দ ইহারা কেবল এক একটি বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। সংযোগ, বিভাগ এবং বেগ ইহারা ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাদিগকে কর্ম্মজ গুণ বলে।

রূপ—একটি গুণ, কেবল দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। জগদীশ তর্কালঙ্কার বলেন শুক্ল, নীল, রক্ত, পীত, হরিত, কপিশ, চিত্র—এই সাত প্রকার মাত্র রূপ আছে। বিশ্বনাথ বলেন রূপ অনেক প্রকার। রূপ সচরাচর

বর্ণ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। পৃথিবী, জল, তেজঃ এই তিনটি মাত্র দ্রব্যেই রূপ থাকে; পৃথিবীতে সকল প্রকার রূপই থাকে, জলে শুক্ল, এবং তেজে ভাস্বর শুক্ল। রূপ সকল আবার দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, প্রথম উদ্ভূত, দ্বিতীয় অনুদ্ভূত। শাস্ত্রকারেরা উদ্ভূত এবং অনুদ্ভূতের কোন বিশেষ লক্ষণ করেন নাই, কেবল স্বরূপ মাত্র দেখাইয়াছেন। তাহারা বলেন ভাজা খোলার আগুণ, গ্রীষ্মের উষ্মা এবং চক্ষুঃ অর্থাৎ দৃষ্টির তেজ প্রভৃতির রূপ অনুদ্ভূত, এবং ঘট, পট প্রভৃতির রূপ উদ্ভূত।

রস—ইহা রসনা অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা অনুভূত হয়। রস—কষায়, মধুর, লবণ, কটু, তিক্ত, এবং অম্ল এই ছয় প্রকার। রস পৃথিবী ও জল এই দুইটি মাত্র দ্রব্যেরই গুণ। জলে এক মাত্র মধুর রস অবস্থান করে, হরিতকী প্রভৃতি দ্রব্য ভক্ষণে জিহ্বার দোষ কাটাইয়া জল পান করিলে ইহা ঠিক অনুভূত করা যায়। রসও উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত এই দুই প্রকার, তাহার মধ্যে অনুদ্ভূত রস অতীন্দ্রিয়।

গন্ধ—ইহা ঘ্রাণেন্দ্রিয় অর্থাৎ নাসিকা দ্বারা অনুভূত হয়। গন্ধ দুই প্রকার সুরভি এবং অসুরভি ইহা কেবল পৃথিবীরই গুণ। পাষাণাদির গন্ধ অনুৎকট বলিয়া অতীন্দ্রিয়, অনুভূত হয় না। গন্ধ অনিত্য।

স্পর্শ—ইহা ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। স্পর্শ তিন প্রকার—শীত, উষ্ণ, এবং অনুষ্ণ অশীত। ইহা পৃথিবী জল, তেজ, এবং বায়ু, এই চারি দ্রব্যেই অবস্থান করে। তন্মধ্যে শীত স্পর্শ জলে, উষ্ণ স্পর্শ তেজে এবং অনুষ্ণ অশীত-স্পর্শ পৃথিবী এবং বায়ু এই উভয়েই বর্ত্তমান। এই স্পর্শ আবার দুই প্রকার—পাকজ এবং অপাকজ; তাহার মধ্যে পৃথিবীতে পাকজ এবং বায়ুতে অপাকজ অর্থাৎ একরূপ বিজাতীয় স্পর্শ অবস্থান করে *। পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ুর

---

* পাক দুই প্রকার পীলুপাক এবং পিঠরপাক। বৈশেষিকেরা পীলুপাক বাদী এবং নৈয়ায়িকেরা পিঠর পাকবাদী। পীলুপাকবাদীদিগের মতে কোন একটা বস্তু, মনে কর মাটির ঘড়া, বা ইট (যাহার পাক আবশ্যক) প্রস্তুত করিয়া অগ্নি সংযোগ করিলে, আগুনের উত্তাপে ঐ বস্তুটি প্রথমে একেবারে শিথিল হয়, কাজেই উহার পরমাণু গুলি পৃথক পৃথক হইয়া পক্ক হয়, সেই ধারাবাহী আগুণের উত্তাপেই আবার ঐ পক্ক পরমাণু গুলি একে একে সংযুক্ত হইয়া যথাক্রমে দ্ব্যণুকাদিরূপে পরিণত হওত পুনর্ব্বার যেরূপ

পরমাণুতে যে স্পর্শ থাকে তাহা নিত্য ; তদ্ভিন্ন সমুদয় স্পর্শই অনিত্য। পৃথিবীতে কঠিন এবং কোমল এই উভয়বিধ স্পর্শই অনুভূত হয়।

সংখ্যা—ইহা গণনা ব্যবহারের প্রতি হেতু। যে নয় প্রকার দ্রব্য উক্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলেই সংখ্যা থাকে। সমুদয় সংখ্যার মধ্যে একত্ব কেবল দুই প্রকার—নিত্য এবং অনিত্য, নিত্য বস্তুগত একত্ব নিত্য এবং অনিত্য বস্তুগত একত্ব অনিত্য। দ্বিত্ব হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সমুদয় সংখ্যা, অপেক্ষা বুদ্ধি জন্য। সুতরাং অপেক্ষা বুদ্ধির নাশের সহিত ইহাদেরও নাশ হয়। অপেক্ষা বুদ্ধি বলিতে এই এক, এই এক, করিয়া একেবারে যে অনেক একত্বের জ্ঞান। এই অপেক্ষা বুদ্ধি ক্ষণত্রয় মাত্র অবস্থান করে। *

পরিমাণ—মান ব্যবহারের প্রতি হেতু। ইহাও সমুদয় দ্রব্যে বর্ত্তমান এবং নিত্য অনিত্য দুই প্রকার, নিত্য দ্রব্যবৃত্তি পরিমাণ নিত্য, অনিত্য

বস্তু ছিল, সেইরূপ আকারের একটি পক্ক বস্তু প্রস্তুত হয়। বহ্নির বেগবশত পরমাণুদিগের ঐরূপ বিশ্লেষ এবং পুনঃ সংযোগ এত শীঘ্র সম্পাদিত হয়, যে আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারি না। এইরূপ পরমাণুতে পাকের নাম পীলুপাক। পিঠরপাকবাদীদিগের মতে পার্থিব বস্তুমাত্রেই সচ্ছিদ্র (Porous) সুতরাং কোন পার্থিব পাত্রকে অগ্নিসংযুক্ত করিলে অগ্নির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবয়ব গুলি ঐ সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে ভিতর বাহির উভয় দিকেই পক্ক করে, অবয়বের আর বিশ্লেষ আবশ্যক করে না। পাক হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে পাকজ বলে। যাহা আপনা হইতে উৎপন্ন, তাহা অপাকজ ; অপাকজকে স্বাভাবিক বলা যায়।

* তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন "সংখ্যাঃ খল্বপি উৎপত্তেঃ প্রভৃত্যা বিনাশ মনুবর্ত্তন্তে।" ইহার অর্থ সংখ্যাসকল উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্যন্ত স্থিত হয়। কার উৎপত্তির সহিত কার বিনাশ পর্য্যন্ত স্থিত হয়, একথা আমরা ভাল করে বুঝিতে পারিলাম না। যদি সংখ্যেয় পদার্থের উৎপত্তি হইতে তাহার বিনাশ পর্য্যন্ত স্থিত হয়,—এইরূপ তাৎপর্য্য হয়, তাহলে আমাদের একটা জিজ্ঞাস্য এই যে সংখ্যেয় পদার্থগুলিত এক এক করিয়া উৎপন্ন হয় সুতরাং সংখ্যেয়ের উৎত্তির সহিত কেবল একত্ব সংখ্যারই সম্বন্ধ, অন্য সংখ্যার নয়। এবং ইহার পর "প্রত্যক্ষস্তস্য দ্বয়োরিন্দ্রিয় সন্নিকর্ষাদ্রূপ জায়তে।" এই অস্য পদের উদ্দেশ্য কি, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

দ্রব্য বৃত্তি পরিমাণ অনিত্য। পরিমাণ সামান্যত চারি প্রকার—অণু (ক্ষুদ্র) মহৎ (বড়), দীর্ঘ (লম্বা), হ্রস্ব (খাট)। সংখ্যা জন্য, পরিমাণ জন্য এবং সমূহ জন্য পরিমাণ অনিত্য। আশ্রয়ের নাশই পরিমাণ নাশের কারণ। পরিমাণ সজাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের কারণ হয়, এই জন্য দ্ব্যণুকের পরিমাণ কাহারও কারণ নয়। উহা নিজে অতি সূক্ষ্ম, উহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পরিমাণ আর হইতে পারে না।

পৃথক্ত্ব—যে গুণ থাকাতে অমুক বস্তু অমুক বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়, তাহার নাম পৃথক্ত্ব। এই পৃথক্ত্বও সমুদয় দ্রব্যে অবস্থান করে। ইহাও পূর্ব্ববৎ নিত্য ও অনিত্য দুই প্রকার। অনিত্য পৃথকত্ব আশ্রয় নাশে বিনষ্ট হয়। এক হইতে পৃথক্, অন্য হইতে পৃথক, এইরূপে অনেক প্রকার পৃথকত্ব হইতে পারে। উহাদের মধ্যে দ্বিপৃথক্ত্বাদি অপেক্ষা বুদ্ধি জন্য এবং অপেক্ষাবুদ্ধির নাশাধীন উহাদের বিনাশ হয়।

সংযোগ। বিভিন্ন বস্তুর মেলনের নাম সংযোগ, ইহা সকল দ্রব্যেই থাকে। সংযোগ তিন প্রকার—এক কর্ম্মজ, উভয় কর্ম্মজ এবং সংযোগজ। ক্রিয়া জন্য সংযোগ দুই প্রকার প্রথম অভিঘাত, দ্বিতীয় নোদন। যেরূপ সংযোগ হইলে শব্দ উৎপত্তি হয় তাহার নাম অভিঘাত। শব্দ না হইলে, নোদন।

বিভাগ—এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর ছাড়া থাকাকে বিভাগ বলে, ইহা সংযোগের ঠিক উলটা। সংযোগের ন্যায় বিভাগও নয়টি দ্রব্যে অবস্থিত হয় এবং তিন প্রকার। এক প্রকার ক্রিয়া জন্য, উভয় ক্রিয়াজন্য এবং বিভাগ জন্য।

পরত্ব ও অপরত্ব দুই প্রকার—প্রথম দৈশিক, দ্বিতীয় কালিক। দৈশিক পরত্বকে দূরত্ব এবং অপরত্বকে নিকট বলা যায়। কালিক পরত্বকে জ্যেষ্ঠত্ব এবং অপরত্বকে কনিষ্ঠত্ব বলা যায়। এই উভয় বিধ পরত্ব, অপরত্বই ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু এবং মনেতে বর্ত্তমান হয়। বৈশেষিকদিগের মতে দৈশিক পরত্ব বা দূরত্বের প্রতি অধিক সূর্য্য সংযোগ এবং অপরত্ব বা সমীপত্বের প্রতি অল্প সূর্য্য সংযোগ কারণ এবং কালিক পরত্ব বা জ্যেষ্ঠত্বের প্রতি অধিক সূর্য্যের গতি এবং অপরত্ব বা কনিষ্ঠের প্রতি অল্প সূর্য্যের গতি কারণ।

বুদ্ধি। বৈশেষিকদিগের মতে বুদ্ধি প্রথমত দ্বিবিধ অনুভূতি এবং স্মৃতি। ইহাদের মধ্যে অনুভূতি আবার দুই প্রকার প্রত্যক্ষ এবং অনুমান। ইন্দ্রিয়

জন্য জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয় ছয় প্রকার, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক, কর্ণ, এবং মন; এই নিমিত্ত ঘ্রাণজ, রাসন বা স্বাদ, চাক্ষুষ, স্পার্শন, শ্রাবণ এবং মানস এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ। তাহার মধ্যে চাক্ষুষ ও স্পার্শন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি জ্ঞেয় বস্তুতে উদ্ভূত রূপ এবং তাহার সহিত আলোক সংযোগ হওয়া আবশ্যক। বস্তুর সহিত তাহার সংখ্যা পরিমাণ, পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, বেগ, দ্রবত্ব, ক্রিয়া এবং জাতি ইহাদিগেরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম স্পার্শন প্রত্যক্ষ। বস্তুর জাতিরও স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয়। সংখ্যা, পরিমাণ পৃথক্, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, বেগ, দ্রবত্ব এবং ক্রিয়া ইহাদেরও স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয়। মনের দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহার নাম মানস প্রত্যক্ষ, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন এবং বিশেষ গুণযুক্ত আত্মার ও মানস প্রত্যক্ষ হয়। * যে বস্তু যে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয়, সেই বস্তুর অভাবও সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয়। সকল প্রকার প্রত্যক্ষের প্রতি জ্ঞেয় বস্তুর পরিমাণের মহত্ত্ব থাকা আবশ্যক, এই নিমিত্ত পরমাণু, দ্ব্যণুক এবং তাহাদের গুণের প্রত্যক্ষ হয় না। জ্ঞেয় বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষের নিষ্পাদক, বৈশেষিকেরা উহাকে ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করেন। প্রত্যক্ষ আবার লৌকিক এবং অলৌকিক ভেদে দুই প্রকার। লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় বলা হইল, ঠিক্ রীতিমত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ না হইয়া যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহার নাম অলৌকিক প্রত্যক্ষ। এই অলৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি তিন প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ কারণ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে, সামান্য লক্ষণ, জ্ঞান লক্ষণ এবং যোগজ। সামান্য-লক্ষণ সন্নিকর্ষ দ্বারা জাতির জ্ঞানে তজ্জাতীয় নিখিল বস্তুর জ্ঞান হয়; রজ্জু দেখিয়া সর্পজ্ঞান, বা ঝিনুক দেখিয়া রূপার জ্ঞান, এইরূপ প্রকার জ্ঞান সকল জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ দ্বারা উৎপন্ন এবং যোগীদিগের জ্ঞানের প্রতি যোগজ সন্নিকর্ষ কারণ।

ব্যাপ্তি জন্য জ্ঞানের নাম অনুমিতি বা অনুমান, বৈশেষিকেরা অনুমানকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন যথা পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতো

---

* তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন আত্মার একেবারেই প্রত্যক্ষ হয় না। আমি জানিতেছি এইরূপ জ্ঞান—ভ্রমমাত্র।

দৃষ্ট। কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ, যেমন মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমানকে শেষবৎ বলে ; যেমন প্রাতঃকালে উঠে খানা ডোবা জলে পরিপূর্ণ দেখিয়া, রাত্রে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এইরূপ অনুমান। এই দুই প্রকারের অতিরিক্ত অনুমানকে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলে, এক স্থানে এক প্রকার কার্য্য কারণ ভাব দেখিয়া তজ্জাতীয় আর একটি স্থলেও সেইরূপ কার্য্য কারণ ভাব কল্পনার নাম সামান্যতো দৃষ্ট। অনুমানের আরতিন প্রকার ভেদ আছে (১) কেবলান্বয়ী (২) কেবল ব্যতিরেকী এবং (৩) অন্বয়-ব্যতিরেকী। সকল স্থলেই আছে বলিয়া বিচার্য্য স্থলেও অবশ্য আছে, এরূপ অনুমান কেবলান্বয়ী। কেবল মাত্র বিচার্য্য স্থলেই থাকিতে পারে অন্যত্র পারে না—এইরূপ সাধ্যের অনুমান ব্যতিরেকী, বিচার্য্যস্থলে, থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে, এই এই কারণে বিচার্য্য স্থলে আছে, এরূপ অনুমান অন্বয়-ব্যতিরেকী। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান' ঐরূপ অনুমান মূলক। সাধারণত অনুমান পঞ্চ অবয়ব বিশিষ্ট। সেই পঞ্চ অবয়ব—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন ; প্রতিজ্ঞা—পর্ব্বতে আগুন আছে, হেতু—ধূমাৎ, ধূম আছে বলিয়া, উদাহরণ—যেখানে আগুন থাকে সেই খানেই ধূম থাকে, নিগমন—এখানে আগুনের সহিত একত্রস্থায়ী ধূম আছে, উপনয়—অতএব এখানে আগুন আছে।

বৈশেষিকেরা উপমান এবং শব্দ এই উভয়কে অনুমানের অন্তর্গত করিয়াছেন।

পূর্ব্বানুভব জন্য সংস্কারাধীন যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম স্মৃতি। জ্ঞান মাত্রের প্রতি মনের সহিত ত্বকের যোগ হেতু। সমুদয় জ্ঞানই দুই প্রকার—প্রমা যথার্থ জ্ঞান, অপ্রমা মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রম। ভ্রম আবার দুই প্রকার সংশয় এবং বিপর্য্যয়।

সুখ— সকলের বাঞ্ছনীয়, দুই প্রকার—ঐহিক এবং পারত্রিক।

দুঃখ—যাহা কেহই চাহে না, এবং অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

ইচ্ছা—দুই প্রকার—ফলেচ্ছা এবং উপায়েচ্ছা। ফল বলিতে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—সুখ বা দুঃখ নিবৃত্তি, উপায় বলিতে—ঐ ফল লাভের সাধন।

দ্বেষ—কোন বস্তু হইতে অনুরাগের নিবৃত্তির নাম দ্বেষ।

প্রযত্ন—চেষ্টা, ইহা তিন প্রকার—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং জীব, যোনি।

প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি যে কি, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছে। করিতে ইচ্ছা, নিজের সামর্থ্য লাভবোধ এবং করিবার উপকরণ, ইহারা প্রবৃত্তির কারণ, নিবৃত্তির, কারণ দ্বেষ বা অনুপকার বোধ। আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের যত্নকে জীব যোনি যত্ন বলে।

গুরুত্ব—বস্তুর ভাবের নাম গুরুত্ব। ইহা পৃথিবী, এবং জলে অবস্থান করে ও অতীন্দ্রিয়।

দ্রবত্ব— যে গুণ থাকিলে বস্তু গলে যায় তাহার নাম দ্রবত্ব। দ্রবত্ব দুই প্রকার সাংসিদ্ধিক এবং নৈমিত্তিক। যাহা স্বভাবতই বর্ত্তমান তাহার নাম সাংসিদ্ধিক, যাহা কোন কারণ বশত উৎপন্ন হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক। জলে সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব এবং ঘৃতাদিতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে। দ্রবত্ব পৃথিবী জল এবং তেজ এই তিনেতে বর্ত্তমান। জলের পরমাণুতে যে দ্রবত্ব আছে, উহা নিত্য।

স্নেহ—কেবল জলেরই গুণ। জলের পরমাণুতে যে স্নেহ আছে তাহা নিত্য এবং তদ্ভিন্ন স্থলে অনিত্য। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন এই স্নেহ পদার্থ দ্বারাই গুঁড়া বস্তু একত্র করিয়া বটিকা বা তাল করা হয়।

সংস্কার তিন প্রকার বেগ স্থিতিস্থাপক এবং ভাবনা। উহাদের মধ্যে বেগ—পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ুতে বর্ত্তমান; স্থিতি স্থাপক কেবল পৃথিবীতে এবং সংস্কার কেবল জীবাত্মায় বর্ত্তমান। যে গুণ থাকিলে আকর্ষণ দ্বারা বস্তুর বৃদ্ধি হয় এবং আকর্ষণ ছাড়িয়া দিলে পুনর্ব্বার আপনার স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয় তাহার নাম স্থিতি স্থাপক সংস্কার, ভাবনা একটি গুণ যাহা থাকিলে স্মৃতির উৎপত্তি হয়।

ধর্ম্ম—পুণ্য। অধর্ম্ম—পাপ; ইহারা জীবাত্মার গুণ।

শব্দ—শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যাহার অনুভব করা হয়, তাহার নাম শব্দ। ইহা দুই প্রকার প্রথম ধ্বনি, দ্বিতীয় বর্ণ। মৃদঙ্গাদির শব্দের নাম ধ্বনি, এবং কণ্ঠতালু প্রভৃতি আস্যের অভ্যন্তর স্থান হইতে উৎপন্ন শব্দের নাম বর্ণ। শব্দ সকল আমাদের কর্ণের ভিতর আসিয়া উৎপন্ন হইলেই উহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। বৈশেষিকগণ এই কর্ণের ভিতর শব্দের উৎপত্তির প্রতি দুই প্রকার রীতির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রথম বীচি তরঙ্গ ন্যায়, দ্বিতীয় কদম্ব গোলক ন্যায়। যেমন কোন জলাশয়ের মধ্যে ঢিল ফেলিলে, যেখানে ঐ ঢিল পড়ে সেই স্থলে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তাকার তরঙ্গ উৎপন্ন

হয়, তাহার পর ঐ বৃত্ত ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া তীরে আসিয়া সংলগ্ন হয়। সেইরূপ কোন প্রদেশে অভিঘাত দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হইয়া উহা ঐরূপ বৃত্তাকারে ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া দশদিকে ছড়িয়া পড়ে; আমাদের কাণের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ প্রক্রিয়াকে বীচি তরঙ্গন্যায় বলে। দ্বিতীয় মতে অভিঘাত মাত্রেই দশ দিকে দশটি শব্দ উৎপন্ন হয় এবং সেই দশটা শব্দ হইতে আর দশ দশটা শব্দ উৎপন্ন এইরূপ ক্রমে শব্দ উৎপন্ন হইতে হইতে ক্রমে কর্ণবিবরে আসিয়া উৎপন্ন হয়। এইরূপ শব্দোৎপত্তি রীতির নাম কদম্বগোলক ন্যায়। বৈশেষিকদিগের মতে শব্দ অনিত্য; কারণ আমরা এই শব্দ উৎপন্ন হইল এই শব্দ বিনষ্ট হইল, এতদ্রূপ ব্যবহার করি।

কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, এবং সমবায় ইহাদের বিষয় পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই উহাদের বিষয় এক প্রকার মোটামুটি জ্ঞান হইতে পারে। এক্ষণে সপ্তম পদার্থ অভাবের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। কোন বস্তুর না থাকার নামই অভাব। অভাব চারি প্রকার, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। কোন বস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বে যে সেই বস্তুর না থাকা তাহার নাম প্রাগভাব, ধ্বংস বলিতে নাশ, বস্তু বিনষ্ট হইলে তাহার যে না থাকা, তাহার নাম ধ্বংসাভাব। অত্যন্তাভাব বলিতে কোন বস্তুর ভূত, ভবিষ্যত এবং বর্ত্তমান এই তিন কালেই না থাকা। এই তিন প্রকার অভাব সংসর্গাভাব নামে অভিহিত হয়। ভেদ ও অন্যোন্যাভাব—একই পদার্থ।

বৈশেষিকোক্ত পদার্থ গুলি উক্ত হইল। এক্ষণে সাধর্ম্ম্য এবং বৈধর্ম্ম্য। সাধর্ম্ম্য বলিতে একরূপ ধর্ম্মের আশ্রয়তা। বৈশেষিকোক্ত ষট্ পদার্থের সাধর্ম্ম্য এই কয়টি—অস্তিত্ব অভিধেয়ত্ব, বাচ্যত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব। আশ্রিতত্ব নামক একটি ধর্ম্ম নিত্য দ্রব্য ভিন্ন অপর বস্তুতে বর্ত্তমান হয়। দ্রব্য ভিন্ন সমস্ত নির্গুণ এবং ক্রিয়াশূন্য, এই জন্য নির্গুণত্ব এবং নিষ্ক্রিয়ত্ব উহাদের সাধর্ম্ম্য। যে যাহার সাধর্ম্ম্য, উহা তাহার বিপরীতের বৈধর্ম্ম্য।

এই সকল পদার্থ বিস্তৃতরূপে বৈশেষিক দর্শনে উক্ত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৈশেষিক সূত্র দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। উহার মধ্যে প্রথমাধ্যায়ে সমুদয় পদার্থের সামান্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্রব্যের নিরূপণ; তৃতীয়াধ্যায়ে আত্মা ও অন্তঃকরণের লক্ষণ, চতুর্থাধ্যায়ে শরীর এবং তাহার উপযোগী বস্তুর নির্দ্দেশ, পঞ্চমাধ্যায়ে কর্ম্ম নিরূপণ; ষষ্ঠাধ্যায়ে যাজ্ঞিক কর্ম্মের আলোচনা; সপ্তমাধ্যায়ে গুণ এবং সমবায়

সম্বন্ধের প্রতিপাদন, অষ্টমাধ্যায়ে জ্ঞানের উৎপত্তি ও তাহার নিদানাদি নিরূপণ, নবম অধ্যায়ে বুদ্ধিবিশেষের প্রতিপাদন, দশম অধ্যায়ে আত্মার গুণগুলির আলোচনা। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় বলিয়াছেন যদিও এই শাস্ত্রে বিস্তৃতরূপে পদার্থসমূহের নির্ণয়ই করা হইয়াছে, তথাপি ঐরূপ নির্ণয় মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশে সংসাধিত হওয়ায়, এইশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য যে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া, সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই সূত্রকার প্রথমেই "অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ" এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ধর্ম্ম বলিতে এখানে নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মই বলিতে হইবে। কারণ বস্তুর সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান হইলে, কোন বস্তু কিরূপ তাহা ঠীকঠীক জানিতে পারিলে, আমাদের জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়, জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির সহিত আমাদের আকাঙ্ক্ষারও নিবৃত্তি হয়, সেই সঙ্গে দুঃখেরও নিবৃত্তি হয় মন সন্তোষ অনুভব করত স্থিরভাব ধারণ করে। বৈশেষিকেরা বলেন ঐরূপ দুঃখনিবৃত্তির নামই মোক্ষ। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন, তত্ত্বজ্ঞান হইলে মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয়, এই মিথ্যাজ্ঞানের নাশই মোক্ষ প্রাপ্তির প্রতি হেতু। কারণ জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞানের নামই তত্ত্বজ্ঞান, ঐ তত্ত্বজ্ঞান হইলে পুরুষ আর সংসারে আবদ্ধ থাকে না, মুক্তিলাভ করে।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাষ্যে বৈশেষিকদিগের পূর্ব্ব প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ অনেক কথাই আছে। তাহার মধ্যে আমরা একটি প্রধানের মাত্র উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। বৈশেষিকদিগের মতে জীবাত্মা পরমাত্মা দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। উভয়েরই কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই পদার্থ, যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, সমুদ্রে জল বুদ্বুদ হয়, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে জীবাত্মাসকল উৎপন্ন হইয়া যে পর্য্যন্ত মোক্ষ লাভ না হয়, সেই পর্য্যন্ত জন্ম মৃত্যু ধারাবাহী সংসারে পতিত হইয়া পৃথক ভাবে অবস্থান করে, মোক্ষ লাভ হইলে যেমন পুষ্প রস সমুদয় মধুরসহিত মিশিয়া যায়, নদীসকল সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়া যায় এবং ঘটাকাশাদি ক্ষুদ্র আকাশ মহাকাশে মিলিয়া যায়, সেইরূপ জীবাত্মাও পরমাত্মায় মিলিত হইয়া একভাবে অবস্থান করে তখন আর ভিন্নভাবে প্রকাশ পায় না। এইরূপ একটী ভাবকেই পরম মোক্ষ বলে। আত্মা স্বভাবত নির্গুণ।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাষ্যে এরূপ অনেক নূতন কথা আছে। বিস্তার ভয়ে সেগুলি এখানে সমালোচিত হইল না।

হিন্দুর নবজীবন।

সনাতন ধর্ম্মই (সর্ব্বশক্তিমান্ এক ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ) অলৌকিক হিন্দু ধর্ম্ম। দেবতা বা ঋষি প্রোক্ত উপায়ে জীবাত্মার মোক্ষ বিধান এই অলৌকিক ধর্ম্মের চরমোদ্দেশ্য। এই অলৌকিক ধর্ম্মের অন্তর্গত সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয় ভূষিত চারিবর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চতুর্ব্বর্ণের অলৌকিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক—ধর্ম্মভাব যে সকল গ্রন্থে বিবৃত আছে, সেই সকল গ্রন্থকে হিন্দুশাস্ত্র বলে। এই হিন্দুশাস্ত্রের উপদেষ্টা প্রধানত ব্রাহ্মণগণ। ব্রাহ্মণ হিন্দুর মস্তক, ক্ষত্রিয় বাহুদ্বয়, বৈশ্য উদর এবং শূদ্র পদদ্বয়। কাল সাক্ষী আছেন, এক সময়ে এক্ষণকার এই প্রাচীন হিন্দু, শূদ্র রূপে দৃঢ়াধ্যবসায়ে, ব্রাহ্মণরূপে মস্তিষ্কের প্রতিভায়, ক্ষত্রিয়রূপ ত্রিলোক-বিজয়ী বাহুবলে, এবং বৈশ্যরূপে অতুল বিভবের উত্তরাধিকারী হইয়া, কত মহাযুগ ধরিয়া এক-ছত্ররূপে সসাগরা ধরার বরণীয় পতি ছিলেন। এক্ষণে হিন্দুর ঘোর সুপ্তাবস্থা। হিন্দুর মস্তিষ্ক শুষ্ক হইয়াছে—বাহুতে বল নাই—উদরে অন্ন নাই এবং গমনশক্তি রহিত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ মূর্খ, ক্ষত্রিয় ভীরু, বৈশ্য অলস এবং শূদ্র অবাধ্য হইয়াছে। কে জানে আবার কত দিনে হিন্দুর অভ্যুদয় হইবে! বর্ণগত বৈচিত্রতা আবার আদৃত হইবে। ব্রাহ্মণ তত্ত্ব কথায়, ক্ষত্রিয় রাজ্যপালনে, বৈশ্য বাণিজ্যে এবং শূদ্র আশ্রমী সেবায় মনোনিবেশ করিবে! হিন্দু, নিরাশ হইও না। যে কালবশে তুমি পৃথিবীর শীর্ষ স্থানে থাকিয়া অধঃপতিত হইয়াছ, সেই কালবশে তুমি এই নীচ

* আমরা বলিয়াছি তর্কালঙ্কার মহাশয় পৃথিবীর কৃষ্ণরূপের প্রতি কোন প্রমাণ দেন নাই, এটি আমাদের ভ্রম; তিনি সপ্তম অধ্যায়ে পাকজ রূপপ্রসঙ্গে এ বিষয়ের প্রমাণ দিয়াছেন।

অবস্থা হইতে কিছুকাল বিশ্রামের পর, আবার সসম্মানে আপনার অভী স্থান অধিকার করিবে। বুঝি তোমার অদৃষ্ট চক্র আবার ফিরিয়া আসিল!

আমাদের মধ্যে এক্ষণে সাতশ্রেণীর হিন্দু আছে।

(১) কুলি মজুর, বাক্দী বামন্, ভাট্, ইত্যাদি নিরক্ষর লোক। এই শ্রেণীতে সমাজের দশ আনা লোক আছে।

(২) মূর্খ গোঁড়া হিন্দু, যারা দুই চারিটা করিয়া অশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া কোন রকমে পিতৃ পিতামহের পাট ও ব্রাহ্মণ হইলে ফলাহারের কার্য্য বজায় রাখিয়াছে। এই শ্রেণীতে চারি আনা লোক।

(৩) ইংরাজী নবীস্ কালেজের ফেরতা--যারা——

"না হিন্দু না মুসল্মান
ধর্ম্ম ধনের ধার্ ধারে না।
নয় মগ্, ফিরিঙ্গী, বিষম খিজি
ভিতর বাহির যায় না জানা।"

এই শ্রেণীতে এক আনা লোক।

(৪) অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, সরস্বতী, স্বামীর দল, যাঁহাদের সাহায্যে কতক পরিমাণে সমাজ চলিতেছে।

এই শ্রেণীতে অর্দ্ধ আনা লোক।

(৫) তৃতীয় শ্রেণী হইতে সরিয়া যাঁহারা আজিকালি গীতা ভাগবতের কথা আওড়াইতেছেন।

এই শ্রেণীতে এক পাই লোক।

(৬) জ্ঞানী নাস্তিক যাঁহারা নিরপেক্ষ।

এই শ্রেণীতে অর্দ্ধ পাই লোক।

(৭) জ্ঞানী আস্তিক যাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া অদৃশ্য ভাবে নির্জ্জনে থাকেন।

এই শ্রেণীতে অর্দ্ধ পাই লোক।

পূর্ব্বোক্ত সাত শ্রেণীর মধ্যে সপ্তম শ্রেণীর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমাজের কোন সংশ্রব নাই, তজ্জন্য এই শ্রেণীর হিন্দুকে বাদ দিতে পারা যায়। অবশিষ্ট ছয় শ্রেণীর পরস্পর সাহায্যে আধুনিক সমাজ চলিতেছে। কিন্তু এরূপ চলিলে, আর অধিক দিন আধুনিক হিন্দুসমাজ টিকিয়া থাকিবে না। কারণ প্রথম তিন ও ষষ্ঠ শ্রেণীর হিন্দুর দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম কখনও সম্যক্রূপে আচরিত

হইবে বলিয়া বোধ হয় না। অবশিষ্ট চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর হিন্দু থাকিল। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর হিন্দুর ভাগ ক্রমশই উত্তরোত্তর কমিয়া আসিতেছে। যেরূপ এক ভাবে কমিতেছে, এরূপ কমিতে থাকিলে, এই শ্রেণী অচিরে লোপ পাইয়া তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যা বাড়াবে। আবার তৃতীয় শ্রেণী ভাঙ্গিয়া ক্রমশ পঞ্চম শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে এবং বৈদেশিক শিক্ষার উত্তরোত্তর বিস্তারে ১ম ও ২য় শ্রেণীর হিন্দু ৩য় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া ৫ম শ্রেণীর আরও দল পুষ্টি করিবে। এইরূপে ইংরাজ রাজ্য আমাদের দেশে আর একশত বা দুই শত বর্ষ স্থায়ী হইলে, পঞ্চম শ্রেণীতে আট আনা লোক হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

এক্ষণে দেখা যাউক এই পঞ্চম শ্রেণীর হিন্দুর কিরূপ চরিত্র। যাহারা কোন ধর্ম্ম মানিত না—যাহাদের আচার ব্যবহার অদ্ভুত রকমের ছিল—যাহাদের মন বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাবে কতক পরিমাণে স্বাধীন হইয়াছিল—যাহারা ইংরাজের কাছে আপনাদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিত—যাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞসূত্র না ঢাকিয়া লজ্জায় বাহিরে আসিতে পারিত না—যাহাদের মধ্যে শূদ্রেরা যজ্ঞসূত্র গলদেশে ধারণ করিবার জন্য উৎসুক ছিল— যাহারা অখাদ্য খাইয়া সর্ব্ব লোকের নিকট ঐ বিষয়ের আন্দোলন করা আপনাদের শ্লাঘা জ্ঞান করিত—যাহারা সম বয়স্ককে হিন্দু শাস্ত্রালোচনা করিতে দেখিলে বা রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে শুনিলে তাহাকে অসভ্য বলিয়া উপহাস করিত—সেই তাহারা—সেই মানোয়ারী কালেজের ফের্‌তা গোরারা আজি নব গোরা সাজিয়া হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন। যেন স্বপ্ন যোগে দৈবাদেশে হিন্দুধর্ম্মের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা সহসা হিন্দুধর্ম্মের নাম লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আজি হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে এই নব্য শ্রেণীর হিন্দুরা নবজীবন পাইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছেন। যখন এই একটী নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে তখন আশা করা যায়, কালে এই শ্রেণী অত্যন্ত প্রবল হইয়া আবার সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য সমস্ত জগতে স্থাপন করিবেন। এই শ্রেণীর উদ্ভব শুভ বলিতে হইবে। এই শ্রেণীর উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রতি দুইটি মুখ্য কারণ দেখা যায়।

✓ (১) ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজের সহিত সংশ্রবে তৃতীয় শ্রেণীর মনে স্বাধীন ভাবের স্ফূর্ত্তি।

(২) ঐ স্বাধীন ভাবের স্ফূর্ত্তিবশত জাতীয় ভাষার ও ভাবের উন্নতি করে মনঃসংযোগ।

এক্ষণে আমাদের ভাবী শুভাশুভ ইংরাজের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। ইংরাজ আমাদের দেশে বদ্ধমূল হইয়া থাকিলেই আমাদের আশা ফলবতী হইবে। অর্থাৎ কোন বলদৃপ্ত স্বাধীন ধার্ম্মিক জাতির সংস্রবে আমাদের বাস এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃকল্প। এই সংস্রবে জেতার স্বাধীন ভাব আমাদের মনে ক্রমে ক্রমে সঞ্চরিত হইবে। এই জন্যই সাধুসংসর্গের মাহাত্ম্য আমাদের শাস্ত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। সাধুসংসর্গে সাধুভাব মনে সঞ্চিত হয় সুতরাং ধার্ম্মিক পরাক্রমশালী জেতার সংসর্গে আমাদের মনে যে স্বাধীন ভাবের স্ফূর্ত্তি পাইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমতে বিজিতের মনে স্বাধীন বৃত্তির স্ফূর্ত্তির নিমিত্ত জেতার দুইটী গুণ থাকা আবশ্যক।

(১) পরাক্রমশালিতা।

(২) ধার্ম্মিকতা।

পরাক্রমশালী না হইলে জেতার আত্ম স্বাধীনতার পক্ষে বাধা পড়িবে। জেতা ধার্ম্মিক না হইলে বিজিতের মনে স্বাধীন ভাব জন্মাইবার পক্ষে বাধা পড়িবে। ধার্ম্মিক জেতা, বিজিতকে ক্রমশ আত্মশাসন যোগ্য করিয়া বিজিতের মনে উত্তরোত্তর স্বাধীন ভাবের স্ফূর্ত্তি করিয়া দিতে বাধ্য। ইংরাজ পরাক্রমশালী ও ধার্ম্মিক সুতরাং ইংরাজের সংসর্গে আমাদের মনে স্বাধীন ভাব জন্মাইবার পক্ষে কোন বাধা দেখিতে পাই না। ইংরাজের অপেক্ষা অপর কোন জাতি ধার্ম্মিক আছেন কি না, আমরা সম্যক্ জানি না। শুনিতে পাই অপর দুই একটী জাতি ইংরাজের অপেক্ষা ধার্ম্মিক আছেন কিন্তু আমাদের দেশ তাঁহাদের অধিকৃত হইলে তাঁহাদের স্বভাবের যে ব্যতিক্রম হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে। বিশেষ ইংরাজের রাজত্ব আমাদের এক প্রকার বেশ সহিয়া গিয়াছে। এই জন্য আমাদের ইংরাজের অধীনে থাকিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত ২টী ব্যতীত জেতার আর একটি গুণ থাকা আবশ্যক, কিন্তু এটী তত মুখ্য নয়।

(৩) সাধারণ তন্ত্রমতাবলম্বিতা।

জেতার এই গুণ থাকিলে বিজিতের পক্ষে এই সুখ হয়, যে বিজিত জাতি কখন যথেচ্ছাচারী রাজার ক্রীড়ার সামগ্রী হইতে পারে না। ইংরাজের মধ্যে

যদিও সম্পূর্ণরূপে সাধারণ তন্ত্র প্রচলিত নাই কিন্তু অনেকাংশে ইংরাজরাজ্য সাধারণ তন্ত্রের উপর গঠিত বলিতে পারা যায়। ইংরাজ রাজ্যে যথেচ্ছাচারী একজন রাজার খেয়ালের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করিতেছে না। সুতরাং এক্ষণে ইংরাজ যাহাতে আমাদের দেশে বদ্ধমূল থাকিতে পারেন তদ্বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত। এইরূপ সংসর্গ না করিলে কোন প্রাচীন জাতির আর স্বাধীন হওয়ার উপায় নাই। সুতরাং আমাদের দেশে ইংরাজ যত অধিক দিন থাকিবেন, তত অধিক পরিমাণে আমাদের মনে স্বাধীন ভাবের উপায় হইবে এবং তত অধিক সংখ্যক হিন্দু তৃতীয় শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইবে। যত পঞ্চম শ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, ততই স্বদেশীয় ভাষার ও ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ধর্ম্মালোচনা বৃদ্ধি পাইবে এবং জাতীয় ধর্ম্মালোচনার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চরিত্র পুনর্গঠিত হইবে এবং বল ও সাহস প্রস্ফুটিত হইবে। যেমন একদিকে হিন্দুর স্বাধীনতা ও ধর্ম্মবৃত্তির আধিক্যতা হইবে, তদ্রূপ অন্য দিকে ইংরাজের মানসিক বল ক্ষয় হইয়া ইংরাজজাতির অবনতির সূত্রপাত হইবে। এইরূপ একের উন্নতি ও অন্যের অবনতি বিজ্ঞানসম্মত ও প্রত্যক্ষীকৃত সত্য।

এক্ষণে, তৃতীয় শ্রেণীর মনে স্বাধীন ভাবের উপচয় হইলে কি প্রকারে পঞ্চম শ্রেণীর উদ্ভব হয় তাহাই বলি। স্বাধীন ভাবে মনে স্বাতন্ত্র্য ভাব স্বত উদয় হয়। স্বাধীন ভাবের ফল জাত্যভিমান। মন জাত্যভিমান প্রণোদিত হইলে এইরূপ তর্কবিতর্ক করে। "অপরে আপনার ধর্ম্ম পালন করে, আমরা কেন আমাদের ধর্ম্ম পালন করি না? আমরা কেন পরের ধর্ম্মের অনুসরণ করি? আমাদের হিন্দুধর্ম্ম—সনাতন ধর্ম্ম—আমরা হিন্দু। আমাদের শাস্ত্র আছে, এক আধ খানি নয়—অনন্ত শাস্ত্র। আমাদের বেদ আছে—আমাদের পুরাণ আছে—আমাদের দর্শন আছে,—আমাদের রামায়ণ আছে—মহাভারত আছে— ভাগবত আছে—আমাদের গীতা আছে,—আমাদের কি নাই? কেন ভাই আমরা আর পরধর্ম্মের দোহাই দিয়া বেড়াই? আমরা সাক্ষাৎ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া বিধর্ম্মীর ধর্ম্মের আশ্রয় লই। আমাদের ধিক। এস ভাই আমরা মিলিয়া আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রমন্থন করিয়া চিচিত্র ধর্ম্ম রত্নের উদ্ধার করি"। এইরূপ আন্দোলনে ক্রমে মনে অপূর্ব্ব, অগাধ, অনন্ত ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। এই ধর্ম্মোদয়ের ফল জাতীয় ভাষার উদ্ধার এবং সাময়িক পত্রের ও ধর্ম্ম গ্রন্থের বহুল প্রচার। এইরূপে ধর্ম্মবৃত্তির সঙ্গে জাতীয় ভাষার

উন্নতি হইলে নূতন নূতন দৃশ্য ও ভাব আসিয়া মন অধিকার করে। ধর্ম্ম ভাবের পরবর্ত্তী বীরত্ব ব্যঞ্জক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের বিকাশ হয়। এক্ষণে পঞ্চম শ্রেণী হিন্দুর ধর্ম্মবৃত্তির স্ফুরণের সঙ্গে জাতীয় ভাষার ও ভাবের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপে ধর্ম্মান্দোলনের সঙ্গে সম্যকরূপে জাতীয় ভাবের উন্নতি হইলে, কালে এই শ্রেণীর মনে, ধর্ম্ম সহায় থাকিয়া—একতা, সাহস ও বলের সঞ্চার করিয়া দিবে। তখন এই শ্রেণীর হিন্দুরা পৌরাণিক বিখ্যাত বীরগণের কথা স্মরণ করিয়া বীরভাবে উত্তেজিত হইয়া মহাবীরের ন্যায় জয়রাম শ্রীরাম ধ্বনিতে পৃথ্বীরূপ লঙ্কাদ্বীপের আমূল প্রকম্পিত করিয়া ধর্ম্মানলে পৃথিবীর পাপরাশী সমূলে ভস্মীভূত করিয়া পুনর্ব্বার পবিত্র হিন্দুজাতির বিজয় নিশান হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরাগ্রে স্থাপনপূর্ব্বক মঙ্গলময় হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বস্তিবাচন করিবেন।

আয় আয় আয় সেই দিন আয়
হিন্দু রাজ্য যবে শোভিবে ধরায়।
পাপে তাপে তপ্ত যবে ক্ষিতিতল
প্রেম শান্তি জলে হবে সুশীতল॥

জনৈক হিন্দু।

কে কাহার প্রাণাধিক ?

নিস্তব্ধ নিশীথে নিভৃত নিবাসে,
সুদীন শয্যায় শায়িতা সতী,
প্রাণ যায় যায়, সম্মুখ শমন,
না মানে প্রবোধ অবোধ পতি।

নয়ন আসারে বুক ভাসি যায়,
জগৎ সংসার আঁধার ময়,
কেহ নাহি আর শরণাগতের,
সুদীন ব্রাহ্মণ সর্ব্বান্ত হয়।

"থাক থাক থাক কুশলে থাক হে !
জনমে জনমে দাসী যে আমি ;
বলি উঠি বৈসে, মমূর্ষু বলিছে,
"ঠাকুর গোসাই পদে প্রণামি।"

"মুছে ফেল জল যাই দেখে যাই
তব চাঁদ মুখ ফুল্ল জ্যোৎস্নায়,
হায় মরে যাই মরণ অধিক,
বল প্রাণাধিক কে কার হায়।"
শমন শাসনে যত না কাতরা,
পতির দশায় অধিক তার,
ততোধিক সতী সন্দেহ দোলনে,—
থামিল কণ্ঠের ক্ষীণ ঝঙ্কার।

স্তবধ ব্রহ্মাণ্ড নিভৃত কুটীরে,
নিসাড়ে স্বামীর বদন চাই,
চরিতে চপলা চমকিয়া যেন
কহিলা কান্তেরে "দেব হে ভাই !"
"দেখহে বারেক নয়নে আমার,
দেখা দেখি করি দুই জনায়,
প্রাণ গেলে তবু রবে প্রাণাধিক,
নয়নের মণি নয়ন্ তারায়।"

এত বলি তবে অঞ্চলে আপন
মুছায়ে নাথের নয়ন নীর,
নয়নে নয়নে বৈঠল দুজনে,
প্রকৃতি রহিল ধীর সমীর।

এক দৃষ্টে দুঁহে দুঁহেতে তন্ময়,
আত্মসাৎ একি চমতকার
আপন স্বরূপ হরি হরি বোল,
নিরখে বদনে দুঁহে দুঁহার।

দেখিতে দেখিতে উভয়ে বিভোর,
এ দিকে যামিনী প্রভাতা হয়,
"কে প্রাণাধিক লুকাও প্রতিমা !"
কহিলা কামিনী শেষ সময়।

সোণার প্রতিমা লুটায়ে পড়িল,
চোখের প্রতিমা গেল না তায়,
প্রাণাধিক ছবি প্রাণের প্রতিমা,
নয়নের পটে রহিল হায় !

কাতর ব্রাহ্মণ ছাড়িলা নিশ্বাস,
বলে "প্রাণাধিকে জিনিলে পণ !"
সুদূরে দামিনী—হাসেন কামিনী,
পদ ধূলি চাহি সীমন্তে লন।

অরুণ উদয়ে ব্রাহ্মণ তনয়,
প্রবোধ প্রশান্তে মুরতি ধরি,
অনুরাগে নাম শুনাইল কাণে,
প্রাণ প্রতিমায় পরাণ ভরি।

বিধিমতে তার করিল সৎকার,
পরমা পবিত্রা জাহ্নবী কূলে,
আপনি সেখানে সাধিলা সমাধি,
দুরন্ত মাটির সংসার ভুলে।

সে সমধি ভূমে তমাল তলায়,
আলোকে আঁধারে দেখে পথিক,
ছায়ার কায়ায় সারঙ্গে বাজায়,
"দেখ দেখ কার কে প্রাণাধিক ?"

শারীরিক বৃত্তি।

গুরু। শারীরিক বৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তিতে যে সুখ আছে, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে এ সকলের কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না।

শিষ্য। তাহার কারণ বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম্ম কেহ বলে না।

গুরু। কোন কোন ইউরোপীয় অনুশীলনবাদী বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম্ম বা ধর্ম্মস্থানীয় কোন একটা জিনিস বিবেচনা করেন, কিন্তু তাঁহারা এমন কথা বলেন না, যে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়। †

শিষ্য। আপনি কেন বলেন?

গুরু। যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম্ম হয়, তবে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনও অবশ্য ধর্ম্ম। কিন্তু সে কথা না হয়, ছাড়িয়া দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিবে যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। যদি যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম্ম বল; যদি দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকারকে ধর্ম্ম বল; যদি কেবল দেবতার উপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম্ম বল; না হয় খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্‌লাম ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বল, সকল ধর্ম্মের জন্যই শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। ইহা কোন ধর্ম্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্তু সকল ধর্ম্মের বিঘ্ননাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন। এই কথাটা কখনও কোন ধর্ম্মবেত্তা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু এখন এ দেশে সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

শিষ্য। ধর্ম্মের বিঘ্ন বা কিরূপ, এবং শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনে কিরূপে তাহার বিনাশ, ইহা বুঝাইয়া দিন।

---

* অনুশীলন তত্ত্ব সম্পূর্ণ হইয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রাঙ্কন জন্য প্রস্তুত আছে। ইহার যে সকল অংশ নবজীবনে প্রকাশিত হয় নাই, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধীয় এই অধ্যায় তাহার একাংশ। গ্রন্থের মধ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া নবজীবনে ইহা দেওয়া গেল বলিয়া প্রথমটা একটু অসংলগ্ন বোধ হইতে পারে।

† Herbert Spencer বলেন।

গুরু। প্রথম ধর, রোগ। রোগ ধর্ম্মের বিঘ্ন। যে গোঁড়া হিন্দু রোগে পড়িয়া আছে, সে যাগযজ্ঞ, ব্রত নিয়ম তীর্থদর্শন, কিছুই করিতে পারে না। যে গোঁড়া হিন্দু নয়, কিন্তু পরোপকার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম বলিয়া মানে, রোগ তাহারও ধর্ম্মের বিঘ্ন। রোগে যে নিজে অপটু, সে কাহার কি কার্য্য করিবে? যাহার বিবেচনায় ধর্ম্মের জন্য এ সকল কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম্ম, রোগ তাহারও ধর্ম্মের বিঘ্ন। কেন না রোগের যন্ত্রণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় না; অন্ততঃ একাগ্রতা থাকে না; কেন না চিত্তকে শারীরিক যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে। রোগ কর্ম্মীর কর্ম্মের বিঘ্ন, যোগীর যোগের বিঘ্ন, ভক্তের ভক্তির সাধনের বিঘ্ন। রোগ ধর্ম্মের পরম বিঘ্ন।

এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না, যে শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের অভাবই প্রধানতঃ রোগের কারণ।

শিষ্য। মনে করুন, হিম লাগানতে পীড়া হয়। তাহাও কি অনুশীলনের অভাব?

গুরু। ত্বগিন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের ব্যাঘাত। শারীরতত্ত্ব বিদ্যাতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার থাকিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। তবে দেখিতেছি যে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলন না হইলে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন হয় না।

গুরু। না, তা হয় না। সমস্ত বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন পরস্পরের অনুশীলনের সাপেক্ষ। কেবল শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির সাপেক্ষ, এমত নহে। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিও তৎসাপেক্ষ। কোন কার্য্য কি উপায়ে করা উচিত, কোন বৃত্তির কিসে অনুশীলন হইবে, কিসে অনুশীলনের অবরোধ হইবে, ইহা জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। জ্ঞান ভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

শিষ্য। এখন থাকিলে চলিবে না। যদি বৃত্তিগুলির অনুশীলন পরস্পর সাপেক্ষ, তবে কোন্‌গুলির অনুশীলন আগে আরম্ভ করিব?

গুরু। সকল গুলিরই যথাসাধ্য অনুশীলন এককালেই আরম্ভ করিতে হইবে; অর্থাৎ শৈশবে।

শিষ্য। আশ্চর্য্য কথা! শৈশবে আমি জানি না, যে কি প্রকারে কোন

বৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে। তবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব ?

গুরু। এই জন্য শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক। শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না। সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। কেবল শৈশবে কেন, চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন। এই জন্য হিন্দুধর্ম্মে গুরুর এত মান। আর,—গুরু নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না। ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের কথায় এ কথা বলিয়াছি। এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহা বলি।

(২) বৃত্তি সকলের এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষতা হইতে শারীরিকী বৃত্তি অনুশীলনের দ্বিতীয় প্রয়োজন, অথবা ধর্ম্মের দ্বিতীয় বিঘ্নের কথা পাওয়া যায়। যদি অন্যান্য বৃত্তিগুলি শারীরিক বৃত্তির সাপেক্ষ হইল, তবে জ্ঞানার্জ্জনী প্রভৃতি বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের জন্য শারীরিকী বৃত্তি সকলের সম্যক্ অনুশীলন চাই। বাস্তবিক, ইহা প্রসিদ্ধ যে শারীরিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট না থাকিলে মানসিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, অথবা অসম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন. মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা শরীর ও মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষণে যে কালেজি শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে ইহাতে শিক্ষার্থীদিগের শারীরিক স্ফূর্ত্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না, এজন্য কেবল শারীরিক নহে, অকালে মানসিক অধঃপতনও উপস্থিত হয়। ধর্ম্ম মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে, কাজে কাজেই ধর্ম্মেরও অধোগতি ঘটে।

(৩) কিন্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ত্ব, বা তৃতীয় বিঘ্ন আরও গুরুতর। যাহার শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ কোথায় ? সকলেরই শত্রু আছে। দস্যু আছে। ইহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণের বিঘ্ন করে। তদ্ভিন্ন অনেক সময়ে যে বলে শত্রুদমন করিতে না পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধর্ম্ম অবলম্বন করে। আত্মরক্ষা এমন অলঙ্ঘনীয় যে পরম ধার্ম্মিক ও এমন অবস্থায় অধর্ম্ম অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে পারে না। মহাভারতকার, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" ইতি উপন্যাসে ইহার উত্তম উদাহরণ কল্পনা করিয়াছেন।

বলে দ্রোণাচার্য্যকে পরাভব করিতে অক্ষম হইয়া যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পরম ধার্ম্মিকও মিথ্যা প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শিষ্য। প্রাচীন কালের পক্ষে এ সকল কথা খাটিলে খাটিতে পারে, কিন্তু এখনকার সভ্য সমাজে রাজাই সকলের রক্ষা করেন। এখন কি আত্ম-রক্ষায় সকলের সক্ষম হওয়া তাদৃশ প্রয়োজনীয়?

গুরু। রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন, এইটা আইন বটে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না। রাজা সকলকে রক্ষা করিয়া উঠিতে পারে না। পারিলে এত খুন, জখম, চুরি ডাকাতি, দাঙ্গা, মারামারি প্রত্যহ ঘটিত না। পুলিষের বিজ্ঞাপন সকল পড়িলে জানিতে পারিবে, যে যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল অত্যাচার ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আগু হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল আপনার শরীর বা সম্পত্তি রক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, ইহাও তোমার বুঝা কর্ত্তব্য। যখন তোমাকে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের অবশিষ্ট কথা বলিব, তখন বুঝিবে যেমন আত্মরক্ষা আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম, আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার স্বজন কুটুম্ব প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও তাদৃশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। যে ইহা করে না, সে পরম অধার্ম্মিক। অতএব যাহার, তদুপযোগী বল বা শারীরিক শিক্ষা হয় নাই, সেও অধার্ম্মিক।

(৪) আত্মরক্ষা, বা স্বজনরক্ষার এই কথা হইতে ধর্ম্মের চতুর্থ বিঘ্নের কথা উঠিতেছে। এই তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুতর; ধর্ম্মের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই ধর্ম্মের জন্য, প্রাণ পর্য্যন্ত, প্রাণ কি, সর্ব্বসুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্বদেশরক্ষার কথা বলিতেছি।

যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম্ম। সমাজস্থ এক এক ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্তির সর্ব্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক সমাজ বা দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধর্ম্মের শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজশাসন নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে যার পাবে, সে তার কাড়িয়া খায়। তেমনি, বিবিধ সমাজের উপর কেহ একজন রাজা না থাকাতে, যে সমাজ বলবান, সে দুর্ব্বল সমাজের কাড়িয়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা বলিতেছি না, সভ্য ইউরোপের এই প্রচলিত রীতি। আজ ফ্রান্স জর্ম্মানির কাড়িয়া খাইতেছে,

কাল জর্ম্মানি ফ্রান্সের কাড়িয়া খাইতেছে; আজ তুর্ক গ্রীসের কাড়িয়া খায়, কাল রুস তুর্কের কাড়িয়া খায়। আজ Rhenish Frontier, কাল পোলণ্ড, পরশু বুল্‌গেরিয়া, আজ মিশর, কাল টঙ্কুইন—এই সকল লইয়া ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ কুকুরের মত হুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি করিয়া থাকেন। যেমন হাটের কুকুরেরা যে যার পায় সে তার কাড়িয়া খায়, কি সভ্য কি অসভ্যজাতি তেমনি পরের পাইলেই কাড়িয়া খায়। দুর্ব্বল সমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্ব্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম্ম। বরং আরও গুরুতর ধর্ম্ম, কেন না এস্থলে আপন ও পর, উভয়ের রক্ষার কথা।

সামাজিক কতকগুলি অবস্থা ধর্ম্মের উপযোগী আর কতকগুলি অনুপযোগী। কতকগুলি অবস্থা সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির অনুকূল। আবার কোন কোন সামাজিক অবস্থা কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির প্রতিকূল। অধিকাংশ সময়ে এই প্রতিকূলতা রাজা বা রাজপুরুষ হইতেই ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায়, প্রটেষ্টাণ্টদিগকে রাজা পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ, ঔরঙ্গজেবের হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষ আর একটি। সমাজের যে অবস্থা ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি। লিবর্টি শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ধর্ম্মোন্নতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন তাহা সকলেরই কর্ত্তব্য।

শিষ্য। অর্থাৎ সকলেরই যোদ্ধা হওয়া চাই?

গুরু। তাহার অর্থ এমন নহে যে সকলকে যুদ্ধ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু সকলের প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকেই যুদ্ধব্যবসায়ী হইতে হয়, নহিলে সেনাসংখ্যা এত অল্প হয়, যে বৃহৎ রাজ্য সে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রীকনগরী সকলে সকলকেই এই জন্য যুদ্ধ করিতে হইত।

বৃহৎ রাজ্যে বা সমাজে, যুদ্ধ, শ্রেণীবিশেষের কাজ বলিয়া নির্দিষ্ট থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়, এবং মাধ্যকালিক ভারতবর্ষের রাজপুতেরা ইহার উদাহরণ। কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকারী কর্তৃক বিজিত হইলে, দেশের আর রক্ষা থাকে না। ভারতবর্ষের রাজপুতেরা পরাভূত হইবামাত্র, ভারতবর্ষ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু রাজপুত ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য জাতি সকল যদি যুদ্ধে সক্ষম হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সে দুর্দ্দশা হইত না। ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অস্ত্রধারণ করিয়া সমবেত ইউরোপকে পরাভূত করিয়াছিল। যদি তাহা না করিত, তবে ফ্রান্সের বড় দুর্দ্দশা হইত।

শিষ্য। কি প্রকার শারীরিক অনুশীলনের দ্বারা এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে?

গুরু। কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনকার দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির পরিপুষ্টির জন্য ব্যায়াম চাই। এদেশে, ডন, কুস্তী, মুগুর, প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ইংরেজি সভ্যতা শিখিতে গিয়া আমরা কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের বর্ত্তমান বুদ্ধিবিপর্য্যয়ের ইহা একটি উদাহরণ।

দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ অস্ত্রশিক্ষা। সকলেরই সর্ব্ববিধ অস্ত্র প্রয়োগে সক্ষম হওয়া উচিত।

শিষ্য। কিন্তু এখনকার আইন অনুসারে আমাদের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ।

গুরু। সেটা একটা আইনের ভুল। আমরা মহারাণীর রাজভক্ত প্রজা, আমরা অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিব ইহাই বাঞ্ছনীয়। আইনের ভুল পশ্চাৎ সংশোধিত হইতে পারে।

তারপর তৃতীয়তঃ অস্ত্রশিক্ষা ভিন্ন আর কতকগুলি শারীরিক শিক্ষা শারীরিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণতা জন্য প্রয়োজনীয়। যথা অশ্বারোহণ। ইউরোপে যে অশ্বারোহণ করিতে পারে না এবং যাহার অস্ত্রশিক্ষা নাই, সে সমাজের উপহাসাস্পদ। বিলাতী স্ত্রীলোকদিগেরও এ সকল শক্তি হইয়া থাকে। আমাদের কি দুর্দ্দশা!

অশ্বারোহণ যেমন শারীরিক ধর্ম্মশিক্ষা, পদব্রজে দূরগমন এবং সন্তরণও তাদৃশ। যোদ্ধার পক্ষে ইহা নহিলেই নয়, কিন্তু কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়, এমন বিবেচনা করিও না। যে সাঁতার না জানে সে জল হইতে আপনার রক্ষায় ও পরের রক্ষায় অপটু। যুদ্ধে কেবল জল হইতে আত্মরক্ষা ও পরের রক্ষার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় এমন নহে, আক্রমণে, নিষ্ক্রমণে, ও পলায়ন জন্য অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন হয়। পদব্রজে দূরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা বলা বাহুল্য। মনুষ্য মাত্রের পক্ষেই ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। অতএব যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন করিবে, কেবল তাহার শরীর পুষ্ট ও বলশালী হইলেই হইবে না। সে ব্যায়ামে সুপটু—

গুরু। এই ব্যায়াম মধ্যে মল্লযুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। ইহা বিশেষ বলকারক। আত্মরক্ষার ও পরোপকারের বিশেষ অনুকূল।*

শিষ্য। অতএব, চাই শরীরপুষ্টি, ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, অস্ত্রশিক্ষা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, পদব্রজে দূরগমন—

গুরু। আরও চাই সহিষ্ণুতা। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি সকলই সহ্য করিতে পারা চাই। ইহা ভিন্ন যুদ্ধার্থীর আরও চাই। প্রয়োজন হইলে মাটি কাটিতে পারিবে—ঘর বাঁধিতে পারিবে—মোট বহিতে পারিবে। অনেক সময়ে যুদ্ধার্থীকে দশ বারদিনের খাদ্য আপনার পিঠে বহিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। স্থূল কথা, যে কর্ম্মকার আপনার কর্ম্ম জানে সে যেমন অস্ত্রখানি তীক্ষ্ণধার ও শাণিত করিয়া, সকল দ্রব্য ছেদনের উপযোগী করে দেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে—যেন তদ্দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধ হয়।

শিষ্য। কি উপায়ে ইহা হইতে পারে ?

গুরু। ইহার উপায় (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহার, (৪) ইন্দ্রিয়সংযম। চারিটিই অনুশীলন।

শিষ্য। ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন শুনি-

---

* লেখক প্রণীত দেবী চৌধুরাণী নামক গ্রন্থে প্রফুল্লকুমারীকে অনুশীলনের উদাহরণ স্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে। এজন্য সে স্ত্রীলোক হইলেও তাহাকে মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে।

থাছি। কিন্তু আহার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা আছে। বাচস্পতি মহাশয় কাঁচকলা ভাতে ভাত খান। ততটুকু মাত্র আহার করাই কি ধর্ম্মানুমত? তাহার বেশী আহার কি অধর্ম্ম?

গুরু। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক কামনা করা অধর্ম্ম। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য কিরূপ আহার প্রয়োজনীয়, তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিবেন, ধর্ম্মোপদেষ্টার সে কাজ নহে। বোধ করি তাঁহারা বলিবেন যে কাঁচকলা ভাতে ভাত শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যথেষ্ট নহে। কেহ বা বলিতে পারেন, বাচস্পতির ন্যায়, যে ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়, তাহার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই—বৈজ্ঞানিকের কর্ম্ম বৈজ্ঞানিক করুক। আহার সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ—যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনির্গত—গীতা হইতে তাহাই তোমাকে শুনাইয়া আমি নিরস্ত হইব।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮।১৭॥

যে আহার আয়ুর্বৃদ্ধিকারক, উৎসাহবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকারক, স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকারক, সুখ বা চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধিকারক এবং রুচিবৃদ্ধিকারক, যাহা রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, যাহার সারাংশ দেহে থাকিয়া যায় (অর্থাৎ Nutritious) এবং যাহা দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই সাত্ত্বিকের প্রিয়।

শিষ্য। ইহাতে মদ্য, মাংস, মৎস্য বিহিত না নিষিদ্ধ হইল?

গুরু। তাহা বৈজ্ঞানিকের বিচার্য্য। শরীরতত্ত্ববিদ্ বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিও, যে ইহা আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতিবর্দ্ধন, ইত্যাদি গুণযুক্ত কি না।

শিষ্য। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ত এ সকল নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

গুরু। আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিকিৎসকের আসনে অবতরণ করা ধর্ম্মোপদেশকের বা ব্যবস্থাপকের উচিত নহে। তবে হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মদ্য, মাংস, মৎস্য নিষেধ করিয়া যে মন্দ করিয়াছেন, এমন বলিতেও পারি না। বরং অনুশীলনতত্ত্ব যে তাঁহাদের বিধি সকলের মূল ছিল, তাহা বুঝা যায়। মদ্য যে অনিষ্টকারী, অনুশীলনের হানিকর, এবং যাহারেই তুমি ধর্ম্ম বল, তাহারই বিঘ্নকর, একথা বোধ করি তোমাকে কষ্ট পাইয়া

বুঝাইতে হইবে না। মদ্য নিষেধ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ভালই করিয়াছেন।

শিষ্য। কোন অবস্থাতেই কি মদ্য ব্যবহার্য্য নহে?

গুরু। যে পীড়িত ব্যক্তির পীড়া মদ্য ভিন্ন উপশমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। শীতপ্রধানদেশে, বা অন্যদেশে শৈত্যাধিক্য নিবারণ জন্য ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদকালে ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ বিধিও চিকিৎসকের নিকট হইতে লইবে—ধর্ম্মোপদেষ্টার নিকট নহে। কিন্তু একটি এমন অবস্থা আছে, যে সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের কথার অপেক্ষা বা কাহারও বিধির অপেক্ষা না করিয়া পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার।

শিষ্য। এমন কি অবস্থা আছে?

গুরু। যুদ্ধ। যুদ্ধকালে মদ্য সেবন করা ধর্ম্মানুমত বটে। তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তিতে যুদ্ধে জয় ঘটে, পরিমিত মদ্য সেবনে সে সকলের বিশেষস্ফূর্ত্তি জন্মে। এ কথা হিন্দুধর্ম্মের অননুমোদিত নহে। মহাভারতে আছে যে জয়দ্রথ বধের দিন, অর্জ্জুন একাকী ব্যূহ ভেদ করিয়া শত্রু সেনা মধ্যে প্রবেশ করিলে, যুধিষ্ঠির সমস্ত দিন তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সাত্যকি ভিন্ন আর কেহই এমন বীর ছিল না, যে ব্যূহভেদ করিয়া তাহার অনুসন্ধানে যায়। এ দুষ্কর কার্য্যে যাইতে যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে অনুমতি করিলেন। তদুত্তরে সাত্যকি উত্তম মদ্য চাহিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মদ্য দিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে পড়া যায়, যে স্বয়ং কালিকা অসুর বধকালে সুরাপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে চিন্‌হটের যুদ্ধে ইংরেজসেনা হিন্দু মুসলমান কর্ত্তৃক পরাভূত হয়। স্বয়ং Sir Henry Lawrence সে যুদ্ধে ইংরেজ সেনার নায়ক ছিলেন, তথাপি ইংরেজের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইংরেজ ইতিহাস লেখক সর জন কে ইহার একটি কারণ এই নির্দ্দেশ করেন যে ইংরেজসেনা সে দিন মদ্য পায় নাই। অসম্ভব নহে।

যাই হৌক, মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই যে (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার, (২) পীড়াদিতে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে সেবন করিতে পার, (৩) অন্য কোন সময় সেবন করা অবিধেয়।

শিষ্য। মৎস্য মাংস সম্বন্ধে আপনার কি মত?

গুরু। মৎস্য মাংস শরীরের অনিষ্টকারী এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বরং উপকারী হইতে পারে। কিন্তু সে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে। ধর্ম্মবেত্তার বক্তব্য এই যে মৎস মাংস, প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কিয়ৎ পরিমাণে বিরোধী। সর্ব্বভূতে প্রীতি হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব। অনুশীলন তত্ত্বেও তাই। অনুশীলন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্নিহিত—ভিন্ন নহে। এই জন্যই বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। মৎস্য মাংস বর্জ্জিত করিলে শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি বোধ হয় কি না? এ কথা বিজ্ঞানবিদের বিচার্য্য। কিন্তু যদি বিজ্ঞান শাস্ত্র বলে যে, সমুচিত স্ফূর্ত্তি বোধ হয় বটে তাহা হইলে প্রীতিবৃত্তির অনুচিত সম্প্রসারণ ঘটিল, সামঞ্জস্য বিনষ্ট হইল। এমত অবস্থায় মৎস্য মাংস ব্যবহার্য্য। কথাটা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ধর্ম্মোপদেষ্টার বৈজ্ঞানিকের আসন গ্রহণ করা উচিত নহে, পূর্ব্বে বলিয়াছি।

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে, (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, এবং (৩) আহারের কথা বলিলাম এক্ষণে (৪) ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধে একটা কথা বলা আবশ্যক। শারীরিক বৃত্তির সদনুশীলন জন্য ইন্দ্রিয় সংযম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করি বুঝাইতে হইবে না। ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে না, শিক্ষা নিষ্ফল হয়, আহার বৃথা হয়, তাহার পরিপাকও হয় না। আর ইন্দ্রিয়ের সংযমই যে ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত অনুশীলন, ইহাও তোমাকে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে স্মরণ করিতে বলি যে ইন্দ্রিয় সংযম মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন; মানসিক শক্তি ভিন্ন ইহা ঘটে না। অতএব যেমন ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছ, যে মানসিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনের উপর নির্ভর করে, তেমনি এখন দেখিতেছ যে শারীরিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন আবার মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট, একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের অভাব ঘটে। অতএব যে সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত, তাঁহাদের কথিত ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জ্জন, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয় না। এবং কতকগুলা

বহি পড়িলে পণ্ডিত হয় না। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এই কথাটা বড় অনিষ্টকারী হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

‘ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের কথা।’

কলিকাতার ৩ ক্রোশ উত্তর গঙ্গার পশ্চিম পারে উত্তরপাড়া। উত্তরপাড়া একটি প্রসিদ্ধ স্থান, বঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাসস্থান। উত্তরপাড়ার হিতকরী সভার কথা সকলেই শুনিয়াছেন এবং উক্ত সভার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বোম্বাই আঁবের যে গুণাগুণ বিচার হয়, তাহা বোধ হয় কেহ কখনও ভুলিতে পারিবেন না। উত্তর পাড়ায় একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আছে, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, একটি উত্তম বাজার আছে, মিউনিসিপালিটি আছে। আর আছে—একটি উৎকৃষ্ট পুস্তকালয়। সভ্যতার উপকরণের মধ্যে নাই কেবল আদালত। কিন্তু না থাকিয়াও উত্তরপাড়ায় যেরূপ মামলা মোকদ্দমা, থাকিলে যে কি হইত, বলে কার সাধ্য?

মধ্যে একদিন উত্তরপাড়ায় গিয়াছিলাম। দুই একজন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আর তথাকার পুস্তকালয়টি দর্শন করিয়াছিলাম। পুস্তকালয়ে ভারতসম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক পুস্তিকা ও কাগজপত্র আছে। দেখিতে দেখিতে তাহার মধ্যে একখানি অপূর্ব্ব পুস্তিকা পাইলাম। পুস্তিকাখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়—প্রায় দেড়শত পৃষ্ঠা—নাম, সুধাবিন্দুসংগ্রহ। উহাতে তিনটি প্রবন্ধ দেখিলাম—একটি বর্গীয় হাঙ্গামার কথা, একটি বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের কথা, একটি ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের কথা। শেষের কথাটি সংক্ষেপে বলিতেছি।

সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ কোলব্রুক সাহেব জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে বড় ভাল বাসিতেন। একদা তিনি তর্কপঞ্চাননের ত্রিবেণীর বাটীতে গিয়াছিলেন। জগন্নাথ তাঁহাকে দেশীয় রীতিতে আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার জন্য একখানি কাষ্ঠাসন বা পীড়া প্রদান করিলেন। সাহেব কোন রকম অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া, তদুপরি উপবেশন করিলেন। তখন তর্কপঞ্চানন এক ছিলিম তামাক সাজিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং এক টুকরা জ্বলন্ত অঙ্গার সাহেবের নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"সাহেব চুরট খাও, কিন্তু দেখিও যেন ধোঁয়া আমার গায় লাগে না।" সাহেব চুরট ধরাইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন।

ধূম পান করিতে করিতে দুই জনে নানা কথা কহিতে লাগিলেন—দায় ভাগাদির কথাই বেশি। কোলব্রুক তখন দায়ভাগ অনুবাদ করিতেছিলেন। সেই জন্যই বোধ হয় জগন্নাথের বাটীতে গিয়া দায়ভাগের কথাটাই বেশী কহিতেছিলেন।*

প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এইরূপ কথাবার্তার পর তর্কপঞ্চানন সাহেবকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন। জলযোগের সামগ্রীর মধ্যে ফলের ভাগই বেশী—ফুটি, তরমুজ, পেঁপে, আম, কাঁটাল, রম্ভা এবং বড় একবাটি দুগ্ধ। সাহেব দুগ্ধ বেশী খাইলেন না, রম্ভা যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহা খাইয়া আরো গোটাকতক চাহিয়া লইয়া খাইলেন। রম্ভার কথায় তর্কপঞ্চানন দুই একটা পরিহাস করিলেন, সাহেব শুনিয়া খুব হাসিলেন।

জলযোগের পর আবার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, সাহেব সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। কিন্তু সংস্কৃতে ইতিহাস নাই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। তর্কপঞ্চানন যেন বিস্মিত ও চমকিত হইয়া বলিলেন—"সে কি সাহেব, ইতিহাস নাই কি?"

সাহেব। কই, ইতিহাস কি আছে?

তর্ক। কেন, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি কি? ও গুলি কি ইতিহাস নয়!

সা। ওগুলি ইতিহাস নয়। রামায়ণ মহাভারত কাব্য, পুরাণগুলি উপন্যাস।

---

* এ কথাটা পুস্তিকায় নাই, আমাদের অনুমান মাত্র।

তর্ক। হ'লই বা কাব্য, হ'লই বা উপন্যাস—কাব্য বা উপন্যাস হইলে কি ইতিহাস হইতে পারে না ?

সা। কেমন করিয়া ইতিহাস হইতে পারে? ইতিহাসে কেবল প্রকৃত ঘটনার কথা থাকে। পুরাণাদিতে তাহা নাই।

তর্ক। ধরিলাম, নাই—ধরিলাম, পুরাণাদিতে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ নাই। কিন্তু পুরাণাদি সে জন্য ইতিহাস বলিয়া আখ্যাত হইতে পারিবে না কেন? পুরাণাদিতে যে সকল রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থনীতি প্রভৃতির বিবরণ আছে তাহা যদি প্রকৃত ঘটনা দেখিয়া লিখিত হইয়া থাকে তবে পুরাণাদি ইতিহাস বলিয়া গণ্য না হইবে কেন? গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া কি প্রকারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিলে কিরূপ ফলাফল হয়, জাতিতে জাতিতে কি প্রকার সম্বন্ধ হইলে কি প্রকার ফলাফল হয়, রাজা কি প্রকারে রাজকার্য্য করিলে কি প্রকার ফলাফল হয়, ইত্যাদি মানবজীবন ঘটিত ও সমাজ সম্বন্ধীয় বহুবিধ তথ্য—প্রকৃত মানবজীবন, প্রকৃত মানবসমাজ ও প্রকৃত রাজকার্য্য দেখিয়া নির্ণয় করা যায়। নির্ণয় করিয়া যদি কল্পিত ঘটনাদি অবলম্বন করিয়াও তাহা বিবৃত করা হয়, তাহা হইলে, সে বিবরণ মানবের ইতিহাস বলিয়া গণ্য না হইবে কেন? এই যে হিতোপদেশ গ্রন্থে এত নীতি কথা আছে। পশু পক্ষীর গল্পের ছলে সে সকল কথা লিখিত আছে বলিয়া হিতোপদেশ খানিকে নীতি গ্রন্থ না বলিয়া উপন্যাস বলিতে হইবে কি? ভগবান বেদব্যাসও তেমনি বহুকাল ধরিয়া বহুলোকের জীবন, বহুবিধ মনুষ্য সমাজ ও নানা রাজ্যের রাজকার্য্য দেখিয়া মানবজীবন, সমাজ ও রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় নানা তথ্য অবগত হইয়া, পুরাণে সেই সকলের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ধরিলাম, কল্পিত ঘটনাদি অবলম্বন করিয়াই তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তজ্জন্য পুরাণগুলি ইতিহাস না হইয়া উপন্যাস বা উপকথা হইবে কেন? এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি যে বলিলে, পুরাণাদিতে প্রকৃত ঘটনার কথা নাই। তুমি কেমন করিয়া জানিলে, নাই?

রামরাবণের যুদ্ধের কথা, কুরুক্ষেত্রের কথা, হরিশচন্দ্রের কথা,—এসব যে উপকথা বা অলীক কথা, কেমন করিয়া জানিলে?

সা। আচ্ছা, এই রামায়ণের যুদ্ধের কথাটা ধর। রাম বানর ভল্লুকের সাহায্যে রাবণ বধ করিয়াছিলেন, ইহা কি প্রকৃত কথা বলিয়া বিশ্বাস করা যায়?

তর্ক। কেন, সাহেব, কলিকাতায় তোমাদের জাহাজের যে সব গোরা দেখিয়াছি, তাহাদিগকে বানর বলিলে কি বড় একটা মিথ্যা কথা বলা হয়?

সা। (হাসিয়া) না, তা হয় না, সত্য। বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতিতে তাহারা বানরবৎই বটে।

তর্ক। কিন্তু তাহাদের সাহায্যেইত তোমরা জাহাজে চড়িয়া মহাসাগর পার হইয়া আসিতেছ। তবে আর বানরের সাহায্যে একটা রাজাকে পরাজয় করা এমন কি অসম্ভব বা অসঙ্গত কথা?

সা। সে যাহা হউক, কিন্তু পুরাণাদিতে ত প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হয় নাই, তবে—

তর্ক। আবার ঐ কথা? কেমন করিয়া জানিলে প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হয় নাই—প্রমাণ কই?

সা। আচ্ছা, ও কথাটা ছাড়িয়া দিন। পুরাণাদি যে ইতিহাসের লক্ষণাক্রান্ত নয়, তাহাত অস্বীকার করিতে পারেন না।

তর্ক। কেন ইতিহাসের লক্ষণ কি?

সা। ইতিহাসের প্রধান লক্ষণ এই যে উহাতে অলীক বা কাল্পনিক কথা থাকে না, কেবল প্রকৃত ঘটনার কথা থাকে।

তর্ক। এইত ও কথা ছাড়িয়াদিলে, আবার তুলিতেছ কেন?

সা। তুলিতেছি তাহার কারণ এই যে, ইতিহাসের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, অগ্রে ঐ লক্ষণটি নির্দ্দেশ করিতে হয়।

তর্ক। কিন্তু বুঝিলে ত, যে, ও লক্ষণ পুরাণাদিতে নাই এমন নয়।

সা। তা বটে, কিন্তু একটা কথা আছে। প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হইলেই যে ইতিহাস হয়, তা নয়। ইতিহাসের বর্ণনার একটি লক্ষণ আছে, সেই লক্ষণের অভাবেও ইতিহাসের অভাব হয়।

তর্ক। সে লক্ষণটি কি?

সা। সকল জিনিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ।

তর্ক। সে কেমন?

সা। একটি উদাহরণ দিয়া না বুঝাইলে সহজে বুঝিতে পারিবেন না।

তর্ক। উদাহরণ দিয়াই বুঝাও।

সা। এই রামায়ণের কথাই ধরুণ। রামায়ণ—রাজা রামচন্দ্রের কথা। কোন লোকের কথা কহিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার জন্ম স্থানের পরিচয়

দিতে হয়। কিন্তু রামের জন্মস্থান অযোধ্যা সম্বন্ধে রামায়ণে বিশেষ কিছুই লিখিত নাই। উহা যে দেশে অবস্থিত তাহার চৌহদ্দি লিখিত নাই, যে জেলায় অবস্থিত তাহার নাম কি চৌহদ্দি কিছুই লিখিত নাই, উহার ল্যাটিটুড্ লঙ্গিটুড্ লিখিত নাই, রামের জন্মের পূর্ব্বে উহা কখন্ কোন নামে খ্যাত ছিল ইত্যাদি অসংখ্য কথার কোন কথাই লিখিত নাই। তবে কেমন করিয়া বলি যে রামায়ণ ইতিহাসের লক্ষণাক্রান্ত।

তর্ক। আচ্ছা, আরো একটু বল, লাগ্‌ছে ভাল।

সা। রামায়ণে রামের জন্মেরও কোন বর্ণনা নাই বলিলেই হয়। রামায়ণ যদি ইতিহাস হইত, তাহা হইলে উহাতে রামের জন্মের এই রকম একটা বিবরণ থাকিত—অমুক সনের অমুক মাসের অমুখ তারিখ দিবসে বেলা ৮ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ১৯ সেকেণ্ডের সময় রামের জন্ম হয়। কোন কোন ইতিহাসে বলে, ১৯ সেকেণ্ডের সময় নয়, ১৯½ সেকেণ্ডের সময়। কিন্তু অপর সমস্ত কাজ ফেলিয়া, এমন কি আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত এক রকম ত্যাগ করিয়া রাজবাটীর খাস সেরেস্তায় ক্রমাগত সাড়ে চারি বৎসর অনুসন্ধান করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে রামের জন্ম ১৯½ সেকেণ্ডের সময় হয় নাই, ঠিক ১৯ সেকেণ্ডের সময় হইয়াছিল। যাঁহারা বলেন ১৯½ সেকেণ্ডের সময় রামের জন্ম হইয়াছিল, তাঁহারা ভয়ানক ভ্রম করিয়াছেন এবং ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহারা আর একটি বিষম ভুল করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যে সূতিকাগারে রামের জন্ম হয়, তাহা ৭ হাত দীর্ঘ, ৪ হাত প্রস্থ ও ৫ হাত উচ্চ। আমরা কিন্তু এবিষয়ের সত্যাসত্য নিরূপণ করা অতিশয় প্রয়োজনীয় জানিয়া বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি। যে ঘরামি সূতিকাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিল রাজবাটীর হিসাব সেরেস্তায় তাহার নাম ধাম জানিয়া লইয়া আমরা প্রথমে অযোধ্যার ঘরামি পল্লীতে তাহার অনুসন্ধান করি। দশ পনর দিন অনুসন্ধানের পর অবগত হইলাম যে সে ঘরামি অযোধ্যাবাসী নয়, সে রামের জন্মের কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া ঐ সূতিকাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া আবার স্বদেশে চলিয়া গিয়াছে। এরূপ গুরুতর বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমরা দুই তিন মাসের পথ অতিক্রম করিয়া বঙ্গে উপনীত হইলাম। এবং অনেক অনুসন্ধানের পর ঘরামির গ্রামে উপস্থিত হইলাম। ঘরামিকে সূতিকাগারের দৈর্ঘ্যাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে

বলিতে পারিল না, বলিল—আমার মনে নাই। তখন ভাবিলাম, এত পরিশ্রম ও অনুসন্ধান বৃথা হইতেছে। সেটা কিন্তু ভাল নয়। এ রকম অনুসন্ধান বৃথা হইলে কাহারো ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইতে প্রবৃত্তি হইবে না। তাহা হইলে ইতিহাসের সমূহ ক্ষতি হইবে। অতএব সূতিকাগারের পূর্ব্ব বর্ণনা ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেই হইতেছে। ভ্রান্ত যে নয়, তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যায়।

অযোধ্যার পাটরাণীর সূতিকাগার দৈর্ঘ্য ৭ হাত, প্রস্থে ৪ হাত ও উর্দ্ধে ৫ হাত বই নয়, এমন কি হইতে পারে? সে সূতিকাগার নিশ্চয়ই দৈর্ঘ্যে ২৭ হাত, প্রস্থে ৪০ হাত এবং উর্দ্ধে ৫০০ হাত।

রাম ভূমিষ্ঠ হইলে পর কৌশল্যার প্রধানা পরিচারিকা বাবী খাস দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিল। তখন বেলা ১০ ঘণ্টা ১১ মিনিট ২২ সেকেণ্ড।

তখন খাস দরবারে প্রধান মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ, ৭ জন সভাসদ, ৬ জন চোপদার, ৪ জন খানসামা, ২ জন মুৎসুদ্দী, ৮ জন দপ্তর লেখক, ৪ জন পত্র বাহক এবং ১২ জন প্রহরী উপস্থিত ছিল। সংবাদ পাইবা মাত্র রাজা পুত্র দর্শনার্থ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন। সে সিংহাসন স্বর্ণনির্মিত, দেড় কোটী আড়াই লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা মূল্যের মণি মুক্তা খচিত এবং ওজনে ১ মন ৩৫ সের ৩ পোয়া ২৫০ ছটাক। সিংহাসন হইতে নামিয়া তিনি প্রধানামাত্য, সভাসদগণ, ২ জন খানসামা ও ৪ জন প্রহরীকে তাঁহার সঙ্গে আসিতে অনুমতি করিলেন এবং আপন কণ্ঠহার খুলিয়া বাবীকে তাহা পারিতোষিক প্রদান করিলেন। সে কণ্ঠহারের মূল্য ৭৫লক্ষ ১১ হাজার ৫১ ৭½ স্বর্ণ মুদ্রা। রাজা দশরথ তখন আহ্লাদে এতই বিহ্বল যে বাঁ পায়ের জুতা ডান পায়ে এবং ডান পায়ের জুতা বাঁ পায়ে দিয়াই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এই অত্যাবশ্যক কথাটি অন্য কোন ইতিহাসে লিখিত হয় নাই। এবং সেই জন্য সে সকল ইতিহাস এক কালে অসার, অপদার্থ ও গৌরবহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ক্রমাগত পঁচিশ বৎসর অনুসন্ধান করিয়া এই মহামূল্য কথাটি অবগত হইয়া ইতিহাসের ঐতিহাসিকত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছি।

রাজা সূতিকাগারের দ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র পুরবাসিনীরা শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন প্রধানা ধাত্রী নবজাত শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। প্রধানা ধাত্রীর নাম যোশি, তাহার বয়স

৬৩ বৎসর ৭ মাস ১২½ দিন। সে গৌরবর্ণা ও কৃশাঙ্গী। তাহার বাম হস্তে ৬টি অঙ্গুলি এবং দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখটি খুব বড়। রাজার সম্মুখে আনিবামাত্র শিশু একবার হাঁচিয়া ফেলিল। সকলে 'দীর্ঘায়ু, দীর্ঘায়ু' বলিয়া উঠিলেন এবং রাজার অনুমতি পাইয়া কোষাধ্যক্ষ শিশুকে যৌতুক ও ধাত্রীদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। তদনন্তর রাজা বহির্বাটীতে গমন করিবেন বলিয়া বাহিরিলেন। কিন্তু তখনও তিনি আহ্লাদে এত আত্মহারা যে কৌশল্যার মহল দিয়া না আসিয়া কৈকেয়ীর মহল দিয়া আসিতে লাগিলেন। আসিতে আসিতে যখন কৈকেয়ীর কক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন হঠাৎ একজন পরিচারিকা কৈকেয়ীর গৃহাভ্যন্তর হইতে এক কুলা ছাই পথের বাহিরে ফেলিয়া দিল। সেই ছাই উড়িয়া রাজার চক্ষে পড়িল। 'আঁখ্ গিয়া, আঁখ্ গিয়া' বলিয়া রাজা বসিয়া পড়িলেন। প্রহরীরা তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কৈকেয়ীর পক্ষের ইতিহাস লেখকেরা বলিয়া থাকেন যে সেই অবধি রাজা অন্ধ হন। কিন্তু আমরা জানি, তা নয়—তাঁহারা ঘোর মিথ্যাকথা কহিয়াছেন। এবিষয়ে আমরা নিরপেক্ষ ভাবে বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াছি। অনুসন্ধানের ফল এই ইতিহাসের যথা স্থানে প্রকাশ করিব। তাহার পর—

তর্ক। আর বলিতে হইবে না। এই রকম করিয়া লিখিলেই ইতিহাস হয়?

সা। হাঁ।

তর্ক। বাল্মীকি যদি এই রকম করিয়া রামায়ণ লিখিতেন, তাহা হইলে রামায়ণ ইতিহাস আখ্যা পাইত?

সা। পাইত বই কি।

তর্ক। আচ্ছা, এরকম ইতিহাস তোমাদের কত আছে?

সা। সহস্র সহস্র—সংখ্যা হয় না।

তর্ক। তোমাদের মধ্যে ঐ সকল গ্রন্থের আদর কেমন?

সা। খুব আদর—এমন কি, আমাদের মধ্যে যে যত ইতিহাস পাঠ করে সে তত পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়।

তর্ক। তোমাদের টোলেও কি ঐ রকম ইতিহাস বেশি পঠিত হয়?

সা। আমাদের টোল নাই, ইস্কুল, কালেজ ও ইউনিবর্সিটি আছে। তথায় বালক দিগকে রাশিবাশি ইতিহাস পড়িতে হয়, নহিলে তাহাদিগের শিক্ষা নিতান্তই অঙ্গহীন হয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

তর্ক। সাহেব, তোমাদের ইতিহাস আর তোমাদের শিক্ষা লইয়া তোমরা থাক, আমাদের উপকথাই ভাল। এখন এস অন্য কথা কই।

শিশু মহারাজ।

ঝিমি ঝিমি নিশীথিনী, সাধে গলা বিষাদিনী,
লক্ষ ঝিল্লী তাহে সঙ্গেতে ঝঙ্কারে,
লক্ষ্য নাই কারু পাছে, বক্ষ পাতি পড়ি আছে,
গভীরা,গম্ভীরা,বিভোরা আঁধারে।
কোলেতে কালিন্দী কন্যা, কূলে কূলে বহে বন্যা,—
অন্ধ জননীর নন্দিনী আঁধার,
কেবল উজ্জ্বল ছটা,— কুন্তল সীমন্ত ঘটা,
হীরক কোরক তারক আকার।
গহন অটবী ঘন, বিশাল বিটপীগণ,—
প্রবলা বল্লরী ভারতে আচ্ছন্ন;
অন্ধকার স্তূপ মত রহিয়াছে ইতস্ততঃ,
শাখা কাণ্ড পত্র সমানে প্রচ্ছন্ন।
বিরাট বিটপী বট ঢেকেছে কালিন্দী তট,
মোটা মোটা জটা বিলম্বিত জলে,
যেন সেই বটতল, তামস আশ্রয়স্থল;
—ভয়ে ভয়ে ক্ষুদ্র খদ্যোতিকা জ্বলে।

অমোঘ পশ্চিমে মেঘ, অমোঘ বায়ুর বেগ,
দেখিতে দেখিতে ছাইল গগন।

কোথা সে নক্ষত্রকুঞ্জ, কুন্তলে হীরকপুঞ্জ ?
ঘোর অন্ধকারে বিশ্ব নিমগন।
না—না—খদ্যোতিকা আছে, ঝোপে ঝাপে গাছে গাছে,
সাজায়ে রেখেছে সুন্দর সজ্জায় ;
বাতাসে উড়ায়ে লয়, তথাপি জড়ায়ে রয়,
ক্ষুদ্রের পিরীতি মরিতে জুড়ায়।
শোঁও শোঁও সমীরণ হেলাইল মহাবন,
আতস ফুয়ারা খদ্যোত ছুটিল ;
কালিন্দীর কাল জলে, মজিতে মজিতে জ্বলে,
তরঙ্গ ভঙ্গেতে পরাণ তেজিল।
মরিল খদ্যোত পুঞ্জ, নিবিল তারকাকুঞ্জ,
গগন মেদিনী সব একাকার ;
জুড়িয়া জগত কায়া— ছায়া—ছায়া—মহাছায়া—
সব অন্ধকার—মহা অন্ধকার !

আসে বৃষ্টি তড় তড়, চলে বজ্র গড় গড়,
দামিনী দীপিছে ব্যোম জল স্থল,
বটতলে দৃশ্যমান— বালচ্ছবি লম্বমান্,
ঊর্দ্ধ করপুটে, বিভোর বিহ্বল।
ভয়েতে বিহ্বল নহে, অটল দাঁড়ায়ে রহে,
বায়ু বারি বজ্রে ভ্রূক্ষেপ করে না,
মাতৃ অঙ্কে শিশু যেন, সুপ্রফুল্ল ভাব হেন,
নড়ে না, চলে না, টলে না, সরে না।
সায়ম্ভুব মনুবংশে উত্তান পাদের অংশে,
ধ্রুব নামে শিশু, সুনীতি নন্দন,
পঞ্চম বর্ষের বেলা তেয়াগিয়া ধূলা খেলা,
কঠোর কঠিন তপস্যা মগন।
কি কোমল কম কান্তি ভক্তি ভরা পূর্ণ শান্তি !
উজ্জ্বলে মধুরে মোহন শোভন !

এক মনে, এক ধ্যানে, রুদ্ধশ্বাসে, শুদ্ধ প্রাণে,
ভাবে মাত্র পদ্ম-পলাশ-লোচন।

বাড়িল বায়ুর বড়, বহিল তুমুল ঝড়,
মড়মড় শব্দে শাখা ভাঙ্গি পড়ে,
বর্ষিছে মুষল ধারে, ইরম্মদ হুহুঙ্কারে,
ঘর্ঘর ঘর্ঘর কড়কড় করে।
পড়ে বজ্র শিশু পাশে,— মধুর অধরে হাসে;
ধীরে ধীরে শিশু মেলিল নয়ন,
দেখিল জ্যোতির স্তম্ভ— স্বর্গে মর্ত্ত্যে অবলম্ব,
বলে, 'এলে পদ্ম-পলাশ লোচন!'
ধ্রুব যায় দিতে কোল, থামিল দারুণ রোল,
নিমেষ ফেলিতে নিভিল জ্বলন;
হেরে শিশু চারি ধার, অন্ধকার। অন্ধকার!
বলে, 'গেলে পদ্ম-পলাশ লোচন।'
পুন ধ্রুব পরক্ষণে, একান্ত প্রশান্ত মনে,
ভক্তি-ভর-ভাবে, ভাবে নারায়ণে;
সুনীতি বলেছে যাহা, শুদ্ধ মাত্র ভাবে তাহা,
সেই এক পদ্ম-পলাশ-লোচনে।

হইতেছে ঝড় বৃষ্টি, নড়িছে ব্রহ্মার সৃষ্টি,
না নড়ে, না টলে, ধ্রুব ধ্রুবচিত;
চৌদিকে আঁধার ঘোর, অন্তরে উজ্জ্বল ভোর,
অঙ্গে মৃদু কান্তি হয় বিভাসিত।
ঘন ঘোর ভূকম্পনে, বজ্রপাতে ক্ষণে ক্ষণে,
গিরি গুহা ছাড়ি সিংহ বাহিরিল,
জ্বলিছে লোচন ছটা, ভিজিছে কেশর জটা,
লেলিহান জিহ্বা জ্বলিতে লাগিল।
গর্জ্জে বজ্র মহা ঘোষে; সিংহ সিংহ নাদে রোষে,
উর্দ্ধ ফুল্ল হয়ে চারি দিকে চায়,

মারে পঞ্জা ভিজা ভূমে, আঁচড়ে কামড়ে ক্রমে,
আশ্রয় আশয়ে বট তলে যায়।
জটায় আছড়ে লেজ, নয়নে নিকলে তেজ,
ছট ছট ছটা কেশর ঝাড়িল,
থাবা মারি বসে ভূমে, গর্জ্জে বজ্র মহা ধূমে,—
গম্ভীর জৃম্ভনে মুখ ব্যাদানিল।
সম্মুখে দেখিল মূর্ত্তি, মৃদুমন্দ কান্তস্ফূর্ত্তি,
লাবণ্যের ছবি দাঁড়ায়ে বালক,
নাহি নড়ে, নাহি টলে, চক্ষু মুদে কুতূহলে,
সর্ব্বাঙ্গে জলিছে শীতল দীপক।
দাঁড়াইল পশুরাজ, ঝাড়িল কেশর সাজ,
একদৃষ্টে রহে চাহি শিশু পানে,
ধীরে ধীরে অগ্রসরি, বিকট হুঙ্কার করি,
স্ফীত নাসা পর্শি শিশুরে আঘ্রাণে।
পর্শ মাত্র চেত হয়, দেখে সিংহ ঘ্রাণ লয়,
গন্ধক দেউটি জ্বলিছে নয়ন,
সিংহে শিশু টানে কোলে, তেমনি মধুর বোলে,
বলে 'এলে পদ্ম-পলাশ-লোচন।'
ধীরে ধীরে চেলাঞ্চলে ঝাড়িল কেশর দলে,
সিংহ অঙ্গে হস্ত করিল মর্ষণ,
লাঙ্গূল লইয়া গলে, বলে শিশু কুতূহলে,
'কোথা ছিলে পদ্ম-পলাশ-লোচন?'
গলিল পশুর প্রাণ, আবার লইল ঘ্রাণ,
জানু পাতি ভূমে শির নোয়াইল,
লাঙ্গুলে বেড়িয়া ধরে' উঠাইল পৃষ্ঠোপরে,
হুঙ্কারি, আস্ফালি, উঠি দাঁড়াইল।
দাঁড়াইয়া সিংহ পৃষ্ঠে, চাহে শিশু ঊর্দ্ধদৃষ্টে,
বলে 'ভাই পদ্ম-পলাশ-লোচন!
কই সে অনন্ত শুম্ভ, হুহুঙ্কার মহাদম্ভ,
লুকাইছ কেন ওহে নারায়ণ!'

বিস্ময় মনেতে আনি, বলিতে বলিতে বাণী,
ধীরে ধীরে ধ্রুব মুদিল নয়ন ;
পড়ে বজ্র, বাড়ে বৃষ্টি, কম্পে ভূমি, নড়ে সৃষ্টি,
—ভাবে সেই পদ্ম-পলাশ-লোচন।

কালিন্দীর কাল জলে, কালের কল্লোল বলে,
ঘন ঘর জীব যায় খর টানে,
অজগর ফণধর, যায় স্রোতে তর তর,
আছাড়ি, কাছাড়ি, তরঙ্গ তুফানে।
লাগিল বটের জটে, উলটি পড়িল তটে,
সুদীর্ঘ আয়ত বিষম ভয়াল।
হইল জীবনে আশ, ছাড়ে সর্প দীর্ঘ শ্বাস,
ব্যাদানে বদন বিস্তৃত করাল।
জ্বলে চক্ষু ধীকি ধীকি, নাড়ে জিহ্বা লীকি লীকি,
বিস্তারয়ে ফণা দ্বিগুণ চৌগুণ।
বাঁকায়ে তুলিল শির, কাঁপাইল ধীরি ধীর,
জ্বলে শিরোমণি শীতল আগুণ।
মণি আভা বটতলে, অতি মৃদু মৃদু জ্বলে,
সিংহোপরে শিশু ভুজঙ্গ হেরিল,
মূর্ত্তি সুকুমারতম, ননীর পুত্তলীসম,
রসনা নিকলি চাটিতে লাগিল।
চেতনা পাইয়া তবে, সর্পেরে হেরিল যবে,
ভাবে এই পদ্ম-পলাশ-লোচন।
দেহ অতি সুবিচিত্র, শ্বেত কৃষ্ণ কত চিত্র,
মাথায় মানিক অতীব শোভন।
ধরিল ভুজঙ্গ গলে, বক্ষে নিল কুতূহলে,
করিল চুম্বন দ্বিজিহ্ব বদন,
বলে 'দেখি অপরূপ তোমার কতেক রূপ!
বহুরূপী পদ্ম-পলাশ-লোচন।'

ঘুচিল সর্পের দর্প, পাশেতে দাঁড়াল সর্প,
ধরিল ছত্রক শিশুর মস্তকে।
ছাড়ে বৃষ্টি বজ্রপাত; বিশ্ব শান্ত সুপ্রভাত;
পূরব গগনে অরুণা ঝলকে।
পাখীতে প্রভাতী গায়, বহিছে মলয় বায়,
সুধীর সুশান্ত যমুনার জল,
সুস্নিগ্ধ ধরণী পরে তরুণ অরুণ করে,—
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য পূরিত সকল।

সপ্তঋষি যায় স্নানে, উপনীত সেই স্থানে,
দেখে সিংহাসনে শিশু মহারাজ,
বিস্তারিয়া ফণপত্র মাথায় ধরেছে ছত্র
মহা অজাগর ভীম নাগ রাজ।
স্মরে তবে ঋষিগণ, "এই সেই মধুবন,
এই সেই ধ্রুব, সুনীতি বালক,
আমাদেরি উপদেশে আসি এই বন দেশে
বিশ্বাসে আশ্বাসে হয়েছে সাধক।"
বুঝিল, ভক্তির বলে ধ্রুব শিশু ধরাতলে
শ্রেষ্ঠ রাজপদ লভিয়াছে আজ,
সিংহ পৃষ্ঠে শিশু আছে, সর্প ছত্র ধরিয়াছে,

প্রকৃতির রাজা শিশু মহারাজ।

উপরে বিটপী বটে— চন্দ্রাতপ শোভা বটে,
যমুনা বহিছে—অভিষেক জল,
প্রাচীন অরুণ ভাতি— হৈম দীপে জ্বলে বাতি,
সামগান গায় দ্বিজ অবিরল।
তবে সেই সপ্ত ঋষি ঘেরি ঘেরি চউদিশি,
ধ্রুবমহারাজে করে প্রদক্ষিণ,—
মরীচি, অঙ্গিরা, আর অত্রি, ক্রতু, এই চার
পুলস্ত, পুলহ, বশিষ্ঠ এ তিন।

কন্ধে শ্বেত নামাবলি, বক্ষে শ্বেত লোমাবলি,
শ্বেত কেশ দাম, শ্বেত শ্মশ্রু ধারী,
তালে তালে এক কালে, রুদ্র তালে, ব্রহ্ম তালে,
নাচে,গায়,ফেরে—সারি সারি সারি।

"জয় ব্রহ্ম সনাতন! শিশুর সর্ব্বস্ব ধন!
ভক্তের ভক্তিতে ভাবনা-ভঞ্জন!
বালক সাধক বরে বক্ষিলে অপন করে,
ধন্য তুমি পদ্ম-পলাশ-লোচন!"

মৈথিল যাত্রা।

মিথিলায় বাইজীর আড্ডা বহু দিন হইতেই আছে; সম্প্রতি বাবুজী এখানে এসে থিয়েটার খুলেছেন। মৃদঙ্গ করতালের স্থানে তবলা বেহালা অভিষেক করিয়া আড়-খেমটায় আখড়াই দিতেছেন। সারঙ্গে সা রে গা মা সাধনা পূর্ব্বমতই চলিয়াছে; উপরোক্ত বাঙ্গলী বাবুর বিলাতি সুর বিবিজানের বামাস্বরে মিশিয়া বাঙ্গালার ন্যায় এই মেড়ুয়ার দেশ মিথিলাতে চালওয়া নাট্য রসের অতি সুন্দর ও সভ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে। সংগীত শাস্ত্রের সেবা কিম্বা শ্রাদ্ধ হইতেছে, আমি ঠিক বলিতে পারি না, শাস্ত্রে আমাদেরই অধিকার নাই। তবে এটা খুব সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ত্রিহুতে বিদ্যাপতির আমলের সে বাদ্যভাণ্ড এখন চুরমার প্রায়। সে কালের সেই ধানশী, ধ্রুপদ, ধামারের অন্তর্জ্জলী উপস্থিত—বাইজী ও বাবুজীর মৃদু মধুর কণ্ঠ সঞ্চালনে। ধামার ধানশীর অবস্থা যাহাই হউক, আমি নিজে কিন্তু বাইজী বা বাবুজী কাহারই প্রতি বৈমুখ নহি। শাস্ত্রে দখল না থাকিলেও তাঁহাদের উভয়কেই আমি,—ষোল আনা রকম না হউক,—এক আধ আনা আন্দাজও সম্ভোগ করিতে সমর্থ। বাইজীর,—বিধাতা তাঁহার

ব্যবসা বজায় রাখুন,—গজল্ (মোক্তাদার ও বে-মোক্তা) আমার বিলক্ষণ প্রিয়। পরন্তু বাবুদের "নাট্য—সমাজ" রঙ্গাভিনয়ও আমার আরাম-দায়ক। রূপে রসে রাগে উপরোক্ত উভয়ের কেহই কম নহেন। সংক্ষেপত এ অধীন উভয়েরই নিকট কৃতজ্ঞ, উভয়েরই বাধ্য।

তবে জনৈক স্বদেশীয় সমজদার আমাদের আধুনিক যাত্রা সমালোচনা প্রসঙ্গে কেমন একটা কথা লিখে ফেলেছেন,—সেটা আমার সময়ে সময়ে হঠাৎ মনে এসে যায় কিন্তু কথাটা কিছু কর্কশ। কথাটা এই ভাবের যে যেদিন থেকে আমাদের দেশে তবলা বাঁওয়া দেখা দিয়াছে, সেই দিন থেকে নাকি সুর-সঙ্গত-সঙ্গীতের সপিণ্ডীকরণ আরম্ভ হইয়াছে। সে সপিণ্ডীকরণ সাক্ষ্য দিয়া সপ্রমাণ বা সমর্থন করিতে আমি উদ্যত নহি ; পরন্তু উহার সত্যতার বিচার—বিবেচনা—বিশ্লেষ করিতেও আমি স্বভাবত ও শিক্ষা বশত অক্ষম। কেবল এই প্রবাসে ঐ পিণ্ড পরিচ্ছেদ যদ্রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহারই কিছু 'পরিভাষা' করিলেও করিতে পারি। কিন্তু আমার এই 'প্রসঙ্গের' বিষয় 'মৈথিল যাত্রা'। অতএব অন্য বিষয়ে অধিক ছন্দ বন্ধ, আর অন্যায়।

গত জানুয়ারি মাসে,—কথাটা একটু গোড়া ঘেঁসে বলাই ভাল,—একটা বিষয় কার্য্য উপলক্ষে, কিছু "রং তামাসা" দিবার প্রয়োজন আমাদের হয়। রং তামাসা, সাধারণেরই জন্য ; অতএব সাধারণ রুচির অনুবর্ত্তী হইয়াই আমরা তাহার বন্দোবস্ত করি, কয়েক দিন ধরিয়া খুব নাচ-রঙ্ দিবা রাত্রি ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত (?) হয়। বাই নাচ, নট নাচ্—কয়েক রকমের "নাচরং" ভিন্ন ভিন্ন তয়েফার ছিল। অবশ্য কেবলই নাচ নয়, গানও ছিল এবং গানই অধিক। কিন্তু 'নাচ' কথাটাই এ অঞ্চলের লোক সাধারণত ব্যবহার করে, তা যে ধরণের নৃত্য গীতই হউক না। সেই জন্য এখানে আমাদের এখন যে 'থিয়েটর' বা "নাট্য সমাজ" হইয়াছে তাহাকে এখানকার লোকেরা বলে "বাঙ্গালীর নাচ"। বিপদ আর কি!

কয়েক দিন ভিন্ন ভিন্ন নাচ রঙের পর আমার নিজেরই ইচ্ছা ক্রমে এবং জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ সহকারীর পরামর্শে আমরা, একদল অমিশ্রিত আসল মৈথিল 'নাচ' আনাইলাম। ইহাকেই আমি বলিতেছি 'মৈথিল যাত্রা'। মৈথিল যাত্রায় মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল দেখিলাম ; সারঙ্গের মত এক রকম বেহালাও দেখা গেল। বাদ্য যন্ত্র সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত। যাত্রার অধিকারী

আছে, ছোকরা আছে, সখী আছে, সংও আছে। অথবা ইহারা সকলই সং। ইহাদের হাব ভাব পোষাক 'পেসয়াজ' দেখিয়া আমি নিজে পুরাতন শ্রেণীর লোক হইয়াও প্রথমত হাসি রাখিতে পারি নাই; অতএব নব্য সভ্য বাবুদের ত কথাই নাই। অধিকারীর মাথায় মুকুট, পরিধানে পুরুষের পোষাক; ধুতি মেরজাই, কখনও বা টিলে পায়জামা। সখীরা আমাদের বাঙ্গালা যাত্রার সখীদেরই মত,—নাচে, গায় 'পাঁওচারি' করে। নৃত্যের প্রত্যেক উপসংহারে বাহুর বক্র বিস্তার,—তদ্দ্বারা তাল রক্ষা,—একটু নূতন ভঙ্গি,—সেটুকু আর লিখে কিরূপ জানাইব? এই যাত্রাকে মৈথিলরা খুব বিশুদ্ধ ভাষায় অভিহিত করে;—বলে "নাটক অভিনয়।" কথাটা ইহাদের মধ্যে, আমাদের মত, ইংরেজী আমলের আমদানি নহে। উষাহরণ, পারিজাত হরণ, কৃষ্ণের জন্ম ইত্যাদি অনেক রকমের নাটক অভিনয় এখানকার যাত্রা-ওয়ালারা করে। তা ছাড়া বিদ্যাপতির পদ গায়, গীত গোবিন্দের গাথা গায়। অধিকারী সংস্কৃত ছড়া কাটে, শ্লোক পড়ে, কবিতা ব্যাখ্যা করে, বক্তৃতা দেয় 'ঘটকালি করে।' যাত্রার গানের ও কথার ভাষা চমৎকার বিশুদ্ধ, অধিকাংশ সংস্কৃত, পরন্তু মৈথিল ভাষার মিষ্টত্বের ত কথাই নাই। যে সব নাটক সচরাচর ইহারা অভিনয় করে, তাহার অধিকাংশই আধুনিক এবং বেশ পণ্ডিতদিগেরই রচিত। মৈথিল ভাষার উষা হরণ, নাটক সে দিন ছাপা হইয়াছে দেখিলাম। এখানি, "শ্রীহর্ষনাথ শর্ম্মণা মৈথিলেন প্রণীতম্।" এই নাটকের এক আধটা গান অবকাশ মতে আপনার পাঠক দিগকে উপহার দিলেও আমি দিতে পারি।

নাটক অভিনয়ের "তোড় যোড়" সাজ সরঞ্জাম—এই যাত্রাওয়ালা দিগের কিছু কিছু না আছে, এমন নয়; কিন্তু সে সব নেহাত জঘন্য ও অপ্রচুর। প্রকৃষ্ট ও প্রচুর হওয়াও অসম্ভব। আহার সমেত সবলগে সাত টাকা ভোর রাত্রি 'নাটক অভিনয়' দেওয়ার থোকা খরচ। ইহাতে আর কত প্রত্যাশা করিতে পারেন মহাশয়! এখনকার সব মৈথিল রাজা-রাইচরা সুইডেন সুইজরলাণ্ডের সংগীতের উন্নতি সাধনার্থ ভূরি অর্থ ব্যয় করেন এবং ব্যয় করিতে প্রস্তুত শুনিতে পাই। তা তাঁহাদের স্বদেশীয় সঙ্গীতের জন্য সিকি পয়সাও যদি কখনও ব্যয় করিতেন, তা হলে বোধকরি এই যাত্রার অন্য রকম বৃত্তান্ত আমাকে লিখিতে হইত। কিন্তু 'উন্নতিতে' আসল জিনিষ যেমনতর আজকাল বিগড়ে যাইতে দেখা যাইতেছে, তাহাতে 'উন্নতির'

নাম লইতেও যেন কেমন একটা ভয় হয়। আধুনিক উন্নতি প্রবেশ করিলে এই মৈথিল যাত্রার হয় ত ভিন্নমূর্ত্তি দেখিতে হইবে এবং সে মুর্ত্তিতে আর ইহার খাটি স্বজাতীয়তাটুকু দেখা যাইবে না।

আমরা যে যাত্রা আনাইয়াছিলাম তাহা নাকি এখানকার খুব একটা শ্রেষ্ঠ দল। রাজা মহারাজা শতি শ্রোত্রীয়ের মজলিসেই নাকি ইহার 'গাওনা' হয়; যথা তথা হয় না। এই যাত্রার নাম শুনিতেই আমাদের কার্পী নবিস লালা আমলারা যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন। তাঁহাদের মতে,—মতটা যদিও তাদৃশ সপ্রকাশ হইবার অবসর ছিল না, উপরোক্ত সঙ্গীত 'অসভ্য গোঁয়ারের গান'। তাঁহাদের ভাবটা এমনিতর যে যা কিছু সভ্য ও সুচিক্কণ তাহা কেবল বাইজীর গজলে। বস্তুত মুন্সী মহাশয়রা মুসলমানী দ্রব্য ভিন্ন অন্যত্র সভ্য "তামিজি" 'চিজ্' খুব কমই দেখেন। মুন্সীরা আমাদের "ময়াফেলে" আসিলেন বটে, কিন্তু এ 'ময়াফেল' তাঁদের মনের মত হইল না। আদব কায়দার 'খাতিরে অল্পক্ষণ বসিয়া আমাদের মন রক্ষা করিয়া একে একে আস্তে আস্তে পিট্টান দিলেন। এখন যত বিপদ আমার আর সেই মৈথিল ব্রাহ্মণটির। গান আমাদিগকে শুনিতেই হইবে; নহিলে আর শুনে কে? রাত্রি কাল কন্‌কনে শীত, তবুও নিস্তার নাই। চেয়ারের চারি দিকে আগুন জ্বালিয়া কম্পিত কলেবরে যাত্রা শুনিতে লাগিলাম। কয়েক দিন বিবি ও বাবুয়াদের * ক্ষীণ কণ্ঠের চুটকি কর্ তাপে, তবলা সারঙ্গের মৃদু ঝন ঝনে, কর্ণ-পটহ কিছু 'মধালস-ময়' হয়ে উঠেছিল,—আজ তাহার পূর্ণ 'সংস্কার' উপস্থিত। 'ত্রিহুত' (২) গীতের তার স্বরে তীক্ষোচ্চ ঝঙ্কারে কর্ণ-বিবর বুঝি বা বিদীর্ণ হয়। সপ্তমের উপরেও যদি কোনও উচ্চতর 'স্বর গ্রাম' থাকে তা হলে তাহা এই এখানে,—'ত্রিহুত' গীত ধরিবার সময়। বস্তুত এমন তর 'চড়া সুরে' গান ধরিতে অন্যত্র অনুভব করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। যাহা হউক আজ "মজলিসের' ভাব অন্য রকম। পূর্ব্বে কয়েক দিন ধরিয়া বাইনাচ হইতে বন্দর নাচ খুবই হইয়াছিল, কিন্তু গান এক দিনও 'জমে' নাই কিন্তু আজ বিলক্ষণ 'জমাট'। মৃদঙ্গের গভীর নাদে ও 'ত্রিহুতের' আকাশ-ভেদী

---

* ছোট ছোট ছোকরা নট।

(২) বিদ্যাপতির পদাবলী ও তদনুরূপ গীতকে 'ত্রিহুত' বলে। বলার কারণ এই সকল গান খাস ত্রিহুতের কীর্ত্তি বলিয়া নয় কি?

গানে 'গান জমিয়াছে', শীত ভাঙ্গিয়াছে, লোক জুটিয়াছে; আর চাই কি? এখন আমি কেবল এই বলিতে চাই যে মৈথিল যাত্রা অদ্যাপি ইহার আদিম ভাব রক্ষা করিয়া বজায় আছে এবং আমাদের যাত্রার প্রাথমিক অবস্থার ইতিবৃত্ত খুঁজিতে হইলে নমুনা স্বরূপ দৃষ্টিপাত করিতে হয়. এই মৈথিল যাত্রার প্রতি। তবলা বামা ও ক্ষীণ কণ্ঠের ও চুটকি সুরের বিস্তর গুণ গ্রাম, মনোহরণ-শক্তি থাকিতে পারে এবং আছেও বটে—কিন্তু উহারা যে আমাদের যাত্রার জমাট ভাব ধ্বংশ করিয়াছে, বা প্রতি রাত্রেই করিতেছে,—ইহা এক রকম নিশ্চিত।

মাক্‌বেথ ও হ্যাম্‌লেট।

৪।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাপের সামান্য স্ফুলিঙ্গ ধুঁয়াইয়া ধুঁয়াইয়া কিরূপে ক্রমে ক্রমে দুরাকাঙ্ক্ষার শুষ্ক সমিৎ কাষ্ঠের পরিপোষণে কুপ্রবৃত্তির কুবাতাসের পরিসেবনে, দারুণ দাবানলে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপনার বাস্ত-ক্ষেত্র দগ্ধ করিয়া ফেলে, মাক্‌বেথ নাটকে তাহাই দেখান হইয়াছে। মুঞ্জ-তরু যেমন আপনার বীজ-কোষেই বীজ সকল অঙ্কুরিত, আর অঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত করিয়া আপনার হৃদয়েই শতশত ক্ষুদ্র তরু ধারণ করে, একটি জীবন্ত মহাপাপ, তেমনই শত শত পাপাঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিরাজমান হয়, ইহাই মাক্‌বেথ নাটকের কথা।

প্রথম অঙ্কে অতি সামান্য অঙ্কুর হইতে পাপতরুর পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধন; অঙ্কের শেষ ভাগে পাপতরু জট গড়িয়া বসিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কে পাপতরু বিস্তৃত শাখা প্রশাখায় নব নব পুষ্প পল্লবে বিরাজমান;

তৃতীয় চতুর্থে সেই বিষতরুর ফল পাকিতেছে, বৃক্ষের উপরই শত শত অঙ্কুর হইতেছে, শত শত পাপ বৃক্ষ, মহা বৃক্ষে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এখন সেই কথাই বলিতে চলিলাম।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, রাজভবনের এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে বাঙ্কো আপনা আপনি ভাবিতেছেন। এই নাটকে কি ভাবে বাঙ্কো মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন; তাহা এই স্থলে একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

ম্যাক্‌বেথ যেরূপ ডঙ্কানের সেনাপতি ছিলেন, বাঙ্কোও সেইরূপ সেনাপতি ছিলেন; নাটকের আরম্ভেই দেখা গিয়াছে, উভয়েই অতুল সাহসে তুমুল সমরে জয়লাভ করিয়াছিলেন। ম্যাকবেথ ও বাঙ্কোর সহিত প্রথমে একত্র আমাদের সাক্ষাৎ—তখন নব বিজয়ের উৎসাহে উভয়ে রাজ-শিবিরে আসিতেছিলেন—পথি মধ্যে প্রান্তর ভূমিতে প্রেতিনীগণকে দেখিতে পান। বাঙ্কোই প্রথমে দেখিতে পান; কিন্তু প্রেতিনীগণ প্রথমে ম্যাক্‌বেথকেই অভিবাদন করে। ম্যাক্‌বেথ শিহরিয়া উঠিলেন, বাঙ্কো প্রেতিনীদিগকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। ম্যাক্‌বেথ শিহরিয়া উঠিলেন, কেননা প্রেতিনীরা তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়াছে; বাঙ্কো ভৎর্সনা করিলেন যে তাঁহারা দুই জনেই আসিতেছেন, তাহারা একজনকে অভিবাদন করিল, আর একজনকে কিছু বলিল না কেন? বাঙ্কো আপনিই বলিলেন, যে তিনি প্রেতিনীদের অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষা বা নিগ্রহের আশঙ্কা করেন না, * ম্যাক্‌বেথ কিন্তু একেবারে অভিভূত হইলেন, এই চরিত্র বৈচিত্র আমাদের বিশেষ লক্ষণীয়।

প্রেতিনীরা তিরোহিত হইলে, বাঙ্কো ম্যাক্‌বেথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য সত্যই আমরা প্রেতিনী দেখিলাম, না, পাগলা গেঁড়ো খেয়ে আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে?" ম্যাক্‌বেথ উত্তর করিলেন "তোমার সন্তানেরা রাজা হইবে।" কি কথার কি উত্তর! বাঙ্কো ভাবিতেছেন,—যাহা দেখিলাম তাহা সত্য কিনা—ম্যাকবেথ ভাবিতেছেন, তাহারা যাহা বলিল তাহা ফলিবে কি না। দুরাকাঙ্ক্ষার বিষ-বীজ ম্যাক্‌বেথ হৃদয়ে আপনার প্রকৃতি-সঙ্গত রস পাইয়াছে, বাঙ্কোর হৃদয়ে পায় নাই।

---

* Speak then to me, who neither beg nor fear
Your favours nor your hate.

প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে দেখান হইয়াছে রাজা ডঙ্কান মাক্‌বেথ ও বাঙ্কো উভয়কেই সমান ভাল বাসিতেন, সমান আদর করিতেন। ষষ্ঠ দৃশ্যে দেখান হইয়াছে, বাঙ্কো মাক্‌বেথ ভবনে প্রবেশ করিয়া মহা আহ্লাদিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সপুত্রক বাঙ্কোর বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই (৩৫৮ পৃষ্ঠায়) দিয়াছি। বাঙ্কো দুঃস্বপ্ন হইতে রক্ষার্থ দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করেন; দুষ্কার্য্যে দুর্ম্মতি তাঁহার নাই। স্বপ্নে যে ডাকিনীদিগকে দেখিয়াছেন সে কথা মুক্তকণ্ঠে মাক্‌বেথকে বলিলেন; মাক্‌বেথ জাগ্রতে স্বপ্নে তাহাদের কথা ধ্যান করিতেছেন, কিন্তু তাহা বলিতে পারিলেন না। বাঙ্কো ও মাক্‌বেথ সমান তেজস্বী থাকিলেও পাপের অঙ্কুর উদ্গমে মাক্‌বেথ হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে যখন মাক্‌ডফ্‌ ডঙ্কান হত্যার কথা বলিলেন, তখন বাঙ্কো একবার মাত্র বলিলেন—'মাক্‌ডফ্‌ বল, যে তোমার কথা মিথ্যা?' তাহার পর আর কোন কথা কহিলেন না—কেবল যখন লেডি মাক্‌বেথ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান, তখন বলিলেন "ধর, ধর, গৃহিণীকে দেখ।"

ঐ কয়স্থলে মাত্র বাঙ্কোর সহিত আমাদের পূর্ব্ব সাক্ষাৎ, তাহার পর এই তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাজ ভবনের এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে বাঙ্কো আপনা আপনি ভাবিতেছেন;—

"এখন সকলি হ'লো; রাজত্ব, সর্দ্দারি
—যা কিছু বলিয়াছিল, প্রেতিনী মাগীরা
সকলি হয়েছে—কিন্তু বিষম দুষ্কার্য্যে;
তবু তারা বলেছিলো তব বংশে রাজ্য
নাহি রবে; মমবংশে কিন্তু হবে স্থায়ী।
প্রেতিনীরা বলে' থাকে যদি সত্য কথা—
খাটিয়াছে ঠিক ঠাক তোমার বেলায়—
আমার বেলায় যদি সেই মত ফলে,
তাহা হলে আমিও ত আশা কর্ত্তে পারি।"

সম অবস্থায় দুই জন লোকের মধ্যে চরিত্র বৈষম্য প্রদর্শন জন্যই মাক্‌বেথের পাশাপাশি বাঙ্কোর সৃষ্টি। দৈবী বাণী হোক, পৈশাচী বাণী হোক, এক জনের সম্বন্ধে ফলিয়াছে; আমার বংশে রাজা হবে, এমন একটা কথা সেই

দৈবী বাণীতে শুনিয়াছি, এমন স্থলে কে বল, আশা না করিয়া থাকিতে পারে? সুতরাং বাঙ্কোর মনে আশার ছায়া দেখা দিয়াছে, কিন্তু সে কেবল আশা মাত্র; তাহাতে দুরাকাঙ্ক্ষার স্পর্শ নাই; আবার ম্যাক্‌বেথের রাজ্য লাভে বাঙ্কোর হৃদয়ে ঈর্ষার উদয় হয় নাই। ঈর্ষা থাকিলে এই সময়ে আমরা তাহা দেখিতে পাইলাম।

বাঙ্কো ভাবিতেছেন,—এমন সময়ে রাজা ও রাণী রূপে দলে বলে ম্যাক্‌বেথ দম্পতি প্রবেশ করিলেন। ম্যাক্‌বেথ বাঙ্কোকে সেই রাত্রির দরবার-ভোজে প্রধান ভোক্তারূপে নিমন্ত্রণ করিলেন। বাঙ্কো নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, কথায় কথায় ম্যাকবেথ জানিয়া লইলেন, যে বাঙ্কো তাঁহার পুত্রের সহিত সন্ধ্যার পূর্ব্বে অশ্বারোহণে বেড়াইতে যাইবেন, এবং রাত্রি দুই চারি দণ্ড না হইলে ফিরিবেন না। ম্যাক্‌বেথ সকলকে বিদায় দিয়া, একাকী ভাবিতে লাগিলেন;—ভাবনার প্রথম কথা—

To be thus is nothing;
But to be safely thus

এরূপ ভাবেতে থাকা—কিছুই ত নয়,
হতে নিষ্কণ্টক যদি পারা নাহি যায়।

এই কয়টি কথার সহিত হাম্‌লেটের প্রসিদ্ধ স্বগতোক্তির তুলনা করিলে এই দুই নাটকের নায়কদ্বয়ের চরিত্র বৈচিত্র্য অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

মহাদুঃখী হাম্‌লেট চিন্তায় জর্জ্জরিত, সন্দেহে বিষম আন্দোলিত, হাম্‌লেটের প্রধান ভাবনা—থাকিব কি না থাকিব?

To be or not to be, that is the question

মহাপাপী ম্যাক্‌বেথের কেবল আকাঙ্ক্ষা—আকাঙ্ক্ষা—রাজা হইয়াও এ আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। তাহার প্রধান কথা—

থাকিতে যদি হয় ত নিষ্কণ্টক থাকিতে হইবে।

কণ্টক কে? বাঙ্কো। ম্যাক্‌বেথ অনেকক্ষণ ধরিয়া কেবল বাঙ্কোর ভাবনাই ভাবিলেন, শেষে বলিলেন—

করিলাম এত মহাপাপ কেবল কি
বাঙ্কোর বংশের বুক ভরাইতে আমি?
তা হবে না। অদৃষ্ট রে এসো রে সম্মুখে।
দ্বন্দ্ব্য যুদ্ধে ভয়ানক, দেখিব রে তোরে।

এই মাক্‌বেথ প্রথম প্রলোভনে পড়িয়া বলিয়াছিলেন, "অদৃষ্টে থাকে হবে, আমার চেষ্টার প্রয়োজন কি?" (৩১৬ পৃষ্ঠা) আজ সেই মাকবেথ, দেখ অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত; এ সকলই পাপের লীলাখেলা। অদৃষ্ট বাদ পাপে প্রবৃত্তি দেয়—পাপীকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না।

মাক্‌বেথ ইহার পূর্ব্বদিন, দুইজন গুপ্ত ঘাতার সহিত বাঙ্কোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন; সেই লোক দুটাকে পূর্ব্বে মাকবেথ নানারূপ যন্ত্রণা দিয়াছিলেন; ঐ দিন বুঝাইয়া দেন, যে বাঙ্কো হইতেই ও হারা যন্ত্রণা পাইয়াছিল; তিনি (মাক্‌বেথ) সেই সকল যন্ত্রণাদানের দুষ্কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন না। আজি আবার মাক্‌বেথ সেই কথা সংক্ষেপে তাহাদিগকে বলিলেন, বাঙ্কোর বিরুদ্ধে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া দিলেন। শেষে বলিলেন, "বাঙ্কো তোমাদেরও শত্রু, আমারও শত্রু, তাহাকে গোপনে আমি লোকান্তরিত করিতে চাই। এই দিনই করা চাই, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুত্র ফ্লিয়ান্সকেও যমঘরে পাঠাইতে হইবে। কখন, কোথায়, কিরূপে করিতে হইবে, আমি শীঘ্রই বলিয়া দিব।" ঘাতুকেরা, পিতা পুত্রকে হত্যা করিতে স্বীকার করিল, মাক্‌বেথ তাহাদিগকে বিদায় দিয়া ভাবিতে লাগিলেন;—

এ কথাত হলো, বাঙ্কো তোমার কপালে
যদি স্বর্গ থাকে—হবে অদ্য রাত্রি কালে॥

সমালোচনার প্রথমেই বলিয়াছি, মাক্‌বেথের দুরাকাঙ্ক্ষা বলে—যাহা করিতে হইবে, তাহাতে শুভাশুভস্য শীঘ্রং (৩১৩ পৃষ্ঠা)। এই স্থলের সহিত হামলেট নাটকের এক স্থলের তুলনা করিতে হইবে। হাম্‌লেট আপনার পিতৃহন্তা পিতৃব্যকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলেন, গিয়া দেখেন, পিতৃব্য উপাসনা করিতেছেন। ভাবিলেন, ইহাকে এখন হত্যা করিলে, ইহার সদ্গতি হইবে,—না, একাজ এখন করা হইবে না। ইহাতেই বলিয়াছিলাম চিন্তাপীড়িত হামলেট নিরন্তরই ভাবেন—শুভাশুভস্য কালহরণং। (৩১৩ পৃষ্ঠা) মাক্‌বেথের কথা—

স্বর্গে যায় যাক—কিন্তু অদ্য রাত্রি কালে।

আবার আর একটি মহাপাপের সংকল্পে এই প্রথম দৃশ্যের পরিসমাপ্তি হইল।

আর্য্যজাতির কর্ম্মকাণ্ড।

(১৮০ পৃষ্ঠার পরে)

১৬। মনুষ্য মৃত্যুর পরে প্রথমত প্রেত লোকে গমন করে, প্রেত ক্রিয়া (দাহ অবধি সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত) যথা বিধি অনুষ্ঠিত হইলে মনুষ পিতৃপদ বাচ্য হয়। এবং তৎপর স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কেহ স্বর্গে (২০) ও কেহ বা নরকে (২১) গমন করে। (২২) অনন্তর স্বর্গ নরক ভোগাবসানে, জীব, পুণ্য পাপ কর্ম্মের অনুবন্ধ বশত পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্য বা তির্য্যক্ যোনি প্রভৃতিতে (২৩) জন্ম গ্রহণ করে। (২৪)

মনুষ্য জন্মধারণ করিলেও, পুণ্য পাপফলে সুখী বা দুঃখী এবং সুস্থ বা রোগী হইয়া থাকে।

জীব যাবৎ না মুক্ত হয়, এই রূপ স্বস্ব কর্ম্মের ফলভোগ, পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ ও যোনি ভ্রমণ করিতে থাকে।

১৭। মায়াচ্ছন্ন জীবাত্মার সহজেই সদ্গতি ও মুক্তিলাভ সম্ভাবিত নহে। কিন্তু কোন না কোন সময়ে তাহার যে শেষ লক্ষ্য প্রাপ্তি হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যেরূপ উত্তাল তরঙ্গায়িত নদীগর্ভে ক্ষেপণী সঞ্চালন পূর্ব্বক বায়ু ও প্রবাহ বেগে কখন হটিয়া, কখন বা অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে

---

(২০) স্বর্গশব্দে কাহারও মতে ভিন্ন ভিন্ন সুখ ভোগের স্থান—যথা পিতৃলোক (চন্দ্রলোক), দেবলোক (ইন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণাদি লোক) ইত্যাদি। কেহ কেহ বিশেষ সুখ ভোগকেই স্বর্গ বলেন।

(২১) তামিস্র, অন্ধ তামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, কুম্ভীপাক প্রভৃতি দুঃখ ভোগের স্থান গুলিকে নরক কহে।

(২২) 'ততো হসৌ নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মনা।'

শুদ্ধিতত্ত্ব।

(২৩) পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা ইত্যাদি।

(২৪) তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গ লোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।

ভগবদ্গীতা।

অথ নরকানুভূত দুঃখানাং তির্য্যক্ত্ব মুত্তীর্ণানাং মানুষ্যে লক্ষণানি ভবন্তি।

শুদ্ধি তত্ত্ব ধৃত বিষ্ণু সূত্রে।

তীরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়,—যেরূপ উচ্চ প্রাসাদে বা উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শিখরে আরোহণ কালে, অত্যল্প অসাবধানতা হইলেই পতিত ও ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেই ক্রমে উত্থিত হওয়া যায়, এবং যেরূপ বণিক্ স্বকীয় ব্যবসায় প্রসঙ্গে চেষ্টাবান্ হইয়া কখন লাভ ও কখন বা হানি স্বীকার করত অবশেষে সফল মনোরথ হয়—তদ্রূপ লোকে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উত্তমাধম ভিন্ন ভিন্ন গতি প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করে।

১৮। কর্ম্মকাণ্ডের চরম উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। যিনি কেবল সাত্ত্বিক কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি শীঘ্র হয়। যিনি অধিকাংশ সাত্ত্বিক, অল্পাংশ রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম করেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি অপেক্ষাকৃত বিলম্বে এবং যিনি অধিকাংশ রাজসিক তামসিক ও অল্পাংশ সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি আরো বিলম্ব হইয়া থাকে। ফলত যে যেরূপ কর্ম্মই করুক না কেন, কর্ম্ম করিতে করিতে ক্রমশ তাহার সাত্ত্বিক বহ নিষ্কাম কর্ম্মে রুচি হইয়া তদনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মে। চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে, জ্ঞানযোগে (২৫) অধিকার হইয়া চরমে মুক্তি (২৬) লাভ হইয়া থাকে। মহাপাপিষ্ঠ হইলেও, জীব বহু কোটি যুগান্তরে একদিন, না একদিন অবশ্যই মুক্ত হইবে। হিন্দু ধর্ম্মের এই একটি বিশেষ উদারতা ও মহত্ত্ব।

এই প্রকারে এক কালে সমুদয় জীব মুক্ত হইলে, তাহাকে আত্যন্তিক প্রলয় (২৭) বলে।

---

(২৫) জ্ঞানযোগ—তত্ত্বজ্ঞান। শঙ্করাচার্য্যের মতে অদ্বিতীয় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞান। নৈয়ায়িক মতে জীবাত্মাকে তদিতর দেহাদি সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন রূপে জানা। সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে পুরুষের ভেদ জ্ঞান।

(২৬) মুক্তি দুই প্রকার—জীবন্মুক্তি ও পরম মুক্তি। যে দেহাবচ্ছেদে আত্মার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া অজ্ঞান নষ্ট হয়, যাবৎ সেই দেহ থাকে, তাবৎ 'জীবন্মুক্তি' এবং ঐ দেহপাতের পরেই 'পরম মুক্তি' বা 'বিদেহ কৈবল্য' অথবা 'নির্ব্বাণ'।

(২৭) প্রলয়—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক এই কয়েক প্রকার। প্রাত্যহিক নাশ হওয়াকে নিত্য প্রলয় কহে। ব্রহ্মার প্রত্যেক দিনাবসানে যে প্রলয় হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়।—এক এক ব্রহ্মার

১৯। দেবতা মনুষ্য এবং পিতৃলোকোদ্দেশে যে সকল কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা ক্রমান্বয়ে দেবকৃত্য, মনুষ্য কৃত্য, এবং পিতৃকৃত্য বলিয়া কথিত। সাধারণত দেবকৃত্যের কাল পূর্ব্বাহ্ন (ত্রিধা বিভক্ত দিনের প্রথম ভাগ), মনুষ্যকৃত্যের কাল মধ্যাহ্ন (ত্রিধা বিভক্ত দ্বিতীয় ভাগ), ও পিতৃকৃত্যের কাল অপরাহ্ন (ত্রিধা বিভক্ত দিনের তৃতীয় ভাগ)।

দেবকৃত্য—পূজা, জপ, স্তুতিপাঠ, হোম, যজ্ঞ, দান, স্নান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, কার্ত্তিক মাসের আকাশ প্রদীপ, দীপান্বিতায় দীপ দান, দ্বাদশ যাত্রা, উপনয়নাদি সংস্কার ইত্যাদি।

মনুষ্য কৃত্য—মনুষ্য যজ্ঞ, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভ্রাতৃপূজা, কার্ত্তিকের শুক্ল প্রতিপদে বলিরাজ পূজা, অশোকাষ্টমীতে অশোক কলিকা পান, সায়ং প্রাতর্ভোজন, রাজোপসর্পণ, কৃষ্যাদি বৃত্তি ইত্যাদি।

পিতৃকৃত্য—শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পিতৃবলি, উল্কাদান, বৃষোৎসর্গ, দাহ, পূরক পিণ্ডদান, গঙ্গায় অস্থি প্রক্ষেপ—ইত্যাদি।

২০। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে কর্ম্ম তিন প্রকার। যদিও বেদান্ত মতে নিত্য, নৈমিত্ত্য, কাম্য, প্রায়শ্চিত্ত ও নিষিদ্ধ এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম উক্ত আছে (২৮), কিন্তু সচরাচর কর্ম্মের প্রথমোক্ত ত্রিবিধ বিভাগই প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত।

২১। নিত্য কর্ম্ম দুই প্রকার। ১—যাহা প্রত্যহ করিতে হয়। ২—যাহার অকরণে প্রত্যবায় (পাপ) জন্মে।

১ম শ্রেণীর নিত্য কর্ম্ম—প্রাতঃকৃত্য, মূত্র পুরীষোৎসর্গ, শৌচ, আচমন, দন্তধাবন, প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যোপাসন, দেবপূজা, ব্রহ্ম যজ্ঞ, বৈশ্বদেব, বলিকর্ম্ম, নিত্যশ্রাদ্ধ, অতিথি সেবা, দান, ভিক্ষাদান, ভোজন,

---

পরমাণু শেষ হইলে, সমুদয় পদার্থ প্রকৃতিতে অর্থাৎ আদিকারণে লীন হইয়া যায়, তাহাকে প্রাকৃতিক প্রলয় কহে। অপর ব্রহ্মা জন্মিয়া ঐ সকলের পুনঃ সৃষ্টি করেন।—আত্যন্তিক প্রলয় সর্ব্ব জীবের মুক্তি।

(২৮) তচ্চ পঞ্চবিধং। নিত্য নৈমিত্ত্য কাম্য প্রায়শ্চিত্ত নিষিদ্ধ ভেদাৎ। তত্র আদ্যানি চত্বারি ধর্ম্ম্যাণি। অন্ত্যং অধর্ম্ম্যং।

ইতি বেদান্ত মতং।

ভোজনোত্তর আচমন, সায়ং প্রাতর্হোম, ইতিহাস পুরাণ শ্রবণ,—লোকযাত্রা ইত্যাদি।

২য় শ্রেণীর নিত্য কর্ম্ম—অনুরহঃ স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা, নিত্য পূজা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, দান, ভিক্ষা দান, সায়ং প্রাতর্হোম, শৌচ, আচমন, ভোজনোত্তর আচমন; ষষ্ঠী অষ্টমী অমাবস্যা ও চতুর্দ্দশী তিথিতে স্নান, সংক্রান্তি স্নান, গ্রহণ স্নান, পুত্র জন্ম নিমিত্তক স্নান, আষাঢ়ী, কার্ত্তিকী ও মাঘী পূর্ণিমার স্নান; একাদশী ব্রত, জন্মাষ্টমী ব্রত, রামনবমী ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত; দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, কামদেব পূজা, বাসন্তী পূজা, শ্রাবণী কর্ম্ম, আগ্রহায়ণী কর্ম্ম, গৃহাদিতে বাস্তুযাগ, প্রতি মাসের কৃষ্ণ পক্ষের শ্রাদ্ধ, অশ্বযুক্ কৃষ্ণপক্ষ শ্রাদ্ধ, মঘা ত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ, কন্যার্ক শ্রাদ্ধ, নবান্নশ্রাদ্ধ, নবোদক শ্রাদ্ধ, যবশ্রাদ্ধ, পূপাষ্টকা, শাকাষ্টকা ও মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধ, অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ, গৃহ প্রবেশ নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, পুত্র জন্ম নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, সংস্কার কর্ম্মাঙ্গ শ্রাদ্ধ, বৃষোৎসর্গাদি কর্ম্মাঙ্গ শ্রাদ্ধ, গ্রহণ শ্রাদ্ধ, প্রত্যাব্দিক শ্রাদ্ধ, শ্রাবণী ও মাঘী পূর্ণিমা শ্রাদ্ধ, সংক্রান্তি শ্রাদ্ধ, জন্ম নক্ষত্র নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, তীর্থ প্রাপ্তি শ্রাদ্ধ, পাত্র প্রাপ্তি শ্রাদ্ধ, প্রেত শ্রাদ্ধ, ভীষ্মতর্পণ, দশ সংস্কার, ভ্রাতৃপূজা ইত্যাদি।

২২। নৈমিত্তিক কর্ম্ম (২৯) দুই প্রকার। ১—যে কর্ম্মে দিন, মাস বা বৎসর বিশেষের নিয়ম নাই, যাহা আগন্তুক নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই করিতে হয় এবং যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ২—যাহা কোন নিমিত্ত জন্য করিতে হয়।

১ম শ্রেণীর নৈমিত্তিক কর্ম্ম—পুত্র জন্ম নিমিত্তক স্নান, দান ও শ্রাদ্ধ; সপিণ্ড মরণাদি নিমিত্তক স্নান, প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থ ও পাত্র প্রাপ্তি শ্রাদ্ধ, গৃহ প্রবেশ শ্রাদ্ধ, তীর্থযাত্রা শ্রাদ্ধ, কর্ম্মাঙ্গ শ্রাদ্ধ, অস্পৃশ্য স্পর্শন জন্য স্নান ইত্যাদি।

২য় শ্রেণীর নৈমিত্তিক কর্ম্ম—প্রথম শ্রেণীর নিত্য কর্ম্ম ও প্রথম শ্রেণীর নৈমিত্তিক কর্ম্ম ভিন্ন, সমুদয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নিত্য কর্ম্ম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমুদয় কাম্য কর্ম্ম।

---

(২৯) নৈমিত্তিক কর্ম্ম হয় নিত্য, না হয় কাম্য হইবে। নিত্যত্ব এবং কাম্যত্ব বিনির্ম্মুক্ত নৈমিত্তিক কর্ম্ম পাওয়া যায় না।

২৩। কাম্য কর্ম্ম—যাহা ফলজনক বা যাহা ফলকামাধিকারীর কর্ত্তব্য। কাম্য ও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পাবে। ১—যাহা শুদ্ধ ফলার্থ বিহিত ও যাহা কোন নিমিত্তানুসারে বিহিত নহে। ২—যাহা ফলার্থ অথচ নিমিত্তানুসারে বিহিত।

১ম শ্রেণীর কাম্য কর্ম্ম—গঙ্গাদি তীর্থ স্নান, তীর্থতর্পণ, কাশী প্রভৃতি তীর্থ দর্শন, শিবাদি দেব পূজা, কাম্য বলি ও হোম, তুলসী, বিল্বপত্র ও পুষ্পাদি প্রদান, অনিমিত্ত বিহিত সকল প্রকার দান, গৃহাদিতে বাস্তুযাগ, ঔপচায়িক ও গোষ্ঠী শ্রাদ্ধ ইত্যাদি।

২য় শ্রেণীর কাম্য কর্ম্ম—বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসের প্রাতঃস্নান, মাকরী স্নান, মৌনী স্নান, ভূত চতুর্দ্দশী স্নান, নারায়ণী স্নান, অক্ষয়া তৃতীয়ায় স্নান, মহা জৈষ্ঠীর গঙ্গাস্নান, মাঘ মাসের গঙ্গাস্নান, জন্ম নক্ষত্র ব্যতীপাত পুষ্যা নক্ষত্র ও বৈধৃতি নক্ষত্রের গঙ্গাস্নান, দশহারা স্নান, সংক্রান্তি স্নান, যুগাদ্যা ও মন্বন্তরা স্নান, ও দান, অষ্টমী স্নান, বারুণী স্নান, চৈত্র মাসে লৌহিত্য স্নান, বুধাষ্টমীতে স্রোতোজলে স্নান, অমাবস্যাতে নদী স্নান, পৌর্ণমাসীর স্নান; অমাবস্যা, দশহারা ও বৈশাখ পৌর্ণমাসীর তর্পণ, ভূতচতুর্দ্দশী ও রটন্তী চতুর্দ্দশীর যমতর্পণ, অক্ষয় তৃতীয়ার বিষ্ণু পূজা, নাগ পঞ্চমী ও কর্কট সিংহ সংক্রান্তিতে মনসা পূজা, দুর্গোৎসব, কোজাগর কৃত্য, জগদ্ধাত্রী পূজা, গোষ্ঠাষ্টমীতে গোপূজা, পৌষ সংক্রান্তিতে বাস্তু পূজা, বরদা চতুর্থীতে গৌরীপূজা, শ্রীপঞ্চমী পূজা, বাসন্তী পূজা, রটন্তী পূজা, ফলহারী পূজা; অরণ্যষষ্ঠী ব্রত, অমাবস্যা ব্রত, ধর্ম্মঘট ব্রত, ললিতাসপ্তমী ব্রত, দুর্গাষ্টমী ব্রত, দুর্গানবমী ব্রত, দধিসংক্রান্তি ব্রত, কার্ত্তিকেয় ব্রত, সর্ব্বজয়া ব্রত, বরদাচতুর্থী ব্রত, শ্রীপঞ্চমী ব্রত, অশূন্যশয়না ব্রত, কোকিল ব্রত সাবিত্রী ব্রত; বারোপবাস, তিথ্যুপবাস, নক্ষত্রোপবাস, মহাষ্টমীর উপবাস, জন্মাষ্টমীর উপবাস, রামনবমীর উপবাস, শিবরাত্রির উপবাস, একাদশীর উপবাস, শ্রাবণদ্বাদশীর উপবাস, অঘোর চতুর্দ্দশীর উপবাস, সংক্রান্ত্যুপবাস; বার শ্রাদ্ধ, তিথি শ্রাদ্ধ, নক্ষত্র শ্রাদ্ধ, যুগাদ্যা শ্রাদ্ধ, সংক্রান্তি শ্রাদ্ধ, গ্রহণ শ্রাদ্ধ, গয়াশ্রাদ্ধ, পুষ্কর শ্রাদ্ধ, দেব শ্রাদ্ধ, ঋষি শ্রাদ্ধ, মনুষ্য শ্রাদ্ধ, মৃত ব্যক্তির প্রধান সংস্কার না হইয়া থাকিলে তাহার প্রেতশ্রাদ্ধ; পূর্ত্তকার্য্য, কার্ত্তিক্যাদিতে বৃষোৎসর্গ, দেবব্রত বৃষোৎসর্গ; সংক্রান্তি, যুগাদ্যা, অক্ষয়া ও পর্ব্বাদি নিমিত্তক দান ইত্যাদি।

২৪। মিশ্রলক্ষণাক্রান্ত কর্ম্ম সকলকে, পুনশ্চ নিত্যনৈমিত্তিক, নৈমিত্তিক কাম্য, এবং নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

নিত্যনৈমিত্তিক—দ্বিতীয় শ্রেণীর কাম্য কর্ম্ম ভিন্ন সমুদয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নৈমিত্তিক কর্ম্ম।

নৈমিত্তিক কাম্য—সমুদয় দ্বিতীয় শ্রেণীর কাম্যকর্ম্ম।

নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য—দ্বিতীয় শ্রেণীর নৈমিত্তিক কর্ম্মের মধ্যে যে যে কর্ম্ম, কাম্য শ্রেণীর মধ্যেও পড়িয়াছে।

ভারতে ইংরাজ।

মহাভারতের কাব্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক ভাগ গ্রহণ করিলে এবং রাজনীতিজ্ঞতার আদর্শ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সমালোচনা করিলে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতের নৈসর্গিক অবস্থানুসারে সমগ্র সসাগর ভারতবর্ষ একাধিপতির শাসন শৃঙ্খলে আবদ্ধ না থাকিলে, ভারতে সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি, উন্নতি এবং মঙ্গল কদাপি বিরাজ করিতে পারে না। ভারত, যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত, খণ্ডাধিপতিগণ যখন রাজ্যবিস্তারের জন্য পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত, সমরানল যখন সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীগণ যখন কেবল মাত্র বিদ্বেষবশীভূত, ফলত যখন ভারতে একতা, শান্তি ও কুশলের নিরতিশয় অভাব হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভার মোচন অর্থাৎ ভারতে শান্তি সংস্থাপন করণার্থ স্বীয় অলৌকিক রাজনীতিজ্ঞতা শক্তি প্রভাবে সমগ্র ভারতের রাজবর্গকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধের পরিণাম-ফলে ভারত একেশ্বর পাণ্ডবের কর-কবলিত হইয়া উন্নতির শেষ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, এবং সুখ, সৌভাগ্য ও শান্তি বহুকালের জন্য ভারতে সংস্থাপিত হইয়াছিল।

দ্বাপরের শেষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটনের অনতিপূর্ব্বে ভারতের যেরূপ শোচনীয় দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, ইংরাজের ভারত গ্রহণ কালেও ভারতের ঠিক্ সেই দুর্দ্দশা।

ভারতের যে বিপদে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিশাল রাজনীতিজ্ঞতার, অনন্ত কাল ব্যাপি দূরদর্শিতার এবং অলৌকিক ক্ষমতার নির্ব্বিশেষ প্রত্যক্ষ পরিচয় জগতের যাবতীয় লোক-চক্ষে চিরদিনের জন্য সমর্পণ করিয়া ভারতকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইংরাজ ঠিক সেইরূপে দ্বিতীয়বার ভারতের ভার মোচন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইতিহাস প্রকাশ করিতেছে যে, ইংরাজ আগমনের অনতি-পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ আবার খণ্ড-রাজ্যে বিভাগ, ক্ষুদ্রাধিপতিগণের মধ্যে রাজ্যবিস্তারের অভিলাষ একান্ত বলবান, সমরানল প্রজ্জ্বলিত, অকারণ মনুষ্য-ধ্বংস, লোকমধ্যে অনৈক্য, শান্তির অভাব, এবং উন্নতি নির্ম্মূলপ্রায় হইয়াছিল। এবার ভারতের ভারমোচন ইংরাজ সংসাধন করিলেন। ইংরাজ আবার সসাগর ভারতে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়া শান্তি, উন্নতি ও মঙ্গলের বীজ রোপণ করিলেন। ভারত-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ রাজ-নীতি বিশারদের মহৎ চরিত্র অবলম্বনে ভারতকে একাধিপতির কর-কমলে সমর্পণ করিয়া, ভারতের যে পরম মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন, ভাগ্যফলে দেশকালপাত্র বিবেচনায় দ্বিতীয় বার ভারতাদৃষ্টে অবিকল সেই মঙ্গলের নিয়ন্তা—ইংরাজ।

রাজকুল-তিলক মহারাজ রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যৎ বাক্য সফল হইয়াছে; ভারতবর্ষের মানচিত্রের সমস্তই লাল হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষমতাহীন নির্জ্জীব ব্রহ্মরাজ্য অন্য রং মাখিয়া এক পার্শ্বে পড়িয়াছিল, আজ লালেলাল হইয়া উঠিয়াছে; ক্ষুদ্র সিকিমের জন্য লাল রং প্রস্তুত হইতেছে। সমস্ত রাজবর্গের অভিষেকে মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী ভারত-সিংহাসনে রাজরাজেশ্বরী রূপে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। রাজপ্রতিনিধি দিল্লির রাজসূয় যজ্ঞে সম্রাট-প্রতিনিধি বলিয়া রাজা ও লোক সম্প্রদায়ের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছেন। অতএব কে না বলিবে যে ইংরাজই এখন ভারতের একাধিপতি? একাধিপতির ভারত এখন শান্তিময়, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিমালয়ের চরণ প্রান্ত হইতে সমুদ্র তরঙ্গ বিঘাতিত কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্বে চীনের সীমা হইতে অনন্ত পশ্চিমে পেশোয়ারের সীমা পর্য্যন্ত সুবৃহৎ সাম্রাজ্যে একটী আভ্যন্তরীণ বিবাদের কোন সূত্রপাত নাই এবং কোন বিপৎপাতের সম্ভবনা নাই। সাগরবক্ষে

তারঙ্গানুগত দ্বীপ মালাও নির্ব্বিরোধে ভাসিতেছে। সুতরাং শান্তি অবিচলিত ভাবে সসাগর ভারতে বিরাজিত ইহা কে না বলিবে? উত্তরে হিমালয় বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভারতের উত্তর দ্বার রক্ষা করিতেছেন, অবশিষ্ট তিন সীমায় সীমাশূন্য মহাসাগর স্বেচ্ছা পূর্ব্বক প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন; এতাদৃশ চতুঃসীমা বিশিষ্ট স্বাভাবিক নিয়মানুকূলে নিরাপদ দেশ অন্যের অভেদ্য। বহিঃশত্রুর দ্বারা এ অভেদ্য দুর্গ ভেদ হওয়া অসাধ্য এবং অসম্ভব। সত্য বটে ভারতের উত্তর পশ্চিমের প্রান্তসীমার বহির্ভাগে হিমালয়ের পরপারে সম্প্রতি একখানি কাল মেঘ দেখা দিয়াছিল, সেই মেঘ ক্রমে করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টিপাতে ভারতকে জলপ্লাবনে ভাসমান করিবে, এরূপ আশঙ্কা ভারতবাসীর হৃদয়ে একদিন উদিত হইয়াছিল,— কিন্তু ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত শান্তিময়, ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রবল বায়ুর সবেগ সঞ্চালনে অত্যল্প কাল মধ্যে সে মেঘখণ্ড ছিন্নভিন্ন হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায় যে, রুষরাজ রণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভারতের সিংহদ্বার হীরাটের সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতবাসীর একটি প্রকৃত পরম উপকার সাধন করিয়াছেন, অর্থাৎ ভারতবাসীকে রাজভক্তির পরিচয় প্রদর্শনের একটি সুচারু অবসর প্রদান করিয়াছেন। ঐশ্বরিক নিয়ম প্রভাবে সর্ব্বনাশের এক-শেষেও মঙ্গলের নিগূঢ় বীজ নিহিত থাকে। একচ্ছত্র সম্রাটাধীন হওয়া ব্যতীত ভারতের চরম সুখ অন্য কিছুতেই নাই, চিন্তাশীল ভারতবাসী ভূয়োদর্শন দ্বারা সম্যক্‌প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, একাধিপতির অধীনতা ব্যতীত ভারতীয় লোকরাশির একতা কদাপি সম্পাদিত হইতে পারে না—এ কথাও তাঁহারা বেশ্ বুঝিয়াছেন, এবং একতা ভিন্ন দেশে শান্তি সংস্থাপিত হয় না, ও শান্তি না থাকিলে উন্নতি লাভ হয় না, কার্য্যকারণ সূত্রে ইহাও তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। সেই জন্যই আশ্রিত রাজবর্গ সম্রাটের বিপদে স্বদেশের এবং আপনাদের বিপদ বুঝিয়া ধন ও প্রাণ দিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন; এবং অন্যান্য যাবতীয় লোক-কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলেই একবাক্যে স্বদেশের অনুকূলে রাজার স্বপক্ষে তরবারি ধারণ করিতে এবং যথাসর্ব্বস্ব প্রদানে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। দুর্ব্বল বঙ্গবাসী বলেন্‌টিয়ার সাজিয়া বন্দুকের ভারবহন করিতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবেদন করিয়াছেন; বঙ্গরমণীকুল, যাঁহারা এ জগতে অলঙ্কারকেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ভাবিয়া থাকেন, রাজার এই অদ্ভুত পূর্ব্ব ব্যবহারের যৎকিঞ্চিৎ আনুকূল্যের জন্য অম্লান

বদনে শ্রীঅঙ্গকে নিরলঙ্কার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সম্পূর্ণ সাত শত বর্ষ ভারতবাসীগণ একাদিক্রমে রক্তপাত ও সর্ব্বনাশের নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ইদানীং ইংরাজাধীনে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পরম সুখে কালাতিপাত করিয়া কি বলিয়া আজ রাজ পদে এ ভক্তি কুসুমাঞ্জলি অর্পণ না করিবেন, ভারতের হিন্দুগণ কোন কালেই অকৃতজ্ঞ নহে।

হইতে পারে আশ্রিত রাজা মহারাজ বর্গের মধ্যে কেহ কোন কারণে মর্ম্ম-পীড়িত, কাহারও হৃদয়ানল অযথা শাসনে প্রজ্বলিত, কেহ বা সম্রাট আরোপিত ব্যয়ভারে জর্জ্জরিত, কেহ বা বংশমর্য্যাদার আসনের বিচারে অপমানিত, এবং কেহ বা আরও অধিক সংখ্যক তোপের জন্য লালায়িত। হইতে পারে শিক্ষিত বাবুগণ আরও অধিক চাকরি চাহেন, জাতিভেদে একই পদের বেতনের তারতম্যে জজবাবুর হৃদয় হয় ত দগ্ধ হইতেছে; হইতে পারে চা-করের দৌরাত্ম্যে স্ত্রীহীনের হৃদয়ে আগুণ জ্বলিতেছে, জটিল আইনের কুতর্কে হয় ত কেহ সর্ব্বস্বান্ত এবং হয় ত কেহ প্রভুর পীড়নে উপবাসী। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের এ সকল দুঃখ কাহিনীর আন্দোলন কি জাতীয় রাজবিদ্রোহিতার চিহ্ন, না, রাজার অনুগ্রহ পূর্ণ প্রজা-বাৎসল্য জনিত স্বত্বভোগের ইচ্ছা মাত্র? যে রাজা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রজাকে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের স্বত্ব দিয়াছেন, সে রাজা কি লোকের দুঃখ বা অভাবের আন্দোলনে রাজভক্তির ত্রুটি বিবেচনা করিতে পারেন? প্রতাপশালী ইংরাজরাজের সাম্রাজ্য এত বিশাল যে, ইহাতে সূর্য্যদেবের অস্তগমনের অবকাশাভাব। সেই সাম্রাজ্যের ভারত একটী প্রশস্ত খণ্ড। সেই ভারতের বিংশ কোটি লোকের নিয়ন্তা কতিপয় বিদেশীয় রাজ কর্ম্মচারী। অতএব লোকের দুঃখ অভাব যে কতক পরিমাণে থাকিবে এটী কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই দুঃখের কাহিনী এত অল্প। ভারত একজাতীয় লোকরাশির নিবাস ভূমি নহে, ন্যূনাধিক এক শত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভারতে বাস করিতেছে; তাহাদের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, এবং সকল জাতিই সমস্ত বিষয়েই রাজার সহিত নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন। জাতি, ভাষা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্নতায় একশ্রেণীর মনুষ্যকুল অন্য হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়; এতাদৃশ শতাধিক বিভিন্ন জাতি ভিন্ন জাতীয় রাজার সহিত যে

সম্যক প্রকার সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে, ইহাই অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। কোন দেশের কোন রাজনীতি বিশারদ মহান ব্যক্তি মুক্ত কণ্ঠে না স্বীকার করিবেন যে, এতাদৃশ ভারতকে ইংরাজ আয়ত্ত করিয়া রাজনীতিজ্ঞতার এবং বিশাল বুদ্ধিমত্তার সবিশেষ পরিচয় জগতে প্রদান করিতেছেন। ইংরাজ, ইদানীন্তন সমস্ত সভ্য জাতির অনুমোদিত ব্যবস্থানুকরণে বিজেতার সমস্ত জাতীয় স্বত্ব সংরক্ষণ করিয়া, দেশ প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া, এবং অবশেষে স্বত্বদানের চরমসীমা স্বরূপ "আত্মশাসন" ভার সমর্পণ করিয়া, অভূতপূর্ব্ব মাঙ্গলিক প্রথায় যে, রাজ্যশাসন করিতেছেন, তদ্দ্বারা রাজনীতিজ্ঞতার অভাবনীয় এবং অশ্রুতপূর্ব্ব পরিচয় দানে জগতকে চমকিত করিয়াছেন। ভারতের এই শান্তিময়ী মোহিনী মূর্ত্তি ইংরাজের বিশাল রাজনীতি-বিনির্ম্মিত। এ রাজার প্রতি যদি ভারতীয়গণ রাজভক্তি প্রদর্শন না করিবে, তবে কোন রাজার প্রতি করিবে?

তবে ভারত করভারাক্রান্ত এ কথা অবশ্য বলিব। সে গুরুভারে ভারতের বিংশতি কোটি লোকের মস্তক সমভাবে ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে; আর সহ্য হয় না। এইটি যথার্থই ভারতের জাতীয় দুঃখ কাহিনী। করবৃদ্ধির অন্যতম ফল অসন্তোষ বৃদ্ধি। ভারতের প্রজা কেবল কর-জ্বালায় রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট। সত্য বটে প্রজার প্রদত্ত করে রাজ্যে প্রতিনিয়ত প্রজারই সুখ সচ্ছন্দতার উপায় সৃষ্টি হইতেছে, প্রজার দ্বারে দ্বারে অনবরত অযাচিত ঐশ্বর্য্য রাশি বিতরিত হইতেছে, কিন্তু ভারতের নিরন্ন প্রজা-কুল সে সুখৈশ্বর্য্যের রসাস্বাদনে সম্যক্ সন্তোষ লাভে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। সত্য বটে হিন্দু ও মুসলমানাধিকারে ভারতের আভ্যন্তরীণ সুখসচ্ছন্দতার এত সচ্ছলতা ছিল না, কিন্তু ভারত করজালেও এত জর্জরিত ছিল না। কার্য্যকারণ সূত্রে তুলনা করিলে এ কথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, এ রূপ ধনে এ সুখের সামঞ্জস্য কদাপি হয় না। কর-পীড়িত ভারত সুখের প্রলোভনে ভীত হইয়াছে, ঋণদগ্ধ ভারত ঋণে ঐশ্বর্য্য লাভে শঙ্কিত হইয়াছে, নয়নাশ্রুপাতে অমৃতপানে ভারত একান্ত কাতর হইয়াছে।

ব্যয়-সংকুলনার্থই আয়ের সংস্থান। বহুল ব্যয়ে বহুল ধনাগমের আবশ্যক। প্রবাদ এই যে, পৃথিবীর যাবতীয় দেশাপেক্ষা ইংরাজের রাজকার্য্য পরিচালনায় ব্যয় অধিক। ভারতের ইংরাজ কর্ম্মচারীর বেতন অশ্রুতপূর্ব্ব উচ্চ। বিংশতি সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতনের কর্ম্মচারীর পদ ধর্ম্মাসনগুলের কোন

দেশে কোন কালে কখনই সৃষ্ট হয় নাই। পুরাকালে ইংলণ্ডে প্রবাদ ছিল যে, ভারতের বৃক্ষরাজিতে সুবর্ণের মোহর ফলে। সেই সংস্কারপূর্ণ হৃদয়-বিশিষ্ট আয়-ব্যয়-নীতিজ্ঞদিগের দ্বারাই ভারতের ব্যয়-ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং এ পর্য্যন্ত তাহাই অবিচলিত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইংরাজের কমিশেরিয়টের কেরানি গোমস্তা, পবলিক ওয়র্কের ঠিকাদার প্রভৃতিরা এত শীঘ্র অশ্রুতপূর্ব্ব ধনবান্ হইয়া উঠেন যে, পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশে তদ্রূপ হয় না। ব্যয় সম্বন্ধে এই যথেচ্ছাচারিতা এবং বিশৃঙ্খলতার জন্যই ভারতের শি'র করভার প্রতিনিয়তই সমর্পিত হইতেছে। কিন্তু ভারত আর তৃণগাছটীও বহন করিতে পারে না। অতএব ইহাই স্থির বুঝিতে হইবে যে, ভারতে আয়ের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়াছে, এখন ব্যয়-সঙ্কোচ ব্যতীত ভারতের আর উপায় নাই। তদন্যথায় ভারত ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

আর একটী অতীব শোচনীয় অবস্থা ভারতের ভাগ্যদোষে সম্প্রতি সংঘটিত হইয়াছে। ইংরাজ যে শোচনায় অবস্থায় ভারতকে, একাধিপতির পবিত্র প্রশস্ত করতল বিস্তার করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, আজ কি কারণে বলিতে পারা যায় না সেই ইংরাজ ইচ্ছা করিয়া ভারতকে সেই শোচনীয় অবস্থায় আবার নিক্ষেপ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। সত্য বটে, ভারতের অভ্যন্তরীণ বর্ত্তমান অবস্থা সম্যক্ প্রকারে ইংরাজের ভারত গ্রহণ কালের ন্যায় নহে, তথাপি তৎকালে ভারতে যেরূপ শান্তির অভাব হইয়াছিল, আজ অন্য কারণে সেই বিমল শান্তির অভাব হইতেছে। শান্তির অভাবই রাজ্যের অমঙ্গলের চিহ্ন, সেই চিহ্ন আজ আমাদের অদৃষ্টদোষে ভারতের ললাটদেশে অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে। যুদ্ধবিগ্রহে সে শান্তির অভাব হয় নাই, রাজভক্তির অন্যথাচরণে সে শান্তির অভাব হয় নাই, শাসন-বিশৃ-ঙ্খলার সে শান্তির অভাব হয় নাই, কিন্তু অন্য অভাবনীয়, অতীব নিষ্ঠুর কারণে, সেই পবিত্র মাঙ্গলিক শান্তির নিরতিশয় অভাব হইতেছে। এবং ভ্রমশূন্য মীমাংসায় ইহা সন্তোষজনক রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ইংরা-জের স্বাধীন ইচ্ছাই, সেই শান্তি বিধ্বংসী কীর্ত্তিস্তম্ভের ভিত্তি স্বরূপ।

প্রথম, " ইল্‌বর্ট বিল। " ইলবর্ট বিল সর্ব্বাগ্রে যেরূপ পাণ্ডুলিপিতে ব্যবস্থাপক সভায় সমর্পিত হইয়াছিল, সম্পূর্ণরূপে সেই আকারে বিধিবদ্ধ হইলে, ভারত এই মাত্রবৎ লাভ করিত যে, চারিজন মাত্র ভারতীয়

ব্যক্তি ইংরাজ অপরাধীর প্রতি বিচার বিধান করিতেন। কিন্তু ইংরাজ অপরাধীর প্রতি কি রূপে, কোথায়, এবং কাহার দ্বারা বিচার বিতরিত হয় তাহা ভারতের বিংশ কোটি লোকের মধ্যে কজন জানিতে ইচ্ছা করেন? যে কেহই বিচার করুন, তাহাতে এই বিংশ কোটী লোকের ক জনের কি আসে যায়? এই সাগরসম বিস্তৃত ভারত রাজ্যের বিংশকোটি লোকের মধ্যে চারিজন মাত্র ব্যক্তি এক একটী সুদূর নিভৃত অজানিত সামান্য স্থানের বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের জীবনকালের মধ্যে ইংলণ্ডের এক একটি পথ পরিষ্কারকের প্রতি দণ্ডবিধান করিলে, ভারতের কি মহান্ স্বত্ব সংস্থাপিত হইত এবং কি অলৌকিক গৌরব গগনস্পর্শ করিত, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু সে বিল সে ভাবে বিধিবদ্ধ হয় নাই। অথচ ঐ বিল সম্বন্ধে আন্দোলনের ফলশ্রুতি ভারতের শান্তি নাশের একটী কারণ স্বরূপ। আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, আমাদের কেশ শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, আমরা এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিরতিশয় সাবধানের সহিত একাদিক্রমে সুতীক্ষ্ণ নয়নে দেখিয়া আসিতেছি যে, দেশীয় কৃতবিদ্য জনগণ পঠদশা অতিক্রম পূর্ব্বক সংসারে পদনিক্ষেপ করিয়া চাকরি, ব্যবসায় অথবা যে কোন সূত্রে হৌক, সমস্ত জীবন কাল এইমাত্র ব্রত অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, যে ইংরাজের সহিত ভারতীয় জনগণের সৌহৃদ্য সংস্থাপিত হয়। কারণ তাঁহারা ভূয়োদর্শন দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝিয়াছিলেন যে এই দুই জাতির সৌহৃদ্য, সহানুভূতি এবং সম্মিলনেই ভারতের যাবতীয় মঙ্গলের এবং উন্নতির বীজ নিহিত আছে। সম্পূর্ণ শতবৎসর কালব্যাপী যত্ন ও পরিশ্রমের পর, সংকল্প সাধনের প্রকৃত সন্ধিসময়ে,এই সর্ব্বনাশক আইনের প্রস্তাবের উত্থাপন এবং সেই মহৎ জাতীয় ব্রতের ধ্বংস হইল। সম্মিলন সম্বন্ধে আবার দুই জাতি শতবর্ষ পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হইল এখন এই দুই জাতির মধ্যে শান্তির নিরতিশয় অভাব হইয়াছে।

দ্বিতীয়, "আত্ম-শাসন প্রণালী।" নির্ব্বাচন প্রণালীই আত্মশাসন প্রণালীর অস্থি স্বরূপ। ছাপার কাগজওয়ালারা যতই ঢাক পিটুন, রাজকীয় কর্ম্মচারীরা যতই রং দিয়া রিপোর্ট লিখুন, নির্ব্বাচন প্রথার নিগূঢ় অভ্যন্তরে ব্যবস্থাপকদের যে সুচিকণ চাতুর্য্যের দৃঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা মফস্বলে যোগ্য ব্যক্তির মনোনীত হওয়া অসম্ভব। এ দিকে নির্ব্বাচন প্রথার কল্যাণে ভারতের সর্ব্বত্রই পূর্ব্বতনকালের বিস্মৃতপ্রায়

সামাজিক অনিষ্টরাশির শীর্ষস্থান স্থিত "দলাদলি" প্রথাটীর পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত পরিবার এই নির্ব্বাচন প্রথার আঘাতে কোন না কোন প্রকারে আঘাতিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। পদপ্রার্থীগণের যোগ্যতা সমালোচনা সূত্রে অতি-নিকট-কুটম্বগণের মধ্যে মনোবিবাদ ঘটিয়াছে, সহোদর সহোদরে অনৈক্য হইয়াছে, এবং স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছে। নিমন্ত্রণ বন্ধ ও 'বামুণ' নাপিত বারণ প্রভৃতি অসভ্য কালের দলাদলির ভীষণ অনুচর সকল আবার তীব্র তেজে দেখা দিয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পল্লিগ্রাম সমূহে যে অবস্থা ছিল, আজ আবার সেই অবস্থা। এ সম্বন্ধে আবার আমরা শতবৎসর পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হইলাম। আমাদের ঘরে ঘরে আবার শান্তির অভাব হইল।

তৃতীয়, "টেনান্‌সি বিল।" ভারতবর্ষ রাজভক্তির আদর্শ স্থল। ভারতীয় জনগণ রাজাপ্রজার সম্বন্ধ যে রূপ পবিত্র ভাবে বুঝিতে পারেন, অন্য কোন দেশের লোকে সে রূপ বুঝিতে পারেন না। ভারতে, রাজাপ্রজায় যে স্নেহ ভালবাসা, যে ভক্তিবাৎসল্য, যে সৈরটাব্যবহার, এবং যে সমবেদিত্ব, পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশের রাজাপ্রজার মধ্যে তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতে, প্রজা রাজাকে দেবতা স্বরূপ দেখেন, রাজাও প্রজাকে পুত্রবৎ নিরীক্ষণ করেন, রাজার প্রতি প্রজার অভক্তি হিন্দুশাস্ত্রে মহাপাপ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে; প্রজা পীড়নে রাজার নরকগমন অনিবার্য্য। একটী দীর্ঘায়তন বিস্তৃত রাজ্যের অসংখ্য প্রজার রাজাও যে বস্তু, একটি সামান্য ভূমিখণ্ডের অধিপতি তাঁহার জনৈক মাত্র প্রজার নয়নেও সেই বস্তু। বড়ই হৌন্ আর ছোটই হৌন্, প্রজার নয়নে ভূম্যধিকারী একই পদার্থ। ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞেরা রাজাপ্রজার সম্বন্ধে সে স্বর্গীয় পবিত্র ভাব দেখিতে ভাল বাসেন না। এটী তাঁহাদের চক্ষের শূল। সেই জন্যই কথিত আইনের অবতারণা। এতদ্দ্বারা ভারতের রাজাপ্রজার অবিচলিত সম্বন্ধ বিঘাতিত হইয়াছে। রাজাপ্রজার মধ্যে শান্তির অভাব হইয়াছে।

চতুর্থ, জাতি-বিদ্বেষ-উত্তেজনা। ভারত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীদিগের নিবাস ভূমি। ইতিহাস ব্যক্ত করে যে, ধর্ম্ম অন্তত ভাষা এক না হইলে একজাতিত্ব, জাতীয়জীবন, এবং জাতীয়-একতা কখনই গঠিত হয় না। ইংরাজের অনুকূলতায় ইংরাজি শিখিয়া একভাষী হইয়া ভারতে একজাতিত্ব সম্পাদিত হইতেছিল। ইংরাজিশিক্ষিত কৃতবিদ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষী

ব্যক্তিগণের শীর্ষস্থানস্থিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে একতা সংস্থাপনে তাঁহারাই অভিনেতা। ইংরাজের কৃপায় মহতী জাতীয় একতার পরিপোষণ হওয়াতে যখন অতীব প্রার্থিত মাঙ্গলিক সময়ের আবির্ভাব হইল, ভগবান্ বলিতে পারেন কেন, সেই ইংরাজ আবার তাহা যুগান্তরে নিক্ষেপ করিতে কৃতসংকল্প। প্রধান প্রধান ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীগণ খড়্গহস্তে একান্ত মনে সেই সন্ধি সময়কে সজোরে ছিন্নভিন্ন করিতে লালায়িত। সর্ব্বোচ্চ রাজকর্ম্মচারী স্পষ্টাক্ষরে মুসলমানকে হিন্দুর সহিত ঐক্য সংস্থাপন করিতে নিষেধ করিতেছেন, হিন্দুর প্রতি হিংসা দ্বেষ ও জাতীয় বৈরীতার অনিষ্টকর বিষের বীজ মুসলমান-হৃদয়ে সযত্নে রোপণ করিতেছেন। আবার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানার্থ মুসলমানকে ক্রোড়ে লইয়া উচ্চপদ প্রদান করত, অযথা দয়ার হস্তে তাঁহার গাত্রসেবা করিতেছেন। ওদিকে সর্ লিপেল গ্রেফিণ্ মহারাষ্ট্রীকে বাঙ্গালির প্রতি ঘৃণা করিতে শিখাইতেছেন। প্রদেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তার অভিপ্রায় বুঝিয়া স্ব স্ব প্রদেশে বাঙ্গালির প্রবেশনিষেধের অনুজ্ঞা পর্য্যন্ত প্রচার করিতেছেন। অতএব একতা, একজাতিত্ব এবং জাতীয় জীবনের অভ্যুদয় সময়েই তাহার ধ্বংস নিষ্পাদক কার্য্য সম্পাদিত হইল। এখন ভারতের প্রত্যেক জাতির মধ্যে শান্তির অভাব।

ভারতের শান্তিসংস্থাপক উপর্য্যুক্ত প্রস্তাব চতুষ্টয় মঙ্গলোদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভারতের দুরদৃষ্টদোষে অনিবার্য্য কারণ সূত্রে অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষময় ফল প্রদান করিল, অথবা প্রথম হইতেই কোন সুচতুর রাজনীতিজ্ঞের দুরভিসন্ধির পরিণাম-নির্দ্দিষ্ট ফলই প্রসব করিল,—তাহা সর্ব্বজ্ঞ ভগবানই বলিতে পারেন। যাহাই হৌক্ এখন ভারতে ইংরাজে ও ভারতীয়গণে ঐক্য নাই, এক জাতির সহিত অন্য জাতির ঐক্য নাই, এক দেশের লোকের সহিত অন্য দেশের লোকের ঐক্য নাই, রাজায় প্রজায় ঐক্য নাই, নগরের লোকরাশির মধ্যে ঐক্য নাই, সুহৃদ, অন্তরঙ্গ, আত্ম কুটুম্বের মধ্যে ঐক্য নাই, এমন কি, এক পরিবারের লোকদিগের মধ্যে পরস্পরে ঐক্য নাই। অতএব ভারতে আভ্যন্তরীণ কুশলের নিরতিশয় অভাব। সুতরাং শান্তির অভাব। এখন ভারতের শোচনীয় দুরবস্থা।

প্রশ্ন,—এ শোচনীয় অবস্থার নিয়ন্তা কে?

উত্তর,—বিশারদ রাজনীতিবিশারদ লর্ড রীপণ এবং লর্ড ডফরিণ!!

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। | চৈত্র, ১২৯৪। | ৯ম সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

৬।

যদি বল অভ্যাস এবং বৈরাগ্য এই দ্বিবিধ উপায় দ্বারা চিত্তবৃত্তি সকলকে অবরুদ্ধ করার নাম যদি সমাধি হয়, তবে উহা আবার সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত নামে দুই প্রকার হইল কেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত এই দুই প্রকার ভেদ হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

বিতর্ক বিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥১৭॥

পদচ্ছেদঃ—বিতর্ক-বিচার-আনন্দ-অস্মিতা-অনুগমাৎ, সম্প্রজ্ঞাতঃ।

পদার্থঃ—স্থূল—সাক্ষাৎকারো বিতর্কঃ, তন্মাত্র—সাক্ষাৎকারঃ বিচারঃ, ইন্দ্রিয়াণাং সাত্ত্বিকরূপসাক্ষাৎকার আনন্দঃ, আত্মনাবুদ্ধে রেকাত্মিকা সংবিৎ (অভেদজ্ঞানং) অস্মিতা, অনুগমং যোগঃ সম্বন্ধো বা, পঞ্চম্যা হেতুরর্থঃ, সম্প্রজ্ঞাত শব্দস্য তু সম্যক্ সংশয় বিপর্য্যয় রহিতত্বেন প্রজ্ঞায়তে প্রকর্ষেণ জ্ঞায়তে ভাব্যস্য স্বরূপং যেন স সম্প্রজ্ঞাত ইতিব্যুৎপত্ত্যা সবীজসমাধিরূপেহর্থঃ। কেচিত্তু স্থূলসাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা বিতর্কঃ, সূক্ষ্মসাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা বিচারঃ আনন্দ আহ্লাদ ইত্যাহুঃ।

অন্বয়ঃ—বিতর্কশ্চ, বিচারশ্চ আনন্দশ্চ অস্মিতাচ তাসামনুগমাৎ সম্বন্ধাদ্ধেতোঃ (স সমাধিঃ) সম্প্রজ্ঞাতঃ কথ্যতে ইতিশেষঃ।

ভাবার্থঃ।—সমাধি-র্নাম দ্বিবিধঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ অসম্প্রজ্ঞাতশ্চেত্যুক্তং। তত্র **সম্প্রজ্ঞাতো নাম সমাধিশ্চতুর্ব্বিধঃ (১) বিতর্কানুগতঃ-সবিতর্কঃ (২) বিচারানুগতঃ**

সবিচারঃ (৩) আনন্দানুগতঃ সানন্দঃ (৪) অস্মিতানুগতঃ সাস্মিত ইতি, বিতর্কাদীনামনুগমাদেবহেতোঃ সম্প্রজ্ঞাত ইতি কথ্যতে।

অনুবাদ—বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অস্মিতা এই চার প্রকার অবস্থা যুক্ত হওয়ায় উহার নাম সম্প্রজ্ঞাত।

সমালোচনা। সম্প্রজ্ঞাত শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ যে অবস্থায় কিছু জানা যায় অর্থাৎ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃভাবের একেবারে বিলোপ হয় না। সূত্রকার বলিলেন যোগীর প্রথম অবস্থা, প্রথমবৃত্তির নিরোধ হইতে একটী মাত্র বৃত্তি অবশিষ্ট থাকা পর্য্যন্ত যে অবস্থা তাহা,—যখন ক্রমে ক্রমে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ এবং অস্মিতা এই চারটি অবস্থাবিশেষ দ্বারা অনুগত হয়, তখন সুতরাং উহাকে সম্প্রজ্ঞাত বলা হয়। ঐ চারিটির স্বরূপ ভাষ্যকার বলিলেন—

"বিতর্কঃ চিত্তস্যালম্বনে স্থূল আভোগঃ, সূক্ষ্মো বিচারঃ, আনন্দোহ্লাদঃ একাত্মিকা সংবিদস্মিতা।"

বারম্বার বলা হইয়াছে আমাদের চিত্ত বৃত্তি-সঙ্কুল, সে সকল বৃত্তির একেবারে নিরোধ অসম্ভব, তবে উহাদের মধ্যে একটিকে স্থায়ী করিতে চেষ্টা করিয়া অন্যগুলির গতি রোধ করিতে পারা যায়। ঐ রূপ অভ্যাস দ্বারা ক্রমে যখন সেই একবৃত্তিই স্থায়ী হইয়া অপরের স্থান অধিকার করিয়া বসে, তখন আবার তাহাকে সংকুচিত করত ক্রমে তাহাকে সূক্ষ্ম করিয়া নির্ম্মূল করিতে হয়; এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা মন বৃত্তি শূন্য হইয়া একেবারে স্থিরতার ধারণ করে।

এই অসংখ্যবৃত্তিনিচয়ের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানকেই সর্ব্বব্যাপী করিয়া অন্য বৃত্তিগুলিকে অপসারিত করাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়। কারণ জ্ঞান প্রকাশময় সত্ত্ব প্রধান, জ্ঞানাবস্থায় রজো বা তমো গুণ চিত্তকে অভিভূত করিতে পারে না। এবং বিষয় অনুসারে জ্ঞান মহাস্থূল এবং অতি সূক্ষ্ম, এই উভয় স্বরূপই প্রাপ্ত হয়। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, মনের স্থিরতা সম্পাদনের জন্য একমাত্র জ্ঞানকেই প্রথমে সর্ব্বব্যাপী করিয়া অন্য বৃত্তি গুলিকে ক্রমে ক্রমে অপসারিত করিতে হইবে। পরিশেষে ঐ একমাত্র জ্ঞান সর্ব্বেসর্ব্বা হইলে ঐ জ্ঞানকে আবার সূক্ষ্ম করিয়া ক্রমে নির্ম্মূল করিতে হইবে। জ্ঞানকে ঐ রূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম করিবার পদ্ধতি বাচস্পতি মিশ্র দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন—যেমন প্রথম ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাসকারী ব্যক্তিরা অগ্রে বড় বড় স্থূল পদার্থ লক্ষ্য করিয়া হাতের তিগ্‌ ঠীক করিতে শিখে, স্থূল পদার্থে লক্ষ্য স্থির হইলে ক্রমে সূক্ষ্ম পদার্থ ধরে, সেই রূপ প্রথম যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত যোগীগণ কোন স্থূল ভৌতিক পদার্থ-

বিষযক জ্ঞানকে প্রবল কবত চিত্ত হইতে অপর বৃত্তি গুলিকে অপসাবিত কবিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম বিষযেব চিন্তা দ্বাবা ঐ জ্ঞানকে আবাব সূক্ষ্ম কবিতে থাকে। এক্ষণে দেখ, প্রথম যোগী মনস্থিব কবিবাব নিমিত্ত যে কোন স্থূল ভূতকে আশ্রয় কবিয়া তদ্বিষযক জ্ঞানকে প্রবল কবত মন হইতে অন্য বৃত্তি অপসাবিত কবিবে। কিন্তু সেই স্থূল ভূত নিছক একটা পাহাড় পর্ব্বত না হইযা যদি পবম পবিত্র সত্ত্বময কোন বস্তু হয, তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধিব পথ আবও প্রশস্ত হয। মনে কব, শিব মূর্ত্তিব ধ্যান হইল 'বজত গিবিনিভং' যেন একটি রূপাব পর্ব্বত। পর্ব্বতেব মত স্থূল পদার্থ আব কি আছে? তাতে রূপাব পর্ব্বত। উপাসকেব মন, শিক্ষিত অশিক্ষিত যেরূপ কেন হৌক না, অণুমাত্র আযাস ব্যতীতই সহজে রূপাব পর্ব্বতেব ধাবণা কবিতে সক্ষম হয। এইরূপ একমাত্র ভৌতিক স্থূল পদার্থেব জ্ঞানেব সর্ব্বময়ত্ব সম্পাদনেব নাম বিতর্ক। তর্ক শব্দের অর্থ অনুসন্ধান।

ভৌতিক স্থূল পদার্থ মাত্রেই নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন, সুতবাং যে কোন ভৌতিক স্থূল পদার্থেব পূর্ণজ্ঞান কবিতে হইলে সেই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গেবও অনুসন্ধান কবিতে হয, কেবল রূপাব পর্ব্বতেব মত একটা প্রকাণ্ড শ্বেত-পিণ্ডেব জ্ঞানে সম্পূর্ণ শিবমূর্ত্তিব জ্ঞান হয না, তাহাব সহিত পর্ব্বতেব পাঁচটি চূড়াব মত পাঁচটি মুখ, এক একটি মুখে তিনটি কবিযা চক্ষু, এবং কপালে এক কলা কবে চন্দ্র, পবিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেবও অনুসন্ধান রাখিতে হয।

এক্ষণে বিবেচনা কবে দেখ, ঐ রূপ জ্ঞান মোটেব উপব এক বিষয়ক হইলেও, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগত বিশেষ বিশেষ জ্ঞানেব সংস্রব থাকায়, অনেক বৃত্তিতে সমাকীর্ণ, সুতবাং উহাব প্রাবল্যে অন্যবিধ বৃত্তিব নিবোধ হইলেও ইহাব নিজান্তর্গত বৃত্তিব বাহুল্য হেতু চিত্তেব স্থৈর্য্য সম্পাদন দুঃসাধ্য হইযা উঠে, কাযেই যোগীব স্থূল ছাড়িযা সূক্ষ্ম আশ্রয় কবিতে হয। দীর্ঘকাল এক বিষয়েবও সাক্ষাৎকাবে নিবত থাকায মনেব বৃত্ত্যুদ্ভাবিনী শক্তি অনেকটা হ্রাস হইযা যায, মন যে কোন এক বিষযে নিযুক্ত কবিবাব নিমিত্ত অনেকটা আযত্ত হয, কাযেই একবাবে সূক্ষ্মেব সাক্ষাৎকার আব তাহাব পক্ষে আযাসসাধ্য নহে। এক্ষণে বলিতে পাব ভৌতিক পদার্থেব মধ্যে স্থূল বা সূক্ষ্ম সকলইত সাবযব, তবে সূক্ষ্মেব জ্ঞানকে প্রবল কবাব বিশেষ ফললাভ কি হইল? ইহাব উত্তবে আমবা বলিব, মন তখন ভৌতিক পদার্থ একেবাবে পবিত্যাগ কবিয়া স্থূল ভূতেব

কারণের সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হয়। ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটি মহাভূতের উপাদান শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র। তন্মাত্র সকল অতি সূক্ষ্ম এবং নিরবয়ব। স্থূল ভূত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার তন্মাত্রের মধ্যে যে কোন একটি আশ্রয় করিয়া মন তাহার সাক্ষাৎ লাভ করে, তদাকারে পরিণত হয়। এইরূপ জ্ঞানের অনুশীলনের নাম বিচার সুতরাং যখন আমাদের মন কোন এক তন্মাত্রের আকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই আসক্ত হইয়া থাকে, পঞ্চ স্থূল ভূতকে সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হয়, মনের সেই অবস্থাকে সবিচার সমাধি বলে। বিচার শব্দের অর্থ বিশেষ চিন্তন। এক একটি তন্মাত্র সূক্ষ্ম এবং নিরবয়ব হইলেও উহা এক একটি বিশেষ দ্রব্য পরস্পর কাহারও সহিত কাহার ঐক্য নাই। সুতরাং তন্মাত্রের সাক্ষাৎকারের নাম বিচার। এরূপ জ্ঞানের সময় অন্য বৃত্তির নিরোধ হইলেও চিত্তে কতক গুলি বৃত্তি থাকে। কেননা "তখন আমি জানিতেছি" এইরূপ জ্ঞান থাকে। কাযেই তখনও আত্মার তন্মাত্র এবং তাহার জ্ঞান এই ক্রম বিষয়ের বৃত্তি থাকে, অতএব তখনও চিত্তের সম্পূর্ণ স্থিরতা সম্পাদনের অনেক বাকী। সেই জন্য যোগী উহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিলম্ব দেখিয়া গ্রাহ্য বস্তু একেবারে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয়দিগের অন্যতমের পূর্ব্বোক্ত রীতিতে সাক্ষাৎকার করে। এই ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎকারের নাম আনন্দ। কারণ ইন্দ্রিয় সকল সত্ত্বগুণ প্রধান অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এবং স্বয়ং প্রকাশশীল, সুতরাং মন যখন ইন্দ্রিয়াকারে পরিণত হয়, তখন উহাও সত্ত্ব প্রধান হয়, কাযেই ঐ ইন্দ্রিয় বিষয়ক জ্ঞান কেবল আনন্দময়। ঐ ইন্দ্রিয় জ্ঞানানুশীলন রূপ সমাধিকে সানন্দ সমাধি বলা যায়। বিজ্ঞান বলেন মন যখন স্থূল বা সূক্ষ্ম বস্তু পরিত্যাগ করিয়া তাহার অনুভব জন্য আনন্দ মাত্রের পূর্ব্বোক্ত রীতিতে সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হয়, সেই সাক্ষাৎকারকে আনন্দ বা আহ্লাদ বলে। ঐ রূপ আনন্দের অনুশীলন রূপ যোগকে সানন্দ যোগ বা সমাধি বলে। সে অবস্থায় অপরবৃত্তির কথাত দূরে থাকুক না, স্থূল পদার্থ না সূক্ষ্ম পদার্থ কিছুরই জ্ঞান হয় না, কেবল "আমি সুখী" এই একমাত্র জ্ঞান থাকে।

এক্ষণে বিবেচনা কর "আমি সুখী" ইহা একটি জ্ঞান হইলেও ইহার অন্তর্গত তিনটি বৃত্তি থাকে, প্রথম আত্মবিষয়ক বৃত্তি, যে বৃত্তিদ্বারা আপনার অস্তিত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির অনুভব হইতেছে দ্বিতীয় সুখ বিষয়ক, তৃতীয় তাহার

জ্ঞান বিষয়ক। সুতবাং এ অবস্থায়ও মনেব সম্পূর্ণ স্থিবতা সম্পাদন হইতে পারে না, কাযেই যোগীব উদ্দেশ্য সিদ্ধিব নিমিত্ত উপায়ান্তব অবলম্বন কবিতে হয়।

তখন যোগী আব সব পবিত্যাগ কবিয়া আত্মাব সহিত মনেব ঐক্য সম্পাদন কবিযা আত্মাব সাক্ষাৎকাব আবম্ভ কবে। তখন মনে আব কোনরূপ বৃত্তিই রহিল না, সকল বৃত্তিব নিবৃত্তি হইল, কেবল আমি এই জ্ঞান বহিল। আত্মার সহিত মনেব ঐক্য জ্ঞানেব নাম অস্মিতা, অস্মি শব্দেব অর্থ অহং, 'অস্মিতা' শব্দেব অর্থ অহংএব ভাব অর্থাৎ কেবল আমিই সব, আমি ভিন্ন আব কিছুই নাই, এইরূপ মনোবৃত্তিব নাম অস্মিতা। এই অস্মিতায অনুশীলনরূপ যোগকে সাস্মিত সমাধি বলা হয।

এক্ষণে বিচাব কবিযা দেখ এই সাস্মিত অবস্থাই সম্প্রজ্ঞাতেব চরম অবস্থা। এ অবস্থায চিত্তেব সকল বৃত্তিবই নিবোধ হইযাছে। তখন আব বৃত্তিগণ তবঙ্গমালাব মত একটাব পব একটা, তাব পব আব একটা, এইরূপ অবিশ্রান্ত ভাবে উৎপন্ন হইযা চিত্তকে আব ব্যতিব্যস্ত কবে না, চিত্ত তখন থমথমে ভাব ধাবণ কবিযাছে, কেবল একটি মাত্র বৃত্তি আছে। 'আমি' এইবৃত্তি টুকু আছে বলিযাই ইহাব নাম সম্প্রজ্ঞাত। এই বৃত্তি টুকুব লোপ হইলেই যোগেব দ্বিতীয় (অসংপ্রজ্ঞাত) অবস্থা হইবে, ঐ অসম্প্রজ্ঞাতই যোগেব চরম অবস্থা। পবসূত্রে ইহাব বিষয় সবিস্তব বলা যাইবে।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায চিত্তবৃত্তি একেবাবে নিঃশেষিত হয না বলিয়া উহাকে সবীজ সমাধিও বলা হয। আমবা এ পর্যান্ত যাহা বলিলাম, তাহাতে ইহাও বুঝা গেল যে কেবল জ্ঞানময বৃত্তিব অবস্থান হেতুই ইহাকে সম্প্রজ্ঞাত বলা হয। প্রথমে স্থূল ভূতেব জ্ঞান, তাহাব পব সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রেব জ্ঞান, অনন্তব ইন্দ্রিয জ্ঞান, তাহাব পব আত্মাব জ্ঞান। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে পৃথিবী প্রভৃতি স্থূল ভূত এবং শব্দ আদি পঞ্চ তন্মাত্র ইহাবা সকলই জ্ঞেয়,। সংস্কৃত ভাষায জ্ঞেয এবং গ্রাহ্য এই দুই শব্দেব একই অর্থ। এই নিমিত্ত সবিতর্ক এবং সবিচাব এই উভযবিধ সমাধিকে গ্রাহ্য সমাপত্তি বলা হয। কাবণ গ্রাহ্য বস্তুকে আলম্বন কবিযা ঐ উভযবিধ সমাধিব অনুশীলন কবা হয়। ইন্দ্রিযগণ জ্ঞানেব সাধন, সংস্কৃত ভাষায সাধন এবং গ্রহণ এই দুইটি একার্থক শব্দ। এই নিমিত্ত সানন্দ সমাধিকে গ্রহণ সমাপত্তি বলে, কাবণ জ্ঞানেব সাধন কোন এক ইন্দ্রিযকে আশ্রয় কবিযা উহাব অনুশীলন কবা হয। আত্মা বা চৈতন্য-ময় পুরুষ, একমাত্র জ্ঞাতা, জ্ঞাতা আব গৃহীতা একই কথা। এই জন্য সাস্মিত

সমাধিকে গৃহীতৃ বা গ্রাহক সমাপত্তি বলা হয়। এই অনন্ত জগন্মণ্ডলের যাবতীয় পদার্থকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) জ্ঞেয়, (২) জ্ঞানের সাধন, (৩) জ্ঞাতা, যাহার জ্ঞান হয়। এই তিন প্রকার বস্তুর মধ্যে যোগ শিক্ষায় প্রবৃত্ত যোগী, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে প্রথমে জ্ঞেয় বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়, জ্ঞেয় বস্তু আবার স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার, কাযেই তাদৃশ নবীন যোগীর চিত্ত প্রথমে স্থূল, তাহার পর সূক্ষ্মকে আশ্রয় করে। জ্ঞেয় বস্তুর পর জ্ঞানের সাধন, তাহার পর জ্ঞাতাকে আশ্রয় করাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিমিত্ত যোগবর্ত্তিকার বলিয়াছেন স্থূলে নির্ব্বিজিতং [illegible] চিত্তকে যখন আপনার ইচ্ছানুসারে [illegible] কোন এক স্থূল বস্তুর আকারে পরিণত করিতে [illegible] তখন স্থূল ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে ঐ চিত্তকে সূক্ষ্মের দিকে লইয়া যাইবে। যেমন পৃথিবী আদি ভূতগণ স্থূল এবং পঞ্চ তন্মাত্র সূক্ষ্ম, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ স্থূল এবং অস্মিতা বা অহঙ্কার সূক্ষ্ম, কারণ সত্ত্বপ্রধান অহঙ্কারই ইন্দ্রিয়গণের উপাদান। ভোজবৃত্তিকার বলেন, সবিতর্ক, সবিচার, এই দুই প্রকার সমাধি আবার যথাক্রমে নির্ব্বিতর্ক এবং নির্ব্বিচার এই দুই প্রকার অবস্থা পাইতে পারে। সবিতর্ক সমাধি যখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনুসন্ধান শূন্য হয়, তখন উহাকে নির্ব্বিতর্ক বলে। এইরূপ সবিচার সমাধি কেবল সূক্ষ্ম-ধর্ম্মিমাত্রকে আশ্রয় করিয়া প্রবিষ্ট হয়, তৎসংশ্লিষ্ট দেশকাল কিছুরই বিচার না করে, তখন তাহাকে নির্ব্বিচার সমাধি বলা যায়।

শিকার।

(সোনাখালী—মল্লিকবাড়ী পাহাড়—বসন্ত কাল)

শ্যামল বাসন্তি বন্দ * কানন নিঝরে,
ঢালিছে দয়ায় দ্রব হৃদয় তাহার,
লতায়ে শ্যামল লতা শ্যাম তরুবরে,
দেখিতেছে গভীরতা কত করুণার।
অস্ফুট ভাষায় যেন ফোটা ফুল রাশি
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা রয়েছে প্রকাশি।

---

* দুই উচ্চ টিলার মধ্যস্থ সমতল নিম্ন ভূমিকে বন্দ বা বাইদ বলে।

২

বড়ই করুণাবতী অই স্রোতস্বতী,
জননীর মত স্নেহ সকলে সমান,
তৃণ হতে উচ্চ তরু সকলের প্রতি
জীবন রূপিণী রূপে সদা বহমান।
এত স্নেহ এত দয়া আছে আর কার ?
ঠিক্ যেন দয়াময়ী—জননী আমার !

৩

বিছাইয়া আছে বন্দে শ্যাম তৃণদল,
লীলা নিকুঞ্জের মত, ঝোপ ঝাপ শত শত
খেলাইছে ছোট ছোট সবুজ অচল !
নির্ঝরের দুই কূল, শ্যামল হিজল মূল
বিলাসিনী হরিণীর কেলিলীলা স্থল !
গম্ভীর গুজ্জার * বন, নল তারা অগণন,
যে দিকে ফিরাই আঁখি কানন শ্যামল,
নবতরু নবলতা নব ফুলদল।

৪

বসন্তের শ্যাম রাজ্য রাজত্ব তোমার,
আপনি প্রকৃতি রাণী, পরাইছে যত্নে আনি
যেখানে যা সাজে ভাল বন্য অলঙ্কার !
সজ্জিত গজাড † বন, উচ্চ টেক ‡ সিংহাসন,
লতার ললিত কুঞ্জে শয়ন তোমার !
কোকিল কোমল গানে, শ্যামা সুললিত তানে,
শ্রবণে সঙ্গীত সুধা ঢালে অনিবার !
অনন্ত কানন রাজ্য রাজত্ব তোমার !

---

* গুজা = শ্বেত বর্ণের বন্য গোলাপ।

† গজাড = গজারি।

‡ টেক = টিলা।

৫

প্রতিযোগী শূন্য রাজ্য অনন্ত কানন,
তোমার একাধিপত্য, অসীম শক্তি সামর্থ্য
কে আছে দ্বিতীয় হেন করিবে হেলন ?
তোমার বনের লতা, তোমার বনের পাতা
কাঁপা'তে আপনি ভয়ে কাঁপে সমীরণ !
পড়িতেছে দৌড়াইয়া, এ গাছে ও গাছে গিয়া,
কেমনে পলা'য়ে যাবে ফাঁকর পবন !
দিনে দিবাকর ভাতি, শরতে চাঁদনী রাতি
সশঙ্কে প্রভাত সন্ধ্যা করে আগমন,
বার মাস সাত বার ঋতু ছয় জন।

৬

অসীম বীরত্ব বীর্য্য বিক্রম দুর্ব্বার,
কোটি বজ্র পরাভব, গভীর গর্জ্জন তব
কাননের মাটী ফাটে দাপটে তোমার !
ভীষণ নখর চয়, বড় দন্ত সমুদয়
যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র বাঁধা হাতিয়ার !
অমিত সাহস বল, পরিপূর্ণ বক্ষস্থল
লোলজিহ্বা মহামূর্ত্তি রক্ত পিপাসার !
মাত যবে রণ রঙ্গে, কে আঁটে তোমার সঙ্গে
ভয়ঙ্কর দিক্‌দাহী অগ্নি অবতার !
রাজাধিরাজেন্দ্র তুমি, তোমারি এ বনভূমি,
অনন্ত কানন রাজ্য রাজত্ব তোমার,
অসীম বীরত্ব তব বিক্রম দুর্ব্বার !

৭

এস দেখি আমি ক্ষুদ্র মানব সন্তান,
এস হে শার্দ্দূল রাজ, দু'জনে যুঝিব আজ,
বুঝিব তোমারে তুমি কত বলবান !
এস বজ্র নখ নিয়ে, বীর বেশে হুঙ্কারিয়ে,
পাল হে বীরের ধর্ম্ম বীরেন্দ্র প্রধান !

নতুবা চোরের মত, হও হে কুপথ গত
পলাইয়ে রাখ তুচ্ছ ঘৃণিত পরাণ,
চাহি যুদ্ধ আমি ক্ষুদ্র মানব সন্তান।

৮

তোমার শান্তির রাজ্য কানন শ্যামল,
আমি হে বিদ্রোহী তার, চাহি তার অধিকার
রাখ দেখি নিজ রাজ্য থাকে যদি বল,
বরাহ ভল্লুক চয়, তব সেনা সমুদয়
বধেছি সঙ্গীনধারী মহিষ সকল।
নাহি অবশিষ্ট আর, এই দেখ এই বার,
মুহূর্ত্তে কানন রাজ্য করিব দখল।
ধরিয়াছি রুক্ষ অস্ত্র দেখ রাইফল।

৯

এই যে ছুটিল গোলা অগ্নি উগারিয়া,
ছুটিল নক্ষত্র বেগে, বিজলী জ্বলিল মেঘে,—
লও দেখি কত শক্তি বক্ষ বিস্তারিয়া!
দেখি কণ্ঠে কত বল, কাঁপাইয়া বনস্থল
গোলার গর্জ্জন ঢাক বজ্রে গরজিয়া।
ছুটিল জ্বলন্ত গোলা আকাশ ভাঙ্গিয়া।

১০

"ভেবেছ কি ওহে ক্ষুদ্র মানব সন্তান,
অই গোলা অগ্নিময়, দেখিয়া পাইব ভয়,
এতই ঘৃণিত কি হে পশুর পরাণ?
ও গোলা ত তুচ্ছ অতি, যদি ক্ষেপে সুরপতি
একত্রে অযুত বজ্র তথাপি—সম্মান—
তথাপি জাতীয় মান, প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান
দিব না সে বজ্রমুখে না দিয়ে পরাণ!
ভেবেছ কি ওহে ক্ষুদ্র মানব সন্তান?"

১১

" কি বলিব ঐরাবত পশুর অধম,
হইয়ে তোমার দাস, যদি না করিত নাশ
স্বজাতীয় স্বাধীনতা বীর্য্য পরাক্রম।
না আনিত পিঠে করি, চার্জ্জামা হাওদা ধরি
পারিতে কি প্রবেশিতে কানন দুর্গম ?
আনিয়াছে গৃহে শত্রু পশুর অধম।"

১২

" আনিয়াছে গৃহে শত্রু নতুবা কি আর,
সাম্রাজ্য নিবিড় বন, আজ তার সিংহাসন
চাহিতে মানব, প্রাণে,—কি সাধ্য তোমার ?
শশক শঙ্কায় তুমি, পশিতে না বনভূমি,
থাকুক অজেয় বীর্য্য বীরত্ব আমার।
বংশ নাশী বিভীষণ, বধিল রাক্ষসগণ
সেইরূপ ঐরাবত পশুকুলাঙ্গার।
আনিয়াছে গৃহে শত্রু, কি বলিব আর ?

১৩

" যাক্ পাপিষ্ঠের কথা বলিয়ে কি ফল,
অনন্ত উহার স্মৃতি তীব্র হলাহল।
ও দাস হয়েছে বলি, ভাবিও না বনস্থলী
একেবারে বীরশূন্য বীরভূ শ্যামল।
এই পাতিলাম বুক, সবিব না একটুক-
দেখ এই বজ্র বক্ষে ধরি কত বল,
ছাড় তব ব্রহ্ম অস্ত্র ছাড় রাইফল।

১৪

স্বাধীন হৃদয়ে আর, বৃথা তব অহঙ্কার
সহেনা হে, তুমি ক্ষুদ্র নর হীন বল!
এ বজ্র নখরাঘাতে, এই ভীম বজ্র দাঁতে
বিদারি তোমার গর্ব্ব স্ফীত বক্ষ স্থল,
আকণ্ঠ করিব পান শোণিত তরল।"

১৫

এই ছাড়িলাম গোলা রক্ষা নাই আর,—
গরজিল রাইফল "সেণ্ট্রাল ফায়ার"!—
এ কি হে মুহূর্ত্তে হায়, দেখি অচেতন প্রায়,
পতিত বিদীর্ণ বক্ষ মৃতের আকার,
বীরেন্দ্র শার্দ্দূল রাজ, এত যে অযত্নে আজ
বনেই পতিত বনবীর অহঙ্কার ?
হা হৃদা কি অজ্ঞান, এই আত্ম বলিদান,
এই আত্মবধ চির দেখি পুনর্ব্বার,
সমাহিত স্মৃতি লোপ জাগালে আবার।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

লর্ড কানিঙের ধীরতা।

(১৮৫৭ অব্দে কলিকাতার ঘটনা।)

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতায় বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই খানে খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী বহুসংখ্যক নরনারী, বালক ও বালিকা একত্র জড় হইয়াছিল। ইঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরুদ্বেগে ও নিরাপদে বাস করিয়া আসিতেছেন, এজন্য ইঁহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত কোন চেষ্টা ছিল না। দীর্ঘকাল সুখ শান্তিতে অতিবাহিত করাতে ও দীর্ঘকাল আপনাদের নিরীহভাবের পরিচয় দেওয়াতে ইহাদের চিত্তবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতার অপরাপর অধিবাসিগণও সবল ও সাহস-সম্পন্ন ছিল না। তাহারা নিশ্চিন্ত মনে উদরান্নের সংগ্রহে তৎপর থাকিত, নিরুদ্বেগে গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বাস করিত এবং নিরাপদে আপনাদের অবলম্বিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলিত। ইহাদের আত্মরক্ষার কোন অবলম্বন ছিল না। উদ্ধত ইংরেজেরা ইহাদের উপর অনেক সময়

অত্যাচার করিতেন। যৌবনসুলভ তেজস্বিতায়, অদূরদর্শিতামূলক আত্মম্ভরিতায় ও অমানুষোচিত আত্মপ্রাধান্যমত্ততায় ইহারা কলিকাতার সাধারণ অধিবাসীদিগকে নিপীড়িত করিয়া আপনাদের নিকৃষ্টতর সুখে আপনারাই পরিতৃপ্ত থাকিতেন। বে-সরকারী ইংরাজ সম্প্রদায় ক্রয়বিক্রয়ে আপনাদের ক্ষতিলাভ গণনাতে নিযুক্ত থাকিতেন। এই কার্য্য-প্রসঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদিগের সহিত তাঁহাদের যতটুকু মিশিবার প্রয়োজন হইত, তাঁহারা কেবল ততটুকু মিশিতেন। সুতরাং সাধারণ অধিবাসীদিগের সহিত তাঁহাদের তাদৃশ সমবেদনা ছিল না। তাহাদের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও মানসিক ভাব প্রভৃতিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা রাজধানীর সুরম্য প্রসাদ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা করিতেন না। জনসাধারণের মনোগত ভাব বুঝিয়া অপরের মানসিক প্রকৃতি পরিজ্ঞানের সীমাবৃদ্ধি করিতেও চেষ্টা করিতেন না, এবং আপনাদের অবলম্বিত বাণিজ্যব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া দূরতর প্রদেশের কোন বৃহৎ ব্যাপারের পর্য্যালোচনাতেও ব্যাপৃত হইতেন না। সুতরাং তাঁহারা মহা-রাষ্ট্রখাতের সঙ্কীর্ণ সীমাতে আবদ্ধ থাকিয়া আপনাদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর থাকিতেন। তাঁহারা এইসময়ে মহারাষ্ট্রখাতবাসী বলিয়া অভিহিত হইতেন। রেলওয়ে হওয়াতে ইংরেজেরা সময়ে সময়ে কলিকাতার বাহিরে যাইতেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বহুদর্শিতা অধিকতর প্রসারিত হইত না। তাঁহারা অধিকাংশ সময়েই বাণিজ্যপ্রধান মহানগরে বাস করিয়া বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে আপনাদের সৌভাগ্যবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিতেন। সমগ্র পৃথিবীর সম্বন্ধে চীনদেশের মানচিত্রকারকদিগের যেরূপ ধারণা ছিল, সমগ্র ভারতের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের ধারণা উহাপেক্ষা বড় বেশী ছিল না। চীনের মানচিত্রকারক যেমন চীন সাম্রাজ্যকে সমগ্র পৃথিবী বলিয়া মনে করিতেন, উল্লিখিত ইংরেজ সম্প্রদায়ও তেমনি ভারতের সুদৃশ্য প্রসাদ-ময়ী রাজধানীকে সমগ্র ভারতের প্রতিরূপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে সিপাহীদিগের অভ্যুত্থানের ভয়ঙ্কর সংবাদে এই শ্রেণীর লোকে যে সন্ত্রস্ত হইবে, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। যাহা মিরাটে ঘটিয়াছে, দিল্লীতে যাহার বিকাশ দেখা গিয়াছে, বাঙ্গালাতেও যে, তাহাই ঘটিবে, এই শ্রেণীর লোকে কেবল ইহা ভাবিয়াই সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত; এবং শঙ্কিতহৃদয়ে আপনাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট

চাহিয়া থাকিত। প্রাণের দায়ে তাহাদের এরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে। তাহারা দীর্ঘকাল নিরুদ্বেগে বাস করিয়া আসিতে ছিল; নিরুদ্বেগে ও নিরাপদে আপনাদের বৈষয়িক কার্য্যে অতিনিবিষ্ট থাকিত; এবং আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিয়াই পরাজিত পরাধীন জাতিকে অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিত। এই দীর্ঘকালে তাহারা কোনরূপ আশঙ্কা বা উদ্বেগের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায় নাই, এবং যে জাতির প্রতি তাহারা এই দীর্ঘকাল অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া আসিতেছিল, সেই জাতি হইতে যে তাহাদের সমূহ বিপদ ঘটিবে, ইহা তাহারা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু এখন ঘাতের প্রতিঘাত আরম্ভ হইল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সংবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া ভয়ঙ্কর ভাবে তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহারা এই সংবাদে সন্ত্রস্ত হইয়া চারিদিকে আপনাদিগকে বিপদে পরিবেষ্টিত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। মহানগরীর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়ে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। ফিরিঙ্গি ও পর্ত্তুগীজেরাই ইহাতে অধিকতর ভীত হইয়া উঠিল, ইংরেজেরাও ভয়ের হস্ত হইতে একবারে নিষ্কৃতি পাইলেন না। অনেকে আপনাদের নিরাপদ করিবার জন্য জাহাজে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ বা অন্ধকারময় গোপনীয় স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া আপনাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে বিমুক্ত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ নগর পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী পল্লিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ইংলণ্ড যাইবার জন্য জাহাজ ভাড়া করিলেন, কেহ কেহ বা বন্দুক ও পিস্তল কিনিয়া সর্ব্বদা সসজ্জ ও সশস্ত্র হইয়া রহিলেন *।

* য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের এইরূপ অবস্থা মে মাসে ঘটিয়াছিল। জুন মাসে ইহারা অধিকতর সন্ত্রস্ত হয়। যাহা হউক, মে মাসে ইহাদের যেরূপ আশঙ্কা হয়, তৎসম্বন্ধে একখানি সংবাদ পত্রে এরূপ লিখিত হইয়াছিল :— "অনেকে আপনাদের গাড়ীতে পিস্তল লইয়া যাইতেন, এবং আপনাদের বেহারাদিগকে ঐ পিস্তল শীঘ্র শীঘ্র ভরিতে ও ছুড়িতে শিখাইতেন। ভাগীরথীতে যে সকল জাহাজ ছিল, তাহা রাত্রি কালে য়ুরোপীয়গণে পরিপূরিত হইয়া উঠিত। শত্রুপক্ষ রাত্রিতে আক্রমণ করিবে ভাবিয়া, য়ুরোপীয়গণ ঐ সকল জাহাজে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা সকল স্থানেই ও সকল সময়েই আপনাদিগকে বিপন্ন মনে করিতেন। যখন সহসা কোন বিপদ ঘটে, তখন মনের এরূপ ভাব হওয়া অস্বাভাবিক নহে।"

এই সময়ে মহামতি লর্ড কানিঙের স্বাভাবিক ধীরতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কোনরূপ দুশ্চিন্তা বা কোনরূপ গভীর আশঙ্কা তাঁহাকে পবিত্র কর্ত্তব্যপথ হইতে অণুমাত্রও বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রশস্ত মুখমণ্ডলে এ সময়েও প্রশান্তভাব বিরাজিত ছিল। প্রশস্ত ললাট-ফলক এ সময়েও উদ্বেগের আবিলতা হইতে বিমুক্ত ছিল। কলিকাতার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের এ সঙ্কটকালেও ধীর ও প্রশান্ত ভাব দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন এবং অসন্তোষের সহিত তাঁহাকে স্বশ্রেণীর স্বধর্ম্মের লোকদিগের রক্ষায় উদাসীন ও উপস্থিত সময়ে গুরুতর রাজকীয় কার্য্যের অযোগ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

কলিকাতার য়ুরোপীয় প্রবাসী ও ফিরিঙ্গিগণ যে অকারণে ভীত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তাহাদের ভয়ের অনেকগুলি কারণ ছিল। যে সকল সিপাহী পূর্ব্বে কোম্পানীর প্রধান সহায় হইয়া অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে এই বিপুল সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেছিল, তাহারাই এখন সহসা কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া ইংরেজের শোণিতে আপনাদের উদ্দাম প্রতিহিংসার পরিতর্পণে অগ্রসর হইয়াছিল। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বারাকপুরে বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থান করিতেছিল। ইহারা এক রাত্রিতে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া য়ুরোপীয়দিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিতে পারিত। কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ, কারাগারের অপরাধীদিগের বিমুক্তীকরণ, ইহাদের অসাধ্য কার্য্যমধ্যে পরিগণিত ছিল না। মিরাটে, দিল্লীতে যাহা ঘটিয়াছিল, কলিকাতায়ও তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং কলিকাতার য়ুরোপীয়গণ সন্ত্রস্ত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মহাবিপ্লবের পূর্ণমূর্ত্তি ভাবিতে লাগিল, এবং আপনারা প্রণষ্টসর্ব্বস্ব হইবে মনে করিয়া ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য কাতরভাবে গবর্ণমেণ্টের দিকে চাহিয়া রহিল।

লর্ড কানিঙ্ বিশেষ না ভাবিয়া সহসা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি অটল পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবে থাকিয়া এবং ধীরতার সহিত সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে প্রবাসী য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে আশঙ্কার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, আতঙ্ক উদ্বেগের তরঙ্গে য়ুরোপীয় ও ফিরিঙ্গিগণ যখন সমভাবে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আন্দোলিত হইতেছিল, তখনও লর্ড কানিঙের ধীরতার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল,

লর্ড কানিঙ্ প্রতিদিন ধীরভাবে বিপদাপন্ন স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; এবং ধীরতার সহিত উপস্থিত বিপদ নিরাকৃত করিতে যত্ন, উদ্যম, ও চেষ্টার একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। ইংরেজ সম্প্রদায় এই সময় ভাবিয়াছিলেন যে, গবর্ণরজেনেরল বিপদের পূর্ণ মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিতেছেন না। যে হেতু তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর অদৃষ্টে কি ঘটিবে, ভাবিয়া এখনও বিচলিত হন নাই। কলিকাতা আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইলে য়ুরোপীয়দিগের দশা কি ঘটিবে, তাহা তিনি ভাবিতেছেন না; এবং য়ুরোপীয়দিগের আশঙ্কা যে, কিরূপ বলবতী হইয়াছে, তাহাদের হৃদয় যে, কতদূর অধীর হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্ব-বিধ্বংস-ভাবনার করালছায়া যে তাহাদিগকে কিরূপ আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এ সময়ে গবর্ণর জেনারলের মুখমণ্ডল যদিও প্রশান্তভাবে শোভিত ছিল, তথাপি উপস্থিত বিপদের পূর্ণভাব বুঝিতে তাঁহার কিছুমাত্র ঔদাসীন্য জন্মে নাই।*

দূরতরপ্রদেশে যাহারা বিপদাপন্ন হইয়াছে, যাহাদের জীবন ও সম্পত্তি ভয়াবহ বিপ্লবের সংঘাতে ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের প্রতি গভীর সমবেদনা দেখাইতে তিনি কিছুতেই বিমুখ হন নাই। এই সকল বিপদাক্রান্ত জনপদ রক্ষা করিতে তিনি হৃদয়ের সহিত চেষ্টা করিতে ছিলেন। যাহারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদস্থানে থাকিয়া বিপ্লবের সংবাদ অতিরঞ্জিত করিয়া আপনাদিগকে আপনারাই বিনষ্টপ্রায় মনে করিতে ছিল, গবর্ণরজেনেরল তাহাদিগের প্রতিও সমবেদনা দেখাইতে কাতর হন নাই। তিনি তাহাদের গভীর আশঙ্কার কারণ বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্যসম্পাদন বিষয়ে তাহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। বিপদাক্রান্ত জনপদরক্ষা করাই

* লর্ড ক্যানিঙ্ এই সময় যে সকল চিঠি পত্র লিখিয়া ছিলেন, তৎসমুদয়ে ইহার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়াযায়। তিনি বিশপ্ উইল্‌সনকে এসময়ে যে পত্র লিখেন, তাহার ভাব এই—"আকাশ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি উহা পরিষ্কৃত হইবার চিহ্ন অস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ধীরতা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। যথোচিত পূর্ব্বসাবধানতা ও শক্তির সহিত কার্য্য করিতে কখনও ঔদাসীন্য দেখান হইবে না। আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, ও বারাণসীতেই বিপদ অধিকতর প্রবল হইয়াছে। এই সকল স্থানে প্রভূতশক্তি-সম্পন্ন ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন। আমার বিলক্ষণ আশা আছে যে, আমরা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইব।

অগ্রে তাঁহার প্রধান কর্তব্য হইয়া উঠিয়া ছিল। তিনি এই কর্তব্য সম্পাদনে বিশেষ মনোযোগী হইয়া ছিলেন। অগ্রে কলিকাতা রক্ষা করার সুবন্দোবস্ত না করাতে যাঁহারা তাঁহার বিদ্বেষী হইয়া ছিলেন, তাঁহার তদীয় হৃদয়গত মহান ভাব বুঝিতে পারেন নাই। গবর্ণর জেনেরল যে স্থানে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, সে স্থান অপেক্ষায় অন্যান্য স্থানে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের করাল ছায়া পূর্ণ মাত্রায় বিস্তৃত হইয়াছিল। গবর্ণর জেনেরল ঐ সকল স্থানের রক্ষা বিধানে তৎপর হইয়াছিলেন। কলিকাতার ইংরেজ সম্প্রদায় ইহা না বুঝিয়া গবর্ণর জেনেরলের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া আপনাদিগকে নিঃসহায় ও নিরবলম্ব ভাবিতে লাগিলেন। যে হেতু, গবর্ণর জেনেরল তাঁহাদের ন্যায় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্রখাতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন নাই।

মে মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে কলিকাতার ইউরোপীয়দিগের আশঙ্কা অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিল। ইউরোপীয়গণ সখের সৈনিকদল ভুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কলিকাতায় বাণিজ্যসমিতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান সভা হইতে এ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনেরলের নিকটে আবেদন হইতে লাগিল। ফরাসী, আমেরিকাবাসী প্রভৃতি অন্যান্য বৈদেশিক জাতিও এ বিষয়ে ইংরেজদিগের সহিত সমবেদনা দেখাইতে লাগিল। আবেদনকারীরা সকলেই সৈনিকদিগের ন্যায় যথানিয়মে সজ্জিত ও শিক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু গবর্ণর জেনেরল এ সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী রক্ষার জন্য সখের সৈনিকদল সংগঠিত করিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখিলেন না। তিনি আবেদনকারীদিগের প্রার্থনায় এই উত্তর দিলেন যে, তাঁহারা বিশেষ কনষ্টেবলরূপে নিযুক্ত হইতে পারেন। গবর্ণর জেনেরলের উত্তরে ইংরেজ সম্প্রদায় অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা অপরিসীম বিরাগ ও ক্ষোভের সহিত মনে করিতে লাগিলেন যে গবর্ণর জেনেরল তাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই তাহাদের কাতর প্রার্থনায় উপেক্ষা দেখাইয়াছেন।

গবর্ণর জেনেরল যে, আবেদনকারীদিগের প্রতি তাচ্ছীল্য দেখাইয়া তাহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। এই সময়ে বাহিরে সাধারণের সমক্ষে আপনাদের গভীর আশঙ্কার চিহ্ন প্রকাশ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। এরূপ করিলে হয়ত সাধারণের হৃদয় অধিকতর

উত্তেজিত হইয়া উঠিত। ইংরেজদিগকে সকল বিষয়ে আট ঘাট বাঁধিতে দেখিয়া সাধারণে হয়ত আপনাদের জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় অধিকতর বিচলিত হইয়া উঠিত। লর্ড কানিঙ্‌ সম্প্রদায় বা শ্রেণীবিশেষের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। তিনি সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল জাতিরই শাসন, পালন ও রক্ষার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, নিজ কলিকাতা ও সহরতলীতে সকলেই যারপর নাই ভীত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল স্থানে বিভিন্ন ধর্ম্মের, বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করিয়া থাকে। এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিবাস ভূমিতে এক শ্রেণীকে শান্ত ও নিরুদ্বেগ করিবার জন্য যাহা করা যাইবে, হয়ত তাহাতে অন্য শ্রেণী অধিকতর ভীতি-গ্রস্ত হইয়া উঠিবে। যাহাতে সকলেই শান্ত হয়, সকলেই সর্ব্বব্যাপী আশঙ্কার আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, উপস্থিত সময়ে তাহাই করা উচিত। এ সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ ভয়ে যারপরনাই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা আপনাদের জাতিনাশ হইবে বলিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভয়ঙ্করী বিভীষিকায় বিচলিত হইতেছিল, এবং আপনাদের জীবন বিনষ্ট হইবে ভাবিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিকম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। নানাবিধ বিস্ময়কর বাজারগুজব সকল বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। লর্ড কানিঙ্‌ প্রকাশ্য ঘোষণা পত্র দ্বারা, যাহাতে এই সকল কাহিনীর অমূলকত্ব সপ্রমাণ করেন, তজ্জন্য ইংরেজ সম্প্রদায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। লর্ড কানিঙ্‌ ২০এ মে লিখেন, "বাজার গুজব উঠিয়াছে যে, আমি হিন্দুদিগের ধর্ম্ম-নাশের জন্য, যে সকল পুষ্করিণীতে হিন্দুগণ স্নান করে, তৎসমুদয়ে গোমাংস ফেলিয়া দিতে আদেশ দিয়াছি. জনসাধারণকে অপবিত্র খাদ্য গ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য মহারাণীর জন্ম দিনে সমস্ত মুদীর দোকানই বন্ধ করা হইবে। যে সকল লোকের এ সময়ে ধীরভাবে বুঝিয়া চলা উচিত, তাহারাও আগ্রহের সহিত বলিতেছেন যে, ঐ সকল গুজবের প্রত্যেকটি যেমন বাজারে প্রচারিত হইবে, অমনি প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা তাহা অলীক বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা কর্ত্তব্য। এরূপ করা হইতেছে না বলিয়া ঐ সকল লোক পিস্তল লইয়া সজ্জিত হইতেছেন। এইরূপ জনরবের অলীকত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য, আমার বিবেচনায় যাহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হইয়াছে, আমি তাহাই অবলম্বন করিয়াছি। ধীরতা ও দৃঢ়তার সহিত চলিলে আমি আশা করি,

সাধারণের হৃদয় শান্ত হইবে।" মহামতি লর্ড কানিঙ্ এইরূপ ধীরভাবে ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ছিলেন এবং সম্প্রদায় বিশেষের কটূক্তি ও উত্তেজনার মধ্যেও দৃঢ়তা হইতে অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া শান্ত-ভাবে শান্তির রাজ্য অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা পাইতে ছিলেন।

ভয়ঙ্কর বিপ্লবের সময়ে মহামতি লর্ড কানিঙ্ যেরূপ উদারতা ও সমদৃষ্টি দেখাইয়া ছিলেন, এখন প্রগাঢ় শান্তির সময়ে সেইরূপ উদারতা ও সমদর্শিতা রক্ষিত হইলে, শাসিত জনপদের যে, কতদূর মঙ্গল হইতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ।

আমরা মানুষ বলিয়া অনেক সময়ে অহঙ্কার করিয়া থাকি। প্রকৃত মানুষ হইতে পারিলে অহঙ্কারের কথাও আছে। কিন্তু প্রকৃত মানুষ কাহাকে বলিব? আহার, নিদ্রা, ভয়, ভোগ, লালসাদি কতকগুলি সাধারণ প্রবৃত্তি আছে, ঐ সকল বৃত্তি মানুষেরও যেমন, পশুরও তেমন। সুতরাং ঐ সকল বৃত্তির দ্বারা পশু হইতে মানুষ পৃথক্ করিতে পারা যায় না। সেই জন্যই হিতোপদেশকার বলিয়াছেন—

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং
জ্ঞানং নরাণামধিকং বিশেষঃ
জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।"

অর্থাৎ "আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতি পশুরও যেমন মানুষেরও তেমন। মানুষের কেবল জ্ঞানটী মাত্র বেশী। যাহার জ্ঞান নাই সে পশু।" আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সাধারণ কতকগুলি বৃত্তির সহিত যখন জ্ঞান মিলিত হয় তখনই মানুষের মানুষত্ব, যতদিন জ্ঞান মিলিত না হয়, ততদিন তাহার পশুত্ব দূর হয় না, মনুষ্যত্ব জন্মে না।

তবেই দেখা গেল, আমরা জন্মিয়াই মানুষ হই না। জন্মকালে আমাদের মানুষের মত চোক, মুখ, নাক, কাণ, সবই হয় বটে, কিন্তু তথাপি আমরা মানুষ নই। এই জন্ম আমাদের প্রাণী জন্ম, মনুষ্য জন্ম তখনও হয় নাই, আমাদের মনুষ্যত্ব তখনও জন্মে নাই। পিতা আমাদের জন্মদাতা, তাঁহারই কৃপায় আমরা এ জগতে আসিয়াছি, তিনি আমাদের গুরু, তিনি আমাদের পূজনীয়, আরাধনীয়। কিন্তু আমাদের উৎকৃষ্টতর জন্ম, এখনও বাকী। সেই উৎকৃষ্টতর জন্মদাতা, বা জ্ঞানদাতাও আমাদের পিতা। সেই জ্ঞানদাতা পিতা, আমাদের শিক্ষক, গুরু, আচার্য্য। মনু বলেন :—

"আচার্য্যো ব্রাহ্মণোমূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।"

আচার্য্য বা শিক্ষক পরমাত্মার মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি। প্রজাপতি সৃষ্টিকর্ত্তা, পিতা জন্মদাতা, সেই জন্য পিতাকে প্রজাপতির মূর্ত্তি বলা হইয়াছে। আচার্য্য জ্ঞানদাতা, সেই জন্য তাঁহাকে জ্ঞানময় ব্রহ্মের মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মনু জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা, জ্ঞানদাতা পিতাকে একটু উচ্চে স্থান দিয়াছেন। বোধ হয়, তাহা অতি যুক্তিসঙ্গত। পিতা আমার জন্মদাতা, এজন্য আমি তাঁহার কাছে ঋণী। কিন্তু আমি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন মহা জরায়ুতে আজিও পড়িয়া আছি। কিছুই দেখিতে পাই না, জগতের কিছুই জানিতে পারি না, বুঝিতে পারি না। আমি কি তা জানি না, পশুতে আমাতে প্রভেদ কি, সে জ্ঞান আমার নাই। যে গুরু জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা আমার মত অজ্ঞান তিমিরান্ধ প্রাণীরও চক্ষুরুন্মীলিত করেন, তিনি যে উৎকৃষ্টতর জন্মদাতা তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহার প্রসাদেই আমরা মনুষ্য জীবন লাভ করিয়াছি। সাধারণ প্রাণী জীবন অপেক্ষা মনুষ্য জীবন যেমন শ্রেষ্ঠ, উৎপাদক পিতা অপেক্ষা জ্ঞানদাতা পিতা তেমনি শ্রেষ্ঠ।

মনু বলিতেছেন :—

"উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।"

অর্থাৎ জনক ও শিক্ষক দুইই পিতা, যেহেতু উভয়ই জন্মদাতা। তাঁহাদের মধ্যে উৎপাদক পিতা অপেক্ষা ব্রহ্মদাতা পিতাই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মদাতা অর্থে বেদের উপদেষ্টা বা প্রকৃত জ্ঞানদাতা।

বয়োজ্যেষ্ঠতা অপেক্ষা জ্ঞানজ্যেষ্ঠতার আদর চিরকালই বেশী। শিষ্য

অপেক্ষা গুরুর বয়স কম হইলেও তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান করিতে হইবে। এই বিষয়ে মনুতে এই সুন্দর গল্পটি আছে।

অঙ্গিরার পুত্র শিশুকবি তাঁহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃব্য ও পিতৃব্য পুত্রদিগকে পড়াইতেন, এবং "হে পুত্রক" বলিয়া ডাকিতেন। এইরূপ সম্বোধনে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদের নিকট "পুত্রক" শব্দ যুক্ত কিনা জিজ্ঞাসা করেন। দেবতারা মিলিত হইয়া বলিলেন, "শিশু তোমাদিগকে ঠিকই বলিয়াছে। যে ব্যক্তি অজ্ঞ সেই বালক, যিনি উপদেষ্টা, তিনিই পিতা, পণ্ডিতেরা এইরূপ বলেন।" মস্তকের কেশ পক্ক হইলেই যে বৃদ্ধ হয়, এমন নহে, যুবা হইয়াও যদি বিদ্বান হয়েন, তবে তাঁহাকে দেবতারা বৃদ্ধ বলেন। গুরু বয়সে কমই হউন আর বেশী হউন, তিনি শিষ্যের মান্য, তিনি শিষ্যের পিতা, উৎপাদক পিতা অপেক্ষাও সম্মানের পাত্র।

আজকাল গুরু শিষ্য বলিলে আমরা দুই রকমের গুরু ও দুই রকমের শিষ্য বুঝি। প্রথম, শিক্ষক ও ছাত্র, দ্বিতীয়ত দীক্ষাগুরু ও দীক্ষিত শিষ্য। আমি এ পর্য্যন্ত শিক্ষক ও ছাত্র অর্থেই গুরু শিষ্য কথা দুইটীর ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, পরেও করিব। শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পরের সম্পর্ক ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় লইয়াই এই প্রবন্ধ।

শিক্ষাগুরু আবার পূর্ব্বে কার্য্যভেদে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হইতেন। যিনি উপনয়ন দিয়া সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করাইতেন তিনি আচার্য্য নামে কথিত হইতেন এবং যিনি অর্থলাভের জন্য বেদের এক দেশ বা বেদাদি পড়াইতেন তাঁহাকে উপাধ্যায় বলা হইত। এখন গুরু বলিলে সাধারণত জ্ঞানদাতা মাত্রকেই বুঝায়, সেই জন্য উপাধ্যায় ও আচার্য্য দুই অর্থেই গুরু শব্দের ব্যবহার করিলাম।

যতদূর দেখা গেল, তাহাতে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধটা কি কতক বুঝা গেল? গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ কেবলমাত্র পার্থিব নয়, লৌকিক নয়, সামাজিক নয়, তাহাতে লৌকিকতা প্রভৃতি সমস্ত ত আছেই, আরও কিছু বেশী আছে,— সেটুকু আধ্যাত্মিকতা। এই সম্বন্ধ ক্ষণভঙ্গুর নয়, ইহা সত্য, অজর, অমর, অবিনশ্বর, অনন্তকাল স্থায়ী। ভৌতিক দেহের সহিত এই সম্বন্ধের ধ্বংস নাই। ভগবান মনু বলিয়াছেন:—

"আচার্য্যস্ত্বস্য যাং জাতিং বিধিবৎ বেদপারগঃ।
উৎপাদয়তি সাবিত্র্যা সা সত্যা, সাজরামরা॥"

বেদজ্ঞ আচার্য্য গায়ত্রী উপদেশ দ্বারা যে জন্ম উৎপাদন করেন তাহা ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ বলিয়া সত্য, অজর, অমর। যাঁহার প্রসাদে আমরা ব্রহ্ম পর্য্যন্ত পাইতে পারি, তাঁহার সহিত সম্বন্ধকে কোন মতেই ক্ষণিক বলা যাইতে পারে না।

গুরুর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মনু যাহা বলেন তাহার মর্ম্মানুবাদ এই—ধার্ম্মিক অধ্যাপক শিষ্যদিগের উপর কোনরূপ গুরুতর হিংসা না করিয়া শিক্ষা দান করিবেন। মধুর ও মৃদু বাক্যে শিষ্যের প্রীতি উৎপাদন করিবেন। ইত্যাদি

শিষ্যের কর্ত্তব্য অনেক। মনুর শ্লোক তুলিবার আবশ্যক নাই। মনু যেরূপ শিষ্যের কথা বলিয়াছেন, সেইরূপ শিষ্য ভারতে আর কোন কালে হইবে কি না সন্দেহ। শিষ্যের মধ্যে যে সকল গুণ থাকা নিতান্তই প্রয়োজন তাহার কয়েকটা এই,—

শিষ্য জিতেন্দ্রিয় হইবে, রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইবে না, গুরুর প্রতি কখনও অভক্তি, অনাদর, অনাস্থা দেখাইবে না। মিথ্যাচরণ সকল সময়েই গর্হিত কার্য্য, ছাত্রাবস্থায় আরও বেশী গর্হিত। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি যাহাতে উন্নতি প্রাপ্ত হয়, তাহার চেষ্টা করা শিষ্যের নিতান্তই প্রয়োজন। বেশ ভূষাদির শোভা সম্পাদনে বিশেষ যত্ন করিবে না, বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া ছাত্রের কর্ত্তব্য নহে। ইত্যাদি—

ছাত্রের সহাধ্যায়ীর ছাত্রের প্রতি ভাইয়ের মত ব্যবহার করা উচিত। একজনের দুঃখে অপরে দুঃখ অনুভব করিবে, এবং সুখে সুখ অনুভব করিবে।

শিষ্য যে স্থানে গুরুর নিন্দা বা পরীবাদ শুনিবে, হয় সেস্থান হইতে অপর স্থানে চলিয়া যাইবে, অথবা কাণ ঢাকিয়া রাখিবে। মনু বলেন—

"গুরোর্যত্র পরীবাদ, নিন্দাবাপি প্রবর্ত্ততে
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে গুরুশিষ্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, কিরূপ আচরণ ছিল তাহার ছায়ামাত্র আমি দেখাইলাম। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণই প্রধানত গুরু ছিলেন। তাঁহারা বেদ অধ্যাপন করাইতেন। সুতরাং এখন আমরা অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ এখন কিরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে দেখা যাউক।

ভারতবর্ষের অপর কোন প্রদেশের কথা আমি জানি না। বাঙ্গালাতে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক স্থির করিবার পূর্ব্বে একটী কথা বলা আবশ্যক যে

বাঙ্গালায় গুরু শিষ্য এক রকম নহে। এখন বাঙ্গালায় হিন্দুদের মধ্যে দুই রকম শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত। সুতরাং দুই রকম গুরু শিষ্য দেখিতে পাই। দুই শিক্ষাপ্রণালীতে যখন অনেক প্রভেদ, তখন গুরুশিষ্যের সম্পর্ক দুই রকম হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। টোলে ও ইংরাজি স্কুলে সম্পূর্ণ পৃথক্ নিয়মে অধ্যাপনা হয়। টোল পূর্ব্বনিয়মের অনুসরণ করিয়া চলিতে চান, পূর্ব্ব নিয়ম রক্ষা করিতে চান। কিন্তু স্কুলে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ অন্যরূপ। সেখানে কোন বিশেষ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া কেহ চলে না। ছাত্রগণ তাহাদের সাধারণ জ্ঞানে গুরুকে যতদূর ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত মনে করে, তাই করে। টোলের ছাত্রগণ গুরুবাক্য লঙ্ঘন মহাপাপ মনে করে, স্কুলের ছাত্র অনেক সময়ে কিছুই মনে করে না।

যদিও পূর্ব্বনিয়ম রক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প, তথাপি টোলে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক মর্য্যাদা রাখিয়াছে। টোলে অধ্যাপক আজিও ছাত্রের "পিতা" অধ্যাপকের ভ্রাতা "খুড়ো" সহাধ্যায়ী ছাত্র "দাদা" বা "ভায়া"। টোলের পূর্ব্ব গৌরবের সহিত আধুনিক দুরবস্থার তুলনা করিলে যদিও টোলের অনেক অবনতি হইয়াছে দেখা যায়, তথাপি ইহার গৌরব একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, ইহা বেশ বলিতে পারা যায়। টোলের অধ্যাপকগণ এখনও পূর্ব্ববৎ নিস্পৃহ, অথবা সামান্য অর্থেই সন্তুষ্ট। যতদিন অধ্যাপকগণ এইরূপ নিস্পৃহ থাকিবেন, যতদিন বিলাসিতার মোহন মন্ত্রের ছলনে না ভুলিবেন, যতদিন নিজের কর্ত্তব্যজ্ঞান, স্বাভাবিক তেজ, শাস্ত্রানুশীলনে আসক্তি, স্বকীয় ধর্ম্মে অবিচল অনুরাগ হইতে অণুমাত্র বিচলিত না হইবেন, যতদিন শাস্ত্রচিন্তায় জলাঞ্জলি না দিয়া, নিজের বংশপরম্পরাগত সম্মানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চাটুকারবৃত্তিতে দীক্ষিত না হইয়া, নিজের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিবেন, যত দিন "উপাধি ব্যাধি" গ্রস্ত হইয়া ঘৃণিত পদানুসরণ না করিবেন, ততদিন আমরা টোলের মধুর শিক্ষা, পবিত্র শিক্ষা, স্বর্গীয় শিক্ষার জ্যোতি দেখিতে পাইব, সহাধ্যায়ীর মধ্যে সহোদর প্রীতি দেখিয়া হৃদয়ে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতে পারিব, গুরুর প্রতি ছাত্রের অকৃত্রিম ভক্তি দেখিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে পারিব।

এইস্থানে আমি টোলের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের বিষয়ে কোন কথা বলিতে হইলে, টোলের কি নিয়মানুসারে পড়া হয়, কি নিয়মে থাকা হয়, অধ্যাপক ছাত্রের সহিত কিরূপ ব্যবহার

করেন, তাহা বলা আবশ্যক। অনেক দিন হইল "সাধারণীতে" প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার মর্ম্ম এই,—

ছাত্র ভোরে উঠিয়া "আবৃত্তি" আরম্ভ করেন। টোলের ছাত্রগণ আবৃত্তিকে পাঠের একটা অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা বলেন--"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী"। অর্থাৎ আবৃত্তি—অর্থ বুঝা অপেক্ষাও ভাল। আবৃত্তি শেষ হইলে তাঁহারা অধ্যাপকের কাছে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। গুরু আসনে উপবেশন করিলেন, ছাত্রগণ সম্মুখে বসিলেন। ছাত্রের হৃদয়ে ভক্তির স্রোত বহিতে লাগিল, গুরুভক্তিতে হৃদয় স্নিগ্ধ হইল, ছাত্র গুরুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া পাঠারম্ভ করিলেন, পাঠশেষ হইলে গুরুকে আবার নমস্কার করিয়া স্থানান্তরে বসিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অধ্যয়ন অধ্যাপন চলিতে লাগিল। গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি অচল, প্রগাঢ়, শিষ্যের প্রতি গুরুর স্নেহ অচল, অটল, প্রগাঢ়।

বৈকালবেলা নূতন পড়া হয় না। সকালবেলা যাহা পড়া হয়, তাহার আলোচনা। এইরূপ আলোচনাকে টোলের ছাত্রগণ "পাঠ চাওয়া" বলেন। এই সময়ে ছাত্রে ছাত্রে অলৌকিক ভ্রাতৃভাবে পরিচয়। ছাত্রের প্রতি ছাত্রের স্বর্গীয় প্রীতির দৃষ্টান্ত। অধ্যাপক অধিক পাঠের ছাত্রকে পাঠ চাওয়ান, তার পর যাহার অপেক্ষা যে কম পড়ে, সে তাহার কাছে পাঠ চায়। অধিক পাঠের ছাত্রকে অল্প পাঠের ছাত্র অগ্রজের মত ভক্তি করেন, তিনিও তাঁহাকে কনিষ্ঠের মত স্নেহ করেন। এই সকল নিয়মের গভীরতা না বুঝিতে পারিয়া অনেকে টোলের সমস্ত প্রথারই দোষ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। বাস্তবিক টোল নিন্দার বস্তু নয়। পূর্ব্বে হিন্দুদের গুরু শিষ্যের কিরূপ সম্পর্ক ছিল, তাহা টোলে গেলেই কতক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়।

স্কুলে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক অন্যরূপ। পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে টোলের নিয়ম চলিত। এখন সংস্কৃত কলেজ হইতেও সে নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। এখন অপর স্কুলেও গুরু শিষ্যের যে সম্পর্ক, সংস্কৃত কলেজেও তাই।

ইংরাজি স্কুলে গুরুশিষ্যের সম্পর্কটা বড়ই শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। বালকগণ যতদিন নিম্নশ্রেণীতে পড়ে, ততদিন তাহাদের কোমল, সরল, নির্ম্মল, হৃদয়ে গুরুভক্তির একটু রেখা দেখা যায়। কোমল জিনিষে রেখা বেশী দিন থাকে না, শিশুর কোমল হৃদয়ের ভক্তি রেখাও জলরেখাবৎ বিলুপ্ত

হইয়া যায়। শিশুকালে যে গুরুভক্তির চিহ্ন দেখিতে পাই, উহা গুরুভক্তি কিম্বা ভয়ের রূপান্তর মাত্র, বুঝিতে পারি না। স্কুলের ছাত্রগণে গুরুভক্তির অভাবই পদে পদে লক্ষিত হয়।

যাঁহার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস নাই, তাঁহার কথা হৃদয়ে স্থান পাইবে কেন? সন্দেহ, দ্বৈধভাব, অবিশ্বাস শিক্ষার বিশেষ অন্তরায়। আমাদের ছাত্রগণের অধ্যাপকের উপর কথায় কথায় সন্দেহ। তাহারা "গুরোর্ব্বচঃ সত্যমসত্য মন্যৎ" গুরুর কথাই ঠিক, অপর মিথ্যা, এই মহাবাক্যের অনুসরণ করে না। গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস নাই, সুতরাং গুরুদক্ষিণার ঘটাটা একটু বেশী হইয়া দাড়াইয়াছে। অধ্যাপক পাঠের জন্য কোনরূপ তিরস্কার করিলেন, ছাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া রাস্তায় গুরুদক্ষিণার বন্দোবস্ত করিয়া গেল। পূর্ব্বে গুরুদক্ষিণার বন্দোবস্ত ছিল "উপহারে" এখন "প্রহারে।" ছাত্রদের অবশ্যই দোষ নাই, "প্র" উপসর্গটা যুটিয়াই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এমন স্কুল আজকাল বড়ই বিরল, যেখানে এমন গুরুভক্ত ছাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে একবার গুরুভক্তির একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। সময়টা আমার ঠিক মনে নাই, বোধ হয়, ১৮৮২ সাল। এক শ্রেণীর ছাত্রগণ, দেওয়ালের গায়ে গুরুর অশ্রাব্য স্তুতি লিখিয়া গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান। তাহার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্লাসের সমস্ত বালক তাড়াইয়া দেন। গুরুর অপমানের জন্য একটা ক্লাসের সমস্ত বালক তাড়াইতে হইল, ইহাপেক্ষা হিন্দুর আর কি অধঃপতন হইবে?

গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ-শিথিলতার এইখানেই শেষ হয় নাই। গুরুনিন্দা গুরুপ্রহার, গুরুতিরস্কার করিয়াই আধুনিক গুরুভক্তগণ খুসী নয়, যেখানে সেখানে, যখন তখন, তাহারা গুরুদানব-পরাজয় কাহিনী, অট্টহাস্য হাসিয়া, ঈষৎ গম্ভীরতা, ঈষৎ তরলতার সহিত বলিয়া বাহাদুরী দেখাইয়া থাকে। বলিয়া থাকে—"কত মাষ্টর পণ্ডিত ঠিক করে দিয়েছি।" এইরূপ গুরুদক্ষিণার বন্দোবস্ত কলিকাতায়ই বেশী। পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ে যদিও গুরুভক্তির বেশী একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি এতটা অধঃপতনের চিহ্ন দেখা যায় না।

তার পর সহাধ্যায়ীর প্রতি ব্যবহার। তাহাতেও স্কুলের ছাত্রের প্রশংসা করিতে পারি না। সহাধ্যায়ীর সহিত সদ্ভাব জন্মান ত দূরের কথা, দুই তিন

বৎসর একত্র পাঠ করিয়া ছাত্রেরা পরস্পর নাম পর্য্যন্ত জানেন না। মানুষ একেবারে আপনাকে লইয়া থাকিতে পারে না, তাই দুই এক জনের সহিত আলাপ থাকে। ইহাতে সহাধ্যায়ীর প্রতি উচিত ব্যবহার করা হইল বলিয়া, বোধ হয়, কেহই স্পর্দ্ধা করিবেন না।

আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, স্কুলে যত ছাত্র পড়ে সকলেই গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনাদর করে। এখনও স্কুলে অনেক গুরুভক্ত ছাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুভক্তির জন্য, মাতৃভক্তির জন্য, বা স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য আবার প্রশংসা কি? উহা ত কর্ত্তব্য কার্য্য। আমরা ক্রমে এতদূর শোচনীয় দশায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি যে, আমাদের গুরুভক্তি, মাতৃভক্তি, স্বধর্ম্মে বিশ্বাসও একটা প্রশংসা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কয়েক দিন পরে ছেলেকে ছেলে বলাটাও হয়ত প্রশংসার কথা হইয়া দাঁড়াইবে।

এরূপ হইল কেন? গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ কেন এতদূর শিথিল হইল? তাহার কারণ অনেকগুলি। আমার বোধহয়, এই কয়টী কারণই—প্রধান।

প্রথম। গুরুর সহিত শিষ্যের ঘনিষ্ঠতার অভাব। পূর্ব্বে গুরুর বাড়ীতে শিষ্য বাস করিত, সুতরাং দেখিয়া শুনিয়া গুরুর আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি শিক্ষার অভ্যাস হইত। সর্ব্বদা দর্শনে, সর্ব্বদা সম্ভাষণে তাহাদের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হইত। স্কুলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় শিক্ষক বদল হয়, দিনে এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা শিক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইহাতে অবশ্যই ঘনিষ্ঠতার আশা করা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বের মত গুরুশিষ্য সম্বন্ধ স্কুলে হইতে পারে, এ আশা দুরাশা মাত্র।

দ্বিতীয়। পূর্ব্বে গুরু একজন থাকিতেন, এখন তাঁহার স্থানে অনেক। একের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে যতটা সুবিধা, দশের প্রতি অবশ্যই ততটা নহে। প্রতি বৎসর শিষ্যের নূতন নূতন শ্রেণীতে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুরু সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, ছাত্রেরও কর্ত্তব্য বাড়ে। গুরু এক রকমের হইলে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা সহজ। কিন্তু এখন একটা ছাত্রের নয়টী গুরু। নয়টী আবার নবরঙ্গের। একজনের হিন্দুধর্ম্মে অনুরাগ, একজন খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষপাতী, আর একজন হয়ত কোন একটা উপধর্ম্মের উপাসক। হিন্দু শিক্ষক বলেন গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ "পিতাপুত্রের সম্বন্ধ।" অপর একজন বলেন গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ, "ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার সম্বন্ধ।" খ্রীষ্টান অধ্যাপক হয়ত আর এক রকম বলিবেন। এখন ছাত্র কি শিখিবে? কাহাকে খুসী

করিবে? সুতরাং শিষ্যের ঘাড়ে গুরুকে অসন্তুষ্ট করার দোষ একটু পড়িবেই পড়িবে।

তৃতীয়। গুরুর কর্ত্তব্যের শিথিলতা। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর অবশ্যম্ভাবী ফলই গুরুর কর্ত্তব্যের ত্রুটি। তাহার প্রধান কারণ আর্থিক সম্বন্ধ। গুরু পড়ান, পূর্ব্বের মত ধর্ম্ম উপার্জ্জনের জন্য নয়,—কেবল অর্থের জন্য। কর্ত্তব্য পালনে ধর্ম্ম হয়, কি শিষ্যের পাঠের ব্যাঘাত হইলে অধর্ম্ম হয়, তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। দিনটী গেলেই দুইটী টাকা পাইবে, দুই টাকায় রোজ দুই ঘণ্টা করিয়া খাটিবে, ঘণ্টাটী বাজিলেই বাড়ী চলিয়া যাইবে—এই তাঁহাদের হিসাব। ছাত্রের মঙ্গলের জন্য দুই ঘণ্টা সময় অধিক ব্যয় করিতে তাঁহাদের হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। অবশ্যই এমন কোন মহাত্মা থাকিতে পারেন, যিনি অর্থের লালসা না করিয়া ছাত্রের উন্নতির জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন। তাঁহার বার্য্যকে সকলেই প্রশংসা করিবেন, আমিও করি। কিন্তু সাধারণত কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, আর্থিক সম্বন্ধের জন্যও শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সম্বন্ধের শিথিলতা ঘটিয়াছে।

চতুর্থ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষেও গুরুশিষ্যের সম্বন্ধটা শিথিল হইতেছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের দেশে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ জ্ঞানগত। জ্ঞান তাহার মূল ভিত্তি। জ্ঞান যে শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, সে শিক্ষায় জ্ঞানগত সম্বন্ধ থাকতে পারে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত জ্ঞান দান করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদের জ্ঞান পরীক্ষাগত, পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হইল সেই জ্ঞানী, যে উত্তীর্ণ হইল না সে অজ্ঞান। সুতরাং যাহাতে ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহাই শিক্ষকগণ শিখাইতে ব্যস্ত থাকেন। ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, মহাজ্ঞানী হইল, ঐ খানেই গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ঘুচিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানের কথায় আমার একটা বৈরাগীর জামার কথা মনে পড়িল। বাউলদের মধ্যে মাঝে মাঝে এক রকম জামা দেখা যায়, সেই সকল জামা উনপঞ্চাশ বা বেশী রকমের ছিটের দ্বারা প্রস্তুত। সকল রকমের ছিটখণ্ড সূচী সূত্রের মাহাত্ম্যে জামারূপে পরিণত হয়। যখন আমরা ঐ জামার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন তাহার বাহ্যিক চাকচিক্যে মোহিত হই, শিল্পীকে বাহবা দিই। কতকদিনের পর, সূত্রের জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রযুক্ত কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত ছিটখণ্ড সকল স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে। তাহার প্রকৃত মূল্য বাহির হইয়া পড়ে। আমাদের বিশ্ব-

বিদ্যালয়ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূবিদ্যা, রসায়ন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যার টুকরা দিয়া একটী জামা প্রস্তুত করিয়া ছাত্রের গায়ে দিয়া দেন, দুই দিন পরে যখন তাহাদের মেধা সূত্র ছিন্ন হয়, তখন সেই জামার কিছুই থাকে না। জ্ঞানই যখন জন্মিল না, তখন জ্ঞানগত সম্বন্ধ থাকিবে, কেমন করিয়া ?

পঞ্চম। পূর্ব্বে ছাত্রগণ ইচ্ছামত শিক্ষক বাছিয়া লইতে পারিত। এখন ইচ্ছামত স্কুল বাছিয়া লইতে পারে। স্কুলে তাহার অদৃষ্টে কিরূপ শিক্ষক লাভ হইবে, তাহা সে জানিতে পারে না। হয়ত স্কুলে প্রবেশ করিয়াই দেখিল শিক্ষক তাহার মনের মত নয়। অগত্যা তাহাকে স্কুল ছাড়িতে হইল। এইরূপ স্কুল পরিবর্ত্তনও গুরুশিষ্যের সম্পর্ক শিথিলতার কারণ।

ষষ্ঠ। স্কুলে সকল শিক্ষক সমান নয়। দুই একজন শিক্ষক, কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের "প্রহ্লাদ চরিত্রের" ষণ্ডামর্কের মতও আছেন, প্রহ্লাদ শিষ্য ত আর সব স্থানে যোটে না, সুতরাং নানা রকম অন্যায় কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, গুরু দক্ষিণার গুরুতর ঘটার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

গুরশিষ্যের সম্বন্ধ শিথিলতার যে কয়টি কারণ দেখাইলাম, ইহার অনেক গুলি টোলে নাই, সুতরাং টোলে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ এতদূর শোচনীয় হয় নাই। অনেক দিন পূর্ব্বে স্কুলেও গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা অনেক পবিত্র ছিল। মহাত্মা ডেবিড্ হেয়ার, প্যারিচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি অধ্যাপকগণ আজিও ছাত্রের হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাদের স্নেহ, মমতা, ছাত্রবৎসলতা, সর্ব্বজন বিদিত। যদি ছাত্রকে আপনার মত দেখিতে না জানি, আপনার মত ভাবিতে না পারি, তবে সেই বা আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিবে কেন ?

গুরুশিষ্যের সম্পর্ক নানা কারণে শিথিল হইয়াছে দেখাইলাম। উহার কারণ ছাত্রের দোষ, শিক্ষা প্রণালীর দোষ, শিক্ষকের দোষ, প্রভৃতি সকল প্রকার দোষের সমষ্টি। এই বিষয়ে কতকটা সংস্কার আবশ্যক। পূর্ব্বে যেরূপ গুরুশিষ্য ভাব ছিল আবার তাহা কর, যে নিয়ম আজিকার দিনে ভাল বলিয়া বিশ্বাস না হয়, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা তাহা ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দেও, এরূপ কথা আমি বলিতে চাহি না। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে আমি বড় ভয় করি। আমি বলি, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধটা নেহাত ক্রয় বিক্রয়ের সম্বন্ধ বলিয়া বালকগণ যাহাতে মনে না করে, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। আমরা হিন্দু এই কথাটি আমাদের মনে রাখা

উচিত। আমরা যদি সর্ব্বান্তঃকরণে শিক্ষকের সম্মান করিতে না জানি তবে কেবল যে তাঁহাদের মর্য্যাদার হানি করিলাম এমন নহে, নিজেরও সম্মান হানি করিলাম। হিন্দু কোন কালে অকৃতজ্ঞ নহেন। যাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান রত্ন লাভ করি, তিনি শত দোষের আকর হইলেও আমার কাছে তিনি পূজ্য, আমার ভক্তির পাত্র। নানা কারণে আমাদের জ্ঞানের পূর্ণতা হইতেছে না বলিয়া, গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান অকৃতজ্ঞের ধর্ম্ম। শিক্ষা কালে গুরু আমাদিগকে এমন অনেক কথা বলেন যাহার একটী কথা পালনে সমর্থ হইলেও আমরা অনন্ত কাল সুখে কাটাইতে পারি। বেদে আছে—

"একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ
স্বর্গে লোকে চ কামধুক্ ভবতি।"

একটী শব্দ যদি উপযুক্তরূপে প্রয়োগ করা যায়, এবং তাহার অর্থগ্রহ করা যায়, তবে স্বর্গে, মর্ত্তে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায়। কূর্ম্ম পুরাণ বলেন :—

"আত্মনঃ সর্ব্বযত্নেন প্রাণত্যাগেন বা পুনঃ
পূজনীয়া বিশেষেণ পঞ্চৈতে ভূতিমিচ্ছতা।"

অর্থাৎ মঙ্গলেচ্ছুগণ প্রাণপণে গুরুদেব পূজা করেন। অত্রিসংহিতা বলেন,—

"একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা সোঽনৃণী ভবেৎ॥"

অর্থাৎ একটী অক্ষরও যে গুরু শিক্ষা দিয়াছেন, শিষ্য জগতের কোন বস্তু প্রদান করিলে তাঁহার ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। এইরূপ হিন্দুর কৃতজ্ঞতা। সেই হিন্দু কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অকৃতজ্ঞতার কালী মুখে মাখিয়া গুরুর অমর্য্যাদারূপ মহা পঙ্কে যাহাতে পতিত হইতে না হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা কি ছাত্র মাত্রেরই উচিত নয়? কত বার দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের সহিত সম্মুখ সমরে উপস্থিত হইয়াছেন, অর্জ্জুন তাঁহার সহিত যুদ্ধও করিয়াছেন, কিন্তু মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কখন ভুলেন নাই, গুরুর অঙ্গে শর বিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার পদ বন্দনা করিতেন। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের বিষয় যতই ভাবা যায়, ততই তাহার মাধুর্য্যে মোহিত হইতে হয়, ভাবে বিভোর হইতে হয়, গুণের মহিমায় চমৎকৃত হইতে হয়। গুরুকে গুরুর মত দেখিলে, ছাত্রের হৃদয়েও অসীম আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। দাতা দান করিয়া যতদূর আনন্দ উপভোগ করেন, ভিক্ষুক দান পাইয়াও ততদূর আনন্দ পায় কি না

সন্দেহ। তাই বলি, ছাত্রগণ! তোমরা গুরুকে যতদূর সম্ভব সম্মান করিবে, তাহাতে তোমাদের সম্মান বাড়িবে। মনে রাখিও

"অল্পং বা বহু বা যস্য শ্রুতস্যোপকরোতি যঃ।
তমপীহ গুরুং বিদ্যাৎ শ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া॥"

অর্থাৎ যে শিক্ষক ছাত্রকে অল্পই হউক বা অধিকই হউক, শাস্ত্র অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে গুরু বলিয়া জানিতে হইবে।

আর মনে রাখিও,—অধ্যাপক তোমাদের অন্যায় ব্যবহার সংশোধনের জন্যই তোমাদের উপর শাসন করিয়া থাকেন,—তোমরা ত অধ্যাপকের পর নও। অধ্যাপকছাত্রদের শাসন করেন, পরের ছেলে বলিয়া শাসন করেন না। নিজের কোন অঙ্গে রোগ হইলে যেরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়, সেইরূপ তোমাদের দোষ সংশোধনের জন্য শাসন করেন। যে ছাত্রের মুখে বিষাদের চিহ্ন দেখিলে প্রাণ আকুল হয়, সন্তোষের চিহ্ন দেখিলে হৃদয়ে স্বর্গীয় সুখ অনুভব করি, তাহার সহিত কি ক্ষণস্থায়ী সম্বন্ধ? যাহার দর্শনে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, যাহার কথা শুনিলে কাণ জুড়ায়, যাহার উন্নতি শুনিলে হৃদয়ে আনন্দ ধরে না, যাহাদের সহিত কথোপকথনে স্নেহময়ী জননীর কথা পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যাই, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ কি ক্ষণভঙ্গুর?

ধরণী ও রমণী।

বঙ্গে ধরণীর প্রধানত দুই মূর্ত্তি, বাসন্তী মূর্ত্তি ও প্রাবৃট্ মূর্ত্তি। বঙ্গরমণীরও প্রধানত দুই মূর্ত্তি—সেইরূপ বাসন্তী মূর্ত্তি ও প্রাবৃট মূর্ত্তি।

শীতের অবসানে হিমের তেজ কমিয়া আসে দিঙ্মণ্ডল ক্রমশ পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হয়, গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ পরিস্ফুট হয়, চারিদিকে তাহাদের বিমল ও কোমল জ্যোতিঃ বিভাসিত হয়। শীতে তরু লতা পত্র-পুষ্প শূন্য ছিল, অনেক গাছ একেবারে ডাটা সার হইয়া দীন হীন বেশে জীর্ণ

রোগীর মত অস্থি পঞ্জর লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বসন্তাগমে যেন তাহারা কোন মোহিনী শক্তিবলে পুনরুজ্জীবিত হইল, আবার যেন মৃত শরীরে রক্ত সঞ্চার হইল, নূতন নূতন নানা রঙ্গের পাতা দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে সাদা সাদা, লাল লাল ফুলের কুঁড়ীগুলি উঁকি মারিতে লাগিল। যে উত্তরীয় বায়ু স্পর্শে শরীর জড়সড় হইত, আজ আর সে উত্তরীয় বায়ু বহিতেছে না, এক্ষণে মৃদুমন্দ মধুর মলয় মারুতের কাল পড়িয়াছে। তবে মাঝে মাঝে অনেক দিনের পুরাতন সদ্ভাব ভুলিতে যেন না পারিয়াই, উত্তরীয় বায়ু সময়ে সময়ে এক একবার দেখা দিয়া যান। কিন্তু অসময়ে আসিলে এমনি হয়, দেখিবামাত্র ধরণী আপনার বদনমণ্ডল কুজ্ঝটিকা অবগুণ্ঠনে আবৃত করেন। এইরূপ দিন কতক চলিয়া গেলে উত্তরীয় বায়ু আর বড় দেখা দিতে সাহস করেন না। এক্ষণ দক্ষিণাবায়ু ক্রমাগত বহিতে থাকে। গায়ে লাগিলে শরীর শীতল হয়, প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু যখন সায়ংকালে কাল বৈশাখী বেশে, কখন ঘোর ঘূর্ণী বায়ুরূপে, কখন ভীম ঝঞ্ঝাবাতরূপে আসিয়া সমুপস্থিত হয়, তখন বড়ই ভয়ানক; আবার কখন বৃষ্টিপাত, কখন করকাঘাত—সেইটাই আরও ভয়ানক।

বসন্তকাল ফুলের রাজত্ব সময়, নানাবিধ ফুল চারিদিকে প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধে চারিদিক আকুল করিয়া তুলে। যেমন শোভায় তেমনি গন্ধে, হৃদয় মন আনন্দে ভরপুর করিয়া তোলে। বাগানে, মাঠে, জঙ্গলে, বনে, যেখানে তাকাইবে সেইখানেই ফুল। চারিদিকে ফুল ছড়াইয়া প্রকৃতিদেবী যেন ফুল ক্রীড়ায় বিভোর। অনেক গাছে আজও পাতা দেখা দেয় নাই কেবল ফুলে আচ্ছন্ন, কোনটী কেবল সাদা, কোনটী কেবল লাল। গ্রামে আমের মুকুল, বনে শাল পিয়ালের মুকুল ফুটিয়া চারিদিক গন্ধে পূর্ণ করে। বসন্তে ধরণী ফুলময়ী—ধরণী শোভাময়ী—ধরণী গন্ধময়ী। কেবল এই টুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইলে বসন্ত বর্ণনা ফুরায় না। বসন্তের অপর অঙ্গ কোকিল, পাপিয়া, দহিয়াল, ভ্রমর প্রভৃতির সুমধুর শব্দ। যখন নবরাগভরে নবকিশলয়মধ্য হইতে কোকিল পরদায় পরদায় আওয়াজ চড়াইতে থাকে, পাপিয়া, দহিয়াল প্রভৃতি প্রত্যূষে ক্রমোন্নতি সহকারে ডাকের উপর ডাক ছাড়িতে থাকে, ভ্রমর আম বা শালের মুকুলের ভিতর দলবদ্ধ হইয়া গুণ্ গুণ্ রবে সুর ধরিতে থাকে, তখন মন বিভোর করিয়া তোলে। আপনা আপনি বিস্মৃত হইতে হয়। অমনি যেন বোধ হয় ধরণী এক নূতন সাজে নূতন আওয়াজে মোহিনী

মূর্ত্তিতে আমাদিগকে আত্মবিস্মৃত করিতে আসিয়াছেন। সুতরাং বসন্তের ধরণী ফুলময়ী—ধরণী শোভাময়ী—ধরণী গন্ধময়ী—ধরণী মধুর শব্দময়ী।

আর বর্ষায় ধরণীর আর এক বেশ। এখনও সেই দক্ষিণাবায়ু ক্রমাগত বহিতে থাকে, তবে বসন্তের মত সময়ে সময়ে উত্তরের বায়ু আর দেখা দেয় না, মাঝে মাঝে পূর্ব্ব হইতে বায়ু বহিতে থাকে তাহাতে শরীরে জড়তা আনিয়া দেয়, মনের স্ফূর্ত্তি হানি করে, কিন্তু বসন্তের উত্তরের বায়ুর মত ইহাতে ধরণী কুজ্ঝটিকাচ্ছন্না হয় না। বসন্তের ঘূর্ণীবায়ু, বসন্তের কাল বৈশাখী, বসন্তের ঝঞ্ঝাবাত, বসন্তের করকাপাত এখন এ সকল কিছুই নাই। এখন সময়ে সময়ে অজস্রধারে বারি বর্ষণ হয় আর কখন কখন আকাশ মণ্ডল রোষপরবশ হইয়া বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত দেখাইয়া আমাদিগকে ভয়ে জড়সড় করেন। বসন্তে ধরণী ফুলময়ী, বর্ষায় ধরণী ফলময়ী। কিন্তু তা বলিয়া বর্ষায় ফুল ফুটে না, বলিলেও চলিবে না। যে কালে জলে কমল কুমুদ কহ্লার, স্থলে কদম্ব, কেতকী, শেফালিকা, সে কালে ধরণী ফুল-সৌভাগ্য হীনা এ কথা বলিতে পারা যায় না। তবে এখন ফুলে সে রঙ্গের চটক নাই, সে গন্ধের উন্মত্তকারী তেজ নাই। বর্ষায় ধরণীর বেশভূষার আর একটু প্রভেদ,—বসন্তে ধরণী নানা রঙ্গে সুসজ্জিত, বর্ষায় ধরণী আগা গোড়া ভরপুর সবুজে ঢাকা, মাঝে সাদা সাদা বড় বড় ফুল। যেন মা নিজের আনন্দ নিজে রাখিতে না পারিয়া খল খল রবে হাসিয়া বিহ্বল। এই টুকু বড়ই শোভাময়। বর্ষায় নদী খাল বিল সমস্তই জলে ভরপুর। কূলে কূলে জল। এখন অল্প জল লইয়া কুল কুল করিতে করিতে নদী প্রবাহিত নহে, এখন জল প্রাচুর্য্যে গম্ভীরভাবে একই মনে একই গতিতে সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছেন। এখন আর নদীর জোয়ার ভাটা নাই, কেবলই এক টানা ভাটা অভীষ্টাভিমুখে অনন্যমনা অনন্যপন্থা হইয়া চলিয়াছে। তার পর বর্ষায় আর একটী কথা আছে—শব্দ। বর্ষার শব্দ মধুর কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু হৃদয় মন বিভোর করিয়া তোলে। যিনি কখন নিশীথ সময়ে নদী বক্ষে থাকিয়া নদীর তীব্র বেগের ভিতর হইতে একটী অতি মহান্ গম্ভীর শব্দ অনুভব করিয়াছেন, যিনি কখন বজ্রের কড় কড়ানি, বৃষ্টির তড় তড়ানি বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দের একত্র সংস্থানে হৃদয়ে আনন্দ লাভ করিয়াছেন, যিনি কখন শস্য ক্ষেত্রে খাল বিল হইতে অনন্ত কীট পতঙ্গের অজস্র একতান লয়যুক্ত স্বরের সহিত সহস্র জলচর বিহঙ্গের কলরবে বিমোহিত হইয়াছেন,

তিনিই বুঝিতে পারিবেন, বর্ষার ধরণীর যে শব্দ, তাহা মধুর না হইলেও মহান্ বটে কিনা, হৃদয় মন বিভোর করিতে পারে কি না। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বসন্তে ধরণী মাধুর্য্যময়ী, বর্ষায় গাম্ভীর্য্যময়ী।

যুবতীরও দুই মূর্ত্তি, নবমুকুলিতা বাসন্তী তরুণী মূর্ত্তি, ও ক্ষীর-ভর-পয়োধরা গণেশ জননী মূর্ত্তি। প্রথম মোহিনী মূর্ত্তিটীতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল লাবণ্যময় প্রস্ফুটিত। অঙ্গের আভায় দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত, নয়নের জ্যোতিতে চারিদিক চমকিত, কণ্ঠের সুমিষ্ট স্বর বেণু বীণা বিনিন্দিত। সেই পৃষ্ঠ পরিপূরিত ঘোর কৃষ্ণ কেশরাশি, সেই নয়ন—চঞ্চলতা পরিপূর্ণ, সেই ললাট—চিন্তাচিহ্ন বিরহিত। সেই ক্ষীণ অথচ উচ্চস্বর, সেই অঙ্গ জ্যোতি, সেই অশন বসনে ভাবভঙ্গিতে, কথাবার্ত্তায় বিলাসের আবেশ, আসুরক্তির লক্ষণ। আবার বসন্তের আকাশের মত সময়ে সময়ে অভিমান জনিত রোষ—সুবিমল বদন সুধাকরকে ঘোর ঘনাচ্ছন্ন করে। শীত ঋতুর উপশমে যখন হিমের চিহ্নমাত্র আর না থাকে, তখন সুনীল, সুবিস্তৃত নভোমণ্ডলে সেই পৃষ্ঠ পরিপূরিত, সুদূর বিলম্বিত কেশরাজি প্রত্যক্ষ করি। গ্রহ নক্ষত্রের জ্যোতি হিমের অব-সানে পরিস্ফুটিত, চন্দ্র সূর্য্য কিরণ শীতবাতায়ে আবার তেজোময়, চারিদিকেই প্রকৃতি নিজের কোমল আভা দেখাইয়া—তরুণীর অঙ্গ জ্যোতি মনে পড়ান। এই জ্যোতি, এই তেজ,—নিদাঘের জগৎ দাহনকারী প্রখর সূর্য্যকিরণ নহে, ইহাতে কোমলতা মূর্ত্তিমতী, এই জ্যোতিতে চক্ষু জুড়ায়, হৃদয়ে শান্তি হয়। আবার বসন্তে চারিদিকে নূতন নূতন পত্র পুষ্প বিকশিত, সঙ্গে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত। এই প্রস্ফুটিত পুষ্প রাজি মধ্যে তরুণীর সুস্নিগ্ধ হাসি দেখিতে পাই। কোকিল পাপিয়া প্রভৃতি যখন জীলের উপর পরদায় পরদায় আওয়াজ চড়ায়, তখন তাহাদের সেই হৃদয় রঞ্জন মধুর স্বর শুনিয়া আর একটি হৃদয় আনন্দ কারিণী সুমিষ্ট ধ্বনি মনে পড়ে। বসন্তাগমে যখন সময়ে সময়ে মেঘখণ্ড আসিয়া সেই সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় দৃশ্য সমাচ্ছন্ন করে, তখন মনে হয় সেই হৃদয় আনন্দকারী মনোহর বদন রোষের আবেশে সমাচ্ছন্ন। বসন্তেও যাহা দেখিতে পাই তরুণী মূর্ত্তিতেও তাহাই দেখি,—সেই ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, মধ্যে মধ্যে দুই চারি ফোঁটা বৃষ্টিপাত, আবার কখন কখন বা করকাঘাত।

তার পর আর একটি মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটিকে আমরা গণেশ জননী মূর্ত্তি বলিয়াছি। এখনও যৌবন আছে, কিন্তু যৌবনের আর সেই বিলাস বিভ্রম

নাই। অঙ্গে জ্যোতি আছে, কিন্তু এখন সে জ্যোতি প্রশান্ত ও শীতল। নয়নের সে চপলতা নাই বরং তৎপরিবর্ত্তে গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ অনুভূত হয়। এখন সেই সুন্দর ললাটে একটু একটু চিন্তার চিহ্নের পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও কথাবার্ত্তা ভাব ভঙ্গিতে অনুরক্তির বিলক্ষণ আবেশ আছে; কিন্তু প্রথম যৌবনের সেই অনুরক্তি, আর এই বর্ত্তমানাবস্থার অনুরক্তির ভিতর একটু বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে। প্রথম বয়সের অনুরক্তি স্বার্থান্বেষিণী, স্বার্থ-ময়ী, আর পরিণত যৌবনার অনুরক্তিতে স্বার্থের লেশ মাত্র নাই। ইহা ছাড়া এই মূর্ত্তিতে আর একটি জিনিস আছে—সেটি তেজ। "তেজ" বলিতে সচরাচর যাহা বুঝি, এ তেজ সে তেজ নহে,—এ তেজ অঙ্গের জ্যোতি নহে, রূপের মোহিনীশক্তি নহে, অপাঙ্গ দৃষ্টির অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নহে। এ তেজ অন্যরূপ, কি তাহা পরে বলিব। তাহার পর সেই পূর্ব্বের ক্ষীণ অথচ উচ্চস্বর যাহাতে এত মোহিনীশক্তি ছিল, তাহা এক্ষণে গম্ভীর অথচ মধুর স্বরে পরিণত, এখন আর সে কোকিল পাপিয়ার ঝঙ্কার নাই, এখন কণ্ঠের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, আওয়াজ ভরাট হইয়াছে—শুনিতে বেশ গম্ভীর, অথচ পূর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর। প্রকৃতি প্রতি বর্ষায় আমাকে এই শেষোক্ত অতীব মোহিনী মূর্ত্তিটী দেখাইয়া যান। নব যৌবনা ছাড়িয়া পরিণত যৌবনার রূপের মাধুর্য্য, অনেকের ভাল লাগিবে না। কিন্তু আমি এই শেষোক্ত মূর্ত্তিটীতে, এই গণেশ জননী মূর্ত্তিতে যতদূর মোহিত হই, নব যৌবনা তরুণী মূর্ত্তিতে আমাকে এতদূর বিমোহিত করিতে পারে না। সেইজন্যই বর্ষায় আমার মন বেশী আকৃষ্ট। বসন্তের কথা চারিদিকে শুনি বটে, বসন্তের শোভা সম্পদ চারিদিকে দেখি বটে, বসন্ত বর্ণনা সকল কবির রচনায় পড়ি বটে, কিন্তু বসন্তে কেমন একটা ফাকা ফাকা লাগে, বর্ষায় যেন সৌন্দর্য্য পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়—সে ফাকা ফাকা ভাব থাকে না—সমস্তই গম্ভীর—সুন্দর—মধুর।

বসন্তের বায়ু মৃদুমন্দ মধুর মলয় মারুত বটে, কিন্তু তাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে, তাহাতে ঘূর্ণী বায়ু আছে, তাহাতে কালবৈশাখী আছে, ঝঞ্ঝাবাত আছে। বসন্তের বায়ুর মত তরুণীর ভালবাসা টলমল করে, কখন কমে, কখন বাড়ে, কখন সে ভালবাসায় কালবৈশাখী আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু বর্ষার একটানা গঙ্গার মত পরিণত যৌবনার প্রেম চিরদিন একই মুখে, একই গতিতে প্রবল বেগে চলিয়াছে। চিরদিন ভরপুর, তাহাতে হ্রাস বৃদ্ধি নাই,

জোয়ার ভাঁটা নাই। মাঝে মাঝে তুফান আছে বটে, কিন্তু তখনও তরঙ্গ সমুদ্রাভিমুখী।

তার পর বসন্তের নৈসর্গিক শোভার কথা—চারিদিকেই নব বিকশিত কুসুমকিশলয়—শোভা ধরে না। এখানে সাদা সাদা ছোট ছোট ফুলগুলি ফুটিয়া বায়ুতে গন্ধসঞ্চার করিতেছে, ওখানে নবমুঞ্জরিত বনপাদপ ধূপছায়ার নামাবলি গায়ে মহাযোগীর মত গঙ্গাতীরে দণ্ডায়মান, চারিদিকেই মধুর শব্দ, মনোহর শোভা। কোথাও সাদা সাদা ফুল, কোথাও লাল লাল পাতা। ইহাতে রমণীর সেই প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়ায়, সেই বেশভূষার চটক আর সেই ক্ষণস্থায়ী ক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল সৌন্দর্য্য। তার পর বর্ষার দিকে দেখুন। ফুল পাতার সে চটক নাই, কিন্তু সৌন্দর্য্যেরও কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। তরুণী বাসন্তী গোলাপী প্রভৃতি নানা রঙ্গে ছোপান কাপড় পরিয়া মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করেন, কিন্তু প্রাবৃট রূপিণী ধরণীকে আগা গোড়া সমান ভাবে ভরপুর সবুজে সুসজ্জিত দেখিলে আরও বিমোহিত হইতে হয়। বসন্তে ছোট ছোট মল্লিকা যুঁথের ন্যায় ঈষৎ হাস্যের চিহ্ন মাত্র যে অঙ্গে বিরাজ করিত, বর্ষার সে বদন প্রফুল্ল কমল কুমুদের বিকশিত হাস্যে পরিণত। এখন আর সে চাপিয়া চাপিয়া ভয়ে ভয়ে বা ভাব বিভোরে মুচকি হাসি নাই, এখন বর্ষার সরল প্রাণে মনের আনন্দ প্রাণ ভরিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যৌবনের প্রারম্ভে তরুণীর আনুরক্তি স্বার্থান্বেষী, স্বার্থময়ী। তিনি আপনার সুখের জন্য যাহাকে সুখী করিতে হয় করেন, কিন্তু বয়স একটু পরিণত হইলে সে স্বার্থ ভাবটুকু কাটিয়া যায়, তখন আনুরক্তি এক পাত্রে আবদ্ধ থাকে না, ছড়াইয়া পড়ে, ক্রমশ পরিবারবর্গ, দাসদাসী, প্রতিবেশী, স্বদেশীতে, তারপর পিতৃলোক, দেবলোকে সে আনুরক্তি ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। আনুরক্তি, প্রেম, ভক্তির ভালবাসার এইরূপ বিকাশ সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে।

আর একটী কথা আছে। তরুণী সারা দিন আপনার অঙ্গ সৌষ্ঠব সাধনে তৎপর। প্রাতঃকাল হইতে শয়ন কাল পর্য্যন্ত কিসে তাঁহার শারীরিক শোভা বৃদ্ধি পায়, তিনি সেই চেষ্টাতেই নিমগ্ন। কখন সাবান বা সর রেশম, কখন বা কুলেল কি গোলাপী তেল মাখিতেছেন, কখন পমেটম ল্যাবেণ্ডার ব্যবহার করিতেছেন, কখন মাথা বাঁধিতেছেন, টিপ কাটিতেছেন, অঙ্গের ধূলাটী

ঝাড়িতেছেন, গাত্রমার্জ্জনী সঙ্গে সঙ্গে আছে। বস্ত্রাঞ্চল কোথায় রাখিলে, কিরূপ বেশ ভূষা করিলে, কতদূর শোভা হয়, সারা দিন সেই ভাবনাতেই ব্যস্ত। এই এক ভাব। তার পর কিছুদিন গত হইলে, যৌবনের একটু পরিণতি হইলে, দুই একটী সন্তান জন্মিলে, আর একভাব। এখন আর সে অঙ্গ সৌষ্ঠবে যত্ন নাই, কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য্য কমে না। এখন যেন অসাবধানতাতেই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। মাথার চুল রুখু রুখু হইয়া উড়িতেছে, মাথা বাঁধিবার যত্ন নাই, কেহ জোর বা যত্ন করিয়া বাঁধিয়া দিল, তা হইলে হইল, নচেৎ চুল আর বাঁধা হয় না। স্নান না করিলে নয়, তাই স্নান করা। দেহে যত্ন নাই, পোষাকের চটক নাই, কিছুতেই যেন আর মনোযোগ নাই। এখন নিজের ভাবনা আর আপনাকে ভাবিতে হয় না, এখন তাঁহার ভাবনা অনেকে ভাবেন, বাড়ীর বৃদ্ধতম কর্ত্তা মহাশয় হইতে পরিচারিকা দাসী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার ভাবনা ভাবেন, তিনি এখন সংসার পবিত্র কারিণী, সাক্ষাৎ সাবিত্রী, বর্ষার ধরিত্রী। বর্ষায় বৃষ্টি হইয়াছে বা অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে, ভূস্বামী ও কৃষক সকলেই ক্ষেত্রের ভাবনা ভাবিতেছেন, জল অধিক দাঁড়াইলে শস্য নষ্ট হইবে, আইল কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কোথাও অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ফসল শুকাইয়া যাইবার ভয়ে জল সেচনের বন্দোবস্ত হইতেছে। সকলেই ক্ষেতের ভাবনা ভাবিতেছেন, কোথায় ঘাস হইয়াছে নিড়াইতে হইবে, কোথায় কিরূপ করিয়া ক্ষেত্রের উন্নতি হইবে,—সকলেই সেই ভাবনায় ব্যস্ত। ওদিকে কর্ত্তা মহাশয় প্রাতে উঠিয়া গৃহিণীকে বলিতেছেন, "কাল রাত্রিতে খোকা দুই বার কাশিয়াছিল, বৌমাকে জল ঘাঁটিতে দিও না, বাসী বা পান্তাভাত যেন না খান," ওদিকে পরিচারিকা আসিয়া বলিতেছে "বৌদিদি খোকার আবার অসুক করিবে, তুমি কাপড় ছাড়িয়া দেও, কাচিয়া দি।" যাহাতে তাঁহার সময়ে স্নান আহার হয়, শরীর সুস্থ থাকে, সকলেই সেই ভাবনায় ব্যস্ত। সকলেই এই গণেশ জননীর সেবায় নিরত। তাঁহাকে আর আপনার ভাবনা নিজে ভাবিতে হইবে কেন? তাঁহারও এখন নিজের সুখান্বেষণ নাই। তিনি পূর্ব্বে যখন তরুণী রমণী ছিলেন, তখন মানবী, এখন গণেশ জননী, সংসার পবিত্রকারিণী দেবী হইয়াছেন। বসন্তের ফুলে মুকুলে কিসলয়ে দেবার্চ্চনা হয়, কিন্তু বর্ষার "শস্য শ্যামলা" ধরণী স্বয়ং লক্ষ্মীরূপিণী, পরমারাধ্যা দেবতা। বসন্ত ও বর্ষায়, নব মুকুলিতা বাসন্তী তরুণীতে ও ক্ষীর-ভর-পয়োধরা গণেশ জননীতে এই ভেদ। একজন পরের পূজার উপাদান, অপর স্বয়ং অর্চ্চনীয়া।

তার পর শেষ কথা, পূর্ব্বে যে কথা বলিতে ছিলাম—তেজ। তরুণীর যদি কিছু তেজ থাকে, সে কেবল এক জনের উপর ; গণেশ জননীর তেজ সকলের উপর সমান। বর্ষার ধরিত্রী দর্পভরে বলিতে পারেন—“এখন আমি বসন্তের ন্যায় বাহ্যিক শোভাশালিনী নহি, কেবল শোভা দেখাই না, গন্ধ ছড়াই না। এখন আমি জীব লোকের জীবনরূপিণী। এই বক্ষে অসংখ্য শস্য ক্ষেত্র ধারণ করিতেছি, ইহা সমস্ত জীব লোকের জীবনের উপাদান। আমি আছি বলিয়াই তোমাদের সকলের উপায় হইতেছে।” গণেশ জননী বক্ষে শিশু পুত্র ধারণ করিয়া তেমনি দর্পভরে বলিতে পারেন, “আমি এখন বড় তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সামগ্রী নহি, এই দেখ আমার সোণার চাঁদ সাত রাজার ধন, তোমাদের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের কারণ। এই বিশুদ্ধ তেজশালিনী দর্পময়ী, অথচ বিনয়াবনতমুখী দেবী, শোভায় বল, আভায় বল, সকলদিকেই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তা, গাম্ভীর্য্যে গৌরবিণী।

পাঠক,—তোমার বয়স কত ? তুমি বসন্তের মাধুর্য্যই বুঝিয়াছে, বর্ষার গাম্ভীর্য্যে এখনও মজ নাই কি ?

সখী সম্বাদ।

শুনিতাম যথা তথা—
অতি সে পবিত্র কথা—
বঙ্গ ধামে অতি পুরাতন,
পিরীতি পিযূষে ভরা,
অতীব সে মনোহরা,
পুরাতনে নিতুই নূতন।

কে ক’রে হে পুনরায়
শুনাইবে সে গাথায়,
শ্যাম-প্রেম লালসা লাঞ্ছিত ;
সুধা সিন্ধু প্রমথিয়া
বিন্দু মাত্র উঠাইয়া,
কে বাঁচাবে পরাণ মূচ্ছিত ?

গিয়া সেই দ্বারকায়,
ভেটিয়া সে শ্যামরায়,
কে কবে হে সে সখী সম্বাদে.
পাষাণ গলিত হবে,
ময়ূরী নাচিবে রবে,
শক্তি পাবে মহাশক্তি সাধে।

"হে যোগী উদ্যোগী বর।
দুর্যোগে যন্ত্রণা হর,
অনুদিন করুণা ভিখারী"।
প্রেমগুরো গুণধর।
হে মহামহিম বর,
শক্তিধর নিকুঞ্জবিহারী।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে,
তুমি হে বিশ্বের নেত্র,
মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম অবতার।
হে রাখাল হে ভূপাল,
অনাদি অনন্তকাল,
হে নবীন প্রবীণ সাকার।

হে শ্রীমান্, হে ধীমান্,
মহিমায় হে মহান,
হে মহাপুরুষ মমতায়।
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু,
দীনবন্ধো এক বিন্দু
দেহ নাথ দেহি রাধিকায়।"

বলি সখী যোড় করে,
যেন অভিমানভরে,
সমীরণ ভরে যেন নব কিশলয়,

মৃদু কাঁপি থর থর
সে বিনোদ কলেবর,
বলে "এবে কি হবে হে হরি দয়াময়।

যে দেখিনু দশা তার,
হয়েছে পঞ্জর সার,
শুকাইয়া স্বর্ণলতা কালিমা বরণ,
বহু দিন বহি যায়,
ভেট না হইল তায়,
ভুলে আছ ভুলিয়াছ মদনমোহন।

তাকাইয়া আশাপথে
জীয়ে আছে কোন মতে,
হা কৃষ্ণ। হা কৃষ্ণ। বলি করিছে রোদন,
তোমার কি মনে নাই,
সে প্রকৃতি সেই ঠাঁই,—
অনুদিন অনুগতে রক্ষ নারায়ণ।

গোঁয়ার গোপের দলে
নিরন্তর ফেলি ছলে,
কত প্রলোভনে সতী ভুলাইতে চায়,
মরমে মরমে মরি,
তুয়া মুখ চাহি হরি
কণ্ঠাগত প্রাণ মাত্র আছে বাধিকায়।

আছে বটে অবিকল,
তুঁহারি যমুনা জল,
সে কেলি কদম্বতল অতল প্রেমের,
আছে ধীর সমীরণ,
মধুবন নিধুবন
কিন্তু নাই কান্তি সেই কষিত হেমের।

বহু দিন বহি যায়,
ভেট না হইল তায়,

যমুনার কিনারায় শূন্য বৃন্দাবন!
মরুভূমি লীলাভূমি,
হে শ্যাম ভুল না তুমি।
দয়া করি রাধিকায় দাও দরশন।
হবে কি সে দিন আর,
ঘুচাইবে অন্ধকার,
তুঁহারি সে বৃন্দাবনে দুরন্ত দুর্দ্দিন?
অমিয়া বচন শুনি
পীরিতি পাইয়া পুনি,
লভিবে তুঁহারি রাধা জীবন নবীন।
বৃন্দাবন রসশূন্য,
ম্লান মনে ক্ষীণ ক্ষুণ্ণ,
বৃন্দাবনবাসী সবে বিচ্ছেদে বিধুর,
সবে স্তুতি গীতি গায়,
কবে কৃষ্ণ করুণায়,
পরাইবে শ্রীরাধায় কম কহিনুর।
তবে রাজ-রাজেশ্বরী
ভূলোক আলোক করি,
বিরাজিবে বিনোদিনী নিকুঞ্জ বিহারে,
ঘুচে যাবে যমভয়,
সখীরা গাহিবে জয়,
জয়দেব বিদ্যাপতি মধুর ঝঙ্কারে।
সে সঙ্গীতে দেবতায়
শুনিবে হে শ্যামরায়!
রাঙ্গাপায় রুণু ঝুনু নূপুরের রোল,
ময়ূরী নাচিবে রবে,
যমুনা উজান ববে,
অন্তরে বাহিরে হবে হরি হরি বোল।

শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।

দামিনী। সংস্কৃত পড়িবে বলিয়াছিলে, কৈ পড়িতেছ কি?

যামিনী। না ভাই পড়া হইল না। বর্ণ ও বানান শিখিয়াছিলাম।

দামিনী। তবে বই পড়িলে না কেন?

যামিনী। একখানি প্রথম ভাগ ঋজুপাঠ বই কিনিয়া আনিয়াছিলেন, তা কিন্তু পড়া হইল না।

দামিনী। কেন?

যামিনী। পড়িলাম—"কস্মিংশ্চিৎ বনে"-তার পর দেখি—বড় ঠাকুরের কথা—আর কেমন করে পড়ি বল?

বিনয় বচন।

বৃন্দাবন বাবু বড়ই বিষম উদ্ধত স্বভাবের লোক। নবীন তাঁহার মোসা-হেব, একদিন কথায় কথায় বলিল "বৃন্দাবন বাবু কাজে বড় দক্ষ ও যোগ্য।" বিনয় কথাটা শুনিয়া একটু মুচকি হাসিল। নবীন বলিল, "হাসিলে যে?" বিনয় বলিল, "বৃন্দাবন বাবু কাযে বড় দক্ষ ও যোগ্য, তা বলতে পারি না—তবে কাজে দক্ষযজ্ঞ করেন বটে।"

কুঞ্জ-বিহারী।

মাষ্টর কুঞ্জলাল বাবু পঞ্চাশ বছর বয়সে হুগলি কলেজ হতে এল, এ দিতে-ছেন। না দিলে, বি এ দিতে দেয় না, বি এ না দিলে, পদোন্নতি হয় না। একটার অবকাশ সময়ে কুঞ্জ বাবু মালীর ঘরে তামাক খাইতে গিয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের পাড়ার আর একজন পরীক্ষার্থী বিহারী বাবুও উপস্থিত। কুঞ্জ বাবুকে দেখিয়া বিহারী কুণ্ঠিত হইলেন। কুঞ্জ বাবু হাসিতে হাসিতে বলি-লেন "হে বিহারী আমাকে আর সমীহ কেন ভাই? এখন আমরাত এক সূর্য্যেই ধান শুকাই।" বিহারী মস্তক নত করিয়া বলিল "আজ্ঞে হাঁ। তা এক সূর্য্যে ধান শুকাই বটে, তবে আমরা সকালে, আপনি বৈকালে।"

কৃষ্ণ-ভক্তি।

রোগী। ডাক্তার কৃষ্ণ বাবু এখনও আসিতেছেন না?

বন্ধু। সেদিন কামারপাড়ার যে রোগীটাকে তত ডাকাডাকি করিয়াও জবাব পান নাই, আজি তাহাকেই ঔষধ খাওয়াইতে বিব্রত হইয়াছেন।

রোগী। তবে এবার সে কৃষ্ণকে জবাব দিবে।

আসাম—শিলং।

শিলং আসামের রাজধানী। স্বয়ং চীফ্ কমিস্নর বাহাদুর এখানে সদলে বাস করিয়া থাকেন। ইহা অতি দূর খাসিয়া পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। কলিকাতা হইতে নানা যানে, নানা উপকরণে, এখানে আসিতে হয়। পূর্ব্বে এখানে পৌঁছিতে তিন সপ্তাহ, সময়ে সময়ে বা ততোঽধিক কাল লাগিত, আজ কাল ইংরাজ-রাজের প্রসাদে, চারি দিনেই আসা যায়, তবে কিঞ্চিদধিক ব্যয়-সাধ্য,—ব্যয়ের লাঘব করিতে গেলে ৮ দিন লাগে। কলিকাতা হইতে ধুবড়ি পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের কর্তৃপক্ষগণের বন্দোবস্তে আসা যায়, ইহার মধ্যে নানা স্থানে গাড়ি ও ষ্টীমার বদ্‌লাইতে হয়। ধুবড়ি হইতে গৌহাটী কলিকাতাস্থ ম্যাক্‌নীল কোম্পানীর ষ্টীমারে আসিতে হয়, এই ষ্টীমার ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত গিয়া থাকে। গৌহাটীতে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কামাখ্যাদেবীর মন্দির অধিষ্ঠিত— সহর হইতে ইহার ব্যবধান প্রায় তিন মাইল। আসাম-প্রবাসী বঙ্গবাসীমাত্রেরই এই পবিত্র তীর্থ দর্শন করা উচিত। গৌহাটী ব্রহ্মপুত্র নদের উপকূলে অবস্থিত; কলিকাতা হইতে আগমন কালে আসামের প্রথম সীমা যাত্রাপুর হইতেই এই কল-কল-নাদী অনন্তকাল প্রবহমান মহানদের অবিচলিত তরঙ্গ-শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। পরশুরামের অভিসম্পাতে ইহার জল হিন্দুর দৃষ্টিতে পবিত্র নহে, কেবল বৎসরের মধ্যে এক দিন—বাসন্তী মহাষষ্ঠীর দিন—ইহাতে স্নান প্রসিদ্ধ। গৌহাটী হইতে শিলং ৬৩ মাইল, এইটুকুই পার্ব্বত্য পথ। এ পথে পর্ব্বতবিহারী অশ্বযান টোঙ্গায় আসাই সুবিধা, এতদ্দ্বারা ৮।১০ ঘণ্টার মধ্যে এই সুদীর্ঘ পথ আসা যায়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ—এক জন মাত্র আরোহীর ভাড়া ৩০৲ টাকা, মালপত্রের জন্য পৃথক্ মাশুল দিতে হয়। প্লাণ্টার্স্ ষ্টোর্স্ এণ্ড এজেন্সী কোম্পানী লিমিটেড্—নামক কলিকাতাস্থ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় পূর্ব্বে ইহার ঠিকাদার ছিলেন; সম্প্রতি (জনাই নিবাসী) অত্রত্য প্রধান ব্যবসায়ী গোলাম হায়দার ও তাঁহার পুত্রগণ ইহার অধ্যক্ষ হইয়াছেন। সাহেবদিগের সময় কিছু স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য ছিল, অধুনা এই বঙ্গবাসী মুসলমান সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতায় এই যাতায়াতের পথ সুবিধাজনক হইয়াছে, ইহাঁরা স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন এবং আরোহীবর্গের সুখসচ্ছন্দতা বিধানে সাধ্যমত যত্নের ত্রুটি করেন না। অধিকন্তু

৩০৲ টাকা ভাড়া দেওয়া অনেকের অবস্থাতীত বোধে ইঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্প আয়বিশিষ্ট লোকদিগের জন্য ১৫৲ টাকা ভাড়া স্থির করিয়া অনেকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এ পথে আসার অন্যতম উপায় গো-যান, পরিবারাদি লইয়া আসার পক্ষে ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, এতদ্দ্বারা আসিতে অন্যূন চারি দিন লাগে। বলা বাহুল্য, ইহা অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য—৪।৫ টাকা ব্যয়েই আসা যায়।

আসামের মধ্যে শিলং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর স্থান। পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত বলিয়া ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সহজেই চিত্তবিনোদনকারী, চতুর্দ্দিকেই অভ্রভেদী শৈলমালা সদর্পে মস্তকোত্তোলন করিয়া বিরাজমান—মধ্যে মধ্যে ময়ূরের কেকা, বনজ বিহঙ্গের কাকলি, নির্ঝরের কুল-কুল-ধ্বনি—বড়ই শ্রুতিসুখাবহ। এখানকার জলবায়ুও আসামের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর ও প্রীতিকর, অন্যত্র সকল স্থানেই নানারূপ পীড়া দেখা যায়—এখানকার লোক একরূপ রোগশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে পর্ব্বত-সুলভ প্রাকৃতিক শৈত্য চির দিন বিরাজমান, শীতের সময় নবাগত লোকের পক্ষে কষ্টকর বোধ হইতে পারে, কিন্তু সিমলা বা দার্জ্জিলিঙ্গের মত শীতের মাত্রা প্রখর নহে। বর্ষার ভাগও এখানে অধিক, চিরাপুঞ্জি ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষাপ্রধান স্থান। ইহার নিকটে অবস্থিত বলিয়াই—এখান হইতে চিরাপুঞ্জি ৩১ মাইল—বোধ হয়, এখানে এত বর্ষার প্রকোপ, বর্ষার সময়েও অত্রত্য অধিবাসীবর্গের বিশেষ অধিক ক্লেশ হয়, তবে এক সুবিধা, এখানে কর্দ্দমের যন্ত্রণা নাই, বৃষ্টিধারা বন্ধ হওয়ার অব্যবহিত পরেই পথ পূর্ব্ববৎ শুষ্ক, বরং অধিকতর সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত। বৈশাখে এখানে বসন্ত, নিম্নবঙ্গে মাঘের শেষে ও ফাল্গুনের প্রথমে যেরূপ নাতি শীত, নাতি উষ্ণ ভাব, যেমন একটু প্রাণ-ভুলানি, মন-মজানি ফুর ফুরে বায়ু, প্রকৃতির যেমন একটু মনোমোহন দৃশ্য, এখানে বৈশাখ সেইরূপ। শিলং-এর অতিদূরে দুই মাইলের মধ্যে একটী জলপ্রপাত আছে, ইহা বিডন্ ফল্ নামে প্রসিদ্ধ। অত্যুচ্চ পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে তুষার-ধবল বারিপুঞ্জ অবিরাম গতিতে নির্ঝরিত—প্রকৃতির এই মনোজ্ঞ ভাব দর্শকের বড়ই চিত্তাকর্ষক, বড়ই নয়নানন্দবর্দ্ধক। শিলংএর সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গও স্বভাবের অন্যতম মহৎ নিদর্শন, শুনা যায়, ইহার উপরিভাগ হইতে ব্রহ্মপুত্রকে একটি সূত্রখণ্ডের ন্যায় দেখা যায়।

এখানে ইদানীং সভ্যতার ও বিলাসিতার উপকরণ সমস্তই আছে।

লাটের রাজভবন (চীফ্ কমিসনরের রেসিডেন্সি) বিলাসীর বিলাস-কানন; ক্রীড়োন্মত্তের ক্রীড়োদ্যান, উপাসকের প্রার্থনা-স্থান—কিছুরই অভাব নাই। ইংরাজ-উপভোগ্য সকলই আছে; ডাকঘর, তারঘর ত থাকিবেই, হোটেল, চিত্র-শালা, গির্জ্জা, গোরস্থান—বালক বালিকা বিদ্যালয়, মিসনস্কুল প্রভৃতি পাঠের বন্দোবস্তও আছে। বাঙ্গালীদিগের মধ্যেও এখানে এ সমস্ত বিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। অতি অল্পসংখ্যক লোকের যত্নে এখানে ইংরাজী পড়িবার রিডিং ক্লব, বাঙ্গালার সাহিত্য সভা, বঙ্গ-বালিকা-বিদ্যালয়, উপাসকের ব্রহ্মমন্দির, আমোদপ্রিয়ের নাট্যশালা, প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহা নিরতিশয় প্রশংসার কথা। সকলই আছে, কিন্তু একটী প্রধান জিনিস নাই—পরস্পর ঐক্য বা মনের প্রীতি এখানে সম্পূর্ণ বিরল, প্রবাসীর মধ্যে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান, শ্রীহট্ট, আসাম ও ঢাকাঞ্চল নিবাসী লোকই অধিক, ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে একতার সম্পূর্ণ অভাব, এমন কি, একস্থানীয় লোকের মধ্যেও অনেক স্থলে মনোমালিন্য লক্ষিত হয়। বাঙ্গালীর এ কলঙ্কে প্রায় সর্ব্বস্থান কলুষিত, একতার অভাবে বঙ্গভূমি অনুক্ষণ লাঞ্ছিত, বিধ্বস্ত ও বিদলিত হইতেছে—ইহা দেখিয়াও বঙ্গবাসী একতা শিখিতে চেষ্টা করিলেন না, ইহা সামান্য পরিতাপের কারণ নহে। বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক কতদিনে ঘুচিবে অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। ঐরূপ সভ্যতানুমোদিত নানারূপ সমাজের প্রতিষ্ঠা না করিয়া, অত্রত্য প্রবাসীগণ যদি পবিত্র একতার সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতেন, তাহা হইলে সমাজের গৌরব রক্ষণ হইত, দেশের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইত, অন্তরে শান্তির সুবিমল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইত।

এখানকার আদিম অধিবাসী খাসিয়া জাতি। পূর্ব্বে ইহাঁরা নিতান্ত অসভ্য ছিলেন। অধুনা খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ রেবরেণ্ড জাম্মাণ জোন্স মহোদয়ের শিক্ষকতা গুণে এবং ইংরাজ ও বঙ্গবাসীর সংঘর্ষে সভ্যতার সুন্দর মূর্ত্তি ইহাঁদিগের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে। অত্যল্প কালের মধ্যে ইহাঁরা যে পরিমাণে সভ্য ও শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে কালে ইহাঁরা সভ্যতার ও সর্বশিক্ষার শীর্ষস্থানে উঠিবেন, এরূপ সহজেই আশা করা যাইতে পারে। বলিতে কি, উপরোক্ত জোন্স্ সাহেবই ইহার অন্যতম নিয়ন্তা। তাঁহার নিকট শিক্ষিত খাসিয়া মাত্রই কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ, এমন কি অনেকে তাঁহাকে পিতা ও গুরুর ন্যায় ভক্তি করেন, বস্তুত তিনি সেইরূপ ভক্তির পাত্র।

আদিম খাসিয়াবর্গের ধর্ম্মানুভূতি নিতান্ত কম ছিল; ইহাঁরা উপদেবতার উপাসক ছিলেন, এখনও অসভ্য ও অশিক্ষিত খাসিয়া সমাজে ঐরূপ প্রেতোপাসকদিগের সংখ্যাই অধিক। অধুনা অনেকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন, কাহারও ব্রাহ্মধর্ম্মে কথঞ্চিৎ অনুরাগ, আবার কেহ বা হিন্দুধর্ম্মের দিকেও অল্পে অল্পে অগ্রসর। এই শেষোক্তের মধ্যে মান্যবর জীবন রায় মহাশয় প্রধান। প্রত্যুত ইনি খাসিয়া সমাজের অগ্রণী; বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন—সকল বিষয়েই ইনি শ্রেষ্ঠ, ইনি এখানকার অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর। কোন খাসিয়াই এ পর্য্যন্ত এরূপ উচ্চ আসন লাভ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী ও হিন্দু সমাজের সহিত ইহাঁর সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

সম্প্রতি অত্রত্য অবৈতনিক নাট্যসমাজ কর্তৃক বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত রাবণ-বধ নাটক অভিনীত হইয়াছে। অতি অল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা সকল অংশের সুচারু অভিনয় হওয়া পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভাবনাসত্বেও এ অভিনয় প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে এরূপ অভিনয় দ্বারা প্রবাস-যন্ত্রণা দূরীভূত হয়, অতএব ইহার অনুষ্ঠাতাগণ ধন্যবাদের পাত্র। অভিনয়ে কয়েকটী ত্রুটী লক্ষিত হইয়াছিল, ভরসা করি, নাট্য-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির চেষ্টা করিবেন। রাবণ-জননী নিকষার বেশ বড়ই অরুচিকর ও অস্বাভাবিক বোধ হইয়াছিল—তাঁহার ধীরা, স্থিরা, স্থবিরা মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, রাবণ হেন পুত্রের সম্মুখে, কৃষ্ণকেশা যুবতীবেশা মূর্ত্তি দর্শনে আমরা বাস্তবিক মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। রঙ্গ-মঞ্চে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব রাবণ-বধ নাটকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্য, সঙ্গে সঙ্গে গন্ধর্ব্বকণ্ঠ-নিঃসৃত টোড়ী-ভৈরবী-মিশ্রিত হর-হৃদি-নিবাসিনী রণরঙ্গিণীর স্তোত্র-সংগীত বড়ই হৃদয়াকর্ষী;—অত্রত্য রঙ্গভূমে আমরা এ দুইএরই সম্পূর্ণ অসদ্ভাব দেখিয়াছিলাম। সীতার অগ্নি-পরীক্ষার দৃশ্যও তাদৃশ হৃদয়-ভেদী হয় নাই। ঐকতান বাদ্যে অনৈকতানতাই অধিক লক্ষিত হইয়াছিল, তাহাও এত ভগ্নস্বর যে শ্রোতার কর্ণে সহজে প্রবিষ্ট হয় নাই। রাম, সীতা ও রাবণের অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল;—সুগ্রীব-মিতা "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" দেখাইয়াছিলেন, বোধ হয়, এ কার্য্যে তিনি এই প্রথম ব্রতী। অন্যান্য অংশ মন্দ হয় নাই।

অত্রত্য চীফ্ কমিসনার ফিটজ্ পেট্রিক বাহাদুর অতি সুযোগ্য এবং সুনীতি পরায়ণ। তাঁহার সেক্রেটারী লায়েল বাহাদুরও তাদৃশ দক্ষ এবং ততোধিক পণ্ডিত। এই মণি কাঞ্চন সংযোগে প্রত্যেক কার্য্যে নিরপেক্ষ বিচার ও শাসন

প্রণালী দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী। ইহাঁদিগের দৃষ্টিতে শ্বেত-কৃষ্ণের পার্থক্য নাই। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, ইহাঁরা এখানে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া আসামে শান্তি ও সুমঙ্গল বিধান করুন।

এখানে ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতির মাত্রা কিছু অধিক। অন্ধকার হইতে অনেকেই জ্যোতিতে পৌছিয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে শ্রীহট্টবাসীর সংখ্যাই অধিক। ইচ্ছা হইলেই, রবিবার সান্ধ্যালোকে সমাজ-মন্দিরে ভ্রাতা-ভগিনী-গণের যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন সার্থক করা যাইতে পারে। মাননীয়া শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা সেন ভগিনীদলের অগ্রণী, মোহাচ্ছন্না অন্যান্য ভগিনীবর্গের উন্নতির বাসনা থাকিলে ঐ ভগিনীশ্রেষ্ঠার নিকট শিক্ষা লাভ করাই বিধি। শীঘ্রই এখানে পণ্ডিত প্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আসিবার কথা আছে। জানি না, তিনি এই ভ্রাতা-ভগিনীগণের জ্যোতি ভেদ করিয়া উঠিতে পারিবেন কি না।

রাজশক্তি ও সংবাদপত্র।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র আধুনিক সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ, কিন্তু কেবল সাহিত্য ভিন্ন সংবাদপত্রাদির সহিত আরও অনেকগুলি গুরুতর বিষয়ের সংশ্রব আছে, তন্মধ্যে রাজশক্তির সংশ্রব ও সংঘর্ষণ অতি গুরুতর ব্যাপার। সংবাদপত্র দ্বারা রাজা ও প্রজার মনের ভাব জানিতে পারা যায়। সংবাদ-পত্র দ্বারা রাজা—প্রজার অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হন। প্রজা রাজাজ্ঞা সমস্ত জানিতে পারে। এস্থলে বলা উচিত, সংবাদপত্র জিনিসটা বিলাতী ও আধুনিক এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার একটী সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, এই সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রাদি না থাকিলে ইউরোপখণ্ড এত অল্পদিন মধ্যে এতদূর উন্নত হইতে পারিত কি না বলা যায় না। ইউরোপ যখন একটু একটু সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল সেই সময় হইতে তথায় সংবাদপত্রের প্রথম সৃষ্টি, তাহার পর সেই সভ্যতার যত উন্নতি হইতে লাগিল তথায় সংবাদ-পত্রেরও তত আদর বাড়িতে লাগিল। এস্থলে অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, যদি সংবাদপত্র সভ্যতার প্রধান অঙ্গ হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশ ত এক সময় সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছিল তবে এদেশে সংবাদপত্র ছিল

না কেন? ইহার উত্তরে নানা কারণ দর্শাইতে পারা যায়। প্রথমত এদেশের সভ্যতা ও উন্নতির সহিত ইউরোপের সভ্যতা ও উন্নতির মূলে অনৈক্য রহিয়াছে। অন্তর্জ্জগতের আলোচনায় আমাদের উন্নতি হইয়াছিল, আর বহির্জ্জগতের আলোচনায় ইউরোপ আজি সভ্যতার দিকে উন্নত হইতেছে। তাহার পর, ভারত চিরকাল রাজভক্ত, চিরকাল রাজশক্তির অধীন। ভারতের রাজার একটা স্বতন্ত্র স্বার্থ ছিল না, প্রজাকে সন্তুষ্ট রাখা, প্রজাপালন হিন্দুরাজার প্রধান স্বার্থ, রাজা পিতা, প্রজা পুত্র। পিতা চিরকাল পুত্রের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতেছেন, পুত্রকে আপন স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ভাবিতে হইতেছে না, যেখানে এরূপ পবিত্র সম্পর্ক, পবিত্র ভাব, সেখানে স্বতন্ত্র একটা প্রজাশক্তি থাকিলেও কার্য্যে তাহা প্রয়োগ করিবার কখন আবশ্যক হয় নাই, প্রজাকে আপন স্বার্থ রক্ষার জন্য, আপনাদিগের স্বার্থের প্রতি রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য, কখন কাগজ কলমে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, রাজা নিজেই প্রজার স্বার্থ ভাবিয়া কাজ করিতেন। এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশে সংবাদপত্রের প্রচলন হইবে কিরূপে? কিন্তু ইউরোপের সভ্যতা ও তথাকার রাজনীতি স্বতন্ত্র। প্রথমত ইউরোপের সভ্যতা বহির্জ্জগৎকে লইয়া, সুতরাং তথায় ইহার উন্নতির জন্য সংবাদপত্রের বিশেষ প্রয়োজন। তাহার পর, তথাকার রাজনীতিতে রাজার স্বার্থ স্বতন্ত্র, প্রজার স্বার্থ স্বতন্ত্র। তথায় রাজায় প্রজায় আন্তরিক মিল নাই। আবার রাজা আপনাকে সর্ব্বেসর্ব্বা জানিয়া প্রজাশক্তি নষ্ট করিয়া প্রজাকে আপন বশে রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ওদিকে প্রজা রাজাকে প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিনিধি বা ভৃত্যের অধিক ভাবিতে চায় না, রাজশক্তিকে যতটা সম্ভব প্রজাশক্তির অধীন করিতে চায়, এই কারণে তথায় সর্ব্বদা রাজায় প্রজায় বিবাদ ঘটিতেছে, সংবাদপত্র যন্ত্রস্বরূপ হইয়া প্রজাসাধারণকে তাহাদের স্বার্থ বুঝাইয়া দিতেছে, আবার দূতস্বরূপ হইয়া প্রজাশক্তির বল ও আকাঙ্ক্ষা রাজশক্তির নিকট নির্ভয়ে জানাইতেছে, আবশ্যক হইলে যুদ্ধের ভেরীরবও শুনাইতে ভীত হইতেছে না। এক কথায় প্রজাশক্তির উন্নতির জন্য, প্রজার স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত ইউরোপ খণ্ডে সংবাদপত্রের প্রয়োজন। আমাদের দেশেও যখন রাজা প্রজায় আর সে পূর্ব্বভাব বজায় নাই, যখন রাজার একটা স্বতন্ত্র স্বার্থ ও প্রজার একটা স্বতন্ত্র স্বার্থ দাঁড়াইয়াছে, তখন আমাদের দেশেও আজকাল সংবাদপত্রের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু ইউরোপের সংবাদপত্রের সহিত

আমাদের দেশের সংবাদপত্রের অনেক উদ্দেশ্যগত পার্থক্য আছে। তথাকার সংবাদপত্র প্রজাশক্তির যন্ত্রস্বরূপ হইয়া রাজশক্তির সহিত সর্ব্বদা দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতেছে বলিয়া রাজা এই শক্তি বিনষ্ট করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, কঠোর আইন করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টায় থাকেন। আর আমরা একে রাজভক্ত, তাহাতে নিরীহ,সুতরাং আমাদের দেশে এখনও ততদূর কোন চেষ্টা হয় নাই। কেবল লর্ড লিটন একবার এই প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র। ইউরোপখণ্ডের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডে রাজশক্তি অপেক্ষা প্রজাশক্তি অনেক গুণ অধিক, এজন্য তথায় অন্যান্য দেশ অপেক্ষা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও অধিক। এখানে রাজশক্তি প্রজাশক্তির অধীন বলিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকোচ করিবার বড় একটা সুবিধা হয় নাই। ইংলণ্ড ভিন্ন অপরাপর দেশে প্রজাশক্তি অপেক্ষা রাজশক্তির বল অধিক বলিয়া তথায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও এতাদৃশ নহে। ইংলণ্ডের অধীনে ভারতের আর যত দুঃখ থাকুক না কেন, এই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে ইউরোপের অনেক বড় বড় সাম্রাজ্য অপেক্ষা আমাদের অনেকটা সুবিধা আছে। লর্ড লিটনের সময় যখন দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়, তখন সেই শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থাতেও আমাদের দেশীয় সংবাদপত্রের যতটুকু স্বাধীনতা ছিল, ইংলণ্ড ব্যতীত ইউরোপের আর কোন দেশে স্বাধীন অবস্থাতেও ততদূর স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের প্রজাশক্তির অধীনে আমরা থাকায় আমাদের এইটুকু লাভ, আবশ্যক হইলে আমরা রাজার দোষ রাজার চক্ষে অঙ্গুল দিয়া দেখাইতে পারি, মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি।

অনেকদিন হইল, প্রভাকর-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই নবজীবনে দেশীয় সংবাদপত্রের এক ইতিহাস প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছিলেন, এদেশে অল্পদিন মধ্যে সংবাদপত্রের অবস্থা কতদূর উন্নত হইয়াছে। আর আজ এই প্রবন্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শভূমি, পাশ্চাত্য সভ্যদেশের অগ্রণী ফরাসিভূমিতে রাজতন্ত্রকালে তথাকার সংবাদপত্রের কিরূপ অবস্থা ছিল, রাজশক্তি প্রজাশক্তিকে দমন করিবার নিমিত্ত কিরূপ কঠোর ব্যবস্থা করিতেন ও সংবাদপত্রের চালকদিগকে কিরূপ কঠোর নিয়মের অধীন হইয়া কাজ করিতে হইত, তাহাই দেখান যাইতেছে। রাজশক্তির অধীনে অবস্থানকালে প্রজাশক্তির মুখপাত্রস্বরূপ ফরাসি সংবাদপত্র সকলকে কঠিন রাজনিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হইত, কিন্তু ফরাসীজাতি

যেরূপ এককালে সকল কার্য্যেই বাহবা লইয়াছিল, রাজশক্তির অধীন এই শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থাতেও তাহাদের সংবাদপত্রসমূহ সেইরূপ আপন বিক্রমে কর্ত্তব্য পালন করিয়া, সম্পাদকের ও সংবাদপত্রের গৌরব রক্ষা করিয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

১৬৩১ অব্দের ১লা এপ্রেল ফ্রান্সভূমিতে "গেজেট" নামক প্রথম পত্রের সৃষ্টি হয়। এই পত্র "গেজেটার" নামের অনুকরণ করিয়া বাহির হয়। ক্ষুদ্র আট পৃষ্ঠা পরিমিত আকারে ফ্রান্সের রাজচিকিৎসক রেণাল্ডট্ এই পত্র সপ্তাহে একবার করিয়া বাহির করিতেন, প্রথমত ইহাতে কোন প্রকার সংবাদ ছাপা হইত না। মার্শমান সাহেবের বাঙ্গালা দিগ্‌দর্শনের মত গল্প ও পুস্তকের সমালোচনায় এই কাগজ পূর্ণ করা হইত। ইহাই ইউরোপখণ্ডের বর্ত্তমান সভ্যতার আদর্শভূমি ফ্রান্সের প্রথম সংবাদপত্র। সম্ভবত রোম ব্যতীত ইউরোপখণ্ডের এই প্রথম সংবাদপত্র। গেজেটের অবস্থা এই প্রকার হইলেও এই নূতন জিনিস তথাকার লোকের চক্ষেও একরূপ ভীতিপ্রদ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সকলেই ইহাকে অল্পবিস্তর ভয় করিত। পাছে এই পত্র প্রকাশে কেহ কোন বাধা দেয়, এই কারণে প্রতি সংখ্যার গেজেটে এই কথাগুলি থাকিত,—

"আমি বৈদেশিক রাজাগুভাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন আমার সংবাদপত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করেন না। আমার এই গেজেট সেরূপ জিনিস নহে যে, তাঁহারা ইহাকে বন্ধ করিতে পারেন। স্রোতসলিল যেরূপ বাধা পাইলে স্ফীত হইয়া উঠে, আমার এ কাগজও সেইরূপ বাধা পাইলে পরাক্রমশালী হইয়া উঠিবে।"

ইহার পর ক্রমে দেখাদেখি ফ্রান্সে ২।৪ খানি করিয়া কাগজ বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু বিশেষ উন্নতি কিছুই লক্ষিত হয় নাই।

১৭৮৯ সালের বিপ্লব ফ্রান্সের সংবাদপত্রের উন্নতির পক্ষে একটী প্রধান ঘটনা। এই বিপ্লবে প্রায় দেড় শত নূতন সংবাদপত্র জন্ম গ্রহণ করে ও ইহার মধ্যে অনেকগুলি সবিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করে। এই সকল পত্রে রাজনীতি, সমাজনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে ও ফ্রান্সের সেই সময়কার অনেক প্রধান প্রধান বিখ্যাত লোক এই সকল পত্রে লেখক শ্রেণীভুক্ত হন। সভ্য প্রধান দেশে সংবাদপত্রের উন্নতির এই প্রথম অবস্থা, ফ্রান্স ব্যতীত ইউরোপের অপরাপর দেশেও ঠিক এই সময় সংবাদপত্রের শৈশবাবস্থা, কেবল ইংলণ্ডে একটু উন্নতি লক্ষিত

হইবাছিল, তথায় এই সময় "টাইম্স" পত্র জন্মগ্রহণ করে। ইহাব অল্পদিন পবে ফ্রান্সে দৈনিক পত্রের বিশেষ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়, এবং সেই সময় হইতেই সংবাদপত্রের প্রতি রাজার দৃষ্টি পড়ে ও তাহার ফল স্বরূপ রাজাজ্ঞা দ্বাবা অধিকাংশ সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কেবল যে সকল পত্রের ভাষা বিশেষ তীব্র ছিল না, বা কেবল শিল্প সাহিত্যাদি লইয়া নাড়াচাড়া করিত, রাজনীতিব সংস্পর্শে বড় একটা যাইত না, সেইগুলিই রাজাজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি পায়।

নেপোলিয়নের সময় ফ্রান্সের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিলক্ষণ সংকোচ কবা হইয়াছিল। নেপোলিয়ন অপবাপব কার্য্যে যত উদার হউন না কেন, সংবাদপত্রেব স্বাধীনতা তিনি সহ্য করিতে পাবিতেন না। এখনকাব ন্যায় তখন যে সে লোক ইচ্ছা কবিলেই সংবাদপত্র বাহিব কবিতে পাবিত না। সে সময় কেহ কোন পত্র প্রচাব কবিতে ইচ্ছা কবিলে, প্রথমে রাজাব নিকট অনুমতি গ্রহণ কবিতে হইত, ফ্রান্সে অধিবাসী লোক ভিন্ন অপব কোন দেশীয় লোক তথায় কোন পত্র প্রচাবে অনুমতি পাইত না। সংবাদপত্রেব সম্পাদককে রাজসমীপে কতকগুলি বিশেষ নিয়মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইত। সর্ব্বদা বাজপক্ষ সমর্থন কবিব, গবর্নমেণ্টের বিপক্ষে কখন কোন কথা বলিব না, এই সকল বলিয়া শপথ গ্রহণ করিলে তবে সে সময়কাব গবর্ণমেণ্ট সম্পাদককে কাগজ বাহিব কবিতে আজ্ঞা দিতেন। নেপোলিয়ন বড় যুদ্ধানুরক্ত ছিলেন বলিয়া এই শপথেব মধ্যে যুদ্ধ বিভাগের কথা বিশেষ কবিয়া উল্লিখিত হইত। এই সকল কাবণে নেপোলিয়নেব সময় ফ্রান্সেব প্রধান প্রধান সংবাদপত্রেব সুব ক্ষীণ হইয়া পডিয়াছিল। যে সকল পত্র বোর্বোঁ বংশের কিছু গুণগান কবিত, সে সকল পত্রকে সম্রাট বিষচক্ষে দেখিতেন। আবার যে সকল পত্র নেপোলিয়নের বিপক্ষ ছিল না, অথচ সপক্ষেও কিছু বলিত না, তাহাদিগকেও তিনি পছন্দ কবিতেন না, শত্রু জ্ঞান কবিতেন। নেপোলিয়ন স্পষ্টাক্ষবে তাঁহাব সময়েব সংবাদপত্র সকলকে তাঁহাব বাজনীতিব পক্ষ সমর্থন কবিতে আজ্ঞা কবিতেন। নেপোলিয়নেব সময় সংবাদপত্রেব অবস্থা ত এই, মুদ্রাযন্ত্রের অবস্থা ইহাপেক্ষা শোচনীয় ছিল। নেপোলিয়নেব পব বোর্বোঁ-বংশীয়েরা আবাব যখন সিংহাসন অধিকাব কবিলেন, তখন সংবাদপত্র সমূহকে নেপোলিয়নেব ন্যায় ততদূর কঠোব শাসনাধীনে না রাখিলেও তাঁহারা কোন প্রকাব অনুগ্রহভাব দেখাইতেন না। তবে বোর্বোঁ বংশীয় সম্রাট অষ্টাদশ ই

নৃপতির সময় ফ্রান্সের সংবাদপত্রের দ্বিতীয়বার উন্নতি লক্ষিত হয়; এই সময় সম্রাট স্বয়ং ফ্রান্সের অনেকগুলি প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া সংবাদপত্রের প্রকাশকদিগকে উৎসাহিত করেন, এই সময় সম্রাটের উৎসাহে রাজ্যের অনেক বড় বড় পণ্ডিত ও রাজকর্মচারী পুনরায় সংবাদপত্রের উন্নতি কল্পে লেখনী ধারণ করেন ও ইঁহাদিগের যত্নে ফ্রান্সে সংবাদপত্রের যুগান্তর উপস্থিত হয়।

আমাদের এখানে যেমন পাইওনিয়র, ইংলিসম্যান, সিবিল মিলিটারী গেজেট প্রভৃতি কতকগুলি গবর্ণমেণ্টের তরফের কাগজ আছে, ফ্রান্সে নেপোলিয়নের পতনের অব্যবহিত পরে ও বোর্বোঁ বংশের রাজ্য গ্রহণের প্রথমাবস্থায়, এই প্রকার ছয়খানি প্রধান কাগজ ও প্রজা পক্ষের ছয় খানি প্রধান কাগজের গ্রাহক সংখ্যা তুলনায় সকলে বুঝিতে পারিবেন, রাজ্যে কোন পক্ষের বল অধিক।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ	গ্রাহকসংখ্যা	প্রজার পক্ষ	গ্রাহকসংখ্যা
লি জর্ণাল দে পারী।	৪১৭৫	লি কনষ্টিটিউশনাল।	১১২৫০
লি ইউইসি।	২৭৪৯	লি জর্ণাল দে দিবেট।	১৩০০০
লি গ্যাজেট।	২৩০০	লি কোটিদিয়েন্।	১০৮০০
লি মানটর।	২২২০	লি কুরিয়র ফ্রাঙ্কে।	২৯৭৫
লি দ্রাপিয়ান ব্লাঙ্ক।	১৯০০	লি জার্ন দে কমির্ডন্।	২৩৮০
লি পাইলোট।	৯০০	প্যারিঠাক।	৯২৫
মোট—১৪,২৭৪		মোট—৪১,৩৩০	

এই হিসাবে দেখা যাইতেছে প্রজাশক্তি অপেক্ষা রাজশক্তি কত হীন বল। রাজতন্ত্র দেশে রাজার প্রতি প্রজার কত কম টান। এই সংবাদপত্রের হিসাবে দেখা যাইতেছে রাজশক্তি অপেক্ষা প্রজাশক্তি তিন গুণ অধিক, প্রকৃত হিসাবে আরও কত গুণ অধিক, তাহা বলা যায় না। আমরা এই তুলনায় প্রথম বৎসরের হিসাব মাত্র দেখাইলাম, প্রতি বৎসরের হিসাব তুলিয়া দেখাইলে পাঠকগণ দেখিতে পাইতেন, রাজতন্ত্র ফ্রান্সে প্রজাশক্তি প্রতি বৎসর কিরূপ আশ্চর্য্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নেপোলিয়ন যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ করিয়া প্রজাশক্তির গলা টিপিয়া মারিতে গিয়াছিলেন, নেপোলিয়নের পতনের অল্পদিন পরেই সেই প্রজাশক্তি পুনরায় আপন বল লাভের চেষ্টা করায়, ছয় খানির স্থানে পাঁচ শত সংবাদপত্র প্রজা পক্ষে জন্মগ্রহণ করিল।

ইহার মধ্যে প্রধান আঠার খানির গ্রাহক দুই হাজার হইতে ত্রিশ হাজার পর্য্যন্ত। লুই ফিলিপি প্রজা পক্ষের সংবাদপত্রের আকস্মিক এতাদৃশ বৃদ্ধিতে ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু নেপোলিয়নের ন্যায় তাঁহার সাহস ও বল না থাকায় তিনি কোনরূপে এই শক্তিকে দমন করিতে পারেন নাই। লুই ফিলিপির ভয়ের একটী বিশেষ কারণ এই যে, এই সময় ফ্রান্সের সকল সংবাদপত্রের মূল্য হ্রাস হইয়া পড়ায় এতদিন যাহা কেবল সঙ্গতিপন্ন ও ভদ্রলোকের পাঠ্য ছিল, এক্ষণে তাহা সর্ব্ব সাধারণের পাঠ্য হওয়ায় ছোট বড ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীস্থ লোকেই রাজকার্য্যের সমালোচন আরম্ভ করায়, রাজার স্বার্থে ব্যাঘাত পড়িল। কিন্তু এই সময় মূল্য হ্রাস হইয়া সংবাদপত্রের প্রচার বৃদ্ধি হইলেও এক বিষয়ে ফ্রান্সের সংবাদপত্রের অবস্থা বড় শোচনীয় ভাব ধারণ করে। এই সময় সংবাদপত্রের প্রচারকগণ দেশের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা আপনাদিগের স্বার্থের দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিয়া কাগজ চালাইতে লাগিলেন। আর সম্পাদকগণ আপনাদিগের গ্রাহকগণের প্রবৃত্তি বুঝিয়া সেই অনুযায়ী কাগজ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই সুযোগে সংবাদপত্রের লেখকদিগের বিলক্ষণ আর্থিক উন্নতি হয়। অনেক প্রধান পত্রের-লেখক এই সময় বৎসরে কুড়ি হাজার হইতে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক পর্য্যন্ত বেতন পাইতেন। এই সময় হইতে সংবাদপত্রে পরনিন্দা, হিংসা, দ্বেষ ও গালাগালির কিছু বাড়াবাড়িই হয় এবং আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশের সংবাদপত্রে সেই ভাব সংক্রামিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। ইহা ভিন্ন এই সময় হইতে ফ্রান্সে সংবাদপত্রে স্ত্রীজাতির বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়, সুতরাং অশ্লীলতারও যে আরম্ভ হয়, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। এক কথায় এই সময় হইতে সংবাদপত্রের রুচির পরিবর্ত্তন হয়। ইহার পূর্ব্বে সংবাদপত্রে এই সকলের বড় আলোচনা হইত না, তখন কেবলমাত্র রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনায় পত্র পৃষ্ঠা পূর্ণ করা হইত। স্ত্রীজাতির বিষয় আলোচনার সুরু হওয়ায়, স্ত্রীজাতির জন্য কয়েক খানি পত্রেরও এই সময় প্রথম সৃষ্টি হয়।

১৮৫২ অব্দে ফ্রান্সে নেপোলিয়নবংশ আবার প্রাধান্যলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে, ফ্রান্সে সংবাদপত্র আবার শোচনীয় অবস্থার পতিত হয়। নেপোলিয়ন বংশধর নেপোলিয়ন অপেক্ষা শত গুণ কঠোর শৃঙ্খলে ফ্রান্সের সংবাদপত্র সমূহকে আবদ্ধ করেন। লুই নেপোলিয়নের আদেশক্রমে সংবাদ বা

সাময়িক যে কোন পত্র হউক না কেন, এবং তাহা যে কোন বিষয়েরই আলোচনা করুক না কেন, রাজাজ্ঞা ব্যতীত কেহই তাহা প্রকাশ করিতে পারিত না। তাহার পর এই সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম হইল, ফ্রান্সের অধিবাসী ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি তাঁহার রাজ্যমধ্যে কোন প্রকারের পত্রিকা প্রচারে অধিকারী হইবে না। এই সকল পত্রের অধিকারী ও সম্পাদকের সাবালক হওয়া চাই, শুদ্ধ ইহাই নহে, আবার মিউনিসিপাল অধিকার থাকা চাই। সম্পাদক ও পত্রাধিকারীর পরিবর্ত্তনের সহিত রাজার অনুমতি পুনর্ব্বার গ্রহণ আবশ্যক। এই সময় যদি কোন ব্যক্তি কোন ভিন্ন দেশীয় পত্রের গ্রাহক হইত বা ভিন্ন দেশীয় পত্র ফ্রান্সে আনিয়া বিক্রয় করিত, তাহা হইলে তাহাকেও এই সকল নিয়মাধীনে চলিতে হইত। এই সকল রাজাজ্ঞার কেহ ব্যতিক্রম করিলে, তাহার হয় অর্থদণ্ড, না হয় কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইত। তাহার পর কেহ কোন পত্র প্রচার করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রচারানুমতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার অধিকারীকে জামিন স্বরূপ পনর হাজার হইতে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টে জমা রাখিতে হইত। কোন পত্র লুই নেপোলিয়নের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে, এই টাকা গবর্ণমেণ্টে রাজেযাপ্ত হইয়া যাইত। যদি কেহ রাজাজ্ঞা প্রাপ্তির পূর্ব্বে বা জামিনের সমস্ত টাকা জমা দিবার পূর্ব্বে পত্রিকার প্রচারারম্ভ করিত, তাহা হইলে তাহার গুরুতর অর্থদণ্ড ব্যতীত দীর্ঘ কারাদণ্ড হইত। মুদ্রাকরকে পর্য্যন্ত ইহাতে টান পড়িত। ইহার উপর ষ্টাম্প খরচা, বিদেশী সংবাদপত্রাদি ফ্রান্সে আনিলে তাহার আমদানী মাশুল, কোন প্রবন্ধ গবর্ণমেণ্টের বিরক্তিকর বোধ হইলে গুরুতর অর্থদণ্ড ও কারাবাস উভয়বিধ লাভ, রাজসভার কোন কার্য্য বিনানুমতিতে প্রকাশ করিলে বা গবর্ণমেণ্ট যে কাগজকে যে কার্য্যের জন্য সাবধান করিয়া দিয়াছেন, পুনরায় সেই কার্য্য করিলে,—কাগজ তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। রাজকীয় বিজ্ঞাপনাদি গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছামত বিনা মূল্যে সম্পাদককে প্রকাশ করিতে হইত। যদি কোন পত্রের প্রকাশক বা সম্পাদক গবর্ণমেণ্টের এই সকল আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে লুই নেপোলিয়ন তাহাকে ইচ্ছামত শাস্তি দিবার ক্ষমতা স্বহস্তে ধারণ করিতেন। এই সময় কেহ কোন সচিত্র পত্রিকা বাহির করিতে ইচ্ছা করিলে বা কোন প্রবন্ধ চিত্রযুক্ত বাহির করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার স্বতন্ত্র অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। এইরূপ যত বার ও যতগুলি চিত্র পত্রিকায় প্রকাশের

আবশ্যক হইত, তত বার পৃথক পৃথক্ অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। পুস্তক ও বক্তৃতাদি সম্বন্ধেও লুই নেপোলিয়ন অনেক কঠিন নিয়ম করিয়াছিলেন কিন্তু এ প্রবন্ধে সে সকল উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় আর তাহা বলা হইল না।

লুই নেপোলিয়ন এই প্রকার কঠোর শাসনে তাঁহার প্রথম বৎসরেই এক শত কুড়ি খানি সংবাদপত্রের বা প্রায় এক তৃতীয়াংশ পত্রিকার অকালমৃত্যু হয়, কিন্তু তথাপি ফরাসী প্রজার বল, এত কঠোর শাসনেও দমিয়া যায় নাই। এই বৎসর ফ্রান্সে চৌদ্দখানি দৈনিক পত্র গবর্ণমেণ্টকে ৩১৩, ৫৬২ ফ্রাঙ্ক দণ্ড দিয়াও ১৬১,৩৫০ কাপি করিয়া প্রত্যহ ফ্রান্সবাসীকে উপহার দিয়াছিল।

লুই নেপোলিয়নের পর হইতে ফ্রান্সে সাধারণত ঐ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে। যদিও ফ্রান্সে এক্ষণে সংবাদপত্রাদির আর সে শোচনীয় অবস্থা নাই, তথাপি স্বাধীনতায় এক্ষণেও ইহা ইংলণ্ড অপেক্ষা হীন। ফ্রান্স ব্যতীত, জর্ম্মণি, রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি যে সকল দেশে দেখা যায়, প্রজাশক্তি অপেক্ষা রাজশক্তি বলবান, সেইখানেরই সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদির পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় ইউরোপখণ্ডের মধ্যে ইংলণ্ড সকল জাতিকে অতিক্রম করিয়াছে। আর আমরাও আজ ইংলণ্ডের প্রসাদে সেই স্বাধীনতার কিয়দংশ ভোগ করিতেছি। এস্থলে পাঠকগণকে বুঝাইয়া বলা উচিত, পূর্ণ রাজশক্তিসম্পন্ন দেশে সংবাদপত্রাদির কিরূপ অবস্থা তাহা দেখাইবার জন্যই কেবল ফ্রান্সের কথার অবতারণ করা হইয়াছে, এবং সেই পূর্ণশক্তিবিশিষ্ট রাজা নিজ স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত প্রজাশক্তি বিনষ্ট করিবার অভি-প্রায়ে, প্রজার যন্ত্র ও দূত স্বরূপ সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াও প্রজার মনের আগুন চাপা দিতে পারিলেন না, তিনি প্রজার মুখবন্দের নানা চেষ্টা করিলেও ফ্রান্সের পনর আনা প্রজা লুই নেপোলিয়নের বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, ও তাহার ফলস্বরূপ ফ্রান্সভূমিতে আজ একবারে রাজশক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে; ফ্রান্স সম্পূর্ণরূপে প্রজাশক্তির অধীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের শাসন কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকে এই লুই নেপোলিয়নের দলের লোক আছেন, ইঁহারা প্রজার মনোভাব মনে আবদ্ধ রাখিবার জন্য প্রজার মুখ বন্ধ করিবার জন্য, প্রজাশক্তি নষ্ট করিবার জন্যগবর্ণমেণ্টকে দেশীয় সংবাদপত্রের শক্তি ও ক্ষমতা সংকোচ করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন; তাঁহাদের ভাবা ও দেখা উচিত যে, কেবল সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিলেই প্রজার মুখ বন্ধ করা যায় না, তাহাদের মনে পাষাণ চাপা দেওয়া যায় না, লুই নেপোলিয়ন একপ্রকার প্রজাশক্তি নষ্ট

করিতে চেষ্টা করায় সেই শক্তি যেমন শতগুণ বলে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, আজ ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট যদি প্রজার অপ্রিয় হইয়া প্রজার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদের বলক্ষয় করিয়া ভারতবাসীকে নিজ করতলস্থ রাখিতে যান, তাহা হইলে ইংরাজগবর্ণমেণ্টকেও এক দিন নেপোলিয়নের ন্যায় হতাশ ও ভগ্নমনোরথ হইতে হইবে।

পরিশেষে আমাদের দেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে বলি, ফ্রান্সের সংবাদপত্রের ইতিহাসে তাঁহাদের শিখিবার অনেক আছে। পায়োনিয়র বা ইংলিশম্যান্ প্রেস্ আক্‌টের ভয় দেখাইলেই, আমরা ভয় পাইব কেন?

নাটক।

সৃষ্টিকাল।

যে সে সভ্যসমাজে লোক মনে করিলেই, যখন তখন নাটক সৃষ্টি করিতে পারে না। এ কথা—ঠিক কথা।

নাটক বল, নবেল বল, কাব্য বল, দর্শন বল, জগতে জড় অজড় সকল পদার্থেরই বিকাশ, বিশেষ নিয়ম অনুসারে হইয়া থাকে। সকল পদার্থেরই আগম নিগমের—নিয়ম ও ক্রম আছে। সাহিত্যেরও সকল অবয়বের বিকাশের ক্রম নিয়ম আছে। সেই সকল ক্রম নিয়ম যে কি, তাহা বুঝা বড় কঠিন, তবে মোটামুটি এতটুকু বুঝিতে পারা যায় যে, কোন দেশে পাণ্ডিত্য ও রসগ্রাহিতা যুগপৎ বৃদ্ধি পাইলেই যে সেই দেশে সাহিত্যের সর্ব্ব অবয়বের সুন্দর বিকাশ হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। বড় বড় জাতির বড় বড় কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালি জাতির ক্ষুদ্র বঙ্গ সাহিত্যেই দেখুন—পণ্ডিত ও রসজ্ঞ অনেকেই আছেন, কিন্তু রাম বসুর মত আগমনী বা বিরহ, বা হরু ঠাকুরের মত সখীসংবাদ কেহ লিখিতে পারেন কি? না, তা পারেন না। যখন তখন, যে সে জিনিস, মনে করিলেই হয় না।

প্রাচীন গ্রীসের একটি বিশেষ সময়ে, এবং আধুনিক ইংলণ্ড, স্পেন, ফরাসি দেশের বিশেষ বিশেষ সময়ে, বড় বড় নাটককার জন্মিয়াছিলেন, এইটি

দেখাইয়া, এস্কাইলস্, সেকস্‌পিয়র, হুগো প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়া, য়ুরোপীয় সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন যে, যখন সভ্য দেশে, যুদ্ধবিক্রমের, বাহু-বল-বিপ্লবের, জড় জগতের সহিত মানবের কার্য্যশক্তির—বিশেষ প্রাবল্য হয়, তখনই নাটক সৃষ্টি হইয়া থাকে।

তাঁহাদের কথা এই যে, দেশে জীবন্ত ভাবে ঘাত প্রতিঘাত থাকিলে, সাহিত্যে ঘাত প্রতিঘাত-জীবনময়-নাটকের সৃষ্টি হইবে। দেশে ঘাত-প্রতিঘাত না থাকিলে, সাহিত্যে ঘাত প্রতিঘাত হইবে কেন?

আমরা কাব্য সাহিত্যের সমালোচনায় অনেকেই য়ুরোপীয় সমালোচকগণের মন্ত্র শিষ্য, কাজেই আমরা ঐ মতের অনুসরণ করিয়া, বাঙ্গালিকে নাটক লিখিতে নিষেধ করি, লিখিলে অবজ্ঞা করি, বিজ্ঞতা দেখাই, উপহাস করি, ঘৃণা দেখাই।

কিন্তু সংসারের ঘাত প্রতিঘাত মধ্যে আমরা যে নিয়ম স্থির করিতেছি, বা য়ুরোপীয়েরা স্থির করিয়া দিয়াছেন বলিয়া, যাহা আমরা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতেছি, সেই নিয়মটি একটু বিচার বিতর্ক করিয়া আমাদের এখনকার দিনে দেখা আবশ্যক।

এই কলিকাতায় এক দিকে, যেমন একজন প্রধান ধনীসন্তান, লক্ষপতি বলিলে যাঁহার অবমাননা হয়—এহেন লোক নিভৃতকক্ষে পক্ক পারিপার্শ্বিকে পরিবৃত হইয়া তোষামোদ সেবনের মায়া কাটাইয়া, অথবা তদপেক্ষা আরও নিভৃতকক্ষে মুহুরি মহাফেজ লইয়া কড়া ক্রান্তির হিসাবের মমতা ভুলিয়া, বিপুল অর্থদানে, ভূরি সময় দানে, নাটকের বঙ্গোৎসাহে অগ্রসর,—অন্য দিকে, তেমনই কবি প্রসিদ্ধ দারিদ্রের সহচর কবিবর—রামায়ণ মহাভারতের অপূর্ব্ব অনুবাদ সুখের মায়া কাটাইয়া, ছোট ছোট খোস গল্পের ছাঁচনি বাঁধুনি গাঁথুনির মমতা ভুলিয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, ঋণদায়ে জড়িত হইয়া, সেইরূপে বঙ্গ নাটকের বঙ্গোৎসাহে বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ। আর বৎসর দেখা গেল, নববিধানীরা বাঁশের বেড়ায় গোবর-মাটীর প্রলেপ দিয়া বঙ্গ নাটকের সেবা করিতেছেন, আবার এ বৎসর দেখা যাইতেছে, ষ্টার কোম্পানি সুবৃহৎ, সুরম্য, মর্ম্মর-গ্রথিত হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া নাটকসেবার উদ্যোগে আছেন। এমন উৎসাহের দিনে, নাটকের সৃষ্টিস্থিতির বিলাতী নিয়মটি আমাদের বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

নাটকের জীবন—ঘাত প্রতিঘাত বটে। কিন্তু অত অল্প কথায় বলিলে কিছুই বুঝা যায় না। আমরা অনেক স্থলে ঐ কথাটী অনেক প্রকারে

বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, যদিও এখনও অনেক কথা বলিবার আছে—তথাপি অদ্য ও কথার আর নাড়াচাড়া করিব না। কিন্তু নাটকের জীবন ঘাত প্রতিঘাত বলিয়াই—কোন সভ্য সমাজে ঘাত প্রতিঘাত থাকিলেই যে সেই সমাজে নাটক সৃষ্ট হইবে—তাহা বোধ হয় না।

মুসলমান সভ্য জাতি। মুসলমান ইউরোপের সাক্ষাৎ শিক্ষা গুরু। মুসলমান হিন্দুর নিকট, য়ুনানীর নিকট, স্বয়ং শিক্ষা করিয়াছে, সেই সকল জ্ঞান বিজ্ঞান অতি সন্তর্পণে আবার আপনার শিষ্য য়ুরোপীয়গণকে শিক্ষা দিয়াছে। মুসলমানের ধর্ম্ম শাস্ত্র কোরাণ একরূপ সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ। পারসী ভাষার গীতি কাব্য হিন্দু গ্রীকের সমতুল্য। যুদ্ধ বিক্রমে, দিগ্বিজয়ে, আস দণ্ডের ঘাত প্রতিঘাতে, পাঁচ শত বৎসর যাবৎ মুসলমান জগতে অতুল্য ছিল বলিলেও হয়।—এত ঘাত প্রতিঘাতেও ত মুসলমানের সাহিত্যে—আরবী পারসী, তুরকীতে ঘাত-প্রতিঘাত-ময় নাটক এক খানিও নাই। তবেই বোধ হইতেছে, কোন সভ্য সমাজে ঘাত প্রতিঘাত থাকিলে, তাহাদের সাহিত্যেও ঘাত প্রতিঘাতের ছায়া পড়িবে, এই নিয়ম সকল স্থলে খাটে না। এখন কথা হইতে পারে, কোন সভ্য সমাজে ঘাত প্রতিঘাত থাকিলেই যে সেই সমাজের সাহিত্যে ঘাত প্রতিঘাত থাকিবে—এ কথা ঠিক নহে বটে কিন্তু সমাজে ঘাত প্রতিঘাত না থাকিলে, যে ঘাত-প্রতিঘাত-ময় নাটক হইবে না,—তাহা ঠিক। এ কথারও বিচার করা আবশ্যক।

কোন একটি সমাজের মধ্যে অস্ত্র শস্ত্রের ঝঞ্ঝনাণি, অঙ্গ গ্রন্থির কন্‌কনানি না থাকিলেই, যে সে সমাজে, কিছুমাত্র ঘাত প্রতিঘাত নাই, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। আপাত দৃষ্টিতে নির্জীব প্রায় এই বঙ্গ সমাজে, কতটুকু মানসিক ঘাত প্রতিঘাত আজি কালি চলিতেছে—তাহা আপনারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? বর্ষীয়ান্ পিতা, কিসে পুত্র ঠাট বাট বজায় রাখিয়া পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি কলাপ নষ্ট না করিয়া সুপরিচিত, চির-প্রচলিত পথে চলিতে থাকিবে—নিয়ত সেই ভাবনায় বিব্রত, আর তাঁহার সেই যবীয়ান্ পুত্র, কিসে সমাজ ভাঙ্গিবে, গৃহস্থালি নষ্ট করিবে, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করিবে,—সেই ভাবনায় ভোর। ইহাতে আমাদের সমাজ মধ্যে নিয়তই কি ঘাত প্রতিঘাত চলিতেছে না? অশিক্ষিত ভাবিতেছে উদর-নীতি, শিক্ষিত ভাবিতেছেন উদার-নীতি। গৃহিণী ভাবিতেছে অতিথি অভ্যাগত,—ক্রিয়া, কলাপ—ছেলে পিলে—আবরু আচ্ছাদন। বধূমাতা ভাবিতেছেন—বন্ধু

বন্ধুনী—কৌচ কেদারা—ডাকের পত্র, প্রিয়জনের ছত্র—সোসাইটীর মহাশ্মশান, আর চিড়িয়াখানার জীবন্ত তীর্থ। দুইটি বিভিন্ন-মুখী স্রোতের ঘাত প্রতিঘাত বঙ্গ সমাজে আজি অনেক কাল লীলা খেলা করিতেছে—সমাজে, সংসারে, এমন কি স্ত্রীপুরুষ মধ্যে—ঘাত প্রতিঘাত নিয়তই চলিয়াছে। বাঙ্গালীর যতই চক্ষু ফুটিতেছে এই ঘাত প্রতিঘাত ততই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। বাহ্যে ঘাত প্রতিঘাত নাই বলিয়া অন্তরেও যে নাই, এ কথা বলিতে পারা যায় না। তবে যে সমাজ অন্তর্বাহে সমানে নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল,—জড়, অসাড়—উদাস, উদাসীন,—সে সমাজে অবশ্য নাটক সৃষ্ট হইবে না; শুধু নাটক কেন—তাহাতে দর্শন বিজ্ঞান, ব্যবসায় বাণিজ্য—অবশ্য মনুষ্য ধর্ম্মের কিছুই থাকিবে না।

তেমন জড় সমাজ, বঙ্গ সমাজ নহে। অনেক দিন হইতে বাঙ্গালি কাঁদিতে শিখিয়াছে! অন্তর আলোড়িত হইয়া টগবগ করিয়া না ফুটিলে, কিছু বাষ্প উঠে না। বাঙ্গালি বহুকাল বাষ্পবারি ফেলিতেছে—অনেকদিন হইতে তাহার অন্তর আলোড়িত হইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর হইল, পাশ্চাত্য সভ্যতার আকস্মিক আঘাতে বঙ্গসমাজ সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল, অভিভূত হইয়াছিল—মন্ত্রমুগ্ধবৎ পরিচালকের অঙ্গুলি ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছিল, অল্প অল্পে তাহার সংজ্ঞা হইতেছে। সেই বিষম আঘাতের অল্প অল্প প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়াছে। এমন আন্তরিক ঘাত-প্রতিঘাতে কি নাটকের কিছুই উপযোগিতা নাই? তোমরা অমন করিয়া মাথা নাড়িলে চলিবে কেন? আমি তোমাদের কথাত বিশ্বাস করিব না। আমি স্বয়ং একখানা জীবন্ত নাটক, আমার হৃদয়ে দুইটি প্রবল প্রতীপ স্রোতের নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছে—তোমরা আমাকে চিত্রিত করিলেই নাটক হইবে—তবে এ সময় নাটকের উপযোগী নয়, এমন কথা কেমন করিয়া বলিব? 'আমি জীবন্ত নাটক' এই কথা বলিয়া আমি আত্মগরিমা করিতেছি না—আমি অর্থ, আমরা—আমি, তুমি, তিনি—সমগ্র শিক্ষিত সমাজ। আমরা শিরায় শিরায় পূর্ব্বপুরুষদের নিতান্ত নিষ্কামতা বহন করত, শিক্ষাগুণে পশ্চিমপুরুষদের একান্ত সকামতা পাইয়াছি। পাইয়া হইয়াছি—নিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতের গ্রন্থ—এক একখানি জীবন্ত নাটক। এরূপ আভ্যন্তরিক সংঘর্ষণ জগতে আর কখন হয় নাই। এমন অপূর্ব্ব সংঘর্ষণের ফল যে সাহিত্যে প্রতিফলিত হইবে না।—সে বিশ্বাস আমাদের হয় না। সংসারধর্ম্ম সাধনার জন্যই বল, আর কাব্য সাহিত্যের স্ফুরণ জন্যই বল,—আত্মচিত্তানুসন্ধান ও সেই চিত্তের চিত্রণই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য!

জ

যে সে সময়ে নাটক হয় না বটে, কিন্তু এসময়ে, যে বঙ্গসমাজে প্রকৃত নাটক একেবারেই হইতে পারে না—এমন কথা ইতিহাসের দোহাই দিয়া, জোর করিয়া বলিয়া, আমরা নাটককারগণকে নিরুৎসাহ করিতে পারি না। প্রকৃত পন্থার চেষ্টা করিলে, এসময়ে নাটক সৃষ্ট হইলেও হইতে পারে।

নাটকের উপযোগী গল্প।

প্রকৃত পন্থা অনুসরণ করিতে হইলে, অনেক বিষয় শিখিতে হইবে। নাটকের উপযোগী গল্প নির্ব্বাচন করাও শিখিতে হয়। না শিখিলে অতি সামান্য কর্ম্মও হয় না—এ সকল ত অতি গুরুতর কাজ।

যে সে গল্প লইয়া, অঙ্ক দৃশ্য বিচ্ছেদ করিয়া—কথোপকথনের ভঙ্গিতে পুথী লিখিলে, নাটক হয় না। গল্পের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের উপকরণ থাকাত চাই, গল্পটিতে পূর্ণত্বও থাকা চাই। রাহুর মত কেবল মুণ্ডটা, বা কেতুর মত মাথাকাটা ধড়টা, লইলে হইবে না। একটি গাছের যেমন মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র পুষ্পফল থাকে—একটি নাটকোপযোগী গল্পেরও সেইরূপ পূর্ণবিকাশ থাকা চাই। পাণ্ডবনির্ব্বাসন, মহাভারত যুদ্ধ রূপ মহানাটকের একটী মহামূল, সেইটি মাত্র লইয়া কখন নাটক হইতে পারে না—তবে যাত্রার মত নাটকে পালাগাথুনী থাকিলে, প্রথম দিনের পালায় গাওয়া যাইতে পারে।

নাটকের গল্প নির্ব্বাচনার্থ আরও অনেক কথা জানা চাই। সকল কথাই যে আমরা জানি তাহা নহে। তবে মোটামুটি যাহা বুঝিতেছি, তাহা বলিতে ক্ষতি কি? কিন্তু এরূপ করিয়া বলিবার অগ্রে বোধ হয় দুই একটি নাটকোপযোগী গল্পের নমুনা দিলে ভাল হয়।

প্রথমে বিক্টর হুগো বিরচিত একখানি প্রসিদ্ধ নাটকের গল্পটি শুনুন—হয় ত শুনিলেই আপনা আপনি বুঝা যাইবে, যে এই গল্পে কিরূপ নাটকত্ব আছে।

ফরাসি রাজ প্রথম ফ্রান্সিসের ত্রিবুলে নামে এক জন বিদূষক ছিল। ত্রিবুলে দেখিতে অতি কদাকার, একে কর্কশ, খেঁকুরে, তাহার উপর পিঠে একটা কুঁজ। ত্রিবুলেকে দেখিলেই সকলে হাসিত, ত্রিবুলেও হাসাইত, কিন্তু হাড়ে হাড়ে সে জগৎসংসারের উপর চটা ছিল। রাজা রাজা বলিয়া ত্রিবুলে তাঁহার উপর চটা, বড় মানুষেরা বড় মানুষ বলিয়া, ত্রিবুলে তাহাদের উপর চটা, আর সংসারের লোকের কাহারও পিঠে কুঁজ নাই বলিয়া, ত্রিবুলে সকল

লোকের উপরই চটা। রাজার উপর ত্রিবুলের অসীম প্রভুত্ব, সে জগৎ-সংসারের উপর রাগ করিয়া রাজাকে ক্রমেই পাপের পথে লইয়া যাইতে লাগিল। রাজাকে ক্রমে পাষণ্ড, পশু, পিশাচ করিয়া তুলিল। ত্রিবুলে রাজাকে ভাল-মন্দ কিছুই জানিতে দেয় না, তাঁহাকে অত্যাচারে উত্তেজিত করে, পাপে প্রশ্রয় দেয়। বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবার মধ্যে কোন কুলবধূকে কলঙ্কিনী করিতে হইবে, কাহার ভগিনীকে অভাগিনী করিতে হইবে, কাহার দুহিতাকে ধর্ম্মচ্যুতা করিতে হইবে, সে রাজাকে তাহারই শিক্ষা দেয়, রাজার স্বেচ্ছাচারের সুযোগ নিয়ত জুটাইয়া দেয়।

এক দিন মহা মহোৎসব হইতেছে, ত্রিবুলে রাজাকে পরামর্শ দিতেছে যে, এই সুযোগে তিনি মুসে দে কসের বনিতাকে লইয়া সচ্ছন্দে স্বেচ্ছাবিহারে স্থানান্তরে যাইতে পারেন, এমন সময় সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ সেণ্ট ব্যালীর হঠাৎ রাজার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার কন্যার ধর্ম্মনাশের জন্য রাজাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। পাপিষ্ঠ ত্রিবুলে, এই মর্ম্মাহত পিতাকে আপনার স্বভাবমত বিদ্রূপ করিতে লাগিল। বৃদ্ধ গর্জিয়া উঠিলেন, উর্দ্ধহস্তে অভিসম্পাত করিলেন—'আমার মত দশা যেন তোর হয়।'

ত্রিবুলের একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। সেই তাহার সংসারের একমাত্র বন্ধন। মানুষ যতই কেন পাপিষ্ঠ পিশাচ হউক না, যতই কেন কঠোর নিঠুর হউক না, তাহার হৃদয়ের এক কোণে একটু মনুষ্যত্ব পড়িয়া থাকিবেই। ভালবাসাকে মনুষ্যত্ব বলে। যে যত জগতের উপর চটা, তাহার ভালবাসাটুকু ততই খাটি। জগতের উপর ত্রিবুলে, যেমন চটা, আপন কন্যা ব্লান্সকে তেমনই ভাল বাসিয়া, ত্রিবুলে আপনার হৃদয়ের তুল দাঁড়ি ঠিক রাখিয়াছিল। ব্লান্সকে নগরান্তে, বনান্তরে, একটি নির্জন নিভৃত নিকেতনে রাখিয়া, ত্রিবুলে তাহাকে অতি সন্তর্পণে মানুষ করিয়াছিল। লোকের পাপচক্ষু সমক্ষে তাহাকে আসিতে দেয় নাই, স্বধর্ম্মে, সরলতায়, সৌন্দর্য্যে—ব্লান্সকে স্বচ্ছ সরোবরের শ্বেত পদ্মের মত করিয়াছে; সেই শ্বেত শতদল এখন প্রস্ফুটোন্মুখ হইয়াছে। যে সকল পাপের পঙ্ক লইয়া ত্রিবুলে সর্ব্বদা মাখামাখি করে—ত্রিবুলের বড় ভয় আছে, কিসে ব্লান্সকে সেই পাপ-পঙ্ক হইতে রক্ষা করিবে।

কিন্তু অধর্ম্মের উপর ধর্ম্মের অভিসম্পাতের লীলাখেলা বড়ই ভয়ঙ্কর। ত্রিবুলে মুসেদে কসের বনিতাকে রাজার নিকট লইয়া যাইবার ষড়যন্ত্র করিয়া, নিজে

চক্রে পড়িয়া, আপনার কন্যাকেই রাজভোগে অর্পণ করিল। তাহার পর প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া রাজার উপর রাগ তুলিতে গিয়া স্বহস্তে আপন কন্যাকে বধ করিল। কোলে লইয়া, মুখ দেখিয়া, চিনিতে পারিয়া বুঝিল যে, সেণ্টবালীর অভিসম্পাৎ হাতে হাতে ফলিয়াছে। ত্রিবুলে রাজাকে পাপে শিক্ষিত করিয়াছিল, কন্যাকে পবিত্রতায় দীক্ষিত করিয়াছিল; প্রকৃতির এমনই প্রতি-বিধান যে, সেই অধর্ম্ম-দীক্ষিত রাজা হইতেই সেই ধর্ম্ম-দীক্ষিতা কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট হইল। যে পাপিষ্ঠ এক দিন মর্ম্মাহত পিতার কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া উপহাস করিয়াছিল, দেখ সেই আজি ততোধিক মর্ম্মাহত হইয়া, স্বহস্তে সংসারবন্ধনের এক মাত্র সূত্র ছিন্ন করিয়া, মৃত কন্যা ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে; ত্রিবুলে ত কাঁদিতে পারিল না!

গল্পের নাটকত্ব বুঝিলে কি?

মাক্‌বেথ ও হাম্‌লেট।

৫।

আমরা বলিয়াছি, বাঙ্কো হত্যার সংকল্পে তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সমাপ্তি। দৃশ্যের শেষ কথা মাক্‌বেথ মুখে পাপসংকল্পের স্বগত উক্তি।

এ কথা ত হলো, বাঙ্কো তোমার কপালে,
যদি স্বর্গ থাকে—হবে, অদ্য রাত্রিকালে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে—মাক্‌বেথ গৃহিণী স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভৃত্যকে বলিয়া পাঠাইলেন। পরে আপনা আপনি ভাবিতে লাগিলেন।

আপনা আপনি ভাবিতে আমরা লেডি মাক্‌বেথকে আরও অনেক বার দেখিয়াছি। প্রথমে মাক্‌বেথ-লিখিত পত্র পাঠের পর তাঁহার ভাবনা। তখন দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে ফুটিতেছে। তাহার পর দূত আসিয়া যখন বলিল, ডঙ্কান্ অতিথি হইবেন, তখন দুঃসাহসে বুক বাঁধিবার জন্য তাঁহার পৈশাচী প্রকৃতির উচ্চ রবে আরাধনা।* তাহার পর ডঙ্কান্ হত্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই পিশাচীর সুরাপান করিয়া, কাল পেচকের কাল রব শুনিতে শুনিতে অধর্ম্মের আহ্লাদের ভাবনা। এই দুই স্থলে মাক্‌বেথ গৃহিণীর পৈশাচিকী মূর্ত্তি।

* ৪২৪ পৃষ্ঠায় মাক্‌বেথগৃহিণীর কথাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ হয় না।

এখনও সেই লেডি মাক্‌বেথ আপনা আপনি ভাবিতেছেন, কিন্তু এখন আর সে ভয়ঙ্করী, বীভৎসা মূর্ত্তি নহে।

রাম লক্ষ্মণ সীতা বল্কল পরিয়া বনে গেলেন; কোশলে হাহাকার ধ্বনি; দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন, কিন্তু কৈ ভরত ত সিংহাসনে বসিল না?—কৈকেয়ী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে পারে। ছিন্ন নাসা-কর্ণের প্রতিশোধে সীতাহরণ। কিন্তু সীতাহরণের পরিণামে রক্ষ-রাক্ষস-বংশ ধ্বংশ হইল—সূর্পনখা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে পারে। কিন্তু মাক্‌বেথগৃহিণী সিদ্ধকামা হইয়া, স্বামীকে স্কটলাণ্ডের রাজরাজেশ্বর করিয়া, আপনি রাজরাজেশ্বরী হইয়া, অমন হেটমুণ্ড, মলিন মুখে, দীর্ঘশ্বাস তুলিতেছে, অথচ ফেলিতে পারিতেছে না কেন?

অইত, অইত পাপের মজা। অইত পাপ-পুণ্য-বিধাতার কারদানি। পাপের ভোগেও কষ্ট, বিয়োগেও কষ্ট। অভিলষণীয় বস্তু একেবারে বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন হইলে, বরং একরূপ নিবৃত্তি আছে—পাপের সম্ভোগে কিন্তু কখনই সন্তৃপ্তি নাই। তাহাতেই কৈকেয়ী ও সূর্পনখা নিরাশার শ্বাস ফেলিতেছে—মাক্‌বেথ গৃহিণীত তাহা পারিল না—শ্বাস টানিতেছে, নিশ্বাস রুদ্ধ করিতেছে, শরীর স্ফীত করিতেছে, হেটমুণ্ড স্বামীর আসিবার পথের দিকে চাহিয়া আছে, আর দমে দমে বলিতেছে,—

'পেলেম না কিছু, গেলত সর্ব্বস্ব।' কেন, কেন, রাণী, স্কট্‌লাণ্ডের রাজরাজেশ্বরি। স্বামীর স্বামিনি। কেন কেন? তোমার সর্ব্বস্ব গেল কিসে? তুমি সংকল্প-সিদ্ধির জন্য মাতা হইয়া ক্রোড়স্থ স্তন্যপায়ী শিশুকে পাথরে আছাড় মারিতে পার—এখন তোমার সংকল্প সুসিদ্ধ হইয়াছে—তুমি, সর্ব্বস্ব গেল বলিতেছ কেন? কোথায় সর্ব্বস্ব তাহা বুঝিতে পারিতেছ কি? মানুষের সর্ব্বস্ব দাস-দাসীতে নাই, প্রভুত্ব প্রতাপে নাই, মান-সম্ভ্রমে নাই, রাজ্য-ঐশ্বর্য্যে নাই, প্রাসাদ-পর্য্যঙ্কে নাই—সর্ব্বস্ব থাকে,—মনের কোণের ভিতর, প্রাণের প্রাণের ভিতর। ভিতরের সেই নিজস্বই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব। ঐ সিংহাসন, ঐ সিংহদ্বার, ঐ রাজ্য, ঐ সংসার, ঐ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—বাহিরে—সর্ব্বস্ব নাই, কিছুই নাই। দুর্ম্মতি, দুষ্প্রবৃত্তি, দুরাকাঙ্ক্ষার বশে আজি ভিতরের সর্ব্বস্ব হারাইয়া তাহাতেই তোমাকে বলিতে হইতেছে—

'পেলেম না কিছু—গেল ত সর্ব্বস্ব।'

ভিতর ছাড়া বাহিরে কোথাও কিছু নাই। তা পাবে আর কি? সর্ব্বস্ব যে গিয়াছে, তাহাই ঠিক।

পুণ্যাত্মা পরোপকারের প্রয়াসী। উপকারের সংকল্পসিদ্ধি হওয়া সর্ব্বদা ঘটে না। কিন্তু তাহার চেষ্টাতেই সর্ব্বস্ব লাভ হয়। পাপের সংকল্প সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইলেও, সুখ নাই, তৃপ্তি নাই—কেবল মনে হয়, হলো কি? পেলেম কি?

লেডি মাক্‌বেথ ঐরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় মাক্‌বেথ আসিলেন, লেডি মাক্‌বেথ অমনই সেই অনন্ত নিরাশ চাপা দিয়া মাক্‌বেথকে সান্ত্বনাদান করিতে লাগিলেন।

লেডি মাক্‌বেথ দুরাকাঙ্ক্ষার বশে যতই কেন পাপিষ্ঠা হউন না, তাঁহার স্বামী তাঁহার নিকট প্রণয়-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারই উত্তেজনায় মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছেন সুতরাং লেডি মাক্‌বেথ স্বামীর জন্য বড়ই উদ্বিগ্না আছেন। পাছে ভাবিয়া ভাবিয়া মাক্‌বেথ পাগল হন, সে ভাবনাও আছে। আপনার সর্ব্বস্ব-ধ্বংশকর হৃদয়দাবানল ধীরে ধীরে চাপা দিয়া স্বামীকে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন, 'যাহার কোন উপায় নাই তাহার বিষয় ভাবিয়া আর কি হইবে।'

পাপের কি সান্ত্বনা আছে? মাক্‌বেথ কোন সান্ত্বনাই বুঝিলেন না। পরিশেষে বলিলেন, 'গৃহিণী আমার হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিতেছে, তুমি ত দেখিতেছ—বাঙ্কো ও ফ্লীয়ান্স এখনও জীবিত রহিয়াছে।' ক্রমে বলিতে লাগিলেন—'তুমি জানিও রাত্রিচর বাড়ড়গুলা আপনাদের নিভৃত নিবাস হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে, ঝিল্লির ঝিম্‌ঝিমুনিতে নৈশ সমীরণ পূরিত হইবার পূর্ব্বে, আজি একটি ভয়ঙ্কর কার্য্য হইবে।' গৃহিণী সোৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি কার্য্য?' মাক্‌বেথ বলিলেন, 'এখন তোমার শুনিয়া কাজ নাই—কাজ সমাপ্ত হইলে তখন প্রশংসা করিও।' তাহার পর মাক্‌বেথ কালরাত্রির বোধন করিতে লাগিলেন—আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—দিবসের রমণীয় বস্তু সকল অবসন্ন হইতেছে—কালরাত্রির করাল সহচর সকল বিচরণ করিতেছে। সেই ধূয়া গানের কথা—মাক্‌বেথ মন্দকে সুন্দর দেখিতেছেন, তার মধ্যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছেন।

তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে তিন জন ঘাতুকে সপুত্রক বাঙ্কোকে আক্রমণ করিল—ফ্লীয়ান্স পলায়ন করিল, বাঙ্কো নিহত হইলেন।

চতুর্থ দৃশ্যে রাজভবনে রাজ ভোজ। সকলে উপবেশন করিলে ভোজ প্রকোষ্ঠের বহির্দ্দেশে একজন ঘাতুক দেখা দিল। মাক্‌বেথ আপন আসন হইতে উঠিয়া দ্বারের নিকটে গেলেন, সে বাঙ্কোর নিধন বার্ত্তা মাক্‌বেথকে

জ্ঞাপন করিল। মাক্‌বেথ মহা হৃষ্ট হইলেন, তাহার পর যখন সে আবার ফ্লীয়ান্সের পলায়ন বৃত্তান্ত বলিল, তখন মাক্‌বেথের হর্ষে বিষাদ হইল। ফিরিয়া আসিয়া আপন আসন পরিগ্রহ করিবেন, দেখেন সেই আসনে ঘাতুক-ঘাত-লাঞ্ছিত রক্তাক্ত বাঙ্কো মূর্ত্তি উপবিষ্ট। মাক্‌বেথ চকিত, স্তম্ভিতনেত্র হইয়া চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—

'বল তোমরা কে এ কাজ করিলে?

আমি করেছি বলো না—আমার দিকে তোমার রক্তাক্ত কেশ কম্পিত করিও না।'

মাক্‌বেথ যে ডঙ্কানকে হত্যা করিয়াছেন, এমন কথাটা কাণা ঘুষা অনেকেই করিতেছিল, অনেকেরই মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। আজিকার এই কাণ্ডে সকলেই বুঝিল, যে মাক্‌বেথ ডঙ্কানকে হত্যা করিয়াছে—সেই জন্যই তাহার খেয়াল দেখিতেছে।

একেই বলে ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। একবারকার পাপের খেয়ালে, তাহার পূর্ব্ব পাপের কথায় লোকে বিশ্বাস করিল।

বাঙ্কোর এই প্রেতমূর্ত্তি কেবল মাক্‌বেথ চক্ষেই দৃশ্যমান্। বিশেষ পুণ্যাত্মাগণ এবং অতি বড় পাপাত্মারা অলৌকিক ভাবে চক্ষুষ্মান হন। একের পক্ষে অলৌকিক দৃশ্য সকল, পুণ্যের পরিণাম এবং সুখের আবহ। অন্যের পক্ষে সেইরূপ ঐ সকল দৃশ্য পাপের পরিণাম এবং যাতনার বিভীষিকা। এই সকল অলৌকিক দৃশ্য তোমরা খেয়াল বলিতে চাও, কল্পনা বলিতে চাও বল, কিন্তু কিছু নয়, বলিও না, স্পষ্টত বিশেষ পুণ্যে বা পাপে যাহার উৎপত্তি এবং পুরস্কার বা দণ্ডদানের জন্য যে সকলের বিধান—সে গুলি কিছুই নয় কেমন করিয়া বলিব? পাপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দণ্ডবিধান আছে। বাঙ্কোর ঐ প্রেতমূর্ত্তি সেই দণ্ডবিধানের অঙ্গীভূত—উহা যে কিছুই নয়, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

অল্পক্ষণ পরেই বাঙ্কোর প্রেতমূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। মাক্‌বেথ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-বর্গকে বলিলেন, 'আমার একরূপ রোগ আছে, তাহাতে প্রলাপ বকিয়া থাকি, তাওটা কিছু নয়, তা যাই হোক, এখনও বাঙ্কো আসেন নাই, তিনি আসিলে বড়ই ভাল হয়।'—বলিতে বলিতে বাঙ্কোর মূর্ত্তি আবার মাক্‌বেথ চক্ষে পরিদৃশ্য-মান হইল। মাক্‌বেথ দণ্ডায়মান আছেন আপনার আসনের উপর প্রেতমূর্ত্তি বসিয়া আছে, দেখিতে পাইতেছেন; অন্যে দেখিতেছে শূন্য আসন। তখন সেই

আসনের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া—অন্যে বুঝিতে পারিতেছে না কিন্তু বাস্তবিক প্রেতমূর্ত্তির প্রতি তীব্রদৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

'দূর হ রে দৃষ্টি হতে, যাবে মাটির ভিতরে;
অস্থিতে মজ্জাত নাই, তোর শোণিত শীতল,
চক্ষু জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু চিন্তাশক্তি নাই।
মানুষে যে কর্ম্ম পারে—সাহসে আমি তা পারি;
আয় তুই, উষ্ক খুষ্ক রুষ ঋক্ষরূপ ধরি,
খড়্গাধারী চর্ম্মী কিম্বা, জিঘাংসিত ব্যাঘ্ররূপে,—
অই মূর্ত্তি ত্যজি আয় অন্য কোন মূর্ত্তি ধরি,
কাঁপিব না আমি, কিম্বা আবার জীবন্ত হয়ে,
ভীষণ জঙ্গলে আয় সংগ্রামি উভয়ে দ্বন্দ্বে,
যদি কাঁপি কভু তাহে বলিস্ তখন তুই,
বালিকা আমাকে—দূর হ রে বিভীষিকা ছায়া
অলীক অনৃত দৃশ্য, যা রে দৃষ্টিপথ হ'তে।

বার বার দূর দূর বলাতে প্রেতমূর্ত্তি অপসারিত হইল। মাক্‌বেথ স্বীকার করিলেন,—তিনি সকল মূর্ত্তি দেখিতে পারেন, কেবল বাঙ্কোর মূর্ত্তি দেখিতে পারেন না, আবার স্বীকার করিলেন, জীবন্ত মূর্ত্তির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে পারেন কিন্তু প্রেত মূর্ত্তি তাঁহার নিকট বড়ই বিভীষিকাময়ী। মাক্‌বেথ স্বীকার করিয়াছেন, প্রেতমূর্ত্তি তাহাতেই অপসারিত হইল; আর থাকিবার প্রয়োজন কি? বিধাতার দণ্ডবিধান দেখিবে এইরূপই হইতেছে, পায়ের বেড়ী আর দেখিতে পাই না, কিন্তু কৈ চলিতেও পারি না, জগদ্দল পাথর ত আর নাই—কিন্তু কথা কহিতে পারি না। কেন? প্রেতমূর্ত্তি অপসারিত হইলে, মাক্‌বেথ ঐরূপ কথাই বলিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন. আমি আবার সেই তিনটা প্রেতিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিব, 'আমি শোণিতবাহিনী স্রোতস্বতীতে এত অগ্রসর হইয়াছি যে এখন ফিরিয়া যাইতেও যে কষ্ট, পারে যাইতেও সেই কষ্ট। আমি যখন ডুবিয়াছি, তখন দেখিবে, পাতাল কত দূর, পাপে এখনও আমি অপরিপক্ক আছি, এইবার পরিপক্ক হইব। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞাতেই মাক্‌বেথের ভীষণ পতন। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ স্থলেই তৃতীয় অঙ্কের শেষ বটে, তবে আর দুইটি উপদৃশ্য আছে।

// নবজীবন।

৪র্থ ভাগ।	বৈশাখ, ১২৯৫।	১০ম সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

৭।

এক্ষণে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাস পূর্ব্ব সংস্কারশেষোঽন্যঃ॥ ১৮

পদচ্ছেদঃ।—বিরাম-প্রত্যয় অভ্যাস পূর্ব্বঃ সংস্কার শেষঃ অন্যঃ।

পদার্থঃ।—বিরামো বৃত্তীনামভাব স্তস্য প্রত্যয়ঃ কারণং তস্য অভ্যাসঃ তদনুষ্ঠান পৌনঃ পুন্যং তদেব পূর্ব্বঃ যস্য স কশ্চন সংস্কারঃ শিষ্যতে। স্মিন্নিতি অথবা সংস্কারাণাং শেষোস্মিন্নি সংস্কার শেষঃ অন্যঃ পূর্ব্বোক্তসম্প্রজ্ঞাত বিলক্ষণঃ।

অনুবাদ—সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে ভিন্নরূপ সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত বলে। ইহা সকল প্রকার বৃত্তির উন্মূলক পরবৈরাগ্যের বারম্বার অনুষ্ঠান হইতে উৎপন্ন হয় এবং সংস্কার দ্বারা জন্মের বীজরূপ যে জ্ঞান এবং কর্ম্ম, সেই জ্ঞান এবং কর্ম্মের সম্পর্ক রহিত অথবা সংসারের বীজরূপ সংস্কার সকলের উন্মূলক।

সমালোচনা। অসম্প্রজ্ঞাত শব্দে যে অবস্থায় কিছু জানা যায় না অর্থাৎ যখন জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভাব কিছুই থাকে না, চিত্ত আপনার বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ধারণ করিয়া নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় সম্পূর্ণ স্থিরভাব ধারণ করে; চিত্তের এই রূপ অবস্থার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সূত্রকার কৌশলক্রমে ঐ অসম্প্রজ্ঞাতের উপায় এবং স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন। এইসূত্রে তিনটি বিশেষণপদ আছে। (১) বিরাম প্রত্যয়াভ্যাস পূর্ব্ব, (২) সংস্কারশেষ, এবং (৩) অন্য; উহার মধ্যে 'অন্য' এই পদের দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাতের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; 'অন্য' কি না পূর্ব্বোক্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। 'বিরাম

প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্ব' এই বিশেষণ দ্বারা তাহার উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিরাম বলিতে সমুদয় বৃত্তির অভাব; প্রত্যয় বলিতে কারণ; সমুদয় বৃত্তির অভাবের কারণ একমাত্র পরবৈরাগ্য, ঐ পরবৈরাগ্যের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন যাহার পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই বিরাম প্রত্যয়াভাস পূর্ব্ব। 'সংস্কারশেষ' ইহাদ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সংস্কারশেষ এই পদের দুই প্রকার অর্থ করা হয়। কেহ কেহ বলেন, জন্মমরণ প্রবাহরূপ সংসারের বীজ স্বরূপ যে সকল সংস্কার তাহার শেষ অর্থাৎ অবসান যে অবস্থায় হয়, তাহার নাম সংস্কারশেষ। কেহ কেহ সংস্কারশেষের অর্থ করিয়াছেন বুদ্ধি অহঙ্কারাদির অব্যক্তভাবে অবস্থান। তাঁহারা বলেন, ঐ অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয় বটে, কিন্তু অহঙ্কারাদি তখনও প্রবল সত্ত্বদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, কারণ যোগ ভঙ্গের পর আবার তাহাদের কার্য্য লক্ষিত হয়। ভাষ্যকার এই সূত্রের এইরূপ তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"সালম্বনোহ্যভ্যাসস্তৎসাধনায় ন কল্পতে—ইতি বিরামপ্রত্যয়ো নির্ব্বস্তুক আলম্বনীক্রিয়তে সচার্থশূন্যঃ—তদভ্যাসপূর্ব্বকং হি চিত্তং নিরালম্বনমভাব প্রাপ্তমিব ভবতীইত্যেষনির্ব্বীজ সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতঃ।" স্থূল হইতে আত্মস্বরূপ অবধি যে কোন ধ্যেয়বস্তুকে আশ্রয় করিয়া যে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করা হয়, সেই সালম্বন একাগ্রতার অভ্যাস অসম্প্রজ্ঞাতের সাক্ষাৎ সাধক হইতে পারে না, কারণ কোনরূপ আলম্বন যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ উহা সম্প্রজ্ঞাত হইবে। এই জন্য আত্মসাক্ষাৎকারেও পরাঙ্মুখকারী সম্পূর্ণ বৃত্তিশূন্য পরবৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রবৃত্ত হয় ইহা নির্ব্বস্তুক অর্থাৎ ইহা কোনরূপ স্থূল বা সূক্ষ্ম ধ্যেয়বস্তুকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত, হয় না, অতএব ইহা অর্থশূন্য, এই অবস্থায় চিত্ত যেন মৃতের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, এইরূপ নির্ব্বীজ সমাধির নাম অসম্প্রজ্ঞাত। ভোজবৃত্তিকার সংস্কারশেষের এইরূপ তাৎপর্য্য দেখাইয়াছেন—"আমরা চিত্তের চার প্রকার পরিণাম দেখিতে পাই—(১) ব্যুত্থান—যোগভিন্নাবস্থা, (২) সমাধিপ্রারম্ভ, (৩) একাগ্রতা এবং (৪) নিরোধ। যখন চিত্ত ক্ষিপ্ত চঞ্চল অথবা অতিশয় বিমূঢ় আনন্দের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহার ব্যুত্থান অবস্থা, যখন সত্ত্বগুণের উদ্রেকে চিত্তের একটু স্থিরতা সাধিত হয়, তখন উহা সমাধির প্রারম্ভ (আদিম) অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তাহার পর কোন এক ধ্যেয় বস্তু অবলম্বন করিয়া চিত্তের স্থির হইয়া থাকার নাম একাগ্রতা এবং চিত্তের সম্পূর্ণ বৃত্তিশূন্য অবস্থার নাম নিরোধ। চিত্তের

এই সকল পরিণামই সংস্কার। উহাদের মধ্যে ব্যুত্থান জন্য সংস্কার সমাধি প্রারম্ভ জন্য সংস্কারদ্বারা বিনষ্ট হয়, সমাধি প্রারম্ভ জন্য একাগ্রতা জন্য সংস্কারদ্বারা বিনষ্ট হয়; এইরূপ নিরোধ জন্য সংস্কার দ্বারা একাগ্রতা জন্য সংস্কারের নাশ হয় এবং পরে নিরোধ জন্য সংস্কার স্বয়ং বিনষ্ট হয়।

যেমন সুবর্ণ মিশ্রিত সীসক আপনাকে এবং সুবর্ণের মলকে একেবারে দহন করে, সেইরূপ নিরোধ জন্য সংস্কার সংস্কার এবং আপনাকে অন্তর্হিত করে। এই নিমিত্ত অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিকে নির্ব্বীজ সমাধি বলে। মণিপ্রভা নামক বৃত্তিকার বলেন যে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি সংপ্রজ্ঞাত সমাধি জন্য সংস্কারকেও অন্তর্হিত করিয়া রাখে। ইহা নির্ব্বীজ সমাধি, কেননা ইহাতে কোন ধ্যেয় বস্তু থাকে না এবং ইহাতে কর্ম্মের বীজের অভাব থাকে অর্থাৎ এ সময় এমন কোন প্রকার সংস্কার থাকে না যাহা হইতে পরে কোন নূতন শুভাশুভ কর্ম্মের উৎপত্তি হইতে পারে। বাচস্পতি মিশ্র বলেন 'বীজ' শব্দে ক্লেশ কর্ম্মাশয়, উহারা বিদ্যমান না থাকায় উহাকে নির্ব্বীজ বলা যায়। ভাষ্যকার বলেন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দুই প্রকার (১) উপায় প্রত্যয় এবং (২) ভব প্রত্যয়; ইহাদের মধ্যে উপায়-প্রত্যয় সমাধি যোগীদিগেরই হয়। প্রকৃত মুমুক্ষু ব্যক্তিই উপায় প্রত্যয় সমাধির অধিকারী। ভব প্রত্যয় সমাধির অধিকারী দেবগণ এবং প্রকৃতি লীন ব্যক্তিগণ। কিন্তু সূত্রকার প্রথমে উপায় প্রত্যয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন উপায় প্রত্যয়ের বিষয় অনেক বক্তব্য এবং ভব প্রত্যয়ের বিষয় অল্প বক্তব্য, এই জন্য সূচীকটাহ ন্যায়ে * ভব প্রত্যয়ের কথা আগে বলা হইয়াছে নতুবা প্রথমে উপায় প্রত্যয় বলিয়া পরে ভব প্রত্যয় বলা উচিত ছিল।

ভব প্রত্যয়ো বিদেহ প্রকৃতি লয়ানাম্॥ ১৯

পদচ্ছেদঃ। ভব প্রত্যয়ঃ বিদেহ প্রকৃতি লয়ানাম্।

পদার্থঃ। ভবন্তি জায়ন্তে জন্তবোঽস্মিন্নিতি ভবো বিদ্যা সংসারো বা প্রত্যয়ঃ কারণং যস্য (নিরোধ সমাধিঃ, সঃ তাদৃশঃ নিরোধসমাধিঃ, বিদেহা দেবাঃ যেষাং চেতসি স্ব কারণে লীনে পরম পরিতোষো ভবতি ন পরমাত্ম

---

* যদি কোন কর্ম্মকারকে প্রথমে এক ব্যক্তি একখানি কড়া গড়িতে বলে, তাহার পর কেহ সূচ গড়িতে বলে, তাহলে কর্ম্মকার অগ্রে সূচ গড়িয়া পরে কড়ায় হাত দেয়।

দিদৃক্ষা বৰ্ত্ততে তে প্রকৃতি লয়াঃ বিদেহাশ্চ প্রকৃতিলযাশ্চ তে তেষাং বিদেহ-প্রকৃতি লযানাম্।

অন্বযঃ। বিদেহ প্রকৃতি লযানাং ভব প্রত্যযো নিবোধ সমাধির্ভবতী তি শেষঃ।

অনুবাদ। যাহাবা বিদেহ অর্থাৎ ষাট্‌কৌষিক দেহ বহিত অতএব দেব ভাবাপন্ন এবং যাঁহাবা প্রকৃতিতে লীন, তাঁহাদের অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিব প্রতি অবিদ্যা বা সংসাবই কাবণ।

সমালোচনা। ইহা সকলেই জানেন যে জ্ঞান, শিক্ষা এবং স্বভাব অনুসাবে মনুষ্য সকল নানা প্রকাব এবং এক এক মনুষ্যেব কচিও এক এক প্রকাব স্নতবাং যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তদিগেব মধ্যে যে ফলেব তাবতম্য হইবে, তদ্বিষয বিচিত্র কি? যদিও চিত্ত বৃত্তিব সম্পূর্ণ নিবোধ জন্য স্থিবানন্দ ভোগ কবাই সমুদয যোগাভ্যাসকাবীদিগেব মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু শিক্ষা জ্ঞান, এবং কচি অনুসাবে তাদৃশ নিবোধেব উপায় এক এক মনুষ্যেব চক্ষে এক এক রূপ। আবাব উপায ভেদে মঙ্গলেব তাবতম্য হয ইহা অবশ্যই স্বীকায্য।

ইহা পূৰ্ব্বে বলা হইযাছে আত্ম স্বরূপ দর্শন কবিযা একাগ্রতাব অভ্যাস বশে চিত্তকে বৃত্তি শূন্য কবাব নামই নিবোধ। এই আত্মস্বরূপ লোকেব শিক্ষাদি অনুসাবে বিভিন্ন, কেহ বা স্থূল পঞ্চভৌতিক দেহকেই আত্মা বলিযা জানে, কেহ বা ইন্দ্রিযদিগকে আত্মা বলিযা জানে, কেহ বা অবিদ্যা বা প্রকৃতিকে আত্মা বলিযা জানে। আমবা পূৰ্ব্বে বলিযাছি চিত্তের একাগ্রতা সাধনেব নিমিত্ত স্থূল ভূত হইতে পরমাত্মা অবধি ক্রমে ক্রমে আলম্বন কবিতে হয। উহাদেব মধ্যে আত্মাই চবম আলম্বনীয়, কিন্তু যাহাদেব ইন্দ্রিয়েতে আত্মজ্ঞান আছে, তাহারা ইন্দ্রিযকে আলম্বন কবিযা আত্মাকে আলম্বন কবিয়াছি এইরূপ ভ্রমে তাহাতেই সন্তুষ্ট হয এবং ঐ স্থান হইতে নিবোধ লাভ কবিতে থাকে। ঐ সকল যোগীগণ তাদৃশ নিবোধ অবস্থায শবীব বিনষ্ট হইলে, ইন্দ্রিয়েতে বিলীন হইযা ষাট্‌কৌষিক দেহ শূন্য হয, এইরূপ দেহ শূন্য হয বলিযা তাহাদি কে বিদেহ বলে। ঐরূপ দেহ শূন্য জীবগণই দেব বলিয়া প্রসিদ্ধ।

[illegible] যোগীরা প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কাব এবং পঞ্চ তন্মাত্র—ইহাদেব মধ্যে [illegible] আত্মা বলিযা তাহাকেই চবম আলম্বন কবিয়া একাগ্রতাভ্যাস [illegible] নিবোধ প্রাপ্ত হয, তাহাবা ঐ নিবোধ অবস্থায শবীব বিনষ্ট হইলে প্রকৃতিতে লীন হয। এই নিমিত্ত উহাদিগকে প্রকৃতি লয বলে।

ইহাদিগের নিরোধ সমাধির প্রতি অবিদ্যা অর্থাৎ যাহা প্রকৃত আত্মা নয় তাহাকে আত্মা বলিয়া জ্ঞানই—কারণ। কেহ কেহ বলেন ঐরূপ দেব ভাব প্রাপ্তি বা প্রকৃতিতে লীন হওয়াই তাহাদের নিরোধ সমাধির প্রতি কারণ, কেননা তাহাদের ঐরূপ অবস্থাই সমাধির অবস্থা।

ভাষ্যকার বলেন এরূপ নিরোধ প্রাপ্তি শ্রেষ্ঠ নহে, কারণ বর্ষাকালের অপগম হইলে মণ্ডূক যেমন মৃত্তিকাকারে পরিণত হইয়া থাকে এবং পুনর্ব্বার নূতন মেঘ হইতে জলসেক প্রাপ্ত হইয়া আবার মণ্ডূকাকৃতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদেহ বা প্রকৃতি লয় যোগীগণ কিছুকাল ঐ বিদেহ এবং প্রকৃতি লয় অবস্থায় থাকিয়া পুনর্ব্বার আবার সংসারে অবতীর্ণ হয়। বায়ুপুরাণে বলা হইয়াছে—

দশমন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্ত্যিন্দ্রিয় চিন্তকাঃ।
ভৌতিকাশ্চ শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ॥
বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।
পূর্ণং শত সহস্রংতুতিষ্ঠন্ত্যব্যক্ত চিন্তকাঃ॥
নির্গুণং পুরুষং প্রাপ্য কাল সংখ্যা ন বিদ্যতে।

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়কে আলম্বন করিয়া নিরোধ সমাধি প্রাপ্ত হয়, তাহাদের ঐ সমাধি দশ মন্বন্তর অবধি থাকিয়া ভঙ্গ প্রাপ্ত হয়, ভূত চিন্তাকারীরা পূর্ণ এক শত মন্বন্তর নিরোধ অবস্থায় অবস্থান করে, এবং অহঙ্কার চিন্তকেরা সহস্র মন্বন্তর অবধি নিরোধ অবস্থায় অবস্থিত হয়, বুদ্ধির চিন্তাকারীরা দশ সহস্র বৎসর নিরোধ অবস্থায় অবস্থান করে, আর প্রকৃতি চিন্তকেরা শত সহস্র বৎসর, কিন্তু যে ব্যক্তি নির্গুণ পুরুষকে অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা বশ নিরোধ প্রাপ্ত হয়, তাহার সে সমাধি অনন্তকালেও ভঙ্গ প্রাপ্ত হয় না। অতএব যে সকল যোগী প্রকৃত মুক্তি লাভ করিতে উৎসুক, তাহারা সেই নির্গুণ পুরুষকে অবলম্বন করিয়া একাগ্রতা অভ্যাস দ্বারা নিরোধ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের নিরোধ প্রাপ্তির উপায় পরে বলা হইতেছে।

শ্রদ্ধাবীর্য্য স্মৃতি সমাধি প্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্॥ ২০॥

পদচ্ছেদ।—শ্রদ্ধা-বীর্য্য স্মৃতি-প্রজ্ঞা-পূর্ব্বক ইতরেষাম্।

পদার্থ—শ্রদ্ধা চেতসঃ সম্প্রসাদঃ, বীর্যং উৎসাহঃ, স্মৃতিঃ ধ্যানং, সমাধিঃ একাগ্রতা, প্রজ্ঞা প্রজ্ঞাতব্য বিবেকঃ, এতে শ্রদ্ধাদয়ঃ পূর্ব উপায়া যস্য স শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বকঃ ইতরেষাম্ মুমুক্ষুণাং যোগিনাম্।

অন্বয়ঃ। ইতরেষাং সমাধিঃ শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতি সমাধি প্রজ্ঞাপূর্ব্বকোভবতীতি অন্বয়ঃ।

অনুবাদ। ইতর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিদেহ এবং প্রকৃতি লয় ভিন্ন মুমুক্ষু যোগীদিগের অসম্প্রজ্ঞাত যোগ—শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা এই কয় উপায় দ্বারা সাধিত হয়।

সমালোচনা। পূর্ব্বসূত্রে যে দুই প্রকার যোগের কথা বলা হইল, ঐ দুই যোগ মুক্তির উপায় নয়, কারণ তাহার মূলভিত্তি ভ্রমের উপর স্থাপিত সুতরাং ঐ ভ্রম আজ হউক, কাল হউক, বা শত সহস্র যুগ পরে হউক, এক সময় অবশ্যই নাশ প্রাপ্ত হইবে, ভিত্তিরূপ ভ্রম অপগত হইলে যোগও ভঙ্গ হইবে। যোগভঙ্গ হইলে ব্যুত্থান অবস্থা, আবার বৃত্তির প্রাদুর্ভাব, আবার সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন। তবে এ স্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যাহারা ঐরূপ যোগ ভ্রষ্ট হইয়া সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহারা অন্যান্য সংসারী অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়া আসে এবং অল্প আয়াসেই আবার তাহারা প্রকৃত মোক্ষপথের পথিক হইতে পারে। ফল প্রকৃত মোক্ষলাভই জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য, সে উদ্দেশ্য সফল হইবার উপায় এই সূত্রে বিবৃত হইয়াছে।

এই সূত্রটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শ্রদ্ধা, বীর্য্য প্রভৃতি শব্দ কয়েকটীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। 'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থ বেদব্যাস বলিয়াছেন, চিত্তের সম্যক্ প্রসন্নতা, বাচস্পতি মিশ্র, ইহার ব্যাখ্যাস্থলে বলেন, "অভিরুচিমতী ইচ্ছার" নামই শ্রদ্ধা, অভিরুচি বলিতে ঔজ্জ্বল্য অর্থাৎ সত্ত্বগুণের সম্যক্ প্রাবল্য জন্য দীপ্তি, তাদৃশ দীপ্তিমতী ইচ্ছা অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান অভিলাষের নামই শ্রদ্ধা।

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ—প্রীতি। আমার যোগলাভ হউক, এই অভিলাষ। ভোজরাজ বলেন, যোগ বিষয়ে চিত্তের অত্যাসক্তির নামই শ্রদ্ধা, ইংরাজী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে এক কথায় বুঝাইতে হইলে শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ ফেথ্ বলিলেই যথেষ্ট হয়। এই শ্রদ্ধা শাস্ত্রাধ্যয়ন, পার্থিবতত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ জন্য অনুমান এবং গুরুর উপদেশ হইতে উৎপন্ন হয়। এই শ্রদ্ধা কল্যাণকরী এবং শ্রদ্ধাকারীকে মাতার মত সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করে, একবার যোগের উপর শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় আসক্তি হইলে, যোগই আমার সর্ব্বপ্রকারে শ্রেয়স্কর অতএব যেমন করে হউক, যোগসাধন করিব এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সহস্র বাধাবিঘ্নও আর যোগীকে যোগসাধন হইতে বিচলিত করিতে পারে না। কারণ

শ্রদ্ধা হইতেই বীর্য্য উৎপন্ন হয়। বীর্য্য শব্দের অর্থ উৎসাহ অর্থাৎ অভীপ্সিত বিষয় লাভের নিমিত্ত প্রযত্ন। কোন বিষয়ে শ্রদ্ধা হইলে তাহার সাধনের নিমিত্ত মনের যে উৎকট বা দুর্দ্দম্য ঔৎসুক্য হয়, তাহার নামই বীর্য্য, বীর্য্য শব্দের প্রচলিত অর্থ—শক্তি; সুতরাং শ্রদ্ধা হইলে শ্রদ্ধেয় বস্তুর সাধন নিমিত্ত আমাদের হৃদয়ে শক্তি বিশেষের সঞ্চার হয়, এরূপ ব্যাখ্যাও নিতান্ত অসঙ্গত নয়। মনে উক্তরূপ বীর্য্য উৎপন্ন হইলে যোগীদিগের স্মৃতি উৎপন্ন হয়; বাচস্পতি মিশ্র এবং বিজ্ঞানভিক্ষু উভয়েই স্মৃতিশব্দের অর্থ ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা করিয়াছেন; ভোজরাজ প্রভৃতি বলেন, স্মৃতি শব্দের অর্থ—স্মরণ অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূতের চিন্তা; আমরা বলি বাচস্পতি ও বিজ্ঞান-ভিক্ষু-প্রদর্শিত অর্থই ভাল, কেন না কোন এক বিষয়ের সাধন জন্য আমাদের চিত্ত প্রোৎসাহিত হইলে আমাদের তদ্বিষয় চিন্তা হওয়াই স্বাভাবিক, স্মরণও এক প্রকার চিন্তা বটে, কিন্তু উহা পূর্ব্বানুভব-সাপেক্ষ, চিন্তায় পূর্ব্বানুভব অপেক্ষা করে না। স্মৃতির পর চিত্ত অনাকুল অর্থাৎ স্থির হইয়া সমাধিতে নিযুক্ত হয়, সমাধি শব্দের অর্থচিত্তের একাগ্রতা, অর্থাৎ অন্য সকল বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র ধ্যেয়বস্তুতে সর্ব্ব-প্রকারে চিত্ত সমর্পণ করাকে সমাধি বলে, এই সমাধি হইতে প্রজ্ঞা অর্থাৎ বিবেক কি না, ধ্যেয়বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান হয়। এই বিবেকের বারম্বার অনুশীলন দ্বারা পরে উহাতেও বিরক্ত হইয়া যোগী নিরালম্ব ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হয়, এই নিরালম্ব ধ্যানের নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

পাঠক বোধ হয় এই সূত্রের ব্যাখ্যায়ও জানিতে পারিলেন, যোগী হওয়া কিছু সহজ নয়, ইচ্ছা করিলেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যোগী হওয়া যায় না। যোগ ভেল্কি দেখাইবার জন্য নয়; মনুষ্যের চরম এবং সমুন্নত উদ্দেশ্য মুক্তিলাভই ইহার ফল। যে যোগ নানাবিধ আশ্চর্য্য প্রদর্শন করাইবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রকৃত যোগ নয়, এক প্রকার জিম্‌নাষ্টিকের কসরত মাত্র; তাহার সাধনের নিমিত্ত শ্রদ্ধাদির কিছু আবশ্যকতা নাই বটে, কিন্তু যাহা প্রকৃত যোগ, যাহা মোক্ষলাভের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সাধনের নিমিত্ত শ্রদ্ধাদি ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, "তুমি যে যোগাভ্যাসের উপায় বলিলে ইহাও সকলের পক্ষে সমান, শ্রদ্ধা প্রভৃতি ত সকলেরই সমান অতএব যোগসিদ্ধিও সকলের এক নিয়মে হওয়া উচিত, কিন্তু কার্য্যেতে আমরা তাহা দেখিতে পাই না, আমরা দেখি কেহ যাবজ্জীবন যোগের অনুশীলন করিল, অথচ সিদ্ধিলাভ

হইল না, কাহারও অনেক বিলম্বে সিদ্ধি হইল, কাহারও বা "অপেক্ষাকৃত অল্প বিলম্বে সিদ্ধি হইল, আর কাহারও অতি শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হইল। এইরূপ বৈষম্যের কারণ কি?" ইহার উত্তরে মহর্ষি বেদব্যাস যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত যোগীদিগের নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। যথা—

তে খলু নব যোগিনো মৃদুমধ্যাধিমাত্রোপায়া ভবন্তি। তদ্ যথা—মৃদুপায়ো, মধ্যোপায়ো, ধিমাত্রো পায় ইতি। তত্র মৃদুপায়োঽপি ত্রিবিধ — মৃদুসংবেগো মধ্যসংবেগস্তীব্র সংবেগ ইতি। তথা মধ্যোপায়, স্তথাধিমাত্রোপায় ইতি।

সিদ্ধি বিষয়ে এইরূপ বৈলক্ষণ্য হইবার কারণ এই যে প্রতি মনুষ্যের সংস্কার এবং অদৃষ্ট ভিন্ন ভিন্ন, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই অদৃষ্ট এবং সংস্কার প্রভাবে মনুষ্যের যাবৎ কার্য্যই ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। এক বিদ্যালয়ে, এক সময়ে, এক গুরুর নিকট, এক শ্রেণীতে, একইরূপ এক শত বালক এক রীতি শিক্ষা পাইতেছে, কিন্তু ফল কি হইতেছে? কেহ বা গুরুর মুখ হইতে নির্গত হইতে না হইতে অর্থ সকল হৃদয়ঙ্গম করিতেছে, কেহ বা নিজে উহা আর একবার দেখিয়াই উহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে আর কেহ বা গৃহে আসিয়া তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন অপর এক জন গুরু কর্তৃক ঐ পাঠই ঘণ্টাদ্বয় নিয়ত উদ্ঘাটিত করিয়াও তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া অধীতকে অনধীতের সমান করিতেছে। ইহাত প্রাত্যহিক দৃশ্য। যে কারণে অধ্যয়নে এইরূপ বৈষম্য লক্ষিত হয়, সেই কারণেই যে অধিকারী ভেদে শ্রদ্ধাদি উপায়ের বৈষম্য ঘটিবে, তদ্বিষয় কোন সন্দেহই নাই। সেই শ্রদ্ধাদির বৈষম্য হেতুই তোমার আশঙ্কিত ফলেও বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। শ্রদ্ধাদি উপায়ের বৈষম্য নিবন্ধন আমরা যোগীদিগকে প্রথমত, তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি (১) মৃদু উপায়, (২) মধ্য উপায়, (৩) অধিমাত্র উপায়। উপায় বলিতে পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধা, স্মৃতি প্রভৃতি; মৃদু শব্দের অর্থ ম্যাদ্‌মেদে (অল্প); ঐ শ্রদ্ধাদি যাহার মৃদু [অল্প বা ম্যাদ্‌মেদে] সেইরূপ যোগীকে মৃদুপায় বলে, ঐ শ্রদ্ধাদি যাহার মধ্যম রাশির তাহাকে মধ্যোপায় বলে, এবং ঐ শ্রদ্ধাদি যাহার অধিমাত্র অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহাকে অধিমাত্রোপায় বলে। উপরি উক্ত তিন প্রকার যোগীর মধ্যে প্রত্যেকেই, মৃদু সংবেগ, মধ্য সংবেগ এবং তীব্র সংবেগ এই তিন প্রকার। সংবেগ শব্দের অর্থ বাচস্পতি মিশ্রের মতে বৈরাগ্য, তিনি বলেন অদৃষ্ট এবং সংস্কারবশে বৈরা

গেরও মৃদুত্ব, মধ্যত্ব এবং তীব্রত্ব হইয়া থাকে। বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন সংবেগ **শব্দের অর্থ সম্যক বেগ অর্থাৎ** উপায়ের **অনুষ্ঠান** বিষয়ে শীঘ্রতা। আমাদের বোধ **হয় পূর্ব্বোক্ত অর্থ** অপেক্ষা এই অর্থটি এখানে বিশেষ সঙ্গত। কারণ বৈরাগ্য **শ্রদ্ধাদি উপায়ের কার্য্য**; উপায়ের মৃদুত্বাদির সঙ্গেই বৈরাগ্যের মৃদুত্বাদি **আপনা হইতেই হইবে, বিশেষত** সংবেগ শব্দে বৈরাগ্য—কোন অভিধান সম্মত অর্থ নয়। উপায়ের **অনুষ্ঠান** বিষয়ে শীঘ্রতা কাহারও বা অল্প পরিমাণে কাহারও বা মধ্য পরিমাণে এবং কাহারও বা অধিক পরিমাণে হইলেও অদৃষ্ট এবং সংস্কার বশে কাহার উপায় মৃদু অর্থাৎ অল্প পরিমাণে হয়, কাহার মধ্য পরিমাণে এবং কাহারও বা অধিক পরিমাণে হয়। এই জন্য মোটের উপর যোগীদিগের নয়টি ভেদ কল্পিত হইয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ করে ধরিলে অনেক ভেদ হইতে পারে।

যাহাদের একেবারেই সিদ্ধি হয় না, অথবা যাহাদের বিলম্বে সিদ্ধি হয়, তাহাদের বিষয় বলা, না বলা সমান, কারণ তাহাতে লোকের প্রবৃত্তি আকৃষ্ট হইবে না, উদ্দেশ্য সিদ্ধির শীঘ্রতার দিকেই সকলে উৎসুক। এই নিমিত্ত সূত্রে যে সকল যোগীর শীঘ্র ফললাভ হয়, তাহাদের বিষয়ই বলিতেছেন,—

অধিমাত্রোপায়ানাং তীব্রসংযোগানা মাসন্নঃ॥ ২১।

পদচ্ছেদঃ—অধিমাত্র-উপায়ানাং তীব্র-সংযোগানাং, আসন্নঃ।

পদার্থঃ—অধিমাত্রঃ অতিশয়ঃ অধিকপরিমাণ ইতি যাবৎ, উপায়ঃ শ্রদ্ধাদয়ঃ অধিমাত্র উপায়োযেষাং তে তেষাং, তীব্র অতিশয়ঃ, সংবেগঃ বৈরাগ্যং উপায়ানুষ্ঠানে শীঘ্রতা বা, তীব্রঃ সংবেগো যেষাং তে তেষাং আসন্নঃ সন্নিহিত অনায়াসগম্য ইতি যাবৎ।

অন্বয়ঃ। অধিমাত্রোপায়ানাং তীব্রসংবেগানাং যোগিনাং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি রাসন্ন ইতিশেষঃ।

অনুবাদ। অধিমাত্রোপায় যোগীদিগের মধ্যে আবার যাহাদের সংবেগ-বৈরাগ্য বা উপায়ানুষ্ঠান তীব্র (অতিশয় প্রবল), তাহাদেরই শীঘ্র অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হয়।

সমালোচন। এ সূত্রে আমরা অধিক কিছু বক্তব্য দেখিতেছি না, কারণ সূত্রের অনুবাদ হইতেই সূত্রের মর্ম্মার্থ পাঠকদিগের সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

সুন্দরী স্ত্রী।

সুন্দরী স্ত্রী জগতের সার পদার্থ। লাবণ্যময়ী ললনা যে কি অমূল্য রত্ন তাহা বোধ হয় সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীকৃত হয় নাই। রমণীর সৌন্দর্য্য যে কি অপূর্ব্ব পদার্থে গঠিত, ললিত লাবণ্য যে কি সুকুমার কোমলতার পরিণামে গঠিত, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীর অঙ্গবিন্যাসের মধুরতা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোন পরমাণু সমষ্টিতে নিষ্পন্ন, এবং বিধুমুখের মধুর হাসি বিধাতার কি অপরিসীম নির্ম্মাণ কৌশল, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ, রসজ্ঞ কেহই বলিতে পারেন না। সুন্দরী রমণী মূর্ত্তি যে কি তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হয়েন নাই, এবং কিরূপ বিচারেই বা তাহার সন্তোষজনক ভ্রমশূন্য মীমাংসা লাভ হইবে, সে উপায়ও কেহই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কবি-কল্পনা-প্রসূত, জগতের অদ্বিতীয় প্রেম-প্রতিমা, সৌন্দর্য্যের রত্নখনি স্বরূপ শ্রীমতী রাধিকা যে ব্রহ্মাণ্ডের রমণী-সৌন্দর্য্যের রত্ন সিংহাসনের রাজরাজেশ্বরী, তাহা কে স্থির করিয়া বলিবে? জনক দুহিতা আদর্শ সতী বাল্মীকি-নির্দ্দিষ্টা নিরুপমা চতুর্দ্দশ বর্ষা সীতা দেবী, স্বয়ম্বর সভায় মৃদুমন্দ পবন সঞ্চালিত মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী, যখন রামগলে বরমালা সমর্পণ করিলেন, তখন তিনিই চিরদিনের জন্য যে সর্ব্বজন-সম্মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বলিয়া বিঘোষিতা হইয়া রহিলেন, এ কথা কে স্থির করিয়া বলিবে? মহাভারতের দ্রৌপদী, শেক্সপিয়ারের ক্লিওপেট্রা, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাবতী, বঙ্কিম বাবুর কপালকুণ্ডলা—ইঁহারা যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ছিলেন, এবং সে সৌন্দর্য্য যে বিচারে সর্ব্ববাদিসম্মত, এ কথা কে স্থির করিয়া বলিবে?

রমণী-সৌন্দর্য্যের নিরপেক্ষ বিচারক কি মানব-চক্ষু? মনুষ্য—কি পুরুষ কি স্ত্রী—সকলেরই চক্ষু একই পদার্থে গঠিত, ইহা দেহতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিকেরা ভূয়োভূয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বকথিত কয়টি ললনাকে কেহই চক্ষে দেখে নাই, কবির বর্ণনায় তাঁহাদের অতুল রূপরাশি এবং নিরুপম সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণতা লোকে অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে অনুমান করিতে পারে এই মাত্র। দৈবযোগে সেই কবি-বর্ণিত রূপলাবণ্যময়ী ললনাগণ যদি মানবী হইয়া [illegible] অবয়বে এই বঙ্গদেশে লোকের দ্বারে দ্বারে স্বমুখে

আপনাদের পরিচয় প্রদান করিয়া কবির রূপবর্ণনা সত্য কি অলীক এই বিচারের প্রার্থিনী হয়েন, তাহা হইলে সে বিচার নিষ্পন্ন হইতে পারে কি?

প্রত্যুত্তর, সন্দেহের স্থল। প্রথমত আমাদের রূপগর্ব্বিতা বঙ্গমহিলাগণ, আপন আপন অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্যের সহিত তুলনা করিয়া, কেহই সেই কবি প্রসূত স্বর্গীয় লাবণ্যবতীগণকে আপনা হইতে উচ্চাসন প্রদান করিতে প্রাণান্তেও স্বীকার করিবেন না। আমাদের টাক মস্তক-মণী মস্তকের চক্রাকার তরুণচন্দ্র সম টাকের শোভার এতাদৃশ পক্ষপাতিনী যে, তিনি নিশ্চয়ই সহস্র মুখে দ্রৌপদীর সীমন্ত-শোভিত আগুল্‌ফ-লম্বিত নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশির বিজাতীয় নিন্দা করিয়া আনন্দ উপভোগ করিবেন। স্বরূপ-পক্ষপাতিনী বঙ্গ-কোটরাক্ষি, কুরঙ্গনয়না ক্লিওপেট্রার আকর্ণপূরিত পটলচেরা নীল গভীর উজ্জ্বলতম নয়নের তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাতের নিন্দা নিশ্চয়ই করিবেন। আমাদের দন্তুরা সৌভাগ্যবতী, যিনি বিরলে দর্পণে আপনার হাস্যমুখের নিরতিশয় শোভা সন্দর্শন চিরদিনই এতাদৃশ বিমোহিত হইয়া রহিয়াছেন এবং তাহার মূল্য এত বুঝিয়াছেন যে, সে অমৃতময় হাস্য দান কদাচিত অন্যের পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন, তিনি ভারত-বর্ণিত বর্দ্ধমান-রাজ দুহিতা বিদ্যার ঈষদ্বিকশিত সুরঞ্জিত অধরোষ্ঠ-মধ্যস্থিত কুন্দ-বিনিন্দিত দন্তপাতির নিন্দা নিশ্চয়ই করিবেন, এবং সেই মধুর হাস্য উদ্ভাসিত ক্ষণিক বক্রাভাবিশিষ্ট স্থল-কমল-সদৃশ নিটোল কপোলে নিশ্চয়ই সজোরে চপেটাঘাত করিবেন। এইরূপে কার্পাস বস্তা সম স্থূলাঙ্গী,—কন্দর্পের যষ্টি সদৃশ ছিপ্‌ছিপে শরীরাঙ্গার, গতি শক্তি-বিহীনা কিম্বা দম্ভভরে পদ শব্দকারিণী—করিগামিনীর মৃদুমন্দ মন্থর গমনের, এবং উচ্চভাষিণী,—কোকিল কলকণ্ঠবিনিন্দিত সুমধুর সঙ্গীতময় সুস্বরের নিন্দা প্রাণ ভরিয়া করিবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব এতদ্দ্বারা প্রতি-পন্ন হইতেছে যে, রমণীর চক্ষু রমণী রূপের বিচারক নহে।

দ্বিতীয় বারে, পুরুষের চক্ষুকে সেই বিচারকের স্থলাভিষিক্ত করিয়া দেখা যাক, সে পবিত্র চক্ষু রমণীসৌন্দর্য্যের যথাযথ বিচার করিতে পারে কি না। দেখা যাইতেছে যে, দেশভেদে রমণীসৌন্দর্য্য সম্বন্ধে পুরুষের চক্ষের বিচার বিভিন্ন প্রকার। বঙ্গীয় যুবক, শারদীয় অখণ্ডমণ্ডল গোলাকৃত পূর্ণশশী সদৃশ রমণী মুখমণ্ডলের পক্ষপাতী, নারীতে নবীন নীরদ মালাবৎ আগুল্‌ফ-লম্বিত ঘন কেশরাশির অভিলাষী, সেই কেশ আবার বিচিত্র বেণী বন্ধনে উজ্জ্বল সুবর্ণ বিমণ্ডিত করিয়া নীলাম্ভোদ ক্রোড়ে বিজলীর ক্রীড়া দেখিতে

ভাল বাসেন, তুগ্ধে অলক্ত গুলিয়া রমণীর সর্ব্বাঙ্গে ঢালিতে একান্ত লালায়িত এবং কজ্জল পূরিত ঈষদ্-ভাসিত চঞ্চল নয়নের কন্দর্প-দর্পহারী বাণ সন্ধানে অভিভূত হন। কিন্তু বঙ্গীয় যুবকের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরীর এত সাধের সৌন্দর্য্য ইয়ুরোপীয় যুবকের নয়নে নিতান্ত অপ্রীতিকর। লম্বাকৃত মুখ, রাজহংস সদৃশ উচ্চগ্রীবা, তুষার ধবল বর্ণ, আপৃষ্ঠলম্বিত মাত্র তাম্রবর্ণ আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশ, অণুমাত্র লজ্জাবিহীন স্থির কটমটে নয়ন, বর্ণবিহীন অধরোষ্ঠ, শীর্ণ দেহ, দীর্ঘাকৃতি, চঞ্চলগামিনীকে তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বলিয়া থাকেন। চীন, আরাকান এবং মণিপুরীয়গণ রমণীর মুখমণ্ডলে তুলি দিয়া আঁকা কৃষ্ণ ভ্রূ যুগল দেখিলে মূর্চ্ছিত হয়েন, খাঁদা নাকের সৌন্দর্য্য তাহারাই বুঝিয়াছেন, রমণীর মুখে তাঁহারা উন্নত কিছুই দেখিতে ভাল বাসেন না, কোন রমণীর নাক, চোক, ঠোঁট, কান, মুখে মিশাইয়া থাকিলেই ইহাঁরা তাঁহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বলিয়া সেই স্ত্রীর পূজা করেন। এদিকে আফ্রিকার রমণীর বং যতই ঘন কৃষ্ণবর্ণ হইবে ততই তিনি পুরুষের চক্ষে সুন্দরী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন, অধর ওষ্ঠ যতই স্থূল হইবে, ততই তিনি সুন্দরী বলিয়া পূজিত হইবেন, দেহ যতই কোমলতা শূন্য এবং বলিষ্ঠ হইবে, গাত্র চর্ম্ম যতই কর্কশ হইবে, তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা দেশময় ততই বিঘোষিত হইতে থাকিবে। এইরূপে কোন জাতি রমণীর কটিদেশ অনায়াসে ভাঙ্গিতে ইচ্ছা করেন, কোন জাতি স্থূল শ্রেণীর একান্ত পক্ষপাতী। কেহ কামিনীতে তীব্রতেজ দেখিতে ভাল বাসেন, কেহ বা ধীর শান্ত মূর্ত্তির অনুরাগী। কোন জাতি বিজলি সদৃশ চঞ্চলার অভিলাষী, কেহ রমণীকে স্থিরা ধীরা দেখিতে ইচ্ছা করেন। অতএব পুরুষের জাতীয় চক্ষুকেও প্রকৃত প্রস্তাবে রমণী-সৌন্দর্য্যের ভ্রম প্রমাদ পরিশূন্য বিচারক বলিতে পারিলাম না।

পরীক্ষার সীমা সংকীর্ণ করিয়া হিন্দু বামাকুলের সুন্দরী নির্ব্বাচনের ভার বঙ্গীয় যুবকের চক্ষে সমর্পণ করিলাম। বল দেখি যুবক, সুন্দরী কে? সীতা সুন্দরী কি লক্ষ্মী সুন্দরী? সাবিত্রী কি দময়ন্তী? রাধিকা কি সত্যভামা? বিদ্যা না কুন্দনন্দিনী? ছোটবৌ সুন্দরী না দত্তদের দামিনী সুন্দরী? কে সুন্দরী? যুবক, সদ্য-প্রস্ফুটিত শিশির-সিক্ত বালঃসূর্য্য-রশ্মি-ধৌত মনটীকৃষ্ণ সুন্দর, কি স্থলকমল-লাঞ্ছিত দীর্ঘায়তন, প্রকৃত গোলাপী বর্ণের চরম উপমা স্বরূপ পল্লনিবো সুন্দর? যুবক, মল্লিকা ও মালতীর, যোজনগন্ধা ও চামিলীর সৌরভের কি তারতম্য করিতে পার? যদি সে ক্ষমতা থাকে তবেই

তুমি বামাকুলে তুলনায় সুন্দরী নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হইবে, নচেৎ পারিবে না। তবে বলদেখি কি সাহসে একমাত্র স্বচক্ষু সহায়ে এ অসীম রমণী-রূপ-সাগর নিরত নিরতিশয় মন্থন করিয়া সুন্দরী ললনা নির্ব্বাচন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছ? তুলনায় সুন্দরী নির্ব্বাচন প্রথা তোমার পক্ষে অতীব জটিল, সে কেবল রূপ সাগরে হাবুডুবু খাওয়া মাত্র।

অথবা তোমারই পবিত্র রুচি, যে সর্ব্বজন-সম্মত তাহাই বা কি প্রকারে বলিব? রমণীর যে নির্দ্দিষ্ট রূপ মাধুরী তোমার তৃপ্তি সাধনে সক্ষম, হয় ত তাহাই আবার তোমার অভেদাত্মা পরম বন্ধুর অপ্রীতিকর। যে ললনা সৌন্দর্য্যের শেষ সীমা প্রদর্শনে প্রতিনিয়ত তোমার নয়নানন্দ উৎপাদন করিতেছে, যাহার অতুল রূপরাশি সন্দর্শন-সম্ভোগে তোমার চির-তৃষাতুর নয়ন ক্ষণমাত্র বঞ্চিত হইলে তুমি অস্থির হইয়া উঠিতেছ, তোমারই বন্ধু হয় ত তাহার প্রতি বারেক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেও ভ্রূক্ষেপ করেন না। যে সৌভাগ্যবতীকে তুমি নির্দ্দোষ সুন্দরী বলিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে ঘোষণা করিতেছ, হয় ত তোমারই পরম বন্ধু তাহাকেই কুৎসিত এবং কদর্য্য বলিয়া নিন্দা করিতেছেন,—অথচ তোমার বন্ধুর সহিত অন্য কোন বিষয়েই তোমার মতভেদ নাই। অতএব এই দুর্ভাগা বঙ্গদেশে দুই জন বঙ্গ যুবক একমতে এই সাগর সম বঙ্গললনা কুল হইতে একটী মাত্র সুন্দরী স্ত্রী বাছিয়া দিতে অক্ষম,—অথচ সকল যুবকের চক্ষু একই উপাদানে গঠিত।

যুবক! এক মাত্র তোমারই চক্ষুকে এ বিচার কার্য্যে বরণ করিতেও সাহস হয় না। কেন না তোমার চক্ষু তোমারই বিশ্বাসের পাত্র নহে। তোমারই চক্ষু তোমাকেই প্রতিনিয়ত প্রতারিত করিতেছে। আজ যাহাতে তোমার চক্ষু জগতের অদ্বিতীয় এক মাত্র পরমা সুন্দরী বলিয়া অকপট হৃদয়ে অসন্দিগ্ধচিত্তে লোক সমক্ষে জ্ঞাপন করিতেছে, কাল আবার সেই তোমারই চক্ষু তাহাকে সে উচ্চাসন হইতে সজোরে ভূমিতে নিপতিত করিয়া তাহাতে অন্য এক মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহারই পূজা করিতেছে। একাদিক্রমে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনবরত অনন্যমনে যে অঙ্গনার অতুল রূপরাশি প্রতিনিয়ত নিরীক্ষণ করিয়া তন্ন তন্ন বিচারে সুদৃঢরূপে অটল এবং অভ্রান্তভাবে নির্দ্দোষ এবং নিখুঁত সুন্দরী বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়া রাখিয়াছে, হঠাৎ অন্য এক স্ত্রী মূর্ত্তি ক্ষণমাত্র বিজলির ন্যায় তোমার নয়ন পথে পতিত হইয়া তোমার সে সমস্ত দৃঢ় সংস্কারকে এককালে ভস্মীভূত

করিয়া দিতেছে। আবার দেখিতেছি সেই দ্বিতীয় মূর্ত্তিকে দর্পণের স্থায় সম্মুখে রাখিয়া প্রতিনিয়ত তোমার সেই একমাত্র বিচার-সম্বল চক্ষুকে নিযুক্ত করিয়া যেমন এইবার অভ্রান্ত বিচারে সৌন্দর্য্যের চরমসীমা নিদ্ধারণ করিয়া স্পর্দ্ধায় স্ফীত হইতেছে, অমনি এক তৃতীয় মূর্ত্তির আবির্ভাব হইতেছে। অতএব সেই একমাত্র অবিশ্বাসী চির-প্রতারক চক্ষের সহায়তায় রমণী জগতে সুন্দরী নির্ব্বাচনের এতাদৃশ অব্যবস্থিত মীমাংসা কি প্রকারে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিব?

যুবক! এই রহস্যভেদে যত্নবান্ হও। প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষের চক্ষুই স্ত্রী-সৌন্দর্য্যের বিচারক, কিন্তু প্রণয়-নিয়োজিত চক্ষু ভিন্ন অন্য চক্ষের সে কার্য্য সাধন করা দুরূহ। প্রণয়ীর চক্ষুই স্ত্রী-সৌন্দর্য্যের সার মর্ম্মগ্রাহী। প্রণয়ীর নয়নেই প্রিয়তমা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী। যে যাহাকে ভাল বাসে, সেই তাহার সুন্দরী, সেই তাহার স্বর্গীয় লাবণ্যময়ী, সেই তাহার সার বস্তু। জগতের যাবতীয় লোকের চক্ষে সে রমণী কদাকার এবং কদর্য্য প্রতিপন্ন হৌক, প্রণয়ীর চক্ষে সেই একমাত্র পরমাসুন্দরী, একমাত্র নয়নানন্দ প্রদায়িনী এবং পার্থিব সুখের সেই একমাত্র অমৃতময় আকর স্থল। প্রণয়ী যে চক্ষে আপন প্রিয়তমাকে সন্দর্শন করেন, জগতের যাবতীয় অন্য লোক সে পবিত্র চক্ষু-বিহীন। ভালবাসার চক্ষু স্বতন্ত্রসম্পদ। সে পবিত্র পদার্থ প্রণয়ীর সৌভাগ্য-সঞ্চিত, অন্যের দুর্লভ। প্রণয়ী সে সুখ স্বর্গীয়, দেব দুর্ল্লভ এবং পবিত্র সঙ্গীতময়। ভাগ্যবানের অদৃষ্টেই সেই সুখ বিধি নির্দ্দিষ্ট।

বঙ্গীয় যুবক, অকপট চিত্তে বল দেখি, যাহাকে তুমি ভাল বাসিয়াছ, যাহাকে তুমি ভালবাসার পবিত্র চক্ষে অবলোকন করিয়াছ, সেই তোমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কি না? তোমার হৃদয়াকাশের সেই পূর্ণশশী কি না? ভাবিয়া দেখ দেখি, সেই মঙ্গলময় পবিত্র মূর্ত্তির বিমল জ্যোতির প্রভাবে তুমি সমস্ত জগত জ্যোৎস্নাময় দেখিতেছ কি না? তাহাকে ভাল বাস বলিয়াই তুমি পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীকে ভালবাস কি না? সেই বিধুমুখের সুমধুর হাস্য তোমার সমস্ত মঙ্গলের কারণ কি না? কে তোমাকে জগতের হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়? অসাধ্য সাধনে কে তোমার হৃদয়ে বলের সঞ্চার করে? কার উৎসাহে তুমি বিমুগ্ধ হইয়া নৈরাশ্যের দুর্জ্জয় শৈলকে পুনঃ পুনঃ হৃদয় হইতে উৎপাটন করিতে সক্ষম হও?' দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে, এই অধীনতার চির-নিবাস মাতৃভূমিতে, কুক্কুরের বৃত্তি দাসত্বে আবদ্ধ হইয়া উদয়াস্ত গাধার

খাটুনি খাটিয়া, ইংরাজের পদাঘাত শিরোভূষণ করিয়া, মুষ্টিমাত্র তণ্ডুল ভক্ষণ তুমি কার জন্য জীবন ধারণ কর? যুবক, এখন একবার তোমার হৃদয়-মন্দিরের সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহিত বহির্জগতের সমস্ত রূপরাশির তুলনা করিয়া বল দেখি, তোমারই প্রিয়তমা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কি না? মানসাঙ্কে কবি-কল্পিত সুন্দরী ললনাগণকে মূর্ত্তিমতী করিয়া অনিমিষ লোচনে অনন্যমনে নিরীক্ষণ কর, জগতের জীবিত যাবতীয় যোষিদ্‌গণকে দিব্য চক্ষে প্রতিনিয়ত অবলোকন কর, করিয়া বল দেখি, তোমারই প্রণয়-প্রতিমা এ জগতে একমাত্র সুন্দরী কি না?

ভালবাসা পার্থিব পদার্থ নহে, স্বর্গের অমূল্য বস্তু। নিঃস্বার্থ ভাল-বাসা যাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে, জগতে তিনিই সৌভাগ্যবান্। সর্ব্বত্যাগী শিবই একবার নিঃস্বার্থ ভাল বাসিয়াছিলেন। বঙ্গীয় যুব-কের অদৃষ্ট প্রসাদাৎ ভারতের অপূর্ব্ব কৌশলময় ধর্ম্মবিবাহে সেই ভালবাসা নিহিত রহিয়াছে। হিন্দুর সংসারাশ্রমে ধর্ম্মের অভাবনীয় কারণ সূত্রে সেই অমৃতময় ভালবাসার বীজ বঙ্গীয় যুবকের বক্ষঃ-স্থলে নিহিত রহিয়াছে। সেই জন্যই বঙ্গীয় যুবক সহধর্ম্মিণীকে নিরতিশয় ভাল বাসেন। সেই জন্যই বাঙ্গালির নয়নে স্ত্রীই সুন্দরী। অতএব যুবক, কেহ সুধাইলে নির্ভয়ে বলিও—'আমার স্ত্রীই সুন্দরী।"

তৈমুর সংহিতা।

তৈমুরের নাম ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই। পাঠানরাজ মহম্মদ তগলকের রাজত্বকালে তৈমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। সে আক্রমণ-কাহিনী ভারতের ইতিহাসে শোণিতাক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, এই আক্রমণ সময়ে তৈমুর, দয়া, ধর্ম্ম বা ন্যায়পরতার পরি-চয় দেন নাই। তিনি পারস্য, তাতার, সাইবিরিয়া লুণ্ঠনপূর্ব্বক কাবুল দিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। তাঁহার পৌত্র পীর মহম্মদ মুলতান আক্রমণ করেন। শতদ্রুর তটে এই দুই দল সৈন্য একত্র হইয়া পথবর্ত্তী দেশসমূহ লুণ্ঠন করিতে

করিতে দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হয়। দিল্লীশ্বর গুজরাটে পলায়ন করেন। দিল্লী অধিকৃত, বিলুণ্ঠিত ও দগ্ধ হয়। অধিবাসীগণ তরবারির মুখে সমর্পিত হইতে থাকে। যে মোগলের শাসনমহিমায় "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনি সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, বহুপূর্ব্বে সেই মোগলগণই তৈমুরের অধীনে সজ্জিত হইয়া ভারতবর্ষের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটায়, কিন্তু তৈমুর নিজ রাজ্যের সুশাসন জন্য বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নে উদাসীন থাকেন নাই। তৎপ্রণীত সংহিতা সংগৃহীত ও ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়াছে। এই সংহিতায় তৈমুরের সদাশয়তা, শাসনশৃঙ্খলা ও দয়া দাক্ষিণ্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসপাঠে এক সময়ে যাহাকে মূর্ত্তিমান কালান্তক যমের ন্যায় বোধ হয়, ঐ সংহিতাপাঠে তাঁহাকেই আবার শান্ত, দান্ত ও মধুরপ্রকৃতি বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। তাঁহার সংহিতা তদীয় করালসংহার মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে অনুপম সৌম্যপ্রকৃতির পরিচয় দিয়া থাকে। আমরা এই সংহিতায় তৈমুরের প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় পাই। আমরা ক্রমশ তৈমুর সংহিতার পরিচয় দিব। শেষে এই সংহিতা অবলম্বন করিয়াই তৈমুরের চরিত্র সমালোচনা করা যাইবে।

তৈমুর সৈন্যদিগের সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদীয় ব্যবস্থার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

"আমি নিয়ম করিয়াছি যে, প্রত্যেক যোদ্ধার স্বত্বাধিকারের কোন অনিষ্ট করা হইবে না। যে সৈনিকপুরুষ বয়োবৃদ্ধ হইয়াছে তাহার কর্ম্ম বা বেতন হইতে তাহাকে বিচ্যুত করা হইবে না। যে সকল সৈনিক যোগ্যতানুসারে সম্মান ও পারিতোষিক পাইয়া থাকে, তাহাদের কার্য্যের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে না। যদি কোন যোদ্ধা আপনার পারিতোষিক হইতে গোপনে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহা অবিচার বলিয়া গণ্য হইবে।"

"যে সকল সামন্ত, মন্ত্রী, যোদ্ধা আপনাদের কার্য্যকারিতার দ্বারা আমার সাম্রাজ্য সম্পত্তির উপর স্বত্ব স্থাপন করিয়াছেন, যাহাদের পরাক্রমে বিপক্ষদল পরাজিত হইয়াছে,—রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে, যাহারা যুদ্ধে আপনাদের সাহসের পরিচয় দিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বত্বাধিকারের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা যাইবে, এবং তাহাদের কার্য্যের সমুচিত মূল্য প্রদান করা যাইবে।

"বৃদ্ধ যোদ্ধাদিগের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শিত হইবে। তাহারা যে

পরামর্শ দেন তাহা মনোযোগের সহিত শুনা যাইবে। যেহেতু তাহারা আপনাদের বহুদর্শিতাবলে ঐরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন। তাহারা আমার সাম্রাজ্যের ভূষণস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাহাদের মৃত্যুর পর তদীয় সন্তানেরা তাহাদের কার্য্য ও ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

"যে সকল বিপক্ষসৈন্য সমরে বন্দী হয়, তাহাদিগকে বধ করা হইবে না। যদি তাহারা আমার অধীনে কার্য্য করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে যথোপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবে, নচেৎ তাহাদিগকে বন্দিত্ব হইতে বিমুক্ত করা যাইবে। এইরূপে আমি এক সময়ে চারি হাজার তুরুককে বিমুক্ত করিয়াছি।

'আমি আদেশ দিয়াছি যে, যে সকল সৈন্য আপনাদের কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদন করিয়াছে, যাহারা আমার শত্রুপক্ষের পার্শ্বে থাকিয়া আপনাদের সাহস দেখাইয়াছে, তাহারা যদি ইচ্ছা করিয়া, অথবা প্রয়োজন বুঝিয়া আমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান ও আদর প্রদর্শিত হইবে। কারণ, তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব প্রভুর কার্য্য যথারীতি সম্পাদন করিয়াছিল, এবং সেই প্রভুর প্রতি যথোচিত বিশ্বস্ততা দেখাইয়াছিল।

"আমি এইরূপে শের বহরাম নামক এক জন সৈনিকপুরুষকে পুরস্কৃত করিয়াছি। এই সৈনিকপুরুষ আমীর হোসেনের সহিত আমার বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া অসাধারণ সাহসে সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল। যখন তিনি প্রয়োজন বশত পলাইয়া আমার আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তখন আমি যথোচিত সম্মানের সহিত তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছি।

"মোঙ্গোলী-বুঘা নামক এক জন বীরপুরুষ বাল্‌খের যুদ্ধে সৈন্যগণের সহিত আমার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আমি তাহার নিকটে আমার পক্ষ অবলম্বনের প্রস্তাব করি; কিন্তু তিনি তগল্‌ক তৈমুর খাঁর সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার আদেশে তদীয় সৈন্যদল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়। তিনি যথোচিত সাহস ও ধীরতার সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে পরাজিত হন।

"কিন্তু উক্ত সৈনিকপ্রধান যখন্ অবশেষে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার ক্ষমতার নিকট অবনতমস্তক হন, তখন আমি তাঁহাকে একটী উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করি, এবং আমার বিশেষ অনুগৃহীত কর্ম্মচারীদিগের শ্রেণীভুক্ত করি। আমি সকল

সময় তাঁহার সংকার্য্য, সদাচারের প্রশংসা করিয়াছি। আমি তাঁহার প্রতি একরূপ অনুগ্রহ দেখাইয়াছি যে, যদি তাঁহার হৃদয়ে কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব থাকে, তাহা হইলে উহা ঐরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শনে সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ক্রমশঃ—

যামিনী।

১ম অধ্যায়।

যামিনীর পিতা কলিকাতায় চাকরী করিতেন। যামিনী একমাত্র কন্যা সুতরাং অতি আদরে লালিতা পালিতা হইত। তাহার মাতার নাম দেব দাসী তিনি চলিত রকম লেখা পড়া জানিতেন—সুতরাং যামিনীকে লেখা পড়া শিখাইতে তাঁহার বেশ যত্ন ছিল।

যামিনীর পিতা হিন্দু কি ব্রাহ্ম ছিলেন তাহা কেহ জানিত না, তবে দেশের যাবতীয় সং কার্য্যে তাহার বিলক্ষণ সহানুভূতি ছিল। তিনি যদিও সমাজে যাইতেন না এবং দেশে তাঁহার বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসবাদি পূজা হইত না—তথাপি ব্রাহ্ম সমাজে দান করিতেন, এবং অনাথা হিন্দু বিধবাকে তীর্থাদি দর্শন করিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

স্ত্রী কন্যাকে জামা পাদুকা ব্যবহার করিতে দিতেন এবং বিশেষ বন্ধু লোকের সহিত আলাপ আপ্যায়িত করিতেও দিতেন। খরচ পত্র চাল চলন সকলই তাঁহার আধুনিক উচু দরের ভদ্রলোকের ন্যায় ছিল সুতরাং—যাহা উপার্জ্জন করিতেন, প্রায় সকলই ব্যয় হইত। যামিনী পাঁচ ছয় বৎসর বয়েস হইতেই স্কুলে যাইয়া রীতিমত লেখা পড়া শিখিত।

"এই সময়ে রামকৃষ্ণ নামে একটী দশ বৎসর বয়সের পিতৃ মাতৃ হীন বালক তাঁহাদের বাসায় থাকিয়া লেখা পড়া করিত। দেব দাসী তাহাকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন, যামিনীও তাহাকে বড় ভাল বাসিত।

২য় অধ্যায়।

যামিনী ও রামকৃষ্ণ উভয়েই বড হইল। এখন যামিনীর বয়েস ১৪ বৎসব। আর রামকৃষ্ণ ১৮ বৎসবেব হইয়াছে। উভয়ের প্রতি উভয়েরই ভাল বাসা,—ভাল বাসাব প্রায় শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে।

এখন দুই জন একত্র হইলে উভযেই শঙ্কিত হইয়া ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ কবে। অথচ ভয় বা শঙ্কাজনক কোন কাজই তাহাবা কবিতেছে না।

যামিনী বড় চতুবা—এক দিন সে শয়ন কবিয়া আছে, সেই ঘরে দৈবাৎ অন্য কার্য্যে বামকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সে যামিনীকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। যামিনী তাহাকে হাসিয়া বলিল "তুমি কি আমাকে দেখিয়া এখন ডবাও?" রাম বলিল-"চুপ কব"—কেহ শুনিবে।"

যামিনী ধীবে ধীবে উঠিয়া হাসিতে হাসিত বামকৃষ্ণের হাত ধরিয়া বলিল—"তুমি আজ সুধু সুধু এত ভয় কবিতেছ কেন—আমায় বলিতে হইবে?"

রামকৃষ্ণ বলিল—"বোধ হয় আর একটু বড় হইলে তুমিও আমায় দেখিয়া ডবাইবে।"

যামিনী "বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি—তা ডব ভয় কি—তবে হঠাৎ নির্জ্জনে তোমাকে দেখিলে আমাব একটু একটু গা কাঁপে—ইচ্ছা হয়"——বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বামকৃষ্ণ বলিল—"কি ইচ্ছা হয়, যামিনী!"

যামিনী বলিল—"তোমাব ঐ কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি বেশ করিয়া পবিষ্কাব কবিয়া দি।"

রামকৃষ্ণ সাহস পাইয়া বলিল "আমারও ইচ্ছা হয়—তোমায় ঐ সীঁথায় খানিক সীঁদুর পরাইয়া দিই।"

এই সময়ে কাহার পদ শব্দ হইল, উভয়ে ভয়ে ও নীরবে নিক্রান্ত হইল।

৩য় অধ্যায়।

দেব-দাসী—সকল কথোপকথনই শুনিয়াছিলেন—আকারে প্রকারেও বুঝিয়া ছিলেন—যামিনী রামকৃষ্ণকে ভাল বাসে, আর এখন তাহার বিবাহেবও বয়েস হইয়াছে—তাই সকল কথা স্বামীব নিকট খুলিয়া বলিয়া অনুরোধ করিলেন-"রামের সঙ্গে যামিনীর বিবাহ দাও?"

তাহার স্বামী হাসিয়া বলিলেন "কি বিবেচনায় এ কথা বলিতেছ ?"

"কেন দোষ কি ?"

"অনেক দোষ ?"

"কি দোষ ?"

"আমরা ব্রাহ্মণ, রাম শূদ্র।"

"তা দোষ কি ? না হয় দেশে যাব না।"

"দেশে না গিয়া চলিতে পারে, সমাজ ছাড়িতে পারি না।"

"অন্য সমাজ ত আছে ?"

"যদি একটা সমাজ ছাড়িয়া আর একটা ধরিতে হইল, তবে যেটা আছে সেই ত ভাল ?"

"তবে ত রামের সঙ্গে বিবাহ হইবে না ?"

"না হোক—সমাজে অনেক ভাল ছেলে আছে ?"

"রামকে যে যামিনী ভাল বাসে ?"

"ওটি ভাল বাসা নহে-পিপাসা ?"

"পিপাসা কিরূপ ?"

"বয়েস হইয়াছে—এ সেই বয়সের ভাল বাসা, এখন তাড়াতাড়ি সুপাত্রে বিবাহ দিলেই আবার তাহাকেই ভাল বাসিবে।"

"তুমিইত বলিয়া ছিলে হিন্দুসমাজ ভাল নহে।"

"হঁ, কোন কোন অংশে ভাল নহে, কিন্তু তুলনায়—অন্যান্য সমাজ থেকে ভাল।"

"আমি ত দেখিতেছি ইহাতে দোষই অনেক, স্ত্রী স্বাধীনতা নাই। কথায় কথায় জাতি যায়। অসবর্ণে বিবাহ নাই। বিধবা বিবাহ নাই।"

"কিন্তু সেগুলি ভাল কি মন্দ তা তুমি জান না—স্ত্রী স্বাধীনতায় সমাজ উৎশৃঙ্খল হয়, কলিকাতায় ও ইউরোপাদির দৈনিক পুলিশ কোর্টের তত্ত্ব রাখিলে বুঝিতে পারিতে। জাতি সম্বন্ধে হিন্দুরা অনুদার, তবে উদ্দেশ্য ভাল পবিত্রতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা হিন্দুর ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়াই এ সকল বিষয়ে এতটা আঁটা আটি। অসবর্ণ বিবাহে জাতীয় প্রকৃতি আকৃতি, জাতীয় প্রতিভা, জাতীয় মহত্ত্ব ধ্বংস পায়। বিধবা বিবাহেও সেইরূপ পতি ভক্তি, স্নেহ ও পবিত্রতা ধ্বংস পায় এবং বিবাহ একটা ইন্দ্রিয় সেবনের ব্যবসা হইয়া দাঁড়ায়। বারাঙ্গনায় আর বহুবার পরিণীতা রমণীতে কিছুই প্রভেদ থাকে না।—

দেব-দাসী হাসিয়া বলিলেন—"তর্কালঙ্কার মহাশয় আমি হারি মানিলাম, এখন যেখানেই হোক্ শীঘ্র বিবাহটা দেওয়া চাই?"

তাহার স্বামী বলিলেন—"এবার পূজার সময় বাড়ী যাইয়াই বিবাহ দেওয়া যাইবে।"

"রামকৃষ্ণ কি করিবে?"

"একটী চাকরীর সুবিধা করিয়াছি, তাই করিবে।"

"কত পাইবে?"

"৩০৲ টাকা।"

* * * * * *

কয় দিন পরে রামকৃষ্ণ চাকরীতে নিযুক্ত হইল—এবং স্থানান্তরে থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিল।

৪র্থ অধ্যায়।

রামকৃষ্ণ আজি চারি বৎসর যাবৎ চাকরী করিতেছেন,—এ অনুরোধের চাকরী তাই টিকিয়া রহিয়াছেন। সদাগর আপিসের বড় বাবুর বিশেষ অনুগ্রহ, সেই অনুগ্রহেই রামকৃষ্ণের সাহস এবং কর্ত্তব্য কাজে তাচ্ছিল্য।

রামকৃষ্ণ বাবু সর্ব্বদাই অন্য মনস্ক। আপিসের কাজ তাড়াতাড়ি একরূপ নিঃশেষ করিয়া-কাগজ ও পেনশীল লইয়া আপনার লেখা লেখেন---লোকে দেখিয়া বিস্মিত হয় আর মনে মনে ভাবে, হায় এমন চিন্তাশীল---এমন---পণ্ডিত এমন কবি, সে কেন কেরাণীগিরি করিয়া জীবন ক্ষয় করিবে!

রামকৃষ্ণ অনেকের মুখে অনেক সময় এ কথা শুনিতে পান্—কেহ সরলান্তঃকরণে তাঁহার কবিতার প্রশংসা করে—কেহ ঠাট্টা করিয়া বলে---কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন—যথার্থই তিনি একজন প্রধান শ্রেণীর কবি,—কেরাণীগিরি রূপ সামান্য ব্যবসা তাঁহার স্পর্শে সম্মানিত হইতেছে।

তাঁহার মনে মনে সাহস হইয়াছে, তাঁহার কবিতা বঙ্গভাষার রত্ন স্বরূপ হইবে, এক দিন তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে কালিদাস বলিয়া গণ্য হইবেন—বাঙ্গালী আদর করিয়া তাঁহার কবিতা বহি কিনিয়া পড়িবে—তাঁহার মৃত্যু হইলে দেশের লোকে তাঁহার প্রস্তর মূর্ত্তি গঠন করিবে সুতরাং তিনি কেন সামান্য কেরাণীর কাজে তাঁহার অমূল্য সময় ক্ষেপণ করিবেন?

বড় বাবু কাজে বিলক্ষণ তাচ্ছল্য দেখিয়া মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণকে তিরস্কার করেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলেন—"মহাশয় বেতন ত ত্রিশ —কত খাটা যায়।" আর বড় বাবু যদি বলেন—"এ ভাবে কাজ চলিলে এ ত্রিশও যে রাখা দায় হইবে"—তখন তিনি মুখ গম্ভীর করিয়া বলেন "২৪ ঘণ্টা খাটিয়া একটী কবিতা লিখিলে ১০৲ টাকাত তার দাম হইবে?"—বড় বাবু ঘৃণার ভাবে হাসিয়া চলিয়া যান।

রামকৃষ্ণ আপিসের কাজ "যেন তেন প্রকারেণ" নির্ব্বাহ করিয়া-একদিন কবিতা লিখিতে বসিয়াছেন, এমন সময় ডাক হরকরা একখানি পত্র আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি কবিতার পদ পূরণ করিয়া চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলেন। চিঠির বিবরণ এই—

প্রিয় রামকৃষ্ণ বাবু!

পিতার মৃত্যুর পর মাকে আমার কষ্টে বাখিয়া ছিলাম। কিন্তু আমিও এখন বিধবা। মাও আমি উভয়েই বড় কষ্টে আছি, ইচ্ছা হয়, তোমাকে একবার দেখি—আর তুমিও একবার স্বচক্ষে দেখিয়া যাও, আমরা কি দুর্দশায় পতিত হইয়াছি। তিন মাস হইল, আমরা তোমার কোন পত্র পাই নাই সুতরাং শীঘ্র পত্রোত্তর দিয়া নিশ্চিন্ত করিবে।

স্নেহাকাঙ্ক্ষিনী
শ্রীযামিনী দেবী।

"বড় বড় কবিরা এবং দার্শনিকেরা অতি মহৎ, তাঁহাদের প্রাণ অতি উচ্চ তাঁহারা অতি উদার—তাঁহারা পর দুঃখে অতি কাতর"—রামকৃষ্ণের এই কয়টী কথা শুনা ছিল, অথবা তিনিও সেই শ্রেণীর একজন উদার লোক হইবেন—কেন না ঐ চিঠিখানি পাইয়া তখনই দুই খানী চিঠি লিখিলেন ও মনি অর্ডর করিয়া ৫০৲ টাকা পাঠাইলেন।

১ম পত্র।

যামিনি!

হায়! তোমার পত্র পাইয়া প্রাণ অস্থির হইল—আর তোমাদের বিপদের কথা পড়িয়া এক প্রকার মূর্চ্ছিত হইয়াই পড়িয়াছিলাম—যাহা হউক সকলই বিধির বিধান—চিন্তা করিও না, আমি জীবিত থাকিতে কষ্ট পাইবে না। মা ও তুমি যত শীঘ্র পার এইখানে চলিয়া আসিবে।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
রাম।

২য় পত্র।

"মাতঃ, পত্রে অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না, আমার সময় অমূল্য, অল্প। দেশে থাকিয়া কষ্ট পাইবেন না। আমি আপনার জন্য বাড়ী ভাড়া করিলাম, যামিনীকে লইয়া আসিবেন---খরচ ৫০৲ টাকা পাঠাইলাম। কবে রওনা হইবেন, অগ্রে জানাইবেন।

সেবক শ্রীরামকৃষ্ণ দাসস্য।

৫ম অধ্যায়।

দেব দাসী পত্র ও টাকা পাইয়া যামিনীকে বলিলেন—"তোমার পিতা আমাদের ভরণপোষণ জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। তোমাকেও এমন ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন যে, এখন অন্নাভাবে ভিক্ষা করিতে হইবে—এই কয় মাসে অনাহারে মৃতকল্প হইয়াছ, কলিকাতা যাই, রামকৃষ্ণ আমাদের মায়া মমতা ত্যাগ করিতে পারিবে না; বিশেষ সেখানে তোমার পিতার অনেক বন্ধু আছেন, আমরা বোধ হয় অনাহারে মরিব না।"

যামিনী বুদ্ধিমতী হইলেও, বিপদে এবং অন্নকষ্টে মাতার পরামর্শ ভাল কি মন্দ বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, "মা, তুমি যদি যাও, তবে আমি আর কার কাছে থাকিব—উচিত হউক, অনুচিত হউক, আমিও যাইব।"

দেব দাসী বলিলে—"যাওয়াই স্থির। দেখ আমরা দুঃখিনী, আমাদের এ সংসারে কেহ নাই—রামকৃষ্ণেরও কেহ নাই, তাহাকে সন্তানের মত পালন করিয়াছি। আহা! যদি তোমার পিতা আমার কথা শুনিতেন, তাহার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতেন, তবে আর এ দুঃখ হইবে কেন?"

মায়ের কথা শুনিয়া যামিনীর চক্ষে জলধারা বহিল—তিনি বলিলেন—"মা দুঃখে ও দারিদ্রেই লোকের জাতি যায়, ধর্ম্ম যায়, ধর্ম্মের জন্য এ জগতে কটা লোক জাতি ও সমাজ ও স্বদেশ ছাড়িতে পারে—বাবা যখন ছিলেন, তখন দুঃখ-দারিদ্র ছিল না, তাই তিনি তোমার কথা শুনেন নাই—তিনি ভালই করিয়াছিলেন, আমাদের অদৃষ্ট মন্দ।"

দেব দাসী বলিলেন, "তা ঠিক। আমিও দুঃখ আর সহিতে না পারিয়াই কলিকাতা যাওয়া স্থির করিয়াছি।"

যামিনীর মাতা যাওয়ার দিন স্থির করিয়া কলিকাতায় পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং যথা সময়ে কলিকাতা রওনা হইলেন।

যামিনী কিছুই প্রতিবাদ করিলেন না, নীরবে মায়ের সঙ্গে কলিকাতা চলিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রাতঃকাল রেলওয়ে ষ্টেশনে এখনও গাড়ি আসে নাই। আত্মীয় স্বজনকে গ্রহণ করিবার জন্য ক্রমে দুটী একটী লোক ষ্টেশনঘরে কেবল আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। পুলিশম্যান এক আধ জন অসতর্কভাবে এখানে ওখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ঠিক এই সময়ে ২২।২৩ বৎসরের একটী যুবা পুরুষ ভাল কাপড় জামা ও পাদুকা পরিয়া প্লার্টফরমের এক কোণে দাঁড়াইয়া সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ভাবে পেন্‌শিল দিয়া কাগজে কি লিখিতেছে। এত অন্যমনস্ক যে, চাদরের এক পাশ স্কন্ধ হইতে লুটাইয়া ভূমিতলে পড়িয়াছে। যুবা পুরুষের কেশকলাপ অসতর্কভাবে সুবিন্যস্ত, নাসিকাগ্রভাগে স্বর্ণমণ্ডিত চস্‌মা।

এ দিকে ষ্টেশনে মহোৎসব উপস্থিত, লোকের কোলাহল, পুলিশম্যান ও কুলিগণের হাঁকা হাঁকি, ডাকা ডাকি বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। রেল আপিসের কোন কোন বাবু টেবি কাটিয়া মৃদুহাস্যে ধীরে ধীরে পাদচরণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ি আসিয়া থামিল। আরোহিগণ অবতরণ করিয়া ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল।

এখন ভিড় কমিয়াছে, বড় বেশী লোক নাই, কেবল দুইটী স্ত্রীলোক গাড়ি হইতে নামিয়া যাইতেছেন, প্লাটফরমের ইতস্তত কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। আমাদের সেই চিন্তামগ্ন যুবা পুরুষ কিন্তু এখনও ধ্যানস্থ।

এই দুইটী স্ত্রীলোক অবশেষে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ডাকিল—"রাম বাদ!" রামকৃষ্ণ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"ওঃ গাড়ি আসিয়াছে, আপনারা আসিয়াছেন, বেস্ বেস্, আমার অপরাধ লইবেন না—আমার একটী সুন্দর ভাব মনে উদয় হওয়াতে লিখিতেছিলাম তাই এত অন্যমনস্ক, কবিদের এরূপ হইয়া থাকে, আমার দোষ কি বলুন? যাহোক চলুন?"

রামকৃষ্ণ গাড়ি করিয়া আগন্তুক স্ত্রীলোক দুটীকে লইয়া চলিলেন; বলা বাহুল্য ইঁহারাই দেবদাসী এবং যামিনী।

রামকৃষ্ণ একটী ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতেন, স্ত্রীলোকদিগকেও তথায় লইয়া যাওয়া হইল।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া দেবদাসী এবং যামিনী একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন, কেবল রামকৃষ্ণের অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া মাঝে মাঝে ভীত হইতে লাগিলেন।

এক মাস পরে এক দিন শুনিয়া হতাশ হইলেন, রামকৃষ্ণ কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। সেই দিন হইতে তিন দিনের মধ্যে আর তিনি বাসায়ও আসিলেন না। দেখিয়া শুনিয়া যামিনী বলিলেন, "মা এখন উপায়?"— দেবদাসী কি উত্তর দিবেন? স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

৭ম অধ্যায়।

রামকৃষ্ণের কাজে তাচ্ছল্য ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে অন্ধ-আত্ম বিশ্বাসে তিনি দিশাহারা হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব, তাহার অসাধারণ প্রতিভা—জগৎ সম্মান করিবে; তিনি সামান্য অর্থের দাস হইয়া আর আপিসের টুলে বসিয়া সময় নষ্ট করিবেন কেন?

ফরাশী উপন্যাসকার ব্যালজাক্ প্রথমোদ্দমে নাটক লিখিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল; তাঁহার বন্ধুরা বলিলেন, নাটক লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, আর নাট্যশালার অধ্যক্ষেরাও তাহাই বলিল—ব্যালজাক্ বুঝিলেন, তিনি সে পথ ছাড়িয়া উপন্যাস লিখিতে বসিলেন, এই বারে দেশময় "ব্যালজাক্" বলিয়া হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

রামকৃষ্ণ আশা করিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়াও এক দিন কবিরাজ্যে হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। তিনি এক দিন রত্নখচিত * বেত্র চমকাইয়া যামিনীকে বিস্মিত করিতে পারিবেন। তাই তাঁহার এত সাহস ও কাজে এত তাচ্ছল্য হইয়াছিল।

আপিসের বড় বাবু এক দিন দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রাম তুমি কাজে মনোযোগী না হইলে তোমাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইব।" রামকৃষ্ণ

---

* ব্যালজাকের যষ্টিতে হীরা চুনি ছিল।

তাহাতে হাসিয়া কহিলেন, "ইহা অপেক্ষায় মনো। করিবার আমার গুরুতর বিষয় আছে।" বড বাবু কহিলেন, "তবে আমার চাকরি ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।"

রামকৃষ্ণ আর ইতস্তত না করিয়া বলিলেন, "আপনার চাকরি আমি আজ হইতে ছাড়িয়া দিলাম।"

বড বাবু বলিলেন, "কবিতা লিখিয়া ভাত হইবে ত?" রামকৃষ্ণ তাচ্ছল্য ও ঘৃণার ভাবে হাসিয়া বলিলেন, "তা দেখা যাইবে

বড বাবু আর একটু আমোদ করিবার জন্য বলিলেন, "রাম তুমি যে সকল কবিতা লিখিয়া ডেস্কে রাখিয়া যাও, তাহা আমি পড়িয়া দেখিয়াছি—তুমি কখন কবি হইতে পারিবে না।"

রামকৃষ্ণ অভিমানে স্ফীত হইলেন, তৎক্ষণাৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "মহাশয়, কবিত্ব বুঝিবার শক্তি কেরাণীদের থাকিলে, আপিস স্বর্গ হইত।"

বড বাবু হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। আর রামকৃষ্ণ অপর কেরাণীদের নিকট আস্ফালন ও আত্মগৌরব করিতে লাগিলেন।

বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় রামকৃষ্ণ এস্তফাপত্র লিখিয়া দিয়া কার্য্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আর তিন দিবসের মধ্যে তথায় কিম্বা বাড়ীতে ফিরিলেন না। তিনি প্রথমত হস্তলিপিগুলি লইয়া সহরের সংবাদপত্র ও সাহিত্যানন্দাদি পূর্ণ মাসিক ও পাক্ষিক পত্র প্রভৃতির সম্পাদকদের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার রচনা গ্রহণ করিলেন না। কিন্তু ইহাতেও রামকৃষ্ণ দুঃখিত হইবার লোক নহে—তিনি ঘৃণা করিয়া তাহাদিগকে বলিয়া আসিলেন—"যত দিন সুযোগ্য লোক দ্বারা দেশের কাগজগুলি সম্পাদিত না হইতেছে—তত দিন উহা সাহেবদের কমোড্ ও বণিকের দোকান হইতে উচ্চ স্থান পাইবে না।"

এইবার সংবাদপত্রে তাঁহার ঘৃণা হইল—কেননা তাঁহার লেখা গৃহীত হইল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—ঐ সকল কাগজের কঠিন সমালোচন করিয়া সম্পাদকদিগকে জনসমাজে অপদস্থ করিবেন—কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না—তাঁহার সমালোচন কোন কাগজেই মুদ্রিত হইল না। তখন তাঁহার দেশের সকল কাগজের উপর বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধ হইল—ভাবিলেন, স্বয়ং নূতন কাগজ বাহির করিয়া সকলকে বিস্মিত ও চমকিত করিবেন।

এই নূতন কল্পনায় নূতন স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া তিন দিবস পরে রামকৃষ্ণ আসিয়া বাসায় উপস্থিত হইলেন।

যামিনী ও তাঁহার মাতা দুঃখ প্রকাশ করিয়া কর্ম্মচ্যুতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহাদিগকে হাসিয়া বলিলেন—"এখন রামকৃষ্ণকেও দুই তিনটা ত্রিশ টাকা বেতনের চাকর রাখিতে হইবে।"

শুনিয়া দেবদাসী হর্ষযুক্ত ও যামিনী অধিকতর দুঃখিত হইলেন।

৮ম অধ্যায়।

যামিনী রামকৃষ্ণের গতিক বড় ভাল নহে মনে করিয়া বুঝাইলেন—চাকরী ছাড়া ভাল হয় নাই। খবরের কাগজে পয়সা হইবে না, আরো হাতের কড়ি খরচ হইবে,—কিন্তু রামকৃষ্ণ তাহাতে হাস্য করিয়া বলিলেন—"যামিনী, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি কষ্ট পাইবে না, আমাদ্বারা তোমার সকল অভিলাষই পূর্ণ হইবে।"

যামিনী বলিলেন—"সে সব কথা থাক, তোমার হাতে ওগুলি কি?"

রামকৃষ্ণ বলিলেন—"দশ হাজার টাকার নোট।" যামিনী, হাসিতে হাসিতে সেগুলি তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন এবং খুলিয়া দেখিয়া বলিলেন—"এই তোমার নোট নাকি?" "তা বৈ কি—অমিত্রাক্ষর ছন্দে চমৎকার দুইখানা নাটক লিখিয়াছি—থিয়েটরে অভিনয় করিতে দিলে বিস্তর পয়সা পাইব—তোমাকে অভিনয় দেখাইতে লইয়া যাইব—দেখিবে?" বলিয়া রামকৃষ্ণ কাগজগুলিন চাহিলেন, যামিনী উহা তাঁহার হাতে দিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। রামকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন।

রামকৃষ্ণ চলিয়া গেলে দেবদাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাম কি আজ আবার আসবে?"—"তা কিছুই বলে যায় নাই" বলিয়া যামিনী চুপ করিলেন।

দেবদাসী বলিলেন—"রাম বিবাহ করিলেই সংসারী হইবে—সব সুবিধা হইবে। যামিনী তুমি মত দাও।"

যামিনী—"বাবার মৃত্যুশোক এখনও ভুলিতে পারি নাই" এই বলিয়া নিজের ঘরে যাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, কাজে প্রবৃত্ত হইলেন।

পাঠক, মনে করিয়াছেন—যামিনী রামকৃষ্ণের গলগ্রহ হইয়াছেন—কলত তাহা নহে। তাঁহার উপার্জ্জন রামকৃষ্ণের উপার্জ্জন হইতে এখন অনেক বেশী। তিনি ভাল শিল্পকার্য্য জানেন,—তিনি সারা দিন রাত্ পরিশ্রম করিয়া এক মাসের মধ্যে, সূক্ষ্ম মলমলে লাল ও নীল সূত্রে নানারকম কাজ করিয়া চারিখানি সাড়ি প্রস্তুত করিয়া ৩২ টাকায় বিক্রয় করিয়াছেন। এবারে আরো কাপড় সূতা—রেশম ও উল কিনিয়া নানা প্রকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় জন্য যামিনীকে কোথাও যাইতে হয় না। যামিনীর গৃহ-পশ্চাতে একটী অবস্থাপন্ন ভদ্রপরিবার বাস করেন। সে বাড়ীতে অনেক-গুলি মেয়ে ও অনেকগুলি বউ—তাহাদের সঙ্গে যামিনীর অল্পদিন মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব জন্মিয়াছে—তাঁহারাই তাঁহার কাপড় কিনিয়াছে ও আরো প্রস্তুত জন্য ফরমাইস দিয়াছে। যামিনীর যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক হয়, বলিলে বাড়ীর লোক দিয়া, তাহাও তাহারাই কিনিয়া দেয়। ইহা ছাড়া তাহাদের পরিচিতা, অন্য বাড়ীর মেয়েরাও ঐরূপ সাড়ীর ফরমাইস্ দিয়াছে ও ক্রমে আরও দিবে। সুতরাং তাঁহাকে এই জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়।

ইহা ছাড়া যামিনীর আরো কাজ আছে, যামিনী স্বয়ং উত্তম মেঠাই, নানা-বিধ পক্কান্ন ও ছানার সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে—তাহাও পাড়ার মেয়েরা কিনিয়া খায়। তাঁহার পরিচিতা ভদ্রমহিলারা মেঠাই সন্দেশ প্রভৃতি আর বাজার হইতে আনান না। দেবদাসী এ সম্বন্ধে যামিনীর অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন।

কলিকাতার মেয়েরা অপেক্ষাকৃত অকর্ম্মণ্য ও বাবু; তাঁহারা ক্ষীরের দ্রব্য নারিকেল রচিত ফুল ফল চিঁড়া প্রভৃতি নানা সুদৃশ্য ও সুখাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে জানেন না—সুতরাং তাহাও যামিনী বিক্রয় করিয়া থাকেন। আয় দেখিয়া তাঁহার বিলক্ষণ ভরসা হইয়াছে, যে এভাবে চলিলে খরচ কুলাইয়া হাতেও কিছু টাকা সঞ্চিত হইতে পারে।

যামিনী রামকৃষ্ণকে খুব ভাল বাসেন, এখন আবার সেই ভালবাসার সঙ্গে একটু দয়াও মিশিয়াছে। কিন্তু রামকৃষ্ণের আস্ফালন—দম্ভ—ছোটমুখে বড় কথা—ছোটপদে লম্বা চাল—তাঁহার ভাল লাগে না। যামিনীর আর একটা কথা এখন মনে হয়, উভয়ের শিক্ষাই সমান—তবে রামকৃষ্ণের এত পাণ্ডিত্যাভিমান তিনি বিশ্বাস করিবেন কেন—সহিবেনই বা কেন? আর সেই রামকৃষ্ণ

তাঁহাকে ভরণপোষণ করিবে, এ কথাটারও তাঁহার কষ্ট বোধ হয় ও ঘৃণা হয়। তথাপি তাঁহার ইচ্ছা রামকৃষ্ণ ভাল হউক, বড় হউক। তথাপি তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না—তবে এ ভালবাসার ধার নাই—আবর্ত্ত নাই—স্রোত নাই। এ ভালবাসা ছেলেবেলা হইতে অভ্যস্ত; যামিনী ভাল বাসেন বলিয়া যে রামকৃষ্ণ তাঁহার স্বামী হইতে পারিবেন, একথা যামিনী মনেও কখন স্থল দেন নাই। এই জন্যই যামিনী যখন রামকৃষ্ণের সহিত কথা কহেন, তখন মনে করেন, হয় তিনি পুরুষ, নয়, রামকৃষ্ণ স্ত্রীলোক। এই জন্যই রামকৃষ্ণ এখনও নিজের মুখে তাঁহাকে বিবাহের কথা বলিতে সাহস করেন নাই। গুণে মোহিত করিয়া যামিনীকে বিবাহ করিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

৯ম অধ্যায়।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে আর এক মাস চলিয়া গেল। রামকৃষ্ণ সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া হাতের টাকা ফুরাইয়াছেন, তথাপি সে পত্রের একজনও গ্রাহক হইল না—বা কোন পত্র তাঁহার সুখ্যাতি করিল না—কাগজ তিন সপ্তাহ পর অচল হইল।

নাটক সম্বন্ধেও ঐরূপ ফল ফলিত হইল। নাট্যশালার কোন অধ্যক্ষই তাহা অভিনয় জন্য গ্রহণ করিল না। ইহাতে রামকৃষ্ণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত প্রায় হইলেন। রামকৃষ্ণের ন্যায়প্রতিভা সম্পন্ন লোক কলিকাতায় আরো অনেক আছে। সংবাদপত্র উপলক্ষে—এবং নাট্যশালার অধ্যক্ষগণের নিকট অনেকবার গমন করায়, রামকৃষ্ণ তাঁহার ন্যায় আরো অনেক নিরাশ কবি বন্ধু পাইয়াছেন। রামকৃষ্ণ সেই কবিবন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন—"ভ্রাতৃ-গণ, তোমাদিগের প্রতি আমার বিশেষ সহানুভূতি—তাই বলি, এস একত্র মিলিত হইয়া নাট্যশালার অধ্যক্ষ ও সংবাদপত্রের মূর্খ ও অহঙ্কারী সম্পাদক-গণের দর্প চূর্ণ করা যাউক। আমাদের ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তিগণ একত্রিত হইলে অসাধ্যও সাধন করা যাইতে পারে। আমি শুনিয়াছি—জনসনীয়ানদলের একটি সাহিত্যসভা ছিল—সেই সভা পণ্ডিতকে মূর্খ ও মূর্খকে পণ্ডিত বলিলেও গ্রাহ্য হইত। সকল শ্রেণীর লেখক ও গ্রন্থকার সেই সভার সদস্যগণের নিকট হাতযোড় করিয়া থাকিতেন। এস ভ্রাতৃগণ আমরাও ঐরূপ এক সাহিত্য সমালোচনী সভা করি।"

এ প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল, রামকৃষ্ণ স্বয়ং সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন—আর "মরাল" নামে একজন নূতন কবি—সকলের অপরিচিত হইলেও সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

আগামী পরশ্ব সভার প্রথম অধিবেশন হইবে—সুতরাং সকলেই উৎসাহ-সহকারে সভার কার্য্যে মনোযোগ দিল। কে কে নিমন্ত্রণপত্র লিখিবেন, কে কে একটি বড় হলের চেষ্টা দেখিবেন, কে কে আসবাব আদি ভাড়া করিয়া আনিবেন—কে কে আগন্তুকগণকে অভ্যর্থনা করিবেন—এবং কে কে বক্তৃতা প্রদান করিবেন, সকলই স্থির হইয়া গেল। সুতরাং সকলেই গৃহের দিকে চলিলেন। রামকৃষ্ণও প্রায় দশ দিন পরে, আজ রজনী নয় ঘটিকার সময় বাসায় উপস্থিত হইলেন।

যামিনী বাতি জ্বালিয়া শিল্পকার্য্য করিতেছিলেন, আর দেবদাসী বসিয়া তাহা দেখিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ রামকৃষ্ণ হাস্যমুখে "মা কোথা" বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

দেবদাসী তাঁহাকে বসিতে বলিয়া খাবার প্রস্তুত করিতে গেলেন। যামিনী আপনার কাজ করিতে লাগিলেন। দেবদাসী অন্তর্হিত হইলে রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"যামিনী, আমার উপর রাগ করিয়াছ—রাগ করিতে পার—আমি তোমার চিত্তবিনোদন করিতে পারিতেছি না—কিন্তু ভাই জান না, আমি কেমন এক মহৎ কাজে ব্রতী হইয়াছি—কিছুদিন অপেক্ষা কর, বুঝিতে পারিবে আমি তোমার অযোগ্য দাস নহে।"

যামিনী কিছু বলিলেন না, মাথা তুলিয়া একটু হাসিলেন—আবার কাজ করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—"একি বিবাহের সাড়ী প্রস্তুত হইতেছে নাকি—বটে?"

যামিনী গম্ভীর বদনে বলিলেন—"রাম তুমি জান না—তুমি কে—আর আমি কে,—আমার শোক নির্ব্বাণ হইবার আরো গৌণ আছে; নির্ব্বাণ হইলে তখন, আমোদ করিও।"

রামকৃষ্ণ দেখিলেন, যামিনীর গণ্ড বহিয়া অশ্রুধার বহিতেছে। লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "যামিনী, মাপ কর—প্রসন্ন হও, বিরক্ত করিব না। কিন্তু যামিনী একবার মনে করিয়া দেখ, আমি কার জন্য সন্ন্যাসী না হইয়া, সম্মান, যশ ও অর্থলাভের উন্নতশিখরে আরোহণ করিতেছি?"

যামিনী এবারে হাসিলেন—শির পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ প্রস্ফুটিত নয়নে রামকৃষ্ণের দিকে চাহিলেন—এবং কিছু পরে বলিলেন—"বেশ্‌ বলিয়াছ, যে দিন যশ ও অর্থের উচ্চশিখরে আরোহণ করিবে—সেইদিন তোমাকে উপপতি করিব—কেমন সন্তুষ্ট হইলে ?"।

"উপপতি—সে কি ?"

"তবে কি বলিব ?"

"পতি।"

"আমি যে বিবাহিতা।"

"তুমি বিধবা।"

"পরলোক, পাপ পুণ্য বিশ্বাস কর ?"

"করি"

"তবে স্বীকার কর আমি সধবা।"

কিরূপে ?

"আমার স্বামী পরলোকগত,—পরলোকে তিনি আমাকে পাইবেন—তাই আমি সধবা।"

"এ হিন্দুর কথা, খৃষ্টান বা ব্রাহ্মের কথা নহে।"

"আমরা ত হিন্দু।"

"ব্রাহ্ম বা খৃষ্টানের মতে বিবাহ করিব।"

"পরলোকে যদি বিচার হয়, তুমি ও পূর্ব্বস্বামী উভয়েই যদি আমায় দাওয়া কর, তবে কে আমায় পাইবে ?"

"ঠিক বলিতে পারি না।"

"তুমি পত্নী ঘরে রাখিয়া দূরদেশে গিয়াছ, আর একজন তাহাকে অধিকার করিল—তুমি আসিয়া বিবাদ করিলে, পরে উভয়েই নালিশ করিলে, পত্নী কে পাইবে ?"

"আমি পাইব।"

"তবে ত পরকালে তুমি হারিবে, আমার স্বামী জিতিবেন ?"

রামকৃষ্ণ নীরব হইলেন—অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "আচ্ছা উপপতিই হইব।" যামিনী হাসিয়া কহিলেন,—"পরকালের বিচারের ভয়ে যদি তোমাকে গ্রহণ করিতে না পারি ?"

"আমি আত্মহত্যা করিব।" এই বলিয়া রামকৃষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন।

যামিনী হা, হা, করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আত্মহত্যা বড় বীরের কাজ, তুমি পারিবে না।"

এমন সময় দেবদাসী খাবার আনিয়া দিলেন, রামকৃষ্ণ আহারে বসিলেন।

১০ম অধ্যায়।

আজ রামকৃষ্ণের বড় সুখের দিন, আজ তাঁহার সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠা হইবে। বড় বড় লোকে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবে, সংবাদপত্রে তাঁহার প্রশংসা ঘোষিত হইবে। তাই নয়টার সময় আহার করিয়া চাপকান চোগা গায় দিয়া মাথায় ঠাকুর-পাগড়ি পরিয়া, রামবাবু তাসের গ্রেট মোগলের ন্যায় চলিলেন।

কলুটোলার কোন ভগ্ন প্রাসাদ সভার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উদ্যোগী মহাপুরুষদের চাঁদার টাকায় আসবাবাদি ভাড়া করা হইয়াছে। সুসজ্জিত সদস্য ও দর্শকপ্রধান স্কুলের ছাত্রবৃন্দও উপস্থিত হইয়াছে, কেবল রামকৃষ্ণের অপেক্ষায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিতেছে না। সভায় যে সকল মান্য-গণ্য ব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে রামকৃষ্ণের আপীসের বড় বাবুও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের উদ্দেশ্য,—মূর্খ বড় বাবুটা দেখিয়া যাউক--রামকৃষ্ণ কি দরের লোক। বলা বাহুল্য, বড় বাবুও অন্যান্য মান্যগণ্য ব্যক্তির ন্যায় অনুপস্থিত। স্কুলের মহামান্য ছাত্রবৃন্দ সভার কার্য্যে গৌণ দেখিয়া শৃগাল গর্দ্দভ প্রভৃতি সুসভ্য জন্তুর সুস্বরলহরি তুলিয়া সভাগৃহের গৌরব রক্ষা করিতেছে। এমন সময় রামকৃষ্ণ বাবুর "অমনি বস্" দুই পক্ষীবাজ টানিতে টানিতে আনিয়া, গেটে থামিল।

রামকৃষ্ণ হাস্যবদনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া যেমন সিঁড়িতে পা দিয়াছেন, অমনি তাঁহার পরিচিত এক জন চাপরাশি মাথা নত করিয়া বলিল, "বাবু সাহাব্ সেলাম"। প্রতি সেলাম দিবার পূর্ব্বেই একজন পুলিসের লোক ওয়ারেণ্ট দেখাইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল।

হায় হায়! একি হইল, দলপতি ধৃত হইলেন। সাহসী সভ্যগণ ও দর্শক-গণ মনে করিলেন, না জানি সভার কোন গুরুতর উদ্দেশ্য মনে করিয়া পুলি-সের লোক দলপতিকে ধরিয়াছে সুতরাং তাঁহারা প্রাণপণে কেহ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, কেহ নরদামা দিয়া, কেহ পশ্চাতের জীর্ণ দ্বার ভাঙ্গিয়া

পলায়ন করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ ও পুলিসের লোক বিস্মিত হইলেন। রামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার নামে কি জন্য ওয়ারেণ্ট জারী হইয়াছে?" পুলিসের লোক উত্তর দিল, "তহবিল তছরুপ" রামকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে নির্দ্দোষী সুতরাং মনে করিলেন, এ বড় বাবুর কার্য্য।

* * * * * * *

রামকৃষ্ণের আপিসের হিসাব বহিতে এক হাজার টাকা এক ব্যক্তির নামে বেশী লেখা। অথচ হিসাব বহির মোট টাকার সহিত খাজাঞ্চির তহবিলের বেশ মিল আছে। এক ব্যক্তি ৫০০০৲ টাকা পাইবে, তন্মধ্যে ৪০০০৲ পাইয়াছে, সে আজ চারি মাস পরে অবশিষ্ট হাজার টাকা লইতে আসিয়াছে কিন্তু তাহার নামের ঘরে লেখা পাঁচ হাজার, কিন্তু সংলগ্ন রসিদে চারি হাজার লেখা। বাকি হাজার টাকা কি হইল?

রামকৃষ্ণ বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া জামিনীতে খালাস পাইল। ছয় দিন পরে বিচার হইবে। রামকৃষ্ণ খালাস পাইয়া আপিসে যাইয়া কান্দিতে কান্দিতে বড বাবুকে কহিলেন "মহাশয, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধী—আমি এ টাকার কিছুই জানি না।"

বড় বাবু খাতা দেখাইয়া বলিলেন "এই দেখ? আমার বিশ্বাস তুমি যথার্থই নির্দ্দোষী, কিন্তু আমি কি করিব? সাহেব তোমাকে পুলিসে দিয়াছেন। হইতে পারে তুমি ভ্রমে ও অন্যমনস্ক হেতু একের টাকা অপরের নামে লিখিয়াছ। পূর্ব্ব খাজাঞ্চীর মৃত্যু না হইলে, এরূপ গোল সহজে ধরা পড়িত। তুমি তাহার অনুপস্থিতিতে কয়দিন কাজ করিয়াছিলে, তাহাতেই এরূপ হইযাছে।"

রামকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি মনোযোগপূর্ব্বক খাতা দেখিয়া এ গোল বাহির করিতে পারিব।" বড বাবু তাহাকে দেখিবার আদেশ দিলেন।

রামকৃষ্ণ রোজ আপিসে আসিয়া তন্নতন্ন করিয়া খাতা দেখেন কিন্তু টাকার ভুল কিছুতেই বাহির করিতে পারেন না। অবশেষে একবারে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। জেলে যাওয়া জন্য তিনি তত বিষণ্ণ নহেন, যামিনী এ কথা শুনিবে বলিয়াই তিনি অধিকতর বিষণ্ণ। এই জন্যই আর বাড়ী যান নাই।

এদিকে দেখিতে দেখিতে বিচারের দিন আসিল, বিচার হইতে লাগিল। রামকৃষ্ণের পয়সা নাই, সুতরাং ভাল উকীল দিতে পারিলেন না, তথাপি রামকৃষ্ণকে দেখিয়া ও খাতাপত্রের অবস্থা দেখিয়া বিচারকের বিশ্বাস হইল—

যে ক্রমে একের টাকা অপরের নামে লেখা হইয়া থাকিবে, তাহা না হইলে ৫০০০ টাকা লেখা অথচ তৎসংলগ্ন রসিদে ৪০০০ টাকা কেন থাকিবে, নগেন্দ্র মন্দ লোক অবশ্য রসিদের টাকার অঙ্ক জাল করিয়া তৎস্থানে ৫০০০ টাকা লিখিবারই চেষ্টা করিত।

বিচারকের বিশ্বাস হইলে কি হয়, তিনি আইনে বাধ্য, তথাপি এদিক ওদিক করিয়া তিনি বিচার কার্য্যে গোল করিতে লাগিলেন।

* * * * * * *

কথা গোপন থাকে না, দৈনিকপত্রের পুলিশ রিপোর্টে উহা প্রচার হয়। যে বাটীর মেয়েরা যামিনীকে বড় ভাল বাসে, সেই বাটীতে একখানি দৈনিক সংবাদপত্র আসিয়া থাকে, যামিনী তাহা চাহিয়া আনিয়া পড়েন। সুতরাং রামকৃষ্ণের এই সাংঘাতিক সংবাদ পাইয়া তাঁহার কোমল হৃদয়ে দয়া হইল, তিনি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া মাকে সঙ্গে লইয়া আপিসে চাললেন।

আপিসের নিকট উপস্থিত হইয়া বড় বাবুকে খবর পাঠাইলেন, দুর্ভাগ্য বশত বড়বাবু নাই, তাঁহার অসুখ হইয়াছে। যামিনী তথাপি সাহসে নির্ভর করিয়া সাহেবের নিকট খবর পাঠাইলেন, সাহেব উপরে যাইতে বলিলেন। যামিনী উপরে যাইয়া দেখিতে পাইলেন সাহেব ও বিবি বসিয়া আছেন অন্য লোক নাই। বিবি দেখিয়া তাহার ভরসা হইল, তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া নতজানু হইয়া বলিলেন,—

"রামকৃষ্ণ বাবুকে মাপ করিতে হইবে?"

সাহেব ও মেম্ বিস্মিত হইলেন। কিন্তু যামিনীর নিষ্কলঙ্ক ও সাহস পূর্ণ সুন্দর বদন দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন। মেম্ বলিলেন "তুমি তার কে?"

যামিনী নিজ দুঃখ বর্ণন করিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। সাহেব বিবি উভয়েরই করুণার সঞ্চার হইল। বিবি তাঁহার হাত ধরিয়া একখানি আসনে বসাইলেন। সাহেব কহিলেন "আমি কি করিব? এখন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ছাড়িবেন না।"

যামিনী বলিলেন "তবে আমাকে দয়া করিয়া সেই খাতাখানি দেখিতে দিন?" সাহেব হাসিয়া বলিলেন "খাতার হিসাব পত্র বুঝিতে পারিবে?"

যামিনী সাহস করিয়া কহিলেন "পারিব।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই কয়খানা খাতা আসিল। সাহেব হাসিয়া বলিলেন "কি, এত খাতা দেখিতে পারিবে?"

যামিনী বলিলেন "যদি সঙ্গে নিতে দেন, তবে সমস্ত রাত জাগিয়া দেখিতে পারি।" সাহেব কি জবাব দিবেন তাহ ভাবিতে ছিলেন, ইতি মধ্যে বিবি হাসিয়া বলিলেন "লইয়া যাইবার প্রয়োজন কি? এখানে বসিয়া দেখ, আমিও সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।"

যামিনী স্বীকৃত হইয়া খাতা দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার মা গাড়ী লইয়া বাড়ী গমন করিলেন।

১২শ অধ্যায়।

অরুণোদয় হইয়া গৃহে কোমল রশ্মি প্রবেশ করিয়াছে, গৃহ কোণে পিঞ্জরাবদ্ধ কেনারি পাখী শিশ দিতেছে। টেবিলে এখনও ল্যাম্প জ্বলিতেছে, যামিনী বাহ্য জগতের কিছুই জানেন না, যে ভাবে হিসাব দেখিতে ছিলেন সেইভাবেই দেখিতেছেন। জাগরণে তাহার নয়ন রক্তবর্ণ, স্ফীত হইয়াছে, ঢুলু ঢুলু করিতেছে, মুখ মলিন এবং শুষ্ক।

বিবি গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "ক্ষান্ত হও অসুখ হইবে"। যামিনী মুখ তুলিলেন সে মুখ শুষ্ক, চিন্তিত ও বিবর্ণ দেখিয়া বিবির মনে দুঃখ হইল। তিনি বলিলেন "আর কতটা বাকি?" যামিনী বলিলেন "একবার সমস্ত দেখিয়াছি—আবার ভাল করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি—দেখিতেছি জেল অনিবার্য।"

বিবি হাসিয়া বলিলেন, "অনাহার, জাগরণ, বাড়ী যাও—ভয় নাই—এক হাজার টাকা আমি দিয়া খালাস করিয়া দিব।" বিবির এত দয়া দেখিয়া যামিনী বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিলেন—

বিবি সে মুখমণ্ডলে অভিমান ও দুঃখ পাঠ করিতে শিহরিলেন।

যামিনী বলিলেন—"যদি যথার্থই এক ব্যক্তি চোর হয়, তবে অসৎপাত্রে আপনার টাকা যাইবে কেন?"

"টাকা তোমার জন্য—তার জন্য নহে।"

"আমি টাকার জন্য আসি নাই।"

"তবে কেন আসিয়াছ?"

"নির্দোষী কি না,—তাহাই বুঝিতে।"

"এখনও কি তাহা বুঝিবার বাকি আছে ?"

"একটু আছে।"

"কি ?"

"তাঁর লিখিবার ডেস্কে কি আছে দেখিব ?"

বিবি হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, চল তবে কেরাণীখানায় যাই ?"

উভয়ে কেরাণীখানায় চলিলেন, কিন্তু এখনও আপিস খোলে নাই। বিবি হুকুম দিয়া চাবির অভাবে রামকৃষ্ণের ডেস্ক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। যামিনী সাবধানে উহার ভিতরের কাগজপত্র ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অতি ক্ষুদ্র অতি সামান্য কাগজখানিও দেখিতে ত্রুটি করিলেন না। এক টুকরা কাগজে লাল কালির অক্ষরে কবিতা লেখা, ঐ কাগজখানি দেখা হয় নাই—কাগজপত্র বাহির করিতে ডেস্কের নীচে পড়িয়া গিয়াছিল—যামিনী যখন, সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়া অবশেষে নিরাশ লোচনে বিবির মুখ পানে চাহিলেন—তখন বিবি সেই কাগজখানি অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া বলিলেন "ওখানি কি কাগজ ?"

যামিনী কাগজ তুলিয়া তাহার অপর পৃষ্ঠ দেখিলেন—মনে আশা হইল, সহসা তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইল। বলিলেন "এ খানি হাজার টাকার রসিদ হয় ত এই ব্যক্তির টাকা তাহার নামে জমা না হইয়া অন্য ব্যক্তির নামে প্রথমত জমা করা হইয়া থাকিবে।"

বিবি তখনই রসিদখানি লইয়া উপরে চলিলেন। খাতা খুলিয়া নাম বাহির করিলেন। যথার্থ ই সে নামে টাকা জমা নাই, রসিদও তাহার পাশে সংলগ্ন নাই। অল্পক্ষণ মধ্যে ইহা সাহেবের কর্ণে গেল সাহেব দেখিলেন—রসিদদাতা কলিকাতার লোক—তখনই টেলিগ্রাফ করিলেন। টেলিগ্রাফের উত্তর আসিল "হাজার টাকা পাইয়াছি।"

সাহেব উচ্চস্বরে বলিলেন "রামকৃষ্ণ নির্দ্দোষী" শুনিয়া যামিনী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বিবি তার চেয়ে বেশী সন্তুষ্ট হইলেন বলিলেন—"যামিনী তোমার পরিশ্রম সার্থক, তোমার প্রাণ উচ্চ—বল, আমরা তোমার কি করিতে পারি ?"

যামিনী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন "রামকৃষ্ণের অসাবধানতার দোষ ক্ষমা করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। তাহাকে একটা চাকরী দিবেন, তবেই সন্তুষ্ট হইব।"

সাহেব ও বিবি উভয়েই তাহার পানে বিস্ময়ের লোচনে চাহিয়া বলিলেন —"তাহা হইবে।"

১২শ অধ্যায়।

রামকৃষ্ণ মুক্তি পাইয়াছেন—মুক্তির বিবরণও শুনিয়াছেন। শুনিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছেন—এইবার তিনি প্রথম বুঝিতে পারিলেন, তার চেয়ে যামিনী কত উচ্চ। তাঁহার মস্তক শীতল হইল, হৃদয় ভক্তিপূর্ণ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইল—মনে মনে বলিলেন "দেবি,—আমি তোমার দাসের যোগ্য—আমি স্বামীর যোগ্য নহি"।

* * * * * * * * * *

বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে—আফিস পূর্ণ লোক—তন্মধ্যে উচ্চাসনে বড় বাবু বসিয়া আছেন, এমন সময় সাহেব আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন— "আমি রামকৃষ্ণকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি, আসিলে তাহাকে পূর্ব্ব কাজ সাবধানে করিতে বলিবে।"

বড বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন "সে এক প্রকার আপনি কাজ ছাড়িয়া গিয়াছে।"

সাহেব বলিলেন "তাকে বুঝাইয়া বলিবে সে যেন কাজ ছাড়ে না, ভবিষ্যতে তাহার ভাল হইবে।"

সাহেব স্বস্থানে গমন করিলে কিছু পরে রামকৃষ্ণ বাবুর নিকট আসিয়া বলিলেন "আমাকে সাহেব কেন ডাকিয়াছেন?"

"পূর্ব্ব কাজ করিতে।"

"আর কাজ করিব না।"

"তবে কি করিবে?"

"তা কি জানেন না?"

"জানি, কিন্তু তুমি তাহা পারিবে না।"

"কেন মহাশয়?"

"কবি-জনোচিত প্রতিভা বা ক্ষমতা তোমার নাই।"

"আপনি কিসে বুঝিলেন?"

"তুমি পাগল।"

"আপনি তবে বিখ্যাত কবি "মরাল" কেও পাগল বলিবেন।"

"কোন্ "মরাল" তোমাদের মনোনীত সভাপতি ?"

"হাঁ।"

"তাহাকে দেখিয়াছ।"

"না।"

"তাঁহাকে জান ?"

"না।"

"তবে কিরূপে তাঁহাকে পাইবে ?"

"খুঁজিয়া লইব।"

"মরাল কিরূপ কবি ?"

"চমৎকার!"

"মরাল যদি কেরাণীগিরি করে, তবে তুমি তাহা করিতে অপমান বোধ করিবে না ত ?"

"এত বড় কবি, কেরাণি হইতে পারে না ?

"যদি তাই হয় ?"

"আমি তাহার অধস্থ কেরাণীরও পদসেবা করিব।"

"ঠিক ত ?"

"ঠিক মহাশয়।"

"আমিই মরাল স্বাক্ষর করিয়া কবিতা লিখিয়া থাকি।" রামকৃষ্ণ শুনিয়া অবাক হইলেন, নিজের ব্যবহারে, লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইল মাথা হেট করিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য।"

বড় বাবু বলিলেন, "কিছুই আশ্চর্য্য নহে—এদেশের লেখকদের লেখায় পয়সা হয় না। দেখ হেম বাবু, রবীন্দ্র বাবু প্রভৃতি কি করিতেছেন ? তবে যাঁহাদিগের লিপিক্ষমতা এতাধিক যে ইচ্ছা না থাকিলে একবার তোমাকে তাঁহাদের বহি পড়িতেই হইবে, না পড়িলে উপায় নাই, না পড়িলে মূর্খ হইয়া থাকিতে হইবে, তাঁহারাই কেবল লেখনী লইয়া অহঙ্কার ও লেখনীর উপর সংসার নির্ভর করিতে পারেন। উহা তোমার বা আমার কর্ম্ম নহে। এখন হইতে সাবধানে কর্ম্ম কর, এ পথে অর্থ ও উন্নতি সহজে হইবে।"

রামকৃষ্ণের মন ফিরিল, রামকৃষ্ণ আর এক রামকৃষ্ণ হইয়া কার্য্যে প্রবেশ করিলেন। অবশেষে বড় বাবু পদান্তরে উন্নীত হইলে, রামকৃষ্ণ মোটা বেতনে বড় বাবু হইলেন।

উপসংহার।

রামকৃষ্ণের খুব কাঁকাল অবস্থা দেখিয়া দেবদাসী একদিন যামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আর কেন—বিয়েটা এখন হ'য়ে যাক।" রামকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার বদন প্রসন্ন হইল—ভাবিলেন, "যামিনী আমার না হউক অন্তত এখন আমার অবস্থার দাসী হইতে সম্মতা হইবে—"

যামিনী সেই সময় বদন গম্ভীর করিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মা একটু অপেক্ষা কর, রামকৃষ্ণ তুমিও একটু অপেক্ষা কর।" রামকৃষ্ণের বদন আরও উজ্জ্বল আরও প্রফুল্ল হইল।

সহসা যামিনীর শয়নকক্ষ হইতে এক সন্ন্যাসিনী নিষ্ক্রান্তা হইলেন। সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন, "মা দেখ।—রামকৃষ্ণ দেখ।—আমার বিবাহের পরিচ্ছদ কেমন হইয়াছে।" দেবদাসী নির্বাক—রামকৃষ্ণ বিস্মিত।

* * * * * * * * * * *

দেবদাসী বলিলেন, "এ বেশ কেন?" যামিনী বলিলেন, যামিনী দেবী চিরদিনই দেবী থাকিবে, দাসী হইবে না।

দেবদাসী বলিলেন, "তবে কি করিবে?" যামিনী বলিলেন, "চল বৃন্দাবনে ভিক্ষা মাগিয়া খাইব, আর ব্রজের ধূলি গায়ে মাখিব।"

কপালকুণ্ডলা।

কপালকুণ্ডলা কবির একটী অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই সৃষ্টি মাধুর্য্য অনুভবের জিনিস, বর্ণনার জিনিস নহে। কারণ, কপালকুণ্ডলা ভাবময়ী, অথবা তাহা হইলেও একরূপ বুঝান যাইত—কপালকুণ্ডলা ছায়াময়ী। সত্য বটে, কবি ইহাকে ভাষাময়ী করিয়াই আমাদিগের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু কোন ভাষাই কপালকুণ্ডলার পূর্ণাবয়ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। কলাবিৎ যেমন সঙ্গীতকালে স্বীয় স্বরের অপূর্ণতা বা স্বর-বিচ্ছেদ কোন এক অবিরাম-ধ্বনিত যন্ত্র সাহায্যে পূরণ করিয়া থাকেন, আমাদিগের কবিবরও সেইরূপ তাঁহার এ মনোহর সঙ্গীতটি ভাষায় গঠিত করিয়াও ইহার অপূর্ণতা ও বিচ্ছেদ

পাঠকবর্গের মানসযন্ত্র ধ্বনিত করিয়া পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ যন্ত্র যাহার ধ্বনিত হইবার জন্য শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, যাহার এ যন্ত্র সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে মিশিতে অসমর্থ, কপালকুণ্ডলা তাহার নিকট সম্যক্ অপূর্ণ। ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, তাহার জন্য হইতে পারে, কিন্তু কপালকুণ্ডলা নিশ্চয়ই তাহার জন্য নহে। কপালকুণ্ডলা চিত্র নহে· চিত্রের ছায়া। প্রতিচিত্র গ্রহণকারীরা যেরূপ চিত্রিতব্য পদার্থের ছায়ামাত্র গ্রহণ করিয়া পরিশেষে তাহাই যথাবিধ বর্ণে প্রতিভাসিত করিয়া, ঠিক সেই পদার্থের অনুকৃতি রচনা করে, পাঠকবর্গকেও সেইরূপ এই ছায়া লইয়া মনোমধ্যে কপালকুণ্ডলাকে অঙ্কিত করিয়া লইতে হইবে। ছায়াটি একটী যন্ত্র সাহায্যে উঠিয়াছে, সে বাহাদুরী যন্ত্রের; কিন্তু মূর্ত্তি-গঠনে বাহাদুরী পাঠকবর্গের। তাই চিত্রনিপুণ পাঠকবর্গের নিকটে পূর্ণ মূর্ত্তি অপেক্ষা—এই ছায়ারই আদর অধিক।

পাঠক, কখনও কোন চিত্রগৃহে বর্ণ গুচ্ছের (রঙের আবরার) ছবি দেখিয়াছ? এখানে এক ধাবড়া রঙ, ওখানে এক ধাবড়া রঙ, বহু যত্ন বিন্যস্ত অথচ অযত্ন বিন্যস্তের ন্যায় পরিদৃশ্যমান রঙের আবরার ছবি কখন দেখিয়াছ? কপালকুণ্ডলা সেইরূপ চিত্র। ইহাতে কোনও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য নাই—অথচ চিত্রটী বড়ই মনোহর। যে চিত্রে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য থাকে, তাহা হঠাৎ কেহ না বুঝিলে, বুঝাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু এরূপ চিত্র না বুঝিলে, বুঝান দুরূহ। ইহার বিশ্লেষণ হয় না—অথবা বিশ্লেষণে উহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। তবে বুঝান যায়,—উহার সেই এক একটি বর্ণ গুচ্ছের (রঙের আবরার) সৌন্দর্য্য। তাহাই আমরা চেষ্টা করিতে পারি কিন্তু সেই সমগ্র চিত্রের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়।

ঐ দেখ সেই রকম পাংশু বর্ণে ঐ কি লিখিত হইয়াছে,—দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি—মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড তেজ বক্ষে করিয়া অনলশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ নাই, লতা নাই, মানব নাই, তথায় পশু চরে না, পাখী ডাকে না, সমীরণও যেন বহে না। এহেন ভীষণ মরুভূমির মধ্যদেশে ঐ দেখ একটী পথিক ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিতেছে। পথিক পথহারা—তাহার বদনমণ্ডলে বিষম আশঙ্কার চিহ্ন, গমনে বিষম ভ্রান্তির চিহ্ন। নয়নযুগল ভীতিব্যঞ্জক, সমুদ্রে পতিতের ন্যায় নিরাশায় হাবুডুবু করিতেছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় জঠর ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। পথিক বিষম বিপদগ্রস্ত। আত্মহারা হইয়া পথিক কি ভাবিতেছেন—সহসা এ কি! পরি-

কেব চতুর্দ্দিক বেষ্টন কবিয়া ধপ্ করিয়া এ কি জ্বলিয়া উঠিল। এ যে প্রদীপ্ত অনলশিখা—আগুণেব মধ্যে আগুণ। পথিক জীবনে নিরাশ হইলেন—হা ভগবান বলিয়া সেই ভীষণ মরুভূমে, সেই ভীষণ অনলবাশি মধ্যে নিশ্চেষ্ট হইযা আত্মসমর্পণ করিলেন। এমন সময়ে সহসা তাঁহার চতুর্দ্দিকে আবার এ কি এ উত্থিত হইল। সেই ভীষণ মরুভূমি ভেদ কবিয়া আবার এ কি বেষ্টন কবিল। সলিলের উৎস। শুভ্র, নির্ম্মল, সুশীতল, বাবিপুঞ্জ! আহা মবি মবি, কি সুন্দব চিত্র রে।—সেই ভীষণ মরুভূমিতে, সেই ভীষণ অনলরাশি মধ্যে আহা মবি মবি এ কি এ সুন্দব দযাব উৎস বে! ঝব্, ঝর্, ঝব্, ঝর্ রবে কি ঐ মধুব ধ্বনি বে! স্বজন-পবিত্যক্ত বিজন প্রদেশে কাপালিক কর্ত্তৃক বধার্থ আনীত শ্মশানক্ষেত্রে নিবীহ নবকুমাবেব পার্শ্বে, ঐ কি মধুব দয়াব উৎস বে! সেই মহাকালেব ক্রীডাভূমি ভীষণ মরুক্ষেত্রে শবশয্যাশাযিত ভীষ্মমুখে অর্জ্জুন-শরপ্রোদ্ভিন্ন ধবিত্রীভেদী সলিলধাবাও এত অমৃতমবী নহে।

ঐ দেখ আর এক স্থানে ধ্যাবড়া রঙ্গে ঐ কি লিখিত হইয়াছে,—মাতৃক্রোড়ে একটী যুবতী বালিকা। মায়েব আব সন্তান নাই, মায়েব পুত্রও ঐ, কন্যাও ঐ, তাই কন্যাটি যুবতী হইলেও বালিকাব ন্যায এখনও লালিত। এখনও সে বনে বনে ছুটা ছুটি কবিযা বেড়ায, এখনও সে মায়েব কাছে বালিকার ন্যায় আবদাব কবে। গাত্রে আভবণ নাই, দবিদ্রা মাতা কোথায় পাইবে? অথবা সে পাগলা মেয়েকে আভরণ পবান যাইতই না। কেশরাশি সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন কবিয়া বাখিয়াছে। নযনে বালহৃদয় প্রতিভাসিত, তেমতি সবল, তেমতি স্নেহ-পূর্ণ। আবাব যুবতীব ন্যায তাহাতে গাম্ভীর্য্যও প্রকটিত রহিয়াছে। বালিকার মাধুর্য্য ও যুবতার গাম্ভীর্য্য মধুর ভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে। বালিকাটি মাতৃ-ক্রোড়ে বসিয়া মায়েব মুখপানে চাহিযা আছে, এমন সময়ে হঠাৎ কে আসিয়া তাহাকে মাতৃক্রোডচ্যুত কবিয়া লইয়া গেল। বালিকা কাঁদিল না, অথবা কাঁদিল কিন্তু আর্ত্তনাদ কবিল না। সে কিছুই বুঝিল না—অথবা বুঝিল, কিন্তু নিরুপায় ভাবিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ব্যতীত আব কিছুই করিল না। ঐ দেখ, ঐ সেই মাতৃক্রোড়চ্যুতা যুবতী বালিকা আজি বিবাহিতা হই-যাছে। আজ সংসাররূপিণী বিমাতা তাহাকে কত আদর করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ আভরণে ভবা, কেশপাশ সুনিবদ্ধ। মাতা নাই বলিয়া, মাতৃক্রোড়চ্যুত বলিযা, সকলে তাহাকে কত আদর কবিতেছে। স্বামী অপরিমিত স্নেহ করি-তেছে, ননন্দিনী প্রাণের অধিক যত্ন কবিতেছে, কিন্তু কিছুতেই যেন তাহার

মন উঠিতেছে না। সেখানে সে যে মায়ের কোলে ছিল, এখানে যে এ বিমাতা। মাতৃহারা শিশু যখন মা মা বলিয়া রোদন করে, তখন তোমরা তাহার নিকটে যতই কেন মনোহর দ্রব্য ধর না, সে তদ্দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না, বরং অন্য সময়ে যাহা সে আদর করিয়া বুকে করিত, সে সময়ে সে তাহা রাগ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে। যুবতী আজ ঠিক তাহাই করিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে যেন তাহার চক্ষু দুইটি ফুলিয়া পড়িয়াছে, মুখখানি যেন রাহুগ্রস্ত বিমলিন চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতেছে। দেখ দেখি, চিত্রকরের কি অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্য। সে মুখখানি কেমন ফুটিয়াছে—সে মনোভাবটি কেমন খুলিয়াছে। প্রকৃতি দুহিতা ষোড়শী বালিকা কপালকুণ্ডলাকে সংসার ক্রোড়ে আজ কেমন দেখিতেছ? আর কখন কোন বন্য বিহঙ্গিনীকে খাঁচায় পুরিয়া রাখিতে সাধ হইবে? কোন বন্য ব্রততীকে বন হইতে তুলিয়া টবে বসাইতে সাধ হইবে?

এই দেখ আর এক ধারড়া বড়ে এই কি লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত সমাজের সংগ্রামের পরিণাম। কাব্যে, ইতিহাসে, দর্শনে, শ্রবণে, যে সকল অন্তিম দুঃখের কথা পড়িয়াছ, যে সকল শ্মশানক্ষেত্র দেখিয়াছ, যে সকল শোক সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছ, সব একত্রিত করিয়া ভাবিয়া একবার ঐ দিকে চাহিয়া দেখ দেখি—ঐ শ্মশানভূমির প্রান্তভাগে উচ্ছ্বাসময়ী ভাগীরথীর তটদেশের ঐ যুগল মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কর দেখি—ঐ প্রকৃতি আর ঐ সমাজের দিকে তাকাও দেখি—এরূপ আর কখন কি দেখিয়াছ? এরূপ হৃদয়ভেদী গাম্ভীর্য্যময় মধুরদৃশ্য আর কখন কি দেখিয়াছ? ঐ দেখ ঐ সামাজিক প্রেমিক নবকুমার—ঐ দেখ ঐ স্বভাব প্রেমিকা কপালকুণ্ডলা। উভয়েরই চরমোচ্ছ্বাস দেখ—উভয়েরই আদর্শভাগ দেখ। আরও দেখিতে চাও। তাহা হইলে তোমাদিগের নিকটে আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম। কপালকুণ্ডলা যে আমাদিগের প্রিয়তমা দুহিতা—তাহাকে শ্মশানস্থ দেখাইলাম—তাহার ভস্মাবশেষ দেখাইতে পারিব না।

কিন্তু এ সকল ব্যষ্টির সৌন্দর্য্য—সমষ্টির সৌন্দর্য্য বুঝান যায় না। এ ব্যষ্টির সৌন্দর্য্য নিকটে আসিয়া দেখা যায়—কিন্তু সমষ্টির সৌন্দর্য্য নিকটে আসিয়া দেখা যায় না। তাহা দেখিতে হইলে, নবকুমারের মত অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে গম্ভীরনাদী বারিধিকূলে উচ্ছ্বসিত মনোভাব লইয়া দেখিতে হইবে। সংসারীর কাছে অমন প্রকৃতি তনয়া ছায়াময়ী ভিন্ন ত উজ্জ্বল হইতে পারে

না—ছায়াময়ী ভাবেই তাহাকে দেখিতে হইবে—কল্পনার স্বপ্নে তাহাকে দেখিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, কপালকুণ্ডলা অনুভবের জিনিস, বর্ণনার জিনিস নহে। ভাব বর্ণনা করা যায, কিন্তু ভাবের ছায়া বর্ণনা করা যায় না। কল্পনা বর্ণনা করা যায় কিন্তু কল্পনার স্বপ্ন বর্ণনা করা যায় না।

কপালকুণ্ডলা আদর্শ রমণী নহে, কিন্তু তবু চিত্ত বিমোহিনী। ইহার কতক কারণ, এক প্রকার বলা হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা বিজন মরুভূমে বিমল সলিলধারা, কপালকুণ্ডলা বিমাতৃক্রোড়ে আদরপালিতা মাতৃহারা শিশু, কপালকুণ্ডলা প্রিয়তমা তনয়ার বিমলানন মুখচ্ছবি। কপালকুণ্ডলা আমাদিগের নিকটে অতীতের স্মৃতি—রোগীর তন্দ্রা, নিদাঘের মলয় মারুত। এই স্বার্থময় কপটতা-তাড়িত সংসারে থাকিয়া থাকিয়া আমরা একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি—সরলতাময়ী পরময়ী কপালকুণ্ডলা তাই আমাদিগের এত ভাল লাগে। কপালকুণ্ডলা যে সম্পূর্ণ সংসার ছাড়া—তাই সংসারী আমরা, কপালকুণ্ডলা আমাদিগের নিকট বড় অপূর্ব্ব, বড় মধুর। অমন ছবি ত আর কোথায়ও নাই। এমন সংসার ছাড়া জীব আর কোথাও ত দেখিতে পাই না। কপালকুণ্ডলাকে যে আমরা এক সময়েও সংসারী বলিয়া আপনার বোধ করিতে পারিলাম না। আর এ প্রকার,—যত ছবি দেখিয়াছি, সকল গুলিই এক সময়ে না এক সময়ে আমরা আপনার বলিয়া বোধ করিতে পারিয়াছি। রমণীর চিত্তে স্বামী প্রেমই জীবন স্বরূপ। এই জীবনটী আমরা প্রায় সকল ছবিতেই এই সংসারের বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। অন্য সময়ে সংসার ছাড়া ভাবিতে পারিলেও, এ সময়ে যেন তাহারা সম্পূর্ণ আমাদিগের বোধ হইয়াছে। সম্পূর্ণ সাংসারিক বোধ হইয়াছে। তাই, মিরন্দা, শকুন্তলা হইতে কপালকুণ্ডলার অপূর্ব্বত্ব অধিক। কপালকুণ্ডলার এই জীবনটি একবার দেখ দেখি—এখানেও দেখিবে আমাদিগের সংসারের কিছু নাই। নবকুমারের প্রতি কপালকুণ্ডলার অনুরাগ বা মনোভাব কপালকুণ্ডলার এক অদ্ভুত বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বটুকু এত অপূর্ব্ব ও এত মধুর, যে শুদ্ধ এই টুকু যেন কপালকুণ্ডলাকে আমাদিগের হইতে এক পৃথক জীব করিয়া তুলিয়াছে। কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি মানবের মৌলিক প্রকৃতি—ঈষৎ পরিবর্ত্তিত বটে, কিন্তু তবু সামাজিক মানবের প্রকৃতি হইতে তাহা কত অন্তর! কবিবর আমাদিগকে এই প্রকৃতিটি দূরে রাখিয়া একবার দেখাইয়াছেন—আবার কাছে আনিয়া, তুলনায় আর একবার দেখাইয়াছেন। এই মৌলিক প্রকৃতির সহিত আমাদিগের সামা-

জিক প্রকৃতি তুলনা করিলে, আমাদিগের হৃদয় বিস্ময় রসে পরিপ্লুত হয়। সমাজ আমাদিগকে এখন্ এত দূরে আনিয়াছে? কোথায় কপালকুণ্ডলা—আর কোথায় আমরা—এই বিস্ময়টিও কপালকুণ্ডলার আর একটি সৌন্দর্য্য। সকল জড়াইয়া কপালকুণ্ডলা এত মনোহারিণী। এত একরকম বলা গেল, কিন্তু স্বপ্নময়ী কপালকুণ্ডলাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না। সে বিনা সূতার হার, আকাশের প্রতিমা ধরিতে গেলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ভোলাদাদার ব্রাহ্মণভোজন।

ভোলাদাদার ব্রাহ্মণভোজন বর্ণনা করার পূর্ব্বে—ভোলাদাদা আমার কে? কি রকমের মানুষ ছিলেন? তাহা আপনাদিগের নিকট না বলিলে চলিবে কেন? অতএব শুনুন।

ভোলাদাদা পূর্ব্ববঙ্গের লোক এবং সকল পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীর ন্যায় তিনিও স্বদেশবৎসল ছিলেন কিন্তু তাঁহার দেশবাৎসল্য অনেকের অপেক্ষা কিছু বেশী মাত্রায় প্রবল ছিল। তিনি জানিতেন যে ঢাকার মতন সহর নাই, গনী মিঞা সাহেবের ন্যায় বড় মানুষ নাই, বিক্রমপুরের লোকের ন্যায় বিদ্বান নাই, পদ্মানদীর ন্যায় বড় নদী নাই এবং তাঁহার নিজের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিও নাই। যে দিবস সংবাদপত্রে পাঠ করিলেন যে, আনন্দমোহন বসু ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেঙ্গ্লার হইয়াছেন, সেই দিবস ভোলাদাদা দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিলেন এবং অর্দ্ধ পয়সার বাতাসা কিনিয়া সন্ধ্যার সময় গ্রামের বালকদিগকে ডাকিয়া হরিলুঠ দিলেন এবং বলিলেন, যে "এখন কল্‌কাতার বেটারা যা'য়া গলায় দরী দিয়া মরুক।" এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, আনন্দমোহন বাবু পূর্ব্ববঙ্গে জন্মিয়াছেন। কিন্তু ভোলাদাদার নিজের বিদ্যা সাধা ঢাকা কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে শেষ হয়, তথাপি তাঁহার

অহঙ্কার এবং সাহসের সীমা ছিল না। গবর্ণমেণ্টের অধীনে এমন চাকরী নাই, যাহার জন্য তিনি দরখাস্ত করেন নাই।

ভোলাদাদা তাঁহার পিতৃ অস্থি গঙ্গায় দেওয়ার জন্য একবার কলিকাতায় গিয়া কয়েক দিবস কালীঘাটের বাঙ্গালপাড়ায় থাকিয়া আসিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষে তিনি গড়ের মাঠ, মনুমেণ্ট, লাট সাহেবের কুঠী, যাদুঘর এবং পশুশালা প্রভৃতি কয়েকটী প্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করিয়াছিলেন এবং দুই একবার সেয়ারের গাড়ীতে কলিকাতায় দুই এক জন লোকের সহিত কথাবার্ত্তাও কহিয়াছিলেন, ইহাতেই তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ করিলেন যে, তিনি কলিকাতার সব দেখিয়াছেন, সব জানেন এবং সকল বড় বড় লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছেন। সেই কথা প্রমাণার্থ তিনি সর্ব্বদা কলিকাতাবাসীর ন্যায় 'গেলুম খেলুম' শব্দ ব্যবহার করিতেন এবং বলিতেন যে উক্ত নগরের সভ্যসমাজে প্রতিনিয়ত থাকাতে তাঁহার কথা ফিরিয়া গিয়াছে। কথায় কথায় কেশব সেন, দেবেন্দ্র ঠাকুর, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ও কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেন যে, ঐ সকল মহোদয়েরা তাঁহাকে পাইয়া বড় সম্মান ও সমাদর করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সুপারিসে তিনি ছোট লাটের দ্বারা এক ডেপুটী মাজিষ্টরী লইতে পারিতেন কিন্তু লবণাম্বু স্থানের জলবায়ু তাঁহার সহ্য না হওয়াতে, তিনি কলিকাতায় দীর্ঘকাল থাকিতে ও ঐ চাকরী হস্তগত করিতে পারিলেন না।

ভোলাদাদার রূপের ব্যাখ্যা কত করিব? শরীর যদি তাঁহার কিঞ্চিৎ হৃষ্টপুষ্ট না হইত এবং অঙ্গে ভদ্রলোকের পরণ পরিচ্ছদ না থাকিত, তাহা হইলে কাওয়া বাগদীরাও তাঁহাকে সজাতির ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিত না; কিন্তু ভোলাদাদার মনে উল্টা ধারণা ছিল, তিনি আপনাকে আপনি বড় শ্রী-যুক্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেন এবং কিসে রূপের আধিক্য হইবে, তৎপ্রতি তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি ছিল। প্রত্যহ প্রাতে স্নানের পরে কোশাকুশী পুষ্পপাত্র প্রভৃতি পূজার সরঞ্জাম লইয়া তাঁহার পৈতৃক দীঘীর ঘাটের আধখানা জুড়িয়া বসিতেন কিন্তু পূজাতে যত সময় ক্ষয় না হইত, তাহার অধিক সময়, তিনি একখানা চারি পয়সার টিনের পুরাতন আয়না সম্মুখে রাখিয়া তাহাতে ঘাড় গুঁজিয়া আপনার মুখ দেখিতে ও ফোঁটা কাটিতে এবং একখানা কাষ্ঠের চিরণীর দ্বারা কেশবিন্যাশ করিতে ক্ষয় করিতেন। ঈশ্বর তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ ও কুরূপ করিয়াছেন বলিয়া ভোলাদাদা সকল সুন্দর ও

গৌরবর্ণ ব্যক্তিকে হিংসা ও দ্বেষ করিতেন। এই জন্য তিনি গৌরাঙ্গদেবকে অবতার স্বীকার করিতেন না, বলিতেন যে, "গোরা ব্যাটা আবার কিসের দেবতা" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রং কাল ছিল বলিয়া তাঁহাকে তিনি পূর্ণাবতার বলিয়া মানিতেন এবং বলিতেন যে, "অবতার ত কৃষ্ণাবতার এবং দেবী ত মা কালী, আর সকল ঝুট।"

পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ নিয়মানুসারে ভোলাদাদাও অত্যন্ত পরিমিত ব্যয়ী ছিলেন এবং মুদ্রা তাঁহার এমনই প্রিয় এবং যত্নের দ্রব্য ছিল, যে তাঁহাকে কেহ কখনও গোটা টাকা ভাঙ্গাইতে দেখে নাই এবং তাহা বাঁচাইবার জন্য এমন কর্ম্ম ছিল না যাহা তিনি না করিতে পারিতেন। তাঁহার হিসাবের একটী দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ অরুচিকর ঘটনার গন্ধ আছে, রুচিধ্বজী পাঠক তজ্জন্য আমাকে কৃপাপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন। ভোলাদাদার পরিবারের মধ্যে কেবল স্ত্রী ও একটী পুত্র। পুত্রটী বড় হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ভোলাদাদা ব্যয়ের ভয়ে তাহার এ পর্য্যন্ত বিবাহ দিতে পারেন নাই। পুত্রের গুণাগুণও পিতার ন্যায়, অতএব যৌবনের দোষ দমন করিতে তাহার ক্ষমতা হয় নাই। ২২।২৩ বৎসরের সময় সে একটী স্ত্রীলোককে টাকা অভাবে তাহার পিতার গৃহের দ্রব্য সকল চুরি করিয়া দিয়া সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ভোলাদাদা দেখিলেন যে, আজ বাক্সটা, কাল পিত্তলের কলসীটা, পরশ্ব তাঁহার স্ত্রীর এক জোড়া নূতন বস্ত্র অন্তর্ধ্যান হইতে লাগিল এবং ভবিষ্যতে আরও ঐরূপ হইবে। পুত্রকে ধমকাইয়া নিবারণ করিবার সাধ্য নাই—বিশেষ লোকে শুনিলে পুত্রকে কেহ দোষী করিবে না, পিতাকেই দোষী সাব্যস্ত করিবে, কারণ তিনি পুত্রের এখন ও বিবাহ দিলেন না এবং সকলে ভোলাদাদাকে পুত্রের বিবাহ দিতে অনুরোধ করিবে, বিবাহ দিতে হইলে অন্যূন ৭।৮ শত টাকা ব্যয় হইবে কিন্তু ভোলাদাদা প্রাণ থাকিতে এত টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন না। এমন সঙ্কটে তিনি উভয়কুল বজায় রাখার জন্য এক মতলব আঁটিয়া এক দিবস পুত্রের অসাক্ষাতে সেই স্ত্রীলোকের বাড়ীতে যাইয়া তাহাকে বলিলেন যে, "বাছা পচা, (ভোলাদাদার পুত্রের আদরের নাম) ছোঁড়া দেখিতেছি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না এবং তুমিও শুনিলাম তাহাকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাক, লুকাচুরি করিয়া তোমরা আর এইরূপে কত দিন কষ্ট পাইবে? আইস তুমি আমার বাড়ীতে যাইয়া থাকিবে চল, স্বামী স্ত্রীর ন্যায় থাকিবে, কোনও কষ্ট হইবে না।"

স্ত্রীলোকটী সামান্য চাকরাণী শ্রেণীর স্ত্রীলোক। সে ভোলাদাদার কথা শুনিয়া হাত বাড়াইয়া চাঁদ পাইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার বিছানাপত্র লইয়া ভোলাদাদার সঙ্গে ভোলাদাদার গৃহে যাইয়া সংস্থাপিত হইল। ভোলাদাদার একটী বেতনভোগী চাকরাণী ছিল—কিন্তু এই স্ত্রীলোকটী আসিবামাত্র ভোলাদাদা চাকরাণীকে জবাব দিয়া স্ত্রীলোকটাকে বলিলেন যে, "বাছা তুমি যেখানে ছিলে, সেখানে ত আপনার কাজ কর্ম্ম করিয়া থাইতে—এই বাড়ীও এইক্ষণে তোমার বাড়ী হইল, অতএব গৃহস্থালী সকল কর্ম্ম কাজ তোমারই নির্ব্বাহ করিতে হইবে।" এইরূপে ভোলাদাদা তাঁহার চাকরাণীর বেতন-গুলি বাঁচাইলেন, এবং পুত্রকে গৃহের দ্রব্য সকল অপচয় করার রোগ হইতে মুক্ত করিলেন। পুত্রের কিম্বা অপর লোকের চক্ষে এই কার্য্যটী যেভাবেই পরিগৃহীত হউক, কিন্তু ভোলাদাদার চক্ষে ইহা একজন বেতনভোগী চাক-রাণীর পরিবর্ত্তে আর এক জন অবৈতনিক চাকরাণী আনিয়া নিযুক্ত করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন ত আপনারা বুঝিলেন যে, আমার ভোলাদাদা কেমন সুবুদ্ধি লোক, তবে আর আমি ব্রাহ্মণভোজনের বিলম্ব করিব না। শুনুন।

পূর্ব্ববঙ্গের এক জেলার সদর স্থানে ভোলাদাদা এক চাকরী উপলক্ষ করিয়া সপরিবার বাস করিতেন এবং সেই স্থানেই উপরি উক্ত ঘটনা হয়। ভোলা দাদা কেবল তাঁহার বেতনের উপরে নির্ভর করিতেন এমন নহে, তাঁহার স্ত্রীর নামে তিনি অনেক টাকার মহাজনীও করিতেন এবং তাহাতে বেতন অপেক্ষা তাঁহার বিলক্ষণ দশ টাকা আয় ছিল। ইতিমধ্যে এক দিবস সংবাদ আসিল যে তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছে। কি করেন এক দিকে স্ত্রীর অনুরোধ আর এক দিকে লোক নিন্দা এড়াইতে না পারিয়া অনেক ধ্বস্তা ধ্বস্তীর পরে ভোলা দাদা একটী ষোড়শ করিতে ও দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে সম্মত হইলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্ব দিবসে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে "ভাই আমি ত এই সকল কার্য্য কখনও করি নাই, অতএব এখানে আসিয়া কাল ব্রাহ্মণগুলিকে খাওয়াইতে হইবে।" তাহাতে আমি কহিলাম যে "তবে কি ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য একটা ফর্দ্দ ধরিতে হইবে?" তিনি উত্তর করিলেন যে কেবল "শাস্ত্র রক্ষার জন্য দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ খাওয়াইতে হইবে, তাহার আবার ফর্দ্দের প্রয়োজন কি, আয়োজন যাহা করিতে হইবে তাহা আমি নিজেই করিব, ভোজনের সময় কেবল তুমি

আসিয়া পরিবেশন করিলেই যথেষ্ট উপকার হইবে।" আচ্ছা বলিয়া আমি সম্মত হইলাম এবং পরদিবস যথাকালে ভোলা দাদার গৃহে গমন করিলাম—দেখিলাম যে ঘরের এক কোণে একখানা ডালাতে আন্দাজ এক সের মোটা লাল চিঁড়া ও ছোট এক মালসা দধি, এক সের ক্ষীর, এক সের কদর্য্য গুড় ও এক সের অপকৃষ্ট চিনি, কয়েক খানা কলা পাতা ও কয়েক খানা কুশাসন সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ আয়োজনের স্বল্পতা দেখিয়া ইহার দ্বারা ১২ জন ব্রাহ্মণের ভোজন কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়া কঠিন বলিয়া, আমি প্রকাশ করাতে, ভোলা দাদা বলিলেন যে "না হয় আরও জিনিস বাড়ীর মধ্যে আছে আবশ্যক হইলে আনাইয়া কার্য্য সমাধা করা যাইবে।" ইহা শুনিয়া আমি নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম, ক্ষণ কাল বাদে দেখিলাম যে একটী লাঠিতে ভর দিয়া একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভোলা দাদা তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং মুখুর্য্যা মহাশয় বলিয়া আহ্বান করিলেন। মুখুর্য্যা মহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে অনেক কষ্টে আসনের উপর বসিলেন, দেখিলাম যে তাঁহার হস্ত পদ মাংস শূন্য, উদরটি স্ফীত এবং সেই উদরের বাম ভাগের উপরে তিন চারিটী ক্ষত স্থানে তৈলাক্ত, তলায় পটি বসান আছে, মুখের রং পাণ্ডুবর্ণ এবং শরীরে বিন্দুমাত্র রক্তের চিহ্ন নাই। জানিলাম যে ব্রাহ্মণটি প্লীহা অগ্রমাস ও যকৃৎ রোগে আক্রান্ত এবং তাঁহার যে অবস্থা, তাহাতে যে তিনি আর দীর্ঘ কাল এইরূপ নিমন্ত্রণ খাইতে আসিতে পারিবেন, এমন বোধ হইল না। তাঁহার পরে দুই ব্যক্তি 'ক্কক ক্কক' করিয়া কাশিতে কাশিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, ইহারা উভয়েই অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ, পঞ্জরের অস্থি সকল বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা এক একটি করিয়া গুণিতে পারা যায়, প্রত্যেকের গলায় কয়েকটি মাদুলী এবং বুকে পুরাতন ঘৃত লেপিত ছিল, ইহাদের এক জনের যক্ষ্মা ও আর এক জনের হাঁপানী কাশী। এই দুই ব্রাহ্মণ বসিতে না বসিতে চতুর্থ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার উদরী রোগে পেট ফুলিয়া ঢাক হইয়াছে এবং তাহার উপরে সবুজ বর্ণের শিরগুলি ভূগোলের মানচিত্রের নদীর ন্যায় অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ বিলম্বে পঞ্চম ব্রাহ্মণটী কর্ণের উপরে পৈতা উঠাইয়া "ভোলা বাবু ঘটি কৈ? জলপাত্র কৈ?" বলিয়া দ্রুতবেগে ঘরের মধ্য হইতে একা গাড়ু লইয়া বাহিরে গেলেন, বুঝিলাম যে ইনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছেন। ষষ্ঠ ব্যক্তি যিনি আসিলেন তাঁহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ

দ্বযে ভেড়াব বোমেব এক একটী অঙ্গুরী এবং বাম কর্ণে সূত্র দ্বাবা এক কড়া কানা কড়ী ঝুলিতেছে। সপ্তম ব্যক্তি অতিশয় দুর্ব্বল, দুই বাহুতে দুইটী গুল বসান আছে এবং দন্তগুলি মিসী দ্বাবা কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া গিয়াছে, তিনি বলিলেন যে বস-বাতে কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। অষ্টম ব্যক্তির আধ কপালে শিরঃপীড়া। নবম ব্যক্তির অম্ল শূল বোগ ; আহার করিলেই বমন হইয়া সকল উঠিয়া যায়, কখন কিছুমাত্র ক্ষুধা হয় না। দশম ব্যক্তিব বিসূচিকা বোগে জীর্ণ কবিবার শক্তি এককালেই লোপ পাইয়া গিয়াছে, এবং আহাবের কিছুমাত্র অনিয়ম হইলেই পীড়ার আধিক্য হয় ; এই যে দুই প্রহর বেলা হইয়াছে তথাপি তিনি যেন সদ্য আহাব কবিয়াছেন এইরূপ ঢেকুব তুলিতেছেন। একাদশ ব্যক্তিব যদিও যথার্থ এবং দ্রষ্টব্য কোন পীড়া ছিল না, তথাপি তিনি মনে মনে আপনাকে সর্ব্বদাই অত্যন্ত পীড়িত বিবেচনা কবিতেন এবং নিয়মিত আহার্য্য লঘু দ্রব্য ভিন্ন নূতন কোন দ্রব্য খাইতে হইলেই তাহাব যৎপরোনাস্তি আশঙ্কা হইত। দ্বাদশ ব্রাহ্মণটী যুবা এবং বলিষ্ঠ ছিলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাব বড ওলাউঠা হইয়াছিল, এবং সেই পর্য্যন্ত তিনি অত্যন্ত বাছিয়া গুছিয়া এবং সাবধান হইয়া আহাব কবেন। এই দ্বাদশটী মূর্ত্তি সমবেত হইলে পবে ভোলাদাদা আমাকে তাঁহাদেব শুনাইয়া বলিলেন যে, "দেখ ভায়া, ইহাঁবা সকলে বড় সম্রান্ত এবং মহামান্য ব্রাহ্মণ, অশূদ্র-পরিগ্রাহক, কাহারও বাড়ীতে আহাব করেন না, কেবল আমাকে শ্রদ্ধা করিয়া আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তুমি ঠাকুরদের খুব করিয়া খাওয়াইবা যেন কোন বিষয়ে ত্রুটি হয় না।" কিন্তু আমি দেখিলাম যে, তাঁহাদেব মধ্যে কেহই খুব কবিয়া খাইবার লোক নাই, অধিকাংশেব একখানা বাতাসা খাইয়া হজম করা দুষ্কব, তবে বলিতে পাবি না, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ ; ব্রাহ্মণ না পারেন এমন কর্ম্ম নাই ; সহস্র পীড়িত হইলেও ব্রাহ্মণ ফলাবে মজবুত। সে যাহা হউক, পরন্তু আমি পরিবেশন কবিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণের পাতায় চিঁড়া দিতে উদ্যত হওয়ায়, তিনি পাতাব উপরে দুই হস্ত বিস্তীর্ণ করিয়া চিঁড়া দিতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মণ যতই নিষেধ কবেন, ভোলাদাদা ততই "দেও দেও" বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করেন। ব্রাহ্মণ অবশেষে উপুড় হইয়া পড়িয়া চীৎকার শব্দে বলিতে লাগিল যে, "ভোলা বাবু রক্ষা কর, আমাকে চিড়া দিও না, চিড়া খাইলে অদ্যই ওলাউঠা হইয়া মবিব, আমি কোথাও নিমন্ত্রণ খাইতে যাই না, কেবল

তোমার কয়েকটা টাকা ধারি বলিয়া সেই খাতিরে তোমার নিমন্ত্রণে আসিয়াছি, নচেৎ আমার এখন নিমন্ত্রণ খাওয়ার সময় নহে, রক্ষা কর চিড়া দিও না” তথাপ ভোলাদাদার “দেও দেও” শব্দ থামে না। এইরূপ আরও কয়েক জনে চিঁড়া লইলেন না, যাহারা লইলেন, তাহারা কেহ একমুষ্টি কেহ অর্দ্ধমুষ্টি লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। তামাসা দেখিলাম যে, যাঁহারা নিষেধ করেন, তাঁহাদের বেলাই ভোলাদাদা বারম্বার “দেও দেও” বলিতে লাগিলেন, কিন্তু যাঁহারা লইলেন, তাঁহাদের সময় তিনি একটী কথাও বলিলেন না। পরন্তু দধি দেওযার সময়ও ঐরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইল। এক বহুমূত্র রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সকলেই দধি দেওয়ার সময় হস্তদ্বারা পাতা ঢাকিয়া রহিল—বিশেষ যাহাদের কাশী ও বসবাত, তাঁহারা আমি তাঁহাদের নিকট দধি লইয়া উপস্থিত হইবামাত্র “না না আমাদের দৈ দিও না, দৈ আমাদের বিষ, দৈ খাইলে মরিয়া যাইব” বলিয়া নিষেধ করিলেন। ক্ষীর সম্বন্ধেও তদ্রূপ কেহ দুই ফোঁটা কেহ এক ফোটা মাত্র লইলেন। বস্তুত অধিকাংশ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এক কালেই কিছু খাইলেন না, কেবল নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য এক চিমটী গুড় কিম্বা চিনি মুখে দিয়া এক ঢোক জল পান করিলেন। এবম্প্রকারে ভোলা দাদার শ্বশুরের শ্রাদ্ধে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজনের কার্য্য সমাধা হইল। পরে জানিলাম যে উহাঁরা সকলেই ভোলা দাদার খাতক এবং সেইজন্য তাঁহারা ভোলা দাদাকে সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত আসিযাছিলেন; প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের কেহই নিমন্ত্রণ খাইবার ব্যক্তি নহেন। দেখিলাম যে আহারের যে সকল দ্রব্য দেখিয়া আমি অতি স্বল্প বিবেচনা করিয়াছিলাম, ফলে তাহা প্রচুর অপেক্ষাও অধিক হইল কারণ সকল দ্রব্যই কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া রহিল। ব্রাহ্মণেরা চলিয়া যাওয়ার পরে ভোলা দাদা হাস্য বদনে আমাকে বলিলেন “দেখলে ভায়া কেমন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলাম, শাস্ত্রও রক্ষা হইল এবং পয়সাও অধিক খরচ হইল না, এইরূপ না করিলে গৃহস্থলি চলে না।” আমি ভোলা দাদার পদধূলী লইয়া প্রস্থান করিলাম।

শ্রীমতী রাধিকা নিকুঞ্জে।

তপন-তনয়া-তটে, মঞ্জু-কুঞ্জ-কাননে
মৃদুল-মলয়ানিলে, কুসুম-কামিনী দু'লে
মধুকর-করে ধরি, হাসি,'ও কি বলিছে!—
—রাধিকারমণে মোর তবে বুঝি দেখেছে!
মাধব মাধব-কথা, অথবা এনেছে তথা
কি বলে উহারা যাই চুপে চুপে শুনিগে,—
—রাধিকা-হৃদয়-নিধি পাই যদি দেখিগে!
ওহে শ্যাম শশধর রাধিকার প্রীতি-কর,
সুখের কৌমুদীরাশি তোমা সনে গিয়াছে,—
—ঘোর-তর অন্ধ-কারে ব্রজ ধাম ডুবেছে!
না শুনি মুরলী ধ্বনি, না উজানে সে তটিনী,
শিখিনী দুখিনী এবে নৃত্য করা ভুলেছে!—
—তমাল-কদম্ব-তল শোভাহীন হয়েছে!
আহা মরি একি একি, পত্রের মাঝারে থাকি'
"কুহু—কুহু" রবে ওই কে সহসা ডাকিল।—
—নিকুঞ্জ-বিহারী মোর নিকুঞ্জে কি আসিল?
হৃদয়-উজ্জ্বল মণি, এসেছ এসেছ তুমি!
মুরলী সুরবে নাথ দাসী তোমা চিনেছে!—
—শ্রবণ-রঞ্জন-ধ্বনি জ্ঞান-হারা করেছে!
যাই যাই ত্বরা করি, হেরিগে প্রাণের ছবি,
সুচারু-বদন-পদ্ম কত শোভা ধরেছে!—
—না হেরি'এ অভাগীরে বুঝি ম্লান হয়েছে!
সখী-গণ কোথা এবে, আয় লো আয় লো সবে,
হৃদয়-পিঞ্জর পাখী চুপে চুপে ধরিবে!—
—জানিলে রাখালগণ কাড়ি' লয়ে পলাবে!
এই যে এই যে পাখী, পত্রের মাঝারে থাকি,
"কুহু কুহু" রবে এই জগতে মাতায় লো!—
বেণুর সুরব হেন, মম মনে ভায় লো!

কপটতা করি' কালা, ছলিতে ব্রজের বালা,
বুঝেছি বুঝেছি নাথ, বিহঙ্গিনী হয়েছে!—
—"কৃষ্ণ-কালী-রূপ" ধরি' মোরে রক্ষা করেছে!
দাঁড়ায়ে তমাল তলে, ডাকি "নাথ—নাথ" ব'লে
অশ্রুবারি দরদরি কপোলে তাঁহায় হে,
—শরত সুধাংশু মুখে চুম্বিতে যাহায় হে!
নবজলধর-রূপ, ব্রজ-বধূ-কাম-কূপ
আহা মরি সহচরি ত্বরাকরি আয় লো!
—এবার ধরিলে শ্যামে কেবা লয়ে যায় লো।
মোর তরে ঝুরি ঝুরি, আঁখি দুটী আহা মরি,
তরুণ-অরুণ-ভাতি দেখ দেখ হয়েছে।—
সখি সখি কৃষ্ণ-পাখী, এ নহে লো কৃষ্ণ পাখী,
"কুকু—কুকু—কুকু" বলি ওই দেখ উড়িল।—
—কোকিলা সরলা বালা হৃদে বাজ হানিল।
উড়িল মাধব-ঘোষা, অধীরা মাধব-যোষা,
"হায় নাথ কোথা তুমি" বলি ভূমে পড়িল।
—গলিত-কবরী মরি ধূলি মাখা হইল।

মাক্‌বেথ ও হাম্‌লেট।

৬

পঞ্চমদৃশ্যে প্রান্তরভূমিতে ডাকিনীরা বিচরণ করিতেছে। এবার তাহাদের সঙ্গে তাহাদের পরিচালিকা হিকেট আছে। দুরাকাঙ্ক্ষার পরিচালিকা আর কি? পৈশাচিকী মায়া। মায়া বলিয়া দিল 'এবার মাক্‌বেথকে এমনই করিয়া ভেল্‌কি দেখাইতে হইবে, যেন—

কুহকের কুহেলিতে হয়ে সে আচ্ছন্ন,
একেবারে হয় তাতে পুরা মতিচ্ছন্ন।
অদৃষ্ট ঠেলিবে পায়ে, না ডরিবে মরণে,
দয়াধর্ম্ম ভয়শূন্য আশার ছলনে।

'আত্মবলে করিবে সে অটল বিশ্বাস,
আত্মম্ভর (ই) মানুষের করে সর্ব্বনাশ।'

বাস্তবিক আত্মনির্ভরে আপনাকে নিরাপদ মনে করাই মানুষের বিষম ভ্রম, ঐ বিশ্বাসই মানুষের প্রধান শত্রু, উহাতেই সর্ব্বনাশ হয়। স্বাধীন চিন্তা, স্বাবলম্বন, স্বানুবর্ত্তিতা, সহজ জ্ঞান, বিবেক—* বলিয়া যতগুলি ভাব জাহাজে আমদানি হইয়াছে—এ সকলই আত্মম্ভরিতার নামমাত্র। ঐ গুলাই আমাদের প্রধান শত্রু। বালককালে পিতামাতা—উপাধ্যায়, আচার্য্য,—উপদেষ্টা ও দৃষ্টান্তদাতার উপর ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, নির্ভর করিতে হয়। গৃহস্থ হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ব্যবহারশাস্ত্রে (আইনে) নির্ভর করিতে হয়। যে গৃহস্থাশ্রমের উর্দ্ধে যাইতে পারে—সে জগদীশ্বরে নির্ভর করে। আত্মনির্ভরের স্থল নাই—যে মায়ামোহে ভ্রান্ত, সেই আপনাতে নির্ভর করিয়া নিরাপদ মনে করে। কিন্তু যে মহাপাপী, সে ত নীতি মানে না, ধর্ম্ম মানে না—মাকবেথ নিজেই বলিয়াছেন, † সে প্রাণ ভরিয়া একবার বলিতে পারে না, যে ভগবান্ আমাকে রক্ষা কর। সুতরাং তাহার ত আর নির্ভর করিবার কিছু নাই—কাজেই সে আত্মনির্ভর করে সুতরাং সর্ব্বনাশের পথে সহজেই যায়, মাকবেথ যাইতে বসিয়াছে।

ষষ্ঠ দৃশ্যে দুই জন ওমরা ডঙ্কান্ ও বাঙ্কোর হত্যার কথা ভাবিতেছেন—দুর্ব্বৃত্ত মাকবেথের হস্তে দেশের দুরবস্থার কথা চিন্তা করিতেছেন; মাক্‌ডফ্ ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়াছে, তিনি যেন ডঙ্কানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাল্‌কোমকে লইয়া সত্বর দেশে ফিরিয়া আসিয়া, অভাগা মাক্‌বেথের হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধার করেন তাহারই জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ইহাতেই তৃতীয় অঙ্কের শেষ হইল।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে এক গিরিগুহার অভ্যন্তরে বৃহৎ কটাহ টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। সেই তিনটা ডাকিনী ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গুহামুখে বাহিরে বজ্র গর্জ্জন করিতেছে।

---

* বিলাতী আমদানি ছাড়া দেশী বিবেকও আছে, তাহার অর্থ—এমন শক্তি যাহার দ্বারা একটি হইতে অন্যটিকে পৃথক করা যায়—শক্তির নাম বিবেক—কাজের নাম বিবেচনা। মন্দ কাজ করিতে গেলে, ভিতরে যে খিট্‌খিট্‌নি হয় তাহা আত্মগ্লানি, ভাল কাজে যে স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা আত্মতুষ্টি। উভয়ই আত্মার ভাব মাত্র।

† ৫২০ পৃষ্ঠা দেখ।

ডাকিনীরা জলন্ত কটাহে নানা প্রকার টোট্‌কা টাট্‌কা ফেলিতেছে—ও সেই কড়া ঘিরিয়া ঘিরিয়া গান করিতেছে। এবার সে সাবেক ধুয়া বদলাইয়াছে। এখন আর বলে না—

সুন্দরকে মন্দ ভাবি, মন্দকে সুন্দর।

ওত পাপীর প্রথম অবস্থার মনের ভাব ; এখন কি বলিতেছে শুন,—

ঘুরিবে, ফিরিবে,—খাটিবে, খুটিবে,—
আগুন জ্বলিবে,—কড়া ফুটিবে।

এই কথাই ঠিক। এখন হইতে দেখিবে মাকবেথে পাপের ছটফটানি ধরিয়াছে ; মাক্‌বেথ যতই ঘুরিতেছেন, ফিরিতেছেন, শাসন করিতেছেন, সংগ্রাম করিতেছেন, তাঁহার মনের আগুন ততই জ্বলিয়া উঠিতেছে—হৃদয় কটাহ ততই টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে। মহাপাপের ঐ আর এক সাজা! সৎপথে থাকিলেও নানারূপ শোক-দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণা আছে—কিন্তু পাঁচ কাজে তাহার অনেকটা ভুলিয়া থাকা যায়। কিন্তু মহাপাপী—

যতই—ঘুরিবে, ফিরিবে,—খাটিবে, খুটিবে।
ততই—আগুন জ্বলিবে,—কড়া ফুটিবে॥

হিকেট আসিয়া দেখিল, ডাকিনীরা বড়ই যোগাড়যন্ত্র করিয়াছে—হিকেট বড় খুসী হইল। গান জুড়িয়া দিল—এমন সময় মাক্‌বেথ আসিল। সে বার ডাকিনীরা সুযোগ বুঝিয়া মাক্‌বেথকে দেখা দিয়াছিল, এবার মাক্‌বেথ স্বয়ং অভিসার করিয়াছে।

মাকবেথ বলিলেন, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তোমাদিগকে তাহার উত্তর দিতে হইবে। ডাকিনীরা জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের মুখে উত্তর শুনিবে, না আমাদের পরিচালক উপদেবতাগণের স্থানে শুনিবে?' মাকবেথ বলিলেন, 'তাহাদের নিকটেই শুনিব।' তখন ডাকিনীরা সকলে মিলিয়া প্রেতযোনিদের আহ্বান করিতে লাগিল।

বজ্রধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই এক সশস্ত্র মূর্ত্তি দেখা দিল। মাক্‌বেথ প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন, ডাকিনীরা বলিল, "প্রেতমূর্ত্তি তোমার মনের কথা বুঝিয়া নিজেই বলিবে, তোমাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না"

প্রেতমূর্ত্তি বলিল—"মাক্‌বেথ সাবধান! মাকডফকে অবধান করিও।" মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

আবার বজ্রগর্জন হইল। রক্তাক্ত এক বালক হইল। বলিল, "মাক্‌বেথ মাভৈঃ নারী জঠর-প্রসূত কেহ তোমার কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না" বলিয়া অন্তর্হিত হইল।

আবার বজ্রের হুঙ্কার। মুকুটমস্তক এক বালক, হস্তে একটি বৃক্ষ ধরিয়া আছে; এই মূর্ত্তিতে তৃতীয় প্রেত আবির্ভূত হইল; বলিল, "মাক্‌বেথ কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করিও না যতক্ষণ বর্ণান বন ডন্‌সিনেন পর্ব্বতে না আসিবে, ততক্ষণ তোমাব পরাজয় নাই।" মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল, মাক্‌বেথ মহা আনন্দিত হইলেন! বলিলেন, "তোমবা পাব যদি আর একটি বিষযে আমরা কৌতূহল পবিতৃপ্ত কব। বল বাঙ্কোব বংশ এই রাজ্যে বাজা হইবে কি না?" ডাকিনীরা দৃশ্যপটে দেখাইতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে আট জন বাজা দেখা গেল, শেষের হস্তে একখানি দর্পণ আছে—সেই দর্পণে আব কত বাজার মূর্ত্তি রহিয়াছে—পশ্চাতে রক্তাক্ত বাঙ্কো মাক্‌বেথের পানে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে যাইতেছেন। ঈর্ষায মাক্‌বেথের হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, ডাকিনীরা তাহার উপব নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল; মাক্‌বেথ ঈর্ষায় ক্ষোভে বিহ্বল—একটু পবে চাহিয়া দেখেন ডাকিনীবা অন্তর্হিত হইযাছে। 'গুহাব বাহিরে কে আছে?' বলিয়া মাক্‌বেথ জিজ্ঞাসা কবিলেন। বাজসহচব লেনক্স আসিলেন বলিলেন "ডাকিনীদেব দেখিয়াছ?" লেনক্স বলিলেন "না।" "তোমার ঐ দিক দিয়া তাহাবা আসে নাই?" লেনক্স আবাব বলিলেন "না।" তখন মাক্‌বেথ দন্ত কডমড়ি কবিযা বলিলেন, "তবে দেখিতেছি, তাহাবা বায়ুপথে যাতায়াত কবে—তাহাদের গম্য পথেব বায়ু উচ্ছিন্ন যাউক ও তাহাদেব কথায় যে বিশ্বাস করে সেও উচ্ছিন্ন যাউক।"

মাক্‌বেথ! এখন যাই ডাকিনীদের প্রদর্শিত পরিণামে বিশ্বাস করিতে তোমার কষ্ট হইতেছে, তাই তুমি শাপাতাপা করিতেছ—কিন্তু ঐ ডাকিনীরা যখন তোমাকে ভাবি নবপতি বলিয়া সম্বোধন কবে, তখন বড় আনন্দে বিশ্বাস করিয়াছিলে! 'যে ডাকিনীদের কথায় বিশ্বাস করে, সে উচ্ছিন্ন যাউক, এ কথা তুমি আর কাহাকে বলিতেছ? তুমিত তোমার নিজের কথারই বলবন্ত প্রমাণ!

মাক্‌বেথ লেনক্সকে জিজ্ঞাসা কবিলেন "অশ্বক্ষুর ধ্বনি শুনিতে ছিলাম—কে আসিয়াছে?" "দুই তিন জন দূত আসিয়াছে—তাহাদেব সংবাদ এই যে মাকডফ ইংলণ্ডে পলায়ন কবিযাছে।" তখন মাক্‌বেথ ভাবিতে লাগিলেন

'দেখ মাক্‌ডফকে হত্যা করিব মনে করিয়াছিলাম, বিলম্ব করাতেই কার্য্যসিদ্ধি হইল না এখন হইতে হৃদয়ে যখন যাহা স্থির করিব কার্য্যে তখনই তাহা করিব। মাক্‌ডফ্ পলাইয়াছে, আচ্ছা! তাহার স্ত্রী-পুত্র ত আছে, সকলকে প্রাণে নষ্ট করিব। মিথ্যা নির্ব্বোধের মত কতকগুলা সাহঙ্কার সংকল্প করিয়া ফল কি? সদ্যোজাত সংকল্প সদ্য সদ্যই কার্য্যে সুসিদ্ধ করা আবশ্যক।' এই বলিয়া আগন্তুক দূতেদের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ—লেনক্সের সহিত প্রস্থান করিলেন। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য শেষ হইল। পাঠক এই সময়ে একবার মাক্‌বেথ নাটকের মূল কথা স্মরণ করিবেন—শুভাশুভস্য শীঘ্রং।

দ্বিতীয় দৃশ্য মাক্‌ডফ ভবনে। গৃহিণীকে না বলিয়াই মাক্‌ডফ ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়াছেন। গৃহিণী আপনার শিশু সন্তানের সহিত সেই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। ছেলেটি বড় চালাক চতুর, মায়ের সঙ্গে কেমন কথায় কাটাকাটি করিতেছে—মাক্‌বেথের প্রেরিত ঘাতুকগণ প্রবেশ করিল—মাতৃ-সমক্ষে সেই অপোগণ্ড শিশুকে হত্যা করিল, লেডি মাক্‌ডফ পালাইয়া গেলেন, ঘাতুকেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মাক্‌বেথ যে বলিয়াছিলেন, মাক্‌ডফের পুরী সগোষ্ঠী নষ্ট করিবেন, তাহাই হইতে লাগিল। নবহত্যা মায়াচরী সহস্র করাল মূর্ত্তিতে স্কটলণ্ডের গৃহে গৃহে বিচরণ করিতে লাগিল।

তৃতীয় দৃশ্য ইংলণ্ডে রাজভবনে। মালকাম্ মাকডফের সহিত পরীক্ষা করিতেছেন। দেখিলেন সেই হৃদয় দেশভক্তি পরিপূর্ণ, দয়া মায়ায় আপ্লুত। উভয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে, লর্ড রস আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, মাক্‌বেথের আদেশে মাক্‌ডফের স্ত্রী-পুত্র কন্যা দাসদাসী সকলই হত হইয়াছে। 'হা ভগবান্' বলিয়া মালকোম শিহরিয়া উঠিলেন। মর্ম্মাহত মাক্‌ডফ মুখ নত করিয়া চক্ষু আবরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"সন্তানগুলি সব গিয়াছে?" ক্ষণপরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার স্ত্রীও গিয়াছেন?" রস্ বলিলেন—আমি ত বলিয়াছি—কিছুই নাই," তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"মাক্‌বেথের সন্তান নাই। হায় হায়, একবারে কচিকাচা ছেলেগুলি—তাদের প্রসূতি শুদ্ধ সব গেল!' তখন মাক্‌ডফ্ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি একবার সম্মুখযুদ্ধে মাক্‌বেথের হৃদয়ে আপনার অস্ত্র পরীক্ষা করিবেন। এক অভিমন্যুবধে ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞা শুনিয়াছেন, এখন সর্ব্বস্ব খোয়ায়ে মাক্‌ডফের প্রতিজ্ঞা দেখিলেন। এই প্রতিজ্ঞায় চতুর্থ অঙ্ক শেষ।

পঞ্চম অঙ্ক রাজপ্রাসাদে। রাজমহিষী লেডি মাক্‌বেথ অসুস্থা হইয়াছেন। রাত্রিকালে তাঁহাকে 'নিশিতে পায়,' তিনি গাঢ় নিদ্রিতাবস্থায় বিচরণ করেন, কথা কহেন—কত কি করেন। এইরূপ রোগের সময় রোগিণীকে দেখিবার নিমিত্ত একজন চিকিৎসক প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন; প্রথম দৃশ্যে রাজ্ঞীর একজন পরিচারিকার সহিত তাঁহার ঐ বিষয়েই কথোপকথন হইতেছে। এমন সময়ে জ্বলন্ত বাতি হাতে লইয়া লেডি মাক্‌বেথ শনৈঃ শনৈঃ আসিতেছেন। লেডি মাক্‌বেথ সংজ্ঞাশূন্য, অথচ চক্ষু চাহিয়া আছেন; কিন্তু আপনার খেয়ালে যাহা কিছু দেখিতেছেন, তাহা ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছেন না। চিকিৎসক দেখিতে লাগিলেন, লেডি মাক্‌বেথ বাতি রাখিয়া হাত ধুইবার মত ভাবে হাত কচ্‌লাইতেছেন। পরিচারিকা বলিল, যখনই নিশিতে পায়, তখনই ঐরূপ করিয়া থাকেন। তাহার পর উভয়ে শুনিতে লাগিলেন, লেডি মাক্‌বেথ আপনা আপনি বলিতেছেন;—

এই যে আর একটা দাগ রহিয়াছে!
দূর ছাই! পোড়া দাগ ধুলেও যায় না।

(যেন ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া)

এক—দুই—এইত কাজের সময়;
নরকের কি আঁধার! ছি ছি—প্রভু
তুমি যোদ্ধা—তুমি বীর!—তুমি ভীত হবে?
কে জানিল, না জানিল, তাহাতে ক্ষতি কি?
আমাদের রাজশক্তির প্রতিরোধ ত নাই।
—কে জানিত বৃদ্ধ দেহে অত রক্ত ছিল?

চিকিৎসক পরিচারিকাকে ইঙ্গিত করিলেন।

লেডী মাক্‌বেথ বলিতে লাগিলেন;—

মাক্‌ডফের গৃহিণী—কোথায় এখন তিনি?
না—এই হাত দুটা হবে না পরিষ্কার!
আর কেন প্রভু? ওসব কথা আর কেন?
ওরূপে চমকি তুমি সব্ নষ্ট করিবে!

(হস্তের ঘ্রাণ লইয়া)

রক্তের দুর্গন্ধ হস্তে এখনো রয়েছে,
আরবের গন্ধদ্রব্যে, হবে না সুগন্ধ!
ওহ্!

চিকিৎসক। কি বিষম শ্বাস! ক্ষত বক্ষে কি যন্ত্রণা!

পরিচারিকা। বাহ্যিক মর্য্যাদা সঙ্গে চাহিনা কখন
অন্তরের ঐ ভার করিতে ধারণ!

লেডী মাক্‌বেথ বলিতে লাগিলেন,—

ভীত কেন? হাত ধোও, পর রাত্রিবাস—
বার বার বলিতেছি বাঙ্কো কবরেতে,
কবর হইতে কেহ আসিতে পারে না।
শোও গিয়া—শোও গিয়া—দ্বারে শব্দ হয়—
এসো, হাত ধরো—যা হবার তা হয়েছে
ফিরে পাওয়া যাবে না—শোও গিয়া—শোও গিয়া।
মাক্‌বেথ গৃহিণীও গিয়া শয়ন করিলেন।

চিকিৎসক বলিলেন ;—

"দৈব বল আবশ্যক—ঔষধে হবে না।" এই স্থলেই প্রথম দৃশ্যের শেষ হইল। বস্তুবিক পাপের পরিণাম রূপ মহাব্যাধির জন্ত ঔষধ নাই।

ইহার পর তৃতীয় দৃশ্যে মাক্‌বেথ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ;—

জান না কি বৈদ্যরাজ শুশ্রূষা করিতে
পীড়িত মনের? উপাড়িতে স্মৃতি ক্ষেত্র
হতে বদ্ধমূল শোক তরু? মুছিবারে
মস্তিষ্কে অঙ্কিত যত কলঙ্ক কালিমা?
দুর্ভার হৃদয়ের ভার খসাইয়া,
পার না কি বিস্মৃতির স্নিগ্ধ তৈল দানে
জুড়াইতে জীবনের জ্বলন যন্ত্রণা?

চিকিৎসক উত্তর দিলেন ;—

আমাদের হাত নাই—অই সব স্থলে,
আপন চিকিৎসা রোগী আপনি করিবে।

পূর্ব্বের কথার সহিত এই কথাটি গ্রহণ করিতে হইবে ;—

"দৈববল আবশ্যক—ঔষধে হবে না ;"
"আপন চিকিৎসা রোগী আপনি করিবে।"

মহাপাপের পরিণামে যে সকল মহাব্যাধির উৎপত্তি হয়—এক মাত্র দৈব-বলের আশ্রয় লইয়া রোগীই কেবল সেই রোগের চিকিৎসা করিতে পারে।

এরূপ রোগী যদি আপনার রোগ বুঝিতে পারে—যদি বুঝিতে পারে, যে পাপের পরিণামে তাহার মানসিক পীড়া হইয়াছে, যদি তাহাতে ক্রমে তাহার মনে অনুশোচনার উদয় হয়—ক্রমে ঘোরতর আত্মগ্লানিতে আক্রান্ত হয়—ক্রমে অগাধ নিরাশে নিমজ্জিত হয়,—যদি সেই অনন্ত নিরাশার মধ্য হইতে একবার অনন্ত মঙ্গলকে স্মরণ করিয়া বলিতে পারে—

মাধব মঝু পরিণাম নিরাশা!
তুহু জগতারণ, দীন-দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।

তবেই রোগী সেই দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া, আপনার চিকিৎসা আপনি করিতে পারে। সকল দেশেই একই রূপ ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় দৃশ্য, ডন্‌সিনেন্‌ নিকটস্থ পল্লীপ্রদেশ। লেনক্স প্রভৃতি চারিজন প্রধান সর্দ্দার বহুতর সেনা-সমেত মাক্‌বেথ হস্ত হইতে দেশোদ্ধারার্থ আগত-প্রায় মাল্‌কোমের সহিত যোগ দান করিতে যাইতেছেন। অনুসঙ্গ ক্রমে মাক্‌বেথের মনের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। মাক্‌বেথ দুঃসাহসে উন্মত্ত প্রায় হইয়াছে, ক্ষিপ্ত সিংহবৎ গর্জ্জন করিতেছে, রাজ্যে আধিপত্য নাই, সেনা মধ্যে সুশৃঙ্খলা নাই। মাক্‌বেথ গুপ্ত বিদ্রোহী—লক্ষ লক্ষ প্রকাশ্য বিদ্রোহী তাহার বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছে।

তৃতীয় দৃশ্যে, ডন্‌সিনেনস্থ রাজভবনের মধ্যে মাক্‌বেথ চিকিৎসক এবং অনুচর বর্গ। হিরণ্য কশিপু আপন মৃত্যু-সাধন দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে ব্রহ্মার বর পাইয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয় ছিল, মাক্‌বেথ কিন্তু ডাকিনীদের ভবিষ্যদ্বাণীয় বিশ্বাস করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না। বার বার সেই কথা দুইটার জল্পনা করিতেছে—বলিতেছে বর্ণাম্‌ বন ডন্‌সিনেনে না আসিলে, আমার আর ভয় কি? আর মালকোম্‌কেই বা ভয় কি? সে ত নারীগর্ভজাত"। একজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল, দশ হাজার ইংরেজ ফৌজ আসিতেছে মাক্‌বেথ দূতকে দূর করিয়া দিল। আপনার বিষম পরিণাম একবার চিন্তা করিল ভাবিল এ বয়সে কোথায় মান সম্ভ্রম—স্নেহ ভালবাসা—বন্ধু বান্ধব থাকিবে—না চারি দিকেই শত্রু—শত্রু—বিসম্বাদ এবং অভিসম্পাৎ। মাক্‌বেথ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে—কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না—ভৃত্যকে ডাকিয়া সমর-সাজ আনিতে বলিল। চিকিৎসককে একবার গৃহিণীর কথা জিজ্ঞাসা করিল—যখন চিকিৎসক বলিল—'আপন চিকিৎসা রোগী আপনি করিবে।' তখন চিকিৎসককে ভর্ৎসনা করিল, বলিল—'কুক্কুরে ঔষধ তব কর প্রক্ষেপণ।' তাহার পর মাক্‌বেথ একবার চর্ম্ম বর্ম্ম ধারণ করে, আবার খুলিয়া ফেলে, আবার পরাইতে বলে, অন্তর্দাহে মাক্‌বেথ অস্থির, ডাকিনীরা শেষ ধূয়ায় তাহা বলিয়া দিয়াছে।

ঘুরিবে, ফিরিবে,—খাটিবে, খুটিবে—
আগুণ জ্বলিবে—কড়া ফুটিবে।

মাক্‌বেথের হৃদয়ে আগুণ জ্বলিতেছে, বাহিরে তাহার টগবগানি দেখা যাই-তেছে, মাক্‌বেথের অস্থির অবস্থা প্রদর্শনে তৃতীয় দৃশ্যের শেষ।

চতুর্থ দৃশ্যে, বর্ণাম কাননের নিকট দিয়া সসৈন্য মালকোম্‌ যুদ্ধ সজ্জায় অগ্রসর হইতেছেন; মালকোম্‌ আদেশ দিলেন প্রত্যেক সৈনিক বর্ণাম বন হইতে এক একটি বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া হস্তে লইয়া অগ্রসর হৌক। তাহাতে শত্রু পক্ষে সৈন্য সংখ্যা বুঝিতে পারিবে না এবং রৌদ্র নিবারিত হইবে। সৈন্যরা তাহাই করিতে লাগিল।

মাক্‌বেথ! যে মূর্ত্তি তোমাকে ভবিষ্যদ্‌ ভাষায় বলিয়া যায়, 'বর্ণাম্‌ জঙ্গল ডন্‌সিনেনে না আসিলে, তোমার পরাজয় হইবে না'—তাহার হস্তে একটি বৃক্ষ শাখা ছিল মনে পড়ে কি? তাহার হস্তে বৃক্ষ শাখা কেন? তাহা বুঝিবার

চেষ্টা করিয়াছিলে কি? তখন বুঝ নাই, এখন বুঝ। ঐ দেখ বর্ণাম্ জঙ্গল জঙ্গম হইয়াছে—তোমার কাল উপস্থিত!—কিন্তু মাক্‌বেথ কোথা? ইহার পরের দৃশ্যেই তাহাকে দেখিতে পাইব।

পঞ্চম দৃশ্যে, সেই ডন্‌সিনেন রাজভবন প্রকোষ্ঠে সসৈন্য মাক্‌বেথ অবস্থান করিতেছেন; দুর্গের বহির্ভাগে সমর সজ্জার পতাকা সকল উড্ডীন করিতে আদেশ দিতেছেন; বলিতেছেন 'বিদ্রোহীরা শত্রুপক্ষে যোগদান না করিলে, দুর্গ হইতে অগ্রসর হইয়া উহাদিগকে তাড়িত করিতাম।' এমন সময়ে প্রকোষ্ঠান্তরে পুরবাসিনীরা ক্রন্দনের রোল তুলিল। মাক্‌বেথ ভাবিতে লাগিলেন—'এক সময়ে একটি পেচকের ধ্বনি শুনিলে ভয়ে আমার অঙ্গ শীতল, কেশ কণ্টকিত হইত, কিন্তু ক্রমে অহরহ সন্ত্রাসে যাপন করিয়া এখন এমনই অভ্যস্ত হইয়াছি—এখন মহা বিভীষিকাতেও আর আমার চমক হয় না'; প্রতীহারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসের জন্য ক্রন্দনের রোল উঠিতেছে?" প্রতীহারী উত্তর করিল—"প্রভো, মহারাণীর মৃত্যু হইল।" মাক্‌বেথ বলিতে লাগিলেন;—

মৃত্যু তার—কিছু পরে,—হলে' ভাল হতো;
যথা কালে—অই কথা—শুনিতাম সুখে।—
অদ্য কল্য—অদ্য কল্য—অদ্য কল্য করি—
শনৈঃ শনৈঃ মহাকাল—প্রলয় যাবৎ
ধীরে কালসর্প বৎ—হয় অগ্রসর;
দিন যায়,—দিন যায়—দেখাইয়া পথ
মূর্তিময় মৃত্যুহ্রদে—নির্ব্বোধ পথিকে।
নিভে যা রে ক্ষুদ্র প্রাণ—নিভে যা—নিভে যা,
এ জীবন চলচ্ছায়া—মায়া মাত্র সার।

মানুষ যাত্রার সঙ্—রঙ্গ ভঙ্গ করি,
নেচে কুঁদে—গান গেয়ে—কালীচুণ মেখে—
যায় সাজ ঘরে—কেহ না লয় খবর।
মানব জীবন শুদ্ধ—বাতুল প্রলাপ
ঘোর ঘটা শব্দ কিন্তু—ভিতরেতে ফক্কা।

দূত আসিয়া সংবাদ দিল বর্ণাম্ জঙ্গল অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তখন মাক্‌বেথ একটু একটু করিয়া বুঝিতে লাগিল—কাল আগত।

পাপে ধর্ম্মে—সমভাবে—নর-নারীর দাম্পত্য বন্ধন। সংসারে, ধার্ম্মিকের ধর্ম্মপথে প্রধান সহায়—তাহার সহধর্ম্মিণী স্ত্রী। পাপিষ্ঠের পাপ পথের সহায়ও সেই সহপাপিনী স্ত্রী। মাক্‌বেথ গৃহিণী কেবল যে মাক্‌বেথের সহায় ছিলেন এমন নহে—তিনি যেমন আরম্ভে প্রবৃত্তিরূপা—তাঁহার সমস্ত জীবনে সেইরূপ শক্তি স্বরূপাও ছিলেন। 'কিসে স্বামীকে সান্ত্বনা দান করিবেন, কিসে তাঁহার অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিবেন, কিসে তাঁহাকে

দুষ্কর্ম্মের দারুণ স্মৃতি হইতে ভুলাইয়া রাখিবেন,—অহরহ কেবল সেই চিন্তা, সেই চেষ্টাই করিতেন। পাপের অন্তর্দাহের তুষানলে তাঁহার নিজ হৃদয় ক্ষাক হইতেছিল, এক দিনের তরে স্বামীকে তাহা মুখ ফুটিয়া বলেন নাই—পাছে তাহাতে স্বামীর শান্তি ভঙ্গ হয়। স্বামীর সান্ত্বনার্থ সমস্ত দিন মনের আগুণ চাপিয়া রাখিতেন—রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থায়—সেই আগুণ জ্বলিয়া উঠিত; তিনি বিষম নিশিরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন—তবু সেই রোগের খেয়ালে, মাক্‌বেথকে সান্ত্বনা করিতেছেন—শোও গিয়া—শোও গিয়া—বারবার বলিয়া যখন খেয়াল দেখিতেন, যে স্বামী সুস্থ হইয়া শয়ন করিলেন, তখন নিজে শয়ন করিতেন।

এই মাক্‌বেথ গৃহিণী যখন স্বামীকে মহাপাপে লওয়াইতেছিল, তখন আমরা ঘৃণা মিশ্রিত ভয়ে প্রবৃত্তি-রূপাদের পদে নমস্কার করিযাছিলাম—কিন্তু মাক্‌বেথ গৃহিণী যে, মহা রোগে আক্রান্ত হইয়াও স্বামী শুশ্রূষায় বিব্রত—ইহা ভাবিলে কি—সাক্ষাৎ সেবারূপিণীদের ভক্তিভরে আবার নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয় না?—হয় বৈ কি।

তাহাতেই বলিতেছিলাম পাপে ধর্ম্মে, নর-নারীর দাম্পত্য বন্ধন—বড় বিচিত্র বন্ধন। মাক্‌বেথ মহাপাপী—তাঁহার গৃহিণী পাপিষ্ঠা—তবু গৃহিণী মাক্‌বেথের সাক্ষাৎ সেবা রূপিণী—হৃদয়স্থ শক্তিরূপা ছিলেন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মাক্‌বেথ বলিতেছিলেন—'মৃত্যুতাঁর—কিছু পরে—হলে ভাল হতো। শক্তির এখন আমার বিশেষ আবশ্যক—এমন সময়ে আমি শক্তি হারা হইলাম!' শক্তি হারা হইয়াছে বলিয়াই মাক্‌বেথ এত কাল পরে মহাকালের নিঃশব্দ পদ সঞ্চার বুঝিতে পারিয়াছে। বুঝিয়াছে—মানুষের জীবন শলিতার আলো—একটুতেই নিভিয়া যায়—বুঝিয়াছে মনুষ্য জীবন ছায়াময়—বুঝিয়াছে মানুষ যাত্রার সঙ্‌—বুঝিয়াছে—মানুষের জীবন কেবল পাগলের প্রলাপ।

লেডি মাক্‌বেথের মৃত্যু সংবাদে যখন মাক্‌বেথ এক দিকে শক্তি হারা হইয়া—আপনার ভার আপনি আর বহন করিতে পারিতেছে না, যখন—অন্য দিকে সংসারের একমাত্র বন্ধন ছিন্ন হওয়াতে শিথিল গ্রন্থি হইয়া এলাইয়া পড়িতেছে—তখনই তিতিক্ষায় বলিতেছে 'নিভে যা রে ক্ষুদ্র প্রাণ—নিভে যা—নিভে যা।' সেই তিতিক্ষার ঘোর মোহাবস্থায় দূত আসিয়া সংবাদ দিল—'বর্ণাম জঙ্গল অগ্রসর হইতেছে।' কাজেই সেই-শক্তি শূন্য, গ্রন্থি-শূন্য, তিতিক্ষা-পূর্ণ মাক্‌বেথ বুঝিতে পারিল—যে মহাকাল আগত প্রায়। তখন আপনার প্রকৃতিগত সাহসের শেষাংশ সঞ্চয় করিয়া সমর সজ্জায় প্রস্তুত হইল—বলিল;—

বহ বায়ু, ধর মূর্ত্তি—মহাপ্রলয়-করী
মৃত্যু মুখে মাক্‌বেথ—যায় সজ্জা করি।

এই সংকল্পে পঞ্চম দৃশ্যের শেষ। আর তিনটি দৃশ্য আছে।

নাটক।

নাটকের উপযোগী গল্প।

২। পূর্ণচন্দ্র।

শালিবান রাজা পঞ্জাব প্রদেশস্থ শিয়ালকোটের রাজা। ইচ্ছা তাঁহার মহিষী। অনেক যাগযজ্ঞেও দম্পতির সন্তান হয় নাই। সিদ্ধযোগী গোরক্ষনাথ সদয় হইয়া রাজরাণীকে দেখা দিলেন,—বলিলেন শিবরাত্রির উপবাস করিলে সন্তান হইবে। রাজরাণী ক্রমে তিনবর্ষ সেইরূপ করেন,—সন্তান হয় না; তাঁহাদের বিশ্বাস টলিল, পরবর্ষে ত্রয়োদশীতে তাঁহারা সংযম করিলেন না। গোরক্ষনাথ আবার দর্শন দিলেন—বলিলেন, "তোমরা অবিশ্বাসী—তোমাদের সন্তান হইবে কেন?" দম্পতি অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন। যোগীবর রাজাকে বলিলেন, "সন্তান পাইবে—তবে তুমি ষোড়শ বৎসর তাহার মুখ দেখিও না—ঐ কালের মধ্যে দেখিলে, অমঙ্গল হইবে।" মহিষীকে বলিলেন "তুমি সন্তানের লালন পালন করিতে পাইবে, দেখো—যেন সন্তান সর্ব্বমঙ্গলালয়ের সর্ব্বমাঙ্গল্যে বিশ্বাসবান্ হয়; হইলে, তাহার মঙ্গল হইবে—তোমারও মঙ্গল হইবে।"

সময়ে সুলক্ষণাক্রান্ত সন্তান জন্মিল; রাজ্ঞী পৃথক্ ভবনে তাহার লালন-পালন করিতে লাগিলেন। রাজাতে রাজ্ঞীতে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। পুত্রের নাম পূর্ণচন্দ্র।

শালিবান একজন চর্ম্মকার দুহিতার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহার নাম লূণা। ইহার পূর্ব্বে লূণার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া গোরক্ষনাথের একজন শিষ্য সেবাদাস তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। যৌতুকস্বরূপ লূণার পিতা জম্বুকে সেবাদাস মহাবিষ প্রদান করিয়াছিল। সন্ন্যাসীর আরও কত ঔষধ পত্র আছে মনে করিয়া লূণা সেবাদাসের তল্পি চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছিল। সেবাদাস তাহার পৃষ্ঠে তপ্ত লৌহে 'চোর' চিহ্ন করিয়া দিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। সেই অন্যপূর্ব্বা, চোর-চিহ্নে-চিহ্নিতা চর্ম্মকারকন্যা লূণা শিয়ালকোটের দ্বিতীয়া মহিষী। কিন্তু রাজা এখনও এ বিবাহের কথা লোকলজ্জায় প্রকাশ করেন নাই।

পঞ্চনদস্থ আর একটি রাজ্যে রাজা নাই। রাজকুমারী সুন্দরা বড় রূপবতী—বড় গুণবতী ও বড় সাহসশালিনী, স্বয়ং সেনানায়িকা হইয়া যুদ্ধ করিয়া স্বরাজ্য স্বাধীন করিয়াছেন। তিনি মনোমত যোগ্য পতি পান নাই বলিয়া বিবাহ করেন নাই। সুন্দরা মন্ত্রী হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ছদ্মবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করেন।

কাল পূর্ণ হইলে রাজকুমার পিতৃসকাশে আগমন করিলেন। সেই দিনই লূণা পিতৃ পরামর্শে বিষ প্রদানের উদ্দেশে পূর্ণচন্দ্রকে দেখিতে চাহিলেন। রাজা অগত্যা প্রধানা মহিষীর নিকট লূণাকে বিবাহের কথা—লূণার অভি-

লাসের কথা বলিলেন। রাজ্ঞী ইচ্ছা বলিলেন "তা মহারাজ এ কথা লুকাইবার কি প্রয়োজন ছিল—রাজাদের এমন ত শত মহিষী থাকে।" রাজা বলিলেন "তা সে যে চর্ম্মকার দুহিতা।" রাজ্ঞী বলিলেন "তা হলই বা; যেমন আমি আপনার চরণ স্পর্শে রাজরাণী হইয়াছি, সেও তেমনি হইবে।" রাজা বলিলেন "কুমারকে দেখিতে চায়, তার কি?" মহিষী বলিলেন "আমি যেমন, সেও ত তেমনি,—পূর্ণচন্দ্রের মা—দেখিতে চাবেই ত; কুমারকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিউন।" রাজা হিন্দু নারীর উদারতায় মুগ্ধ হইলেন। কুমার বিমাতার সহিত দেখা করিতে গেলেন।

দুষ্টা লূণা যুবরাজের রূপে মুগ্ধা হইয়া তাঁহার সঙ্গ কাঙ্ক্ষিণী হইল। যুবরাজ সংসার প্রবেশের প্রথম দিনে—সংসারের এই দারুণ দৌরাত্ম্যে ব্যথিত হইয়া চলিয়া আসিলেন। প্রত্যাখ্যাতা বিমাতা প্রতিহিংসার ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিল।

লূণা যথারীতি বৃদ্ধ রাজাকে বুঝাইল যে, যুবরাজ তাঁহার উপর লালসান্বিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা,—রাজা তাহাই বুঝিলেন। লূণার ইচ্ছামত কুমারকে মরুভূমি মধ্যস্থ কূপে ফেলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। মহিষী ইচ্ছার আবার বিশ্বাস টলিল। তিনি রাজার ও লূণার কত সাধ্য সাধনা করিলেন—তাঁহারা শুনিলেন না। কুমারের কিন্তু ঈশ্বরের সর্ব্ব মাঙ্গল্যে অটল বিশ্বাস। তিনি মঙ্গলময়কে ডাকিতে ডাকিতে কূপে ঝম্প প্রদান করিলেন। ইচ্ছা পাগলিনী প্রায় হইলেন—লূণা তাঁহাকে বাতুলালয়ে রাখিবার আদেশ দিলেন। ইচ্ছা পূর্ণচন্দ্রের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ প্রায় হইল।

পূর্ণবিশ্বাসী পূর্ণচন্দ্রকে গোরক্ষনাথ উদ্ধার করিলেন। তাঁহাকে সংসারে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, আজ্ঞা দিতে চাহিলেন—পূর্ণচন্দ্রের প্রকৃত বৈরাগ্য হইয়াছে; তিনি গোরক্ষনাথের সেবার কামনা প্রকাশ করিলেন। গোরক্ষনাথ অনুমতি দিলেন—কিন্তু পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

গোরক্ষনাথ সুন্দরার অতিথিশালা হইতে পূর্ণচন্দ্রকে ভিক্ষা আনিতে পাঠাইলেন। যোগীকে দেখিয়া সুন্দরা তাঁহাতে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। গোরক্ষনাথের সমীপে পূর্ণচন্দ্র ভিক্ষা মাগিল। গোরক্ষনাথ—পূর্ণচন্দ্রকে সুন্দরার ভবনে, সুন্দরা যতকাল বলে, বাস করিতে আদেশ করিলেন।

সুন্দরার ভবনে পূর্ণচন্দ্র নিত্য পূজাদি করেন—সুন্দরা পরিচর্য্যা করেন। একদিন আপনার আত্মসমর্পণ বৃত্তান্ত পূর্ণচন্দ্রে নিবেদন করিল। কাতরবাক্যে বলিল, "আপনি একবার পত্নী সম্বোধনে ডাকুন—এইমাত্র। আমি আপনার যোগভ্রংশ করিব না।" পূর্ণচন্দ্র বলিলেন "সুন্দরা! যোগিদের সংসার আশ্রম নিষিদ্ধ। তুমি কেন ঐহিক পতি-পত্নীভাবের জন্য লালায়িত হইতেছ? শঙ্কর গোরক্ষনাথের সেবায় নিষ্ঠাবতী হও—তোমার আমার পরকালে সমসেবায় এক আত্ম হইব।" সুন্দরা বুঝিল,—বলিল, "আর আমি আপনার প্রভু-সেবার হন্তারিকা হইব না, আপনি প্রভুর সকাশে গমন করুন।"

সুন্দরা বুক বাঁধিল, ইহকালে স্বামীসেবা অদৃষ্টে নাই বুঝিয়া, কাতরা

শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সেবা করিতে সংকল্প করিল। তোমরা ইচ্ছা মহিষীতে হিন্দু পত্নী দেখিয়াছিলে, সুন্দরায় হিন্দু বধূ দেখ। সুন্দরা মনে মনে মাত্র বিবাহ করিয়া আপনার রাজ্য ঐশ্বর্য্য—আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া এখন শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সেবা করিতে যাইতেছে!

সুন্দরা রণসজ্জা করিয়া শিয়ালকোটে শালিবানকে আক্রমণ করিল,—পরাস্ত করিল,—সন্ধি করিল, প্রধানা মহিষীকে বাতুলালয় হইতে মুক্ত করিল। যে ভবনে তিনি সন্তান পালন করিয়াছিলেন, সেই ভবনে তাঁহাকে রাখিয়া দিল, আপনি ছদ্মবেশে দিবারাত্রি তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল।

এদিকে লূণা শালিবানকে বিষ খাওয়াইয়াছে।—সেই বিষে রাজা রোগে শীর্ণ হইতেছেন। কোন সন্ন্যাসীর ঔষধ সেবন করিবেন স্থির করিলেন। পূর্ণচন্দ্র সুন্দরার নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া—অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গোরক্ষ-নাথের সমীপে আগমন করিয়াছেন। গোরক্ষনাথ মহারাজকে ঔষধ দিতে পূর্ণচন্দ্রকে আদেশ করিলেন।

নবীন সন্ন্যাসী পূর্ণচন্দ্র রোগজীর্ণ বৃদ্ধ পিতাকে ঔষধ দিলেন। সেবাদাস সঙ্গে ছিলেন—লূণার পূর্ব্বচরিত্র ধরা পড়িল—আপনার মুখে পাপীয়সী কুমারের উপর মিথ্যাপবাদ দেওয়ার কথা স্বীকার করিল। রাজা তখন আপনার পুত্রহত্যার কথা স্মরণ করিয়া, সেই পুত্রশোকে মহা কাতর হইলেন। পূর্ণচন্দ্র আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া রাজাকে সময়ে সান্ত্বনা দিলেন। মাতার ছিন্নমতি নষ্টদৃষ্টি ঘুচিল—তিনি আবার তাঁহার পূর্ণচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। পাপীয়সী লূণা পিতার সহিত জ্বালামুখীতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রেরিত হইল।

দেবাদিদেব মহাদেব নিজ মূর্ত্তিতে কৈলাসশিখরে, বৃষভ বাহনে, বামে মহাশক্তি লইয়া আবির্ভূত হইলেন, বলিলেন—"রাজা, রাণী তোমরা ক্ষুণ্ণ হইও না। পূর্ণচন্দ্র জড় সিংহাসনে বসিবেন না, তিনি দেশে দেশে 'বিশ্বাসে মঙ্গল'—এই ধর্ম্ম প্রচার করিবেন—কৈলাসে সুন্দরার সহিত মিলিত হইবেন। এই স্থলে গোরক্ষনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিও।"

তখন চারিদিকে শব্দ হইতে লাগিল—"জয় পার্ব্বতীনাথ কি জয়—জয় গোরক্ষনাথ কি জয়।"

আবার জিজ্ঞাসা করি,—কিরূপ গল্পে নাটক হয়—তাহা বুঝিলে কি? না বুঝিয়া থাক—আরও দুই চারিটি গল্প বলিব।

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫। | ১১শ সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

৮।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ॥ ২২॥

পদচ্ছেদঃ। মৃদু-মধ্য-অধিমাত্রত্বাৎ-ততঃ অপি বিশেষঃ।

পদার্থঃ। স্পষ্টম্।

অন্বয়ঃ। তীব্রস্য মৃদু-মধ্য-অধিমাত্রত্বাৎ ততঃ আসন্নাদপি বিশেষঃ সমাধিলাভ ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। পূর্ব্বসূত্রোক্তবিশিষ্টান্তর্গতস্য তীব্রত্বস্য মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বেন মৃদুতীব্রোমধ্যতীব্রোঽধিমাত্রতীব্র ইতি ত্রৈবিধ্যাত্তত আসন্নাদপি বিশেষঃ তরতমরূপ ইতি তথাহি মৃদুতীব্রসংবেগস্য আসন্নঃ, ততো মধ্যতীব্রসংযোগস্য আসন্নতরঃ তস্মাৎ অধিমাত্র তীব্রসংযোগস্যাধিমাত্রোপায়স্যাপ্যাসন্নতম সমাধি লাভ ইতি শেষঃ।

অনুবাদ। পূর্ব্ব সূত্রে যে সংবেগের তীব্র এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে সেই তীব্রত্বও আবার মৃদু, মধ্য এবং অধিমাত্র এই প্রকার হওয়ায় তীব্র সংবেগশালী যোগীদিগের সমাধি লাভে বিশেষ অর্থাৎ শীঘ্রতার তারতম্য লক্ষিত হয়।

সমালোচন। তীব্র সংবেগ শব্দের অর্থ ভাষ্যকার, চরম সীমা প্রাপ্ত বৈরাগ্য বলিয়াছেন কিন্তু সেই চরমসীমা প্রাপ্ত বৈরাগ্য সকলের একরূপ হয় না, কাহারও বা মৃদু অর্থাৎ ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়, কাহারও বা মধ্যগতিতে উৎপন্ন হয় আর কাহারও অতি শীঘ্র উৎপন্ন হয়, কাযেই তীব্র সংবেগশালী যোগীদের

সমাধি লাভের শীঘ্রতার তারতম্য স্বীকার্য্য, যাহার তীব্র সংবেগ মৃদু তাহার শীঘ্র সমাধি লাভ হয়, যাহার মধ্য তাহার তদপেক্ষা শীঘ্র সমাধি সিদ্ধি হয় আর যাহার অধিমাত্র তাহার সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র সমাধি লাভ হয়। ভাষ্যকার বলেন কেবল সমাধি নয়, তাহার ফল মোক্ষও উহার সহিত একই ক্রম অনুসারে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা॥ ২৩॥

পদচ্ছেদঃ। ঈশ্বর-প্রণিধানাৎ-বা।

পদার্থঃ। ঈশ্বরঃ বক্ষ্যমাণলক্ষণঃ পুরুষবিশেষঃ প্রণিধানং ভক্তিবিশেষঃ বিশিষ্টমুপাসনং সর্ব্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং, বিষয়সুখাদিকং ফলং অনিচ্ছন্ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ পরমগুরাবর্পয়তি তৎ প্রণিধানং ইতি নিষ্কর্ষঃ তস্মাৎবা অথবা।

অন্বয়ঃ। অথবা ঈশ্বরে প্রণিধানাৎ ভক্তি বিশেষাৎ অসংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধি লাভোভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। প্রণিধানাৎ ভক্তি বিশেষাদাবর্জ্জিতঃ ঈশ্বর স্তমনুগৃহ্নাত্যভিধ্যান মাত্রেণ তদভিধ্যানমাত্রেণাপি যোগিনঃ আসন্নতরঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ মোক্ষশ্চ ভবতীতি ভাবঃ।

অনুবাদ। ঈশ্বরে বিশেষ ভক্তি করিলেও অতি শীঘ্র সমাধিলাভ হইতে পারে।

সমালোচন। পূর্ব্বে সমাধি সিদ্ধির এক প্রকার উপায়, তাহার ভেদ, ও তারতম্য ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিয়া এই সূত্র দ্বারা অন্য প্রকার উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। কেননা জগতের লোক মাত্রেই কেবল ভিন্ন রুচি নয়, তাহাদের শক্তিও বিভিন্ন। একজনের যাহা ভাল লাগে অন্যের তাহা ভাল লাগে না এবং একজনের যাহা সাধ্যায়ত্ত অপরের পক্ষে তাহা হয় ত অতিশয় দুষ্কর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই নিমিত্ত পরম দয়াবান্ মহর্ষিগণ এক একটী বিষয়ে সিদ্ধি লাভের প্রতি প্রায়ই বিভিন্ন উপায় কল্পনা করিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে যাহা ভাল বুঝিবে, যে যাহা স্বীয় সাধ্যায়ত্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে, সে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করিবে। এই নিমিত্ত আজ মহর্ষি পাতঞ্জল সমাধিলাভের প্রতি দুইটি উপায় নির্দ্দেশ করিলেন। পূর্ব্ব কথিত উপায় পূর্ব্বেই বিবৃত করা হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় উপায়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় উপায়টি ভাল করে বুঝিতে হইলে, ঈশ্বর এবং প্রণিধান এই দুইটি কথা বুঝা চাই। তাহার মধ্যে সূত্রকার পর সূত্রে নিজেই ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে কেবল 'প্রণিধান' শব্দটি বুঝিলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। প্রণিধান শব্দের অর্থ বিশেষ ভক্তি, অথবা চরমসীমা প্রাপ্ত ভক্তি। যে ভক্তির উদয় হইলে কর্ম্মের ফল অনুসন্ধান না করিয়া, ঐহিক বা পারত্রিক সুখ ভোগাদি তুচ্ছ করিয়া নিজের কার্য্য অপকার্য্য সমুদয় অথবা এক কথায় আত্মাকে ঈশ্বরে সমর্পণ করে, সেই ভক্তির নাম প্রণিধান। সেইরূপ ভক্তির উদয় হইলে ঈশ্বর ঐ ভক্তজনকে অনুগ্রহ করিয়া ঐকান্তিক ভাব প্রদান করেন, তাহাতে সমাধি ও তাহার ফল মুক্তি অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়। এ উপায়ের মৃদু, মধ্য অধিমাত্রতা নাই; ইহাতে তীব্র সংবেগ ও তাহার মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্রত্ব ধর্ম্মভেদে ফল সিদ্ধির শীঘ্রতার তারতম্য নাই। ইহাতে কেবল "যৎকরোষি, যদশ্নাসি, যদ্দদাসি, জুহোষি যৎ—তৎ কুরুষ মদর্পণং" ইহাই আবশ্যক। কামনা শূন্য হইয়া কর্ম্ম ফলের অনুসন্ধান না রাখিয়া অথবা আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব চিরকালের মত মত বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরে আপনার সমুদয় কার্য্য সমর্পণ করিতে পারিলেই এ পথের পথিক হওয়া যায়।

মহর্ষি পতঞ্জলি সমাধিলাভের যে দুইটি উপায় নির্দ্দেশ করিলেন তাহার মধ্যে প্রথমটিকে জ্ঞানমার্গ এবং দ্বিতীয়টিকে ভক্তিমার্গ বলা যায়। ইহার মধ্যে প্রথমটি দ্বারা আত্মজ্ঞান কেন্দ্র করিয়া ক্রমশ জগৎকে বিস্মৃত হইয়া মনকে স্থির করিতে শিখিতে হয়। দ্বিতীয়টি দ্বারা আত্মাকে বিস্মৃত হইয়া মনের বৃত্তি সকল বিলোপ করিতে হয়। প্রথম পথে ফল সিদ্ধির তারতম্যে বিলম্বতা ও শীঘ্রতা আছে। দ্বিতীয় পথে সে সব কিছুই নাই; এ পথের পথিকেরা সকলেই সমানভাবে সিদ্ধি লাভ করে। তবে ইহাদের মধ্যে কোন পথ সুগম তাহা নির্দ্ধারণ করা আমাদের অসাধ্য। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যেমন দুরূহ, যথার্থ ভক্ত হওয়াও যে তাহা অপেক্ষা সহজ নয়, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বরং আমরা বলি আত্মার স্বরূপ জানা যেরূপ দুষ্কর, আত্ম বিস্মৃত হওয়া তাহা অপেক্ষা অধিক।

ঈশ্বর কে? তাঁহার কিরূপ স্বরূপ? প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়বিধ মৌলিক তত্ত্বের মধ্যে উহা কোন তত্ত্বের অন্তর্গত? এই সকল আশঙ্কার নিবারণের নিমিত্ত সূত্রকার ঈশ্বরের পরিচায়কসূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

ক্লেশকর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ ॥২৪॥

পদচ্ছেদঃ। ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাক-আশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ, ঈশ্বরঃ।

পদার্থঃ। ক্লিশ্নন্তি খলমী সাংসারিকং পুরুষং বিবিধদুঃখপ্রহারেণেতি ক্লেশাঃ অবিদ্যাদয়ো বক্ষ্যমাণাঃ বিহিত, প্রতিষিদ্ধ, ব্যামিশ্ররূপাণি বৈদিক লৌকিকানি ত্রিবিধানি কর্ম্মাণি ধর্ম্মাধর্ম্ম ইতিকেচিৎ। বিপচ্যন্তে ইতি বিপাকাঃ কর্ম্মফলানি জাত্যায়ুর্ভোগাঃ, আফলবিপাকাৎ চিত্তভূমৌ শেরত ইতি আশয়া বাসনাখ্যাঃ সংস্কারাঃ। তৈঃ অপরামৃষ্টঃ ত্রিষপি কালেষু ন সংস্পৃষ্টঃ, পুরুষবিশেষ অন্যেভ্যঃ পুরুষেভ্যঃ বিশিষ্যতে ইতি পুরুষ বিশেষঃ ঈশ্বরঃ ঈশন শীলঃ ইচ্ছা-মাত্রেণ সকলজগদুদ্ধরণ ক্ষম ইত্যর্থঃ।

অন্বয়ঃ। ক্লেশ অপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ কথ্যত ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। ঈশ্বরস্তু ন তত্ত্বান্তরং পুরুষ—তত্ত্ব এব তস্যান্তর্ভাবঃ। তত্র বিশেষস্তু অন্যে পুরুষাঃ ক্লেশাদিভিঃ পরামৃষ্যন্তে ঈশ্বরস্তু তৈঃ কদাপি ন পরা-মৃষ্যত ইতি। নন্থ ক্লেশাদয়ো বুদ্ধিধর্ম্মাঃ, কস্য চিদপি পুরুষস্য বস্তুগত্যা ক্লেশাদি স্পর্শো নাস্ত্যেব তৎ ঈশ্বরে কিং বৈশিষ্ট্যমিতি চেৎ সত্যং ক্লেশাদয়ো বুদ্ধিধর্ম্মা অপি সর্ব্বত্রে সাংসারিকে পুরুষে ব্যপদিশ্যন্তে যথা যোধেষু বর্ত্তমানো জয়ঃ পরাজয়ো বা স্বামিনি। ঈশ্বরস্যতু ত্রিষপি কালেষু তথাবিধঃ ক্লেশাদি পরা-পরামর্শো নাস্তীত্যতঃ স বিলক্ষণ এব ভগবানীশ্বরঃ।

অনুবাদ। ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয় এই সকলের সম্পর্ক রহিত কোন বিলক্ষণ চৈতন্য বা আত্মাকে ঈশ্বর বলে।

সমালোচন। ঈশ্বর কি ? ইহার উত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিলেন, ঈশ্বর একটী বিলক্ষণ পুরুষ বা চৈতন্যশক্তি। যে জড় ও চৈতন্য লইয়া এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, ঈশ্বর তাহা ছাড়া নয়। ঈশ্বরও তাহারই অন্তর্গত চৈতন্যস্বরূপ, ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ কিন্তু সংসারে সম্বদ্ধ যে সকল চৈতন্য, ঈশ্বর তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্বভাবের। সাংসারিক চৈতন্য বা পুরুষগণ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয় দ্বারা সংস্পৃষ্ট, ঈশ্বর চৈতন্য সেরূপ নয় ; এই ভেদ। এক্ষণে ক্লেশাদি কাহাকে বলে তাহাই প্রথমে বুঝান আবশ্যক। ভাষ্যকার বলেন যাহা সাংসা-রিক পুরুষদিগকে ক্লিষ্ট অর্থাৎ দুঃখিত করে তাহার নাম ক্লেশ, উহা আর কি ? অবিদ্যা আদি পাঁচটি। পরে উহাদের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইবে। বিহিত ও নিষিদ্ধ ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের জনক ক্রিয়া সকলের নাম কর্ম্ম। বিপাক বলিতে কর্ম্মের ফল—জাতি ও আয়ুর ভোগ। আশয় বলিতে বাসনা কর্ম্ম জন্য চিত্তস্থিত

সংস্কার সকল। সাংসারিক জীব সকল এই ক্লেশাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত। তাহার কর্ম্মের গতি শাস্ত্রে এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্যের কর্ম্ম সকল দুই প্রকার প্রথম প্রারব্ধ, দ্বিতীয় উপাদান; প্রারব্ধ কর্ম্ম বলিতে মনুষ্যের প্রথম ক্রিয়া, অর্থাৎ যে কার্য্যের প্রতি ইচ্ছা প্রভৃতি কোন কারণ লক্ষিত হয় না যেমন, উৎপত্তি প্রভৃতি, যে সকল কর্ম্ম ঐ প্রারব্ধ ক্রিয়ার ফলস্বরূপ তাহাদিগকে উপাদান কর্ম্ম বলে। এই দুই প্রকার কর্ম্ম হইতেই মনের বাসনা বা সংস্কার সকল উৎপন্ন হয়। ঐ বাসনা হইতে আবার সুখ-দুঃখাদির ভোগ হয়। সেই ভোগ হইতে পুনর্ব্বার বাসনার উদয় হয়। বাসনা হইতে আবার কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এইরূপ কর্ম্মের গতিকে কর্ম্মচক্র বা কর্ম্মবন্ধন বলে। সাংসারিক চৈতন্যমাত্রেই এই কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বর চৈতন্য সেরূপ নয়, ইঁহার কর্ম্মবন্ধন নাই।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, তোমাদের মতে চৈতন্যমাত্রেরই বন্ধন নাই, তবে ঈশ্বরের সহিত অন্যের বৈশিষ্ট্য কি হইল? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলেন, চৈতন্যের সহিত ক্লেশাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু সাংসারিক চৈতন্য সকলের প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকায় প্রকৃতির কার্য্য বুদ্ধির সহিত তাহাদের একটা স্ব-স্বামীভাব সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। সেই সম্বন্ধবলে বুদ্ধিকে তাহারা আপনার বলিয়া বিবেচনা করে। পূর্ব্বোক্ত ক্লেশাদি বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ অবস্থান করে। সাংসারিক চৈতন্য বা পুরুষগণ বুদ্ধিতে আত্মীয় বোধ থাকায় বুদ্ধিস্থ যাবৎ বস্তুতেও আত্মীয় বোধ করে। যেমন নিজের অধীনস্থ সৈন্যকৃত জয় বা পরাজয়ে রাজাগণের আত্মীয় বুদ্ধি হয়। যে চৈতন্যের সহিত যেরূপ কোন সম্বন্ধ নাই, সেই চৈতন্যই ঈশ্বর।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল মুক্ত পুরুষ বা প্রকৃতিলীন প্রভৃতি যোগীগণের বর্ত্তমান ক্লেশাদি সম্বন্ধ না থাকায় তাহাদিগের উপর ঈশ্বরের লক্ষণ যায় না কেন? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "স তু সদৈবমুক্তঃ সদৈব ঈশ্বর ইতি।" মুক্ত পুরুষ বা যোগীদিগের বর্ত্তমান ক্লেশাদি সম্পর্ক না থাকিলেও পূর্ব্বে ক্লেশাদির সম্পর্ক ছিল এবং যোগীদিগের যোগভ্রংশের পরেও ক্লেশাদির সম্পর্ক হইবার সম্ভাবনা কিন্তু ঈশ্বর চৈতন্যের কোন কালেই ক্লেশাদির সম্পর্ক হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনাও নাই, তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই মুক্ত অর্থাৎ ক্লেশাদির সম্পর্ক রহিত এবং তিন কালেই তাঁহার ঐশ্বর্য্য অব্যাহত, তিনি কোন কালেই কিছুরই অধীন নয়।

ঈশ্বর কেবল চৈতন্যস্বরূপ, তাঁহাতে সুখ-দুঃখ ভোগাদি সত্ত্বাদিগুণের কার্য্য নাই, এ কথা—

"তত্র যঃ পরমাত্মাহি অনিত্যং নির্গুণঃ স্মৃতঃ
কর্ম্মাত্মা পুরুষো যোঽসৌ মোক্ষ বন্ধৈঃ সযুজ্যতে।" (১)

ইত্যাদি অসংখ্য ঋষিবচন দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। ভগবান্ নারদও বলিয়াছেন—

"পরন্তু নির্গুণঃ প্রোক্তোঽহংকারস্থ যুতোঽপরঃ।" (২)

যোগাচার্য্যদিগের মতে ঈশ্বর পূর্ব্বোক্ত ক্লেশাদি বন্ধন শূন্য হইলেও তিনি নিত্যজ্ঞানী, এবং অপ্রতিহত ইচ্ছাবিশিষ্ট। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, ঈশ্বর নিরুপাধি অতএব তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব ভাব কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, "বাধকং বিনা দৃষ্টান্মুসার ত্যাগানৌচিত্যাৎ" নিরুপাধির যে জ্ঞাতৃভাব হইতে পারে না এরূপ কোন বাধক কারণ নাই বরং শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে ঈশ্বর জ্ঞানবান তাহা বারম্বার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অতএব বিনা বাধকে চিরপ্রসিদ্ধ বচন সমূহের প্রতি উপেক্ষা করা যায় কিরূপে?

এই ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রভাবেই সৃষ্টির আদিতে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বিলোড়িত হইয়া গুণের বৈষম্য হওয়ায় নানাবিধ বিচিত্র সৃষ্টির উদয় হয়। তদ্বিষয়ে

"প্রকৃতিং পুরুষং চৈব প্রবিশ্যাত্মে চ্ছয়াহরিঃ।
ক্ষোভয়ামাস সংপ্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ॥" (৩)

ঈশ্বর অবিদ্যাদি উপাধিশূন্য হইলেও একেবারে নিরুপাধিক নহেন, তাঁহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণ নিয়ত বিদ্যমান থাকায় ঐ প্রকৃষ্ট সত্ত্বই তাঁহার উপাধি। ভাষ্যকার বলেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সাদৃশ্য বা তাঁহার ঐশ্বর্য্যাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যও আর কাহাতে বিদ্যমান নাই। অর্থাৎ ঈশ্বর একটি মাত্র দুইটি নয়। দুইজন ঈশ্বর হইলে দুইজনের ইচ্ছা সমানভাবে অপ্রতিহত; এমন স্থলে একজন ইচ্ছা করিলেন জগতের সৃষ্টি কার্য্যের আরম্ভ হোক, অপরনি সৃষ্টির

---

(১) যিনি পরমাত্মা তিনি নিত্যনির্গুণ, জীবাত্মা বা পুরুষই বদ্ধ এবং মোক্ষযুক্ত।

(২) পরমাত্মা নির্গুণ এবং জীবাত্মা অভিমানী অর্থাৎ সগুণ।

(৩) সত্ত্ব রজঃ এবং এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি। ঈশ্বর আপনার ইচ্ছানুসারে সৃষ্টির আদিতে ঐ সাম্যাবস্থা নষ্ট করিয়া বৈষম্য উৎপাদন করেন।

আরম্ভ হইল, তাহার পরই আর একজন বলিলেন, না সৃষ্টি হইয়া কায নাই, অমনিই সৃষ্টি বন্ধ হইতে লাগিল। এক্ষণে বিবেচনা করে দেখ দুই জন ঈশ্বর হইলে জগতের প্রত্যেক কার্য্যে কিরূপ বিসংষ্টুল হইত। এ স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া, বোধ হয় অন্যায় নয়। আমাদের গ্রামে কাশীনাথ এবং শম্ভুনাথ নামে দুই জন সহোদর বাস করিত। দুই জন পীঠেপীঠী উভয়ের বয়সের অধিক ন্যূনাধিক্য ছিল না, কাযেই কাহার উপর কাহার বড় একটা প্রভুতা ছিল না, সংসারে দুই জনই সমান প্রবল। কিন্তু দুই জনই বদ্ধ পাগল। ইহাদের মধ্যে মধ্যে ক্রিয়াকর্ম্ম—ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করানও ছিল। কিন্তু সংসারে উভয়ের সমান পাগলামি থাকায় মধ্যে মধ্যে ঐ সকল কার্য্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খল হইত। কোন দিন প্রাতঃকালে একজন গ্রামস্থ সমুদয় আত্মীয় স্বজনকে একটা কর্ম্মের উপলক্ষ্য করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরেই আর একজন বাহির হইয়া প্রতি বাড়ী বাড়ী বলিয়া আসিলেন 'আমার ভ্রাতা উন্মত্ত, উহার কথা আপনারা শুনিবেন না, অদ্য আমাদের গৃহে কোন কর্ম্মই নাই।' সে দিবস বাস্তবিক হয় ত একটা কার্য্য ছিল এবং ব্রাহ্মণ ভোজনেরও প্রচুর আয়োজনও ছিল কিন্তু নিমন্ত্রণ রদ করায় কোন ভদ্রলোকেই যাইতে সাহসী হইলেন না, সমুদয় আয়োজন বিনষ্ট হইল, রাশি রাশি ভোজ্য দ্রব্য পচিয়া গেল। আবার কোন দিন হয় ত বাড়ীতে কিছুই আয়োজন নাই, গ্রামস্থ লোক মধ্যাহ্নকালে অনাহারে আসিয়া উপস্থিত। দালানে দেব প্রতিমা প্রস্তুত, জ্যেষ্ঠ—পুরোহিত স্থির করিয়া আসিলেন। কনিষ্ঠ তাহার পরই পুরোহিতের বাটীতে গিয়া বলিল "মহাশয় দাদা পাগল জানেনত, কোথায় বা পূজা কোথায় বা কি সকলই মিথ্যা"। কাযেই পুরোহিত আর যাইতে সাহস করিলেন; মাটীর ঠাকুর অমনি অমনিই মাটী হইলেন। জগতে যদি সমান ক্ষমতাশালী এবং অপ্রতিহত শক্তি দুইটি ঈশ্বর হইতেন, তাহলে জগতের কার্য্য সকল ঠিক ঐরূপ হইত তদ্বিষয় কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য ভাষ্যকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন ঈশ্বর অদ্বিতীয় এবং কি মুক্ত কি অমুক্ত যাবতীয় পুরুষ অপেক্ষা তাঁহার ঐশ্বর্য্য অনেক অধিক; তাঁহা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য আর কাহারও নাই।

ভক্তি সাধন।

যে ভগবানের পদপ্রান্ত হইতে ভক্তি-রূপিণী অমৃত নিঃস্যন্দিনী নির্ঝরিণী প্রবাহিতা হইয়া পাপরূপ সূর্য্য-ময়ূখ-প্রোত্তপ্ত অবিশ্বাস-বালুকাপূর্ণ নাস্তিক-হৃদয়কেও সুশীতল করিয়া অনন্তকাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে, সেই চিরন্তন নির্ব্বিকল্প পুরুষ নিজ মুখেই ভক্তির শ্রেষ্ঠতা স্বীয় প্রাণোপম প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনের নিকট কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যোশ্চাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাম্ মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্তোতমোমত॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬অঃ ৪৬।৪৭।

উদ্ধৃত শ্লোক দ্বয়ের তাৎপর্য্য এই যে তপোনিষ্ঠ, জ্ঞানী এবং কর্ম্মনিষ্ঠ অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। প্রথম শ্লোকটি বলিয়া ভগবানেব তৃপ্তি জন্মিল না, অপিচ কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইল। যোগ সাধক-ভেদে ১৮।১৯ প্রকাব, তবে প্রিয় শিষ্য কোন যোগ অভ্যাস কবিবেন এই সন্দেহেই পরোক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করিবেন, তাহার তাৎপর্য্য অর্থ এই যে "যোগীদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্তরাত্মা আমাতেই সমর্পণ করিয়া ভজনা করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

এই দুই শ্লোক দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিযোগের প্রাধান্য স্পষ্টত বুঝাইয়া ছিলেন। ইহার কারণ এই যে ভক্তিযোগ * সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। ভক্তি

* যদিও ভগবান ভক্তিযোগের প্রাধান্য স্পষ্টত স্বীকার করিলেন, তথাপি পতঞ্জলি মুনি অনুশাসিত যোগের নিন্দা করা হইল না। ভক্তিযোগ কিছু সরল, কিন্তু "চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ" যোগ বহুকাল ও বহু পরিশ্রম সাপেক্ষ। তাহার কারণ এই যে, পতঞ্জলি প্রথমত যোগকে ৮ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমধি। তাহার পর যম আবার দশ প্রকার, নিয়ম দশ প্রকার, আসন আট প্রকার, প্রাণায়াম তিন প্রকার, প্রত্যাহার পাঁচ প্রকার, ধারণা পাঁচ প্রকার, ধ্যান ছয় প্রকার, এবং সমাধি এক প্রকার, এবং কাহার কাহার মতে নানা প্রকার। একবার ভাবিয়া দেখুন এক যম অভ্যাস করিতে কত কাল লাগে, তার পর নিয়ম ইত্যাদি। যোগের ফল প্রত্যক্ষ বটে, কিন্তু সাধক এক জন্মে ফল পায় কি না সন্দেহ।

সাধনেচ্ছু ব্যক্তির ধন, মান, কুল, শীল, কিছুরই অপেক্ষা করে না—কেবল আবশ্যক একমাত্র সবল বিশ্বাস।* শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন এই বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল "বিশ্বাসঃ ধর্ম্ম মূলং হি।" কি বাহ্য জগতে কি অন্তর্জগতে, উভয় জগতের কার্য্যের জন্যই বিশ্বাসের আবশ্যক। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে বিশ্বাস না হইলে লৌকিক জগতের কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলরূপে চলিত না। পিতা পুত্রে সদ্ভাব, স্বামী স্ত্রীতে ভালবাসা, বন্ধু বন্ধুতে প্রণয়, এক এই বিশ্বাস না থাকিলে,—জগতে কিছুই দেখা যাইত না। এই বিশ্বাসই ভালবাসার মূল। ভালবাসার অন্যতর নাম অনুরাগ। ঈশ্বরের প্রতি এই অনুরাগকেই শাস্ত্রকারগণ ভক্তি নামে অভিভূত করিয়াছেন যথা "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। শাণ্ডিল্য সূঃ ১ম অঃ ২ সূত্র।

এ পর্য্যন্ত কেবল ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইল, এবং ভক্তি কাহাকে বলে তাহাই বলা হইল। এখন কি উপায়ে ভক্তি সাধন করিতে হয় তাহাই বলিতে হইবে। যদিও বস্তুতপক্ষে বলিতে গেলে ভক্তি সাধারণের সাধনের বস্তু নহে অর্থাৎ যে সে ব্যক্তিই সাধন করিতে আরম্ভ করিলে যে সফল-মনোরথ হইবেন তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, তবে ভক্তি সাধন সম্বন্ধে যে সমস্ত অনুষ্ঠান অনুকূল তাহাই মাত্র আমরা বলিব। আর এক কথা—যে ভক্তি জ্ঞানের অভ্যুদয় সাপেক্ষ, তাহার কথা আমরা বলিব না, কারণ সে প্রকার ভক্তি সাধন বড় সহজ ব্যাপার নহে, এবং তৎসম্বন্ধে অনেক গোল-যোগও আছে। এখন স্বয়ং ভগবান ও বহুদর্শী আচার্য্যগণ ভক্তিসাধন সম্বন্ধে যে সমস্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান অনুশাসন করিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিব।

> ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
> নিবসিষ্যসি ময্যেব অতঃ উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
> অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোসি ময়ি স্থিরম্।
> অভ্যাসযোগেন ততঃ মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
> অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্ম পরমোভব।
> মদর্থামপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিং অবাপ্স্যসি॥
> অথৈতদপ্যশক্তোসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
> সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২ অঃ ৮।৯।১০।১১ শ্লোক।

---

* এই স্থলের সহিত পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাখ্যায় ৬৪৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের মন্তব্য মিলাইয়া দেখিবেন। [নবজীবন সম্পাদক।]

উদ্ধৃত শ্লোক সমূহের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এই যে—(হে অর্জ্জুন) তুমি আমাতে মন অবধান কর এবং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিকেও আমাতে স্থির কর, তাহা হইলেই তুমি দেহান্তে আমাতে বাস করিতে পারিবে এ বিষয়ে কিছুই সন্দেহ নাই।

যদি এইরূপ আমাতে চিত্তসমাধান করিতে না পার, তাহা হইলে ইতস্তত বিক্ষিপ্তচিত্তকে * পুনঃ পুনঃ মৎস্মরণ রূপ কার্য্য দ্বারা সংযত করিতে অভ্যাস কর।

আর যদি অভ্যাস দ্বারা এরূপ করিতেও অক্ষম হও—তাহা হইলে আমার প্রীত্যর্থে ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান কর, † এবং এইরূপ কার্য্য করিতে করিতেই সিদ্ধিলাভ করিবে। আর যদি এরূপ করিতেও অক্ষম হও, তাহা হইলে ভগবান বলিতেছেন সমস্ত মুখ্য ও নিত্য কর্ম্মাদি আচরণ করিবে; কিন্তু স্মরণ থাকে যেন সমস্ত কর্ম্ম করিবে ফলপ্রত্যাশা একবারে বর্জ্জন করিয়া।

স্বয়ং ভগবান ভক্তিসাধন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল। এখন ভক্তিপথের পথিক ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন তাহাই এক্ষণে উদ্ধৃত করিতে হইবে।

"ভক্তিসাধন—বিষয় ত্যাগ ও সঙ্গ ত্যাগ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে।"

"সর্ব্বদা ভগবদ্ভজন দ্বারা।—"

"লোকের নিকট ভগবদ্গুণের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা।"

"ভগবানের কৃপাদৃষ্টি, ও মহাত্মাগণের অনুগ্রহই ভক্তি সাধন সম্বন্ধে মুখ্য অনুকূল।" ‡

---

* পাতঞ্জল দর্শন মতে চিত্তের পাঁচটী অবস্থা যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। যখন চিত্ত ক্ষণেক এক বস্তুতে, পরক্ষণেই অন্য বস্তুতে নিবিষ্ট হয়, অর্থাৎ যখন এক বস্তুতে অধিকক্ষণ নিবিষ্ট থাকিতে পারে না, সেই অবস্থাকেই বিক্ষিপ্ত অবস্থা বলে।

† উক্ত দর্শন প্রণেতা ক্রিয়াযোগ সম্বন্ধে এই ভাবে বলিয়াছেন "তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।"—তপস্যা, বেদাধ্যয়ন এবং ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা ক্রিয়াযোগ অভ্যাস করিতে হয়। কিন্তু ভগবান এ স্থলে (ভক্তি-যোগ সাধকের প্রতি) কিছু বিস্তৃত ভাবে আদেশ করিয়াছেন যথা—হরিনাম সংকীর্ত্তন, পূজা, যাগ, যজ্ঞ, একাদশীর উপবাস, হরি কথা শ্রবণ, ব্রাহ্মণাদির সেবা শুশ্রূষা আদি।

‡ "ওঁ তত্তু বিষয় ত্যাগাৎ সঙ্গ ত্যাগাৎ চ।"
"ওঁ অব্যাকৃত ভজনাৎ।"
"ওঁ লোকেঽপি ভগবদ্গুণ শ্রবণ কীর্ত্তনাৎ।"
ওঁ মুখ্যস্তু মহৎ কৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাৎ বা।"

নারদ সূত্র ৫ অনুঃ ৩৫।৩৬।৩৭।৩৮ সূত্র।

বিষয় ত্যাগ দ্বারা ভক্তিসাধন অতি দুরূহ কার্য্য সন্দেহ নাই। সংসারে থাকিয়া বিষয় ত্যাগ করা সামান্য লোকের সাধ্য নহে। ইন্দ্রিয় পাঁচটি, এবং তাহার বিষয়ও পাঁচটি যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। এই পাঁচটি লইয়া জগতের যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি। ইহাদের মোহিনী শক্তি অতি আশ্চর্য্য, যে কোনটিতেই লোককে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতে পারে। মনে করুন অনতিদূরে বীণার মধুর নিক্কন শুনিতে পাইলাম। কর্ণের ধর্ম্মই এই যে, তাহা প্রতিধ্বনিত করিবে এবং মন তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক রসাস্বাদ করিবে। নারদ ঋষির মতে চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধারণ ধর্ম্মের বিলোপ করিতে পারিলে ভক্তি-সাধন হইয়াছে ও হইতেছে জানা যাইবে। একটু স্পষ্ট করিয়া বলিলে বোধ হয় সহজেই ইহা বুঝা যাইবে। ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত মন মিলিত হইয়া কার্য্য না করিলে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ-প্রসূত বিষয়জ্ঞান আমাদিগের কখনই জন্মিতে পারে না। সুতরাং মন যদি ভগবৎপ্রেম রস পানে মত্ত থাকে, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত মিলিত হইয়া বস্তুবিষয়ক জ্ঞান উৎপাদনে আর তাহার কোথায় অবসর রহিল?

সঙ্গ ত্যাগের গুণ অতি আশ্চর্য্য। সঙ্গ ত্যাগের অর্থ এখানে অসৎ সঙ্গ ত্যাগ—সৎসঙ্গ ত্যাগ নহে, কারণ, ইহার পরেই নারদ ঋষি বলিতেছেন "মহৎ সঙ্গ দুর্ল্লভোঽগম্যো চ হমোঘশ্চ" অর্থাৎ মহৎ সঙ্গদুর্লভ, অগম্য, এবং ভক্তি-সাধন বিষয়ে অমোঘ।

ভগবদ্ভজন, তাঁহার নাম কীর্ত্তন, এবং শ্রবণ দ্বারা অনুরাগ * বৃদ্ধি হয় ও মনোমালিন্য দূর হয়, এবং অনুরাগ জন্মিলেই কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এই ভাবই ভক্তির অঙ্কুর। এ পর্য্যন্ত সাধারণত ভক্তি নামেই যাহা কিছু বলা হইল। এক্ষণে ভক্তির বিভাগ করিয়া বিস্তৃতরূপে কিছু বলিতে হইবে। ভক্তিসাধক ভেদে দুই প্রকার—পরা ভক্তি ও গৌণী ভক্তি। গৌণী ভক্তিই সাধকের সাধনানুকূল, এবং এই ভক্তিই পরাভক্তির ভিত্তিস্বরূপ। শাণ্ডিল্য ঋষির মতে এই গৌণীভক্তি দ্বারাই চিত্তের পবিত্রতা জন্মে যথা "তাভ্যঃ পাবিত্র্যমুপক্রমাৎ" (শাঃ সূঃ ৫৯)। এই

* "রাগার্থ প্রকীর্ত্তি সাহচর্য্যাচ্চেতরেষাম্" (শাঃ সূঃ ৫৩)—নমস্কার, নাম কীর্ত্তনাদির ফল কেবল অনুরাগ। তীর্থপর্য্যটন, ভগবদ্ মূর্ত্তির পূজা, নাম কীর্ত্তন, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ইত্যাদি কার্য্য কেবল অনুরাগ বশত এবং অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত।

শাণ্ডিল্য ঋষিই আবার গৌণী ভক্তিকে তিন ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে তাহা বলা যাইতেছে।

ভগবদ্গীতায় ভক্তিকে সাধরণত চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী। যে ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া কাতর করুণ-কণ্ঠে, এক মন প্রাণ হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক মধুসূদনের নাম লইয়া থাকে তাহাকে আর্ত্ত ভক্ত কহে। যে ব্যক্তি ভগবত্তত্ত্ব জানিবার জন্য ঈশ্বরে, শাস্ত্রে, গুরুবাক্যে, এবং ব্রাহ্মণে ভক্তি করিয়া থাকে, তাহাকে জিজ্ঞাসু ভক্ত বলা যায়। যে ব্যক্তি স্বীয় কামনাসিদ্ধির নিমিত্ত ভগবানকে ভক্তি করিয়া থাকে, তাহাকে অর্থার্থী ভক্ত বলা যায়। এবং জ্ঞানবান্ ভক্তকে জ্ঞানী ভক্তি বলা যায়। প্রথম তিন প্রকার লক্ষণোপেত ভক্তের ভক্তিকে গৌণীভক্তি কহে, জ্ঞানীর ভক্তি নিষ্কাম, সুতরাং গৌণীভক্তির মালিন্য ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এখন এইরূপ একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে "আজ কাল তৃতীয় প্রকার ভক্তের সংখ্যার ন্যূনতা নাই, কিন্তু তাহাদিগের কামনা সিদ্ধি হয় না? চিত্তের উৎকর্ষতাও তো কিছু বুঝিতে পারা যায় না, ইহার কারণ কি?" আমাদিগের বোধ হয় যে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি করিবার জন্য যে একটু চিত্তের একাগ্রতা ও স্থিরতার আবশ্যক, তাহা তাহাদের আদৌ হয় না, সুতরাং বাঞ্ছিত ফল লাভের বা চিত্তের উন্নতি সাধনের আশা কোথা হইতে সম্ভবে? শুদ্ধ শুষ্ক সংস্কৃত ঈশ্বর স্তোত্র পড়িয়া শেষে "দাও ভক্তি, দাও প্রেম" বলিলে ঈশ্বর ভক্তি বা প্রেম দেন না—ভক্তি কি প্রেমের প্রার্থী হইলে, সেই প্রকারের আয়োজনের আবশ্যক, এবং তাহার অধিকারী হইতে হইবে। আধুনিক নব্য-ভক্ত-সম্প্রদায় দলবলের সহিত একাসনস্থ থাকিয়া, গদ্গদ-স্বরে (বিকৃত কণ্ঠে) ঈশ্বরের আরাধনা চ্ছলে যে কতকগুলি স্তুতিবাদ করিয়া থাকে, তাহাতে চিত্তের সবলতা ও নির্ম্মলতা হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহারা তাহাতে দিন দিন কপটাচারী হইতে থাকে। ভক্তের চিত্তের প্রতিবিম্ব স্বরূপ যে সকল বাহ্যিক ভাব (অঙ্গ বিকৃতি, রোমাঞ্চ, অশ্রুপাত, স্বরভঙ্গ, সময়ে সময়ে বেপথু) দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা যত্ন কৃত বা লোক দেখাইবার জন্য নহে, তাহা স্বাভাবিক এবং অন্তরের অবস্থার বাহ্য স্ফুরণ মাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় নব্য-ভক্ত-সম্প্রদায় উক্ত লক্ষণ গুলি অভ্যাস করিয়া ভক্তির ভাণ করেন মাত্র। ভক্তের অঙ্গে প্রাগুক্ত ভাবগুলি শোভা পায় কিন্তু যত্ন কৃত-ভাবগুলি শোভা পাওয়া দূরে থাকুক বরং বিষবৎ বলিয়া বোধ হয়।

এইবার আমাদিগের পূজাদি বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে। পূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?—উপাস্য দেবতার প্রীতি সাধন। কি হইলে তাঁহাদিগের প্রীতি সম্পাদন হয়?—হৃদয়ের ভক্তি। এক্ষণে বিরোধী নব্য-ভক্ত-সম্প্রদায় প্রশ্ন করিতে পারেন "তবে যে হিন্দুদিগের দেব দেবীর পূজায় ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ফুল ইত্যাদি আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রয়োজন কি?" আমরা বলিতেছি,—আছে বৈ কি? যদি বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে আছে বৈ কি? যদি বিষ্ঠা ও চন্দনে মনুষ্য হৃদয়ে দুই সম্পূর্ণ বিরোধী ভাবের উদ্রেক করিবার ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে আছে বৈ কি? একবার পূতি গন্ধময় স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেখুন, এবং তৎ পরক্ষণেই বেলা যুঁই, মালতী, গন্ধরাজ প্রভৃতি প্রস্ফুটিত উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া দেখুন—যদি হৃদয়ে কিছু বিষম ভাবের উদয় অনুভব করিতে পারেন, তাহা হইলে জানিবেন—পুষ্প, ধূপ, দীপাদির প্রয়োজন সহজ বোধ্য। ভক্ত! তুমিই জান পূজার সময় তোমার অন্তরের ভাব কিরূপ হয়। বাজনার তালে তালে কি তোমার হৃদয়ও নাচিতে থাকে না? পুষ্প চন্দন এবং ধূপাদির গন্ধে কিন্তু তোমার প্রাণ প্রফুল্ল হয় না? কি এক নির্ম্মল, অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাবে প্রাণ মন বিভোর হয় না?

যে ব্যক্তি ভক্তি কি তাহা জানে না, অথবা কখন ঈশ্বরে ভক্তি করে নাই, সে কি সহসা বিক্রম করিয়া বলিতে পারে আমি অদ্য হইতে ভক্ত হইলাম—আর ইহাই কি কখন সম্ভব পর? ভক্তি বিক্রমের বস্তু নহে—ভগবানের কৃপা সাপেক্ষ—এবং তাঁহার আদেশ বিহিত কর্ম্ম-কাণ্ড-সাপেক্ষ। কিন্তু এ সমস্তই গৌণী ভক্তি। পূজাদি দ্বারা যে ভক্তির অভ্যুদয় কামনা করা যায়, তাহা কেবল গৌণী ভক্তি। ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ না হইলে, পরা ভক্তি লাভ হয় না। আজন্ম যাহারা ভক্ত, তাহারাই ভগবানের বিশেষ অনুগৃহীত—এবং তাহাদের ভক্তিই পরা ভক্তি। শুন শুন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্ত-দিগকে কি অভয় দিতেছেন—

"সর্ব্বে নশ্যন্তি ব্রহ্মাণ্ডে প্রভবন্তি পুনঃ পুনঃ।
ন মে ভক্ত প্রণশ্যন্তি নিঃশঙ্কাশ্চ নিরাপদাঃ॥"

দেবার্চ্চনা ভক্তিলিপ্সু ব্যক্তির একটি সুগম পন্থা—হরিনাম সংকীর্ত্তন অপর একটি; তীর্থ পর্য্যটন আর একটি; ব্রাহ্মণাদির সেবা-শুশ্রূষা অপর একটি; ইত্যাদি। এইরূপ করিতে করিতে চিত্তের প্রসন্নতা ও নির্ম্মলতা জন্মে—

ইহাই ভক্তির অঙ্কুর মাত্র। ইহার পর যত রস ঢালিবে ততই সতেজ হইয়া বৃদ্ধি পাইবে। পরে যদি তাঁহাকে প্রীতি করিতে করিতে তাঁহার কৃপাকণা লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ভক্তির চরম পুষ্টিসাধন হইল—এবং সেই ভক্তি হইতেই অন্তে মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এই ভক্তি সরল বিশ্বাসীর সুখসাধ্য—তার্কিকের নহে। ভাই ভক্ত! প্রাণান্তেও যেন তর্ক করিও না—তর্ক তোমার জন্য নহে, জ্ঞানীর জন্য, তুমি যেন এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও—

"ভক্তিতে পাইবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

কুমারীর শিব-পূজা।

অজ্ঞানে পিতামাতার স্নেহে শৈশবকাল অতিবাহিত হইল, ধূলা খেলায় বাল্যকালও দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল; এই বার কৈশোরে সংসার-শিক্ষার সময় আসিল। রমণী-হৃদয়ই প্রেম-পয়োধি, অনন্ত বিশ্ব-প্রেম শিখাইবার সামগ্রী; সুতরাং প্রথমে প্রেমই বালিকা-হৃদয়ের শিক্ষার পদার্থ। ধূলি কর্দ্দম লইয়া বালিকা রন্ধন করিল, পাঁচ জন সম বয়স্ক বালক বালিকাকে তাহা ভোজন করিতে দিল, বালিকার হৃদয় আপন ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রেম জনিত আনন্দ অনুভব করিয়া পরম সুখী হইল। গ্রাম্য উৎসব দেখিতে গিয়া বালিকা দুই চারিটী পুত্তলিকা ক্রয় করিয়া আনিল, তাহাদিগকে পান ভোজন করিতে দিল, ছিন্ন বস্ত্রে সজ্জিত করিল এবং তাহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া আর পাঁচটি বালক বালিকার সহিত সম্বন্ধ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া প্রেমের সংসার রচনা করিল। এইরূপে বাল্যকাল কাটিল বটে; কিন্তু বালিকার বাল্যকালের সংসার-বন্ধন স্থায়ী হইল না; প্রত্যহ প্রেম পরিবার গঠন করে, আবার প্রত্যহ তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং সে এখন এমন একটি সংসারের সহিত হৃদয়কে বাঁধিতে চায়, যাহার সহিত ইহ জগতে

বিচ্ছিন্ন হইতে না হয় এবং ঘটনা-বিড়ম্বনায় নৈসর্গিক নিয়মে ইহ জগতের সম্বন্ধ ভাঙ্গিলেও পরকালে বা জন্মজন্মান্তরে সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে। যখন এই চেষ্টায় বালিকা-হৃদয় ব্যাকুল হইল, তখন তাহার বাল্যকাল অতীত হইয়া কৈশোর উপস্থিত হইল এবং তৎসহ হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি আরম্ভ হইল। হৃদয় এত দিন ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিয়া, তাহাতে অতৃপ্ত হইয়া—বিস্তৃত ক্ষেত্রের অনুসন্ধানে ফিরিতে আরম্ভ করিল। বালিকার শিক্ষার উপযোগী বিস্তর সহজ সহজ ব্রত নিয়ম ও কার্য্যপ্রণালী বালিকার চক্ষে পড়িল। কেবল জ্ঞানোপার্জ্জনে শিক্ষা হয় না, তাহার সহিত কর্ম্মের আবশ্যক; এই জন্য গীতা শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। যেমন সহজ জ্ঞান, কর্ম্মও তেমনি সামান্য; কিন্তু ইহাতে যে শিক্ষা নিহিত আছে, তাহা অন্যত্র বৃহৎকর্ম্মপ্রবাহেও আছে কি না সন্দেহ। অতি সহজ উপায়ে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম একত্র মিলিত হইয়া জগতের ভিত্তিরূপিণী বালিকাদিগের শিক্ষা ও হৃদয় গঠনের সামগ্রী হইয়াছে।

মানুষের পশুভাব এতই প্রবল, মানুষ এমনই স্বার্থপর যে, স্বার্থের ভিতর দিয়া ব্যতিরেকে পরার্থপরতা শিক্ষা হয় না। সুতরাং বালিকার সংসার-শিক্ষাও প্রথমে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া আরম্ভ হয় এবং ক্রমে অলক্ষিত ভাবে আপনাকে অতিক্রম করিয়া সংসারময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যে কোন ব্রত বা পূজাই হউক না, তাহার ফল সংসার ব্যাপী; জগৎ সংসারের জন্য যাহা করিবে, তাহাই স্থায়ী ও কার্য্যকর হইবে; কেবল আপনি ফলভাগী হইব, এই আশায় কর্ম্ম করিলে, তাহা বিড়ম্বনা হইয়া উঠিবে। এই জন্য গীতা শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মফল অর্পণ করিবার শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। বালিকা শিব-পূজা করে, মনোমত পতি পাইবার জন্য; কিন্তু তাহার ফল বর্ত্তে সমস্ত জগৎ সংসারের উপর। বিবাহে কেবল যে আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়, এমন নহে, বালিকা যাহাকে বিবাহ করে তাহাকে, তাহার আত্মীয় স্বজনকে এবং অবশেষে সমগ্র সমাজকে জগৎ প্রণয়ে অনুপ্রাণিত করে।

মনোমত পতি পাইবার জন্য শিবপূজার বিধি কেন? "কন্যা বরয়তি রূপং"—মহাদেবের রূপের সীমা কি! মস্তকে জটাজূট, বিষপানে ঢুলু ঢুলু চক্ষু, অঙ্গে চিতাভস্ম, পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কর্ণে ধুতুরা, গলে হাড়মালা, সর্ব্বাঙ্গে ফণিফণা। যাহা যাহা বিকট, যাহা যাহা উৎকট মহাদেবে

তৎসমস্তই আছে, তথাপি তিনি মনোমত পতির আদর্শ। পরমা সুন্দরী গিরিসুতা পার্ব্বতী আর পাত্র পাইলেন না; তাই উমেদারী করিয়া মহাদেবকে তপে তুষ্ট করিয়া তাঁহার গলায় বরমাল্য দিলেন! ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হিন্দু রমণী বাহ্যিক চাকচক্যে বিমোহিত না হইয়া, গুণের দাসী হইতে শিক্ষা করিবেন, সুতরাং বালিকার চক্ষে সুরূপের প্রয়োজন নাই। অনন্ত প্রেম শিক্ষাই বালিকার উদ্দেশ্য; সেই জন্য দিগম্বর তাহার আদর্শ পতি। অতি কুরূপও তাহার হৃদয়ের আদরের সামগ্রী হইতেছে। যে অলঙ্কার ও ধনের জন্য স্ত্রীজাতি একেবারে উন্মত্তপ্রায়, এমন কি মাতা সর্ব্বদা যাহাতে জামাতাকে অধিকারী দেখিতে চাহেন, মহাদেবে তাহার বিন্দুমাত্র না থাকিলেও তিনি আদর্শ জামাতা।

"মাতা বিত্তং"—মাতা চাহেন কন্যার স্বামী ধনশালী হইবে; কিন্তু মহাদেবের এক কড়া কাণা কড়িরও সম্বল নাই। যাহার একখানা লজ্জা-নিবারণ জন্য বস্ত্র যুটে না, যে পেটের দায়ে ভাং ধুতুরা খায়, গৃহাভাবে শ্মশানে মশানে ভ্রমণ করে, বাহন অভাবে দাগা ষাড় চড়িয়া বেড়ায়, অলঙ্কারাভাবে হাড়ের মালা গলায় পরে, সে যদি ধনবান তবে আর নির্ধন কে? তথাপি তিনি আদর্শ জামাতা। কেন না তিনি প্রেমিক, প্রেমের নিকট পার্থিব ধন যে অতি অপদার্থ, মহাদেবকে আদর্শ পতি করিয়া বালিকা তাহাই শিক্ষা করে। "পিতা শ্রুতম্"—পিতার ইচ্ছা পণ্ডিত জামাতা; কিন্তু মহাদেবে পাণ্ডিত্যের কিছুই লক্ষিত হয় না। যে জীবন-নাশক হলাহল পান করে সে যদি বিজ্ঞ, তবে অজ্ঞ কে? যাহার কর্ম্মাকর্ম্ম জ্ঞান নাই, যে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানবিবর্জ্জিত, সে যদি শাস্ত্রপারগ, তবে নিরক্ষর কে? তথাপি মহাদেব আদর্শ পতি। ইহার কারণ এই যে, বিশ্বপ্রেমের নিকট কি রূপ, কি ধন, কি বিদ্যা কিছুরই আদর নাই। যদি বিশ্বপ্রেম, রূপ বা ধন বা বিদ্যা সাপেক্ষ হইত, তাহা হইলে অনন্ত প্রেমের পথে বাধা পড়িত, কারণ সকলেই যে এই সকল গুণবিশিষ্ট হইবে, তাহা কখনই সম্ভব নহে। অবশেষে বিশ্বপ্রেম কুল, জাতি কিছুই অপেক্ষা করে না' সুতরাং যে সকল "বান্ধবা কুলমিচ্ছন্তি" তাঁহারাও মহাদেবকে পতির আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মহাদেব স্বয়ম্ভু, সুতরাং তাঁহার পিতামাতা, জাতি কুল কিছুই নাই। বিশ্বপ্রেম এ সকল কিছুরই অপেক্ষা করে না—যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই প্রেমপ্লাবনে প্লাবিত করিয়া ধাবিত হয়। এই সকল কারণে মহাদেবই প্রকৃত আদর্শ

তুমি কৃপা, তুমি ভক্তি,
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় শক্তি,
প্রেমিকের তুমি প্রেম, তুমি সে বিরহ।
তুমি মান, অভিমান,
তুমি দান, প্রতিদান,
তাই ব্রজবালা তোমা ভাবে অহরহ।
অভাগিনী মোরা নারী,
তুমি নয়নের বারি,
হৃদয়ে বসতি কর হৃদয়ের ধন।
বড় ব্যথা হ'লে পরে,
দেখি তোমা প্রাণভরে,
ধরিয়ে হৃদয়ে রাখি করি আলিঙ্গন।
তুমি দীপ্তি, তুমি রূপ—
তুমি রস, রস কূপ—
নীরস রসিক হয় লভিলে তোমায়।
তুমি ধারা যমুনার,
বাঁশরী মাধুরী ধার,
তুমি হে অমৃত-সিন্ধু এ মরু ধরায়।
তুমি মলয়ের বায়,
মধুমাস এ ধরায়,
তুমি তমালের শাখে কোকিল কূজন।
মরতের স্বর্গ ভূমি,
বিকচ নলিন তুমি,
তুমি মধু, তুমি অলি, তুমি হে গুঞ্জন।
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা,
সকলি তোমার ধারা,
সৃজেছ ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব তোমার কণায়।
তুমি রাধা, তুমি শ্যাম,
শুধু ভিন্ন ভিন্ন নাম,
একরূপে দুইরূপ অভেদ আত্মায়।

গোপ নারী মোরা নাথ।
প্রেম আশ তব সাথ,
এত কি পুণ্যের বল অবলা বালার।
তব অংশ বলে তাই।
যদি কিছু জানে রাই,
তুমি প্রেমচাঁদ, সে যে জোৎস্না তোমার।
নাহি তব আত্ম পর,
তাই ওহে নটবর।
ভরসায় ভাসে প্রাণ পদ লভিবারে।
দেখ দেখ চেয়ে দেখ।
রাখ রাখ মান রাখ।
অকূলে এসেছি বলে সবে তরিবারে।"

দেবশর্ম্মা।

নারীজীবন।

"বিদ্যাবতী ধর্ম্ম পরা কুলস্ত্রী লোকে নরাণাং রমণীয় বস্তুং
তৎশোভতে যস্য গৃহে সদৈব ধর্ম্মার্থ কামং লভতে স ধন্যঃ।

বিদ্যাবতী ও ধর্ম্ম-পরা কুলনারী এক মনোহর বস্তু, এই বস্তু যাঁহার গৃহে সর্ব্বদা শোভা পায়, তিনি ধন্য ও তাঁহার ধর্ম্ম অর্থ কাম লাভ হয়। এক্ষণে যদিও তাদৃশী নারী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু পূর্ব্বকালে এইরূপ নারীরত্ন দুর্লভ ছিল না। পূর্ব্বকালে যে সকল ধর্ম্মিষ্ঠা নারী ছিলেন, তাঁহাদের নাম লইলে স্বর্গের দেবী বলিয়াই পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহারা বাস্তবিকই এক একটি রত্ন। আত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাচীন মহিলাগণ অতি উচ্চধর্ম্মমন্ত্র

পতি। বালিকা হৃদয়ে একবার এই আদর্শপতির মূর্ত্তি অঙ্কিত হইলে, তাহা আর এ জন্মে মিশায় না—বিশ্ব-সংসারের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া থাকে। শুভ বিবাহে কন্যা ও তাহার পিতা এবং বন্ধুবান্ধব ভিন্ন অপর লোকে মিষ্টান্নের আশা করিয়া থাকেন। মহাদেবের বিবাহে তাহা মিলিবার সম্ভাবনা নাই বটে; কিন্তু যে বিবাহের বীজমন্ত্র বিশ্বপ্রেম, তাহাতে আপামর সাধারণ প্রেমে বদ্ধ হইলে, অপর মিষ্টান্নে প্রয়োজন কি? যে বিবাহে জগৎ সংসার এক অনন্ত প্রেম প্রবাহে পরিপ্লুত হয়, তাহতে মিষ্টান্নের অভাব নাই। সুতরাং যাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, এ বিবাহে তাহারা যেমন লাভের ভাগী, অপরেও তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে। এই সকল কারণে কুমারীগণ সংসার ক্ষেত্রে পদার্পণ করিবার সময় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার তুল্য পতির কামনা করিয়া থাকে। এ ব্রত রমণী জীবনের মহাব্রত এবং অতি কোমল সময়ে কুমারীগণ এ ব্রতে দীক্ষিত হয় বলিয়া, আজীবন ইহার সাধনা করিয়া হিন্দু পরিবারকে অমরাবতী করিয়া তুলে। ইহাতে ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার সুখের সম্ভাবনা এবং নিতান্ত সংস্রব-বিহীন লোকেও ইহার সুফল ভাগী হইয়া থাকে। অতএব হিন্দু গৃহে যত কুমারী আছে, সকলেই যেন এই মহাব্রত গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পবিত্রতা ও হিন্দু রমণী কুলের গৌরব বৃদ্ধি করে।

সেই বৃন্দাবন।

(যমুনাতট—সময় সন্ধ্যা।)

চেতন যমুনা কূলে,
চেতন তমাল-মূলে,
দাঁড়ায়ে কালিয়ে নট পীতবাস পরা।
চূড়ায় কুসুম দাম,
লেখা তাহে রাধা নাম,
গলে দোলে চাঁদ মালা সদা সুধা ভরা।

সেই সুধা লভিবারে
ফেরে অলি চারিধারে,
সেও গুন্ গুন্ স্বরে রাধা নাম গায়।
অলকা তিলকা গায়,
রতন নূপুর পায়,
কোটী রবি শশী তাহে লুটোপুটি খায়।
ললাটে চন্দন-চাঁদ,
রমণী-মোহন-ফাঁদ ;
ফুলধনু লয়ে তথা বসে আছে কাম ;
ব্রজ-কুল-বালা কুল
শ্যামে সঁপে দেয় কুল,
হেরে সেই সুকুমার ত্রিভঙ্গিম ঠাম।
শ্যামের বাঁশরী বোলে
ব্রজবালা হিয়া দোলে,
ঢেলে দেয় শ্যাম পদে যৌবন নিছনী ;
যবে সে বাঁশরী ভাষে,
নয়ন ঢুলিয়া আসে,
অবশ অলস অঙ্গ সুথির চাহনী।
থির বিজুরির মালা—
করে থাকে যেন আলা,
প্রেমিকা ব্রজের বালা যমুনার তীরে।
মন্ত্র মুগ্ধ ফণি প্রায়
আপনায় পাশরায়,
হৃদয় ভাসিয়ে যায় নয়নের নীরে।
যবে ঘোর ভেঙে যায়,
পড়িয়ে শ্যামের পায়,
কেঁদে কেঁদে কহে সবে আকুল পরাণে,—
"শুন শ্যাম গুণধাম!
তুমি শান্তি, তুমি কাম,
জপি মোরা তব নাম ধেয়ানে গেয়ানে।

অনেকে সাংসারিক জীবনকে বিরক্তিকর বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু ধর্ম্মভাবে চালিত হইয়া চলিতে পারিলে ইহাতেই পরম সুখ। যাঁহাদের ধর্ম্ম আছে, জীবনে সাধন ভজন আছে, তাঁহারা স্বীয় ধর্ম্মবলে কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করেন না। নারী সধবাই হউন আর বিধবাই হউন, যদি তিনি ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া কায়মনোবাক্যে ভগবানে আত্মা সমর্পণ করেন, তাহা হইলে আর তাঁহার ভয় কি? ঈশ্বর তাঁহার সকল দুঃখ খণ্ডন করেন। আমরা যে, যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, জীবনে ধর্ম্ম থাকিলে সুখের অভাব থাকিবে না। সংসারে লোক ধনের জন্য, মানের জন্য, যত ব্যস্ত থাকে, ধর্ম্মের জন্য তদ্রূপ হইলে ইহ জীবনেই স্বর্গসুখভোগ করিতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে কুমারী, সধবা, বিধবা সকলের জন্যই ঈশ্বর এক এক অবস্থায় সুখ রাখিয়াছেন। কুমারী বিদ্যা শিখিয়া, সধবা পতিসেবা করিয়া, বিধবা দেবী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব ধর্ম্ম সাধন করিতে অধিকারিণী। পূর্ব্বকালে এইরূপ প্রথাই প্রচলিত ছিল। আহা! ধর্ম্মের কি অপূর্ব্ব মহিমা। যে সকল মনুষ্য সর্ব্বদা কুসংসর্গ এবং পাপ কার্য্যে রত থাকে, তাহাদের জীবনেও যদি ধর্ম্মের ছায়া পতিত হইতে পারে, তবে সেই দুর্গন্ধ কলুষিত জীবনও কেমন অপূর্ব্ব হইয়া উঠে। আমার নিকট একখানা পুস্তক আছে, তাহার নাম "পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা।" ইহা পাঠ করিলে মনে কি সুখ হয়; রামায়ণে একটি হীনজাতীয়া তাপসীর বৃত্তান্ত আছে, তাহাও কি মিষ্ট, পাঠ করিলে মনে কি অপূর্ব্ব ভক্তির সঞ্চার হয়। দুঃখের বিষয় এই, ইদানীন্তন কালে নারীগণ মধ্যে তাদৃশ ধর্ম্মজীবন দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ কাল পুরুষের মধ্যে যদিও ধার্ম্মিক দুই একটি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ধার্ম্মিকা নারী বড়ই দুর্লভ। পূর্ব্বকালে এ রত্নের অভাব ছিল না। প্রতি তপস্বীর আশ্রমেই দুই একটী রত্ন শোভা পাইতেন। আহা! কবে আবার এমন দিন আসিবে, যখন প্রতি গৃহস্থের ঘরে রমণীগণ পবিত্র নারীজীবন লাভ করিয়া জগৎকে স্বর্গতুল্য করিবেন। যদি আমরা সকলেই ধার্ম্মিকা ও শুদ্ধাচারিণী হই, তবে অচিরে ইহজীবনেই স্বর্গ দর্শন করিতে পারি। হে ঈশ্বর! আমরা অবলা রমণী, আমাদের জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই, ধর্ম্মবল নাই। হে প্রভো! তুমি জ্ঞান দেও, বুদ্ধি দেও, আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মবল প্রদান কর। আমরা যেন চির দিন তোমার চরণের দাসী হইয়া থাকি। তুমি জ্ঞান, তুমি বুদ্ধি এবং তুমিই ধর্ম্ম, তোমার চরণ হইতে আমাদিগকে পৃথক রাখিও না। প্রভো

দয়াময়! চির দিন যেন তোমার পাদপদ্মে আমাদের মতি রতি থাকে। দয়াল! আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর। তুমি পাপহারী হরি, আমরা অজ্ঞান, কিরূপে তোমাকে ডাকিতে হয় এবং কিরূপেই বা তোমার পূজা করিতে হয়, কিছুই জানি না। প্রভো! আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই দাসীরা তোমার গুণ কীর্ত্তন করিয়া তোমার পাদপদ্মে ভক্তি করিয়া কৃতার্থ হইতে পাবে।

শ্রীমুক্তকেশী দেবী।

[শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি এ, হেডমাষ্টার, পুটিয়া হায়র ইংবাজি স্কুল, ডাক—নাটোর—আমাদিগকে লিখিয়াছেন, লেখিকা "ষোড়শ বর্ষীয়া"—"ইবাজি জানেন না, অন্তঃপুরে থাকিয়া রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছেন। বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখনে এই তাঁহার প্রথম উদ্যম।"

নবজীবন সম্পাদক।]

প্রাচীন কলিকাতার দুই একটী চিত্র।

আজ যে কলিকাতার এত নাম ডাক, এত সৌন্দর্য্য, এত গৌরব, দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে, ইংরাজ অধিকারের প্রথম অবস্থায়, ইহার কিরূপ ভাব ছিল, তখন কলিকাতার কোথায় কি ছিল, তাহা জানিতে অনেকের আগ্রহ থাকিতে পারে, আমরা এ সম্বন্ধে যত টুকু বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, অদ্য তাহার একটু পরিচয় দিব।

পলাশীর যুদ্ধের পরও কলিকাতা অরণ্যে পূর্ণ ছিল। এখন যে গঙ্গাতীর বাণিজ্য ও বায়ু সেবনের সুন্দর স্থান হইয়াছে সে সময় তাহা বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। চৌরঙ্গীর তখন নাম গন্ধ হয় নাই, কেবল ইংরেজের গৌরব ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সবে মাত্র তখন নির্ম্মিত হইতেছে। এক্ষণে যে স্থানে পর্মিট বা কষ্টম হাউস, ঐ স্থানে ইংরাজদিগের পুরাতন দুর্গ ও তাহার সন্নিকটে একটা ছোট খাট ডক্ ছিল, সেই ডকে কোম্পানীর বোট প্রভৃতি মেরামত হইত। তখন কলিকাতায় এত ষ্টীমার ছিল না, জাহাজ কদাচিৎ দেখা যাইত।

নারীজীবন গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম অদ্যাপি প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা পতিব্রতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁহারা আশ্রমে থাকিয়া পুরুষের ন্যায় তপস্যা করিতেন। অরুন্ধতী, অদিতি প্রভৃতি নারীগণ পতিসহ যোগাচারে রত থাকিতেন। স্ত্রীদিগের পৃথক যজ্ঞব্রত বা ধর্ম্মাচরণ নাই। স্ত্রীধর্ম্মার্থ কাম বিষয়ে পতিরই সহচারিণী ও অনন্ত জীবনের সঙ্গিনী। ইহাতেই তিনি নরলোকে ধন্যা ও সুরলোকে প্রশংসিতা হন। গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়া স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্যই ধর্ম্মচর্য্যা। হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত স্ত্রী গ্রহণ করে না। বাস্তবিক হিন্দুদিগের এ নিয়মটী অতি উৎকৃষ্ট। ধর্ম্ম নর নারী উভয়েরই অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। মনুষ্য হইলেই জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান ধর্ম্মের জন্যই আবশ্যকীয়। ধর্ম্ম বিনা জীবন নিরর্থ, ধর্ম্মহীন জীবনের কোন অর্থই নাই। মানবজীবনে যদি ধর্ম্মের চর্চ্চা বা সাধন ভজন না থাকে, তবে ইহার যে কি প্রয়োজন তাহা আমরা মনেও কল্পনা করিতে পারি না।

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতৎ পশুভির্নরাণাং
ধর্ম্মোহি তেষা মধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।

মনুষ্যেরা যেমন আহারাদি করিয়া থাকে, পশুরাও সেইরূপ করে, কিন্তু পশুতে এবং মানুষেতে বিশেষ এই যে, মানুষের ধর্ম্মবোধ আছে, পশুর তাহা নাই। ধর্ম্মহীন হইলে মানুষ পশুর সমান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অবলা নারীগণ অধুনা প্রায়ই সদাচার ও ধর্ম্মবর্জ্জিত। যাহাদের জীবনে ধর্ম্মের জ্যোৎস্না পতিত হয় নাই, তাহারা ঈশ্বর কি, ধর্ম্ম কি, কিছুমাত্র জানে না, তাহাদের জীবন ঘোর অন্ধকারময় নরক।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পুরুষই স্ত্রীলোকের জ্ঞানধর্ম্মের প্রতিবন্ধক, পুরুষের দোষেই নারী জাতির এত হীনতা! কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহা ছলমাত্র। স্ত্রীই হউন আর পুরুষই হউন, সকলেরই উন্নতির জন্য নিজেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। "আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু রাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।" আপনিই আপনার বন্ধু ও আপনিই আপনার শত্রু।

আবার অনেকের ধারণা এই যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীদিগের জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করিবার শক্তিই নাই,—এটিও নিতান্ত ভ্রমাত্মক কথা। কেননা, সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, তিনি জ্ঞান ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকলকেই সমান অধিকার দিয়াছেন।

স্ত্রীলোকদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবেন কেন? মৈত্রেয়ী, গার্গী, গৌতমী, অরুন্ধতী প্রভৃতি যে সকল মহিলার নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি এবং ধর্ম্মে পুরুষের ন্যায় উন্নতা ছিলেন। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মন অধিক কোমল, অতএব ধর্ম্মসাধনে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শক্তি অধিক বলিতে হইবে। তবে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্ত্রী-পুরুষের যদি বিদ্যা এবং ধর্ম্মে সমান অধিকার হয়, তবে পুরুষ অপেক্ষা বিদ্যাবতী এবং ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীর সংখ্যা এত অল্প কেন? উত্তর এই যে, স্ত্রীলোকদিগের নিজের উদ্যোগ ও উৎসাহ নাই। তাই তাহাদের এত দুর্দ্দশা। স্ত্রীলোকেরা নিজের দোষেই নিজে জ্ঞান ধর্ম্ম শূন্য হইয়া আছেন। "উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্য্যানি ন মনোরথৈঃ। নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।" সিংহ নিদ্রিত থাকিলে যেমন তাহার মুখে মৃগ প্রবেশ করে না, সেইরূপ উদ্যোগ বিনা লোকের মনোরথ সিদ্ধ হয় না। স্ত্রীলোকের নিজের উদ্যোগ নাই বলিয়াই তাঁহাদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের এরূপ হীন অবস্থা লক্ষিত হয়। অবশ্য পুরুষের সাহায্য ব্যতীত রমণীর পক্ষে বিদ্যালাভ দুষ্কর বটে, কিন্তু ধর্ম্মসাধন সেরূপ দুষ্কর নহে। আর বিদ্যালাভেই বা পুরুষকে অন্তরায় বলিব কেন? রমণী বিদ্যার জন্য প্রকৃত ব্যগ্রতা দেখাইতেছেন, অথচ পুরুষ তাহার সাহায্য করিতেছেন না, এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল, অন্তত আমি এরূপ দৃষ্টান্ত কোথাও দেখি নাই। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ তাঁহাদের রমণীদিগকে দেবী মনে করিতেন। তাঁহাদের আচরণও ঠিক দেবীর মতই ছিল। সেই প্রাচীনতার সহিত আধুনিক ভাবের অনেক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালের রমণীগণ গুরুজনদিগের সেবাশুশ্রূষাকে পরম ধর্ম্ম মনে করিতেন। আধুনিক নব্যাগণ গুরুজন দিগের সেবা না করিয়া সেবা পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে সেবা করাতেই অধিক সুখ। শরীর দ্বারা এবং আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিলেই জীবের জীবন সার্থক হয়। মহিলাগণ যদি উৎসাহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে সদাচার ও ধর্ম্মাচারে রত থাকেন, তাহা হইলে আর সুখসৌভাগ্যের সীমা থাকে না। সংসারে স্ত্রী-পুরুষ যদি এক হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্যক সাধিত হয়। ধর্ম্মময় জীবন বড়ই সুন্দর, ইহা সুগন্ধি ফুলের মত লোকের মনে আনন্দ দেয়। কর্ত্তব্যকার্য্যে অটল ও সর্ব্ব জীবে দয়া এবং ঈশ্বরে ভক্তি থাকিলেই জীব ধর্ম্মময় ও সুন্দর হয়। বিশেষত নারীজীবন ধর্ম্মময় হইলে আরো সুন্দর দেখায়।

নানা প্রকার বড় বড় দেশী নৌকায় তখন কোম্পানীর কাজ চলিত। আর এখানকার ন্যায় তখন কলিকাতায় এত ঘাটও ছিল না, পুরাতন কেল্লার সম্মুখে একটী এবং আরও দুই একটী সামান্য ঘাট মাত্র ছিল। কেল্লার ঘাটে কোম্পানীর লোকজন নামা উঠা করিত।

১৭৫৬ অব্দে নবাব সিরাজ উদ্দৌল্লার কলিকাতা আক্রমণে কলিকাতা-বাসীদের কিছু লাভ হইয়াছিল। নবাবের কলিকাতা আক্রমণে কলিকাতা-বাসীদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে বলিয়া তিনি সকল শ্রেণীর লোককেই সেই ক্ষতি পূরণের জন্য বিস্তর টাকা ধরিয়া দেন, সেই টাকায়, ইংরেজদের ত কথাই নাই, অনেক বাঙ্গালী নূতন নব বাড়ী প্রস্তুত করেন, অনেকের জরাজীর্ণ আবাস ও কুঁড়ে ঘর এই দুষ্ট সিরাজ উদ্দৌল্লার আক্রমণের ফলে নূতন আকার ধারণ করে। আর এই উনবিংশতি শতাব্দীতে ইংরাজ বাহা-দুরের কল্যাণে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া সহর আর একরূপ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। যাহা হউক, নবাব সিরাজ উদ্দৌল্লার আক্রমণ ফলে কলি-কাতার শ্রী একটু ফিরিয়া যায়, ও বর্ত্তমান ইংরাজ টোলার এই উপলক্ষে প্রথম সূত্রপাত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখন চৌরঙ্গীর নাম গন্ধ ছিল না; ইংরাজ দোকানদারেরা বাধাবাজার, চীনেবাজার, মুরগীহাটা ও আর্ম্মানি গির্জ্জার নিকট দোকান পত্র করিত, এখন ইংরাজেরা লালদিঘি, চৌরঙ্গী ও ও ধর্ম্মতলা অধিকার করায় বাঙ্গালীরা এই সকল স্থান অধিকার করিয়াছে। তখন লালবাজার এখনকার চৌরঙ্গীর সম্মান উপভোগ করিত, কোম্পানীর বড় বড় কর্ম্মচারীরা তখন লালবাজারবাসী ছিলেন। এই স্থান তখন কলিকাতার মধ্যে 'ভদ্রপল্লী' বলিয়া সম্মান লাভ করিত।

পুরাতন দুর্গের উত্তরাংশে কোম্পানীর কাপড়ের গুদাম ও অপরাপর অংশে কর্ম্মচারী লোকজনেরা বাস করিত। চৌরঙ্গী তখন বন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, কেবল কলিঙ্গায় একটি ক্ষুদ্র পল্লী ছিল। গড়ের মাঠের কতকটায় বন জঙ্গল আর কতকটা আবাদী জমি ছিল, তাহার মধ্যে দুই চারিখান কুঁড়ে ঘর দৃষ্ট হইত। এই সকলের মধ্য দিয়া একটি মাত্র রাস্তা গিয়াছিল, এই রাস্তা দিয়া তখন আলিপুর ও খিদিরপুরে যাইতে হইত। আলিপুর খিদিরপুর তখন যৎ সামান্য গ্রাম মাত্র, উপনগরের সম্মান লাভ তখন ঘটে নাই। এখন আদি গঙ্গা পার হইয়া এই দুই গ্রামে যাইবার নিমিত্ত যেরূপ কয়েকটি বৃহৎ সুবিস্তৃত লৌহ সেতু রহিয়াছে, তখন দুইটি অপ্রশস্ত কাষ্ঠের

সেতু ইহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছিল মাত্র। কলিকাতায় এখনকার মত তখন যেখানে সেখানে ব্রুম, বগী, ফিটনের হুড়াহুড়ি ছিল না; ভাল গাড়ীর মধ্যে ক্লাইবের একখানি এবং ওয়াট সাহেবের একখানি সবে মাত্র দুই খানি ছিল, তবে অল্পদিনের মধ্যেই সংখ্যা বাড়িতে লাগিল বটে। বাঙ্গালী-দিগের মধ্যে বড় একটা কেহ গাড়ী ঘোড়ার ধার ধারিত না। বড় লোকেরা পাল্‌কিতে করিয়াই প্রায় সকল স্থানে যাতায়াত করিতেন, আর বাঙ্গালী টোলায় তখন গাড়ি চড়িবারও বড় সুবিধা ছিল না। পাড়ায় পাড়ায় বন জঙ্গল আর পুকুর, বড় রাস্তার মধ্যে সবে চিৎপুর রোড, সুতরাং বাবুরা ভাল গাড়ী চড়ে, কি করবেন। কলিকাতার উত্তর পল্লী কয়টির বা বাঙ্গালী টোলার এখনকার তুলনায় তখন লোক সংখ্যা সামান্য হইলেও অধিবাসীর সংখ্যা বড় মন্দ ছিল না। কোম্পানীর চাকরীতে রোজগার থাকায়, কলিকাতার লোক সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল।

যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে সে সময় কলিকাতার স্বাস্থ্য বড় মন্দ ছিল। জ্বর, পালাজ্বর, পিলে, উদরাময় প্রভৃতি রোগগুলি তখন কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী সকলের নিত্য সহচর ছিল। এখন যেমন একজন ইংরাজ আপন অত্যাচারের ভোগে ভুগিয়া মরিলেও তাহার খবর পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত যায়, ও কথায় কথায় মিউনিসিপালিটী ও গ্যাস কোম্পানীকে তাহার জবাব দিহি করিতে হয়, তখন এত ঝঞ্ঝাট কাহাকেও পোহাইতে হইত না, অথচ প্রতি বৎসর আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে (অর্থাৎ বর্ষা ও শীতকালে) বার ঘণ্টার মধ্যেই অনেককে ইংরাজ লীলা সম্বরণ করিতে হইত। নবাব সিরাজ উদ্দৌলা যে বৎসর কলিকাতা আক্রমণ করেন, সে বৎসর মেজর ফিলপেট্রিক দুই শত চল্লিশ জন ইংরাজ-সৈনিক লইয়া ফল্‌তায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেখানে এই কয় মাসের মধ্যে দুই শত দশ জন সংক্রামক জ্বরে প্রাণত্যাগ করে।

১৬৮৯ সালের সংক্রামক জ্বরে আগষ্ট হইতে জানুয়ারী মাসের মধ্যে বার শত ইংরাজ অধিবাসীর মধ্যে চারি শত যাট জনকে কবরস্থ করিতে হয়। ১৭৬২, ১৭৬৮ এবং ১৭৭০ সালে কলিকাতায় জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে শেষোক্ত বৎসর জ্বর ও আমাশয় রোগে আশী হাজার বাঙ্গালী ও দেড় হাজার ইংরাজের কলিকাতা প্রাপ্তি হইয়াছিল। মনে করুন, এখন-কার তুলনায় তখন ইংরাজের সংখ্যা কত অল্প ছিল। কেবল কলিকাতাতেই

যে ইংরাজদিগকে এইরূপ বিনা বাক্য ব্যয়ে প্রাণ হারাইতে হইত তাহা নহে, জলপথেও প্রভুদের পরিত্রাণ ছিল না; ভাল বৎসরেই প্রত্যেক জাহাজের প্রায় সিকি লোককে ডায়মণ্ড হারবারে গঙ্গালাভ করিতে হইত। কলিকাতার মিউনিসিপালিটী সৃষ্টি হইয়া এই মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়াছে, তাই সাহেবদিগের মিউনিসিপালিটীকে লইয়া আজকাল এত আবদার বাড়িয়াছে ও কথায় কথায় মিউনিসিপালিটীর উপর আক্রোশ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা ঝাল ঝাড়িয়া থাকেন।

মৃত্যু সংখ্যার ন্যায় তখনকার কলিকাতায় আগুন লাগার সংখ্যারও বড় বাড়াবাড়ি ছিল। প্রতি বৎসরই বিস্তর গৃহ অগ্নিতে ছার খার হইয়া যাইত। তন্মধ্যে ১৭৮০ সালের ২৪শে মার্চ্চ শুক্রবার দিবসে কলিকাতায় যেরূপ অগ্নি' কাণ্ড হয়, সেরূপ অগ্নিকাণ্ড সমস্ত বাঙ্গালায় পরবর্ত্তী শত বর্ষের মধ্যে হইয়াছে কি না সন্দেহ। উক্ত দিবস বহুবাজারে প্রথম আগুন লাগিয়া জান বাজার ও কলিঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অর্দ্ধ ক্রোশাধিক পথে হাজার গৃহ ধ্বংশ করে। এই অগ্নিকাণ্ডে কত লোক পুড়িয়া মরে তাহার সংখ্যা নাই, তবে এই আগুনের ধুঁয়াতে এক শত নব্বই জন লোককে শ্বাসবদ্ধ হইয়া মরিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। এই বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডে কলিকাতায় বিস্তর লোক নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, আবার এই অগ্নিকাণ্ডের কথা শেষ হইতে না হইতেই এপ্রেল মাসে উহার নিকট পুনরায় এক ভয়ানক আগুন লাগে। এই সকলের দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, প্রাচীন কলিকাতার অধিবাসীগণ কতদূর নিঃশঙ্ক চিত্তে বাস করিতেন।

ইংরাজদিগের কলিকাতায় উপনিবেশ সংস্থাপনের প্রথম অবস্থায় পুলিস আদালত ছিল না। তখন মেয়র কোর্ট বলিয়া এক রকম আদালত ছিল। ১৭২১ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারীরা এই আদালত সংস্থাপন করেন। জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে মেয়র ও অল্‌ডারম্যানেরা তখন বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। এই সকল বিচারকার্য্য বড় চমৎকার ছিল, "জোর যার মুলুক তার" "টাকা যার জয় তার" এই প্রণালীতে তখন বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইত।

প্রাচীন কলিকাতায় হিন্দুধর্ম্মের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা লিখিতে গেলে বড় গোলে পড়িতে হয়। সাহেবরাই আমাদের দেশের সকল সময়ের ইতিহাস লেখক, বাঙ্গালী বাবুরা এ সকল বাজে কাজের ধার ধারেন না, আবার সাহেব-

দিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বেশী করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিশনরি, সুতরাং তাঁহাদের লেখায় নিন্দা ভিন্ন প্রশংসা খুঁজিয়া বাহির করিবার যো নাই; তবে আমরা এই নিন্দার মধ্য, হইতে এইটুকু ছাঁকিয়া লইতে পারি যে, তখনকার হিন্দুয়ানীতে ভেল চড়ে নাই, ভণ্ডামী, দোকানদারী করিবার লোক তখনও জন্মায় নাই, আর হিন্দুধর্ম্মের মুখপত্র বলিয়া তখন কেহ দাবী দাওয়া করিত না, সকলে সরল বিশ্বাসের সহিত হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম রক্ষা ও ক্রিয়া কাণ্ড পালন করিত। কারনওয়ার সাহেবের লেখায় বোধ হয় বৈষ্ণব অপেক্ষা শাক্তের প্রাদুর্ভাব তখন যেন কিছু বেশী ছিল; তাঁহার লেখার মধ্যে চিত্‌পুরে ও কালি-ঘাটে নরবলির কথা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই নর বলির সংখ্যাও যে বড় মন্দ ছিল না,—তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বলি গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইত। সতী দাহ, শিশু সন্তান গঙ্গায় নিক্ষেপ ও অন্তর্জ্জলির তখন বড় ধুম ছিল। দশহরা এবং পৌষ সংক্রান্তির দিন গঙ্গায় শিশু সন্তান নিঃক্ষেপের প্রশস্ত দিন ছিল। আমরা চিরকাল সতী "দাহের" কথাই শুনিয়া আসিয়াছি, অনেককেই যে জোর করিয়া নিষ্ঠুরভাবে 'দাহ' করা হইত,—আমরা বরাবর সাহেবদের মুখে ইহাই শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু কায়রওয়ার সাহেবের লেখায় আমরা দেখিতে পাইলাম, কোন কোন বিধবা স্ত্রী স্বামীর অনুগমন না করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে গঙ্গাতীরে যাইয়া বসিয়া থাকিত, পরে জোয়ারের স্রোতে তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। বোধ হয়, যাহাদের স্বামীর বিদেশে মৃত্যু হইত তাহারা এই প্রকার করিত। যাহা হউক, সতীদাহর মধ্যে নিষ্ঠুরতা থাকিলেও সাহেবরা সতীদাহ প্রথাটাকে হিন্দু রমণীর অবরোধ প্রথার ন্যায় ভীষণভাবে বর্ণনা দ্বারা হিন্দু হৃদয়ের যতটা নিষ্ঠুরতা, নির্দ্দয়তা ও পিশাচ ভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন, হিন্দু পুরু-ষেরা যে ঠিক সেই ভাবে পরিচালিত হইয়া কাজ করিতেন, শেষোক্ত ঘটনার দ্বারা ঠিক তাহা বোধ হয় না, বরং অনেক সতী স্ত্রীলোক যে স্বামীর মৃত্যুতে ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্ম বিসর্জ্জন করিতেন—গঙ্গাতীরে বসিয়া দেহ ত্যাগ করার ঘটনায় তাহাই বিশেষ প্রমাণ হইতেছে।

।কালীপ্রসন্ন দত্ত।

বনিবে না।

তোমাদের সঙ্গে আমার বনিবে না। কেমন করিয়াই বা বনিবে বল, তোমাদের সঙ্গে আমার প্রকৃতির আকাশ পাতাল প্রভেদ।

তোমরা সুখের কোলে লালিত পালিত হইয়া, পরিজনে বেষ্টিত হইয়া, কৌমুদী-স্নাত সৌধোপরি বসিয়া, আশার মোহন মূরতি হৃদয়ে আঁকিতে আঁকিতে যে সুখভোগ কর, আমি গাঢ় অন্ধকারাবৃত, প্রাবৃটধারায় সিক্ত, পরিজন-চ্যুত, একাকী এবং নির্জ্জনে অবস্থিত, লোক ভয়ঙ্কর শ্মশানক্ষেত্রে উপনীত—হইয়া তোমাদের চেয়েও সুখ পাই। এ ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুতে সুখের আবেগে, বড় বড় তরঙ্গ ছুটিতে থাকে, তাই বলি তোমাদের সঙ্গে আমার বনিবে না।

তোমরা সুখ চাও, আমি কেবল দুঃখ চাই; তোমরা সর্ব্বদা হাসিলে সুখ পাও, আমি এই নির্জ্জন স্থানে বসিয়া যদি দু ফোটা চক্ষের জল ফেলিতে পারি, তাহা হইলে আমার বড়ই সুখ হয়। তোমরা সুখ খুঁজিয়া খুঁজিয়া সারা হও, কাঁদ; আমি তোমাদের এই রহস্য দেখিয়া বড়ই সুখ পাই, আমার খুব হাসি আসে। তোমরা সুখের পেছুনে পেছুনে ছুটিয়া যে সুখ পাও, আমি কেবল তোমাদের সুখের কথা ভাবিয়া তাহা হইতেও আমোদ পাই। মোট কথায় তোমাদের সুখ এক রকম, আমার সুখ অন্য রকম। তবে বনিবে কি করিয়া?

মানুষ মরিলে তোমরা 'বিচ্ছেদের' জন্য কাঁদ, কিন্তু আমি কেবল 'তাহাদের' জন্য কাঁদি। তোমরা বল যে "তাহাকে আর দেখিতে পাইব না; সে যে একেবারে গেল; সে তো আর আসিবে না," আমি বলি তাহাকে দেখিতে পাইব, কিন্তু চিনিতে পারিব না। সে গেল আবার আসিবে, কিন্তু অন্য রূপে। তাহাকে দেখিব, তাহার কথা শুনিব, তাহাকে আবার পাইব কিন্তু চিনিতে পারিব না। তোমরা তাহার অস্তিত্ব লোপ হইল বলিয়া কাঁদ, আমি তাহার অস্তিত্ব রহিল বলিয়া কাঁদি। সুতরাং তোমাদের চেয়ে আমার কষ্ট বেশী।

শ্মশানের ন্যায় আমার মন। শ্মশানক্ষেত্রে যদি তোমরা ঘৃণা কর, তবে আমি তোমাদের ঘৃণার্হ। রাবণের চিতার ন্যায় আমার মন সর্ব্বদা ধু ধু

করিতেছে। তাহাতে পৃথিবীর সুখ-দুঃখ, মোহ-মায়া, প্রণয়-স্নেহ, মমতা-ভালবাসা, ভক্তি প্রীতি, দয়া-দাক্ষিণ্য, পূজা-যোগ, ভালমন্দ, মান অপমান, জ্ঞান অজ্ঞান, বুদ্ধি-বৃত্তি, স্বার্থ-পরার্থ, কাম নিষ্কাম, আলোক অন্ধকার, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, আস্থা অনাস্থা,—এই সকলই পুড়িতেছে। মনের যে গুণটা সোণার মত, তাহা এই আগুনে পুড়িয়া বিশুদ্ধ হইতেছে; যেটা অতি অকিঞ্চিৎকর, সেটা পুড়িয়া লয়প্রাপ্ত হইতেছে। স্বীকার করিলাম তোমাদের মনও চিতার মত। কিন্তু তবু তোমাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে প্রভেদ বিস্তর। চিতার্পিত দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে চিতা নির্ব্বাণ হয়। তোমাদের ঠিক্ সেইরূপ দশা। তোমাদের মন জ্বলিয়া উঠিল, যে জিনিষটা তোমাদের মনে ছিল, তাহা সেই সঙ্গে পুড়িয়া গেল। অবশেষে ফোঁস ফোঁস করিয়া ফোঁটা কত তপ্ত অশ্রু পড়াতে তোমাদের মনের চিতা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল—সব ফুরাইল। তার পর অন্য দ্রব্য আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিল, পূর্ব্বের চিহ্ন মাত্রও রহিল না। কিন্তু আমার মনে যখন চিতা জ্বলিয়া উঠে, তখন সেই চিতাধূম মনের সর্ব্বাংশ একেবারে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। চিতাও যত নিবিতে থাকে, সেই ধূমও তত আমার মনের অন্যান্য দ্রব্যের সহিত বিজড়িত হইতে থাকে। চিতা নির্ব্বাণ হইলে যে সকল অস্থি‌ও পড়িয়া থাকে সেগুলিও আমার মনের ভিতর স্তরে স্তরে চাপা পড়িয়া যায়। তোমাদের মন সমতল, আমার মন তদ্বিপরীত। আমার মনে 'পাড়' রহিয়াছে। সেই 'পাড়ের' এক পার্শ্বে তোমরা যদি দাঁড়াইতে পারিতে, তবে দেখিতে যে স্তরে স্তরে কত অসংখ্য চিতার স্তর রহিয়াছে। কত অস্থিখণ্ড, কত অঙ্গারখণ্ড, কত চিলুর দাগ—আরো কত কি! তাই বলি, আমার মনে যে আগুণ জ্বলিতেছে, তাহার কাছে পৃথিবীর আগুণ অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ, অতি হেয়।

আজি এক বৎসর পূর্ব্বে আমি একটী 'পোষ্টমর্টেম' অর্থাৎ শব-ব্যবচ্ছেদ দেখি। সে একটী কিশোরীর শব। বয়স ১৪।১৫ বৎসর। যখন তাহার হৃৎপিণ্ড উদ্ঘাটিত হইল, তখন একটী কথা আমার মনে পড়িল। সে কথাটী এই যে, লোকে বলে—

"আমায় হৃদয় যদি দেখাবার হ'তো,
বুক চিরে দেখাতাম ভালবাসি কত।"

কিন্তু কৈ? হৃৎপিণ্ডে যে কিছুই অঙ্কিত থাকে না। তাই আমি আমার হৃৎপিণ্ড চিরিয়া মানসিক শ্মশান দেখাবার ভাণ করিব না। তবে এই মাত্র

বলিতে পারি যে, যদি কেহ তোমরা যাহাকে বিনা কারণে বল, সেই বিনা কারণে শ্মশান ভ্রমণ, নির্জ্জন-রোদন, সংসারে বৈরাগ্য, অতর্কিত অশ্রুফোটা, শূন্যদৃষ্টি, জীবনে নির্ম্মতা, প্রকৃতির পূজা, অন্তরের ধ্যান, অসতর্কতা এইগুলির অর্থ প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তবে তিনি আমার মানসিক অবস্থা কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারেন। নচেৎ অন্যের কি সাধ্য যে আমার মনের কথা জানিতে পারে ?

তোমরা যাহাকে বীভৎস বল,—তাহাই আমার রম্য। তোমাদের যাহা ভাল লাগে না, তাহা আমার বড় আদরের। তোমাদের সঙ্গে আমার প্রকৃতি-গত প্রভেদ বিস্তর। তাই বলি তোমাদের সঙ্গে আমার বনিবে না।

তোমরা সংসারী, আমি বৈরাগী। তোমাদের চিন্তার অন্ত আছে, আমার চিন্তার অন্ত নাই। তাই আমি সদা অনন্তে ডুবিয়া থাকি। আমি 'অনন্তের' বিষয় ভাবিতে ভাবিতে যে সুখ পাই, তাহার বিন্দুমাত্রও বোধ করি তোমরা পাও না। সেই জন্য—

"Alone and pensive, the deserted strand
I wonder o'er with slow and measured pace,
And shun with eager eye the lightest trace
Of human foot, imprinted on the sand.

I find alas ! no other resting—place
From the keen eye of man , for in the show
Of joys gone by, it reads upon my face
The traces of the flame that burns be low.

And thus, at length, each leafy mount and plain,
Each wondering stream and shady forest know,
What others know not—all my life of pain."

জনশূন্য গঙ্গাতীরে, ভাবিতে ভাবিতে ধীরে,
একা একা ভ্রমি আমি পায়ে পায়ে গণে,'
বালুর উপরে লেখা, মানবের পদরেখা,
দেখিলে দূরেতে যাই চকিত নয়নে।

মানবের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ছেয়েছে সংসারসৃষ্টি,
জুড়াবার স্থান মম আর কোথা জুটে ?
অন্তরের দাবানল, মানবের লক্ষ্যস্থল,
যতই ছাপাতে যাই তত ফুটে উঠে।

তাইত,—

প্রান্তর, পর্ব্বতগণ, ছায়া-আচ্ছাদিত বন,
ধীর প্রবাহিনী নদী জানে মম ব্যথা,
জীবনের এ যন্ত্রণা, আর কেহ জানিল না,
মরমে রহিল মম মরমের কথা।

এক দিন তোমাদের সঙ্গে আমার বনিত। যে দিন মৃদু পবনের মৃদু মৃদু হিল্লোলে ছোট ছোট ঢেউগুলি, অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যের মৃদুরশ্মি সংস্পর্শে মণ্ডিত হইয়া, দুলিতে দুলিতে আমার হৃদয় দুকূলে আসিয়া ধীরি ধীরি প্রতিঘাত করিত, সেই দিন তোমাদের সঙ্গে আমার বনিত। হায়! সে দিন এখন আর আমার নাই,—সে দিন কখন আর আসিবে না। তবে আর তোমাদের সঙ্গে বনিবে কি করিয়া ?

সে দিনও আর নাই, সেই ঢেউগুলিও আর নাই। তাহার পরিবর্ত্তে, হৃদয় এখন একটী মহাসমুদ্রের আধার। যদি সাহস হয়, সেই সমুদ্রের বেলাভূমির উপর অবস্থান করিয়া দেখ, অনন্ত ব্যাপিয়া, নিম্নদেশে কি পড়িয়া রহিয়াছে! কি শান্ত, কি গভীর, কি প্রাণোন্মাদকর! ইহাতে 'উত্তমাশা অন্তরীপের' আবর্ত্ত নাই, 'কৃষ্ণসাগরের' ঝটিকা সঙ্কুলতা নাই। বন্যার ন্যায় ইহার জল ছুটে না; খরস্রোতার মত ইহাতে ডাক নাই। ইহার জল বড়ই প্রশান্ত, বড়ই স্বচ্ছ, এবং অনন্তবিস্তৃত। নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে, ফল্গু নদীর ন্যায় ইহা অনেক স্থলেই অন্তঃসলিলা। অনেক জলবিন্দুর সমষ্টিতে ইহা এইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু কার সাধ্য এখন ইহার গতিরোধ করে ?— সুতরাং তোমাদের সঙ্গে আমার বনিবে না।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মিলিবে না।

তোমায় আমায় কিরূপে মিলিবে গৌরাঙ্গ? তুমি নন্দনোদ্যানবিহারী, আমি পথের ভিখারী। সুপ্রশস্ত সুবাসিত সুশীতল সুরম্য হর্ম্ম্যে তোমার বাস,—বাত্যোৎক্ষিপ্ত বর্ষা-সলিল-সিক্ত কর্দ্দমময় কুটীরতলে আমার শ্বাসপ্রশ্বাস। বরুণ তোমার ভয়ে তটস্থ,—জমিয়া বরফ, সে বরফ-স্নিগ্ধ বিয়ার-বারুণী তোমার পানীয়। আর আমার পেয়—সকর্দ্দম কূপোদক, সমল সরোবর সলিল, অথবা ভগীরথের কঠোরতম তপোলব্ধ এখনকার এই জবাকুসুম-সঙ্কাশ জাহ্নবী জল। তোমার সহধর্ম্মিণী—দিব্য বসন ভূষিতা চারুচন্দ্রপ্রভাননী গৌরী! আর

"মন্দোদরী মে শয়নে বিলগ্না
স রাবণোঽহং দিকপাল হীনঃ।"

এমন উত্তম ও এমন অধমে কিরূপে মিলিবে, গৌর?

তুমি আছ, অমরাবতীতে—স্বর্গে। আর আমি, পাতালে—পূতিগন্ধময় অন্ধকার বিবর মধ্যে। দেখ, কেলো ভুলো আমার চাকর; তাহাও সকল সময়ে ঠিক বুঝিতে পারি না যে, তাহারা আমার ভৃত্য, কি আমি তাহাদের ভৃত্য। কিন্তু তোমার পরিচারিকা—স্বয়ং চপলা। কি বশীকরণ তুমি জান জানি না—যাহার প্রভাবে তুমি অত্যন্ত চঞ্চল, চঞ্চলতার আদর্শ সৌদামিনীকেও স্থির অচঞ্চল করিয়া গৃহে বাঁধিয়া রাখিয়াছ; আর সেও 'বিনা ওজর আপত্তিতে' তোমার ভৃত্যকে আহ্বান করিতেছে, তোমার সংবাদ দেশ দেশান্তরে বহন করিতেছে, আবশ্যক মত সুবিমল শুভ্র আলোক রাশিতে তোমার গৃহ ও উদ্যান উদ্ভাসিত করিতেছে,—আর কত কি করিতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। ধন্য তোমার মহিমা। তোমার প্রতাপে ক্ষণপ্রভা স্থিরপ্রভা হইয়া তোমার গৃহে নিত্য বিরাজমানা। তুমি স্বর্গের দেবতা, আর আমি মর্ত্ত্যের মানব। কত অসাধ্য, কত অদ্ভুত কার্য্য তোমার দ্বারা সাধিত হইতেছে। আর আমার দ্বারা কি হইতেছে? আমি কি? আমি তোমার পদলেহী ভৃত্য মাত্র। তোমাতে দেবত্ব, আর আমাতে নিগারত্ব। এমন উত্তমে ও এমন অধমে কেমনে মিলিবে, দেব?

ব্রহ্মতেজ এখন তোমারি। শুনিতে পাই, সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণ ফুৎকারে

অগ্ন্যুৎপাদন করিতে পারিতেন। সত্য মিথ্যা সেই সর্ব্বজ্ঞ দেবই জানেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাই, তোমার সঙ্গে অগ্নি সর্ব্বদা বিদ্যমান। তোমার বাক্যে অনল বাহিব হয়, তোমাব বুটাঘাতে অনল নিকলে, তোমাব বেত্রে ত অগ্নি বিদ্যমান আছেনই, তোমাব পকেটেও বহ্নিদেব সর্ব্বদা বিরাজমান। স্নুতবাং তুমিই এক্ষণে এই প্রবল কলিযুগে নিষ্ঠাবান বব-ব্রাহ্মণ, তাহাব সন্দেহ নাই। আর তাহা না হইলে ইংলণ্ডে বসিয়া মোক্ষ মূলব সাহেব হিন্দুব শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণপণ্ডিতেব 'বিদায়' পাইলেন কিরূপে? ব্রাহ্মণেব বাক্যই বেদ। সে বেদবাক্যে এখন আমাদেব অটল বিশ্বাস। তাইত বলি, সামৃগযজুঃ কেবল কৃষকদেব ভযগীতি মাত্র বই ত নয। যোগ, এখন কেবল তোমাবি সাধ্য। প্রমাণ—অল্‌কট্‌ সাহেব। 'যজন যাজনের' কথা কেহ জিজ্ঞাসা কবিবে না। কেন না তুমি ব্রহ্মদেশ হইতে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত সমগ্র দেশটা যেরূপ যজাইযাছে, তাহা লোক-বিশ্রুত। 'অধ্যযন অধ্যাপন'—শিক্ষাবিভাগেব বিববণীতেই প্রকাশ। আব দান প্রতিগ্রহণে' তোমাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বাহাদুবী। দুই চাবিটা ফাঁকা আওযাজ 'দান কবিয়া তুমি দেশীয় ভাবত ভাণ্ডাবস্থ অমূল্য বত্ন সকল যে অতুলনীয় অনুকম্পার সহিত 'প্রতিগ্রহণ' কবিতেছ—তাহা বাস্তবিক প্রশংসনীয়। বালকে যেরূপ "গোপ্তাখেকো" ঘুডীতে "কান্নে" অথবা "নেজুড়" লাগাইয়া দিয়া আকাশ কোলে উডাইতে পাবে, তুমিও সেইরূপ বডলোকদিগের নামে এক আধটু নেজুড যুড়িয়া দিযা বিশেষ দক্ষতাব সহিত অত্যুচ্চে উড়াইতে পার; এবং বাযুবেগে তাঁহাবা ছিন্ন ভিন্ন হইযা গেলে তুমি সেই বালকদেবই মত নির্ম্মম ও দ্বিধাশূন্য চিত্তে তাঁহাদিগকে অক্লেশে পবিত্যাগ কবিতে পাব, —স্নুতরাং তুমি বালকেব ন্যায সবলচিত্ত তাহাতে আব সন্দেহ কি? পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদেব কোথায়ও যাইতে নিষেধ ছিল না, এখন তোমাবি সর্ব্বত্র অবা-রিতদ্বাব। আমবা যেখানে গেলে গলা ধাক্কা খাইয়া "হাত মুখ" লেহন করিতে কবিতে হৃতাহাটাব চোবেব মত ফিবিযা আসি, তুমি সেথানে সগর্ব্বে অবাধে প্রবেশ কবিতে পাব। পুলিশ প্রতিকৃতি দ্বাবী মহাশয় তখন সশঙ্কে আভূমি সেলাম কবিয়া তোমাকে দ্বাব ছাডিয়া দিযা সবিযা দাঁড়ায়। এমন প্রতাপান্বিত—এমন প্রবলেব সহিত এমন দুর্ব্বলেব মিলন কি কখন সম্ভব?

প্রকৃতি অধম আমি তোমাব বিচাবেও আমাব অধিকাব নাই। তবুও আমি তোমাব স্বরূপকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতেছি, তবু আমি তোমাব সহিত

মিলিবার—তোমার সমান হইবাব স্পর্দ্ধা করিতে যাইতেছি, আমার ধৃষ্টতা কম নয়! কিন্তু দেব! আমার এ অপরাধেব মূল তুমি। "ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।" তুমিই আমাকে 'Struggle for existence' কি, বুঝাইয়া দিয়াছ। আর যখন Struggle for existence পদার্থটা বুঝাইয়াছ, তখন 'Survival of the fittest' কি, তাহা কি আমাকে বুঝাইবে না? অবশ্যই বুঝাইবে। তাই ত তোমার গুণকীর্ত্তন কবিতে বসিয়াছি—তাই ত তোমাব অনুগ্রহ লাভে এত যত্ন। তোমাব অনুগ্রহ ব্যতীত কিছুতেই ত কৃতকার্য্য হইতে পাবি না। নিজ ভুজবীর্য্যবলে পবাজয় আটকাইযা বাখিতে পাবি না। তোমাব প্রতি ভক্তি না দেখাইলে পরিত্রাণ পাই না। যে দিনই শুভ্র বজত পুষ্পে নিকুম্ভিলা যজ্ঞে তোমায় পবিতুষ্ট করিতে পাবিয়াছি, সে দিনকার যুদ্ধে, দেখিযাছি, জয় আমাকেই আশ্রয় কবিয়াছে। তাই ত তোমাব পূজার জন্য আমাব এত আকিঞ্চন। তোমায় আমাব কখন মিলিবে না বলিযাই আমি তোমায এত পূজা কবি। তাইতে বলিতেছি,—

আমাব এ সঙ্কীর্ত্তনেব মাঝে একবাব
এস, হে গৌব!
তোমায দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে
এস, হে গৌব!
যদি 'বিলাত' ছেড়ে রইতে নাব,
আমাব এই 'ভারত' মাঝে বিলাত কব।
তুমি হৃৎপদ্মে অধিষ্ঠান কব, আমি তোমায় ষোড়শোপচারে পূজা করি।

লীলা।

১ম অধ্যায়।

বামদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং সুপণ্ডিত। তাঁহাব একটী পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্র হবদয়াল কলেজে পড়েন। কন্যা লীলা, সে বালিকা।

রামদয়ালের বড় সাধ পুত্রটীকে মনের মত সুশিক্ষা দেন। কিন্তু বিধাতা ক'জনকে মনের সাধ পূর্ণ করিতে দেন! হরদয়াল পৃথিবীর মায়া—পিতার মায়া পরিত্যাগ করিলেন।

পুত্র শোকে রামদয়ালের স্ত্রী চিররুগ্না হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন। রামদয়ালের আর পুত্র হইবার আশা রহিল না। কিন্তু তিনি মনে মনে আবার প্রতিজ্ঞা করিলেন "লীলাকে সরস্বতী করিব।"

রামদয়ালের যে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ছিল—তাহাতে একটী ক্ষুদ্র পরিবার বেশ সম্ভ্রমে থাকিতে পারে। সুতরাং তিনি চাকরী ও বিদেশ ছাড়িয়া স্বদেশে আসিলেন। লোকে তাঁহার শোকে শোক মিশাইয়া হরদয়ালের অভাবযাতনা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিল—তিনি লীলাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন, "লীলা আমার শত হরদয়াল।"

বাড়ী আসিয়া রামদয়াল এক নূতন চাকরী লইলেন—চাকরী অবৈতনিক কিন্তু রামদয়াল শিমলা শিখরে বসিয়া বিশ হাজার টাকা পাওয়ার চেয়েও তাহা অতি বেশী সুখের বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তিনি লীলার শিক্ষক হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস এইরূপ শিক্ষক হইলে নারীর উচ্চ শিক্ষার ফল যৌবন স্রোতে বিষের সাগরে ভাসিয়া যাইতে পারে না।

২য় অধ্যায়।

রামদয়াল লীলাকে অতি সাবধানে লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন। লীলা শিক্ষার এক পদ অগ্রসর হইলেই তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন—উহাকে সরস্বতী করিতে পারিবেন।

লীলার বয়স যখন নয় বৎসর হইল তখনই লীলা রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া পিতাকে শুনাইত এবং ধর্ম্মনীতি, চারুপাঠ, সীতার বনবাস, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ও নব নারী প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থ ব্যাখ্যা করিয়া পড়িতে পারিত। আর অতি পরিষ্কার অক্ষরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও কবিতা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারিত।

রামদয়াল দেখিলেন কন্যার বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণ জ্ঞান সুন্দর জন্মিয়াছে, সুতরাং আর এখন উহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া একযোগে

সংস্কৃত ও ইংরেজী পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। লীলা খেলার আনন্দে তাহা শিখিতে লাগিল।

তের বৎসর বয়সের সময় লীলা একদিন পিতার শিয়রে বসিয়া পড়িতেছে। একখানি পুথি বাম হস্তে ধরিয়া ক্রোড়ে রাখিয়াছে—আর এক খানি ডান্ হাতে ধরিয়া মৃদুস্বরে পড়িতেছে। এই সময়ে রামদয়ালের এক জন প্রাচীন বন্ধু উপস্থিত হইয়া বসিলেন। লীলার কোমল মাধুরীতে তাঁহাকে বিস্মিত ও মোহিত করিল। তিনি জিজ্ঞাসা—করিলেন—"মা তুমি ও খানি কি পড়িতেছ," লীলা ধীরে ও সম্ভ্রমে কহিল "গীতা।"

বন্ধু অবাক্ হইয়া রামদয়ালের মুখপানে চাহিলেন। রামদয়াল হাসিয়া বলিলেন, "গীতা উহার কণ্ঠাগ্রে—নিজে ব্যাখ্যা করিয়া ও বুঝিয়া পড়িতে পারে।" বন্ধু পুনরায় লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বাঁ হাতে ও খানি কি বই মা?" এবারে লাজ-শীলা লীলা একটু হাসিয়া বলিল "জন বুনিয়ানের পিল গ্রিমস্ প্রগ্রেস" বন্ধু নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ!

৩য় অধ্যায়।

লীলার পনের বৎসর বয়স হইল। গ্রামের লোক ছি--ছি করিতে লাগিল—আর এ দিকেও কত সম্বন্ধ আসিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিল।

লীলা কুলীন কন্যা বটে, কিন্তু সে জন্য যে উহার বয়েস বেশী হইয়াছে তাহা নহে। রামদয়াল কন্যা চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারেন না। সুতরাং তিনিই দোষী।

লীলা পনের বৎসরের হইয়াছে এবং ইংরেজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বেশ শিখিয়াছে বটে—কিন্তু এখনও তাহার বালিকা ভাব যায় নাই—এখনও পৃথিবীর দূষিত বায়ু তাহার গাত্র স্পর্শ করিতে পায় নাই। লীলা কেবল বহি পড়িয়াছে, পীড়িতা মাতার সেবা করিয়াছে, এবং পিতার উজ্জ্বল বদন নিয়ত দেখিয়াছে। ইহা বৈ লীলা নূতন কিছু জানে না, নূতন কিছুই শিখে নাই।

একদিন রামদয়াল কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"লীলা এখন তোমার বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, এখন আর রাখিতে পারি না, স্বামীগৃহে সকলের প্রিয় হইয়া থাকিতে গেলে অনেক কষ্ট সহিতে হইবে"—

লীলা দেখিল পিতৃদেবের দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে—স্নেহময়ী কি উত্তর দিবে,—তবে অশ্রুপাতের প্রতিদান যদি অশ্রুপাত হইতে পারে তবে লীলার নয়ননির্ঝরই তাহার যথেষ্ট উত্তর। লীলা কাঁদিল—

"মা কাঁদিতেছ কেন?"

"তুমি কাঁদিলে কেন বাবা?"

"তোমার বিবাহের কথায়"

"বিবাহ?"

"হাঁ—মা"

"তবে বিবাহে কাজ কি?

রামদয়াল হাসিলেন—হাসিয়া বলিলেন, 'বিবাহে কাজ না থাকিলেও বিবাহ করিতে হয়। নারীর স্বামী বই গতি নাই। স্বামী পিতা মাতা হইতে উচ্চ—স্বামী দেবতা। নারীর বিবাহের অর্থ—নারীর দেবসেবায় রত হওয়া। এখন তোমার বয়স হইয়াছে—এখন কঠোর ব্রত ধারণ করিতে পারিবে, দেব-সেবা করিতে সক্ষম হইবে—এখন তোমাকে গৃহে রাখিলে আমাদের পাপ হইবে।'

লীলা শুনিল, কিছু বলিল না। রামদয়াল পুনরায় বলিলেন "লীলা, তুমি সুশিক্ষিতা, এবং তোমার ভাল মন্দ বুঝিবার উপযুক্ত বয়সও হইয়াছে, তুমি যদি লজ্জা না করিয়া আমার কথার সদুত্তর দাও, তবে আমাকে বড় খুসী করিবে।"

লীলা বলিল, "কি জিজ্ঞাসা করিবে, কর।"

রামদয়াল হাসিয়া কহিলেন "সিন্ধুকে দেখিয়াছ?"

"যিনি সংস্কৃত কবিতা লিখিয়াছিলেন?"

"হা।"

"দেখিয়াছি।"

"তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিতে চাহি।"

লীলা ইহার কোন উত্তর দিল না—ধীরে ধীরে পিতার নিকট হইতে উঠিয়া মাতার শয্যাপ্রান্তে যাইয়া বসিল।

রামদয়াল লীলাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা বোধ করিলেন না। লীলার ফুল্ল বদন এবং নৃত্যশীল নয়নই তাঁহার প্রশ্নের পরিস্ফুট উত্তরদান করিল।

৪র্থ অধ্যায়।

লীলার বিবাহ হইল। লীলা সুখী হইল—ভাবিল, "নবজীবন পাইয়াছি—পতিসেবা নহে—যথার্থই দেবসেবা করিতে পাইয়াছি—ইহার পরেই বুঝি স্বর্গ—সে স্বর্গ, কত দূরে, কত উচ্চে"?

চাঁদে কলঙ্ক না থাকিলে চন্দ্র-মাধুরী পরিস্ফুট হইত না। কমলদলে কণ্টক না থাকিলে কমলের গৌরব বাড়িত না, সুখ-দুঃখ মিশ্রিত না থাকিলে সুখ সুখের হইত না। তাই সহসা লীলা চন্দ্রে কলঙ্কপাত হইল,—লীলার সুখের হাসি—না ফুরাইতেই দুঃখ আসিয়া তাহাকে ঘিরিল।

বিবাহের ছয় মাস পরে লীলার মা মরিল; আর ছয় মাস পরে বাপ মরিল—তাহার তিন মাস পরে স্বামী শয্যাগত রোগে মৃতপ্রায়। ধর্ম্ম-বল—যোগ-বল—ঐশী-বল কি সৌভাগ্য-বল—যে বলেই বল—লীলা বিধবা হইল না। লীলা স্বামীকে কলিকাতা নিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইল। স্বামী মৃতদেহে জীবন পাইল—কিন্তু তাঁহার পৌরুষ শক্তি নষ্ট হইল।

লীলা রুক্মা নহে, লীলা আমেরিকা বা ইউরোপীয় ললনা নহে, লীলা নারীসমাজ-সংস্কারিনী বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিতাও মনে করে না; সুতরাং স্বামীর পুরুষ শক্তি ধ্বংশাধ্বংশের জন্য সে কিছু মাত্র বিষণ্ণ নহে। স্বামী মৃত্যু-মুখ হইতে বাঁচিয়াছেন এই তাহার আনন্দ, স্বামীপদসেবা তাহার সুখ। পতিসেবা—দেবসেবা—ইহা হইতে সে বঞ্চিত হয় নাই, ইহাই তাহার শান্তি। যে কাজ সে জীবনের লক্ষ্য মনে করিয়াছে, তাহা তাহার বজায় রহিয়াছে সুতরাং—আর সে কিছুই চাহে না।

লীলার জন্য লীলার স্বামী বিষণ্ণ। লীলার রূপ গুণ মুগ্ধা পরিচিতা রমণীগণ বিষণ্ণ, কিন্তু লীলা বিষণ্ণ নহে। তাহার সুখ ও প্রফুল্লতা এখনও হৃদয়ে আতট পূর্ণ। তন্মধ্যে কেবল একটু চিন্তা, পাছে স্বামী মনে করেন ইন্দ্রিয় সেবনে অসমর্থ হইয়া সে কষ্ট পাইতেছে বা অসুখে আছে।—শুদ্ধ এই ভয়ে বা ভাবনায় লীলা সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বামীকে সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। লীলা অধিকতর স্বামী সেবা প্রিয়—এবং অধিকতর আনন্দিতা ও সর্ব্বদা হাস্যমুখী, ইহা দেখিয়া তাহার স্বামীর আর বিস্ময়ের পার রহিল না।

এ হেন স্ত্রীরত্ন তাহার সহবাসে বনকুসুমের ন্যায় বিশুষ্ক হইবে ইহা

ভাবিয়া তিনি অস্থির। লীলা কোমলকরে যখন তাঁহার পদ সেবা করে তখন তিনি লীলার দুঃখে ক্রন্দন করেন—লীলা অঞ্চলে তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া সান্ত্বনা করে।

একদিন পদ সেবা তাঁহার অসহ্য হইল—ধীরে কোমল বন্ধন হইতে পদ মুক্ত করিয়া বসিলেন—কি ভাবিলেন—পরে বলিলেন—"লীলে, সিন্ধুনাথ মুখোপাধ্যায় তোমার কে?" লীলা হাসিয়া বলিল "আমার কে?—আমার স্বামী—আমার দেবতা।" এবারে সিন্ধু কাঁদিয়া বলিলেন—"তোমার সিন্ধু মরিয়াছে, সে ক্লীব, ধর্ম্মমতে তুমি পুনরায় বিবাহ করিতে পার—তাহা করিতে হইবে।"

লীলা তাঁহার পদদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।—কাঁদিয়া বলিল "কি অপরাধে দাসীকে এ নিষ্ঠুর কথা কহিতেছ, তোমার একটা পিস্তল আছে, যদি অপরাধিনী হইয়া থাকি তাহা দিয়া আমাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেল—এরূপ কথা শুনাইয়া কষ্ট দিও না।" সিন্ধু নীরবে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

৫ম অধ্যায়।

সিন্ধুনাথ মুখোপাধ্যায় যুবাপুরুষ, সুন্দর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। সংসারে পিতা মাতা, ভাই ভগিনী কেহই নাই, স্বয়ং বিপুল পৈত্রিক বিষয়ের এক মাত্র অধিকারী। তাঁহার পীড়া না হইলে লীলার ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিতা ও পরমা সুন্দরী স্ত্রী লইয়া তিনি পৃথিবীর সম্রাটকেও এক দিন তুচ্ছ করিতে পারিতেন—কিন্তু কি বিষম বিড়ম্বনা।

সিন্ধু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন কলিকাতা থাকিবেন, যে কোন উপায়ে হয়, লীলাকে বিবাহ দিয়া সুখী করিবেন। ইহা করিতে যাইয়া সমাজে ঘৃণিত হইতে হয়, জাতি কুল হারাইতে হয়,—তাহাতেও স্বীকার। তিনি ভাবিলেন নামে মাত্র বিবাহ করিয়া এহেন সুন্দরী লীলার চিরসুখের কণ্টক হইয়া থাকিবেন না।

সিন্ধু বিবাহে রাজি করিবার জন্য লীলাকে কত অনুনয় বিনয়, কত প্ররোচনা, কত অনুরোধ, কত উপদেশ, কত তিরস্কার করিলেন; কিন্তু লীলার হৃদয় অটল। এরূপ অটলতা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে

লজ্জাবশতই লীলা বিবাহে এরূপ অস্বীকৃত হইতেছে। সুতরাং আর মুখে কিছু না বলিয়া কৌশল অবলম্বন করাই শ্রেয়।

প্রথম কৌশল—সিন্ধু তাঁহার তিনটী অবিবাহিত বন্ধুকে লীলার নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন, ইহার এক জন ব্রাহ্ম, দুই জন খৃষ্টান—তিন জনই সুশিক্ষিত সুন্দর ও যুবক। সিন্ধু নিজ উদ্দেশ্যও তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—এরূপ সুবিধা কোন্ রসিক যুবা অবহেলা করিতে পারে—সুতরাং তাহারা প্রতিনিয়ত লীলার সহিত কথোপকথন করিতে আসিতে লাগিল। কিন্তু লীলা স্বামীর অনুরোধ উপেক্ষা করা পাপ মনে করিয়া, অতি কষ্টে তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন। অবশেষ সিন্ধুর বন্ধুত্রয় ক্লান্ত হইয়া হারি মানিলেন, একে একে সকলেই সিন্ধুকে বলিলেন "লীলা সাধারণ নারী নহে—দেবী, ছলে বলে বা কৌশলে কিছুতেই তাহার চিত্তাকর্ষণ করা তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।"

কৌশল ব্যর্থ হইল দেখিয়া সিন্ধু মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, অন্যে বিবাহ করিলে তাঁহার এই বিপুল ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইবে বলিয়া হয় ত লীলা বিবাহে স্বীকৃতা নহে। সুতরাং উকিলবাড়ী যাইয়া লীলার নামে সমস্ত বিষয় সম্পত্তির দানপত্র প্রস্তুত করিলেন, এবং যথারীতি রেজেষ্টরি করিয়া আনিয়া লীলার হাতে দিলেন।

এক মাস পর লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দানপত্রখানি যত্নে রাখিয়াছ?"

"দানপত্র কি?"

"আমার সমস্ত বিষয় যে তোমার হইয়াছে সেই দলিল?" লীলা হাসিয়া বলিল "তোমার হইলেই আমার হইল, তার আবার দলিল কি?"

সিন্ধু বলিলেন "এক মাস হইল তোমাকে একখানি কাগজ দিয়াছি, তাকি তুমি পড় নাই?"

"না"

"পড় নাই?"

"না—তুমিত পড়িতে বল নাই?"

"তবে কি করিয়াছ?"

"বাক্সে রাখিয়াছি।"

সিন্ধু আশ্চর্য্য হইলেন—বলিলেন "দলিলখানি লইয়া আইস।"

লীলা তিলমাত্র গৌণ না করিয়া দলিল আনিয়া স্বামীর হাতে দিল। সিন্ধু বিষয়গুলি পাঠ করিলেন।

লীলা বিস্মিত হইয়া বলিল "আমার নামে কেন?" সিন্ধু বলিলেন "এখন হইতে সকল বিষয়ই তোমারই হইল, যাহা খুসি করিতে পারিবে—আমার কিছুতেই অধিকার থাকিল না।"

লীলা কাঁদিয়া বলিল—"নির্দ্দয় হইলে কেন, আমি ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করিব, তুমিই আমার একমাত্র ঐশ্বর্য্য।"

সিন্ধু বলিলেন "প্রশ্ন করিও না, এখানি রাখিয়া দাও?" লীলা আদেশমত উহা গ্রহণ করিল।

সিন্ধু এবারে খুলিয়া বলিলেন, "লীলে, আমার জন্য কেন কষ্ট পাইবে, বিবাহ করিয়া সুখী হও। এখন আমার সকল ঐশ্বর্য্যই তোমার—লোভে অতি রূপবান এবং গুণবান পুরুষ তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিবে এবং বিবাহ করিলে কোন কষ্টই পাইবে না। কলিকাতা, কাশী বা বৃন্দাবন যেখানে খুসী রাজরাজেশ্বরী হইয়া থাকিতে পারিবে। আর——"

সিন্ধুর বাক্য শেষ না হইতেই লীলা মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার পদতলে লুটাইল। তিনি শুশ্রূষা করিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলে, সে কাঁদিয়া তাঁহার পা ধরিয়া বলিল "এরূপ নিষ্ঠুর কথা আর বলিও না, তা হ'লে আমি আর এক মুহূর্ত্তও বাঁচিব না।"

সিন্ধু কিছুকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিলেন "লীলে যদি বিবাহের কথায় এত কষ্ট পাও, আর বলিব না, এই দলিলখানি সম্প্রতি তোমার কাছে রাখিয়া দাও।"

লীলা কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর আজ্ঞা পালন করিয়া বলিল "আর আমায় কাঁদাইও না।"

ষষ্ঠ অধ্যায়।

লীলার অটলতা দেখিয়া সিন্ধুর মনে কেমন এক প্রকার ভয় জন্মিল। তিনি একেবারে হতাশ হইয়া চিন্তায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন, ভাবিলেন "বুঝি আমি মরিলে লীলা বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিবে।" সুতরাং এখন তাঁহার চিন্তা এবং চেষ্টা হইল,—কিরূপে সহজে মরিতে পারা যায়। উদ্বন্ধনে

বা তীব্র বিষ পানে মরিলে, লীলা বিপদগ্রস্ত হইবে, তিনি পীড়িত হইয়া মরিয়াছেন—সাধারণে নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পাবে,—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

এখন আর লীলাব শুশ্রূষা—লীলাব রূপ—লীলার হাসি মুখ—লীলার ভালবাসা—তাঁহাব ভাল লাগে না। এখন লীলা তাঁহাকে শত্রু মনে করিলে, অথবা সহজে তিনি মরিতে পারিলেই কেবল সুখী হইতে পাবেন।

একদিন হঠাৎ তাঁহাব মনে পড়িল ডাক্তব পলিডোবি কিরূপে ধীব-বিষ প্রযোগ কবিয়া তাহাব প্রভু পত্নীব যোগে প্রভুকে বধ কবিয়াছিল। তাঁহাব প্রাণ নাচিয়া উঠিল, মনে শান্তি হইল--এক লম্ফে শয্যা হইতে উঠিলেন—তাড়াতাড়ি বস্ত্র লইযা বেড়াইতে বাহিব হইলেন। যাইবাব কালে লীলা জিজ্ঞাসা কবিল "কোথা যাও?"

সিন্ধু অনেক দিন পবে আজ হাসিয়া বলিলেন "নিমন্ত্রণ খাইতে।" স্বামীব বদনে হাসি দেখিয়া লীলাব প্রাণ শীতল হইল।

* * * * * * *

বাত্ এগাবটাব সময় সিন্ধু গৃহে আসিয়া বিছানায শয়ন কবিলেন। লীলাকে বলিলেন—"বড অসুখ হইয়াছে।" লীলা সাবা বাত্ জাগিযা তাঁহাব শুশ্রূষা কবিল। প্রাতে, জিজ্ঞাসা কবিল—"ডাক্তাব আনাইব?"

যে হতভাগ্য ডাক্তাবকে টাকা দিয়া বন্দোবস্ত কবিয়া আসিয়াছেন—সিন্ধু তাহাকেই আনিতে কহিলেন।—ডাক্তাব আসিতে বিলম্ব হইল না।

ডাক্তার যথাবীতি বোগী দেখিয়া বলিয়া গেল "আমার ঔষধালয়ে লোক পাঠাইযা ঔষধ আনাইও।"

ঔষধ আসিল, রোগী তাহা যথাবীতি সেবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

৭ম অধ্যায়।

একদিন, দুই দিন কবিয়া ক্রমে দশ দিন গত হইল, কিন্তু সিন্ধু ক্রমেই বেশী পীড়িত হইয়া পড়িলেন। লীলা দেখিলেন ঔষধে তাঁহার স্বামীর উপকার না হইয়া অপকার হইতেছে—তিনি দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছেন।

লীলার আহার নাই, নিদ্রা নাই, দেখিলে বোধ হয়—এক রোগী আব এক রোগীর শুশ্রূষা করিতেছে। লীলা দশ দিনের দিন সিন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন—"এ চিকিৎসক ভাল নহে—আব একজনকে আনা যাক্।" সিন্ধু—অতি কষ্টে বলিলেন "আবশ্যক নাই।" লীলা তাঁহার কথা না শুনিয়া চুপে চুপে সহরের প্রধান ডাক্তার সাহেবকে—আনিতে পাঠাইলেন।

অল্পক্ষণেব মধ্যেই সিন্ধুর অবস্থা আরো মন্দ হইল। এত মন্দ হইল যে লীলা কান্দিতে লাগিল। সিন্ধু লীলাব মুখপানে চাহিয়া অতি কষ্টে বলিলেন, "লীলা—আমি যাই—স্বামী-বাক্য পালন করো—আমি মরিলে বিবাহ করিবে বল—প্রতিজ্ঞা কব।"

লীলা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিল—"হৃদয়ে যদি সহমরণ যাইবাব বল না থাকে—সর্ব্বস্ব দিয়া যদি তোমাব জীবন বক্ষা কবিতে না পাবি—প্রতিজ্ঞা কবিতেছি—তোমাব আজ্ঞা পালন কবিব।" সিন্ধুব বদন প্রসন্ন হইল—সিন্ধুব নিদ্রা হইল।

একাদশ দিনে পূর্ব্ব চিকিৎসক প্রেরিত ঔষধ লীলা সিন্ধুকে সেবন না করাইয়া, নূতন চিকিৎসকের অপেক্ষায় রহিলেন। সিন্ধু যখন ঔষধ চাহেন, লীলা তখন ঔষধ বলিয়া জল পান কবিতে দেন।

এই সময়ে নূতন চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইলেন—লীলা লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাঁহার পা ধবিয়া কান্দিয়া বলিল—"আপনি যত টাকা চান—আপনি যাহা চান, আমাব যাহা কিছু আছে সকলই আপনাকে দিব—আপনি দয়া করিয়া আমার স্বামীকে ভাল কবিয়া দিন।"

চিকিৎসক আশ্বাস দিয়া বোগীব অবস্থা দেখিলেন—দেখিয়া বলিলেন—

"এরূপ অজ্ঞানাবস্থা কতক্ষণ ?"

"এই মাত্র।"

"পীড়া কত দিন হইতে ?"

"এগাব দিন।"

"পূর্ব্ব চিকিৎসকেব ব্যবস্থাপত্র দেখাও ?"

"ব্যবস্থা পত্র তিনি দেন না।"

"তবে ঔষধ পাঠান ?"

"হাঁ।"

"নিজেব ডিস্পেন্সরির ?

"আজ্ঞে হাঁ।"

"ঔষধের শিশি কোথা?"

লীলা কান্দিতে কান্দিতে শিশি আনিয়া দিল—ডাক্তার শিশি-সহ পত্র লিখিয়া বিশ্লেষণ করিবার জন্য পাঠাইলেন—লোক আর একখানি চিঠি লইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিল—সাহেব তাহা পাঠ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"আপনার স্বামী ভাল হইবেন চিন্তা নাই"—এই বলিয়া ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া দিয়া কহিলেন—"এই ঔষধ সেবন করাইবেন—আমি কাল আসিয়া দেখিব।"

যাইবার কালে লীলা পুনর্বার সাহেবের পা ধরিয়া কান্দিতে লাগিল—সাহেব তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন—"আমি নিশ্চয় ভাল করিয়া দিব।"

* * * * * * *

লীলার শুশ্রূষাগুণে এবং সুচিকিৎসকের চিকিৎসাগুণে—সিন্ধু এক মাসের মধ্যে শুদ্ধ আরোগ্য হইলেন না, সবল এবং সুস্থও হইলেন। এ সবলতা—এ স্বাস্থ্য—সিন্ধু অনেক দিন হারাইয়াছিলেন। বিধাতার কি অনন্ত লীলা, বিষ পান—অমৃত পান হইল। এ লীলা—লীলার সতীত্বের পুরস্কার।

উপসংহার।

একদিন সিন্ধু প্রফুল্ল মনে নিজ হাতে লীলাকে নূতন আভরণে সাজাইতে-ছেন—লীলা হাসিতে হাসিতে বলিল—"কনে ত সাজাইলে, এখন আমার বর কোথায়—বিবাহের কি করিলে?"—সিন্ধু তাঁহার গণ্ড নাসাগ্রে স্পর্শ করিয়া বলিলেন 'এইত বিবাহের আয়োজন করিতেছি।' একটা শুক পাখী এক পাশে ছিল—সেও বলিল—"এইত বিয়ের আয়োজন কচ্ছি।" সিন্ধু ও লীলা হাসিয়া উঠিলেন।

লীলা আবার বলিল—"এখন তোমার সকল বিষয় সম্পত্তির মালিক হইতে যাচ্ছি আছি, আবার জোরে দখল করিবে না ত?

সিন্ধু হাসিয়া বলিলেন "যদি তাহাই করি," লীলা বলিল "তাহা করিবার আগে আমার সকল বিষয় ছারখার করিয়া ফেলিব।"

'কিরূপে ছারখার করিবে?'

"দেখিবে?"

"দেখিব।"

"তবে এই দেখ" বলিয়া লীলা দৌড়িয়া একটা ছোট বাক্স লইয়া আসিল এবং উহা হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া ধরাইয়া দিল।

সিন্ধু হাসিয়া বলিলেন "পুরুষ হইয়া সতীন দেখিবার সাধ এত দিনে পুড়িয়া ছাই হইল।"

মাক্‌বেথ ও হাম্‌লেট।

৭।

ষষ্ঠ দৃশ্যে মাক্‌বেথের প্রাসাদ সম্মুখস্থ ডন্‌সিনেনের নিকট সিওযার্ড, মাক্‌ডফ প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষ সমভিব্যাহারে, রণবাদ্য সহকারে মালকোম্‌ সমর সজ্জায় অগ্রসর হইতেছেন। কে কোন দিকে যুদ্ধ করিবেন, মালকোম্‌ তাহারই বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

সপ্তম দৃশ্যে সমরক্ষেত্রের অন্য স্থলে শত্রু সৈন্য বেষ্টিত মাক্‌বেথ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। মাক্‌বেথ এখন সূক্ষ্ম আশা সূত্রে জীবন ধারণ করিয়া আছে। সেই সূত্রটি বার বার পরীক্ষা করিতেছে, বলিতেছে "রমণীর জঠর-প্রসূত নহে—এমন কি কেহ কখন হইতে পারে? তা কখনই হইতে পারে না—তবে আমি আবার কাহাকে ভয় করিব?" মাক্‌বেথ ভয় ভরসায় এইরূপ তোলাপাড়া করিতেছে—এমন সময় সৈন্যাধ্যক্ষ সিওয়ার্ডের পুত্র যুবক সিওয়ার্ড যুদ্ধার্থ মাকবেথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যুবা সিওয়ার্ড। কহ—তোমার কি নাম ?

মাকবেথ। শুনিলে পাইবে ত্রাস।

যুবা। দানব রাক্ষস যক্ষ—ভয়ঙ্কর নামে,
আরো ভয়ঙ্কর হ'লে—না ডরিব আমি।

মাকবেথ। মাক্‌বেথ নাম মম—

যুবা। সয়তান্ কোন নাম না পাবে বলিতে,
তব নাম হ'তে আরো অধিক ঘৃণেয।

মাকবেথ। —কিম্বা অধিক ভয়াল।

যুবা। মিথ্যা কহ তুমি—বীভৎস্য ব্যধিপ!
সাক্ষী এই করবাল—মিথ্যা কহ তুমি।

[দ্বন্দ্ব করবাল যুদ্ধে—মাক্‌বেথ কর্ত্তৃক যুবা সিওয়ার্ড হত হইল।]

মাকবেথ। নারী গর্ভ-সূত তুই!
নারী গর্ভজাত ব্যক্তি ধরিলে আয়ুধ—
খড়্গে হাসি, অন্য অস্ত্রে উপহাসি আমি।

(নিষ্ক্রান্ত)

মাক্‌বেথ ডাকিনীদের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই শেষ সূত্র এখনও ধরিয়া আছে। যুবা সিওয়ার্ডের সহিত দ্বন্দ্ব সংগ্রামে সেই সূত্রের পরীক্ষা করিল। সিওয়ার্ড যুবক, নির্ভীক, উৎসাহী, সাহসী ছিল, কিন্তু হইলে কি হয়? মাক্‌বেথ যতক্ষণ সূত্র ধরিয়া আছে, তখন কে তাহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে? তবে তৃণের মত যুবা নষ্ট হইল—মাক্‌বেথ উপহাসে বীভৎস হাসি হাসিতে লাগিল।

রণ-রঙ্গ-স্থলের অন্যত্র—সুষুপ্ত সৈন্যসহ পাণ্ডব-শিশু-পঞ্চকের হত্যাকারী অশ্বত্থামার অনুসন্ধানে উন্মুখ, ব্রহ্মাস্ত্র বিক্ষেপে উদ্যুক্ত, অর্জ্জুনের মত-মাক্‌ডফ্ অকাল-নষ্ট আত্মীয়গণের শোক স্মৃতিতে উত্তেজিত হইয়া, দারুণ প্রতি বিধিৎসায় প্রেরিত হইয়া, গভীর গর্জ্জনে মাক্‌বেথের অন্বেষণে, ইতস্তত বিচরণ করিতেছেন। এখন তাঁহার একমাত্র ভাবনা, পাছে মাক্‌বেথকে অন্য কেহ বধ করে; তাহা হইলে তাঁহার পুত্র কলত্রের প্রেতাত্মাগণ চিরদিন তাহাকে ধিক্কার দিবে! মাক্‌ডফ্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—মাক্‌বেথ ভিন্ন অন্য কাহারও উপর তিনি অস্ত্র চালনা করিবেন না। এখন অদৃষ্টের নিকট মাক্‌ডফ্ কেবল এই মাত্র ভিক্ষা চাহিতেছেন যে তিনি যেন জীবন্ত মাক্‌বেথকে একবার তাঁহার সম্মুখে পান, তাঁহার অন্য প্রার্থনা নাই।

এ দিকে মাক্‌বেথের প্রাসাদ দুর্গ দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, মাক্‌বেথের অনুচরেরা অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। জয়শ্রী যে মাল-কোম্‌কে আশ্রয় করিবেন, তাহাও একরূপ নিশ্চয়। সৈন্যাধ্যক্ষ বৃদ্ধ সিওয়ার্ডের পরামর্শ মত। মাল্‌কোম্ প্রাসাদ দুর্গে প্রবেশ করিলেন। সপ্তম দৃশ্য শেষ হইল।

মাক্‌বেথ নাটকের শেষ দৃশ্য—রণক্ষেত্রের অন্যত্র। মাক্‌বেথ বুঝিয়াছে যে, এ সংগ্রামে তাহার আর জয়ের আশা নাই, তবু মাক্‌বেথ আত্মহত্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল, ভাবিল,—আপন শরীরে আঘাত করা অপেক্ষা পরদেহে অস্ত্রাঘাত ভাল। প্রতিবিধিৎসায় প্রতিজ্ঞাত ম্যাক্‌ডফ্ সম্মুখে আসিলেন। বলিলেন—

"আয়! নরক-কুক্কুর। আয় তোরে দেখি" মাক্‌বেথ বলিলেন—"ম্যাক্‌ডফ্ বৃথায় উদ্যম তব, আমি বর পাইয়াছি—রমণীর জঠর-প্রসূত ব্যক্তিরা আমায় কেহ কিছু করিতে পারিবে না।" ম্যাক্‌ডফ্ বলিলেন, "বর্ব্বর! তাহাতে তোর অব্যাহতি নাই। মাতৃকুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া অকালে আমাকে নিষ্কাশিত করা হয়, আমি প্রসূত হই নাই।"

তখন মাক্‌বেথ, ম্যাক্‌ডফ্‌কে অভিসম্পাত করিলেন, ডাকিনীগণের উপর গালি পাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, 'কেহ যেন ঐ সকল প্রতারিকা প্রেতিনীদের বিশ্বাস না করে—উহারা দ্ব্যর্থ-বাচক প্রহেলিকায় আমাদিগকে বিড়ম্বিত করে—তাহাদের প্রতিজ্ঞার সুর আমাদের কাণে লাগিয়া থাকে, কিন্তু পরিণামে আশায় নিরাশ হইতে হয়।'

ভাল—মাক্‌বেথ তুমি সত্যসত্যই কি প্রেতিনীদের কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলে? যদি সত্যসত্যই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলে যে তুমি ভাগ্যবলে স্কটলণ্ডের রাজা হইবে, তবে ডঙ্কানকে হত্যা করিবার তোমার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? যদি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিয়াছিলে যে, তোমার পরে বাঙ্কো বংশীয়েরা স্কটলণ্ডের রাজা হইবেন, তবে ফ্লিয়ান্সকে বধ করিবার জন্য ঘাতুক নিযুক্ত করিয়াছিলে কেন? না, মাক্‌বেথ তুমি আসন্ন-কালেও আপনাকে আপনি প্রতারিত করিতেছ। মানুষ আপনার প্রকৃতি প্রবৃত্তি অনুসারে বিশ্বাস অবিশ্বাস করে। প্রেতিনীরা—বাঙ্কো এবং তুমি—তোমাদের উভয়ের সহিতই সাক্ষাৎ করিয়াছিল; কিন্তু তুমি স্বীয় দুরাকাঙ্ক্ষাময়ী প্রকৃতির বশে আর তোমার তদ্রূপ দুরাকাঙ্ক্ষাময়ী প্রবৃত্তির উত্তেজ-

যায়, অতি গুরুতর মহা মহা পাপে পাপী হইয়াছ—আর সেই বাঙ্কো নিষ্পাপ শরীরে তোমারই প্রেরিত ঘাতুকগণের হস্তে পরলোকগত হইয়াছে। তুমি দুরাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই দুরাকাঙ্ক্ষা-রূপিণী প্রেতিনীরা তোমার উপর বল করিতে পারিয়াছে। কিন্তু বিশ্বাস—বিশ্বাস ত তুমি তাহাদের কর নাই। বিশ্বাস করিলে—তুমি নরঘাতী, গুপ্তঘাতী, রাজদ্রোহী, নারীঘাতী, শিশুঘাতী হইবে কেন? মানুষ আপনার প্রকৃতি প্রবৃত্তি অনুসারে, আপনার গরজের মত করিয়া, অনেক বিষয়েই খানিক বিশ্বাস, খানিক অবিশ্বাস করে। সেই অর্দ্ধ বিশ্বাসই অনেক অনর্থের মূল। ঐ যে বর্ষীয়ান্ এখন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছেন ও বলিতেছেন "হায়! হায়! আমার সহোদরকে বিশ্বাস করিয়াই আমার সর্ব্বনাশ হইল।" আমার বিনীত জেরা সওয়ালের উনি সরল উত্তর দিলে, আমি দেখাইতে পারি যে, উনি স্বীয় সহোদরকে পূরা বিশ্বাস একদিনের তরেও করেন নাই—অর্দ্ধ বিশ্বাস করিয়াছিলেন মাত্র। মাক্‌বেথ তুমিও বিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্বাস পুষিয়াছিলে। পাপের ধর্ম্মই এই যে, পাপ কখন কাহাকেও পূরা বিশ্বাস করিতে পারে না। যে প্রেতিনীদের ভবিষ্যদ্বচনে তোমার দুরাকাঙ্ক্ষা ইন্ধন পাইল, কৈ তুমি তাহাদিগকে ত পূরা বিশ্বাস করিতে পারিলে না?—যে পিশাচীর প্ররোচনায় রাজহত্যায় লিপ্ত হইলে, কৈ বাঙ্কো ফ্লিয়ান্সের হত্যাব্যাপারে—তাহাকেই বা বিশ্বাস করিতে পারিলে কৈ? পাপী—দেব দৈত্য পুত্র কলত্র—কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না। পাপে অবিশ্বাসের পরিমাণ বুঝা যায়, অবিশ্বাসে পাপের পরিমাণ জানা যায়; ও দুটায় বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

পাপে বিশ্বাসের যেমন সঙ্কোচ হয়, বিশ্বাস যেমন খণ্ডীকৃত হয়, তেমনই পাপের ভরে বুদ্ধিবৃত্তিরও স্ফূর্ত্তি হয় না। যে মূর্ত্তি মাক্‌বেথকে বলে যে, "বর্ণাম জঙ্গল ডন্‌সিনেনে না আসিলে তোমার পরাজয় নাই," সেই মূর্ত্তির হস্তে একটি বৃক্ষ-শাখা ছিল। মাক্‌বেথ কেবল তাহার কথাই কাণে লইল, তাহার ভাব-ভঙ্গি বুঝিবার চেষ্টা করিল না। চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারিত যে, জঙ্গল চলিয়া আসা অসম্ভব নহে। তাহার পর যে মূর্ত্তি তাহাকে বলিল, যে "নারী-জঠর-প্রসূত কেহ তোমার কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না"—সে মূর্ত্তি রক্তাক্ত বালক মূর্ত্তি। মাক্‌বেথ তাহারও আকার ইঙ্গিত বুঝিল না। বুঝিল না, যে বালক প্রসূত না হইয়াও অস্ত্ররূপে নিষ্কাশিত হইতে পারে। বুঝিবে কে? যে পাপভরে বিভোর তাহার বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না। পাপী কেবল

আপনার ভালর দিকই দেখিতে পায়—আপনার মন্দের দিক দেখিবার বুদ্ধি তাহার ক্রমেই লোপ পায়; শেষে একেবারে মন্দের মধ্যস্থলে আসিয়া ডুবিয়া যায়। ঐ দেখ ব্রহ্মরাক্ষস রাবণের দশমুণ্ড লঙ্কার বেলাভূমিতে লুটাইতেছে; ঐ দেখ ভীম-শিশুর মস্তক হস্তে মান-ধন দুর্য্যোধনের হর্ষ-বিষাদে মৃত্যু হইল, ঐ দেখ সেণ্টহেলেনার পাতালপুরে ক্ষিপ্ত সিংহ কি ভয়ানক অথচ হৃদয়ভেদী মৃত্যু-গর্জ্জন করিতেছে—আর ঐ দেখ যে মাকৃবেথ এক দিন স্বীয় অতুল সাহসে অসীম প্রতাপে নরওয়ের অযুত যোধ নষ্ট করিয়াছিল, আজি সেই মাকৃবেথ মাকৃডফের জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়া, সম্মুখ-যুদ্ধার্থী সেই মাকৃডফকে সচ্ছন্দে বলিতেছে—"আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।"

মাকৃডফ। "কাপুরুষ। যুদ্ধ করিবি না, ত আত্মসমর্পণ কর্। মোটা খোঁটার উপর পিঁজরায় পুরিয়া তোকে রাখিয়া দিব, লোককে দেখাইব, নীচে লিখিয়া রাখিব, 'এইখানে দুরন্ত দুর্বৃত্তকে দেখিতে পাইবে।'

তখন মাকৃবেথ বলিল 'আমি আত্মসমর্পণ করিব না—আর তোমাকে অস্ত্র সম্বরণ করিতেও বলিব না।' তখন যুদ্ধ করিতে করিতে দুই জনে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ওদিকে জয়বাদ্য বাজাইয়া বিজয়-নিশান উড়াইয়া মালকোম্ বৃদ্ধ সিওয়ার্ড, রস্ প্রভৃতি আসিতেছেন—সিওয়ার্ডকে রস্ ধীরে ধীরে বলিলেন—তাঁহার পুত্র সম্মুখ সমরে হত হইয়াছেন—তাঁহার শরীরের পুরোভাগ শত্রুঅস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত কিন্তু পশ্চাদ্দেশ অক্ষুণ্ণ ছিল। বৃদ্ধ শোকে আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—'তবে ভগবান তাহাকে নিজ সেনা করিয়া লউন—যদি আমার সহস্র পুত্র থাকিত, এবং সকলেই ঐরূপে হত হইত তা হইলেও আমি আনন্দিত হইতাম।'

মালকোমে বৃদ্ধ সিওয়ার্ডে কথোপকথন হইতেছে এমন সময় মাকৃবেথের ছিন্নমুণ্ড সঙ্গীনে গাঁথিয়া লইয়া মাকৃডফ প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "জয় মহারাজকি জয়! এখন আপনিই মহারাজ, এই দেখুন রাজ্যাপহারীর মস্তক কোথায় রহিয়াছে।"

তা ত দেখিতেছি, মাকৃবেথের জড়-মুণ্ড তোমার সঙ্গীন-বিদ্ধ হইয়া নিশ্চল ত্রস্ত চক্ষুতে চাহিয়া রহিয়াছে, তা ত বেশ দেখিতেছি—কিন্তু তাহার চক্ষু কর্ণ মুখবিবর,—হস্তপদ, অস্থি পঞ্জর—ছাড়া যদি আরও কিছু থাকে, তবে সেই আরও কিছুর কি গতি হইবে—মাকৃডফ তুমি তাহা বলিতে পার কি? এরূপ

আশ্রিত সুপ্তের গুপ্ত হত্যাকারী মানবের, এরূপ উপকারী আত্মীয় রাজার হত্যাকারী প্রজার, এরূপ বন্ধু-বধ-কারী বান্ধবের এবং এরূপ নিরাশ্রয় শিশু নারী হত্যাকারী রাজার,—হস্তপদ, অস্থি-পঞ্জর ব্যতীত যদি ভিতরে আরো কিছু থাকে—তবে তোমরা কেহ বলিতে পার—যে, সেই আরো-কিছুর কি গতি হইবে? আচ্ছা বলিতে পার আর নাই পার—ভাবিতে ত পার, আপাততঃ ভাবিলেই যথেষ্ট।

তখন মাক্‌বেথের সেই ছিন্নমুণ্ড হস্তে লইয়া মাক্‌ডফ্ মাল্‌কোম্‌কে উচ্চ স্বরে অভিবাদন করিলেন, "জয় স্কট্‌লাণ্ড-রাজকি জয়!" সকলে বলিয়া উঠিল—'জয় স্কটলাণ্ড-রাজকি জয়!" তখন মাল্‌কোম্ অধিরাজ রূপে সকলের সম্মান বর্দ্ধন করিলেন। উপস্থিত সৈন্য সামন্ত সকলকে নতশিরে অভিবাদন করিলেন এবং অভিষেক স্থলে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া নাটক সমাপ্তি করিলেন।

আমরাও এই সমালোচনার শেষার্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ হামলেট সমালোচনায় সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেছি এবং দরিদ্র বাঙ্গালা ভাষায় লক্ষ্মীমন্ত ইংরাজির একখানি মহানাটকের এরূপ বিস্তৃত সমালোচনা যাঁহারা পাঠ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নতশিরে বড়ই আহ্লাদে আজি অভিবাদন করিতেছি।

নাটকের গল্প।

৩।

চন্দ্রহাস।

চন্দ্রহাস কেরল দেশের রাজপুত্র। তাঁহার জন্মের অতি অল্পকাল পরেই, শত্রু পক্ষ কেরল রাজ্য আক্রমণ করে। রাজা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন; রাজ্ঞী সহমৃতা হইলেন; রাজ্য শত্রু হস্তগত হইল। একজন ধাত্রী চন্দ্র-হাসকে লইয়া পলায়ন করিল, কুন্তলক রাজপুরে আসিয়া দাসীবৃত্তি অবলম্বন করত চন্দ্রহাসকে লালনপালন করিতে লাগিল। চন্দ্রহাসের তিন বৎসর

বয়সের সময় ধাত্রীর মৃত্যু হইল, পুরবাসীরা চন্দ্রহাসকে বড় ভাল বাসিত, এখন লালনপালন করিতে লাগিল। চন্দ্রহাসের পাঁচ বৎসর বয়সের সময়, কুতলক রাজমন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির যজ্ঞে সমাহূত বহুতর ঋষি মুনি চন্দ্রহাসকে দেখিয়া, ধৃষ্টবুদ্ধিকে বলেন, "এই বালক অতি সুলক্ষণাক্রান্ত, তবে ইহার রাজপদ প্রাপ্তি না হইতে পারে, কিন্তু বহু সম্মানিত রাজমন্ত্রীত্ব নিশ্চয়ই লাভ করিবে। ইহাকে ভালরূপে প্রতিপালন করিও।"

হিতে বিপরীত হইল; মন্ত্রী কোথায় চন্দ্রহাসকে সুপালন করিতে আদিষ্ট হইল, কোথায় সে ধৃষ্টবুদ্ধি, এ 'আমার পদলাভ' করিবে, অতএব এ আমার শত্রু, এইরূপ বিবেচনা করিয়া চন্দ্রহাসের বিনাশার্থ চণ্ডালদিগকে আদেশ করিল। চণ্ডালগণ স্নেহ পরবশ হইয়া, চন্দ্রহাসের একটি অতিরিক্ত অঙ্গুলী ছিল, সেইটি মাত্র ছেদন করিয়া লইয়া চন্দ্রহাসকে বনে পরিত্যাগ করিয়া গেল। চন্দ্রহাসের অতিরিক্ত অঙ্গুলি থাকিলে, বিকৃতাঙ্গ বলিয়া, কখন রাজপদে বসিতে পাইতেন না, এখন অঙ্গুলি ছেদনে সে অন্তরায় দূরীকৃত হইল। অহিতে হিত হইল।

ধৃষ্টবুদ্ধি কর্ত্তৃক নিযুক্ত সেই বন প্রদেশের অধ্যক্ষ—কুলিন্দ মৃগয়ার্থ সেই বনে আসিয়াছিলেন, রোরুদ্যমান চন্দ্রহাসকে অশ্বপৃষ্ঠে করিয়া লইয়া গেলেন। আপনার সহধর্ম্মিণী মেধাবিনীর হস্তে সমর্পণ করিলেন; দম্পতি অপুত্রক—চন্দ্রহাসকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রহাস সুপণ্ডিত, মহাবীর এবং হরি পরায়ণ হইলেন। যথাকালে কুলিন্দ তাঁহাকে স্বীয় নগরী চন্দনাবতীতে রাজ-পদে অভিষিক্ত করিলেন। চন্দ্রহাস স্বীয় রাজ্য মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন, কেহ যেন একাদশী দিনে উপবাস ভঙ্গ না করে।

কুলিন্দককে কুতলক রাজসকাশে নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিতে হইত। চন্দ্রহাস সেই কর ও অন্যান্য উপহার সম্ভার মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দূতেরা একাদশী দিনে কুতলক পুরে উপনীত হইল; ধৃষ্টবুদ্ধি দ্রব্যজাত গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া কুলিন্দ কিঙ্করগণকে সুচারু অন্ন পানাদি প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা একাদশীতে আহার করিতে অসম্মত হইল। ধৃষ্ট বুদ্ধি অবমাননা বোধ করত মনে মনে রোষাবিষ্ট হইল।

আবার হিতে বিপরীত। কুলিন্দের উপহার আয়োজনে কোথায় সন্তুষ্ট হইবে,—না ধৃষ্টবুদ্ধি তাহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল; কিঙ্করগণের হরি-বাসর-ব্রত-পরায়ণতায় কোথায় প্রীত হইবে, না সে রোষাবিষ্ট

হইয়াছিল—সুতরাং ধৃষ্টবুদ্ধি যুগপৎ রোষ হিংসা পরবশ হইয়া কুলিন্দকে নির্য্যাতন মানসে স্বয়ং রাজার আদেশ লইয়া চন্দ্রবাবতী যাত্রা করিল। স্বীয় পুত্র মদনকে কার্য্যভার দিয়া গেল। কুলিন্দের মুখে তাহার বন মধ্যে চন্দ্রহাস প্রাপ্তির কথা শুনিয়া ধৃষ্টবুদ্ধির সন্ত্রাস হইল; মনে ভাবিল, এই সেই বালকই হইবে; অতএব ইহার নিধন সাধন করা অচিরাৎ কর্ত্তব্য।

'অতি গূঢ় বিষয়ের সংবাদ বিশেষ বিশ্বস্ত দূত দ্বারা আমার পুত্রের নিকট প্রেরণ করার প্রয়োজন হইয়াছে' এই বলিয়া চন্দ্রহাসকে মদনের নিকট প্রেরণ করিল। চন্দ্রহাসের হস্তে মদনের নামে এক পত্র দিল—তাহাতে লিখিয়া দিল—'এই চন্দ্রহাসই আমার বিষয় ধনের ভাবি অধিকারী হইবার কথা। অতএব ইহার রূপ, গুণ, বয়স, কুল, শীল পরাক্রম—কোন বিষয়েই দৃষ্টি না করিয়া, কোন দ্বিধা না করিয়া, ইহাকে বিষ প্রদান করিবে। তাহা হইলে আমরা উভয়েই কৃতার্থ হইব।'

চন্দ্রহাস পত্রী লইয়া অতি ত্বরায় কুন্তলপুরে আগমন করিলেন; অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিলেন, ক্রীড়া সরোবর তীরে শয়ান হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন; ক্লান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যা বিষয়া সেই স্থলে আসিয়া চন্দ্রহাসের রূপে মুগ্ধা হইলেন; বসন-স্খলিত পত্রী পাঠে বিষণ্ণা হইলেন—শেষে পত্র মধ্যে দুইটি অতিরিক্ত অক্ষর সংযোজিত করিয়া 'বিষয় ধন' স্থলে 'বিষয়া-ধন' এবং 'বিষ প্রদান' স্থলে 'বিষয়া প্রদান' করিয়া দিয়া—পত্র পূর্ব্বাবস্থ ভাবে রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন শুভলগ্নে মদন স্বীয় ভাগিনী বিষয়াকে চন্দ্রহাস করে যথা-শাস্ত্র-রীতি সমর্পণ করিলেন।

ওদিকে ধৃষ্টবুদ্ধি কুলিন্দকে নিগড় নিবদ্ধ করিয়া, অতি দ্রুতযানে কৌতলক পুরে প্রত্যাগমন করিলেন; দেখিলেন, পুরী উৎসবময়ী, শুনিলেন মদন চন্দ্রহাসের সহিত বিষয়ার বিবাহ দিয়াছে, পুত্রকে বলিলেন, 'বর্ব্বর কি করিয়াছ?' মদনউৎসবের কিছু ত্রুটি হইয়াছে বোধে বলিলেন "সময়ের স্বল্পতা-নিবন্ধন সমারোহের আয়োজন করিতে পারি নাই, তবে যতদূর সম্ভব তাহাই করিয়াছি"—ধৃষ্টবুদ্ধি আপনার পত্র আনয়ন করিতে বলিলেন, পত্রে বিষয়া প্রদানের কথা সুস্পষ্ট দেখিলেন; আপনারই ভ্রম হইয়াছে মনে করিয়া নীরবে রহিলেন। বিষয়া বিধবা হয় হৌক, তথাপি চন্দ্রহাসকে নষ্ট করিতে হইবে ইহাই স্থির করিলেন।

মনে মনে একটা কৌশল স্থির হইল। নগরের বাহিরে বনমধ্যে চণ্ডিকার মন্দির ছিল, সেইখানে দুইজন ঘাতুককে বিশেষ ধনলোভ দেখাইয়া এই বলিয়া পাঠাইয়াদিলেন, 'অদ্য সন্ধ্যার পর কেহ প্রণামার্থ চণ্ডীমণ্ডপে সমাগত হইলে, তোমরা তাহার শিরচ্ছেদ করিও, ইতস্তত করিও না।' তাহারা আদেশমত চণ্ডীমন্দির মধ্যে গিয়া লুকাইয়া রহিল।

পরে ধৃষ্টবুদ্ধি চন্দ্রহাসকে বুঝাইয়া দিল যে, 'কুলপ্রথানুসারে নবজামাতার চণ্ডী বন্দনা একান্ত আবশ্যক। অদ্যই বনচণ্ডীকে সন্ধ্যার পর বন্দনা করিয়া আসিবে।' চন্দ্রহাস শ্বশুরের আদেশমত একাকী পুষ্পচন্দনাদি লইয়া সন্ধ্যার সময় চণ্ডীপূজায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে মদনের সহিত সাক্ষাৎ হইল; মদন বলিলেন, "আমি পুষ্পচন্দনাদি লইয়া দেবীমন্দিরে যাইতেছি, আপনি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসুন, আপনাকে তিনি আহ্বান করিয়াছেন।" মদন দেবীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিবামাত্র ঘাতুকেরা তাঁহার শিরচ্ছেদন করিল।

এদিকে চন্দ্রহাস রাজ-সকাশে অভূতপূর্ব্বরূপে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইয়া গজপৃষ্ঠে মন্ত্রীকে প্রণাম করিতে গেলেন। মন্ত্রী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ তুমি বন-চণ্ডীকে প্রণাম করিতে যাও নাই?" চন্দ্রহাস বলিলেন "আমি আপনার আদেশমত যাইতেছিলাম, মদন বলিলেন 'মহারাজ আহ্বান করিয়াছেন, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসুন, আমি পুষ্পচন্দন লইয়া অগ্রসর হইতেছি।'" মন্ত্রী ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কি মদন দেবীমন্দিরে গমন করিয়াছে?" চন্দ্রহাস বলিলেন, "হাঁ গিয়াছেন।" তখন মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন—"যে পরের জন্য গর্ত্ত খনন করে, সে নিজেই তাহাতে পতিত হয।"

মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি ঐ কথা বলিতে বলিতে বনাভ্যন্তরে দেবীমন্দিরে উপনীত হইলেন—দেখিলেন, ছিন্ন-পশু-বলিবৎ তাঁহার পুত্র মদন দ্বিখণ্ডীকৃত দেহে পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি শোকে দুঃখে মর্ম্মর স্তম্ভে মস্তক আস্ফালন করিতে লাগিলেন; তাহাতেই তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইল।

* * * * * *

চন্দ্রহাস কুন্তলকপুরে রাজা হয়েন। তিনি অতীব হরিপরায়ণ ছিলেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন, অশ্বমেধের অশ্বরক্ষার্থ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে, তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ হয়। মহাভারতে এই গল্প আছে; কাশীরাম দাস তাহার মর্ম্মানুবাদ করেন। জৈমিনি ভারতে এই গল্পের বিস্তৃত বাদ আছে।

হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থে এবং তাহাব বঙ্গানুবাদেও এই গল্প আছে—বীণা-রঙ্গভূমির জন্য শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় এই গল্প নাটকাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। আমরা জৈমিনি ভারতের বঙ্গানুবাদ হইতে গল্পটি প্রধানত লইলাম; কাশী-দাসে ও ভক্তমালে এই গল্পের বিভিন্ন আকার আছে; কিন্তু মূল কথা এক—দুর্জ্জনের হিতে বিপরীত—সজ্জনেব বিপবীতে হিত।

ভক্তমাল গ্রন্থোক্ত চন্দ্রহাসের বিবরণ।

এক বাজপুত্র, তাব   চন্দ্রহাস নাম।
বিপদ কালেতে লইয়া   রাখে অন্য ধাম॥
অন্য সেই দেশাধিপ   রাজার দেওয়ান।
শিশু লইয়া ভেট দিল   নৃপতিব স্থান॥
পালন কবিয়া রাজা   রাখে নিজ ঘবে।
দাসী পুত্র ন্যায় থাকে,   নাহি সমাদরে॥
এক দিন রাজপুবে   ব্রাহ্মণ ভোজন।
সেইখানে গেলা শিশু   সঙ্গে শিশুগণ॥
সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ   দেখি শিশুবর।
রাজাব জামাতা হবে   কহে পরস্পব॥
রাজা তাহা শুনিয়া   ক্ষোভিত হৈল মনে।
মোর কন্যা যোগ্য এই   দাসীর নন্দনে?
এত ভাবি বিচারিল   বালকে মারিতে।
নীচগণে আজ্ঞা দিল   মশানে লইতে॥
স্বাভাবিক বালকেব   কৃষ্ণপদে মতি।
অচ্ছেদ্য অভেদ্য হয়   বেদের সম্মতি॥
শিশুরে লইয়া গেল   কাটিতে মশানে।
কৃষ্ণে যার মতি, তার   কি কবিবে আনে?
চন্দ্রহাস কহে মোবে   দইবে মারিবে।
কিন্তু এক কথা মোর   নেহারা রাখিবে॥
আঁখি মুদি মুহূর্ত্তেক   বসিয়া থাকিব।
খড়্গ হানিবে, যবে   শির হেলাইব॥
ইহা বলি কৃষ্ণপদে   মন নিয়োজিল।
শিব হেলাইয়া খড়্গ   হানিতে কহিল॥

কৃষ্ণের করুণা মহা বলবান হয়।
আর্দ্র হইল নীচ গণের হৃদয়॥
কেহ বলে ছাড়ি দেহ, যাউক অন্তরে।
মারিনু করিয়া ছল কহিব রাজারে॥
কেহ বলে কিছু চিহ্ন লহ দেখাইতে।
অঙ্গুলী কাটিয়া লহ প্রতীত করিতে॥
বালকের এক হস্তে ছয় অঙ্গুলী ছিল।
বৃদ্ধ দুই অঙ্গুলীর এক কাটি নিল॥
ঈশ্বরের কৃপা দেখ হয় গূঢ়তর।
রাজা যোগ্য নাহি হয় ছয় অঙ্গুলী নর॥
এই হেতু এক অঙ্গুলী তার কাটাইল।
পরে নৃপাসন যোগ্য ছলে করাইল॥
নীচগণ লইয়া অঙ্গুলী দেখাইল।
চন্দ্রহাস যাইয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥
ঐ রাজার প্রতিযোগী কোন রাজা অন্য।
মৃগয়া করিতে গিয়া বেরিল অরণ্য॥
তার মধ্যে দেখে এক অপূর্ব্ব বালক।
আনিয়া রাখিল ঘরে বৎসর কতক॥
পুন সেই রাজা স্থানে ঐ যে বালক।
আর কত দাস দাসী ধনাদি যতেক॥
আপোসেতে ভেট দিল প্রণয় পূর্ব্বক।
চমকিয়া নৃপতি চাহিয়া রৈল মুখ॥
এই বালকেরে পূর্ব্বে কাটে মোর দূত।
পুন কোথা হইতে আইল একি অদ্ভুত॥
রাজা বুদ্ধিমান মনে বিচার করিলা।
দূতগণ ছাড়ি মোরে প্রবঞ্চনা কৈলা।
বালক কৃষ্ণভক্ত, আর বিবাহ নির্ব্বন্ধ।
তথাচ না বুঝে রাজা মূঢ়মতি মন্দ॥
পুন মারিবারে চেষ্টা কয়য়ে নৃপতি।
কিছু দূরে উপবনে পুত্র আছে তথি॥

সেইত রাজার কন্যা নাম তার বিখে।
ভ্রাতার নিকটে থাকে স্নেহেতে অধিকে॥
বিষ খাওয়াইয়া চন্দ্রহাসে মারিবারে।
উপায় চিন্তিলা উপবনে পুত্র যারে॥
পত্র লিখে পুত্রে, 'ইহ যে দণ্ডে যাইবে।
সেই ক্ষণে বালকেরে বিষ্ সমর্পিবে॥'
পত্রী চন্দ্রহাসে দিয়া কহয়ে নৃপতি।
উপবনে পুত্র স্থানে যাহ শীঘ্র গতি॥
পত্রী নিয়া শীঘ্র দিলা রাজপুত্র স্থানে।
পত্রী পড়ি বালক দেখিয়া হর্ষ মনে॥
সুন্দর কুমাব দেখি বিচারয়ে মনে।
রাজা পাঠাইলা বিখে কন্যার কারণে॥
ইহা বুঝি রাজপুত্র সেই ক্ষণ মাত্রে।
ভগিনীব বিবাহ দিলেক সেই পাত্রে॥
হরিভক্ত মহিমাব কর্ম্ম কে জানয়?
বিষ দিতে বিখে মিলে এ বড় বিস্ময়॥
বর কন্যা গৃহে আইল মঙ্গলাচরণে।
বৃত্তান্ত শুনিয়া বাজা নিন্দয়ে আপনে॥
ছিছি ধিক ধিক মোর এ ছার জীবনে।
এত অপমান মোর না সহে পরাণে॥
মোর কন্যা হেন বরে বিধি ঘটাইল।
গর্ভবাসে মোর কেন মৃত্যু না হইল॥
শিশু কৃষ্ণভক্ত, আর বিবাহ নির্ব্বন্ধ।
তথাচ না বুঝে রাজা মূঢ়মতি মন্দ॥
পুন মারিবারে তবু উপায় চিন্তয়।
কন্যা রাঁড় হয় হউক, স্বীকার করয়॥
বিবাহের পরে দেবীপূজা কুল ধর্ম্ম।
করিবারে গেলা বর লইয়া শুভ কর্ম্ম॥
রাণীগণ রাজপুত্র গণ সবে গেলা।
চন্দ্রহাসে মারিবারে দূত পাঠাইলা॥

ভাল মন্দ চন্দ্রহাস কিছুই না জানে।
মন বুদ্ধি সদা মাত্র কৃষ্ণের চরণে॥
দেবীরে প্রণাম করিতে সবে কহে।
সেই তর্কে রাজদূত খড়্গ হস্তে রহে॥
কৃষ্ণভক্ত হিংসা দেবী সহিতে নারয়।
প্রতিমা কাটিয়া উগ্ররূপে বাহিরয়॥
খড়্গাঘাতে রাজপুত্রে আদি নীচগণে।
মস্তক কাটিয়া করে কন্দুক ক্রীড়নে॥
রাজা শোকাকুলি হয়ে যাই দেবী স্থানে।
আত্মঘাত করি তেয়াগয় নিজ প্রাণে॥
কৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছা অবার্থ সন্ধান।
চন্দ্রহাস বৈসে সেই রাজসিংহাসন॥
অতএব বিঘ্নের বিঘ্ন হরির ভকত।
তাঁর পদে যার মতি, সেহ এই মত॥
চন্দ্রহাস রাজ সিংহাসনেতে বসিয়া।
শাসন করিল রাজ্য কৃষ্ণভক্তি দিয়া॥
এ ছার জনমে মোর প্রার্থনীয় এই।
সেই রাজ্যে প্রজা হৈয়া যেন জন্ম লই॥

মোগলের দরবারে বিদেশী ভ্রমণকারী।

মোগলসম্রাট আওরঙ্গজীব যে সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, মোগলসাম্রাজ্যের গৌরব ও ক্ষমতা যে সময়ে উন্নতির চরমসীমায় উপস্থিত হয়, সে সময়ে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ একে একে ভারতে উপনীত হইতে থাকেন। ইহার পূর্ব্বেও অনেকে ভারতে আসিয়া আপন আপন ভ্রমণ বিবরণ লিখিয়া স্বদেশীয়দিগকে চমকিত করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই কর্ত্তব্য-সম্পাদনে অনলস, একাগ্রতায় তৎপর, বর্ণনার বৈচিত্র্য সম্পাদনে অগ্রসর ও

কল্পনার চাতুরী প্রদর্শনে উন্মুখ ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে সকল ইউরোপীয় প্রাচ্য ভূখণ্ডে আসিয়া আপনাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টা করে, তাহাদের প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল। তাহারা আপনাদের সাহস ও আপনাদিগের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া অনেক স্থলেই অনেক দুরূহ কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহারা এক হস্তে তরবারি, অন্য হস্তে ক্রুশচিহ্ন ধারণ করিয়া অসঙ্কোচে অবলীলায় আপনাদিগের কার্য্যসিদ্ধির পথ প্রশস্ততর করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের উদ্যম, তাহাদের একাগ্রতা ও তাহাদের জিগীষা কোন স্থলেই প্রতিহত হয় নাই। তাহারা নানা বিপত্তিপূর্ণ, অজ্ঞাতপূর্ব্ব, সমুদ্রপথে কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিয়াছে। সমৃদ্ধ নগর সকল অধিকার করিয়াছে, এবং বলশালী ভূপতির সহিত তুল্যবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। তাহাদের ধর্ম্মমন্দির, তাহাদের আশ্রমগৃহ, মুসলমানের মসজিদ ও হিন্দুর দেবমন্দিরের পার্শ্বে থাকিয়া তাহাদের বিজয়িনী শক্তির মহিমা বিস্তার করিয়াছে। তাহারা অনেককেই আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে এবং অনেককে আপনাদের সৈনিকদলে নিবেশিত করিয়া তাহাদিগকে রণবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে। অনেক ভ্রমণকারী তাহাদের দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। অনেক সুবাদার তাহাদের ক্ষমতায় পরাজিত হইয়াছে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বন্দর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অধিপতিদিগের নিকট হইতে সনন্দলাভ করিয়াছে, এবং নানা স্থানে কর সংগ্রহের জন্য কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও তাহাদের ক্ষমতা ও গৌরবের কাহিনী লোকের স্মৃতিতে জাগরূক ছিল। কথিত আছে, এই সময়ে একজন মোল্লা যুবক আওরঙ্গজীবকে একজন প্রধান পর্ত্তুগিজ ভূপতির গল্প বলিয়া আমোদিত করিতেন। বিদেশীয়দিগের এই গৌরবকাহিনী ভারতের এই শেষ গৌরবান্বিত মোগল সম্রাটের স্মৃতি হইতে কখন স্খলিত হয় নাই।

ভারতে পর্ত্তুগীজ জাতির এইরূপ গৌরব কাহিনী শুনিয়া অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি প্রাচ্য ভূখণ্ডে আসিতে উদ্যত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেকে আপনাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধির বা ভূয়োদর্শন লাভের আশায় ভারতের উপকূলে পদার্পণ করিতে থাকে। এই সকল ভ্রমণকারীদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। স্বভাবে ও কার্য্যে এই উভয় শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে উভয়ের বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত। এক দল ইউরোপীয—সমাজের অতি ঘৃণার পাত্র ও

মানব জাতির অতি অপকৃষ্ট অংশের মধ্যে পরিগণিত ছিল। যাহারা সমাজে নানা প্রকার অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, বিধি ব্যবস্থার অবমাননা করিয়া নানা অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, অবশেষে ফাঁসি কাষ্ঠ বা কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের শোচনীয় জীবনে আপনারাই পরিতপ্ত হইয়াছে, তাহারাই দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া মোগলের দরবারে বা আরাকানের ভূপতির আশ্রয়ে থাকিয়া আপনাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধির উপায় দেখিত। ইহাদের উদ্যম ও ইহাদের অধ্যবসায় একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। ইহারা সাহসী, উৎসাহপূর্ণ ও কার্য্য কুশল ছিল। যদি ইহারা অশ্বচালনায় দক্ষতা প্রকাশ করিতে পারিত, কামান সকল সজ্জীভূত করিতে সক্ষম হইত, বন্দুকের গুলি লক্ষ্যে পাতিত করিতে কৌশল দেখাইতে পারিত, বা অন্য কোনরূপে আপনাদের সমর কৌশলের পরিচয় দিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে সম্রাটের দরবারে ইহাদের কখন অবমাননা হইত না। ইহাদের পরিচর্য্যার জন্য অনেক অনুচর নিযুক্ত হইত, আবাসের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন গৃহ সকল সজ্জীভূত করা হইত। ইহারা বহু সংখ্যক সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া সম্রাটের দরবারে বিশেষ সুখ ও সম্মানের সহিত কালাতিপাত করিত। ইহারা যে এক সময়ে আপনাদিগের জন্মভূমিতে উদ্দাম প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিল, বিলুণ্ঠনে, বিধ্বংসে বা বিপ্লবে আপনাদের বলবতী জিঘাংসায় পরিতর্পণে সাহসী হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া ইহারা এখন পরিতপ্ত হইত না। ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, ইংরেজ ও ওলন্দাজ নাবিক, দস্যু, ও নরঘাতকেরা এইরূপে ভারতের মোগল দরবারে আসিয়া আপনাদের জীবিতকালের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিল। স্বদেশে ইহাদের দুরাচারের কাহিনী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, বিদেশেও ইহাদের কার্য্য কলাপের কোন চিহ্ন থাকে নাই। ইহাদের দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির কথা লিপিবদ্ধ হইয়া ইতিহাসে স্থান পরিগ্রহ করে নাই; উহা ইহাদের দেহের সহিত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই শ্রেণী ব্যতীত আর এক দল লোক বাণিজ্য ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি, গবেষণার চরিতার্থতা এবং আপনাদের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য ভারতে সমাগত হইয়াছিলেন। ইংরেজ ও ফরাসিরাও অধিকাংশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহারা সুশিক্ষিত সুব্যবস্থিত ও সৌম্য প্রকৃতি ছিলেন। ইউরোপের অনেক পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ইঁহাদের সম্মান করিতেন। এই

সকল পণ্ডিত ইহাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অতি আগ্রহের সহিত পড়িতেন। কিন্তু ইহাদের যেমন ভূয়োদর্শিতা ছিল, বিচার শক্তি তেমন সূক্ষ্ম ছিল না। কৌতূহলপর লোকে ইহাঁদের নিকট যাহা কিছু বলিয়াছে, ইহারা তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। সুতরাং ইহাঁদের বর্ণনা অধিকাংশ স্থলেই অতিশয়োক্তিতে কলঙ্কিত হইয়াছে। ইহাঁরা অনেক স্থলে এরূপ অতি-রঞ্জন-প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন যে, ইহাঁদের লিখিত বিষয় কোন কোন স্থলে ঈসপের গল্প-মালাকেও অধঃকৃত করিয়াছে। অধিকন্তু ইহাঁরা ঘটনাবলীর তারিখ সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। স্থানের দূরত্বও সূক্ষ্মরূপে অবধারণে সমর্থ হন নাই। ইহাঁরা প্রাচ্য ভূখণ্ডে স্থানের ও ব্যক্তির-নাম এরূপ লিখিয়াছেন যে তাঁহাতে সার উইলিয়ম জোন্স এবং মাউণ্ট ষ্টুয়ার্ট এলফিনষ্টোনও বিস্মিত ও বিব্রত হইতে পারেন। তাঁহাদের বর্ণনা চিত্রকরের চাতুরীতে বা ঐতিহাসিকের যথার্থ-প্রিয়তায় মনোহারিণী হয় নাই! তাঁহারা এভাবে ভারতের মানচিত্র আঁকিয়াছেন, যে উহাতে হুগলি একটী দ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং রাজমহল বঙ্গ অখাতের উপকূলে শোভা পাইতেছে।

ভ্রমণকারীরা এইরূপে আপনাদের কল্পনাপ্রিয়তা বা অতিরঞ্জন-শক্তির পরিচয় দিলেও আমরা তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে অনেক স্থলে অনেক বিবরণ জানিতে পারি। তাঁহারা অনেক সময়েই অনেক ঘটনা যথাযথরূপে বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সকল ইউরোপীয় ভ্রমণকারী মোগলের দরবারে উপনীত হয়েন, আমরা এ স্থলে তাঁহাদের পরিচয় দিতেছি। প্রথমে সর টমাস রো ভারতে উপনীত হয়েন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে সর টমাস্ ইংলণ্ডের অধিপতি প্রথম জেমসের দূত হইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে আইসেন। ইনি তদা-নীন্তন সময়ের ঘটনা সূক্ষ্মরূপে লিখিতে যথোচিত প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সর্ব্বাংশে সফল হয় নাই। ইনি স্বয়ং যে ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে ভার বহনে তাঁহার তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না। অপরি-চিত স্থানে আসিয়া অপরিচিত বিষয়ের বর্ণনা করিতে হইলে বিশেষ সূক্ষ্মদর্শিতার আবশ্যক। প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া অনেক বিষয় জানিয়া শুনিয়া নিজের ভূয়োদর্শিতা বৃদ্ধি করা উচিত। কিন্তু সর টমাসের এরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা ও এরূপ ভূয়োদর্শিতা ছিল না। দরবারের প্রধান

প্রধান ওমরাহের সহিত ইহাঁর তাদৃশ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সুতরাং পূর্ব্বে কি ঘটিয়া থাকে, তাহা ইনি সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারেন নাই। সম্রাট আপনার সিংহাসনের উপরিভাগে প্রাচীরে ইংলণ্ডের রাজা ও রাণীর, লেডী এলিজাবেথের এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর জেনারলের প্রতিকৃতি রাখিয়াছিলেন। সম্ভবত সার টমাস্ রো এই সকল প্রতিকৃতি সম্রাটকে উপহার দেন। রো আপনার ভ্রমণবৃত্তান্তে এই বিষয় বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভারতে যে ইংলণ্ডের আধিপত্য বদ্ধমূল হইবে, তাহা আওরঙ্গজেবের এই কার্য্য হইতে বোধ হয় সূচিত হইয়াছিল।

এড্ওয়ার্ড টেরি ও কাপ্তেন ফকেন্স বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইহাঁরা সর টমাস রোর সমকালে ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করেন। রো অপেক্ষা ইহাঁদের কর্ম্মক্ষমতা অধিকতর ছিল। কিন্তু শেষোক্ত ভ্রমণকারী আপনার ভ্রমণবৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে লিখিয়া গিয়াছেন। পক্ষান্তরে প্রথম জনের লিখিত বিবরণ উক্তরূপ সংক্ষিপ্ত নহে। ইহার বর্ণনা মনোহর ও বিষয়গুলি সুপ্রণালীতে বিন্যস্ত। এই সকল বিষয় জানিয়া বিশেষ আমোদিত হওয়া যায়।

চতুর্থ ভ্রমণকারী জন্ আলবর্ট মন্‌বেল্‌সো একটি প্রসিদ্ধ বংশে মাকবেলবর্ক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। দেশভ্রমণে প্রগাঢ় অনুরাগ বশত ইনি সুখ ও সম্পত্তি উভয়ই জলাঞ্জলি দেন। পারস্য, আরব প্রভৃতি স্থান হইতে এই ভ্রমণকারী সুরাটে পদার্পণ করেন। ইহাঁর সাহস ও উদ্যম কোথাও পর্য্যুদস্ত হয় নাই। ইনি সুরট হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত গমন করেন। ইহাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সমকালে যে তিন জন ভ্রমণকারী ভারতে সমাগত হন, তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনেক জ্ঞাতব্য ও আমোদকর বিষয়ে পরিপূর্ণ। এ অংশে অন্যান্য ভ্রমণকারীরা ইহাঁদের ন্যায় যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ইহাঁদের এক জনের নাম জন্ বাপটিস্ত টেবারনিয়া। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পারিসে জন্মগ্রহণ করেন। কুড়ি বৎসর বয়সে ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশে যাইয়া অত্রত্য রীতিনীতি ও ভাষা অবগত হন। স্বয়ং রত্নব্যবসায়ী হওয়াতে ইনি তুরস্ক, পারস্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থলে যাইয়া রত্নাদি বিক্রয় করিতেন, ভারতের নবাবদিগের মধ্যে ইনি কিরূপে সহস্র সহস্র মুদ্রা উপহার দিয়াছেন, সুরাট হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত কিরূপে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, বর্ণিয়ারের সহিত বঙ্গের সমতল ক্ষেত্র ও জলাভূমি সকল কিরূপে অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার

ব্যবসাবাণিজ্য কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, তিনি কিরূপে রত্নাদি বিক্রয় করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ইঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বিশদরূপে জানিতে পারা যায়।

অন্য ব্যক্তি ইউরোপের দক্ষিণাংশস্থিত তপন-কর-বিভাসিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় ভূখণ্ডের অধিবাসী। ডাক্তার জন্ ফ্রান্সিস্ গেমেলিকাবিরে এই ভূখণ্ডের যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা আলেখ্যবৎ রমণীয়তার জন্য চির প্রসিদ্ধ। ইতালীয়গণ প্রকৃতির এই প্রিয় নিকেতনের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। কৌতূহলের পরিতৃপ্তি সাধন ও পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য গেমেলি-কারিয়ে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। তিন জনের মধ্যে ইঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তই অধিকতর বৈচিত্র্য-পূর্ণ। ইনি সরলভাবে সকল কথাই অতি সূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া বহুর্শিতা উপার্জ্জন ভিন্ন ইঁহার ভ্রমণের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং তিনি যাহা দেখিয়াছেন বা যাহা শুনি-য়াছেন, তাহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের ক্রটি করেন নাই। ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য পশু পক্ষীর বিবরণ, অধিবাসীদিগের রীতিনীতি, হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, রাজ্যের শাসনপ্রণালী, পর্ত্তুগিজদিগের উন্নতি ও যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তৎসমু-দয়ের কথা—সমস্তই তাঁহার ভ্রণবৃত্তান্তে অতি বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। এই চিত্র অনেক স্থলে যেমন স্বাভাবিক, তেমনি হৃদয়াকর্ষক। কিন্তু তিনি বোধ হয়, সাতিশয় উগ্রপ্রকৃতি ও ধর্ম্মান্ধ ছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, ইনি যখন সুযোগ পাইয়াছেন, তখনই দেবমূর্ত্তি বিনষ্ট করিতে বিমুখ হন নাই। ১৬৯৫ অব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইনি গোয়া হইতে দক্ষিণ আমেরিকা পর্য্যন্ত যাইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ কার্য্য সম্পন্ন করেন।

সর্ব্বশেষ ভ্রমণকারী বর্ণিয়ার। এই ফরাসী ভ্রমণকারীর যেমন উৎসাহ ও একাগ্রতা, তেমনি সূক্ষ্মদর্শিতা, রহস্যপটুতা ও লোকরঞ্জনে শক্তি ছিল। ইনি সাধারণের এরূপ অধিগম্য ছিলেন যে, নিম্ন হইতে উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত অনেকে ইঁহার বন্ধুমধ্যে পরিগণিত ছিলেন। যাহা কিছু ইঁহার সম্মুখে পতিত হইয়াছে, তাহারই সূক্ষ্ম বিবরণ সংগ্রহ করিতে ইনি কষ্ট স্বীকার করিতে বা অর্থব্যয়ে কাতর হন নাই। আওরঙ্গজেবের এক জন প্রধান পারিষদের অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া ইনি দরবারের সমস্ত ঘটনাই জানিতে পারিয়াছিলেন। পৃথিবীর কোন দরবারের কোন ব্যক্তি নিগূঢ় তত্ত্ব সংগ্রহে ইঁহার ন্যায় সুযোগ পাইয়া

ছিলেন কি না সন্দেহ। ইনি অনর্গল উর্দ্দু বলিতে পারিতেন। পারস্য ভাষা হইতে অনুবাদ করিতে জানিতেন, এবং গোলেস্তার পদাবলী মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। ইহাঁর উদ্যম কোথাও প্রতিহত হয় নাই; মনের স্থিরতা কোথাও বিচলিত হয় নাই এবং বিচারশক্তি কোথাও অবনত হইয়া পড়ে নাই। ইতি বালেশ্বর হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত যাহা দেখিয়াছেন, তাহারই চিত্র যথাযথ ভাবে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতে উদাসীন হন নাই। ঘটনার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বর্ণনায় ইনি বস্‌ওয়েলের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইবার যোগ্য। গিবন্ ইহাঁর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন এবং এল্‌ফিনষ্টন ইহাঁর উপর নির্ভর করিয়া ভারতের ইতিহাসের অন্ধকারময় দুর্গম পথ অনেকাংশে আলোকিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই তিন জন ভ্রমণকারীর ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতের শেষ প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের অনেক কথা বিশদরূপে জানিতে পারা যায়।

কর্ণেল অলকট।

১

সুনীল আকাশে শ্বেত মেঘ মত,
নীল পারাবারে মাতা শ্বেতাঙ্গিনী,
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা, গৌরবে-গর্ব্বিনী,
মার্কিনের অঙ্কে বসি ধ্যান রত,
হে শ্বেতর্ষি! তুমি দেখিলে কি, হায়!
আমাদের মাতা পতিতা ভারত
পাশ্চাত্য-সভ্যতা-দর্শন ধূয়ায়
যাইছে ছুটিয়া নিপাতের পথ!
শান্তি-সিন্ধুতীরে শ্বেতাঙ্গ ঈশান
বিষাণ ঝঙ্কারে কহিলে সম্ভাষি,—
"হায় মা! ফিরিয়া দেখ রাশি রাশি
"তারাময় তব অতীত বিমান।
"যোগীন্দ্র মহাত্মা, অমরেন্দ্রগণ
"হিমাদ্রি শেখরে ওই অগণন।

২

"দাঁড়াইয়া ওই নর-নারায়ণ,—
"পাঞ্চজন্য রবে পূরিয়া গগণ,
"কহিছে—ত্যজিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম, নর!
লও একমাত্র আমার শরণ!"
ফিরিলা জননী; দেখিলা চাহিয়া
নক্ষত্র-খচিত আকাশ তাঁহার।
তব কণ্ঠ তাহে উঠিছে ভাসিয়া
ডুবা'য়ে পাশ্চাত্য ঝিল্লির ঝঙ্কার।
মৃতা ভারতেরে দিলে তুমি প্রাণ!
লও পাদ্য অর্ঘ ঋষি আয়ুষ্মান্।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

নবজীবন।

৪র্থ ভাগ। } আষাঢ়, ১২৯৫। } ১২শ সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞ বীজম্॥ ২৫।

পদচ্ছেদঃ। তত্র, নিরতিশয়ং, সর্ব্বজ্ঞ, বীজম্।

পদার্থঃ। তত্র—তস্মিন্ ভগবতি, নিরতিশয়ং-নির্নাস্তি অতিশয়ঃ যস্মাৎ তৎ কাষ্ঠাপ্রাপ্তমিতি যাবৎ, সর্ব্বজ্ঞবীজং সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বজ্ঞত্বস্য অতীতানাগতাদিগ্রহণস্য বীজং লিঙ্গং অনুমাপকোহেতুরিতি যাবৎ। কারণমিতি কেচিৎ।

অন্বয়ঃ। তত্র সর্ব্বজ্ঞবীজং নিরতিশয়মস্তীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। দৃশ্যতে হি অণুত্বমহত্ত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং সাতিশয়ানাং কাষ্ঠা প্রাপ্তিঃ, যথা পরমাণাবণুত্বস্যাকাশে চ পরমমহত্বস্য। এবং জ্ঞানাদয়োপি চিত্ত ধর্ম্মা তারতম্যেন পরিদৃশ্যমানাঃ কচিন্নিরতিশয়তামাপাদয়ন্তি যত্র জ্ঞানস্য কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ স সর্ব্বজ্ঞঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। যে চৈতন্যরূপ পুরুষে সর্ব্বজ্ঞতার অনুমাপক জ্ঞান চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত সেই পুরুষ ঈশ্বর।

সমালোচন। পূর্ব্ব সূত্র দ্বারা আপ্ত বচনানুসারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে অনুমান-রূপ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছেন। আমরা এস্থলে দর্শন শাস্ত্রের একটি রহস্য দেখিতেছি।

আমরা দেখিতেছি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধি বিষয়ে পতঞ্জলির মতন নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা ঋষিগণও অনুমানরূপ প্রমাণ অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকের মত পরস্পর ঐক্য হইলেও

পতঞ্জলির অনুমানের রীতি তাঁহাদের অনুমানের রীতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদিগের মতে ঈশ্বর সগুণ; জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন প্রভৃতি অনেক গুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান; কাযেই তিনি স্বয়ং কর্ত্তা, আপনার ইচ্ছামত সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করিতে সক্ষম। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র মতে ঈশ্বর নির্গুণ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। জগৎ কার্য্যের প্রতি তাঁহার নিজের কোন ক্ষমতা নাই, তিনি উদাসীন ভাবে উহার দ্রষ্টামাত্র। এরূপ স্থলে এই উভয়ের অনুমানের পদ্ধতি যে ভিন্ন হইবে, তাহা বড় বিচিত্র নয়।

নৈয়ায়িকেরা বলেন—কার্য্য মাত্রেরই কর্ত্তা আছে; এই জগৎ যখন কার্য্য—তখন ইহারও অবশ্য একজন কর্ত্তা মানিতে হইবে;—সেই কর্ত্তাই ঈশ্বর। পতঞ্জলির পক্ষে এই অনুমানটি খাটে না। কারণ যোগশাস্ত্র সাংখ্য সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবিষ্ট; এই সাংখ্য সম্প্রদায়ে এত দিন ধরিয়া যে নিরীশ্বরতা দোষ ছিল, পতঞ্জলি এই ঈশ্বরাস্তিত্ব নিরূপক সূত্র দ্বারা তাহা নিবারণ করিয়াছেন মাত্র; এই নিমিত্তই যোগশাস্ত্র সেশ্বর সাংখ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাংখ্যেরা বলেন, কার্য্য মাত্রেরই এক একটি কর্ত্তা আছে সত্য এবং সেই জন্য এই জগৎ কার্য্যেরও একটি কর্ত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু সে কর্ত্তা প্রকৃতি। জগৎ কার্য্যের উপর একমাত্র প্রকৃতিরই যে কর্তৃত্ব, তাহা সাংখ্যাচার্য্যগণ বিশেষ যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতের সার মর্ম্ম এই "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" প্রকৃতিই জগতে যাবদীয় কার্য্যের কর্ত্রী। তবে আত্মা কেবল অহঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া ঐ সকল কার্য্যকে নিজের বলিয়া বিবেচনা করেন। এই নিমিত্তই মহর্ষি কপিল মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, যদি জগৎ-কার্য্যের কর্তৃত্বের জন্য ঈশ্বর মানিতে হয়, তবে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।" সেরূপ ঈশ্বর না মানিলে কোন ক্ষতি নাই, যে হেতু প্রকৃতিই জগৎ কার্য্যের কর্ত্তা।

মহর্ষি পতঞ্জলি নিজের সাংখ্য সাম্প্রদায়িকতা বজায় রাখিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছেন অথবা কপিলের "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই বাক্য যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে একেবারে লোপ করিতেছে না, তাহাই বুঝাইতেছেন। তিনি বলেন জগৎ কার্য্যের উপর কর্তৃত্ব নাই বলিয়াই যে ঈশ্বর নাই এমন কথা বলিও না, কারণ আমরা অন্য প্রকারেও ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুমান করিতে পারি। তাহা এই—"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞ বীজম্।" এই অনুমান বা তর্কটিকে বিশদ করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথমে আর একটি অনুমান

বা তর্কের অবতারণা করিতে হইবে। যথা—আমরা ইহ জগতে যে সকল বস্তুর তারতম্য অর্থাৎ স্থূল বিশেষে আধিক্য বা ন্যূনতা দেখিতে পাই, তাহারা যে এক স্থলে চরম উৎকর্ষ বা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেমন অণু-পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমিতে কমিতে পরমাণুতে চরম উৎকর্ষ বা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে ; কারণ পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র আর কিছুই নাই। এইরূপ মহৎ পরিমাণ ক্রমশ বাড়িতে বাড়িতে আকাশে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে ; কারণ আকাশ হইতে মহৎ আর কিছুই নাই। এক্ষণে দেখ সর্ব্বজ্ঞতা অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জ্ঞান একটি তারতম্যতাবিশিষ্ট বস্তু বা ধর্ম্ম ; কেননা পুরুষ মাত্রেরই কিছু না কিছু পরিমাণে সর্ব্বজ্ঞতা লক্ষিত হয় ; কিন্তু সকলের সমান নয়, রাম অপেক্ষা শ্যামের জ্ঞান কিছু বেশি। আবার শ্যাম অপেক্ষা যাদবের আরও অধিক ; কেবল তা নয়, একা রামেরই বাল্যকালের জ্ঞান একরূপ অস্ফুট, যৌবনে তাহা অপেক্ষা স্ফুট, আবার বৃদ্ধাবস্থায় তদপেক্ষাও পরিণত হয়, অতএব এই জ্ঞান যে কোন স্থানে চরম উৎকর্ষ বা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে,—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যে স্থানে এই জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে তিনিই ঈশ্বর।

পাঠকগণ বিবেচনা করে দেখ, মহর্ষি পতঞ্জলি কিরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্য-বলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধিবিষয়ে এই নূতন অনুমানের আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহাতে সাংখ্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তিত প্রকৃতির জগৎকর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বজায় রহিল অথচ তাঁহাদের নিরীশ্বরতাপবাদ দূর করা হইল ; ইহাই যথার্থ চাতুর্য্য। ভাষ্যকার বলেন, অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন জগতে জ্ঞানধর্ম্মের উপদেশ দ্বারা সংসারপতিত ভূতগণের উদ্ধারের পথ দেখাইবার জন্য সেইরূপ সম্পূর্ণরূপ সর্ব্বজ্ঞতা পূর্ণ পুরুষের স্থিতি আবশ্যক।

এই নিমিত্তই—ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাদীনাং যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ।

ব্রহ্মাদিরও সম্পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞতা নাই, কাযেই তাঁহারা ঈশ্বর হইতে পারেন না।

স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। ২৬

পদচ্ছেদঃ। পূর্ব্বেষাং, অপি, গুরুঃ, কালেন, অনবচ্ছেদাৎ।

পদার্থঃ। স পূর্ব্বোক্তঃ, এষ ঈশ্বরঃ পূর্ব্বেষাং পূর্ব্ববর্ত্তিনাংসর্গাদ্যৎপন্নানাং অপি ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদীনাং গুরুঃ। অন্তর্য্যামী বিদ্যয়া জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদ

উপদেষ্টা, কালেন, সময়েন ন অবচ্ছিদ্যতে ইত্যনবচ্ছেদঃ তস্মাৎ অনাদিত্বা-দিত্যর্থঃ।

অন্বয়ঃ। কালেন অনবচ্ছেদাৎ স পূর্ব্বেষামপি গুরুর্ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। স কালাতীতঃ অনাদিস্ততশ্চ সৃষ্টে রাদৌউৎপন্নানাং ব্রহ্মাদীনাং দেবানামৃষীণাঞ্চ উপদেষ্টা তাদৃশং কালানবচ্ছিন্নং গুরুং ব্রহ্মাদীনাং জ্ঞাতৃত্বা সম্ভব ইতি ভাবঃ। কচিৎসূত্রে এব ইতি পাঠোনাস্তি।

অনুবাদ। সেই পরমেশ্বর কালাতীত অর্থাৎ কোনরূপ কাল পরিমাণ দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি প্রভৃতির ইয়ত্তা করা যায় না, অতএব তিনি সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মহর্ষিগণের জ্ঞান উপদেষ্টা গুরু।

সমালোচন। সেই ঈশ্বর অমুক সময়ে এত ঘণ্টা বেলার সময় উৎপন্ন হইয়াছেন, এত কাল অবস্থিতি করিবেন এবং অমুক সময়ে তাঁহার ধ্বংস হইবে। ইত্যাদি প্রকার কাল কৃত ইয়ত্তা তাঁহাতে নাই। অর্থাৎ তিনি অনাদি অনন্ত সুতরাং সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ যাঁহারা আমাদের নিকট শ্রেষ্ঠদেব বলিয়া বিখ্যাত তাঁহাদেরও জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেষ্টা গুরুস্বরূপ। ভাষ্যকার বলেন, কেবল যে বর্ত্তমান সর্গের প্রথমে উৎপন্নদিগের গুরু তাহা নহে, যে সকল অনন্ত সর্গ হইয়া গিয়াছে এবং যে সকল অনন্ত সর্গ উৎপন্ন হইবে, সে সকলের প্রথমোৎপন্ন দিগেরও তিনি জ্ঞানোপদেষ্টা।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ ২৭।

পদচ্ছেদঃ। স্পষ্টং।

পদার্থঃ। তস্য ঈশ্বরস্য, বাচকঃ অভিধায়কঃ প্রণবঃ প্রকর্ষেণ নূয়তে স্তূয়তেঽনেনেতি প্রণবঃ ওঙ্কারঃ।

অন্বয়ঃ। প্রণবঃ তস্য বাচকো ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। ঈশ্বরস্য বাচকঃ, প্রণবঃ, প্রণবস্য তু বাচ্য ঈশ্বরঃ। তয়োশ্চ বাচ্যবাচকভাবলক্ষণ সম্বন্ধো নিত্যঃ সঙ্কেতেন প্রকাশ্যতে, নতু কেন চিৎ ক্রিয়তে। যথা পিতৃপুত্রয়োর্বিদ্যমানঃ সম্বন্ধেঽস্যায়ং পিতা, অস্যায়ং পুত্র ইতি কেন চিৎ প্রকাশ্যতে। অতএবাহ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"অদৃষ্ট বিগ্রহোদেবো ভাবগ্রাহ্যো মনোময়ঃ।
তস্যোঙ্কারঃ স্মৃতোনাম তেনাহুতঃ প্রসীদতি॥"

অদৃষ্টবিগ্রহোঽস্তুত শরীরো দেবঃ পরমাত্মা, ভাবগ্রাহ্যো ভক্তিমাত্রগ্রাহ্যো,

মনোময়মনস্তর্লা কারণোপাধিশবলঃ, তস্য নাম ওঙ্কারঃ স্মৃত ওঙ্কারেণ সহ তস্য বাচ্যবাচকভাবো নিত্য ইত্যর্থঃ, তেন ওঙ্কারেণ আহূতঃ সন প্রসীদতি কর্ত্তব্য বিচারোপযোগিনমর্থং পূরয়তীত্যর্থঃ।

অনুবাদ। সেই ঈশ্বরের বাচক বা নাম প্রণবঃ।

সমালোচন। এই জগতে যতগুলি বস্তু বা পদার্থ দৃষ্ট শ্রুত বা অনুভূত হয়, তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি বাচক বা প্রতিপাদক বিশেষ্য শব্দ আছে, যাহা উচ্চারণ করিবামাত্র সেই সেই পদার্থের বোধ হয়। যেমন গোরু এই শব্দটি উচ্চারণে এক প্রকার জানয়ারের বোধ হয়। সেই জানয়ারের বাচক গোরু। সেই বাচক শব্দগুলি দুই প্রকার, গুণবাচক এবং বস্তুবাচক। গুণবাচক শব্দগুলির নাম বিশেষণ এবং বস্তুবাচক শব্দগুলির নাম বিশেষ্য। এই উভয়বিধ শব্দই কালক্রমে বস্তুর বাচকরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় আমরা এক একটি বস্তুর অনেকগুলি নাম বা বাচক শব্দ দেখিতে পাই। এমন কি, এক একটি বস্তুর নামের মধ্যে গুণবাচক বা বিশেষণ শব্দ এত প্রবিষ্ট হইয়াছে, যে উহার মধ্য হইতে প্রকৃত বস্তুবাচক বা বিশেষ্য শব্দটি খুঁজিয়া লওয়া দুর্ঘট হইয়াছে, অনেক স্থলে প্রকৃত বিশেষ্য শব্দটি হয় ত লোপ প্রাপ্ত হয়; অন্যান্য বস্তুর মত এক্ষণে ঈশ্বরের বাচক অনেকগুলি শব্দ দৃষ্ট হয়। যথা—ঈশ্বর, পরমেশ্বর, ধাতা, বিধাতা ইত্যাদি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ সকল গুণবাচক মাত্র, উহারা ঈশ্বরের এক একটি গুণ বা ধর্ম্ম অনুসারে কল্পিত হইয়াছে। ঈশ্বরের বাচক প্রকৃত বিশেষ্য শব্দ একমাত্র প্রণব বা ওঙ্কার। এই ওঙ্কারের সহিত ঈশ্বরের বাচ্য বাচক সম্বন্ধ নিত্য বা স্বতঃসিদ্ধ, কোন গুণ বা ধর্ম্ম অনুসারে কল্পিত হয় নাই। যেমন পিতা পুত্রের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ—লোক দ্বারা অমুক পিতা অমুক পুত্র এইরূপে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বর ও ওঙ্কারের মধ্যে বাচ্য বাচক সম্বন্ধও নিত্য; বেদাদি দ্বারা ঈশ্বর বাচ্য এবং ওঙ্কার বাচক, এইরূপে প্রকাশিত হয় মাত্র। এই নিমিত্তই যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"অদৃষ্ট বিগ্রহোদেবো ভাবগ্রাহ্যো মনোময়ঃ।
তস্যোঙ্কারঃ স্মৃতোনাম তেনাহূত প্রসীদতি॥"

ঈশ্বরের শরীর প্রত্যক্ষ হয় না, তিনি ভক্তির বস্তু এবং মনের মত স্বাভাবিক সত্ত্বগুণ সম্পন্ন। ওঙ্কারই তাঁহার নাম; এই নাম দ্বারা আহূত হইয়া ভক্তের উপর প্রসন্ন হন। এই নিমিত্তই বোধ হয় ঐ ওঙ্কারের অ, উ, ম,

এই অবয়বের মধ্যে কোন না কোনটির সহিত যোগ করিয়া তন্ত্রের মূল মন্ত্র সকল আবির্ভূত হইয়াছে।

এই স্থলে ইংরাজী দর্শনাভিজ্ঞ, মিলের বাদশাস্ত্রের দুইটি কথা স্মরণ করিলেই বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিবেন। কথা দুইটি Denotation এবং Connotation. বিধাতা বলিলে তাহার denotation কেবল বিধান-কর্তা, কিন্তু connotation অর্থে ঈশ্বর বটে। সেই রূপ ভগবান্ বলিলে ষড়ৈশ্বর্য্য যুক্ত পুরুষ মাত্র denote করে, Connotation অর্থে ঈশ্বর বটেন। ইংরাজিতে যে সকলকে Proper Noun বলে, সেই সকল সংজ্ঞার Denotation এবং Connotation একই। ঈশ্বরের সেইরূপ proper name বাচক নাম ওঁ। ওঁ বলিলে কাল শাদা, ভাল মন্দ, ধারণ কর্ত্তা সৃষ্টি কর্ত্তা,— এ সকল কিছুই বুঝায় না—বুঝায় কেবল ঈশ্বর। ঐ ওঙ্কার মাত্র ঈশ্বরের স্বরূপ বাচক, ধাতা বিধাতাদি পদ তাঁহার গুণবাচক মাত্র।

তজ্জপ স্তদর্থ ভাবনম্ ॥ ২৮।

পদচ্ছেদঃ। তৎ-জপঃ, তৎ-অর্থ-ভাবনম্।

পদার্থঃ। তস্য সার্দ্ধ ত্রিমাত্রস্য প্রণবস্য 'জপঃ' যথাবদুচ্চারণং, তদ্বাচ্যস্যে শ্বরস্য 'ভাবনং' পুনঃপুন শ্চেতসি বিনিবেশনম্।

অন্বয়ঃ। স্পষ্টম্।

ভাবার্থঃ। ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বেতি সূত্রেণ সমাধি সিদ্ধৌ যো দ্বিতীয় উপায় উক্তঃ, ইদানীং তমেবোপায়ং বিবৃণোতি-তজ্জপ ইতি। প্রণিধানং নাম ঈশ্বর ভাবনং তদ্ধি ওঙ্কারস্য যথাবদুচ্চারণাৎ নান্যৎ। অতএব সমাধি সিদ্ধয়ে যোগিনা প্রণবো জপ্যঃ, তদর্থশ্চ ভাবনীয়ঃ। তথা চোক্তং—পদস্বাধ্যায়াদ্যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায় মামনেৎ। স্বাধ্যায়যোগ সম্পত্ত্যাপরমাত্মা প্রকাশতে।

অন্বার্থঃ। স্বাধ্যায়াৎ প্রণবার্থ ভাবনাৎ যোগং আসীত প্রাপ্নুয়াৎ প্রণবার্থ-ভাবনা চিত্তস্যৈকাগ্রতা সম্পত্ত্যা যোগস্য সিদ্ধির্ভবতি, তথা যোগাদপি স্বাধ্যায়ং আমনেৎ যোগস্য সিদ্ধাবপি প্রণবার্থং চিন্তয়েদেব। যতঃ স্বাধ্যায়স্য যোগস্য চ সম্পত্ত্যা সম্মেলনেন পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম প্রকাশতে জ্ঞাতো ভবতীত্যর্থঃ।

অনুবাদ। সেই ওঙ্কারের যথানিয়মে উচ্চারণই ঈশ্বরানুশীলন।

সমালোচন। সমাধি লাভের প্রতি ঈশ্বর প্রণিধানরূপ যে উপায়ান্তর কথিত হইয়াছে এই সূত্রে সেই প্রণিধানেরই স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে

মাত্র। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণিধান আর কিছুই নয়, কেবল ওঙ্কারের যথানিয়মে উচ্চারণ এবং মনে মনে তাহার অর্থ পরিচিন্তন। উক্তরূপ ওঙ্কারের প্রতিনিয়ত জপ দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদিত হয়, চিত্তের একাগ্রতাই যে সমাধি সিদ্ধির কারণ, ইহা পূর্ব্বে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥২৯॥

পদচ্ছেদঃ। ততঃ, প্রত্যক্, চেতনা, অধিগমঃ, অপি, অন্তরায় অভাবঃ, চ।

পদার্থঃ। ততঃ তস্মাৎ জপাৎ, তদর্থ ভাবনাৎ চ, প্রত্যক্ চেতনাধিগমঃ প্রতি অঞ্চতি বিষয় প্রাতিকূল্যেন স্বান্তঃকরণাভিমুখং গচ্ছতীতি প্রত্যক্ তাদৃশী যা চেতনা দৃক্‌শক্তিঃ জীবঃ তস্যা অধিগমঃ জ্ঞানং অন্তরায়াঃ বক্ষ্যমাণাঃ ব্যাধি-প্রভৃতয়ঃ সমাধিসিদ্ধৌ প্রতিবন্ধকীভূতাঃ তেষাং অভাবঃ শক্তিপ্রতিবন্ধঃ, চকার সমুচ্চয়ার্থঃ।

অন্বয়ঃ। ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমো ভবতি অন্তরায়া ভাবশ্চ ভবতি।

ভাবার্থঃ। তত ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ তদ্দৃষ্টান্তেন জীবাত্মজ্ঞানং বিষয়ত্যাগ-শক্তিশ্চ চেতসি জায়েতে। তাভ্যামীশ্বর সাক্ষাৎকারো ভবতি। তেন সাক্ষাৎকারেণ চিত্তৈকাগ্রতা তয়া অসংপ্রজ্ঞাতসিদ্ধিঃ। বক্ষ্যমাণানাং ব্যাধি-প্রভৃতীনা মন্তরায়াণাং হানিশ্চ ভবতি।

অনুবাদ। সেই ওঙ্কারের জপ এবং তাহার অর্থচিন্তন-রূপ ঈশ্বর প্রণিধান অভ্যাস করিতে করিতে জীবতত্ত্বের জ্ঞান এবং বক্ষ্যমাণ ব্যাধি প্রভৃতি অন্তরায়ের বিনাশ হয়।

সমালোচন। ওঙ্কারের জপ এবং তাহার বাচ্য ঈশ্বর বিষয়ে চিন্তন করিতে করিতে ঈশ্বরের সহিত তুলনাদ্বারা জীবাত্মার স্বরূপজ্ঞাত হওয়া যায় অর্থাৎ ঈশ্বর পুরুষ, জীবাত্মাও পুরুষ, অতএব ঈশ্বর যেমন নির্ম্মল, সত্ত্বময়, অন্য সংস্রব রহিত এবং সর্ব্ব প্রকার উপসর্গ রহিত আমাদের জীবাত্মাও ত সেইরূপ; কেননা উভয়ই পুরুষ, উভয়েরই এক প্রকার স্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ, এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়। এইরূপে জীবতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে আপনা আপনিই মনে উদয় হয় যে, আমার যে এই সাংসারিক অনন্ত দুঃখভোগ, ইহা কেবল বিষয়ের সংস্রবে হইয়াছে। অতএব বিষয়বাসনা একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিলেই চিত্ত স্থিরভাব অবলম্বন করে এবং চিত্তস্থৈর্য্যের বিঘ্নকারী ব্যাধি প্রভৃতি আর তাদৃশ স্থির চিত্তকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তাহাদের বিঘ্নকারিণী শক্তির বিলোপ হয়। এইরূপ ক্রমে অসংপ্রজ্ঞাত

সমাধি সিদ্ধ হয়। কেহ কেহ বলেন, কেবল ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা নয়, পূর্ব্বোক্ত উপায় অনুশীলন দ্বারাও চিত্তের একাগ্রতা হইলে এইরূপ ফল লাভ হয়। সেই চিত্তের বিক্ষেপকারী অন্তরায়গুলির নাম কি এবং তাহারা কত প্রকার? এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি নিম্নলিখিত সূত্রের উপন্যাস করিয়াছেন।

ব্যাধিস্ত্যান সংশয় প্রমাদালস্যাবিরতি ভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তে২ন্তরায়াঃ॥ ৩০॥

পদচ্ছেদঃ। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধ ভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাঃ, তে, অন্তরায়াঃ।

পদার্থঃ। ব্যাধিঃ ধাতুবৈষম্যনিমিত্তো জ্বরাদিঃ, স্ত্যানং চিত্তস্য অকর্ম্মণ্যতা, সংশয়ঃ সন্দেহ উভয়কোট্যালম্বনং জ্ঞানং, যথা যোগ সাধ্যোনবেতীত্যেবং রূপঃ, প্রমাদঃ অননুষ্ঠানশীলতা সমাধি সাধনে ঔদাসীন্য মিতি যাবৎ। আলস্যং কায়-শ্চিত্তয়োর্গুরুত্বং, যোগবিষয়ে প্রবৃত্ত্যভাবহেতুঃ। অবিবতিঃ বিষয়তৃষ্ণা, ভ্রান্তিদর্শনং শুক্তিকায়াং রজতস্বমিতি বিপর্য্যয় জ্ঞানং, অলব্ধভূমিকত্বং কুতশ্চিৎ নিমিত্তাৎ স সমাধিভূমেরলাভো২সম্প্রাপ্তিঃ, অনবস্থিতত্বং লব্ধাবস্থায়ামপি সমাধিভূমৌ চিত্তস্য তত্রাপ্রতিষ্ঠা। চিত্তং বিক্ষিপ্যতে এভি রিতি চিত্তবিক্ষেপকাঃ, তে এতে, সমাধেবেকাগ্রতযাঃ যথাযোগং প্রতিপক্ষত্বাৎ অন্তরায়া ইতি উচ্যন্তে।

অন্বয়ঃ। ব্যাধিস্ত্যান—অনবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপা ভবন্তি, তে অন্তরায়া ইতি চ উচ্যন্তে।

ভাবার্থঃ। এতে হি ব্যাধি প্রভৃতয়ো রজস্তমোবলাৎ প্রবর্ত্তমানাশ্চিত্তং বিক্ষিপন্তি অস্থিরং কুর্ব্বন্তি ততশ্চ তে সমাধেরন্তরায়াঃ কথ্যন্তে। ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তি দর্শন, অলব্ধ ভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব এই নয়টিচিত্তের বিক্ষেপক অর্থাৎ চিত্তের স্থিরতা বিনষ্ট করে বলিয়া ইহাদিগকে সমাধি লাভের অন্তরায় বিঘ্নকারী বলা হয়।

সমালোচন। ব্যাধি প্রভৃতির অর্থ অবগত হইলেই এই সূত্রের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। ব্যাধি—শরীরস্থ বাত পিত্তাদি ধাতু ও ইন্দ্রিয়ের বৈষম্য জনিত জ্বরাদি রোগ; স্ত্যান, চিত্তের অকর্ম্মণ্যাবস্থা; সংশয় সন্দেহ, উভয় কোটি স্পর্শী জ্ঞান;—উহা এই রূপ, কি এই রূপ? এই উপায়ে সমাধি লাভ করা যাইবে কি না? এই প্রকার আন্দোলনের নাম সংশয়, প্রমাদ অনবধান, সমাধি

লাভের উপায় অনুষ্ঠানে অমনোযোগিতা বা হতশ্রদ্ধ ভাবে উপায়ের অনুষ্ঠান করা। আলস্য,—দেহ বা চিত্তের গুরুত্ব (ভার) নিবন্ধন সমাধি সাধনে অপ্রবৃত্তি। অবিরতি,—অবিশ্রান্ত বিষয় তৃষ্ণা; ভ্রান্তি দর্শন,—মিথ্যাজ্ঞান; যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে সেই রূপ ভাবে জানা—যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা, শুক্তিকে রজত বলিয়া জানা, এবং যে বস্তুর সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই তাহাকে আত্মীয় বলিয়া জানা। অলব্ধ ভূমিকত্ব,—সমাধি ভূমির অপ্রাপ্তি অর্থাৎ চিত্তের যে অবস্থায় সমাধিলাভ হয় সেই অবস্থা পর্য্যন্ত না পৌছান। অনবস্থিতত্ব—সমাধি ভূমি লাভ করিয়াও তাহাতে স্থির হইয়া থাকিতে না পারা। এই নয়টি রজঃও তম গুণ প্রভাবে প্রবৃত্ত হইয়া চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনে বিঘ্ন করে বলিয়া ইহাদিগকে সমাধি লাভের অন্তরায় বলা হয়।

দুঃখ দৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্ব শ্বাস প্রশ্বাসাঃ
বিক্ষেপ সহভুবঃ ॥ ৩১ ॥

পদচ্ছেদঃ। দুঃখ, দৌর্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস, প্রশ্বাসাঃ, বিক্ষেপ-সহভুবঃ।

পদার্থঃ। দুঃখং চিত্তস্য রাগজঃ পরিণামঃ বাধনা লক্ষণঃ, যদ্বাধাৎ প্রাণিন স্তদপঘাতায় প্রবর্ত্তন্তে, দৌর্মনস্যং বাহ্যাভন্তরৈঃ কারণৈ র্মনসোদুস্থতা, অঙ্গমেজয়ত্বং—সর্ব্বাঙ্গানাং বেপথুঃ, আসনস্থৈর্য্যবাধকঃ। প্রাণোয়দ্বাহ্যং বায়ুমাচামতি সঃ শ্বাসঃ। যৎ কৌষ্ঠ্যং বায়ুং নিঃসারয়তি স প্রশ্বাসঃ। ত এতে বিক্ষেপৈঃ সহ ভবন্তীতি বিক্ষেপ সহ ভুবঃ।

অন্বয়ঃ। স্পষ্টম্।

ভাবার্থঃ। পূর্ব্বোক্তৈর্ব্যাধিপ্রভৃতি শ্চিতস্য বিক্ষেপে সতি দুঃখাদীন্যপি সমুদ্ভবন্তীত্যর্থ।

অনুবাদ। দুঃখ, দৌর্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস এবং প্রশ্বাস এই কয়টি চিত্ত বিক্ষেপের সহিত সমুৎপন্ন হয়।

সমালোচন। দুঃখ কি ইহা বোধ হয় সংসারী ব্যক্তিকে বুঝাইবার আবশ্যক নাই, কারণ তাঁহারা প্রতিপদেই উহার অনুভব করিয়া থাকেন; দৌর্মনস্য বলিতে মনের অসুস্থতা, অঙ্গমেজয়ত্ব বলিতে শরীরের কাঁপনি, শ্বাস বাহ্য বায়ুর গ্রহণ, প্রশ্বাস আভ্যন্তরীণ বায়ুর নিঃসারণ। এই কয়টি চিত্তের বিক্ষেপের সহিত উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা যে কেবল

চিত্ত অস্থির হয় মাত্র তাহা নহে, চিত্তের অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখাদিও উৎপন্ন হয়।

তৎ প্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২।

পদচ্ছেদঃ। তৎ-প্রতিষেধ-অর্থং একতত্ত্ব-অভ্যাসঃ।

পদার্থঃ। তেষাং (পূর্ব্বোক্তানাং বিক্ষেপাণাং) প্রতিষেধার্থং নিষেধার্থং একতত্ত্বাভ্যাসঃ একস্মিন্ (যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ) তত্ত্বে অভ্যাসঃ চিত্তস্থ পুনঃ পুনর্নিবেশনম্।

অন্বয়ঃ। ক্রিয়েতেতিশেষঃ।

ভাবার্থঃ। যৎকিঞ্চিদভিমতং বস্তু ধ্যায়ং চিত্তং তান্ বিক্ষেপান্ প্রতিরুন্ধ্যাৎ।

অনুবাদ। চিত্ত কোন এক অভিমত বস্তুর পুন পুন ধ্যান করত ঐ পূর্ব্বোক্ত বিক্ষেপকারীদিগের কার্য্যকারিতা শক্তির বোধ করিবে।

সমালোচন। যোগচার্য্যদিগের মতে চিত্ত একই কিন্তু অনেক বস্তুগামী। চিত্ত অনেক বস্তুগত হয় বলিয়া ইহা চঞ্চল। চিত্তের এই চাঞ্চল্যই আমাদের দুঃখাদির কারণ। সুতরাং অনর্থের মূল চিত্তের এই চাঞ্চল্য দোষকে কোন মতে ঘুচাইতে পারিলে আমরা দুঃখাদির হাত হইতে মুক্ত হইতে পারি। এই সূত্রে সেই চাঞ্চল্য দোষ দূর করিবার উপায়ই বলা হইয়াছে। উহা এক তত্ত্বাভ্যাস—যে কোন একটি তত্ত্বে চিত্তের সংযোগ করিয়া প্রতিনিয়ত অনুশীলন দ্বারা ঐ সংযোগের দৃঢ়তা স্থাপন। ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চিত্তের সম্মুখে যে বস্তু আসিয়া উপস্থিত হয়, চিত্ত সেই বস্তুর আকারে পরিণত হয়। অতএব চিত্তের সহিত কোন এক বস্তুর সংযোগকে দৃঢ় করিয়া রাখিতে পারিলে চিত্ত সেই একই প্রকার আকারে অবস্থান করে। কাযেই উহার চাঞ্চল্য ভাব দূরীভূত হয়, কারণ নানা আকারে পরিণত হওয়াই চিত্তের চাঞ্চল্য। এই চাঞ্চল্য ভাব দূরীভূত হইলে ইহা একাগ্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন আর কিছুতেই বিচলিত হয় না। শরীরের ধর্ম্ম ব্যাধি প্রভৃতি সময়ে সময়ে উৎপন্ন হইলেও তজ্জন্য দুঃখাদির অনুভব না হওয়ায় চিত্ত স্থির অবস্থাতেই অবস্থিত হয়।

এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার "চিত্ত ক্ষণিক এবং অনেক" ইত্যাদি বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া চিত্তের একত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে সে সকল বিচারের বিশেষ উপযোগিতা বোধ করিলাম না বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম।

গঙ্গা।

"মা গো, কি হ'বে আমার।"

গভীর নিশীথকাল স্তব্ধ চারিধার,
জগতের জীব জন্তু স্তব্ধ নিদ্রাকোলে,
সুমৃদু গভীর বাজে 'প্রণব ওঙ্কার,'
বিশাল সংসার ভাসে শান্তির হিল্লোলে।

হেন কালে যুবা এক ভাগীরথী তীরে,
জুড়াইতে সন্তাপিত হৃদয়-অনল,
'আকাশ পাতাল' ভাবে ভাসি আঁখি নীরে,
অনুতাপ তাহে মিশি ঢালে হলাহল।

ভগ্ন-হৃদে অভাগার বৃশ্চিক দংশন,
দীর্ঘ শ্বাস পলে পলে শোষিছে শোণিত,
ক্ষিপ্ত সম শূন্য দৃষ্টি, শূন্য দু'নয়ন,
লক্ষ্য ভ্রষ্ট, দিশে হারা, আপনা বঞ্চিত।

ভূত ভাবী বর্ত্তমান স্মরি' মনে মনে,
ভাবরহ জীবনের ভীষণ বিকার,
সহসা পাষাণ ভেদী করুণ-ক্রন্দনে,
জানাইলা মহামায়ে—"কি হ'বে আমার!"

"মাগো, কি হ'বে আমার!"

মঙ্গলময়ী মা তুমি অতি মূঢ় হীন আমি
পাপ অবতার হেয় খল দুরাচার,
তাই তব হিতবাণী মনে কিছু নাহি মানি,
অসীম পাপ অর্ণবে দিয়েছি সাঁতার।

স্বর্গ সুখ আশে মাতি অসার আমোদে নিতি
দুস্তর নরক-কুণ্ডে দি'ছি অঙ্গ ঢেলে,

অন্তর-যামিনী মাত কিবা তব অবিদিত
কি না জান তুমি—তরে কি ফল লুকা'লে ?

কূল—সীমা বিবর্জ্জিত সুদূর এ মহা স্রোত
কেমনে হ'ব মা পার ব'লে দে উপায়,
দিক্ হারা পথিকের *লক্ষ্য ভ্রষ্ট বিহঙ্গের
নিদারুণ দুঃখ-বাণী না মিলে ভাষায়,
তেমতি এ অভাজন মা গো নিরুপায়।

নিত্য জ্ঞানে অনিত্যেরে করিয়া আশ্রয়,
আমার আমার ব'লে সংসারের গণ্ডগোলে
মত্ত ছিনু দিবা নিশি ঐহিক-চিন্তায়,
বিশাল সংসার মাঝে কেন এনু কির' কাজে,
না ভাবিনু একবার মজিয়ে মায়ায়।

এবে ঘোর তমোজাল ঘিরিয়াছে মহাকাল
বুঝেছি মা এত দিনে তোমারি কৃপায়,
সংসার এ পারাবার কেমনে মা হ'ব পার
বিনে তব কৃপা তরি শ্রীপদ-সহায়,—
তুমি না রক্ষিলে মাগো কে রাখিবে হায় !

ওই শুন ভীমরবে গর্জ্জিছে জলধি,—
চপলা বিকট হাসি' উজলিছে দশদিশি,
মুহুর্মুহু বজ্রনাদে কাঁপিছে হৃদয়,
তরঙ্গ হিল্লোল উঠে সুদূর আকাশে ছোটে
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা একাকার ময়।

কালের করাল-ছায়া —মা, ওই ভীষণ কায়া
ক্রমে আসে আগুসরি গ্রাসিতে আমায়,
'মাভৈ মাভৈ' রবে সান্ত্বনা কর মা সবে
প্রকৃতিরে প্রকৃতিস্থ কর এ সময়।

(নচে) দেহ-তরী ডুবে যায় আয়ু-বায়ু হয় ক্ষয়,
'ভেলায় ভরসা' বল থাকে কতক্ষণ,
কোথা যাব কি করিব (এ) অকূলে কি কূল পা'ব
অনন্ত অপার এ যে দিগ্বিদিক হীন,—
নারকীর পরিণাম। কি ভীষণ দিন!
ইহ পর উভলোক গভীর আঁধার,
তবে কোথা যা'ব, মাগো, কি হ'বে আমার?

সহসা হৃদয়-যন্ত্র হইল নীরব,—
জীবন্ত-উচ্ছ্বাস-গাথা প্রকাশি' অন্তর ব্যথা
উদ্বেলিত হৃদয়ের অধীর আবেগে,
পূত-ভাগীরথী জলে আত্ম বিসর্জ্জন কালে
জাহ্নবী ভক্তের হাত ধরিলেন বেগে।

সহসা উজ্জ্বল-জ্যোতি প্রকাশি' অপূর্ব্ব ভাতি,
উজলিল দশদিশি অপূর্ব্ব শোভায়,
সুগন্ধে পূরিল স্থান মায়ের মধুর তান
সঞ্জীবিল অর্দ্ধমৃত অভাগা যুবায়,—
কবির কল্পনা-ভেলা তাহে ডুবে যায়।

"সম্বরি হৃদয়-ব্যথা দেখ চেয়ে আমি হেথা
সান্ত্বনা করিতে তোরে এসেছি বাছনি,
আর ভয় নাই তোর, করুণা পেলি রে মোর,
ভবার্ণবে কর্ণধার আমি রে শিবাণী।

অনুতাপী যেই জন ডা'কে মোরে অনুক্ষণ
ত্যজি' ভোগবিলাসিতা নশ্বর কামনা,
প্রায়শ্চিত্ত অবসানে কঠোর তপস্যাগুণে
অবশ্যই লভে সেই আমার করুণা।

জ্ঞান-চক্ষু লও এবে তিতিক্ষা বিবেক,—
বিশাল এ কার্য্যক্ষেত্রে যেন নাহি কোন সূত্রে,

স্খলিত-চরণ হও কর্ত্তব্য ভুলিয়ে,
মোহিনী মোহের বশে পৈশাচিক রঙ্গরসে
মজনা মজনা আর আপনা হারায়ে।

স্থির-লক্ষ্যে ধীর মনে আপনার পথপানে
যাও চলি'—অবহেলি' মায়া প্রলোভন,—
বিবেক-কৃপাণে কাটি সংসার-বন্ধন।

সান্ত্বনা অভয়-বাণী দিতেছি তোমায় আমি
যাও বৎস যাও গৃহে নাহি কোন ভয়,
নব-জীবন-প্রভাবে ললিত মধুর রাবে
তোল তান—ভক্তিগান মাতাও সবায়,
অক্ষয়-সুকীর্ত্তি লভ বিশাল-ধরায়।"

বীণা বিনিন্দিত-বাণী কহিতে কহিতে,
জাহ্নবী মিশায়ে গেলা জাহ্নবীজীবনে,
চিত্রাপিত স্থিরনেত্রে সবিস্ময়চিতে—
দাঁড়ায়ে রহিলা যুবা আপনার মনে।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

গঙ্গা স্তব।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

১। গঙ্গে। চলেছ মা কোথায়।
থাক থাক থাক থাক ক্ষণকাল নিবেদিব কিছু তব পায়॥

২। হেরিলে তোমার মুরতি সুন্দর,
নিরমল জল, অতি মনোহর,
পরশিলে পাপী তাপী নারী নর, ব্রহ্ম পদ পায়।

৩। শ্রীশ পাদ রজো বিহারিণী,
সতীশ কামিনী, শৈলেশ নন্দিনী,
সুরেশ বাবণ-প্লাবিনী,
কত দুর্গম নগর তীরে খাড়া হল,
তোমারই প্রতাপে গেল রসাতল,
কার সাধ্য বল, কার এত বল,
রাখে চিহ্ন তব গায়॥

৪। নগেন্দ্র পাদ ধুইয়া ধুইয়া, প্রসন্ন মনেতে চলিছ ধাইয়া,
আপন ভাবে আপনি মাতিয়া, উন্মাদিনী;
দর্পিত ভরে অঙ্গ হেলাইয়া, তবঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া দুলিয়া,
ছুটিছ নাচিয়া, হাসিয়া খেলিয়া,
দৃকপাত নাহি কায়।

৫। কোথায় কংসারি দ্বারকাধিপতি,
কোথা রামচন্দ্র বীর-মহামতি,
কোথা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের সন্ততি, কোথা পৃথুরায়;
জনমিল কত আমীর বাদসাহ,
ভূমে কীর্ত্তি রাখি তেয়াগিল দেহ,
তোমারে শাসিতে নিবারিতে কেহ, নারিল ধরায়॥

৬। হাঙ্গর কুম্ভীর কচ্ছপ মকর,
মৎস্য আদি কত শত জলচর,
আশ্রয় লইয়া তোমার ভিতর, সুখে ভাসি যায়;
কত নদনদী তোমাতে মিশিল,
পরশিয়া অঙ্গ পবিত্র করিল,
আহা কি মধুর বিশুদ্ধ সলিল, তুলনা নাহিক তার।

৭। পতিব্রতা সাধ্বী কতই সুন্দরী,
ভারতের কোটি কোটি নর নারী,
পান করি তব সুবিমল বারি, কত সুখ পায়;
অবগাহন করি তোমার সলিলে,
মাতর্গঙ্গে বলি তোমায় মজিলে,
পতিত পাবনী পাপ নাশিলে, নবীন জীবন পায়॥

৮। সুবোধ সুধীর-পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন,
পুণ্যধারা সবে কর বিতরণ,
রাজায় প্রজায় সম আচরণ, ক্ষীবোদ শুভকারিণী ;
তব তীরে যতি যোগেতে মগন,
সমীরণ করে চামর ব্যজন,
তরঙ্গ কি রব করে অনুক্ষণ, বুঝি হরিগুণ গায়।

৯। বরষায় ধর স্ফীত কলেবর,
ভাবে গদ গদ প্রফুল্ল অন্তর,
শরতের বেলা দেখি ভাবান্তর, শীতে মাগো শীর্ণ কায় ;
গ্রীষ্মে দেখি অস্থি চর্ম্মসার ময়,
কেন মাত ক্রমে হইতেছ ক্ষয়,
প্রবোধ না মানে ব্যাকুল হৃদয়, দুঃখে বুক ফেটে যায়॥

১০। প্রবল ভূজপাতি তোমার উপর,
নিরমিল সেতু এতকাল পর,
বসাইল স্তম্ভ বুকের ভিতর, তাই বুঝি অভিমানে ;
শ্মশান নিবাসী পতির সন্ধানে,
চলিয়াছ দেবি তরঙ্গ তুফানে ;
ভাবত শ্মশান তবে বল কেন, ছাড়িয়া যাইবে হায়॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র মজুমদার।

পশুপতি।

"মৃণালিনীতে" পশুপতির যে জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহা মোটামুটি চারি ভাগে বিভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পশুপতির সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ব পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগে পশুপতির দুরাকাঙ্ক্ষা, সদ্বৃত্তির সহিত সেই দুরাকাঙ্ক্ষার বিরোধ এবং পরিণামে দুরাকাঙ্ক্ষার জয়; তৃতীয় ভাগে সেই দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি জন্য পশুপতির কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ ও কার্য্যের পরিণাম এবং চতুর্থ ভাগে পশুপতির পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রথমভাগ।

পূর্ব্ব পরিচয়।

পশুপতির পূর্ব্ব পরিচয় অতি সংক্ষিপ্ত। গ্রন্থকার ৩।৪ ছত্রে তাহা পাঠক-বর্গকে জ্ঞাত করাইয়াছেন। কিন্তু তবু তাহা জানা আবশ্যক। সেই ৩।৪ ছত্রের মধ্যেই একটি কাব্য-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। পরিচয়টি এইরূপ :—

"পশুপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি কোথা, তাহা কেহ বিশেষ জ্ঞাত ছিল না। কথিত ছিল যে, তাঁহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। পশুপতি কেবল আপন বুদ্ধি বিদ্যার প্রভাবে গৌড় রাজ্যের প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।"

পশুপতির আকৃতি বর্ণনাও এইখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"পশুপতির বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইবে। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ। তাঁহার শরীর দীর্ঘ, বক্ষ বিশাল, সর্ব্বাঙ্গ অস্থি মাংসের সংযোগে সুন্দর। তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চন সন্নিভ; ললাট অতি বিস্তৃত, মানসিক শক্তির মন্দির স্বরূপ। নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত, চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য সম্পন্ন। মুখকান্তি জ্ঞান গাম্ভীর্য্য ব্যঞ্জক এবং অনুদিন বিষয়ানুষ্ঠানজনিত চিন্তার গুণে কিছু পরুষভাব ব্যঞ্জক।"

ইহার পরে পশুপতির বিবাহের কথা যোগ করিলেই পূর্ব্ব পরিচয়টি শেষ হয়। সে কথা স্থানান্তরে বলা হইয়াছে। এ স্থলে এখন ইহাই বলা আবশ্যক যে এই পঞ্চত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত পশুপতি পত্নী-সহবাসে বঞ্চিত।

এইরূপ পূর্ব্ব পরিচয়টি পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারিলাম—পশুপতি প্রথমে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থার লোক ছিলেন। উন্নতির পরে উন্নতিতেই তিনি ধর্ম্মাধিকার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কথাটি পড়িয়াই মনে হইল, গ্রন্থকার অনর্থক এ পরিচয়টি প্রদান করেন নাই। এরূপ পূর্ব্ব পরিচয়ে তাঁহার যথেষ্ট কৌশল প্রকাশিত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা পশুপতির গুণগরিমা পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই স্থির করিয়া, তৎপরবর্ত্তী পশুপতির আকৃতি বর্ণনা পাঠ করিলাম। দেখিলাম সুন্দর একটি রাজনৈতিকের আকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। রাজনৈতিকের কথা মনে হইলেই তৎসঙ্গে আরও দুই একটি কথা মনে হয়। ভরসা করি, ঊনবিংশশতাব্দীর পাঠকবর্গ তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। একে রাজনৈতিক, তাহে চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, মনে মনে পশুপতির সচ্চরিত্রে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। পূর্ব্বের তত্ত্বটিও এই সন্দেহ নিরাকরণ না করিয়া বরং পরিবর্দ্ধিত করিল। আমরা সন্দিগ্ধচিত্তে পশুপতির কার্য্যাবলী পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিতে হইল না। অল্প পরেই সব বুঝিলাম—বুঝিলাম যে, বিশ্বাসঘাতক, শরণাগত অতিথির প্রাণগ্রহণে প্রস্তুত, প্রতিপালক প্রভুর রাজ্যাপহরণাভিলাষী, কূটবুদ্ধি, সুচতুর পশুপতি সম্বন্ধে কথাগুলি বড়ই সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। চারিদিকে দৃষ্টি পড়িল—কত জীবন্ত ঘটনা স্মৃতি পথে উদ্রিক্ত হইল; দেখিলাম, এইরূপ নীচাবস্থা হইতে যাহারা ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া থাকে, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা ফলবতী করিয়া, যাহারা ক্রমে বড় হইয়া উঠে, এরূপ কুমতি তাহাদের পক্ষে হওয়া অসম্ভবপর নহে। অনেক স্থলেই এরূপ ব্যক্তিকে শেষে আশার সর্ব্বশেষ সোপানে অধিরূঢ় দেখিতে পাওয়া যায়—উন্নতিপ্রদাতা প্রভুর সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত দেখা যায়। ইতিহাসও এইরূপ। এইস্থলে মাক্‌বেথ-কাহিনী মনে পড়িল—সেখানেও প্রায় এই কথা। মাক্‌বেথে সেই ডাকিনীগুলার অবতারণে ও ক্রমিক পদোন্নতিতে মাক্‌বেথের দুরাশা পরিবর্দ্ধিত; ঘটনাগুলি কিছু জাঁকাল, এখানে এই তিন চারি ছত্রে পশুপতির দুরাশার ক্রমশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা—কৌশলে ও সংক্ষেপে পরিব্যক্ত। আমাদিগের কবি এতদ্ভিন্ন সেই দুরাশা সঞ্চারের কারণ বর্ণন জন্য কোন ঘটনাও সৃষ্টি করেন নাই, কোন বিশেষ কথাও বলিয়া দেন নাই। ইঙ্গিতে কার্য্য শেষ করিয়াছেন। মাক্‌বেথের সহিত ইহার তুলনা করিতেছি না, কারণ এখানে মাক্‌বেথের কবির যাহা চেষ্টা, আমাদিগের কবির ঠিক সেইরূপ চেষ্টা নহে—আমরা কবির

কৌশল মাত্র প্রদর্শন করিলাম। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল, না জানি এরূপ কত সারগর্ভ সুন্দর কথা আমরা উপেক্ষা করিয়া যাইয়া থাকি। যাঁহারা এত ভাবিয়া লেখেন, তাঁহাদের গ্রন্থ আমরা ভাবিয়া পড়ি না কেন?

পশুপতির বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চত্রিংশ বৎসর। পূর্ণ যৌবন। কিন্তু এই পাঁয়ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত পশুপতি পত্নী সহবাসে বঞ্চিত। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনে এরূপ হয় নাই—বাল্যকালেই পশুপতির বিবাহ হইয়াছিল। ধন মর্য্যাদার অভাবে এরূপ ঘটে নাই, পশুপতি গৌড়ের সর্ব্বপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত। বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত ও পাপ প্রণয়াসক্ত বলিয়া পশুপতি এ কাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই। পশুপতি হিন্দু সন্তান, জাতিতে ব্রাহ্মণ—মনোরমা নাম্নী বিধবা বলিয়া পরিচিতা একটি কামিনী তাঁহার প্রণয়ভাগিনী। কবি এখানেও পশুপতিকে পাপমতিপরায়ণ এবঞ্চ কূটবুদ্ধিপ্ররত করিয়া পাঠকবর্গ সমীপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এখনকার অবশিষ্ট বক্তব্য এই যে, এরূপ লোকের সুপত্নী হইলে (মাক্‌বেথের মত পত্নী নহে) যেটুকু সুফল প্রত্যাশা করা যায়, তাহাও আমরা আশা করিতে পারিলাম না। দুর্ভাগ্যক্রমে পশুপতি সেরূপ সুপত্নী হইতে বঞ্চিত—সুপত্নী থাকিয়াও তাঁহার পক্ষে ছিল না। হায় রে দুরদৃষ্ট!

দ্বিতীয় ভাগ।

দুরাশার সঞ্চার—সদ্বৃত্তির সহিত দুরাশার বিরোধ—
আত্মপ্রতারণা—দুরাশার জয় লাভ।

এই দ্বিতীয় ভাগে পশুপতি একটি ভয়ঙ্করী দুরাশা লইয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই দুরাশার প্রথম সঞ্চারের কথা বা তাহার ক্রমবিকাশের কথা, আমরা গ্রন্থ মধ্যে বড় একটা দেখিতে পাই না। যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। কিন্তু সেটা ইঙ্গিতে সম্ভাবনা ব্যক্তি মাত্র—বিশেষ কোন কথা নহে। আর যাহা কিছু আছে, পরে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইবে।

"যবন সহযোগে বৃদ্ধ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হইব,"—এই আকাঙ্ক্ষা লইয়াই পশুপতি এখন আমাদিগের সমীপে উপস্থিত। মুসলমান চরের সঙ্গে গোপনে কথোপকথন শেষ হইয়া গিয়াছে—ষড়যন্ত্রও একরূপ

সুস্থির হইয়া গিয়াছে। এ তাবৎ পশুপতির হৃদয়ে কোনরূপ সংঘর্ষণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পাইলাম না। কিছু যে পাইলাম না, এমত নহে— মহম্মদ আলীর সহিত কথোপকথনে পশুপতির ইতস্তত ভাবটা সুন্দররূপেই পরিস্ফুট আছে—কিন্তু ইহার পরে যাহা দেখিতে চাহিলাম, তাহা পাইলাম না। মনের কথা গোপন করা রাজনীতিজ্ঞের একটি প্রধান গুণ। তাই কবি প্রথমে এটা খুলিয়া দেখান নাই। কিন্তু ইহার পরে দেখ—পশুপতি মুসলমান চরকে বিদায় দিয়া, স্বীয় স্থাপিত অষ্টভুজা প্রতিমাগ্রে যুক্ত করে স্তুতি করিয়া কহিতেছেন।——

"জননি! বিশ্বপালিনি! আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম—দেখিও মা! উদ্ধার করিও। আমি **জননীস্বরূপা** জন্মভূমি **দেবদ্বেষী** যবনকে বিক্রয় করিব না। কেবলমাত্র এই আমার পাপাভিসন্ধি যে, "**অক্ষম প্রাচীন** রাজার স্থানে আমি রাজা হইব। যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া উভয় কণ্টককে দূরে ফেলিয়া দেয়, তেমনি আমি যবন-সহায়তায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজ্য সহায়তায় যবনকে নিপাত করিব। ইহাতে পাপ কি মা! যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজার সুখানুষ্ঠান করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। জগৎ প্রসবিনি! প্রসন্ন হইয়া আমার কামনা সিদ্ধ কর।"

ইহাই পশুপতির দুরাশার সহিত সদ্বৃত্তির সংগ্রাম। রাজনৈতিক অনেক কথা কহে না—তাই কথাগুলি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু কত অর্থ যুক্ত। কথাগুলি হৃদয়ের দুই দিকই কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। পশুপতির উপযুক্ত কথা বটে।

আমরা যে সকল কথা বৃহদক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছি, তাহা বিশেষ অর্থযুক্ত। সব কিছু ব্যাখ্যা করা যায় না, তবু দুই একটি কথা বলিব।

পশুপতি স্বদেশভক্ত—জন্মভূমি তাঁহার নিকট মাতৃস্বরূপ। পশুপতি দেবভক্ত—স্বয়ং অষ্টভুজার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিত্য তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন। যবনের বিশেষণে তিনি 'দেবদ্বেষী' বিশেষণটিই প্রয়োগ করিতেছেন। এ সকল কথা দুরাশার সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। আবার অনুকূলেও একটা চাপা কথা আছে। রাজা অক্ষম, প্রাচীন। যে রাজ্যরক্ষণে অশক্ত, বিপ্লব সময়ে তাহাকে রাজা রাখা ঠিক স্বদেশভক্তের সঙ্গত কার্য্য নহে। তিনি রাজ্যরক্ষণে পটু, তবে তাঁহার রাজা হওয়াতে দোষ কি? কথাটি বলিয়া পরক্ষণেই আবার পশুপতি

দোষ বুঝিতে পারিলেন। যবনের সাহায্যে রাজ্যলাভ—যবনের অধীনে মাতৃভূমি রাখা! আবার তাহা দূর হইল। যেরূপ কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলে, পশুপতি সেইরূপ যবন সহায়তায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজ্য সহায়তায় যবন দূর করিবেন। ইহাতে পাপ কি? কিন্তু তবু যেন পশুপতির মনে হয়, এতে পাপ আছে। তাই পশুপতি বলিতেছেন, যদি ইহাতে পাপ হয়, সে পাপ তিনি প্রজারঞ্জন করিয়া ক্ষয় করিবেন।

পাঠক এখন দেখ দেখি, এই কয় ছত্রে পশুপতি কত কথা বলিয়াছেন। রাজনৈতিকের উপযুক্ত বাক্য নয় কি? সাবধানতা ও কৌশল দেখ!

আরও একটি কথা। পাঠক, সেক্ষপীয়রের মাক্‌বেথকে দেখিয়াছ, একবার এই হিন্দু পাপীকে দেখ! গোড়াতে মাক্‌বেথকে আমরা ভাল লোকই দেখিয়াছি, কিন্তু কই, তাহার পাপাচরণের সময়ে বা প্রারম্ভে এরূপ ত কিছু শুনিতে পাইলাম না। কারণ পরিষ্কার—মাক্‌বেথ হাজার হউক ম্লেচ্ছ—আর পশুপতি হিন্দু।

হিন্দুপাপী প্রায়ই ধর্ম্মের নিকট একটা জবাব না দিয়া পাপে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। হিন্দুর ডাকাত কালী পূজা না করিয়া ডাকাতি করিতে যায় না। হিন্দুর হিংসুক পরের অবনতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। এত ধর্ম্মভয় ত অন্য জাতিতে দেখিতে পাই না। ইহার কি কোন কারণ নাই? আছে বই কি। হিন্দুর ধর্ম্মচর্চ্চা এক দিন উন্নতির চরমসীমায় উঠিয়াছিল—হিন্দুর ধর্ম্ম এক দিন হিন্দুর রক্তমাংসে জড়িত হইয়াছিল, তাই পড়িতে পড়িতেও হিন্দুর ধর্ম্মভাব রহিয়া গিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্মভাব এখন দূষিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে ভাব এখনও বিদূরিত হয় নাই। এখনও হিন্দু পাপকার্য্য ধর্ম্মের ভাণে করে—এখনও হিন্দু পাপী পাপাচরণেও ভগবানকে ডাকে। এটি ভাল কি মন্দ—কে বলিবে। আর তাহা বলিবার স্থানও স্বতন্ত্র, লোকও স্বতন্ত্র। আমরা এখন এই মাত্র দেখাইব যে, পশুপতির এই ধর্ম্মের ভাণ বা আত্মপ্রতারণের চেষ্টা, বড়ই স্বাভাবিক। স্নেহবশে পশুপতিকে কবি এইরূপ চিন্তাধিকারী করেন নাই—যাহা হইয়া থাকে, বাঙ্গালীর চরিত্রে যেরূপ দেখিয়া থাকি—রোহিণী-রূপ-প্রমত্ত রোহিণীভোগাকাঙ্ক্ষী গোবিন্দলালের অধঃপতনের পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, বিধবা কুন্দনন্দিনী বিবাহেচ্ছু নগেন্দ্রনাথকে বিবাহের পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছি, এও সেইরূপই দেখিলাম। "পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া, পুণ্যাত্মাও এইরূপ করে।" এইরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি,

ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুমতি কুমতি, সংগ্রামে অনেক স্থলে প্রকৃতি সুমতিও জয়লাভ করে না, প্রকৃত কুমতিও জয়লাভ করে না,—জয়লাভ করে সুমতিরূপা কুমতি।

"যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজার সুখানুষ্ঠান করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" এ কথাটীও হিন্দুপাপীর কথা। শত সহস্র হিন্দু পাপী আজ এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া পাপাচরণ করিতে যাইতেছে। শিক্ষিতের প্রবোধ একরূপ, অশিক্ষিতের অন্যরূপ। অশিক্ষিত "গঙ্গাস্নানে পাপ যাইবে" স্থির করিয়া পাপাচরণ করে, শিক্ষিত ঐরূপ আর কোন একটা সুযুক্তি অবলম্বন করিয়া পাপানুষ্ঠানে রত হয়। হায়, কে কবে এই ভ্রান্তির রহস্য সমুদ্‌ঘাটিত করিবে? চুরি করিয়া টাকা আনিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে কি অপহরণ দোষ লুপ্ত হয়? পশুপতি এইটি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বুদ্ধিমান, কিন্তু এখানে বড়ই ভুল বুঝিলেন।

এখন সব জড়াইয়া একবার ভাবিয়া দেখদেখি, দুরাশা প্রেতিনী গর্ব্বিত স্বরে ঐখানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে কিনা—

"সুন্দরকে মন্দ ভাবি, মন্দকে সুন্দর
বদ্ হাওয়া কুয়া দিয়া ফিরি নিরন্তর।"

মহম্মদ আলীর নিকটে যখন পশুপতি ঐরূপ ষড়যন্ত্রের কারণ ব্যাখ্যা করিলেন, তখন দেখিলাম, পশুপতি সমাজকেও বিলক্ষণ ভয় করিয়া চলেন। যেমন ধর্ম্মের জন্য একটা ব্যবস্থা করিতে হইল, সমাজের জন্যও তাঁহাকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইল।

তৃতীয় ভাগ।

সঙ্কল্পস্থির—কার্য্যারম্ভ—নূতন প্রতিবন্ধক (মনোরমা)—প্রতিবন্ধক তিরোহিত—কার্য্যের পরিণাম (অতঃপতন)।

পাপে পাপ বৃদ্ধি করে। একটী মিথ্যা কথায় দশটি মিথ্যা কথা কহায়। আমাদিগের কবি অক্ষয় লিখিয়া গিয়াছেন—যেরূপ জড়জগতে, মাধ্যাকর্ষণে প্রতি পদে পতনশীলের গতিবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ অন্তর্জগতে পাপাকর্ষণে প্রতি পাপে পাপীর পাপকামনা পরিবর্দ্ধিত হয়। সঙ্কল্প সম্যক্ সুস্থির হইতে না হইতেই পশুপতি শরণাগত, উপচিকীর্ষু, অতিথি রাজকুমার, হেমচন্দ্রকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য স্বীয় অনুচর শান্তশীলকে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন।

সঙ্কল্প সুস্থির হইলে, আবার এক নূতন প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রতিবন্ধক—মনোরমা।

আমরা এই স্থলে পশুপতি-মনোরমা সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা বলিয়া লইব।

পশুপতি-মনোরমা সম্বাদ কবির আশ্চর্য্য কাব্যচাতুর্য্য প্রকাশিত করিতেছে। মনোরমা ফুটিয়াছে পশুপতির জন্য, আবার পশুপতিও খানিকটা ফুটিয়াছে মনোরমার জন্য। পশুপতি-মনোরমা উভয়ই ফুটিয়াছে, মনোরমার পূর্ব্বপরিচয় জন্য। পশুপতি-মনোরমার সেইরূপ বিবাহের পরিণাম, মনোরমার বিধবাবেশে অবস্থিতি, ও বিধবাভাবে তৎপ্রতি পশুপতির আসক্তি ইহাতেই সব ফুটিয়াছে। পশুপতির দুরদৃষ্ট, তাই পত্নী প্রতি তাঁহার আসক্তিতেও পাপ ফল প্রসব করিল। পাপটা মনে কি না—তাই।

মনোরমার প্রতি পশুপতির অনুরাগ কিরূপ প্রবল, কবি তাহা স্বয়ং না বলিয়া একটী কৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন। যখন সব স্থির হইয়াছে, যখন পশুপতি ইষ্টদেবীকেও সান্ত্বনা করিয়াছেন ভাবিয়া মনের সঙ্কল্প সুদৃঢ় করিয়াছেন, তখন পশুপতি শয্যাগৃহদ্বারে দেখিলেন—"অপূর্ব্বদর্শন—সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যাপিত করিয়া, জীবনময়ী প্রতিমারূপিণী তরুণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পশুপতি প্রথমে চমকিত হইলেন—শিহরিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রবারিবৎ আনন্দে স্ফীত হইলেন।"

রমণী—ধন্য তোমাদের মহিমা। পশুপতির কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনই সাধিলে! একেবারে তাহাকে নরক হইতে স্বর্গে তুলিলে? কোথায় প্রভু প্রতিপালক বৃদ্ধ রাজাকে রাজ্যচ্যুতের, শরণাগত অতিথির হত্যার, মন্ত্রণা—আর কোথায় এ অপূর্ব্ব প্রেমোচ্ছ্বাস। মাত্রায় দুইই সমান—একটি সুকঠিন কঠোরতা—অন্যটি সুকোমল কোমলতা। পরিবর্ত্তনকারিণী একটি রমণীমূর্ত্তি। রমণীগণ এ সংসারে যথার্থই দেবী।

এই উচ্ছ্বাসের সময় পশুপতির সহিত মনোরমার যেরূপ কথোপকথন হইল, তাহা সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। এখানে আমরা অন্য একটি কথা পাড়িব।

মনোরমা পশুপতিকে কহিতেছেন—"তুমি আমায় ত্যাগ করিবে?"

"পশুপতি। কেন মনোরমে? তোমার জন্যই আমি এ মন্ত্রণা করিয়াছি। আমি এক্ষণে রাজভৃত্য ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি না। আমি বিধবা বিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব, কিন্তু যখন আমি স্বয়ং

রাজা হইব, তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে? যেমন বল্লাল সেন কৌলিন্যের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব।

এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলে, আমরা দেখিতে পাই একমাত্র মনোরমা-প্রাপ্তিই পশুপতির রাজ্যাকাঙ্ক্ষার কারণ। কারণটি সাধারণ নহে, স্বীকার করিতে হইবে। এ জগতে রমণীপ্রণয় না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই। লোককে স্বর্গেও তুলিতে পারে, নরকেও ডুবাইতে পারে। পশুপতির এই কথাটি দ্বারা যেমন এক দিকে তাহার প্রণয়-বলটি সূচিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমন প্রণয়ের স্বকীয় মাহাত্ম্যও প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। মনোরমা-প্রাপ্তি-আশা যে রাজ্যাকাঙ্ক্ষার একমাত্র কারণ, তাহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। পশুপতি যখন স্বীয় ইষ্টদেবীর নিকটে মনোবাসনা ব্যক্ত করিতেছেন, তখন এ কথা প্রকাশিত নাই কেন? তোমরা বলিবে—মনোরমার জন্যই ত রাজ্যা-কাঙ্ক্ষা—সেই রাজ্যাকাঙ্ক্ষার জন্য যখন পশুপতি ঐরূপ বলিয়াছেন, তখন আবার পৃথক করিয়া সে রাজ্যাকাঙ্ক্ষার কারণ না বলিলেও ত চলিতে পারে। তাহা পারে না। মনোরমার জন্য রাজ্যাকাঙ্ক্ষা হইলে, সে কথাটা তখন একবারও মুখে না আনা সম্ভবপর নহে। ফলকথা—রাজ্যাকাঙ্ক্ষা, রাজ্য ও মনোরমা উভয়েরই জন্য। দুইই একত্র মনে উদিত হয়, তাই পশুপতি দুইটিকে সম্যক্ মিশাইয়া এক স্থলে রাজ্য ও এক স্থলে মনোরমাকে প্রাধান্য দিতেছেন। প্রণয়পাত্রের নিকট অজ্ঞাত কপটতা জগৎপ্রসিদ্ধ। এই দুই ভাব যে পর্য্যন্ত মিশিয়া রহিল, সে পর্য্যন্ত ইহার কোন্‌টি প্রধান বুঝা গেল না। কিন্তু কবি ছাড়িবার পাত্র নহেন—কথাটি আরও খুলিলেন। যখন মনোরমা পশুপতিকে প্রারব্ধ কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল, অনেক প্রকারে বুঝাইয়া বলিল "পশুপতি-আমি মিনতি করিতেছি, এই দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ কর"—কবি কহিতেছেন—

"পশুপতি পূর্ব্ববৎ অধোবদনে রহিলেন, তাঁহার রাজ্যাকাঙ্ক্ষা এবং মনো-রমাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা উভয়ই গুরুতর। কিন্তু রাজ্যলাভের যত্ন করিলে, মনোরমার প্রণয় হারাইতে হয়, সেও অত্যাজ্য। উভয় সঙ্কটে তাঁহার চিত্তমধ্যে গুরুতর চাঞ্চল্য জন্মিল। তাঁহার মতির স্থিরতা দূর হইতে লাগিল। 'যদি মনোরমাকে পাই, ভিক্ষাও ভাল, রাজ্যে কাজ কি?' এই রূপ পুনঃ পুনঃ মনে ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু তখনই আবার ভাবিতে

লাগিলেন, 'কিন্তু তাহা হইলে লোকনিন্দা জনসমাজে কলঙ্ক, জাতিনাশ হইবে, সকলের ঘৃণিত হইব। তাহা কি প্রকারে সহিব?' পশুপতি নীরবে রহিলেন; কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।"

কবি দেখাইলেন যে, দুইটির কোনটিই কম নহে। পশুপতি একবার ভাবিতেছেন মনোরমা, আর একবার ভাবিতেছেন. স্বীয় মানসম্ভ্রম। পশু-পতির ন্যায় লোকের উভয়ই অত্যাজ্য।

এইখানে আর একটি অতি সুন্দর কাব্যকৌশল প্রকাশিত হইল। কবি দায়ে পড়িয়াছিলেন—কৌশলে মুক্ত হইলেন। কথাটি এই—

পশুপতি কিরূপ লোক ও তাঁহার পরিণাম কি হইবে, তাহা পাঠকবর্গ একপ্রকার বুঝিয়াছেন। এই পশুপতির প্রণয়বল দেখাইতে হইবে। সে প্রণয় মনোরমার প্রতি। প্রণয়বল দেখাইতে হইবে হৃদয়ের প্রণয় ভিন্ন অন্য যে তুঙ্গবল থাকে, তাহার বিরোধে।—কবি তাহাই করিলেন। রাজ্যা-কাঙ্ক্ষার সহিত মনোরমার বিরোধ ঘটাইলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে বড়ই দায়ে পড়িতে হইল, পশুপতি রাজ্যাকাঙ্ক্ষাও ছাড়িতে পারে না—তাহা হইলে পশুপতি চরিত্রের উদ্দেশ্যই বিনষ্ট হয়; (সে উদ্দেশ্যের কথা আমরা উপসংহারে বলিব) আবার মনোরমাও ইহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না—তাহা হইলে কবির সাধের মনোরমা বিকৃত হইয়া দাঁড়ায়। আবার পশুপতির প্রণয়বলটিও পরিষ্কার দেখান চাই। এখন উপায় কি?

অন্য কবি হইলে, এইখানেই গ্রন্থ মাটি করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু এইখানে আমাদিগের কবি যে রূপে বিপদোত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়।

কবি কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন—গ্রন্থ হইতে সেই অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"মনোরমা উত্তর না পাইয়া কহিতে লাগিলেন, 'শুন পশুপতি, তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না। আমি চলিলাম। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহজন্মে সাক্ষাৎ হইবে না।'

"এই বলিয়া মনোরমা পশ্চাৎ ফিরিলেন; পশুপতি রোদন করিয়া উঠিলেন। অমনি মনোরমা আবার ফিরিলেন। আসিয়া, পশুপতির হস্তধারণ করিলেন। পশুপতি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, রোষ-গর্ব্ব-বিশিষ্টা, কুঞ্চিত-ভ্রূ-বীচি-বিক্ষেপ-কারিণী সরস্বতী মূর্ত্তি আর নাই;

কুসুমকুমারী বালিকা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে রোদন করিতেছে।”

“মনোরমা কহিলেন ‘পশুপতি কাঁদিতেছ কেন ?’ পশুপতি চক্ষের জল মুছিয়া কহিলেন, ‘তোমার কথায়।’”

“ম। কেন? আমি কি বলিয়াছি ?

প। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে।

ম। আর আমি এমন করিব না।

প। তুমি আমার রাজমহিষী হইবে ?

ম। হইব।

“পশুপতির আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল।”

আহা মরি মরি, কি অপূর্ব্ব কবিত্ব রে—কি চমৎকার কৌশল রে !

এ কৌশলে হিন্দুরমণী মনোরমা খুলিল—পশুপতি খুলিল—গ্রন্থকারের কার্য্য শেষ হইল। প্রথমটির কথা আমরা মনোরমা-ব্যাখ্যা স্থলে বলিব। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। পশুপতিকে রাজ্য ছাড়িতে হইল না—মনোরমাও ছাড়িতে হইল না। আর—আর—গ্রন্থকার এই প্রকারে পশুপতির সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন। ফোঁটা কয়েক চক্ষের জলেই না এতটা কাণ্ড করিল। বলিহারি যাই বঙ্কিম—সাধে কি তোমাকে এত পূজা করি!—আমাদের নিকটে যে তুমি পৃথিবীস্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখের উপাদান। ম্লেচ্ছ কবি আমরা বুঝি না।

এই চক্ষের জলে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইল। কারণ যে ব্যক্তি দেশ রাখিলেও রাখিতে পারিত, সে এতদ্দ্বারা সম্যক্ বিনষ্ট হইল। পশুপতিকে যে রাখিলেও রাখিতে পারিত, সেই মনোরমা আজ চক্ষের জলে মোহিতা হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল। ঈশ্বরের ইচ্ছা এইরূপেই সম্পূর্ণ হইয়া থাকে—কিন্তু সে কথা আমাদিগের বক্তব্য নহে।

মনোরমার প্রতি পশুপতির অনুরাগ সম্বন্ধে অবশিষ্ট কথা অন্যত্র বলিব। এ স্থানে আরও একটি কথা বলিতে হইবে সেটি এই—পশুপতির এই প্রণয়, পাপজ।

পাপ-প্রণয়ে সুফল ফলিতে পারে না, তাই অমন মনোরমার স্বামী এক প্রকার মনোরমার জন্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইল। পশুপতি জানেন, মনোরমা বিধবা—পশুপতি হিন্দুসন্তান, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু পূর্ব্বে জাত। বিধবা-

বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত, মনোরমাকে ভালবাসিবার পূর্ব্বে এ কথা তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন না। মনোরমাকে ভালবাসিয়াই তাঁহার এই ধারণা হইল। নগেন্দ্রনাথেরও এইরূপ এক দিন ধারণা হইয়াছিল। এখানেও পাপে আত্ম-বুদ্ধি প্রদান করিয়া পশুপতিকে পাপাচরণে প্রবৃত্ত করাইল। অহো—পাপীর আত্মপ্রতারণা কি ভয়ানক ব্যাপার!

এইরূপে ঘাতপ্রতিঘাতের অবস্থা দূর হইয়া পশুপতির সঙ্কল্প সুস্থির হইল। পশুপতি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। অতঃপর যাহা যাহা ঘটিল, তদ্বর্ণনে আবশ্যক নাই। পশুপতি ঊর্ণনাভের মত জাল পাতিয়াছিলেন, জাল ছিঁড়িয়া গেল। বিশ্বাসঘাতক পশুপতি বিশ্বাসঘাতকের হস্তে পাপের ফলভোগ করিলেন। বড়ই সুন্দর রহস্যের কথা! পশুপতি নিজে বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিতে গিয়া রাজ্যলোভী বিধর্ম্মী মুসলমানকে বিশ্বাস করিলেন! বুদ্ধিমান পশুপতি পাপাতিশয্যে নির্ব্বুদ্ধিতার একশেষ দৃষ্টান্ত প্রদান করিলেন! এইটিও বিধাতার নিয়ম। চোরের ধন বাটপাড়ে লয়।

চতুর্থ ভাগ।

পশুপতি ও মনোরমার শেষ কথা—পশুপতির চৈতন্য লাভ —পশুপতির শাস্তি ও পরিণাম।

সে দিনকার মনোরমা-সম্বন্ধীয় ঘটনার পরে পশুপতি নির্ব্বিরোধে স্বীয় কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছিলেন। এ সকল কথা আমাদিগের পূর্ব্ব ভাগেরই বর্ণিতব্য বিষয়—কিন্তু মনোরমা সম্বন্ধীয় যে কয়টি কথা অবশিষ্ট ছিল, তাই বলিবার জন্য দুই একটী পূর্ব্বের কথাও বলিতে হইবে। শান্তশীল পশুপতির মন্ত্রণা অনুসারে রাজাকে কৌশলে পলায়নপর করিয়া পশুপতিকে সংবাদ দিয়াছেন। পশুপতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। তখন মনোরমা-চিন্তা পশুপতির প্রবল হইয়া উঠিল। ঘটনাধীন মনোরমাও তখন পশুপতির গৃহে উপস্থিত। পশুপতির আনন্দ হৃদয়ে ধরে না। কিন্তু এখনও মনোরমা-প্রাপ্তি-পক্ষে দুই একটি অন্তরায় রহিয়া গিয়াছে। মনোরমা বিধবা—সে পশুপতিকে বিবাহ করিতে চাহিবে কেন? এই অন্ত-

রায়টি তিরোহিত করিবার জন্য পশুপতি মনোরমাকে বিবিধ প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। মনোরমা সে কথায় বড় একটা কর্ণপাত করিলেন না—তিনি তখন অন্য মনে মালা গাঁথিতেছিলেন, সম্মুখে একটা কৃষ্ণবর্ণ মার্জ্জার ছিল, মালা গাঁথিয়া তাহাকে পরাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। "পশুপতি অধিকতর বিরক্ত হইয়া বিড়ালকে এক চপেটাঘাত করিলেন—বিড়াল ঊর্দ্ধ লাঙ্গুল হইয়া দূরে পলায়ন করিল। মনোরমা সেইরূপ দংশিতাধরে হাসিতে হাসিতে করস্থ মালা পশুপতিরই মস্তকে পরাইয়া দিল। মার্জ্জার-প্রসাদ মস্তকে পাইয়া রাজপ্রসাদভোগী ধর্ম্মাধিকার হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। অল্প ক্রোধ হইল—কিন্তু দংশিতাধর হাস্যময়ীর তৎকালের অনুপম রূপমাধুরী দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি মনোরমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন—অমনি মনোরমা লম্ফ দিয়া দূরে দাঁড়াইল—পথিমধ্যে উন্নতফণা কালসর্প দেখিয়া পথিক যেমন দূরে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াইল। পশুপতি অপ্রতিভ হইলেন, ক্ষণেক মনোরমার মুখের প্রতি চাহিতে পারিলেন না—পরে চাহিয়া দেখিলেন—মনোরমা প্রৌঢ় বয়সী মহিমাময়ী সুন্দরী। পশুপতি কহিলেন 'মনোরমে, দোষ ভাবিও না। তুমি আমার পত্নী—আমাকে বিবাহ কর'।" সময় উপস্থিত হইল। গুপ্ত কথা সকল প্রকাশিত হইয়া পড়িল। পশুপতি জানিতে পারিলেন যে, মনোরমা বাস্তবিকই তাঁহার পত্নী। পশুপতি বিস্ময়ে ও আনন্দে চিত্ত হারাইলেন। একটু অনুতাপেরও কথা ছিল—কিন্তু আনন্দের বেগে তাহা তখন মনে আসিতে পারিল না। মনোরমা এখন আবার পশুপতিকে পূর্ব্ব সঙ্কল্প ছাড়িতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। উত্তরে পশুপতি কহিলেন—

'——মনোরমে, আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ হইতে ফিরিবার উপায় থাকিলে আমি ফিরিতাম—তোমাকে লইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া কাশী যাত্রা করিতাম। কিন্তু অনেক দূর গিয়াছি। আর ফিরিবার উপায় নাই—যে গ্রন্থি বাঁধিয়াছি, তাহা আর খুলিতে পারি না—স্রোতে ভেলা ভাসাইয়া আর ফিরাইতে পারি না। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে।——'

সত্যই কি তাই? কতকাংশে সত্য বটে। তখন প্রায় সব স্থির হইয়া গিয়াছিল। তখন পশুপতি ফিরিতে পারিলেও রাজ্য রক্ষা করিতে পারিতেন না।

আরও এক কথা। তখন আর পশুপতি ফিরিলেন কেন। মনোরমা

যদি তাঁহাব পবিণীতা পত্নীই হইল, তবে ত কোন গোলই রহিল না, রাজ্য-লাভের সঙ্গে তাহার ত বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ কথা বরং পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, রাজ্যাকাঙ্ক্ষাটা অত প্রবল না হইলেও হইতে পাবিত; কিন্তু এখন যে এ রহস্যভেদে পশুপতির মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পাবে না। হিন্দুপত্নী আবার স্বামীকে ত্যাগ কবিবে কিরূপে?

এইরূপে আমরা দেখিতে পাইলাম, পশুপতিব সব দিকেই হিতে বিপ-রীত হইতে লাগিল। দুর্জ্জনের, হয়ই এইরূপ।

অভিলষিত পাপপথে অলঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে, পাপীব প্রায়ই চৈতন্যলাভ হইয়া থাকে। পশুপতিবও তাহাই হইল। মুসলমানদিগেব ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া যখন পশুপতি দেখিলেন, তাঁহার সব ফুরাইযাছে, তখন পশুপতিব চৈতন্য হইল। এ চৈতন্যের সঞ্চাব হয়, শাস্তিভোগের জন্য।

এই চৈতন্য সঞ্চাবেব পরেই পশুপতিব শাস্তি আবম্ভ। আমরা গ্রন্থ হইতে সেই স্থানটী সবিস্তাবে পাঠকবর্গকে উদ্ধৃত কবিয়া দিতেছি।

"মহম্মদআলির নিকট বিদায় হইয়া, রাজপথ অতিবাহিত করিয়া পশু-পতি ধীরে ধীরে চলিলেন। ধীরে ধীবে চলিলেন—যবনের কাবাগাব হইতে বিমুক্ত হইয়াও দ্রুতপদক্ষেপণে তাঁহাব প্রবৃত্তি জন্মিল না। বাজপথে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আপনার মনোমধ্যে আপনি মরিলেন। তাঁহাব প্রতিপদে মৃতনাগবিকের দেহ চরণে বাজিতে লাগিল; প্রতিপদে শোণিত সিক্ত কর্দ্দমে চবণ আর্দ্র হইতে লাগিল। পথেব দুই পার্শ্বে গৃহাবলী জন-শূন্য,—বহু গৃহ ভস্মীভূত, কোথাও বা তপ্ত অঙ্গাব এখনও জ্বলিতেছিল। গৃহান্তবে দ্বার ভগ্ন—গবাক্ষ ভগ্ন—প্রকোষ্ঠ ভগ্ন—তদুপবি মৃত দেহ! এখ-নও কোন হতভাগ্য মবণযন্ত্রণায় অমানুষিক কাতবস্ববে শব্দ কবিতে-ছিল। এ সকলের মূলই তিনি। দারুণ লোভের বশবর্ত্তী হইযা তিনি এই বাজধানীকে শ্মশানভূমি কবিয়াছেন। পশুপতি মনে মনে স্বীকার করি-লেন যে, তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্যপাত্র বটে,—কেন মহম্মদআলিকে কল-ঙ্কিত করিয়া কাবাগাব হইতে পলায়ন করিলেন? যবন তাঁহাকে ধৃত করুক,—অভিপ্রেত শাস্তি প্রদান করুক,—মনে করিলেন, ফিরিয়া যাইবেন। মনে মনে তখন ইষ্ট দেবীকে স্মবণ করিলেন—কিন্তু কি কামনা করিলেন? কামনার বিষয় আর কিছুই নাই। আকাশ প্রতি চাহিলেন। গগনেব নক্ষত্র-চন্দ্র-গ্রহ-মণ্ডলী-বিভূষিত সহাস্য পবিত্র শোভা তাঁহার চক্ষে সহিল না—

তীব্র জ্যোতিঃসম্পীড়িতের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সহসা অনৈসর্গিক ভয় আসিয়া তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল—অকারণ ভয়ে তিনি আর পদ-ক্ষেপ করিতে পারিলেন না। সহসা বলহীন হইলেন। বিশ্রাম করিবার জন্য পথিমধ্যে উপবেশন করিতে গিয়া দেখিলেন,—এক শবাসনে উপ-বেশন করিতেছিলেন। শবনিঃসৃত রক্ত তাঁহার বসনে এবং অঙ্গে লাগিল। তিনি কণ্টকিত কলেবরে পুনরুত্থান করিলেন। আর দাঁড়াইলেন না। দ্রুতপদে চলিলেন। সহসা আর এক কথা মনে পড়িল—তাঁহার নিজ বাটী? তাহা কি যবন হস্তে রক্ষা পাইয়াছে? আর সে বাটীতে যে কুসুম-ময়ী প্রাণপুত্তলীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার কি হইয়াছে? মনো-রমার কি দশা হইয়াছে? তাঁহার প্রাণাধিকা, তাঁহাকে পাপপথ হইতে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিয়াছিল, সেও বুঝি তাঁহার পাপসাগরের তরঙ্গে ডুবিয়াছে। এ যবনসেনাপ্রবাহে সে কুসুমকলিকা না জানি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় আপন ভবনাভিমুখে ছুটিলেন। আপনার ভবনসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যাহা ভাবিয়া ছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে,—জলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার উচ্চচূড় অট্টালিকা অগ্নি-ময় হইয়া জ্বলিতেছে। দৃষ্টিমাত্র হতভাগ্য পশুপতির প্রতীতি হইল, যবনেরা তাঁহার পৌরজনসহ মনোরমাকে বদ্ধ করিয়া গৃহে অগ্নি দিয়া গিয়াছে। মনোরমা যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। নিকটে কেহই ছিল না যে, তাঁহাকে এ সম্বাদ প্রদান করে। আপন বিকলচিত্তের সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করিলেন। হলাহল কলস পরিপূর্ণ হইল,—হৃদয়ের শেষ তন্ত্রী ছিঁড়িল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বিস্ফারিত-নয়নে দহ্য-মান অট্টালিকা প্রতি চাহিয়া রহিলেন,—মরণোন্মুখ পতঙ্গোবৎ অল্পক্ষণ বিচল শরীরে এক স্থানে অবস্থিতি করিলেন,—শেষে মহাবেগে সেই অনল-তরঙ্গ মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। সঙ্গের প্রহরী চমকিত হইয়া রহিল।

"মহাবেগে পশুপতি জ্বলন্ত দ্বারপথে পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চরণ দগ্ধ হইল,—অঙ্গ দগ্ধ হইল,—কিন্তু পশুপতি ফিরিলেন না। অগ্নিকুণ্ড অতি-ক্রম করিয়া আপন শয়নকক্ষে গমন করিলেন—কাহাকেও দেখিলেন না। দগ্ধ শরীরে কক্ষে কক্ষে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর মধ্যে দুরন্ত অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাহাতে তিনি বাহ্যিক দাহযন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারিলেন না। ক্ষণে ক্ষণে গৃহের নূতন নূতন খণ্ড সকল অগ্নিকর্ত্তৃক

আক্রান্ত হইতেছিল। আক্রান্ত প্রকোষ্ঠ বিষম শিখা আকাশপথে উত্থিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে দগ্ধ গৃহাংশ সকল অশনি-সম্পাত শব্দে ভূতলে পড়িয়া যাইতেছিল। ধূম, ধূলি, তৎসঙ্গে লক্ষ লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গে আকাশ অদৃশ্য হইতে লাগিল। দাবানল-সম্বোষ্টিত আরণ্য গজের ন্যায় পশুপতি অগ্নিমধ্যে ইতস্তত দাস দাসী স্বজন ও মনোরমার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কাহারও কোন চিহ্ন পাইলেন না।—হতাশ হইলেন। তখন দেবীর মন্দির প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হইল। দেখিলেন, দেবী অষ্টভুজার মন্দির অগ্নিকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জ্বলিতেছে। পশুপ ত পতঙ্গবৎ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, অনলমণ্ডলমধ্যে দগ্ধ স্বর্ণপ্রতিমা বিরাজ করিতেছে। পশুপতি উন্মত্তের ন্যায় কহিলেন,—

"মা জগদম্বে! আর তোমাকে জগদম্বা বলিব না। আর তোমায় পূজা করিব না। তোমাকে প্রণামও করিব না। আশৈশব আমি কায়-মনোবাক্যে তোমার সেবা করিলাম—ঐ পদধ্যান ইহজন্মে সার করিয়া-ছিলাম—এখন মা এক দিনের পাপে সর্ব্বস্ব হারাইলাম। তবে কি জন্য তোমার পূজা করিয়াছিলাম? কেনই বা তুমি আমার পাপমতি অপনীত না করিলে?'

'মন্দিরদহন অগ্নি অধিকতর প্রবল হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। পশুপতি তথাপি প্রতিমা সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

'ঐ দেখ! ধাতুমূর্ত্তি!—তুমি ধাতুমূর্ত্তি মাত্র। দেবী নহ—ঐ দেখ অগ্নি গর্জ্জিতেছে। যে পথে আমার প্রাণাধিকা গিয়াছে—সেই পথে তোমা-কেও প্রেরণ করিব। কিন্তু আমি অগ্নিকে এ কীর্ত্তি রাখিতে দিব না—আমি তোমাকে স্থাপনা করিয়াছিলাম—আমিই তোমাকে বিসর্জ্জন করিব। চল। ইষ্টদেবি! তোমাকে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করিব।'

"এই বলিয়া পশুপতি প্রতিমা উত্তোলনের আকাঙ্ক্ষায় উভয় হস্তে যেমন তাহা ধারণ করিলেন, অমনি সেই সময়ে আবার অগ্নি গর্জ্জিয়া উঠিল। তখনই পর্ব্বত বিদারানুরূপ প্রবল শব্দ হইল,—দগ্ধ মন্দির আকাশ-পথে ধূলি-ধূম-ভস্ম সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ রাশি রাশি প্রেরণ করিয়া, চূর্ণ হইয়া পরিয়া গেল। তন্মধ্যে প্রতিমা সহিত পশুপতির সজীবনে সমাধি হইল।"

পাঠক, তুমি কখন অর্থলোভে নরবলিপ্রদায়ী তান্ত্রিকের নিকট সন্তান-বিক্রয়কারীর শেষাবস্থা নিরীক্ষণ করিয়াছ—সেই ছিন্নমুণ্ড প্রিয়তম তনয়-

সমীপে পিতার সেই গভীর শোকোচ্ছ্বাস পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছ, তাহা হইলে তুমি পশুপতির এই গভীর শোক-মর্ম্ম অনুভব করিতে পারিবে। পশুপতি হাতে করিয়া যে বঙ্গদেশকে এত দিন প্রতিপালন করিয়াছেন, সেই সন্তানতুল্য বঙ্গদেশের মৃত শরীর তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। এ অবস্থার কারণও আবার তিনি—এ কি সহজ কষ্ট! যেমন পাপ, তেমনই শাস্তি। কবির এই শাস্তি-প্রকরণে বিশেষ দক্ষতা পরিদৃষ্ট হয়! শৈবলিনীর শাস্তিতেও এই রূপ দেখিয়াছি। এতদপেক্ষা যদি পশুপতির শরীর খানি চিরিয়া চিরিয়া তত্তৎ প্রদেশে লবণ মাখাইয়া মৃত্তিকা প্রোথিত করিয়া কুক্কুর-ভুক্ত করান হইত, তাহা হইলেও তাহার এত কষ্ট হইত না। এ শাস্তি-বর্ণনার—আর কি ব্যাখ্যা করিব?

পশুপতির হৃদয়ে যখন এইরূপ প্রলয়াগ্নি সমুদ্দীপিত হইতেছিল; ভীষণ গর্জ্জনে পশুপতির হৃদয়, মর্ম্ম, অন্তঃস্থল সব একে একে ভস্মীভূত করিতেছিল, তখন প্রকৃতিপ্রিয় কবি পশুপতির অট্টালিকায় আর এক প্রকারের অগ্নি পাঠকবর্গকে দেখাইয়া দিলেন। কি সুন্দর সুর মিলিল—ঐ পশুপতি, আর ঐ তাহার হৃদয়াগ্নি—ঐ অট্টালিকা—আর তাঁহার অভ্যন্তরস্থ আগুন—কেমন এক সুরে গাঁথা। দুইই ভীষণ—দুইই তিল তিল করিয়া পশুপতিকে পোড়াইতে লাগিল। তোমরা এক আগুনে মানুষ পোড়াইতে পার, কবি একদেহ-বিশিষ্ট পশুপতিকে একবারে দুই আগুনে পোড়াইতেছেন। এদিকে পুড়িতেছে পশুপতির হৃদয়—ওদিকে পুড়িতেছে কি শুধু অট্টালিকা? তাহা নয়, ওদিকেও পুড়িতেছে পশুপতির আর একটি হৃদয়! পশুপতি জানিতেন, মনোরমা ঐ অট্টালিকা মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। আহা মরি মরি কি সুন্দর কবিত্ব রে! জ্বালাও কবিবর, এই আগুনে স্বদেশদ্রোহী পাপিষ্ঠ কুসন্তানদিগকে এইরূপে জ্বালাও।—জ্বালাও কবিবর, যাহারা লোভী, দুরাশাপরায়ণ, বিশ্বাসঘাতক, তাহাদিগকে এইরূপে জ্বালাও।—জ্বালাও কবিবর, যাহারা প্রভুহন্তা, শরণাগত অতিথির প্রাণবধে উদ্যত, তাহাদিগকে এইরূপে জ্বালাও।—জ্বালাও! ইহাতে কতক লোক পুড়িয়া মরুক, কতক দূরে থাকিয়া সেই যন্ত্রণা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুক। তোমাদের এই ত কাজ—এই জন্যই ত তোমাদিগকে ঈশ্বর এত ক্ষমতা দিয়াছেন, তবে জ্বালাইবে না কেন? জ্বালাও, সমস্ত বঙ্গদেশ এই আগুনে জ্বালাও। ভয় নাই, দেশ নষ্ট হইবে না—সোণার কলঙ্ক দূর হইবে মাত্র—আগুনে কি সোণা নষ্ট হয়?

পশুপতি জ্বলিল। প্রলয়ের আগুনে পশুপতি জ্বলিল। মনোরমার জন্য পশুপতি জ্বলিল। পাপীর নিকটে ভাল জিনিসও মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। নহিলে, অমন মনোরমা কি পশুপতির কাল হইয়া দাঁড়াইতে পারে?

আর শুনিয়াছ, পশুপতি জ্বলিবার আগে কি বলিয়া জ্বলিল! উন্মত্ত পাপী পশুপতি ভগবানের প্রতি দোষারোপ করিতে করিতে জ্বলিল! পশুপতি, পাপিষ্ঠ, বিশ্বাসঘাতক পশুপতি—তুমি এই মুমূর্ষু অবস্থাতেও ভগবানকে তোমার পাপের জন্য দায়ী মনে করিতেছ? ঐ শুন আগুন গর্জ্জিয়া তোমাকে এ জন্য তিরস্কার করিতেছে—শুনিতে পাইতেছ কি?—

পাঠক, এখনত পশুপতিকে জ্বালাইলাম—এখন একবার কাঁদিবে না? স্বদেশবৎসল, পশুপতির একদিনকার পাপের জন্য সর্ব্বনাশ দেখিয়া কাঁদিবে না? প্রণয়ী পশুপতির মনোরমার জন্য সর্ব্বনাশ দেখিয়া কাঁদিবে না? দেবীভক্ত পশুপতির অন্তিমের সেই মর্ম্মভেদী তিরস্কার বাক্য শুনিয়া কাঁদিবে না? আর, আর সেই পশুপতিকে সেই আগুনে দগ্ধ হইতে দেখিয়া কাঁদিবে না? কাঁদিবে বই কি? সত্য বটে, পশুপতি বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহী, প্রভুহন্তা ও অতিথিহন্তা; সত্য বটে, পশুপতির সেইদিনকার কর্ম্মের ফল এখনও তোমরা ভোগ করিতেছ, কিন্তু তবু কাঁদিতে হয়। মানুষের পতন দেখিলেই কাঁদিতে হয়। একটু কাঁদিবে না কি?

উপসংহার।

যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার নিন্দা সহ্য করিতে পারে না—একথা সকলেই জানেন। প্রণয়ীর নিকট প্রণয় পাত্রের প্রকৃত দোষগুলি বলিলেও তাহা অসহনীয়। শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহের পাত্র সম্বন্ধেও ঐ কথা। এই রূপ অপবাদ ক্ষালনার্থই পশুপতির সৃষ্টি।

বঙ্কিমবাবুর স্বদেশানুরাগই আমাদিগের পশুপতির স্রষ্টা। যে মনোবৃত্তি হইতে বঙ্গদর্শনের "ভারত কলঙ্ক," প্রচারের "বাঙ্গালার কলঙ্ক" শীর্ষক প্রস্তাবদ্বয় সর্ব্বপ্রথমে উক্ত পত্রদ্বয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল—ঠিক সেই মনোবৃত্তি হইতেই পশুপতি উদ্ভূত। প্রভেদ এই যে, উক্ত প্রস্তাব দুইটি কিছু পরিস্কার, পশুপতি প্রস্তাবটি কিছু চাপা দেওয়া। বঙ্গদেশের ভীরুতাপবাদ যে অমূলক, বঙ্গদেশ যে কেবলমাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বিজিত

হয নাই, গ্রন্থকাব এই কথাটি যেন বঙ্গেব আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেব হৃদয়েই গাঁথা রাখিবার জন্য, পশুপতি-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বদেশানুরাগের ইহা একটি প্রধান লক্ষণ। যেরূপ "বন্দে মাতরং" সঙ্গীতটী সকলের নিকটেই কবিব দেশানুবাগ প্রকটিত করিতেছে, আমরা বোধ কবি, বুঝিয়া দেখিলে, পশুপতির সৃষ্টিও সেইরূপই তাঁহার স্বদেশভক্তি প্রকাশিত কবিতে সমর্থ।

সপ্তদশ অশ্বাবোহী কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইয়াছে, এই অপবাদটি স্বদেশবৎসল বঙ্গীয় কবির নিকট, বড়ই অসহ্য বোধ হইল। কথাটি অসহনীয়ও বটে। সেই অসহ্য অপবাদে মর্ম্মপীডিত হইয়া কবিবব মৃণালিনীতে ইহাব প্রতকািরের চেষ্টা পাইলেন। বিদেশীয় লোকে যাহাই ভাবুক, তাহাতে তাঁহাব বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নাই, বাঙ্গালাব লোকই যে এইরূপ বিশ্বাস করিতেছে, ইহাই তাঁহাব প্রধান দুঃখ। তিনি দেখিলেন, এ দুঃখ ঘুচাইবাব তখনকার এক মাত্র উপায়—উপন্যাস লিখিয়া লোকেব মনে অন্যভাব জন্মাইয়া দেওয়া। তাঁহাব কর্ত্তব্য তিনি করিলেন—মৃণালিনীতে পশুপতি সৃষ্ট হইল। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হইল কি? কিয়ৎপরিমাণে হইল বই কি। উপন্যাসের প্রভূত শক্তি লঙ্ঘন করে কাহার সাধ্য? যাঁহারা মৃণালিনী পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মনে অজ্ঞাতসারে একটি সংস্কারের ছায়া পড়িল। উপন্যাসকাব কৃতার্থ হইলেন।

অপবাদটিতে সম্যক্ অবিশ্বাস করিয়া গ্রন্থকার ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটনে সচেষ্ট হইলেন। বিশ্বাসঘাতকতা দোষেই বাঙ্গালা মুসলমান হস্তগত হইয়াছে, সহজেই এ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইলেন। ভাবতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, বাঙ্গালার পরবর্ত্তী ইতিহাস, তাঁহার বিশ্বাস বদ্ধমূল কবিল। জগতের ইতিহাসও কোনরূপ প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারিল না—সিদ্ধান্ত স্থির বিশ্বাসে পরিণত হইয়া, কবিব অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িল—সেই অস্থিমজ্জাগত বিশ্বাস কল্পনাগর্ভে কাব্যরূপে প্রকাশিত হইল। এইরূপে রাজ্যলোভী পশুপতি জন্মগ্রহণ করিল।

কিন্তু বাঙ্গালার কবি, বঙ্গের সন্তানকে এত ভালবাসেন যে, কেবল মাত্র রাজ্যলোভে বিশ্বাসঘাতকতা দোষে কাহাকে দোষী করিতে তাঁহার রুচি জন্মিল না,—তিনি ঐরূপ কার্য্যের, ঐরূপ কারণ অপ্রচুব মনে কবিলেন। বাঙ্গালীব যথাসর্ব্বস্ব, বঙ্গীয় কবিব চিবস্নেহপাত্র প্রণয়প্রবৃত্তি সাহা-

যার্থ অগ্রসর হইল,—কবি যুগপৎ হাসিয়া কাঁদিয়া সে সাহায্য গ্রহণ করিলেন—মনোরমার প্রণয়ে, বিশ্বাসঘাতক পশুপতি সৃষ্ট হইল।

এইরূপে পশুপতির নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের অবস্থা সৃজিত হইল—পাঠক তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পশুপতিতে কবিবরের প্রবল স্বদেশানুরাগ জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

এখন আমরা পশুপতির জীবনচরিত হইতে যাহা শিখিলাম, তাহাই উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। কথাগুলি এই—

১। পাপে যখন মন বড় আসক্ত হয়, লোকের কুমতি সুমতিরূপ ধারণ করিতে চেষ্টা করে। যেরূপেই হউক, পাপের বিষয়টিকে তখন একরূপ ধর্ম্মের সজ্জা প্রদান করিতে বড়ই ইচ্ছা জন্মে। এই সময়ে কত নূতন (Original theory) মত মনোমধ্যে উদিত হয়—কিন্তু তাহা হইতে বিশেষ সাবধানে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। ২। কোন লক্ষ্য বিশেষ স্থির করিয়া লোকে পাপাচরণ আরম্ভ করিলে শেষে সেই লক্ষ্য সংসাধনের উপায় বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যে উপায়ে সেই লক্ষ্য সম্পন্ন হইতে পারে, সেই উপায়ই তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। অতএব আরম্ভেই এ সকল কথা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ৩। 'আজ একটি পাপ করিলাম—আর কখন এরূপ করিব না—অন্য সম্বন্ধে ভাল থাকিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব' এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি শত সহস্র পাপের প্রসূতি। ৪। অসৎ বুদ্ধির জোরে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার কামনা ত্যাগ করিতে হইবে। ধর্ম্মানুমোদিত না হইলে, বুদ্ধি অনেক সময়েই পাপযুক্ত হইয়া বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় আচরণ করে। ৫। সংসারী হইয়া, অন্য কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে, লক্ষ্মী ছাড়া থাকিলে, লক্ষ্মীছাড়া হইতে হয়। ৬। জগতের যেটী প্রধান ধর্ম্ম—ভালবাসা, তাহাও পাপ সংযুক্ত হইলে কুফল প্রসব করে। ৭। পরের অনিষ্ট করিয়া আমার ইষ্টসাধনের জন্য ভগবানকে ডাকা বড়ই গর্হিত কার্য্য। ইহা দ্বারা ভগবানকে ঘৃণিত চক্ষে দেখা হয়! আরও কত শিখিলাম—কিন্তু তাহা না বলিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই।

শিখিলাম এই, কিন্তু মনে রহিল আর একটি কথা। সে কথাটি দেখিয়াছি অন্যত্র, কিন্তু তখন তাহা মনে বহে নাই—এখন বড়ই মনে সংলগ্ন হইয়া রহিল।

কথাটী সেক্ষপীয়রের সেই (দুরাশা) ডাকিনীর কথা।

"Fair is foul, and foul is fair,
Hover through the fog and filthy air."

"সুন্দরকে মন্দ ভাবি, মন্দকে সুন্দর,
বদ্ হাওয়া কুয়া দিয়া ফিরি নিরন্তর।"

উপন্যাস।

মুদ্রাযন্ত্র বড় কল্যাণ-কর। মুদ্রাযন্ত্র সহস্র সহস্র শয়তানকে দশটা পাঁচটার গোলামিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, নহিলে এই সকল শয়তান হাটে বাজারে ছড়াইয়া পড়িত; দেশে মহা বিভ্রাট হইত। মুদ্রাযন্ত্রে যাহা কিছু পাঠাইয়া দিবে, শয়তানিতে ঐ সকল তথনই ধাতুময় হইবে, প্রুফ পণ্ডিত তথনই তাহা শোধিত করিবে, পীর-বস্ত্র তথনই শাদার উপর কালি পাড়িতে থাকিবে, তাহার পর উপহার-পুস্তকের অবলম্বে হৌক, মাসিক পত্রের প্রবন্ধে হৌক, বা সংবাদপত্রের প্রেরিত স্তম্ভে হৌক, সেই যাহা-কিছু; দিব্য হ্রস্বি দীর্ঘির নিশান উড়াইয়া, বফলা-হ্রস্বুর লাঙ্গুল ছড়াইয়া, রেফের সঙ্গীন বাঁকাইয়া ধরিয়া, বঙ্গসাহিত্যের অনন্ত আসরে, উজ্জ্বল-কজ্জ্বল বেশে বিরাজ করিবে। মুদ্রাযন্ত্রের মত কল্যাণকর আর কিছু আছে কি? মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে যাহা কিছু সমস্তই—

সমানি সম-শীর্ষাণি
ঘনানি বিরলানি চ।

সুতরাং সুলিখিত। এমন সুবিধা সুযোগের সময়ে যে হতভাগারা সুলেখক,—অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্রের উপাসক—হইল না, তাহাদের গর্ভধারিণীরা বন্ধ্যা হইল না কেন? কেন—তাহা জানি না, এই মাত্র জানি, তাঁহারা বন্ধ্যা নহেন,

এবং বাঙ্গালার অবন্ধ্যা-পুত্রগণ নির্ব্বোধ নহেন, সুবিধা সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহেন। শয়ন গৃহে অন্ধকারে চোর প্রবেশ করিলে, তখন খট্টাতলে নিঃশব্দে বিরাজ করাই সুবিধা—বাঙ্গালি তাহা করেন না কি? আর সুদূরে রুষ-ঋক্ষ হুঙ্কার করিলে, তখন দেশভক্তি রাজভক্তি দেখাইবার জন্য সখের সৈনিক হইবার জন্য দরখাস্ত করাই সুবিধা—বাঙ্গালি এরূপ সুযোগ কখন ছাড়িয়াছেন কি? অতএব মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে সুলেখক হইবার সুযোগও বাঙ্গালি ছাড়েন নাই—বাঙ্গালি সকলেই সুলেখক। কিন্তু লিখিবার যন্ত্র আছে—পড়িবার যন্ত্র কৈ? হতভাগা ইংরেজ! একজিবিশন্ খুলিবি ত আগে হাতে পয়সা গজাইয়া দিলি না কেন? শুধু কি জিনিসপত্র দেখিয়াই তৃপ্ত হইব? লেখা পড়া শিখাইবি ত ভাল চাকরী দিবি না কেন? লেখাপড়া কি ধুইয়া খাইব? চাকরি দিবিত মোটা মাহিয়ানা দিবি না কেন? পুরুষানুক্রমেই কি চাকরি করিব? মদের আমদানিই যদি করিবি, তবে আবার টেক্স নিবি কেন? স্যাম্পিন্ কি কেবল তোরাই খাবি, আমরা কি দেশের কেহ নই? ছাপি-বার যন্ত্র করিলি ত, পড়িবার যন্ত্র করিলি না কেন? হতভাগারা তোমাদের সকল কাজেই আধা আধি?

বক-চরণ বিক্ষেপে, কুঞ্চিত কটাক্ষে প্রবিষ্ট গ্রন্থকার বাবু। তাঁহার অঙ্গরক্ষা কক্ষ মধ্য হইতে নব-মুদ্রিত পুস্তকের বড় বড় দুই একটি নামাক্ষর —নবোঢ়া বধূর ত্র্যঙ্গুলী-বিদীর্ণ অবগুণ্ঠনের মধ্যস্থ চক্ষুর মত—উঁকি মারি-তেছে। "আসুন, বসুন, ভাল হয়ে বসুন, আপনার পিরাণের পকেটে ওখানি কি?" "আজ্ঞে, একখানি নূতন পুস্তক—নাম 'বিষম সমস্যা,' আপনাকে উপহার দিতে আনিয়াছি।" হস্তে প্রদান। গৃহীতা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া—এখানে সেখানে দেখিয়া—"এ সকল সমস্যার অনেকগুলির উত্তর 'পুষ্পাঞ্জলি'তে আছে।" "আজ্ঞে কুসুমাঞ্জলি ন্যায়শাস্ত্র—তত বিদ্যা আমাদের নাই।" "আমি ভূদেব বাবুর পুষ্পাঞ্জলির কথা বলিতেছি।" "আজ্ঞে তাহাও পড়ি নাই।" তখন বাবুকে শিষ্টাচারে মিষ্টালাপে বিদায় দিয়া ভাবিতে লাগিলাম —এ দেশে ছাপিবার কল আছে—অথচ পড়িবার কল নাই, তাহাতেই এই বিড়ম্বনা হইয়াছে। আমাদের দেশের জ্বর, দেহের জরা, নদীর চড়া, নদের ভাঙ্গান্, চিনির গবাস্থিকতা, ঘিয়ের ভেজালতা, যুবকের বাচালতা, যুবতীর চপলতা—এ সকলের জন্য ইংরেজ যখন দায়ী সাব্যস্ত হইয়াছেন, তখন এই লিখিবার যন্ত্র থাকা, অথচ পড়িবার যন্ত্র না থাকার জন্য ইংরাজ যে দোষী তাহা

কি আবার বলিতে হইবে? ইংরাজ দোষী সুতরাং আমরা খালাস; কাজে কাজেই আমরা নির্দোষ, অতএব নিশ্চিন্ত।

যন্ত্র আছে বলিয়া আমরা সকলেই সুলেখক—যন্ত্র নাই বলিয়া আমরা সকলেই অপাঠক। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাউক, যে বাঙ্গালায় পুস্তক লিখিত হয়, পঠিত হয় না———

বিলক্ষণ। সে কথা কে বলিবে? গোড়াতেই অশুদ্ধ হইয়াছে—তাইতে মীমাংসায়ও গোল পড়িতেছে। ইংরেজ আমাদের উপর যতই কেন, দ্রোহিতার আচরণ করুন না, ভগবান্ ত আছেন। ইংরেজ এই যে, ভাত রাঁধিবার, ঘাড় গালিবার, জ্বরে ভুগিবার, মড়া পোড়াইবার কল আনে নাই—তা বলিয়া কি আমরা ভাত খাই না, না জ্বরে ভুগি না—না মরিলে পুড়ি না—সকলই ত আমরা করি। তোমরা ইংরেজের গোঁড়া,—তাই ইংরেজের কলের গৌরব কর—আবার ইংরেজকেই গালি পাড়—ইংরেজ বিরূপ হইলই বা—ভগবান্ত স্বরূপে স্বপ্রকাশ আছেন।

ভগবানের যে অপার করুণাবলে, বাঙ্গালি সন্তানের জন্মদাতা হইয়া নিশ্চিন্ত, পালনের ভার গৃহিণীর উপর, সেই করুণাবলেই বাঙ্গালী লিখিয়া নিশ্চিন্ত, পাঠ করিবার ভার সেই গৃহিণীদের উপরেই আছে; বলিহারি—সামঞ্জস্য সাধন! আর বলিহারি শ্রম বিভাগ! এমন নৈলে কি সংসার চলিত গা? সকল বিষয়েরই যেমন হোক, একটা ভাগ বাটোয়ারা চাই—এই আমরা টেক্স দিই, ইংরেজেরা বৃত্তি ভোগ করেন; আমরা দক্ষিণা দি, পুরোহিত ঠাকুর ধর্ম্ম কর্ম্ম করেন—সেইরূপ আমরা লিখি, উহাঁরা পাঠ করেন।

অতএব বাঙ্গালায় পুস্তক লিখিতও হয়, পঠিতও হয়; তবে

যারা লেখে তারা পড়ে না;
যারা পড়ে তারা লেখে না।

লেখক পাঠকের এইরূপ অদ্ভুত বিড়ম্বনা অভূতপূর্ব্বরূপে সমঞ্জসীভূত হওয়াতে—বাঙ্গালায় প্রতিনিয়তই একরূপ গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে, সে গুলির নাম—উপন্যাস। উপ-সর্গে একটু রঙ্গদারি আছেই আছে; উপন্যাস অর্থে রঙ্গদারি কেতাব—সাধু ভাষায় রঞ্জন-কর পুস্তক।

প্রকৃতি রঞ্জনেই রাজার রাজত্ব—পুরুষের পুরুষার্থ। সেই প্রকৃতিপুঞ্জই যখন আমাদের লেখনের লক্ষ্য, তখন, রঞ্জন করাই শ্রেয়ঃ। অতএব বঙ্গ ভাষায় মনোরঞ্জক গ্রন্থের বা উপন্যাসেরই প্রাদুর্ভাব।

রঞ্জন-নীতি ব্যতীত বাঙ্গালায় আর কিছুই কি নাই? আছে বৈকি—ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি সমাজনীতি—সকলই আছে। কিন্তু সকলই ঐ মূল নীতি—রঞ্জন নীতিতে ওত-প্রোত। বাঙ্গালায় ধর্ম্মনীতির অমৃত, রাজনীতির গরল, গার্হস্থ নীতির মধু—এবং শিক্ষানীতির নিম্ব—সকলই সমভাবে উপন্যাসে উপন্যস্ত হইতেছে। প্রতিভা-সম্পন্ন লেখকাগ্রগণ্য স্বীয় স্বীকারোক্তি কলমবন্দি করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার বক্তব্য যাহা কিছু প্রায়ই উপন্যাসে প্রকাশিত করেন; আর মুদ্রা-বিভ্রাট-গ্রস্ত মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারীগণও অনবরত উপন্যাস বিন্যাস করিয়া প্রমাণীকৃত করিতেছেন, যে বাঙ্গালায় উপন্যাস ভিন্ন গত্যন্তর নাই। [এই স্থলে পাঠকগণকে—শ্রীবিষ্ণু, আপনার কথা আপনিই ভুলিতেছিলাম—পাঠিকাগণকে অনুরোধ, তাঁহারা যেন বঙ্গে নাটক নামে প্রচারিত গ্রন্থ গুলিকেও উপন্যাসের মধ্যে গ্রহণ করেন, কেননা সে গুলিতে কেবল উপন্যস্ত বিবরণ আছে—নাটকত্ব কিছুই নাই।]

দুই আর দুয়ে চারি, যদি এই গণিততত্ত্ব দেশে বুঝাইতে হয়—'তোমার দেশকে তুমি ভাল বাসিও'—এ কথা যে দেশে দিবারাত্র শিখাইতে পড়াইতে হইতেছে, সে দেশে যে গণিতের ঐ গভীর তত্ত্বও অচির কাল মধ্যে বুঝাইতে হইবে, এমন ভরসা আমাদের সম্পূর্ণই আছে—যদি তেমনই সুদিন, আর তেমনই সুযোগই হয়—যদি দুই আর দুয়ে চারি এই কথা বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে লিখিতে হইবে—

"সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। বিজয়পুরের বিজন গঙ্গাতীরের কুল কুল ধ্বনিতে তটস্থ ঝিল্লীরবের স্বর সম্মিলন হইতেছে, অষ্ট বর্ষ বয়স্ক বিপিন চারি বৎসরের ললিতার গলা জড়াইয়া বেড়াইতেছে; ধূসরাকাশে একটি তারা টীপ্ করিয়া দেখা গেল। বিপিন বলিল "ললিতে—তোমার আমার কয় চক্ষু?" ললিতা বিপিন দাদার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকে হাসিল—বলিল 'জানি না।' —তখন বিপিন ললিতার হস্ত লইয়া একে একে আপনার চক্ষু দুটি ও ললিতার চক্ষু দুটিতে স্পর্শ করিতে লাগিল—আর সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল—'এক, দুই, তিন, চারি—তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল—"এখন বল—তোমার আমার কয় চক্ষু?" ললিতা হাসিয়া বলিল 'চারি চক্ষু?'—বিপিন বলিল দেখ ভুলিও না—দুই আর দুয়ে চারি হয়, তখন আবার সেই চারি চক্ষু মিলিত হইল—মরি মরি! বালপ্রণয়ের কি মাধুরি!"—ইত্যাদি—ইত্যাদি—

ললিতা বিপিনের উপন্যাস—উভয়ের বিবাহে অর্থাৎ চারি চক্ষুর শুভ

সম্মিলনে সমাপ্ত। এরূপ মনোহর উপন্যাস পাঠের পর দুই আর দুয়ে যে চারি হয়—তাহা তোমরা কি আর কখন ভুলিতে পারিবে? যদি তোমরা তবু ভুলিয়া যাও—তবে কাজেই আমাদিগকে বলিতে হইবে—তোমাদের উদ্ধারের অন্য উপায় নাই—যদি উপন্যাস পাঠ করিয়াও ধর্ম্ম বিজ্ঞান প্রভৃতি তোমরা না শিখিতে পার—তবে তোমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

আমরা—অর্থাৎ ছোট বড় মাঝারি গ্রন্থকারেরা—এবং ছোট বড় মাঝারি সমালোচকেরা—দুঃখিত—অর্থাৎ বিড়ম্বিত। যদি পাঠকের প্রবৃত্তি দোষে উদ্দেশ্য উপলক্ষিত না হয়, তাহা হইলে তাহাতে, গ্রন্থকার মহা বিড়ম্বিত হন।

বঙ্গের সাধারণ পাঠকের কেবল বাল-স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার এবং মজা দেখিবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা বলবতী থাকাতেই, তাঁহারা নারী জাতির অন্তর্গত এবং পাঠকের ঐরূপ অগভীর প্রবৃত্তি হওয়াতেই—সকল শ্রেণীর গ্রন্থকার অগত্যা তাঁহাদের মনোরঞ্জনার্থ ব্যগ্র। ফল এই হইতেছে—পুস্তক পাঠে পাঠকের ক্ষণিক রঞ্জন হইলেই, পাঠক একটু মজা পাইলেই, আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন। সকল সদ্‌গ্রন্থেরই উদ্দেশ্য লোক শিক্ষা। লোকে কিন্তু রঞ্জন অবঞ্জনই বুঝে, রঞ্জন হইলেই চরিতার্থ হয়। সুতরাং বাঙ্গালার অধিকাংশ সদ্‌গ্রন্থই অধিকাংশ স্থলে বিড়ম্বিত।

ও দিকে আবার অনেক গ্রন্থকার গ্রন্থ মাত্রের আসল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া বাজে উদ্দেশ্য লইয়া ব্যস্ত হন। পালা ভুলিয়া গিয়া সঙের পর সঙ দিয়া যাত্রা শেষ করেন। পূর্ব্বে প্রতি পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণভোজন হইত, দুধ দয়ে মুখ দিবে বলিয়া সকাল হইতে বিড়াল বাঁধা হইত; এখন ব্রাহ্মণভোজন আর হয় না, দুধ দয়ের সম্পর্ক নাই—কিন্তু পূর্ণিমায় বিড়াল বেচারা বাঁধা পড়ে; অনেক গ্রন্থেরও ঠিক এই দশা—দুধ দয়ের সম্পর্ক নাই—কিন্তু বিড়াল বাঁধা। আছে—সারা দিন তার মেও মেওয়ানি—গল্প ত কেবল গল্প—হাঁক ছাড়িতে পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি দুইখানি উপন্যাস গ্রন্থ পাঠ করা গেল; দুইখানি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির। এই দুখানির তুলনা করিলে, আমরা উপন্যাস গ্রন্থের গ্রন্থন-রহস্য বোধ হয় অনেক বুঝিতে পারিব।

একখানির নাম চন্দ্রা, অন্য খানির নাম জলাঞ্জলি।* দুই খানিতেই

* চন্দ্রা—উপন্যাস। কলিকাতা—বন্দ্যো ও মুখর্জ্জি প্রকাশক। ১২৯৪।
জলাঞ্জলি—নবন্যাস, এল এম্ দাস এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত। ঢাকা।

গ্রন্থকারের নাম বা কোনরূপ পরিচয় নাই। অল্প মাত্র পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়—যে চন্দ্রার গ্রন্থকার পাকা লেখক ও তুখড় লোক এবং জলাঞ্জলি-কার চিন্তাশীল লোক হইয়াও এখনও মক্স করিতেছেন। অথচ এটিও দেখিতে পাওয়া যায়, প্রবীণ নবীন উভয় গ্রন্থকারই চির-প্রথানুযায়ী পূর্ব্ব লেখকগণের উপর একটু সাহঙ্কার, একটু শ্লেষ ভ্রূকুটি করিতেছেন। চন্দ্রা-কার বলিতেছেন—"আমরা এত কথা বলিতেছি, কারণ এমনি কতকগুলা বলিতে হয়" (৩৬ পৃষ্ঠা)। ভাবটা, যেন পূর্ব্ববর্ত্তী উপন্যাস লেখকগণ বড় বাজে কথার ভক্ত! জলাঞ্জলি দাতা প্রায় প্রথমেই বলিয়াছেন,—"আমরা স্বকপোল কল্পিত কিছুই বলি নাই, লোকের যাহা বিশ্বাস ছিল ও যাহা জনশ্রুতি ছিল, তাহাই যথাযথ বর্ণন করিয়াছি।" ভাবটা, যেন পূর্ব্ব লেখকগণের স্বকপোল-কল্পনা বড়ই নিন্দনীয়। উভয় গ্রন্থকারেরই যখন পূর্ব্ব লেখকগণের উপর ঐরূপ শ্লেষ কটাক্ষ, তখন উভয়েই যে উপন্যাস রচনে নূতন প্রণালী অবলম্বনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। নূতন পন্থা খুঁজিতে গিয়া দুই জনে দুই বিভিন্ন দিকে গিয়াছেন। চন্দ্রা কারের চেষ্টা—ভাষার চুটকিতে চটক দেখাইব, ঘটনার পর ঘটনা জুটাইয়া স্তম্ভিত করিব; পাঠককে হাঁফ ছাড়িতে দিব না; মনের কথা ইঙ্গিতে বলিব, তোমরা আপন মনে পরের মনের ইচ্ছামত বিশ্লেষণ করিও। জলাঞ্জলি-কারের নবীনত্ব ভাষার অকাপট্যে এবং কায়দাহীনতায়; ২৫০ পৃষ্ঠার উর্দ্ধ গ্রন্থে ঘটনা মোটে তিনটি। সে গুলি আবার বঙ্গে নিত্য লক্ষিত,—বিবাহ, বৈরাগ্য ও মৃত্যু। কিন্তু লোকের মনের ভাব তিনি বিশ্লেষণের উপর বিশ্লেষণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হন নাই।

চন্দ্রার গ্রন্থে ভারতের সেই অদ্বিতীয় ঘটনা—সাতান্ন সালের সিপাহী সমর; অভিনায়কগণ—ইংরেজ দ্বেষ্টা সিপাহী সকল—মহা কৌশলী সন্ন্যাসী-কুল,—উন্মাদিনী তেজস্বিনী ভিখারিণী—ইংরেজ পালিতা পাঞ্জাবী কুমারী চন্দ্রা—নানা সাহেব প্রমুখ বিদ্রোহীদল ও লর্ড ক্যানিং প্রভৃতি ইংরেজের উচ্চ কর্ম্মচারী। চন্দ্রায় আছে—পুত্রত্যাগ, কন্যাত্যাগ, স্ত্রীত্যাগ, স্বামীত্যাগ, গৃহত্যাগ; সমাজত্যাগ—ডাকাতি, দস্যুতা,—যুদ্ধ, বিদ্রোহ—সন্ধি বিগ্রহ—ক্ষমা নিগ্রহ—সঙ্গীন কাণ্ড, তুমুল ব্যাপার ও বিভীষণ বীভৎস দৃশ্য। জলাঞ্জলির রঙ্গভূমি—অধিকাংশ বঙ্গ লেখকের তুচ্ছীকৃত, 'নগণ্য' পূর্ব্ব বঙ্গের সামান্য দুইটি পল্লী—অভিনায়ক ও অভিনায়িকা—এতদঞ্চলীয় অধিকাংশের উপহাস ভূমি—

'বাঙ্গাল' নর-নারী, আর ঘটনা—পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বাঙ্গালির নিত্য কর্ম্ম, দৃশ্য গৃহস্থের গৃহস্থালি, সামাজিকের সভাস্থল, কুলবধূ পরিবেষ্টিত বিবাহ-বাসর এবং ভক্তি-সেবিত দেবী মন্দির। চন্দ্রা পড়িয়া, ঘটনার ও মানুষের খতিয়ান করিয়াও জমা খরচ মিলাইতে পারি নাই, জলাঞ্জলিতে লেন দেন বড় সামান্য, জমা খরচ মিলাইলেও যা—না মিলাইলেও তাই। চন্দ্রার বীর ভয়ানক রৌদ্র অদ্ভুত রসে আমরা চকিত, স্তম্ভিত, বিস্মিত হইয়াছি, জলাঞ্জলির সামান্য, শান্ত-করুণে, নিঃশব্দ শান্ত-করুণে, অনাড়ম্বর শান্ত-করুণে, শান্তিপ্রদ শান্ত-করুণে—আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, চোখের জল ফেলিয়াছি। চন্দ্রার সকলই অদ্ভুত—রামচাঁদের পর-পুত্রে স্নেহ অদ্ভুত—নবীন সন্ন্যাসীর স্বদেশ-বাৎসল্য-ব্যঞ্জক গান অদ্ভুত, তাঁহার কথা বার্ত্তা অদ্ভুত—ভিখারিণীর স্বামী ভক্তি অদ্ভুত— চন্দ্রার অভিমান অদ্ভুত—সকলই অদ্ভুত,—

কিন্তু চন্দ্রা নিশ্বাস ফেলিতে দেয় না, হাঁফ্ ছাড়িতে দেয় না, কাঁদিতে দেয় না—গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া একটু সোয়াস্তি হয়। রেল গাড়িতে ত আমরা কত কি দেখিতে থাকি,—ঐ পাহারাওয়ালা গলা ধাক্কা দিল—ইস্, মানুষটা পড়ে ছিল একটু হলে, ঐ জল্ জল্ করিতে করিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ঐ এক জন সাহেব চলন্ত গাড়ীতে দৌড়িয়া উঠিল—সেই পাহারাওয়ালাই সেলাম করিতেছে, ঐ কয়লার খনিতে আগুন লাগিয়াছে—কি ভীষণ ধূম।—আহা বুড় মিন্‌সে আচাতে এসে পড়ে গেল গা—দূর মাগী, শীগ্‌গির তুল্‌সে, হাসিস্ কেন? বা! কাজি পাড়ায় দম্-মাদার বাহির হইয়াছে—বাঁশটা পড়িল পড়িল, খুব সাম্‌লেছে, সাম্‌লেছে কৈ? এ পাড়ায় এদের ছেলে মরেছে। ঐ মেয়ে মানুষটিরই ছেলে হবে—দূর মাগী আর জলে ডুবে মরে না—কেবল বামে জমা করিতে শিখিয়াছিস, এখন ডাহিনে খরচ লিখিতে শেখ্—ত্রিশ বিঘা ধরিল না—ঐ হুগলি—কত কি অদ্ভুত দেখিতে-ছিলাম বটে, তবু বাড়িতে আসিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া সোয়াস্তি হয়। চন্দ্রার পর জলাঞ্জলি পাঠ করিতে করিতে আমাদের ঠিক্ সেই রূপ মনের অবস্থা হয়। সেই ঘর্ঘরানি ঝড়ঝড়ানি এড়াইয়া, সেই চলৎ চলৎ চলৎ ভাব ছাড়াইয়া, নিরেট মাটীর উপর বসিয়া একরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ পাইলাম। এতক্ষণ নানা ভাবে কেবল হা করিয়া দেখিতেছিলাম, এখন ঘরে আসিয়া ক্লেশে কষ্টে কাঁদিতে পারিলেও আরাম আছে। চন্দ্রা বিপ্লব—জলাঞ্জলি আরাম।

চন্দ্রা ও জলাঞ্জলির আরও একটু তুলনা আবশ্যক। আজি কালি বাঙ্গালার প্রায় সকল গ্রন্থেই দেশভক্তির ভাব—কোন না কোনরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই গ্রন্থেও আছে। কিন্তু বড় ভিন্ন মূর্ত্তিতে। সাতান্ন সালের সিপাহী সমরের কথা যে গ্রন্থের উপজীব্য, তাহাতে দেশভক্তি অবশ্য প্রসঙ্গতই থাকিবে, চন্দ্রাতে সেই ভাবেই আছে; তবে চন্দ্রা উপন্যাসের সকল দেশভক্তির মূলেই সংসার বিরাগ আছে। একজনকে অতি শিশু কালে তাহার মা পাগল হইয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া গেল; যে দয়া পরবশ হইয়া কুড়াইয়া লইয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল, ঘটনাক্রমে তাহার জেল হইল। তাহার স্ত্রী দাসী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ছেলেটিকে মানুষ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু ছেলেটির বড় মানুষের বাড়ীতে লাঞ্ছনার শেষ হইল, মিছামিছি চোর বদনাম পর্য্যন্ত দিলে—ছেলেটি প্রাণের ভয়ে সংসারত্যাগী হইল—সেই সোমনাথ একজন দেশভক্ত। আবার সোমনাথকে যিনি দেশভক্তিতে দীক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহার সমাচারও বলি। এক ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে কারাগারে হত্যা করা হয়। জনার্দ্দন নামে তাহার একটি পালিত পুত্র ছিল, সে সেই পালক পিতার অপঘাত মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইল। হঠাৎ প্রেমের ফাঁদে বাঁধিয়া গেল। একটি কুমারীকে বিবাহ করিয়া ঘরকন্না করিতে লাগিল। অযোধ্যায় একটি তালুক কিনিয়াছিল, ইংরেজেরা তাহা কাড়িয়া লইতে চান—সে রাগান্ধ হইয়া একজন ইংরেজ কর্ম্ম-চারীকে বধ করিল। সুতরাং গা-ঢাকা দিয়া বাস করে। এক দিন রাত্রিতে ঘরে আসিয়া দেখে, যে তাঁহার স্ত্রীর কাছে একজন সাহেব বসিয়া আছে। আবার সন্ন্যাসী হইল, ইংরেজের শত্রু হইল, সুতরাং দেশভক্ত হইল। আর একজনের কথা বলি। রমানাথ কলিকাতার একজন বড মানুষের অতি বয়াটে ছেলে; সহরে নূতন আমদানী বিবিয়ানা চালের একটি রমণীর উপর রমানাথের শুভ দৃষ্টি পড়িল। রমানাথ দেখেন সেই রমণীকে একজন সন্ন্যাসী গাড়ী করিয়া আনিল—এ কথায় সে কথায় সন্ন্যাসীকে মারিতে গেলেন, স্বয়ং মার খাইলেন। কতকগুলা গুণ্ডায় ধরিয়া লইয়া গেল; পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া মুক্তি পান। সন্ন্যাসী বেশে সেই রমণীর বাড়ীতে গেলেন, চোর বলিয়া ধৃত হইলেন, কারাগারে বন্দী হইলেন। শেষে প্রণয় বৈরাগ্যের সন্ন্যাসী হইলেন। ইনিও একজন সুতরাং দেশভক্ত। তাহাতেই বলিতেছিলাম চন্দ্রার দেশভক্তি—সংসার বিরক্তির ফল। সকলেই যেন তাড়া খাইয়া, সোজা

পথে কাঁটা দেখিয়া, দেশভক্তির বাঁকা পথে প্রবেশ করিয়াছেন। স্বয়ং নানা সাহেব রাজ্যলালসায় উন্মত্ত; তাঁহার সহচর আজিম উল্লা শ্বেত-রমণী-সম্ভোগ লালসায় ততোধিক উন্মত্ত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চন্দ্রা উপন্যাসের দেশভক্তি—কোথাও জন্মিতেছে সংসার জ্বালায়, কোথাও লালিত হইতেছে—ভোগ লালসায়। এইরূপ দেশভক্তি লইয়াই কি সাতান্ন সালের বিপ্লব? *ঠিক জানি না, কিন্তু বিশ্বাস করি অন্যরূপ।*

জলাঞ্জলির দেশভক্তি সম্পূর্ণ অন্যরূপ, হিন্দুর সংসার ধর্ম্মেই ইহার উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি। এ দেশভক্তির বড় মৃদুমন্দ মূর্ত্তি। এ দেশ-ভক্তিতে চন্দ্রার বিপ্লব ত নাইই—এখনকার দিনের মত বক্তৃতা, বলণ্টিয়ার, ভারতোদ্ধার, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি ধৈবত নিখাদের কিছুই ইহাতে নাই; সহজ সুরের সঙ্গে কেবল কড়িমধ্যমের একটু যোগ আছে। নমুনা দিতেছি;—

"সিকদার। দূর পাগল। সাহেবের স্ত্রীকে মেম বলে তাই, জান না?

জয়চন্দ্র। স্ত্রী! তা স্ত্রীপুরুষে এক সঙ্গে এ রকম করে বাহির হয়।

সিকদার। এরা মানুষ নয়। দেবতা। দেবতাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষে লজ্জা নাই। * * * * [সুরের সঙ্গে লুকান কড়িমধ্যম বহিল যে, উপদেবতা হইলেও হইতে পারে।]

জয়চন্দ্র। হবে। আচ্ছা, ওরা এই গরমের দিনে ঐ বনাতের কাপড়গুলি গায়ে দিয়া রহিয়াছে কেন? মেঘ নাই, রৌদ্র নাই, দুজনেই একটা 'মাতলা' মাথায় দিয়া যাইতেছে কেন?

সিকদার। কে জানে বাবা, আমি তোমার এ বিট্‌কেলে কথার উত্তর দিতে পারি না। ওরা ঐরূপ কাপড় পড়ে।"

বিটকেলে কথা বলাতেই আচরণটি বিটকেল বলা হইল—ইহাতেও কড়িমধ্যম লাগিয়াছে। অন্য স্থানে আর একটু চড়া সুর আছে—শুনাইতেছি।

কালুসর্দ্দার অপূর্ব্ব খেল দেখাইল। "লক্ষ্মণ রায় মহাশয় সাবাস্ সাবাস্ বলিয়া কালুকে দশ টাকা বকসীস্ দিলেন ও চৌধুরী মহাশয়কে বলিলেন, "তোমরা নিজেরাই পূর্ব্বাপর লাঠিয়াল, মানুষ মারা কত রকম কল জান। তোমাদের লোকজন আর এ বিষয়ে দক্ষ হইবে না কেন?" চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "লাঠিয়াল একটা গালি নয়, আমাদের মত পূর্ব্বাপর সকলেই লাঠিয়াল হইলে বিশুদ্ধ সুসভ্য হিন্দু জাতি যবনের পদানত হইয়া আত্মকুলে কালি দিত না। সোমনাথ দেবমন্দিরের চন্দন কাষ্ঠের কবাট ম্লেচ্ছ

মসজিদে খুলিত না। যোগ, জ্যোতিষ, দর্শন, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি রত্ন-গুলি যবনাগ্নিতে ভস্মীভূত হইত না। ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন ভুলিয়া যাইতেন না। হিন্দুর শুভ্র আচারে যবনাচারের কালিমা পড়িত না, কুলাঙ্গার হিন্দু কুল এক যবনের নিধন দেখিয়া অবসর পাইয়াও অন্য যবনকে ডাকিয়া আনিয়া সিংহাসনে বসাইত না। খাল কাটিয়া কুমীর আনিত না। হিন্দুর শিরোভূষণ কোহিনুর অহিন্দুর শিরে আলোক প্রদান করিত না, মুঙ্গেরের নিকট গঙ্গা বল্লভীচর বক্ষে ধারণ করিয়া অসার হিন্দুগণকে দেখাইতেন না।" লক্ষ্মণ রায় মহাশয় দেখিলেন চৌধুরী মহাশয়ের চক্ষু হইতে জ্যোতি বাহির হইতেছে এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। তিনি বলিলেন, "ভাই, তুমি যাহা যাহা বলিলে, সকলই সত্য কিন্তু সময় গিয়াছে; এত আবর্জ্জনা পড়িয়াছে যে, তোমার আমার মত দুই জন বৃদ্ধ মেথরের এ আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার কাজ নয়।" চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "সময় কখন যায় না।"

এই রূপ সুর চড়াইতে গিয়া, তানের উপর গিট্‌কিরি দিতে গিয়া, জলাঞ্জলিকার জলাঞ্জলির পূর্ণাবাম ভঙ্গ করিযাছেন। যেখানে প্রদর্শন, সেই খানেই বিড়ম্বনা—কাজেই এরূপ স্থলে গ্রন্থকার বিড়ম্বিত হইযাছেন। কিন্তু এরূপ স্থলে চন্দ্রার উচ্ছ্বাস বড়ই স্ফূর্ত্তিময়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চন্দ্রার গ্রন্থকার রস বচনে বিশেষ পটু, প্রদর্শনের প্রদর্শনা লুকায়িতে বিশেষ পারদর্শী, একটু নমুনা দিতেছি,—

"কাঁদিতে সাহস হয় না," সিপাহীরা একথা বুঝিতে পারিল না।

যুবা বলিতে লাগিল—"আপ্পা সাহেবের মৃত্যুর পর যখন ম্লেচ্ছ পোষ্য-পুত্র বহিস্কৃত করিয়া মৃত রাজার স্বর্গপথ রোধ করিল, যখন সেতারা রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিল, অট্টালিকা লুণ্ঠন করিয়া নিলামে ধরিল, অনাথিনী রাণীগণের রোদন যখন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, কে কাঁদিতে সাহস করিয়াছিল? সর্ব্বগ্রাসী শ্বেত রাক্ষস যখন নাগপুর গ্রাস করিল, হিন্দুর চির প্রচলিত প্রথা ধ্বংস হইল, রাজপুত্রদিগকে ভিখারী করিল, কেহ কি কাঁদিতে সাহস করিয়াছিল? কেরোলি যখন শ্রীভ্রষ্ট হইল, ঝান্সী যখন পদতলে দলিল, প্রজার হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হইল, সম্বলপুরের কথায় কাহার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়, কিন্তু সাহস করিয়া কেহ কি কাঁদিতে পারিয়াছিল? ম্লেচ্ছ পীড়নে বাজিরাও পেশওয়া যখন রাজ্যচ্যুত হন, কার প্রাণ না কাঁদিয়াছিল?

কিন্তু কাঁদিতে কে সাহস করিয়াছে? কুবেরপুরী অযোধ্যা ভিক্ষুকাগার হইল, ওয়াজাদালি বন্দী, দিঙ্‌মণ্ডল হাহাকারপূর্ণ—কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? কিন্তু কাঁদিতে কি কেহ সাহস করিয়াছিল? যখন ম্লেচ্ছ ভয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দন্তে 'কার্তুজ' কাটিবে, কাঁদিতে কে সাহস করিবে?

সকলেই স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে লাগিল।"

সন্ন্যাসীর মুখে এ সকল কথা শুনিলে যে সিপাহী সকলে স্তম্ভিত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? পড়িতে পড়িতে আমাদিগকেই স্তম্ভিত হইতে হয়—সত্য সত্যই মনে হয়—যেন কান্না আসিতেছে অথচ কাঁদিতে পারিতেছি না। চন্দ্রা গ্রন্থের ইহাই উৎকৃষ্ট গুণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহার দোষ——চটক চমকের অনবরত প্রদর্শন, অঘটন ঘটনার নিয়ত ঘটঘটানি, ইহাতে ঘটনার বিপ্লবে মানসিক বিপ্লব ঢাকিয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থকার প্রদর্শন পটু বলিয়া অনবরত দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, দেশভক্তির বীজ সংসার বৈরাগ্যে বপন করিয়া নিঃস্বার্থ দেশভক্তির অনুপপত্তির অসাধু সঙ্কেত করিয়াছেন এবং চন্দ্রার প্রগাঢ় প্রণয়ে দারুণ অভিমান আরোপ করিয়া চন্দ্রার হিন্দু-রমণীত্ব নষ্ট করিয়াছেন। হিন্দু নারী ক্ষমা, চন্দ্রা নহে।

জলাঞ্জলি-কারের লেখা কাঁচা—হৃদয় পোক্ত। তিনি প্রদর্শনের পন্থা সাধারণত পরিত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি মনোরঞ্জনে লক্ষ্য না করিয়া আবার উপন্যাস আকারে তাঁহার হিন্দুভাব ব্যক্ত করুন, ইহাই আমাদের অনুরোধ! লেখা লিখিতে লিখিতেই পাকিবে। চন্দ্রার উপন্যাস-কর্ত্তাকে অনুরোধ, তিনি ঘটনার আবর্জ্জনা কিছু কমাইয়া, তাঁহার জমাট লেখায় জমাট ভাষায় একখানি চমক চটক বিবর্জ্জিত উপন্যাস বঙ্গীয় পাঠককে এবার যেন উপহার দেন।

সেকালের দারোগার কাহিনী।

পরিচয়ে সমালোচনা।

নবজীবনের তৃতীয় বৎসরের আরম্ভে, ১২৯৩ সালের শ্রাবণ হইতে। সেকালের দারোগার কাহিনী প্রকাশিত হইতে থাকে, চতুর্থ বৎসরের শেষে ১২৯৫ সালের আষাঢ়ে কাহিনাগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে। কাহিনীগুলির খণ্ডশ প্রচারে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্যোগী ছিলাম, এক্ষণে এই পুস্তক প্রচারের অবসরে, দারোগা মহাশয় এবং দারোগা মহাশয়ের কথিত কাহিনীগুলি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল, গিরিশবাবু নবদ্বীপের দারোগা হন। গিরিশবাবু ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত মালখা নগরের বসু গোষ্ঠী সম্ভূত। এই বসু গোষ্ঠী অতি প্রাচীন। মালখা নগরের সে-ঘরের ইষ্টকফলকে বঙ্গাক্ষরে খোদিত বিবরণে জানিতে পারা যায় যে, ইহাঁরা ঔরঙ্গজেব্ বাদশাহের আমল হইতে ঐ নগরে বাস করিতেছেন। এই বংশ যেমন প্রাচীন, তেমনি সম্ভ্রান্ত এবং পূর্ব্বাঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহার পর, গিরিশবাবু হিন্দু কলেজের সীনিয়ার স্কলার, ইংরাজিতে সুপণ্ডিত এবং বিশেষ ব্যুৎপন্ন। যখন গিরিশ বাবু চাকরিতে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত লাল মোহন ঘোষের পিতা এবং গিরিশবাবুর মাতুল রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর কৃষ্ণনগরের সদর আলা। তাঁহার নাম ডাকে তখন কৃষ্ণনগর অঞ্চল প্রতিধ্বনিত হইত। সুতরাং গিরিশ বাবু বড় লোকের ভাগিনা, বড় ঘরের ঘরানা, এবং ইংরাজি শিক্ষায় বড় মর্দ্দানা ছিলেন, তাঁহার মত উচ্চ বংশোদ্ভব, উচ্চ সম্বন্ধে পরিচিত, এবং উচ্চ শিক্ষায় উন্নত লোক তখনকার দিনে দারোগাগিরিতে অতি অল্পই প্রবেশ করিয়াছিলেন। আর তখনকার দিনেই বা বলি কেন? এখনকার দিনেও,—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা ছড়াছড়ির দিনে—গিরিশবাবুর মত লোক সব্‌ইনস্পেক্টরি বা ইনস্পেক্টরিতে কয়জন আছেন? ভাল লোক প্রায়ই পুলিশের কর্ম্মে যান না—ইহা কতকটা আমাদের অর্থাৎ লোকেদের দোষ, আর কতকটা

লোক শিক্ষক, লোক-প্রতিপালক সরকার বাহাদুরের দোষ। বড় নিষ্ঠুর না হইলে, পুলিশের কার্য্যে সফলতা হয় না, গিরিশবাবু স্বয়ং বলিয়াছেন,

"আমিও তাহাকে বরকন্দাজের গারদে একদিন একরাত্র সম্পূর্ণরূপে উপবাসী রাখিলাম, কত ছিদ্দৎ করিলাম, এবং তাহার প্রতি আর যে সকল ব্যবহার করিলাম, তাহা এখানে লিখিতে লজ্জা বোধ হয়। হা! পরমেশ্বর এই সকল নিষ্ঠুরাচরণের নিমিত্ত বুঝি আমি এই বৃদ্ধ বয়সে তাহার ফল ভোগ করিতেছি।"

"বরমেব ভিক্ষা, তরুতলে বাস—তথাপি যেন ভদ্র সন্তানেরা পুলীশের চাকরি না করেন!!!"

গুণধর গিরিশবাবু দারোগাগিরিতে প্রবেশ করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, কি অকৃতি হইয়াছিলেন, সে কথার বিচারে আমরা প্রবৃত্ত নহি, সে পরিচয় নবজীবনের পাঠকেরা পাইয়াছেন ও পুস্তকের পাঠকেরা পাইবেন, পুস্তকের সম্যক্ পরিচয়ার্থ গিরিশ বাবুর যতটুকু চৌহদ্দী জানা আবশ্যক আমরা তাহাই দিলাম। আমাদের কথাটা এই দারোগার কাহিনী—হরিদাসের গুপ্তকথা অথবা রামদাসের ব্যক্ত কথা নহে, দারোগার কাহিনী—সত্য সত্যই দারোগা গিরিশচন্দ্র বসুর লিখিত আপন জীবনের আংশিক কাহিনী।

দারোগার কাহিনীর উদ্দেশ্য গিরিশবাবু স্বয়ং সরল ভাষায় সরল ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। "আজকাল কতজন কত রূপক, কত নাটক, কত কবিতা লিখিতেছেন; কিন্তু কেহই দেশের অব্যবহিত পূর্ব্বকালের বৃত্তান্ত সমস্ত আপন আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে বিবৃত করিতে লেখনী ধারণ করেন নাই। অনেকে অনেক বিষয় লেখা অযোগ্য বলিয়া তুচ্ছ করিতে পারেন, কিন্তু যিনি ভাবি কালে বঙ্গ দেশের ইতিহাস লিখিবেন তিনি দেখিবেন যে, অনেক তুচ্ছ সংবাদ অভাবে সম্পূর্ণ ইতিহাস অঙ্গহীন থাকিবে। এই বিবেচনায় কেবল বর্ত্তমান পাঠকগণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নহে, কিন্তু ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকদিগের সাহায্য উদ্দেশে, এই দেশের দস্যুদিগের কীর্ত্তি কলাপের এবং সেই সঙ্গে ভূত পূর্ব্ব পুলিশের কার্য্যপ্রণালীর যতদূর পারি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।" সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন ইংরেজ নীলকরদিগের ও বাঙ্গালী জমীদারদিগের প্রবল প্রতাপ ও ততোধিক বিস্ময়কর পতনের বিবরণও দারোগার কাহিনীতে আছে। অনুসঙ্গে তখনকার সাহেব স্বভাব আচার ব্যবহার, গরীব দুঃখীর

রীতি নীতি এবং সাধারণত দেশের লোকের আমোদ আহ্লাদের এবং সুখ দুঃখের অনেক কথা আছে।

কথায় বলে,—বলে,—আসলের কাছে আবার নকল? Truth is strange, stranger than fiction. সত্যাহি ঘটনা চিত্রা কল্পনাতো হ্যতিবিচ্যতে। সত্য যদি বুঝিতে জান, দেখিতে জান, বলিতে জান, লিখিতে জান—তবে সত্যের অপেক্ষা অদ্ভুত আর নাই। গিরিশ বাবুর বলিবার, লিখিবার গুণে দারোগার সত্যকাহিনী বড় অদ্ভুত বৃত্তান্ত। অনেক উপন্যাস হইতে এই অনুন্যাস বড়ই অদ্ভুত। গিরিশ বাবুর বর্ণনার রসময়ী বঙ্কিম ভঙ্গিমা দেখিয়া কল্পনা বহুদূরে দিদীকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আসরে জগৎ মনমোহিনী কীর্ত্তন গাহিতেছে দেখিয়া বামা আর পা ধুইল না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গান শুনিয়া চলিয়া গেল।

গিরিশ বাবু মনোহরকে বর্ণন করিতেছেন,—"মনোহর আসিয়া আমাকে নতশিরে দণ্ডবৎ করিল। দেখিলাম তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; আরও সুখ-সচ্ছন্দের অবস্থায় তাহা গৌরবর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারিত। দেহ মধ্যম ছন্দ, কিন্তু গঠনে প্রচুর বলের আকার দৃষ্ট হইল। অতি প্রশস্ত বক্ষঃস্থল; পুষ্ট বাহুযুগল, কোমর চিকণ; উরু ও তন্নিম্নস্থ অঙ্গদ্বয়ও বলের লক্ষণ বিশিষ্ট, গলদেশ মোটা ও খাটো—যাহাকে পারসী ভাষায় কোতাগর্দ্দন বলে। চক্ষু ছোট, পিট্ পিট্ করিয়া তাকায় এবং আমার বোধ হইল তাহা কিঞ্চিৎ ধূসরবর্ণ—কিন্তু চক্ষু ভিন্ন মুখের অন্য কোন অঙ্গ নিন্দনীয় নহে। * * * * মনোহরের পরণ পরিচ্ছদে এবং ভাব ভঙ্গিতে বোধ হইল, যে ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত হওয়া তাহার সম্পূর্ণ অভিলাষ ছিল এবং প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়াও অনেকের ভ্রম হওয়া অসম্ভব ছিল না, কিন্তু ব্যাটা চুলে ধরা পড়িত; কেননা গোয়ালাদিগের সাধারণ প্রথানুসারে তাহার চুল গুচ্ছাকার ছিল।"

দেখ, কেমন একটা আদর্শ গোয়ালার মরদ খাড়া হইয়াছে—আর কল্পনা কি করিবে বল? তাহাতেই বলিতেছিলাম—আসলের কাছে কি নকল?

গিরিশ বাবুর ভাষার কথা পরে বলিতেছি, এইস্থলে তাঁহার একটী বিচিত্র কায়দার কথা বলা আবশ্যক। "কিন্তু ব্যাটা চুলে ধরা পড়িত।" হঠাৎ এই ব্যাটা কথাটি ব্যবহার করাতে গ্রন্থকার—মনোহরকে আপনার সম্মুখে আনিয়াছেন, সে যে হীন জাতীয় তাহা বলিয়া দিয়াছেন এবং অবজ্ঞা সূচনায় তাহার প্রতি ঘৃণা দেখাইয়াছেন। ঐ ক্ষুদ্র কায়দার গুণে আমরা মনোহরকে যেন

চোখের উপর দেখিতে পাই—আর সে যেন অপদস্থ হইয়াছে—আর গিরিশ বাবু টিপি টিপি হাসিতেছেন—এমনই মনে হয়। গিরিশ বাবুর বর্ণনা কল্পনার সাহায্য লয় না, কিন্তু নিজে কল্পনার সাহায্য করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি গিরিশ বাবু ইংরাজিতে সুশিক্ষিত এবং গ্রন্থেই প্রকাশ তিনি দারোগাগিরিতে দীক্ষিত। এই শিক্ষায়, দীক্ষায় গিরিশ বাবুর ভাষা সাধারণত ইংরাজির পরিষ্কৃতি ও ভাব-ব্যঞ্জকতা এবং দারোগা মহাশয়ের রিপোর্টের জটিলতা ও দীর্ঘচ্ছন্দতা পাইয়াছে। গিরিশ বাবুর ভাষায় ঘনঘটার ঘোরতর গভীর গর্জ্জন নাই, কুসুম সুষমার মৃদুমন্দ হাসিও নাই কিন্তু তথাপি ভাবের পরিপোষণে একরূপ দীর্ঘচ্ছন্দতা আছে, রিপোর্টের মত একটি বাক্যের (Sentence) মধ্যে দুইটী গর্ভ বাক্য আছে—কিন্তু ভাবের ধূসরিমা কোথাও নাই; শরতের আকাশের মত সর্ব্বত্রই পরিষ্কার, সর্ব্বত্রই জল্ জল্ করিতেছে। তাঁহার ভাব তাঁহার ভাষার কাছে কোথাও কিছুমাত্র ধার করে নাই—তাঁহার ভাষা সর্ব্বত্রই তাঁহার ভাবের কাছে ঋণী—এই ঋণ আর একটু শুধিতে পারিলেই ভাল হইত।

দারোগার কাহিনীর আর একটি গুণ, ইহাতে গ্রন্থকার প্রায়ই কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নাই—নীলকর, জমীদার,—ধনী, দুঃখী—পোলিস প্রহরী—সকলেরই দোষ গুণ তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। নিজের দোষ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তবে তাঁহার উপরওয়ালাদের সমস্ত দোষের কথা তিনি যে বিবৃত করিয়াছেন—একথা বলিতে আমরা পারিব না। নাই পারি, তথাপি বলিব যে, দারোগার কাহিনী, এক চোখো—এক ঘেযে—একপক্ষপাতের লেখা নহে।

গ্রন্থকার ছোট কথা তুচ্ছ করেন না। মনোহর যখন ঢেঁকিতে বাঁধা তখনি খোট্টা জমাদার আসিয়া একজন চৌকীদারের বস্ত্র দিয়া সেই ঢেঁকীর ধুলা পরিষ্কার করিয়া, সেই ঢেঁকীতে বসিল। এ সকল অতি ক্ষুদ্র কথা—দারোগা মহাশয় তখন লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এখন পর্য্যন্ত ভুলেন নাই এবং আমাদের কাছে বলিতেও ভুলেন নাই। যে ছোটকে ভুলে না, সেইত ভাল; সেইজন্য আমরা বলি,—যথা কথা বর্ণনায় গিরিশ বাবু একজন ভাল লেখক। আর তাঁহার কাহিনী, অরঞ্জিত ঘটনার নিরপেক্ষ, ধীর, বিশদ বর্ণনায়, আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম অথচ সর্ব্ব-জন-রঞ্জন উপাদেয় গ্রন্থ।

মূর্খ।

(সমাজ রহস্য)

প্রথম অধ্যায়।

"মূর্খ"—অনেকের মুখে শুনিয়াছি, আমাকেও লোকে বলিয়াছে, আমিও হয়ত দু একজনকে বলিয়া থাকিব,—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, উহার সূত্র অবগত নহি। লেখা পড়া না জানিলে যদি মূর্খ হয়, তবেত জগতের বেশী লোকই মূর্খ। "দশ জনের মত হওয়া চাই" ; এই কথার যদি কোন সার্থকতা থাকে, তবে মূর্খ হইলেই বা ক্ষতি কি ? আর যদি লেখা পড়া শিখিয়াও মূর্খ হইতে পারা যায, বা অন্য লোকের তাহাকে মূর্খ বলিবার অধিকার থাকে, তবে একজনকে মূর্খ বলিলে সে চটে কেন ? মূর্খ শব্দের সহিত ইংরেজী "ডনস্" শব্দের যদি সাদৃশ্য থাকে, তবেত মূর্খ অর্থ—ঘোর তার্কিক পণ্ডিত, কেননা "ডন্‌স-স্কোটস্" একজন কুট তার্কিক পণ্ডিত ছিলেন। ডন্‌স স্কোটস্ ইংরেজদের, এবং ষণ্ডামার্ক আমাদের,—উভয়ই পণ্ডিত, কিন্তু দশজনের জিহ্বার বলে ইহারা মূর্খের আদর্শ শ্রেণীভুক্ত।

আমাদের ভূতনাথকে এইরূপ মূর্খের শ্রেণীভুক্ত বলিতে পারি না। কেননা ভূতনাথ পণ্ডিত নহেন, বা তার্কিকও নহেন। তথাপি তাঁহার দেশের লোকে তাঁহাকে বলে "মূর্খ" !

বাল্যকালে লেখা পড়া শিখিবার অগ্রে সকলেই মূর্খ। কিন্তু তখন হইতেই ভূতনাথ মূর্খ এবং তাহার সমবয়সীগণ পণ্ডিত। কেননা ভূতনাথ পিতৃহীন, অনাথিনী দুখিনীর সন্তান, বস্ত্রহীন, তৈলহীন, আদর হীন, অন্নহীন, ধুল্লিতে লুটাইয়া ভূতের মত থাকিত। আর তাহার সমবয়সীরা নিকর-বুকর পরিয়া, জরির টুপি জরির পাদুকা পরিয়া, দাস দাসীর কক্ষে বক্ষে স্কন্ধে শিরে গহনার ন্যায় শোভা পাইত। সুতরাং তাহারা পণ্ডিত, ভূতনাথ মূর্খ।

ভূতনাথ স্কুলে যাইতে শিখিল। তাহার সমবয়সীরাও যায়। ভূতনাথের পড়া হইতেছে কি না, গ্রাম্য শিক্ষক দেখিয়াও দেখেন না। আর তাহার সমবয়সী যাহারা,—তাহাদিগকে ক্রোড়ে করেন, চুম খান, একবারের যায়গায় দশবার পড়া বলিয়া দেন। আর ভূতনাথ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, নাসিকা

কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণার ভাবে "ধাৎ ছোঁড়া, এটা মূর্খ হইবে" বলিয়া চলিয়া যান। তখন হইতেই গ্রামের লোকে টের পাইল, ভূতনাথ মূর্খ হইবে।

এই ভাবে পড়া শুনা চলিতে লাগিল। গ্রামের ছেলেরা ইংরেজী তিন চারিখানা বহি সায় করিল, ভূতনাথও নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহা ধরিল। তবে দোষের মধ্যে এই স্কুলের ডিপুটী হাকিম আসিলে সকলে যাহা পারে না, সে তাহা কহিতে পারে, আর সকলের আগে অঙ্ক করিয়া দেয়। সুতরাং ভূতনাথ মূর্খ আর তাহার সহপাঠিগণ পণ্ডিত। ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই স্কুলে পড়িয়া পণ্ডিত হইতে লাগিল, কেবল ভূতনাথেরই মূর্খত্ব বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ভূতনাথ গরীব। সুতরাং তাহার আর পড়া চলে না, সে কেতাব কিনিতে পারে না, স্কুলের মাহিয়ানা যোগাইতে পারে না। গ্রামে দশ ঘর অবস্থাপন্ন লোক আছে, জমীদার ধনকুবের জ্ঞাতিও আছেন, কিন্তু কেহ কিছু সাহায্য করে না। সাহায্যের মধ্যে ভূতর মা জ্ঞাতি বাড়ী রাঁধিয়া দুটী নিজে খায়, পাতে যাহা থাকে, ভূতো খায়। ভূতনাথের মা ম্রিয়মানা হইয়া কাহারো কাছে ভূতর মাহিযানা বলিয়া, কি কেতাবের দাম বলিয়া কিছু সাহায্য চাহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ এই বলিয়া আপত্তি করেন, "ও ছোঁড়া মূর্খ হইবে, ওর আর পড়িয়া দরকার কি।"—ভূতর মা কাঁদিয়া ফিরিয়া আসেন।

ভূত এখন ছোট নয়, তের বৎসরের হইয়াছে। লোকের চক্ষু দেখিয়া হৃদয় বুঝিতে পারে। লোকের কথা বিশ্লেষণ করিয়া উহাতে কতটুকু মধু কতটুকু নিম্বরস আছে বুঝিতে পারে। মায়ের কষ্ট—নিজের হীনভাব—বুঝিতে পারে। এক দিন বাটীর উঠানে দাঁড়াইয়া উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম ও স্বর্গ পানে চাহিয়া দেখিল। দেখিল সব অন্ধকার। পৃথিবী অন্ধকার। দয়া মায়া স্নেহ সহানুভূতি কিছুই নাই। শূন্যে বিহগ, বনে শৃগাল, পথে কুকুর বিড়াল, মাঠে গরু মহিষ গাধা, গৃহে মানুষ, সকলই চিত্রপট, সকলই সমান। দেখিল সকলই বৃথা, সকলই—রূপ-রস-গন্ধ-বিহীন। মনে বিরাগ জন্মিল,—ভাবিল পশু হইলাম না কেন, সকলই পশু হইল না কেন? পশু যদি মানুষের অধম হয়, তবে মানুষের এত ঝঞ্ঝাট কেন? টাকা নাই, কাপড় নাই, খাবার নাই তাই বলিয়া কি সংসারে মিষ্ট মুখও নাই। মিষ্ট কথার দাম নাই; উহা ত অকাতরে সকলকেই বিলাইতে পারা যায়—তবে লোকে তাহাতে কুণ্ঠিত কেন? কেতাবে পড়িয়াছি, "দীন দেখিয়া দান করিও"—কিন্তু সকলেই

ইহার বিপরীত আচরণ করে, যাহার আছে তাহাকেই আরো দেয়। লোকে যাহা কেতাবে লিখিবে পড়িবে, কার্য্যকালে তাহার বিপরীত করিবে এই কি তবে নিয়ম? তবে চুরি করিলে জেলে দেয় কেন? নিয়ম—নিয়মত কিছুই দেখিতেছি না। নিয়ম—তবে মানুষের নিয়ম বুঝি—নিষ্ঠুরতা, রূঢ় কথা, কৃপণতা। যদি কখন বড় হই, টাকা হয়, বড় লোক হই, বড় বাড়ীর বড় বাবুর ছবি যেমন একজন চিত্রকর আসিয়া আঁকিয়াছে—আমার ছবি আঁকিতে আসিলে বলিব "একটা ভালুক আঁকিয়া নীচে আমার নাম লিখিয়া রাখ নতুবা পয়সা দিব না।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আজি পৌষ সংক্রান্তি—গ্রামে উৎসব। কার বাড়ী কতগুলি পীঠে হইবে, আপন আপন বাড়ীতে সকলে তাহারই বন্দোবস্ত করিতেছে। বেলা নয় দশটা হইয়াছে। তবু কুয়াসায় জগত আঁধার করিয়া রাখিয়াছে। ভূতনাথের মা আপন ক্ষুদ্র গৃহে সাত বৎসরের বালিকা কন্যা নীলাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া কান্দিতেছেন। নীলা বুঝিতে পারিয়াছে, যে মা মনোদুঃখে কান্দিতেছেন, বালিকা ক্ষুদ্রহস্তে তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া ক্ষুদ্র কথায় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছে।

"মা কান্দিও না, দাদা চাকরী করিতে শিখিলে আমাদের সুখ হইবে। দাদা পিঠা ভালবাসে না, আমিও ভালবাসি না। আজ পরবের দিন—যদি পিঠা না করিতে পারিলে দোষ হয়, দেবতারা রাগ করে, আমি না হয় ধূলীর পিঠা গড়িব, তুমি দেবতার নামে নিবেদন করিয়া দিও। দেবতারাত আর পিঠা খায় না,—দেবতারা বেজার হইবে না, আমাদের যা আছে তাই দেবতাকে দিব।—দাদা সে দিন রামায়ণ পড়িতে ছিল,—রামায়ণে লেখা আছে, রামচন্দ্র ধূলী দিয়া বাপের পিণ্ড দিয়াছিলেন।"

মাতা বলিতেছেন "না মা, সে জন্য কাঁদিতেছি না,—সে দিন তুই বলেছিলি মা দুধের স্বাদ যে কেমন মনে নাই"—তাই ও বাড়ীর বড় দিদির কাছে একটু দুধ চাহিয়াছিলাম, তিনি বলেছিলেন পৌষ পার্ব্বণের দিন তাঁর পিঠা করিয়া দিলে, দিবেন। তাই বড় আশা করিয়া আজ তাঁর কাছে

গিয়াছিলাম; দুধ ত দিলেনই না, উপরন্তু কত গাল দিলেন; বলিলেন, 'এত বেলায় কি বেড়াইতে আসিয়াছিস্, আর তোকে দরকার নাই, আর আমার বাড়ী কিছু চাইতে আসিলে এক কুল ছাই দিব,' তাই মনের দুঃখে কান্দিতেছি।" নীলা কিছু অপ্রস্তুত হইল, মায়ের দুঃখ দেখিয়া হৃদয়ে বেদনা পাইল, কি করিবে, মার মুখপানে চাহিয়া পবিত্র জাহ্নবীর ধারা ছাড়িয়া দিল। কবিশ্রেষ্ঠ গৈয়াড্ যথার্থই বলিয়াছেন

"শিশু দেহ পুণ্য তীর্থ;
মহা পূত তার অশ্রুনদী
পর দুঃখে উদ্বেলিত যবে।
ক্ষত শিরে দাও ঢালি নর।
যদি নীরোগ হইবে; ঐত
ঐত স্বর্গের দেবতা ঐত,
ঐত স্বর্গ মন্দাকিনী"

* * * * * * * * * *

পশ্চাতে পদ শব্দ হইল। মা, মেয়ে, ফিরিয়া চাহিল। সম্মুখে ভূতনাথ। ভূতনাথের মুখ শুষ্ক ও চিন্তিত। নীলা সহর্ষে দাঁড়াইয়া বলিল, "দাদা কোথা গিয়াছিলে।" যে ভূতনাথ সমস্ত জগত আঁধার দেখিয়াছিল, মানব পাষাণময় দেখিয়াছিল, এখন সে সমস্ত জগত আলোকমালায় সজ্জিত দেখিল, মানবকে কুসুমদাম তুল্য দেখিল, মাতা ভগিনীর পবিত্র স্নেহপূর্ণ বদনমণ্ডল দেখিয়া হৃদয় ক্ষণেকের জন্য শান্তিরসে পূর্ণ করিল। নয়নকোণে দুফোঁটা স্ফটিক ফুটিল। ধীরে নীলাকে তুলিয়া ক্রোড়ে লইল, এবং মাকে মধুর-বচনে বলিল, "মা, শরত কাকা মকর্দ্দমায় সাক্ষী দিতেঢাকা যাইতেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে যাব, এভাবে বাড়ীতে থাকিলে যথার্থই মূর্খ হইব, শুনিয়াছি ঢাকায় অনেক বড় মানুষ আছে, চেষ্টা করিলে সেখানে থাকিয়া লেখা পড়া করিতে পারিব।"

ভূতনাথের মায়ের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; মুহূর্ত্তকাল চক্ষে আঁধার দেখিলেন; পরে বলিলেন, "বাবা! দেশে, লোকে মারতে দাঁড়াইলে কেহ চাহিয়া দেখে না, তাই বলি, বিদেশের লোকে তোমার খরচ যোগাইবে?" "চেষ্টা করিয়া দেখিব, সুবিধা না হয় চলিয়া আসিব।" "শরত কবে যাইবে," "পরশু প্রাতে।"

ভূতনাথের মা, চমকিয়া বলিলেন, "পরশুই, দুখানি কাপড়, তারও একখানি ধোপা বাড়ী, কি লয়ে যাবি,—হাতে একটি পয়সা নাই সঙ্গেই বা কি দিই?"

ভূতনাথ বলিল, "মা তোমার হাতের ও গলার কি গয়না বিশুবাবুদের বাড়ী আছে, তারই একখানি বাঁধা রাখিয়া কিছু টাকা আন, তুমি কিছু রাখ, আমায় কিছু দেও।"

ভূতনাথের মাতা বলিলেন, "তা হ'লে ত ভালই হইত, গয়না তাঁর মায়ের কাছে রাখিযাছি তিনি গঙ্গা স্নানে কলিকাতা গিয়াছেন, এখন আমার একটি হাতের আংটি আছে যদি তাই রাখিয়া কিছু আনিতে পারি।"

আজি একাদশী সুতরাং ভূতনাথের মাতার আহারের আয়োজন করিতে হইবে না এবং একাদশী বলিয়া আজ তাঁহাকে যে বাড়ী রাঁধিয়া দিতে হয়, তাঁহাদের বাড়ীতেও রাঁধিতে হইবে না, কেননা বিশুবাবুর পিতামহী বিশুবাবুর স্ত্রীকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, "ভূতর মা ছেলে বয়সে বিধবা হইয়াছে, তোরা তাকে একাদশীর দিন রান্না করিতে দিস্ না।" বলা আবশ্যক, যে ভূতনাথের মা বিশুবাবুর বাড়ীর (অনরাবি) সম্মানিতা পাচিকা। বিশুবাবু ধনকুবের জমীদার এবং ভূতনাথের জ্ঞাতি খুড়া। এখানে বলিয়া রাখা উচিত, বিশুবাবু বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

* * * * * * *

ভূতনাথ ও নীলার আজ নিমন্ত্রণ আছে। তাহারা নিমন্ত্রণে চলিয়া গেলে ভূতনাথের মা আংটী লইয়া বিশুবাবুর বাটী চলিলেন; যাইবার কালে দুই বিন্দু অশ্রুপাত হইল।

অশ্রুপাত কেন হইল, মূল্যবান জিনিষ বলিয়া কি? তাহা নহে, ভূতনাথের মাতা ভূতনাথের জন্য বিনা অশ্রুপাতে, সহস্র সাম্রাজ্যত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু এই অঙ্গুরী তাহা হইতেও অধিক মূল্যবান। ইটী, স্বামি-চিহ্ন, স্বামীর অঙ্গুলীতে চিরদিন ছিল, তাই যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, আমরণ রাখিবেন; মাঝে মাঝে দেখিবেন; স্বামীর দেবমূর্ত্তি মনে পড়িবে, আজ সেই চিহ্ন লুপ্ত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

অঙ্গুরীতে এক খণ্ড হীরক সংলগ্ন ছিল, স্বামীর নিকট শুনিয়াছিলেন উহার মূল্য একশত টাকার ন্যূন নহে। স্বামী অক্ষম লোক ছিলেন না, ভাল চাকরী করিতেন, গবর্ণমেণ্টের কোন আইন বহির্ভূত প্রদেশের বন্দোবস্তের ভার তাঁহারই হাতে ছিল। উপার্জ্জন যথেষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু পরোপকারেই তিনি একেবারে নিঃস্ব হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। গ্রামের অনেকেরই অবস্থা তিনিই ভাল করিয়া দিয়াছেন, নিজের জন্য অনেকগুলি জমীদারি বেনামিতে নিলামে কিনিয়া ছিলেন, অল্প হইলেও তাহার বার্ষিক আয় প্রায় সহস্র টাকা হইবে। দুর্ভাগ্যবশত বিশু বাবুর নামে ঐ সকল সম্পত্তি কেনা হয়। মনে করিয়াছিলেন নগদ সম্পত্তি না থাকিলেও, স্ত্রী পুত্র কষ্ট পাইবে না। কিন্তু তিনি সরকারী কার্য্য ছাড়িয়া বাড়ীতে আসিতে না আসিতেই বিশুবাবুর সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়। বিশুবাবু সম্পত্তির লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সমস্ত বিষয় অস্বীকার করিয়া বসিলেন। এই সাংঘাতিক ব্যাপারে তাঁহার পরমায়ু নিঃশেষিত হইল, বিষাদের প্রাণ যাতনায় তাঁহার মৃত্যু হয়। মনে করিয়াছিলেন জীবনের অবশিষ্টকাল স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরমাত্মীয় ও স্বজনবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া সুখে দেশে কাটাইবেন। বিধাতা তাহাতে বৈরী হইলেন। মৃত্যু সময়ে বিশুবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিশ্বনাথ, যাহা মনে ছিল, তাহাই করিয়াছ, কিন্তু আমার শেষ ভিক্ষা এই, আমার নিঃসহায় স্ত্রী পুত্র কন্যা যেন অনাহারে মারা যায় না।"

যাহা হউক ভূতনাথের মাতা অঙ্গুরীটি লইয়া বিশুবাবুর স্ত্রীর হাতে হাতে দিয়া কহিলেন, "সম্প্রতি এই জিনিষটি রাখিয়া আমাকে দশটি টাকা দাও; পরে যদি পারি, খালাস করিয়া লইব, নয় বিক্রী করিব।"

বিশুবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "ইহার এত দর কি হইবে?"

ভূতনাথের মা বলিলেন, "ইহাতে হীরা আছে, শুনিয়াছি, একশত টাকায় এই আংটী কেনা হইয়াছিল।" বিশুবাবুর স্ত্রী, পরীক্ষার জন্য দরজার কাচে দাগিয়া দেখিলেন, কাচ কাটিয়া গেল; পরে আপন অঙ্গুলীতে পরিধান করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আমি রাখিব," এই বলিয়া পাঁচটী টাকা হাতে দিয়া বলিলেন, "আমার হাতে আর টাকা নাই, আর

কিছু পরে তিনি (বিশুবাবু) আসিলে, আপনাকে আর পাঁচ টাকা দিয়া আসিব।"

ভূতনাথের মা বাড়ী আসিয়া দেখে, ভূতনাথ, নীলা খাইয়া বাড়ী আসিয়াছে। ভূতনাথ বলিল, "মা আমি নিমন্ত্রণ খাইয়া আট আনা দক্ষিণা পাইয়াছি। ইহাতেই আমার হইবে, আঙ্গটীর জন্য তোমার চক্ষের জল পড়িয়াছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি; এখন আঙ্গটি কোথাও রাখিবার দরকার নাই।" তাহার মা বলিলেন, "আমি ও বাড়ীর বড় বৌর কাছে আঙ্গটি রাখিয়া পাঁচটী টাকা আনিয়াছি।" ভূতনাথ বলিল, "টাকা দিয়া আঙ্গটী লইয়া আসুন।"

এমন সময় বিশুবাবুর স্ত্রী আসিয়া বলিলেন, "আঙ্গটী আমি রাখিব না, আমার টাকা পাঁচটী দিন।" ভূতনাথের মা একটু খুসী হইয়াই টাকা পাঁচটী তাঁর হাতে দিলেন, তিনি টাকা লইয়াই চলিয়া গেলেন।

ভূতনাথের মা, তাহার পাছে পাছে যাইয়া বলিলেন, "আমার আঙ্গটী"?

বিশুবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "কার আঙ্গটী, ও আমাদের আঙ্গটী অনেক দিন হইল চোরা গিয়াছিল, আঙ্গটী নিতে হয় ত তাঁর কাছে যান, তিনিত আপনাকে পুলিশের হাতেই দিতে চাহিয়াছিলেন, আমি কেবল বলিয়া কহিয়া বারণ করিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া ভূতনাথের মা, মাথায় হাত দিয়া রাস্তার মাঝখানে বসিয়া পড়িলেন। একটা কথা তাঁহার মুখে ফুটিল না। কিছুকাল পরে একটি মাত্র অস্ফুট চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন।

বিশুবাবুর স্ত্রী আগেই চলিয়া গিয়াছিলেন, সেখানে কেবল নীলা মায়ের সঙ্গে ছিল। নীলা মায়ের ঐ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া "দাদা মা মলো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ভূতনাথ বাড়ীতে ছিল দৌড়িয়া আসিয়া কান্দিতে লাগিল।

তাহাদের উচ্চস্বরে ক্রন্দন শুনিয়া পাড়ার দুটি তিনটী স্ত্রীলোক ও পুরুষ মানুষ আসিল; ধরা ধরি করিয়া ভূতনাথের মাকে বাড়ীতে আনিয়া শয়ন করাইয়া, কেহ বলিতে লাগিল, ভূতে পাইয়াছে, কেহ বলিতে লাগিল, "মৃগী" হইয়াছে।" গাঁয়ে এক মূর্খ কবিরাজ ছিল, সে স্থির করিল, "প্রেমোন্মাদ" হইয়াছে এবং তদনুসারে কিছু নস্য ও কিছু বটিকাও দিল।

নষ্ট এ বটিকার প্রয়োজন হইল না। ভূতনাথের মা যথার্থ স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইলেন। জাগিয়া কিছু কান্দিয়া মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন, "যথা সর্ব্বস্ব যে লইয়া আমাকে ভিখারিণী করিল, সে অঙ্গুরীটি আত্মসাৎ করিবার জন্য আমাকে চোর অপবাদ দিবে আশ্চর্য্য কি?"

ভূতনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "মা তোমার কি হইয়াছিল?" পাছে ছেলের মনোকষ্ট হয় এজন্য গোপন করিয়া বলিলেন, "একাদশীর উপবাস লাগিয়াছিল, তাই ঘুরিয়া পড়িয়াছিলাম।" ভূতনাথ আর কথা কহিয়া মাতাকে বিরক্ত করিল না।

* * * * * * *

পর দিন, শেষ রজনীতে ভূতনাথ স্বপ্ন দেখিয়া জাগিল। স্বপ্ন দেখিতে ছিল, —সে এক নূতন দেশে গিয়াছে, সেখানে ক্ষুদ্র পুকুর নাই, বড় নদী, কুটীর নাই, শাদা শাদা বড় বড় ইটের বাড়ী। নদীর স্রোত চলিতেছে, পথে মানুষের স্রোত চলিতেছে, পিপাসা লাগিল, জল খাইতে নদীতে নামিল, নদী কাচের ন্যায় কঠিন হইল। পিপাসায় প্রাণ যায়, উঠিয়া এক বাড়ী গেল, কত লোক হাসিতেছে আমোদ করিতেছে;—জল চাহিলে, সকলের মুখ বিষণ্ণ হইল, নিকটে যাইয়া দেখিল উহারা পাষাণ হইয়াছে। এইরূপ ভূতনাথের স্পর্শে সকলই পাষাণ হইতে লাগিল। পিপাসায় দগ্ধ হৃদয় হইয়া প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল, হঠাৎ কে করুণস্বরে বলিল, ভূতনাথ আমি জল আনিয়াছি, চাহিয়া দেখিল আনন্দময়ীর মূর্ত্তি,—জননী। ভূতনাথের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইল, কত আহ্লাদ হইল। মনে ভাবিল একি স্বপ্ন? অমনি জাগরিত হইল। প্রাণ সুস্থ হইল; প্রদীপ জ্বালিয়া অনিমিষ লোচনে মায়ের স্নেহপূর্ণ মুখ দেখিতে লাগিল। "আজ ঢাকা যাইব—কত দিন আর এই মুখ দেখিব না"—এই ভাবিয়া চিন্তার সহিত দর দর অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

চন্দ্র সূর্য্য সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী; কি ধনী কি নির্ধন সকলের বাড়ীতেই সমভাবে উদয়াস্ত হয়। দিনও সেইরূপ, কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে না। বিশু বাবুর দিনও যাইতেছে, ভূতনাথের মায়ের দিনও যাইতেছে। তবে বিশু পরের মাথায় বসিয়া, দুধ ভাত খাইয়া রাত্রি প্রভাত করিতেছে, আর ভূতনাথের মা দিনান্তে আধ পেটা খাইয়া দিন রাত্র কাটাইতেছেন।

এক মাস দু মাস করিয়া ক্রমে বহু মাস কাটিয়া গেল। ভূতনাথ ঢাকা হইতে বাড়ী আসে না, তবে মাঝে মাঝে পত্র লেখে।

ভূতনাথের বাড়ী হইতে যাওয়া অবধি নীলা এক দিনের তরেও সুস্থ নহে, আজ জ্বর, কাল পেটের পীড়া লাগিয়াই আছে। নীলা ভূতনাথকে বড় ভাল বাসে। ভূতনাথের চিঠি আসিলে প্রফুল্ল হয়; তাহার পরেও দু চারি দিন বেশ থাকে, আবার পীড়িতা হয়। বাল্য প্রেমের ভালবাসার কথা অনেক শুনিয়াছি। ভ্রাতা ভগিনীর ভালবাসার কথাও অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু নীলার ভালবাসার মত ভালবাসার কথা কোথাও শুনি নাই। নীলা জানিত, মা দাদা আর সে, এ তিন জনের এক প্রাণ। একজনের অভাবে আর, দুইজন বাঁচিতে পারে না। তাই দাদার কথা সদাই ভাবিতে ভাবিতে তাহার আর অসুখ সারে না। এক দিন ডাকিয়া বলিল "মা আমি বুঝি বাঁচিব না; দাদাকে আর দশ পনর দিনের মধ্যে না দেখিলে প্রাণটা আমার ছট ফট করে বেরিয়ে যাবে।" ভূতনাথের মা বলিলেন, "বালাই, এইত তোমার দাদা আশ্বিন মাসেই আস্‌বে।"

নীলা বলিল, "মা চল না, দাদার কাছে যাই, ঢাকায় দাদা তুমি আমি তিনজনই একত্রে থাকব।"

এমন সময়ে একটী দীর্ঘাকার পুরুষ আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। সন্ধ্যার সময় ঘরের বারান্দায় বসিয়া, মাতা ও কন্যা কথা কহিতেছিলেন,—নীলা ভীতা হইয়া মায়ের পৃষ্ঠ ধরিয়া বসিল, মাও শিহরিয়া, উঠিলেন। দীর্ঘাকার পুরুষ বলিল "বিনোদ"---বিনোদ কথাটি পরিচিত স্বরে উচ্চারিত হইল।

বিনোদ ভূতনাথের মায়ের নাম; এখন হইতে—আমিও বিনোদকে বিনোদই বলিব।

বিনোদ বলিল,—"কে ভুবন দাদা, তুমি না যুদ্ধে গিয়া ছিলে, এস, ইতে এসেছো,"—এই বলিয়া দাঁড়াইলেন। দীর্ঘাকার পুরুষ সেই স্থানে স্থিরবোধ দাঁড়াইয়া বলিল, "যুদ্ধে নহে, মরিতে।"

"বালাই! কি দুঃখে মরিবে?"

"তুমি কি তা জান না?"

"আমি মরি নাই কেন?"

"তুমি নিষ্ঠুর।"

"তুমি মূর্খ।"

"তুমি মূর্খ" বিনোদ এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে অঞ্চল দিয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল,—আর বলিতে লাগিল, "দেখ আমি স্ত্রীলোক হইয়াও কত সহিতে পারি, মরাত সহজ কথা, মরিব কেন? সহিব। দেখিব মানুষের শরীরে কত সহিতে পারে, সহাই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে সহিব না কেন? কষ্টের সীমা থাকিতে পারে, পুরস্কারও থাকিতে পারে, আমি সেই সীমা অপেক্ষা করিতেছি।"

দীর্ঘাকার পুরুষ ভ্রূকুটি করিয়া বলিল——

"আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ?"

"প্রায়।"

"সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাও।"

"কি সম্পূর্ণ?—সম্পূর্ণরূপেই ভুলিয়াছি।"

"শেষ, একটি ভিক্ষা।"

"কি বল?"

"তোমার চিহ্ন স্বরূপ নীলাকে আমায় দাও।"

"বিবাহ করিবে?"

"দিবে কি না, তাই বল?"

"বার বৎসর বয়েস হইলে দিব।"

"তবে দিবে ঠিক?"

"ঠিক।"

"তবে শুন,—নীলাকে বিবাহ করিবার—আমার ক

দের দেশে বিবাহ নাই, পীড়া নাই, শোক নাই, ে

পর, স্নেহ সব—এক, নর নারী ভেদ নাই, ইচ্ছা নাই, অজ্ঞান
চ' য় নাই—নীলা যাবে ত?"

বলিয়া দীর্ঘাকার পুরুষ হাত বাড়াইল। নীলা ভয়ে মাকে যাপটিয়া
ল। বিনোদ চাহিয়া দেখিল দীর্ঘাকার পুরুষের মুখ শুষ্ক, নয়ন শুষ্ক
তি; তাহার শরীরে যে চাঁদের আলো পড়িয়াছে, কাচে প্রতিফলিত তাহাতে
লোকের মত তীব্র জ্যোতি বর্ষিত হইতেছে; বিনোদ ভীতি বিহ্বল চিত্তে
কিল, "ভুবন," "ভুবন" "ভুবন।" ভুবন আর কথা কহিল না, একটু
সিয়া চলিয়া গেল।

বিনোদ অবাক্ হইলেন; ভাবিলেন, "একি—এই কি সেই ভুবন,—একি
নুষ!"

* * * * * * * *

সেই রজনীতে বিনোদ শুইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, "ভুবন প্রলয় অগ্নিকুণ্ডে
স্থিরভাবে বসিয়া হাঁসিতেছে; তাহার ক্রোড়ে বিনোদ বসিয়া রহিয়াছে"—
বনোদ একবার আপনার দিকে, আর বার অগ্নি নিমজ্জিতা বিনোদের দিকে
াহিলেন; তাঁহার আপনার অস্তিত্বে ভ্রম হইল; আবার চাহিয়া দেখিলেন,
বিনোদ বিধবা নহে, কুমারী, জানিয়া ভয়ে গোবিন্দ নাম স্মরণ করিতে
াগিলেন। নীলা তখন কাঁপিতে ছিল, বলিল "মা আমার গায়ে আর এক
ানি লেপ চাপিয়া দাও, বড় জ্বর আসিয়াছে।"

বী।১৮৭ প।
ছুট ফট করে।
তোমার দাদা আশ্বিন ম
নীলা বলিল, "মা চ
তিনজনই একত্রে
এমন সময়ে
সময় ঘরের বারা
ভীতা হইয়া মায়ের
পুরুষ বলিল "বিনোদ"
বিনোদ ভুতনাথে

পঞ্চম অধ্যায়।

ঠকের মনে উদয় হইতে পারে, সুতরাং ভুবনের
বলে অসঙ্গত না হইতে পারে। যদি কেহ অসঙ্গত মনে
দ্র অধ্যায়টী বাদ দিয়া এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন। তাহাতেও
না।

ান দশ বৎসর, তখন হইতে বিনোদ ভুবনকে আন্ত
ভাল বাসে,—এই ভালবাসা ক্রমে বয়েসের সঙ্গে
র তের বৎসর বয়স কালে বিনোদে ভুবনে গোপনে
কেহই অন্যকে বিবাহ করিবে না। ভুবন বেটা
ছেলে সুতরাং চুক্তি রক্ষা করিতে পারিল। কিন্তু বিনোদ তাহা পারিল না।

বিনোদের পিতা মাতা ছিল না, মামা মামি, ভাল চাকুরে দেখিয়া অন্য স্থানে বিনোদকে বল পূর্ব্বক বিবাহ দিল। সেই অবধি পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। বিনোদ বিবাহের রাতে মামার অহিফেনের কৌটা হইতে অহিফেন সেবন করিয়াছিল—ভুবন ডাক্তারী শিখিত, সুতরাং ভুবন উপস্থিত ছিল বলিয়া, বিনোদ মরিতে পারে নাই।

বিবাহ হইয়া গেলে এক বৎসরের মধ্যে, বিনোদ ভুবনকে ভুলিবার চেষ্টা করিল, এবং দশ বার বৎসরের মধ্যে তাহার হৃদয়ে যে ভুবনের ছবি অঙ্কিত ছিল, তাহার বর্ণ একবারে উঠাইয়া ফেলিল কেবল অস্ফুট দাগ মাত্র রহিয়া গেল। বিনোদ এ দাগ তুলিবার জন্যও কম চেষ্টা করেন নাই, তাহা করিতে গিয়া তাঁহার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ভুবন, বিনোদের বিবাহ হইলেও আশা ছাড়েন নাই। একদিন বিনোদকে জনশূন্য স্থানে পাইয়া বলিয়াছিলেন, ‘বিনোদ, দুই স্ত্রীর কি আমাদের দেশে এক স্বামী থাকে না, এক স্ত্রীর দুই স্বামীও ত সে হিসাবে থাকিতে পারে,—ইহ জীবনে আমি আর বিবাহ করিব না, তুমি শুদ্ধ মনে ভাবিও, আমি তোমার স্বামী, ইহা বই আর পার্থিব কোন সুখের আশা আমি তোমার নিকট করি না।”

বিনোদ নিষ্ঠুর হইয়া বলিলেন, “দেখ ভুবন, তোমার এই যুক্তি, এই পবিত্র প্রণয়—বিভীষিকা; ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল ধর্ম্ম কলুষিত করিয়াছে। আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়াছি; তুমিও আমাকে ভুলিয়া যাও।” ভুবন কাঁদিয়া বলিলেন,—“আমি ভুলিতে পারিব না।”

বিনোদ অধিকতর রুক্ষভাবে বলিলেন, “মরিবার পথ অপ্রশস্ত নহে, তুমি মর, তাহা হইলে আমার পাপের একটি সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িবে।”

ভুবন প্রতিজ্ঞা করিলেন, “বিনোদ তবে যাই, তোমার সহিত আর একবার দেখা করিব,—কিন্তু এ শরীরে নহে।”

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই ভুবন—ডাক্তার হইয়া কি রসদের কর্ম্মকারক হইয়া, ঠিক্ বলিতে পারি না, মিসরে সময়ে গমন করেন।

ঘোমটা।

রমণীর চারুচন্দ্র পবিত্র আনন,
কেন তুমি আবরিয়া রয়েছ ঘোমটা ;
দেখিতে না দেও তার লাবণ্য কেমন,
ভুবন মোহন সেই নবরূপ ছটা !
দিবানিশি একাকী সে দেখ চাঁদমুখ,
তথাপি আকাঙ্ক্ষা নাহি পূরে একটুক ?

তুমি হিংসুকের শেষ বড়ই নিষ্ঠুর,
পরে যে দেখিবে তব নাহি সয় প্রাণে !
তুহি হে রাহুর চেয়ে ভয়ানক ক্রূর,
রাহু ত গিলিয়া পুন উগারিতে জানে !
গিলিলে নারীর মুখ তুমি দুরাচার,
যৌবন থাকিতে তাহা নাহি ছাড় আর !

দেও হে দেখিব আছে বড় সাধ মনে,
ও নলিন রূপরাশি অমলিন কাচ !
ভয় কর কি জানি কি যদি দরশনে,
নয়নে তুলিয়া তার নিয়ে যাই ছাঁচ !
নিব না, দেখিব শুধু আমার এ দাগে,
তোমার ও মুখখানি লাগে কি না লাগে!

হারা'য়ে গিয়েছি তারে বহু দিন গত,
পরাণ আকুল বড় দেখিতে তাহারে,
টলমল সে কমল নয়ন আনত,
নুইয়া পড়েছে যেন স্নেহ লাজ ভারে !
দেখিলেই ঢাকা মুখ মনে করি এই,
লুকা'য়ে রয়েছে বুঝি সেই

ঘোমটা।

সন্দেহ ভাঙ্গিয়া দেও, ভেঙ্গে দেও ,লজ্জ
অপবিত্র হইবে না দেখিলে কখন,
পৃথিবীর পাপী তাপী কত দেখে ফুল,
দেখে রবি, দেখে শশী, গ্রহ তারাগণ!
সেই জ্যোতিঃ সেই কান্তি নব পরিমল,
সকলি তেমনি থাকে পবিত্র উজ্জ্বল!

একটু সর না তুমি আমি দেখে যাই,
এত দেখ নিশিদিন পূরে না কি আশা?
অথবা তোমারে মিছা দোষ দেই ভাই,
রমণীর মুখে জাগে স্বপ্নের পিপাসা!
রাহু যে চাঁদেরে ছাড়ে শুধু চাঁদ ব'লে,
সেও না ছাড়িত বুঝি চাঁদ মুখ হ'লে।

শ্রীগোবিন্দী